# SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.



Chief Editor : Dr. Jaygopal Mandal

Abhisek Tower, Block-A, 4th Floor, Flat No. 2,
Kolakushma, P.S.-Saraidhela, Dhanbad–828127, Jharkhand



ISSN : 2394 4889 Vol : VIII, Issue : XVII, 4th March 2023

Published by : Dr. Jaygopal Mandal
Abhisek Tower, Block-A, 4th Floor, Flat No. 2,
Kolakushma, P.S.-Saraidhela, Dhanbad–828127, Jharkhand
Mobile No. 9830633202 / 7003488354

E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com

sahityaangan@gmail.com, Website : www.sahityaangan.com



ISSN : 2394 4889 Vol : VIII, Issue : XVII, 4th March 2023 ● সাহিত্য অঙ্গন

# সাহিত্য অঙ্গন

## (साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

**ISSN : 2394 4889 Vol : VIII, Issue : XVII 4th March 2023**

**Website : www.sahityaangan.com**

মুখ্য সম্পাদক

*ড. জয়গোপাল মণ্ডল*

***(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)***

কার্যকরী সম্পাদক

*ড. প্রণবকুমার মাহাতো*

*ড. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়*

*উজ্জ্বল প্রামাণিক*

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০০৯

**SAHITYA ANGAN**
**An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual**
**Peer-reviewed Journal**
**ISSN : 2394 4889 Vol : VIII, Issue : XVII 4th March 2023**

**Chief Editor :**
Dr. Jaygopal Mandal

**Working Editor :**
Dr. Pranab Kumar Mahato
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Ujjwal Pramanik

© Publisher

**Cover Drawing :** Sidhartha Bose

**Type Setting & Cover Setting :**
Manik Sahu
Mob : 9830950380

**Printing and Binding :**
Dey's

**Price : 550.00**

**Published By :**
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

**Advisory Board :**

Prof. Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata
Prof (Dr) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Amar Mitra, (Katha Sahityik: Bankim & Ananda Awarded)
Nalini Bera (Katha Sahityik. Bankim & Ananda Awarded)
Professor (Dr.) Bikash Chandra Paul, Dept. of Bengali, University
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik ), Kasba, Kolkata

**Members from the other Countries :**

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh) Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

**Working Editor :**

Dr. Pranab Kumar Mahato
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Ujjwal Pramanik

**Working Editorial Board :**

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Soma Bhadra Roy, Associate Professor, West Bengal State University, West Bengal
Dr. Sampa Basu, Associate Professor, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Dipankar Arosh, Dept. of Bengali, B. C. College, Asansol
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College, Bankura

# সূচি

**প্রবন্ধ**


গল্প-কথা—গণেশ বসু ১
উত্তরায়ণের দিন—অমর মিত্র ১৯
নারী স্বাধীনতার মৃদুস্বর : অবতরণিকা—পিউ মণ্ডল ২৩
অচরিতার্থ কামনার লেলিহান আগ্রাসন এবং 'সোনালি মোরগের গল্প'—ড. পৌলোমী রায় ২৯
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নির্বাচিত ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা—মোহ : নূরুল আমিন ৩৮
সমরেশ বসুর ছোট গল্প : এক জীবনবাদী প্রত্যয়ের সুর—দিলরুবা খাতুন ৪২
ভাষা বৈচিত্র্যে সমরেশের ছোটগল্প—চন্দ্রিমা মৈত্র দুবে ৪৮
মধ্যবিত্তের রুচির বিপরীতে : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য—ড. মাধুরী বিশ্বাস ৫৭
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের যন্ত্রণা ও প্রত্যয়ের সংকট
—অসীম মুখার্জি ৬৪
ডোমের চিতা : নিম্নবর্গের অস্তিবাদী চেতনার আখ্যান—মধুসূদন সাহা ৭০
নারীমুক্তির প্রেক্ষিতে আশাপূর্ণার সুবর্ণলতা : মাতৃত্বের ভিন্ন স্বর—অভিজিৎ শীট ৭৭
গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প : কুসংস্কারমুক্ত সমাজ ভাবনা কিংবা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য
—অনিন্দিতা দাস ৮৪
গল্পকার ভগীরথ মিশ্রের গল্পে প্রতিফলিত লৌকিক সংস্কৃতির রূপরেখা—মানস ঘোষ ৯১
আবুল বাশারের গল্প রুকু দেওয়ান : এক রূপাজীবার আলোকোজ্জ্বল পরণকথা
—রফিয়া সুলতানা মোল্লা ১০০
উদ্বাস্তু নারীদের জীবনযুদ্ধ ঃ নির্বাচিত উপন্যাসে—গৌতম অধিকারী ১০৬
দুই পৃথিবীর সংঘাত: প্রসঙ্গ রমানাথ রায়ের 'ক্ষত ও অন্যান্য গল্প'—মানসী কুইরী ১১২
সুকান্তি দত্তের 'মহেন-জো-দারোর নগ্নিকা' : মধ্যবিত্ত যৌনজীবন-চেতনার আধুনিক ভাষ্য
—শ্রেয়া ভদ্র ১২০
অভিজিৎ সেনের নির্বাচিত ছোটগল্প : উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষের অনালোকিত যাপনকথা
—কৌশিক পান্ডে ১২৬
নলিনী বেরার গল্পে মানবজীবন: 'তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন'—উজ্জ্বল প্রামাণিক ১৩৮
বাংলা ছোটগল্পে ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রতিফলন—বিজেন্দ্র দালাল ১৪৩
শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ঃ বাংলা ছোটগল্পের ভিন্নতর ধারা—বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ১৫০
প্রচেত গুপ্তের উপন্যাস 'ধুলোবালির জীবন' : যৌনতা, প্রেম এবং দাম্পত্য—সম্পদ দে ১৫৯

নজরুল দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ—ড. অরুণাভ মুখার্জী ১৬২
প্রবহমান বাংলা কবিতা : অপ্রতিরোধ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়—ড. মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি ১৭২





শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : মহাভারত অনুসঙ্গ —সোমা মুখার্জি ১৮০
নব্বই দশক পরবর্তী মহিলা কবিতায় অন্য বয়ান—ড. শান্তনু সাহা ১৮৫
বন্দে আলী মিয়ার গান : একটি পর্যালোচনা—নাফিসা ইয়াসমিন ১৯৩
পুরাণ-প্রতিমাকে সমকালীন তাৎপর্যে অবতারণা : প্রসঙ্গ গণেশ বসুর কবিতা
—নিখিলচন্দ্র মাহাতো ২০০
পঞ্চাশ দশকের বাংলা কবিতায় ছিন্নমূল মানুষের ইতিকথা—গাফফার আনসারী ২০৭
শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত কবিতায় জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যময় ভাবরূপ অন্বেষণ—সুবর্ণা সেন ২১৫
শিকড়ের সন্ধানে : নির্মল হালদারের 'গরাম থান'—প্রণবকুমার মাহাতো ২২১
বাংলা কাব্যে 'কর্ণ' চরিত্র : বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ—স্বপ্নীল সরকার ২৩২
লোককবি ভবতোষ শতপথীর জীবন-দর্শন ও কাব্য-যাপন—ড. মহঃ খুর্শিদ আলম ২৪১

শংকর : জনপ্রিয় অথচ অনালোচিত ঔপন্যাসিক —উজ্জ্বল মণ্ডল ২৪৭
নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় জীবন : রবীন্দ্রনাথের গোরা—কনিকা সরকার ২৫৩
সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' ও অস্তিত্ব ভাবনা—পান্নালাল কর্মকার ২৫৯
আলকাপের ধূসর গোধূলি : মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাস—প্রকাশচন্দ্র মন্ডল ২৬৫
'এখনই'র টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত যুবসমাজ : রমাপদ চৌধুরীর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে 'যে
যেখানে দাঁড়িয়ে'— শুভঙ্কর ভট্টাচার্য ২৭২
মৃত্যুর রূপ ও স্বরূপ এবং বিমল করের উপন্যাস—শুভাশিস দাস ২৮২
কবিতা সিংহের 'নায়িকা-প্রতিনায়িকা' এবং অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কাস্তে' উপন্যাসে নারী স্বাতন্ত্র্যের
ভিন্ন স্বর—মিঠু রায় ২৮৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যবহ্নি'ও বুদ্ধদেব গুহ-র 'লবঙ্গীর জঙ্গলে' উপন্যাসে অরণ্য
চেতনার বৈচিত্র্যময় রূপ—শুভেন্দু রায় ২৯৫
বিমল মিত্রের 'ভগবান কাঁদছে' উপন্যাসে শিক্ষা, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের বিবর্তন
—প্রশান্ত কুম্ভকার ৩০২
নবাঙ্কুর : লেখিকার আত্ম-অন্বেষণের শিল্পরূপ—ড. মানস আচার্য ৩০৮
'দশমী দিবসে' : বিসর্জনের কথা ও কাহিনি—শ্রাবন্তী মজুমদার ৩১৪
অবহেলিতের শিল্পসাধনা : সৈকত রক্ষিতের 'মদনভেরি' উপন্যাস
—জয়ন্তকুমার মণ্ডল ৩২১
'সীতায়ন' উপন্যাসে নারী : পরিসর ও চরিত্র পর্যালোচনা—ত্রিসপ্ত প্রদীপ ৩২৮
নলিনী বেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' : অন্ত্যজ মানুষের অকৃত্রিম জীবনগাঁথা
—লুৎফান নেছা ৩০৫
নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দেবে অধিকার : বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী
—ড. শাশ্বতী সিন্হাবাবু ৩৪২

ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস : আদিবাসী জীবনবোধের অনন্য প্রকাশ
—ড. অনুপকুমার মাজি ৩৪৭
স্বাধীনতা-উত্তর সময়কালের প্রেক্ষিতে সুমথনাথ ঘোষের 'পরপূর্বা' উপন্যাসে বিষয় ও বৈচিত্র্য
—পিন্টু দাস মোদক ৩৫৫
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে মানুষের জীবনের সংকট ও অস্তিবাদী দর্শন
—বিভাস বিশ্বাস ৩৬১

সময়ের দাবি পূরণে নাটক, প্রসঙ্গ : নীলদর্পণ ও জমীদার দর্পণ—মো. তানবীর হাসান ৩৬৮
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর' ও নটরাজ শিশিরকুমার —বিবেকানন্দ পাল ৩৮৪
জতুগৃহ : বহু কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যিক রূপান্তর—রচনা রায় ৩৯০
অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' : মধ্যবিত্তের সংকট ও উত্তরণ
—আনোয়ারে মুর্শিদ ৩৯৮
সৃজনকর্মে সমকালীন ভাবনা এবং শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যনির্মাণ
—ড. শর্মিলা ঘোষ ৪০৪
'নলিনী'র নামভূমিকা থেকে 'মায়ার খেলা'র প্রমদা : 'মর্মে যে ক্রন্দন তন্বী'
—প্রীতম চক্রবর্তী ৪১০
অন্ধকারের নাটক 'রাজা অয়দিপাউস' এবং শম্ভু মিত্র : একটি পর্যালোচনা
—শ্রী সত্যজিৎ বসাক ৪১৮
সন্মার্গ সপর্যা : শম্ভু মিত্রের নাট্য-দর্শন—তিথি ঘোষ ৪২৪
সৃষ্টির মনের কথা : শম্ভু মিত্রের 'কিছু স্মরণীয় অভিনয়'—লিপিকা সরকার ৪৩১
ব্রাত্য বসুর 'রুদ্ধসঙ্গীত' নাটকে সমকালীন সমাজ : একটি সমীক্ষা—গোলকপতি ধল ৪৩৭
ব্রাত্য বসুর 'উইংকেল টুইংকেল' এক সমকালীন রাজনৈতিক অভিজ্ঞান —তাপস চক্রবর্তী ৪৪১

বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত ছড়ার পাঠান্তর : একটি সমীক্ষা— ড. বিশ্বজিৎ পাত্র ৪৫০
প্রবাহমান সাহিত্য ধারায় জনজাতির উপস্থিতি—ড. মৌসুমী ব্যানার্জী ৪৫৮
মানভূমের বাংলার সাহিত্য আন্দোলন এবং ঝুমুর প্রসঙ্গ—ড. দয়াময় রায় ৪৬৫
ভাদু গান : দার্শনিকতার প্রেক্ষিতে—উপানন্দ ধবল ৪৭৪
রাঢ় বাংলার গাঁ জনের পরব — 'গাজন'—তৃষ্ণা ধবল ৪৮৩
লুপ্ত লুপ্তপ্রায় 'ধাইমা'—দশরথ রজক ৪৮৯
মতুয়া ধর্মসাহিত্য : মতুয়া আন্দোলনের প্রতিবিম্বিত রূপ—সঙ্গীতা ব্যানার্জী ৪৯৫
মানভূম সংস্কৃতির মুখপত্র ছত্রাক : নানান প্রসঙ্গ—সুরঞ্জন রজক ৫০০
হংসেশ্বরী মন্দির পরিকল্পনার অন্তরালে সাধন তত্ত্বের ইঙ্গিত—বেবী পাত্র (সামন্ত) ৫০৯
বাংলার লোকায়ত জীবন ও ময়মনসিংহ গীতিকা—পরাশর গঙ্গোপাধ্যায় ৫১৫



বাঁকুড়া জেলার কিংবদন্তি : সমীক্ষা ভিত্তিক পর্যালোচনা—সোনাই চ্যাটার্জী ৫২৬

'শুকতারা'র কবিতা ও ছড়ায় বাংলার বারো মাস : প্রসঙ্গ ফুল্লরার বারোমাস্যা
—শুভঙ্কর ঘোড়ুই ৫৩২
শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিবর্তনের ধারায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর রচনা
—বিদিশা সরকার ৫৩৯

সত্যজিৎ-সাহিত্যে লিঙ্গ রাজনীতি : তত্ত্ব, বিতর্ক ও সুলুকসন্ধান—অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৪৭
ভাষার আশ্চর্য ব্যবহার : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য—অনির্বাণ মান্না ৫৫৩
ভাষা শিক্ষায় বানানের গুরুত্ব : প্রেক্ষিত বাংলা ভাষা—ড. মৃদুল ঘোষ ৫৬০

বঙ্গদর্শন পত্রিকা ও বঙ্কিমের বিজ্ঞান সাধনা—স্বরূপ দে ৫৬৯
বিশ শতকের প্রেক্ষিতে ভারত-শিল্পচর্চার অভিমুখ ও প্রবাসী পত্রিকা—দেবজ্যোতি মণ্ডল ৫৭৮
বাংলাদেশে পত্র পত্রিকার পরিচয় ও সবুজ পত্র—রানা ভট্টাচার্য ৫৮৫
'বঙ্গদর্শন'-এ রবীন্দ্ররচনা—স্বরূপ দত্ত ৫৯৫
জীবনপথিক প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ—ড. চিরঞ্জীব মুখার্জী ৬০৪
প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম : একটি পর্যালোচনা—কারিমুল চৌধুরী ৬১২
বিশ শতকের দাদা চরিত্র ও বাঙালি কিশোরের স্বপ্নপূরণ—ড. মৌমিতা সরকার ৬১৬
'প্রাচীন সাহিত্য'-এ শকুন্তলা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সঞ্চিতা সাঁতরা ৬২৩

সাহিত্যের আড্ডা : আড্ডার সাহিত্য —সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৯

AMITAV GHOSH : ISSUES OF CULTURAL IDENTITY FROM POSTCOLONIAL PERSPECTIVE —Rana Gorai ৬৩৭
JHUMUR : CORONA AND THE MARGINAL PEOPLE—Sandip Tikait ৬৪৩

## চিন্তন-সূত্রে

"সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ। / সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরই আন্তরিকতাতে/ আমাদেরই সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা খুঁজে আনা।"—এভাবেই জীবন চলে। যারা আজ মূঢ় রাষ্ট্রের বিলাপে, কুরাষ্ট্রের মূঢ়তায় তারাই ক্লান্ত সমাজের ভিড়ে আলো মেখে থাকে সিংহাসনে, তারি চারপাশে। রক্তাক্ত নদীর কলকল্লোলে ভেসে যায় মলিন মুখ; হা হা উল্লাসে ঘুমায় রাজা— মুসোলিনি— হিটলার, আরো কত যে প্রমেয় নয় সেসব ইতিহাস। তবুও কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় "হেলমেট সাজানো আছে", "অবিক্রয় শিরস্ত্রাণগুলি"। কখনোবা আর্তস্বরে রণিত হয় সঘোষ প্রতিবাদ— "আর ক'হাজার মানুষ মারা গেলে এরা আমাদের কান্নার আদল ঠাহর করতে পারবে?"

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেও বাঁচা-মরার অগ্রন্থিত প্রশ্ন ফুটে থাকবে গাছে গাছে রডোড্রেনের মতো। ষড়যন্ত্রের স্বরলিপি নিয়ে গান গায় শাসকের বদলি নেতা, ঠিক সময়ে ঠিক পুস্তক লিখে রাজসভাকবিরা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। সেই প্রাচীন যুগ থেকে প্রসাধনীকাল—সব যুগেই এই দ্বেষ ছড়িয়ে থাকে বারুদের মতো, ঝোপের মধ্যে কোদাল চালালেই ভয়ংকর বিস্ফোরণে মৃত্যু ঘটে আবার কৃষকের।

হাজার হাজার বছর পার হয়ে হয়তো-বা আরো আগে একইভাবে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে যতিহীন জীবনে, শাসক— শাসিত ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রমপরিণতির পথে ধাবিত হয়, হচ্ছে। 'গণনাহীন ধূসর দেয়ালে' আঁকা হয় মুক্তির সংগ্রাম, প্রবাহমান সাহিত্যচর্চায় সারস্বতসাধক রচনা করেন মানুষের ভালবাসার পদাবলী। এই চিরন্তন প্রবোধ বোধের আলোয় স্নাত হয়ে প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজে মানুষ। "আর মৃত্যু হলে শব সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়"। এসবের উর্দ্ধে উঠে মানুষ কেবলই মুক্তিপিয়াসী— শিল্পে, সৃষ্টিতে, সৃজনের তৃষাজলে; মনোরম মূর্তি গড়ে "বাস্তুহারাদের আর কিছু না থাক, আতিথেয়তা বলে একটা ব্যাপার আছে"।

মানুষের কাছে মানুষের এই দাবি আজও হিমালয় ছুঁয়ে যায় বলেই সারস্বতচর্চা অক্ষয়-অমর। এবারের সংকলন বুদ্ধিবৃত্তিদের ফিরে দেখায় সেই অতীত কাল থেকে বর্তমানের দহনকাল। শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজের অনন্ত উদ্যোগে এ সংখ্যা বড় কলেবরে এক উত্তুঙ্গ প্রতিমা হয়ে উঠেছে। সকলকে, সহ-সম্পাদকগণের অক্লান্ত আয়াসকে কুর্নিশ জানাই।

ড. জয়গোপাল মণ্ডল
৪ মার্চ ২০২৩



'তুমি বলছ
দেশের সামনে বিরাট বিপদ
আমিও দেখছি তাই
আপনি হুজুর হঠাৎ হঠাৎ
অ্যাহ! পেয়েছি
হামলে পড়ে
মটকে ধরেন লিকলিকে এই ঘাড়
আমরা বলছি ঢের হয়েছে
ছাড়রে এবার ছাড়'-

আমরা তো এমন অনেক কিছুই বলি। কিন্তু রাজা কী বলেন সেটিই আসল কথা! ছাড়া কি অত সহজে পাওয়া যায় রে ভাই! হাজারো বাধ্যতা আর বশ্যতার মাঝে বেঁচে আছি ভাবলে কেমন আশ্চর্য লাগে! রীতিমতো শিহরণ জাগে! হু-এর নির্দেশিকাকে নমস্কার ঠুকে হরেক ভাইরাসকে আলিঙ্গন করেও আমরা দিব্যি বেঁচে থাকি। শিরায় শিরায়,প্রবাহিত রক্তস্রোতে, স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হদিশ পাইনা বেঁচে থাকার শর্তগুলির, তবু চিমটি কাটলেই বুঝি এই তো বেঁচে আছি! ব্যাস! অমনি সমঝোতা করে ঘাপটি মেরে গিয়ে দাঁড়াই এস্কেলেটরের গোড়ায় চটজলদি সাফল্যের শিরটঙে পৌঁছে যাওয়ার লোভে। তারপর তেড়ি কেটে নৈবেদ্যের নাড়ুটি সেজে অবশিষ্ট জীবনে উপভোগের হদ্দমুদ্দ! আদর্শটাদর্শ চুলোয় যাক, এক জীবনে আমরা যাপনটিকে যেনতেন ভাবে পরিপাটি করে তুলতে চাই। আর ঘাড় ঘোরালেই পানের পিকের মতো যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখি "বিশ্বাস"......

আচ্ছা এ কি শুধু আজকের কাহিনি!! এ অভিজ্ঞতার কি কোন পূর্বসূত্র নেই? আছে। ইতিহাসের পাতায় আর তারও চেয়ে সত্যি ইতিহাস লেখা হয়ে আছে সাহিত্যের খাতায়। সুতরাং সাধ হলো নিজেদের খুঁজে পেতে একবার সাহিত্যের সামনে দাঁড়াই। বাঙালি হয়ে, বাঙালির হয়ে প্রবহমান বাংলা সাহিত্যের আয়নায় একবার দেখে নিই নিজেদের।

ঠিক এই সময়ে কাউকে বন্ধুর মতো পাশে পাওয়া তো কম সৌভাগ্য নয়! যেভাবেই বাঁচি না কেন, বাঁচি বলেই তো স্বপ্ন দেখি আজও। স্বপ্ন দেখেছিলাম এই সময়ে দাঁড়িয়ে শুনে নেব "সৃষ্টির মনের কথা"। বহমান বাংলা সাহিত্যের পাশে দাঁড়িয়ে অনুভব করব নিজেদের! একা নয়, দু'একজনে নয়, অনেকে। স্বপ্ন দেখাতেই সাড়া দিলেন বন্ধুরা। আবার বন্ধু হয়েই পাশে এলেন "সাহিত্য অঙ্গন" পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী। ব্যাস! আমরা নিজেদের মুখোমুখি বসার সুযোগ পেলাম।

সুতরাং ধন্যবাদ তো জানাতেই হয়। "সাহিত্য অঙ্গন" পত্রিকার সম্মাননীয় সম্পাদক, সম্পাদকমন্ডলী,উপদেষ্টা পরিষদের প্রত্যেককে,শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ পরিবারের প্রতিটি সভ্যকে এবং যাঁদের অনুভবে ভরে উঠল এই সংখ্যার এতগুলি পাতা... সকলের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আসুন নিজেদের খুঁজে নিতে অবগাহন করি এই "সাহিত্য অঙ্গন"-এ।

ড. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
(শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজর পক্ষে)

## গল্প-কথা
### গণেশ বসু

ঠাকুরমাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি, ছবিতে পেয়েছি ঠাকুরদাদার সঙ্গে। চাঁদসি, আমার পিতৃভূমি, ছিলো আমার কাছে পিতামহ-পিতামহীশূন্য।

দাদু-দিদিমাকে পেয়েছি দেহেরগতিতে, মামাবাড়ি গেলে। সেখানেই দিদিমাকে ঠাকুরমা বলতাম মামাতো ভাইবোনদের মতো। সে-সব তখন নিছক স্মৃতি, মায়াবী আর্তি। সকালবেলায় প্রাতঃরাশ হ'তো ভাতে। মেজো মামিমা আমাদের খাইয়ে দিতেন। বিরাট একখানা বগিথালা ঘিরে গোল হ'য়ে বসতাম আমরা কজন মামাতো-পিসতুতো ভাইয়েরা। মেজো মামিমা গল্প ব'লে ব'লে নিজের হাতে আমাদের মুখে একে ঠেসে দিতেন ঘি দিয়ে মাখা ডালভাত। হারানো শৈশবের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা ঘটেছে মায়ের কাছে, রাতে তাঁর পাশে শুয়ে বিছানায়। সত্যি মিথ্যে যাচাই করার ক্ষমতা তখন ছিল না। বানিয়ে বানিয়ে অক্লেশে বলে যেতেন গল্প। কৌতূহল ছিলো সে-সব শোনার, সাহস ছিলো স্যাঁতসেঁতে।

তবে, ছেলেবেলায় সবচেয়ে বেশি গল্প শুনেছি দিদিমার কাছে। তাঁর কোল ঘেঁসে শুয়ে রাত কাটানো ছিলো অনন্য অভিজ্ঞতা। শোনাতেন তিনি রাক্ষসখোক্কস-দত্যিদানো-ভূতরি থেকে রামায়ণ-মহাভারত, জাতক, পঞ্চতন্ত্রের কাহিনি। আরব্য রজনীর গল্পে চোখের ঘুম কেড়ে নিতো। এখনো অনুভব করি তার মায়াবী আকর্ষণ। তাল-বেতাল, কথাসরিৎসাগর, জিশুর কথামৃত, থেকে দেশবিদেশের রূপকথা, লোককথা, নীতিবোধের কাহিনি—কোনো কিছুই বাদ দিতেন না দিদিমা। তিনিই শুনিয়েছিলেন যে, এক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে বসে গল্পোকইয়েরা বাণিজ্যিক কাফিলাদের ক্লান্তি অপনোদনে মশলাদার সওদাগরি কাহিনি শোনাতো।

আরো অনেকরকম গল্প শুনেছি যৌবনের, প্রাহ্নবেলায় গোপেন চক্রবর্তী, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শৈলেন বসু, মানিক সেন, মনোরঞ্জন সূর, গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেনানবীশ, হিরণ সান্যালদের কাছে। ইলা মিত্রের উপর সীমাহীন বর্বরতার কাহিনি শুনেছি রমেনদার মুখে। কমিউনের নানান অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুনতে, অবশ্য ধর্মঘটের গল্প শুনতে শুনতে যেমন এক সময় স্বপ্নের বিস্তার ঘটে, সংগ্রামের জেদ বাড়ে তেমনি জাক্সেন হাউমেনে ঘুরতে ঘুরতে মাদাম সোনিয়া ব্রী যখন গল্প বলার ঢঙে নাৎসিদের নৃশংসতার ছবি চোখের সামনে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তখন ক্রোধে-ঘৃণায়-প্রতিহিংসার বাসনায় নিজেকে কি সামলাতে পেরেছি?

গল্পের টান ছিলো, বড়ো টান। আজো, জীবনের একেবারে প্রান্তসীমায় পৌঁছেও সেই আকর্ষণ ঘুচল না। হয়তো আর শেষও হবে না, থেকেই যাবে আমৃত্যু।

মানুষের স্বাভাবিক ভাষাব্যবস্থার শরিক হ'লো শব্দ। প্রথম ধাপে ধাপে আয়ত্ত করে





সম্ভবত শীৎকার ধ্বনিতে। ধাপে ধাপে রপ্ত হয় কথন। দেখতে দেখতে তাতে জোটে পরিকল্পনা। হয়ে ওঠে একধরনের ব্যবস্থা। তার অধীনে সঞ্চারিত হ'লো নিরাকার সামর্থ্য। মুখের ভাষাই একরকম বাহন হয়ে গেল ভাবের আদান-প্রদানের। নিজের অভিজ্ঞতা, অন্যের কাছে শোনা অভিজ্ঞতা, চারদিকের পরিবেশ, অবস্থা বলতে গিয়ে খানিকটা কল্পনার মিশেল ঘটে যায়। কখনো আবার সেটা একটু বেশি মাত্রায় বানানোও হয়ে যায়। তবু, ফুটে ওঠে তাতে ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জনজাতির নির্বাচন থেকে মুক্তির বাসনা, বাস্তব ও কল্পনার মিলমিশ। অনায়াসে এসে যায় বিযুক্তি-সংযুক্তির চলাচল, মানুষে মানুষে সম্পর্কের বন্ধন, নিজের সঙ্গে নিজেরও কথনক্রিয়া।

হয়তো সময়টা ছিলো আহরণের কাল, শিকারের যুগ। যৌথতার আবহেই ব্যক্তির বাসনা ও ভাববিনিময়ের তাগিদেই সেদিন হয়তোবা এসেছিলো চিত্র, এক ধরনের সংকট-মোচনের প্রথম প্রয়াস। তার পরে সম্ভবত এসেছিলো নাচ, গান, কবিতা, গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। চিত্রের মধ্যেও নিহিত ছিলো কোনো-না-কোনো সংবাদ, গল্পের আভাস। নাচ, গান, পদ্য—সব কিছুর ভিতরেই খুঁজলে মিলবে গল্পের হালকা ছোঁয়া।

একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বেদের অনেকগুলি সংবাদসূক্তে মিলতে পারে সংলাপের আদলে নাটকীয় ভঙ্গিতে কাহিনির ইশারা। নাচ, গান, আবৃত্তির মধ্যেও যে তা একেবারে দুর্লক্ষ্য, সেটা বলা যায় না। এ ব্যাপারে মনে আসে ইন্দ্র-মরুত, ইন্দ্র-বরুণ, বিশ্বামিত্র-নদী, সরমা-পণি, ইন্দ্র-বসুক্র, ইন্দ্র-অদিতি-বামদেব, যম-যমী, পুরুরবা-উর্বশীর সূক্তগুলি। বাস্তোস্পতির জন্মকাহিনি, দীর্ঘতমার অন্ধত্বমোচন, কথা তো এক হিসাবে গল্পেরই নামান্তর। গল্প-গল্পোপম এ-সব সূক্তোয় বড়ো হ'য়ে ওঠে কখনো বিপর্যয়-অসহায়তা থেকে মানুষের মুক্তির অভিলাষ, কোনো কোনোটিতে দেহজ প্রেমের উত্তালতা, আবার আরোপিত নৈতিকতার ঘেরাটোপে সংযত আচরণের আকাঙ্ক্ষায় গোষ্ঠীগত বিরোধের রূপায়ণ, তবে সূক্তগুলি ছিলো বাহুল্যবর্জিত, মেদবিহীন।

এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে গল্পকে ঘিরে একালে নানান অভিধাই আরোপিত। আয়তনকে মাথায় রেখে অনেকেই উপন্যাস, উপন্যাসিকা, বড়ো গল্প, ছোটোগল্প, অণুগল্প বলে দাগিয়ে দেন কথাশিল্পকে। পাশাপাশি অনেকেই আবার ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে গল্পের পূর্বপুরুষকে স্মরণ করিয়ে বুফের মতো সাজিয়ে দেন পরিচিতির বহর। মিথ-কে রাখেন এঁরা পুরোভাগে, সবার আগে। এসে পড়ে পুরাণকথা, রূপকথা, নীতিগল্প, বানানো কাহিনি, অলৌকিক গল্প, চুটকি বা কিসসা, গীতিকা, গাঁজাখুরি গল্পো, নকশা, কাহিনি, রুশি স্কাজ্ প্রভৃতি। ইতিহাসের সাক্ষ্যে, ইংরেজির short story বাংলায় হয়ে যায় রবীন্দ্র-কথনে, ছোটোগল্প। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ফরাসি conte এবং nouvele, স্প্যানিশ novela, ইতালীয় novella, জার্মানি novelle ও Kurzgeschichte-এর আত্মীয়তা।

বড়ো গল্পের আয়তন অনুমান করা যায় উপন্যাসের থেকে কৃশাঙ্গ, উপন্যাসিকা থেকেও

কিছুটা মেদ ঝরানো। কিন্তু ছোটোগল্পের আয়তন কীরকম হবে এ নিয়ে মতান্তরের অবকাশ আগেও ছিলো, এখনো আছে। রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পের শব্দসংখ্যা যেখানে কমবেশি ৪, ৩৮৬টি সেখানে বনফুল-এর 'রূপকথা'-র শব্দ সংখ্যা ১২০, 'রাত দুপুরে'-র ১৩১, 'খেঁদি'-র ১৪৭টি। অণুগল্প-এর শব্দ সংখ্যা তো আরো কম। মাত্রাতিরিক্ত স্লিম, যাকে বলা যায় চোখে পড়ার মতো কৃশকায় বা ছিপছিপে। একইভাবে দেখি ডেভিড হার্বার্ট লরেন্সের 'দ্য ফক্স' (১৯২৩)-এর শব্দসংখ্যা যেখানে তিরিশ হাজারের মতো, সেখানে হাইনরিখ ফন ক্লাইস্টের 'বেত্তেলভাইব ফন লোকোর্ণো' (১৮১০) নামের ভূতের গল্পটির শব্দসংখ্যা মাত্র আটশো। সমারসেট মম তাঁর 'সমগ্র ছোটো গল্প'-র ভূমিকায় মন্তব্য করেন 'the shortest item runs to about 1600 words and the longest to about 20,000 words.' বেশির ভাগ ছোটোগল্পই আয়তনে এই দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থিত।

পুনশ্চ ইতিহাসের স্মরণ নিলে দেখবো, বাইবেলের আদম ও ইভের বড়ো ছেলে কেইন ও আবেল-এর পাশাপাশি প্রডিগাল পুত্র, রুথ, জুডিথ, সুজান্নার কাহিনিগুলোকে ছোটোগল্পের প্রাথমিক আওতায় আনা যায় না? অবশ্যই যায় বলে মনে করি। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে পদ্যে রচিত প্রাচীন বীরগাথায় গল্পের মেজাজ, সেকেলে উপন্যাসের আলতো স্বাদ পাওয়া যায়। জেফ্রি চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেলস' যদিও কাব্য তবুও সেখানে অনেকগুলি গল্পই পরিবেশিত। জোভান্নি বোক্কাচোর 'দে কামেরন' (১৩৪৮-৫৩) সংকলনে রয়েছে দশ জনের বলা একশোটি গল্প। একইরকম হ'লো ফরাসি কবি, নাট্যকার, গল্পকার মার্গারিৎ নাভার-এর হেপাতামের্ঁ। ফরাসি কবি ও উপকথার কথক জ্যাঁ দ্য লা ফঁতেন-এর Amours de Psyche stde Cupidon' (১৬৬৯)-এ ধরা পড়ে ছোটোগল্পের বিশেষ অঙ্গিক, যাকে বলা হয় 'conte'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় রূপকথার লেখক ও প্রবন্ধশিল্পী শার্ল পেরো-র Contes de ma mere I'Oye (১৬৯৭)-র কথা। ১৭৭২-এর গোড়ার দিকে ফরাসি মহাকোষকার দ্যনি দিদরো লেখেন Ceci n'est pas un conte (প্রকাশকাল ১৭৮৪)।

এক হিসাবে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটেনে শুরু ছোটোগল্পের প্রতিষ্ঠা। ঘটলো উন্নয়নও। খানিকটা হলেও এর পিছনে প্রভাব বিস্তার করে গল্প শোনা নিয়ে প্রাচ্যের জনপ্রিয়তা। অবশ্যই এর সঙ্গে ছিলো গথিক উপন্যাস/কাহিনির জনমোহিনী আকর্ষণ পাশাপাশি সাহিত্যে রইলো নতুন হাওয়া। এলো 'লিটারেচর অব টেরর'। ভূতের গল্প, আতঙ্ক ছড়ানো কাহিনি ও সন্ত্রাস সঞ্চারী আখ্যানের ঢল নামে। আঠারো শতকের শেষ দিক পর্যন্ত এ ধরনের রচনার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্কটিশ উপন্যাসিক টোকাইয়াস স্মলেট-এর ফার্দিনান্দ কাউন্ট ফ্যাদস্ই মনে হয় হরর উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা। গল্পকার-ও। সন্ত্রাস ও নৃশংসতার প্রতি সুপ্ত আগ্রহ বাড়িয়ে দেন ইংরেজ লেখক হোরেস ওয়ালপোল। তাঁর 'দ্য





ক্যাস্‌ল্ অব ওটরান্টো উপন্যাস বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে অগণন আতঙ্ক সঞ্চারী গল্প পাঠকদের চাহিদা মেটাতে থাকে। আবার আঠারো শতকেরই একেবারে, অন্তিম লগ্নে জার্মান Novella সাহিত্যের সংরূপ হিসাবে যেমন প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে তেমনি উনিশ শতকের শেষ লগ্নে খুলে গেল ছোটোগল্পের স্বর্ণদ্বার। বিভীষিকা সৃষ্টিকারী আখ্যানের ছায়ায় ছোটোগল্প অনেকটাই দখল নিয়ে নেয় পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা। এই সময় যে দুজনের লেখার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে 'সাহিত্যে তাঁরা হলেন জার্মান গল্পকার অ্যর্নস্ট টেরডর হফ্‌ম্যান এবং হাইনরিখ ফন ক্লাইস্ট। পাশাপাশি ছিলেন আরো একজন গুরুত্বপূর্ণ সারস্বত ব্যক্তিত্ব। তিনি হলেন স্কটিশ কবি-কথাকার স্যার ওয়ালার স্কট। বিস্মৃত হওয়া যায় না আমেরিকান লেখক ওয়াশিংটন আরভিং এবং ন্যাথানিয়েল হথর্ন স্কটের অবদানও। ভৌতিক গল্পের ক্ষেত্রে দুজনেরই অবদান অবিস্মরণীয়। আরভিং অনবদ্য মূলত জার্মান লোককথার উপযোগিকরণের চমৎকারিত্বে (যেমন রিপভ্যান উইংকিল এর দ্য লেজেণ্ডাস অব স্লিপি)। উপরন্তু, তাঁর 'স্কেচবুক'-এর কাহিনিগুলোর, রম্যতা তাঁকে করে তোলে পাঠকদের চোখের মণি। হথর্ন-এর ছোটোগল্প সংকলন Twice-Told tales, Mosses form an old Manse, The Snow-Image and Other Twice-Told tales উল্লেখ্য।

আধুনিক ছোটোগল্পের উদ্ভাবক হিসাবে দীর্ঘকাল ধরেই বরণীয় হয়ে আছেন এডগার অ্যালান পো। নিশ্চিতভাবেই গোয়েন্দাগল্পে (যেমন The Murder in the Rue Morgue) তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য, যদিও তিনি এ ধরনের রচনার প্রথম শিল্পী নন। কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী সৃজনেও তিনি হাত পাকিয়েছিলেন গোড়ার দিকে (যেমন গোল্ড বাগ)। একথাও ঠিক যে জার্মান রোমান্তক এবং গথিকগল্পের প্রভাব তিনি কখনো এড়াতে পারেননি। সমসময়ের শুধু নয় উত্তরকালের গল্পকারদের মধ্যে তাঁর প্রভাব পড়েছিলো নিঃসংশয়ে। পো-র অনবদ্য সৃষ্টিসম্ভারে আছে 'Tales of the Grotes que and Arabesque', 'The Murders in the Rue Morgue', 'The Gold Bug", 'The Fall of the House of Usher,' 'A Descent into the Maelsbom', 'The Masque of the Red Death', 'The Mystery of Marie Roget', 'The Cask of Amontillado' প্রভৃতি।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মান Novella -র জনপ্রিয়তা অনেক লেখককেই আখ্যানধর্মী রচনানির্মাণে উৎসাহ জোগায়। সঙ্গে সঙ্গে লোকগাথা-কথা-পুরাণের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় তুরন্তগতিতে। অন্তত দুটি বিখ্যাত সংকলনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। Des knaben Wunderhorn' হ'লো লোকসংগীতের ঝাঁপি। এটির সংগ্রাহক হলেন অ্যখিম ফন অ্যর্নিম এবং ক্লিমেনস ব্রেন্‌তানো। দ্বিতীয়টি 'Kinder-und Hausmarchen' -এর সংগ্রাহক হলেন গ্রিস ভাইয়েরা। বস্তুনিষ্ঠ গল্প সৃজনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন স্টিফটার কেলার এবং স্টর্ম।

বাস্তবানুগ গল্পের উৎকর্ষ ঘটে রাশিয়ায়। এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রবাদপ্রতিম কবি, নাট্যকার, কথাশিল্পী আলেকসান্দ্র্ সের্গেইয়েভিচ পুশকিনের কথা। তাঁর লেখা 'বেলকিনের কাহিনি', 'স্পেডের রানি', 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে', শৈল্পিক সুষমায় কালোত্তীর্ণ। সমকালীন নিকোলাই গোগোলের গল্পে মেলে রোজকার জিনিসপত্র, ঘটনাবলি এবং সাধারণ মানুষজনের কথা। ব্রাত্যজনের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা রুশ পাঠকদের চিত্ত জয় করে নেয়। ইভান সের্গেইয়েভিচ্ তুর্গেনেফ্ একবার মন্তব্য করেন 'আমরা সকলেরই গোগোলের ওভারকোটের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছি।' তুর্গেনেফ্ নিজেও লিখেছেন 'প্রথম প্রেম', 'বসন্তের স্রোতোবেগ'-এর মতো অনেকগুলি স্মরণীয় গল্প। লিয়ো তলস্তয়ের (পুরো নাম কাউন্ট লেভ্ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়) মহাকাব্যপ্রতিম 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আনা কারোনিনা'র পাশাপাশি 'হ্যাপি এভার আফটার', 'দ্য কসাকস', 'দ্য ডেথ অব ইভান ইলিচ', 'দ্য ক্রয়েটজার সোনাটা' প্রভৃতি গল্প রুশ সাহিত্যের সেরা সম্ভারের নিদর্শন। আন্তন পাভ্‌লোভিচ্ চেকভের গল্পসংকলন 'মোচনে স্টোরিজ', বেরোয় ১৮৮৬ তে। আর ১৮৮৮তে প্রকাশিত হয় 'আবছা আলোয়'। তাঁর সেরা গল্পের মধ্যে 'একটি বিষণ্ণ গল্প', 'ওয়ার্ড নম্বর ছয়', 'আমার জীবন', 'প্রেমের বিষয়ে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৮২৯-৩১-এ ঘটে ফ্রান্সে ছোটোগল্পের প্রাচুর্য। এই সময়ের মধ্যে ডজনখানেক conte রচনা করেন প্রস্পের মেরিসে, অনরে দ্য বালজাক এবং তেঅফিল গতিয়ে। শিল্পের জন্য শিল্প অর্থাৎ ' I' art pour I'art' মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন গতিয়ে। বালজাকের সেরা রচনা পাওয়া যায় Droll Stories নামে গল্পসংকলনে। মেরিস্কের সৃষ্টির মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় Mosaique, Cobmba, Nouvelles প্রভৃতি। আল্‌ফঁস দোদে-র উজ্জ্বল রচনাসমূহের মধ্যে সংকলিত গল্পগ্রন্থ হ'লো Letters de mon moulin, Tartarin, এবং Les Contes due lundi প্রভৃতি। গুস্তাভ ফ্লবের-এর অবদান Trois Contes বেরিয়েছিলো ১৮৭৭-এ। অন্যান্য গল্পকারদের মধ্যে ছিলেন কঁৎ দ্য আলফ্রেদ ভিক্তর ভিনি, জসেফ্ আর্ত্যুর কঁৎ দ্য গবিনো, আনাতন ফ্রাঁস প্রমুখ। অদ্বিতীয় ফরাসি ভাষার গল্পকারদের মধ্যে সেরা গল্পকার হলেন গি দ্য মপাসাঁ। তিনশোরও বেশি গল্প এবং ছ'টি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর গল্পের প্রধান সংকলনগুলি হচ্ছে La Maison Teller, Modemoiselle Fifi, Contes de la becasre, Les Soeurs, Rondoli, Miss Harrlet, Contes du jour et de la nuit, Toine, Yvette প্রভৃতি। এই সময়ের সেরা গল্পকার হিসেবে এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হ'তো চেখভ এবং মপাসাঁর নাম।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকায় ছোটোগল্পের ভুবনটিকে শাসন করেন যে আটজন শিল্পী তাঁরা হলেন Hermon Melville, Mark Twain, Bnet Harte, Ambrose Bierce, O. Henry, Stephen Crane, Jack Landon এবং



ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VIII, Issue : XVII

Sherwood Anderson. হেনরি জেমস, টমাস হার্ডি, আর্থার কোনান ডায়াল, এইচ. জি. ওয়েলস, ই. এস. ফরস্টার, ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ড (ইনি নিউজিল্যান্ডের কবি ও গল্পকার। তাঁর In A German passion, Prelude, The Garden Party এক সময়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলো) বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

এঁদের পাশাপাশি আরো কয়েকজন ইউরোপীয় গল্পকারদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অভিনব তাঁদের মধ্যে শ্লোভান লেখক Ivan Cankar, চেকভাষী ফ্রাঞ্জ কাফকা অবিস্মরণীয়। কাফকা রচনা করেন আশিটির কাছাকাছি গল্প। দীর্ঘতার বৈচিত্র্যে, শৈলীর অভিনবত্বে, বিষয়ের নতুনত্বে তিনি নিজেই যেন স্বতন্ত্র ভুবন। তাঁর কোনো কোনো গল্প একশোর কাছাকাছি শব্দে শেষ হ'য়ে যায়। উপকথা, রূপকথা, নীতিকথা, নকশাধর্মিতা, প্রতিবেদন, চিঠি, নাটকীয় সংলাপ, প্রবন্ধের ভঙ্গি-সব কিছু মিলে মিশে তাঁর গল্প হয়ে ওঠে পুরোপুরি স্বাতন্ত্র্যদীপিত। 'মেটামরফসিস' (১৯১৫)', 'দ্য জাজমেন্ট (১৯১৩)', 'ইন দ্য পেনাল কলোনি (১৯১৯) হলো বিশ্ব সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা। নানা দেশ নানা ভাষা মেলালে গল্প লেখকের সংখ্যা কম করেও কয়েক হাজার হবে। তার মধ্যে আমরা মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করছি ক্ষমতা বা প্রতিভার তুল্যমূল্য বিচার ও বয়সের কালানুক্রম রক্ষা না করেই। ডি. এইচ. লরেন্স, অলডস্ হাক্স্‌লি, এ. ই. কপ্‌পারড্, হার্টলে, রিচার্ড হিউজেস, এম. আর. জেমস, গ্রাহাম গ্রিন, ভি. এস. প্রিটচেট, এইচ. ই বেটস, ইশাফ ডাইন সেন, সিলভিয়া টাকউনসেন্ড ওয়ার্নার, ডিলান টমাস (কবি হিসেবেই তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি), এলিজাবেথ টেলর, নবোকভ, জসে ক্যারি, নইপাল, সুপাল হিল, কিংসলে অ্যাসিম, ফ্রাঙ্ক, ও কন্নর, উইলিয়ম ট্রেভর, জর্জ ম্যাকওয়ে ব্রাউন, প্যাট্রিক হোয়াইট, উইলিয়ম ফকসার, ক্যাথারিন অ্যান পর্টার, উইলিয়ম সারোয়ান, ড্যামন রানইয়ন, জেমস থারবার, জন থরা, কারসন ম্যাককুলার, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে, বার্ণাড ম্যালাখাড, জন আপডাইক, লিয়োনিড আন্দ্রেয়িয়েভ, ইভান বুমিন, আন্দ্রেই প্লাতোনভ, ইসাক বাবেল, ভেরা ইনবার, সেতোই নিকিভিন, য়ুরি, আয়েসা, কার্লো গাদদা, মারিও সনপাতি, আলবার্তো মোরাভিয়া, ভাস্কো প্রাতোলিনি, নাতানি গিনরবুর্গ, কার্লো কাসোলা, ইতালো কালভিনো, আন্না জেখেরস, লইস রিনজের, হাইনরিখ ব্যোল, ভোলফ্‌গঙ্গ বোরসোর্ট, ইঙ্গবোর্‌গ বাখমান, জিগফ্রিড লেনংস, মার্টিন ভালসার, মার্সল এসে, জাঁ-পল সার্ত্র (অস্তিত্ববাদের অন্যতম প্রবক্তা এই ফরাসি দার্শনিক কবি-নাট্যকার-গল্পকার ১৯৬৪ সালে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।), ডরোথি লি সেয়ার্স, জোজে শারামাগু (পোর্তুগিজ কথাকার, কবি, নাট্যকার। ১৯৯৮-তে নোবেল পুরস্কার পান), চিনুয়া আচেবে (নাইবেরীয় গল্পকার, উপন্যাসিক), কনরণ্ড পটার এইকেন, আল্যেঁফুর্নিয়ে, পেদ্রো আন্তনিয়ো দে আলারফন (স্পেনীয় কথাকার), ইভো আন্দ্রিচ্ (যুগোস্লাভ কথাশিল্পী, ১৯৬১ তে নোবেল পুরস্কার পান), ফের্নান্দো আর্‌রাবাল (স্পেনীয় কথাকার ও নাট্যকার), আনহেল মিগেল আস্তুরিয়াস (গুয়াতেমালার কবি ও

কথাশিল্পী, ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান), রিক্কাদো বাক্কেল্লি (ইতালীয় কথাকারও নাট্যকার), আঁরি বাধ্যুস্, স্যার জেমস ম্যাথিউ ব্যারি (স্কটিশ নাট্যকার ও কথাশিল্পী), এদুার্দো বার্‌রিয়স (চিলির কথাসাহিত্যিক), জর্জো বাস্‌সানি (ইতালীয় গল্পকার ও ঔপন্যাসিক), সিমন্ দ্য বোভোার (ফরাসি কথাশিল্পী, আত্মজীবনীকার। জাঁ-পল সার্ত্র প্রেমিকা), স্যামুলে বেকেট (আইরিশ নাট্যকার, কবি, গল্পলেখক, ১৯৬৯ সালে নোবেল পুরস্কার, পান), মারিয়ো বেনেদত্তি (উরুগুয়ের কথাশিল্পী), বিয়ার্নস্টিয়ার্ন বিয়ার্নসন (নরওয়েজীয় কবি ও কথাশিল্পী। ১৯০৩ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন), রুফিনো ব্লাংকো ফম্বোনা (ভেনেজুলোর কথাশিল্পী), বিসেন্তে ব্লাস্কো ইবানিস্ (স্পেনীয় কথাসাহিত্যিক), ইনিড ব্লাইটন (শিশু-কিশোরদের, উপযোগী গল্পের জনপ্রিয় ইংরেজ লেখিকা), হাইনরিখ ব্যোল (জার্মান কথাশিল্পী, ১৯৭২-এ নোবেল পুরস্কার পান), আদেউশ বরোউস্কি (পোলিশ কথাশিল্পী ও কবি), আঁরি বসকো (ফরাসি কথাশিল্পী), মলি ক্যালাহান (কানাডার গল্পকার, উপন্যাসিক), বারবারা কার্টল্যান্ড (ব্রিটিশ লেখিকা), মিগেল ফেলিবেস (স্পেনীয় কথাশিল্পী), ভ্লাদিমির দিমিত্রিয়েভিচ্ দুদিনৎসেফ্ (রুশ গল্পকার ও উপন্যাসিক), জ্যির্জি কনরাড (হাঙ্গেরীয় কথাশিল্পী), রিলান কুন্দেরা (চেক কথাশিল্পী। ১৯৭৯ সালে ফরাসি নাগরিক হন।), 'অ্যালিস্টেয়রে ম্যাকলেন (স্কটিশ কথাশিল্পী), রিচার্ড রাইট প্রমুখ নানা দেশের নানা ভাষার নামি-দামি অগণন গল্পলেখক কথাশিল্পের ভুবনটিকে করেন, এখনো করে যাচ্ছেন সমৃদ্ধ।

বাংলা ছোটোগল্পে ইন্ধনের কাজ করেছিল হয়তো বিদেশি ছোটোগল্পেরই বর্ণময় সার। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের ছোটোগল্প পড়ে এদেশের শিক্ষিত, সংবেদনশীল পাঠক। যখন স্তব্ধ, মুগ্ধ, অভিভূত সে-সময়ে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, 'শ্রী পুঃ'-তে আত্মগোপনকারী বঙ্কিম অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন প্রথম বাংলা ছোটোগল্প— "মধুমতী"। এর পর-পরই বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪—১৮৮৯) যেমন "দামিনী" লিখে ছোটোগল্পের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১—১৯৪০) বাংলা ছোটোগল্পের ভবিষ্যৎকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তবে বাংলায় "ছোটোগল্প" শব্দটির স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ হলেন বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম যথার্থ রূপকার এবং তাঁর মধ্যেই ঘটে এই শিল্পরূপের "সর্বপ্রথম সার্বিক বিস্ময়কর পূর্ণতা"। বিষয়ের দিক থেকে তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে যেমন গ্রাম-জীবনের ছায়াবিস্তার, দ্বিতীয় পর্যায়ে তেমনি নাগরিক জীবন ও মনস্কতার স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়। নিসর্গের সঙ্গে ব্যক্তি স্বভাবের অভিন্নতা; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রেম-প্রীতি-স্নেহের সম্পর্কের মাধুর্য, জটিলতা, রহস্যময়তা: সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কের টানাপোড়েন, আত্মক্ষয়, দ্বৈরথ; রাজনীতি ও স্বদেশ-ভাবনা; মনস্তত্ত্বের বিচিত্রমুখিতা সব নিয়েই রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের ভুবন। কোথাও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কোথাও কাহিনি ও ঘটনার বিরলতা; কোথাও বুদ্ধির প্রাখর্য, কোথাও সরল-সহজ কাহিনির দাবি;



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

কোথাও বক্তব্যের প্রাধান্য, কোথাও কেবল তার আভাস দেওয়া মাত্র; কোথাও চরিত্রের আলো-অন্ধকার- আততি, কোথাও আততিহীন প্রসন্ন জীবনমুগ্ধতা। এভাবেই প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতির মেলবন্ধনে তাঁর ছোটোগল্প বর্ণময়, চিত্রময়, বাস্তব। সমাজ-সমস্যা থেকে হৃদয়ের সংকট, বাস্তবের নিষ্ঠুরতা থেকে অতিপ্রাকৃতের ভয়াবহতা, ব্যক্তিক সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে মৌনমুক না-বলা বেদনা, প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ থেকে চরিত্রের জটিলতা, খন্ডত্বের বিচিত্রতা—সবই যেন জায়গা করে নিয়েছে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে।

বস্তুত প্রতীতিজাত যে কথাশিল্প কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে আশ্রয় করে ঐক্যসংকটের মধ্য দিয়ে সংহত, তীব্র, একমুখিতায় সমগ্রতা লাভ করে অথচ পাঠশেষে পাঠকের বোধে অতৃপ্তির মধুর ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে সেই গদ্যের গীতিকবিতা হল ছোটোগল্প। তা ফুলের তোড়া নয়, তার একটিমাত্র ফুল; সঙ্গে সমুদ্রদর্শন; চকিত বিদ্যুৎ-ঝলকে অনন্ত আকাশ; চোরা লণ্ঠনের আলো; হাউইয়ের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তেই বোঁ করে মিলিয়ে যায়; হঠাৎ-শুরু ও হঠাৎ-শেষের অনিবার্য ফসল, কিংবা স্রোতস্বতীর বুক থেকে তুলে আনা এক গণ্ডুষ জল। জীবনের ক্ষণবৃত্তে হয়ে ওঠা অনন্ত জীবনের মর্মবিস্তারী গদ্যবাহিত শিল্পপ্রকরণ, চিত্রকল্পপ্রতিম ছোটোগল্প। উইলিয়ম হেনরি হাডসনের ভাষায় যেমন, 'A short story must contain one and only one informing idea and that idea must be worked out to its logical conclusion–and absolute singleness of aim and directness of method তেমনি W. Saroyan বলেন, "The short story is without a doubt the freest form of writing– freer certainly than any of the kinds of poems and perhaps freer than the novel– although this point might be a source of literary controversy."

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প।')

এখনো যে প্রশ্নের সর্বসম্মত সমাধান হয়নি তা হ'লো রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের সংখ্যা কত? কারো হিসেবে ৯৪ তো কারো গণনায় ১১৯। আবার কেউ কেউ মনে করেন ১৪৫ টি ছোটোগল্পের রচয়িতা হলেন কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। এর সঙ্গে যদি আমরা 'সে' গ্রন্থের ৩-সংখ্যক লেখটিকে ২টি গল্প ('রিপোর্ট' ও 'গেছোবাবা'), 'তিন সঙ্গী'র 'রবিবার', 'শেষ কথা' এবং 'ল্যাবরেটরি'র পাশাপাশি 'শেষ কথার' পাঠ্যাংশটিকে স্বতন্ত্র গল্প হিসাবে

মান্যতা দি (না দেবার কোনো যুক্তি নেই), তা হলে হিসাবটা দাঁড়ায় ('গল্পগুচ্ছ'-র ৯০, "গল্পসল্প"-র ১৭, "লিপিকা"র ৩৯, "তিনসঙ্গী"র ৪ এবং "সে"-র ১৫টি নিচে) মোট ১৬৫টি ছোটোগল্প।

নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উৎস থেকে বিভিন্ন বাঁক পেরিয়ে, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ধারাকে আত্মস্থ করা সত্ত্বেও আজও বাংলা ছোটোগল্পের প্রকৃত রূপকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকেই মেনে নিতে হয়, স্রষ্টার-সেই অম্লান মর্যাদা তাঁরই প্রাপ্য। জমিদারি দেখাশোনা উপলক্ষ্যে পূর্ব বাংলায় থাকার সময়েই কবিতার পাশাপাশি একের পর এক তিনি লেখেন ছোটোগল্প। নিসর্গ ও মানুষকে জড়িয়ে-মিশিয়ে তিনি নানা রঙে, নানা স্বরকে যে বিচিত্র পারিপার্শ্বিকতায় গেঁথে তুললেন, নিয়ে এলেন ছোটোগল্পের ভুবনে, প্রথম পর্বের সেইসব রচনা 'পোস্টমাস্টার', 'অতিথি', 'ছুটি', 'মণিহার' ইত্যাদি বাঙালি পাঠকের তৃষ্ণাকে এক অনাস্বাদিত রসে আপ্লুত করে দেয়। 'দেনা-পাওনা', 'কাবুলিওয়ালা', 'অনধিকার প্রবেশ', 'গিন্নি', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সুভা', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদিও সমাজের কোনো কোনো সমস্যাকে তুলে ধরে, মানুষের বোধকে জাগিয়ে চৈতন্যের বিস্তার ঘটিয়ে হয়ে রয়েছে এক একটি মণিখন্ড। পরিবর্তীকালে গল্পের প্রেক্ষাপটে মিলল নাগরিক জটিলতা, মানসিক যন্ত্রণার ধূসর আস্তরণ, এমনকি, নিদ্রাজাগর অস্তিত্ব। 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি' ইত্যাদি গল্প আঙ্গিকের আধুনিকতায়, মিত-কথনে আমাদের ভাবতে শেখায়, মননে-মেধায় ছড়িয়ে দেয় এক অন্য জগৎ। সবশেষে, কবি বিষ্ণু দে-র কথায় বলা যায়,

'রবীন্দ্রনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে এঁকেছেন কবি আমাদের সকলের ছবি।'

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালের অন্যান্য গল্পকারদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং অনন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ স্মরণীয়। বাঙালি জীবনের বৈষম্য ও অসঙ্গতি হাল্কা চালে অথচ প্রসন্ন এবং কৌতুকস্নিগ্ধ ভঙ্গিতে প্রভাতকুমার যেভাবে তাঁর ছোটগল্পে পরিবেশন করেছেন তার প্রতিতুলনা মেলা ভার। এই বিচারে তাঁর 'মাস্টারমশাই', 'বলবান জামাতা', 'আদরিণী', 'রসময়ীর রসিকতা ইত্যাদি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পাশাপাশি অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', 'একাদশী বৈরাগী', 'অভাগীর স্বর্গ সমাজভাবনার তীব্র তীক্ষ্ণ আলোয় সমুজ্জ্বল। ত্রৈলোক্যনাথের 'ভূত ও মানুষ', 'ডমরুচরিত', 'মজার গল্প' ইত্যাদিও উদ্ভট কল্পনায়, ভৌতিক পরিবেশ রচনায় এবং সেই সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের তীক্ষ্ণ অথচ সরস সমালোচনায় অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তবর্তী সময়ে জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয়, অস্থিরতা, আদর্শভঙ্গজনিত হতাশা, উন্মার্গগামিতা — এককথায় যে সামূহিক সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার প্রতিফলন ধরা পড়ে তাদানীন্তন কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ইত্যাদি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছোটগল্পকারদের রচনায়। এঁদের মধ্যে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

কয়লাখনির অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির গল্প', গোকুলচন্দ্র নাগের 'মায়ামুকুব' যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালী' স্মরণীয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অনেকটাই স্বার্থলেশহীন সামাজিক সম্পর্কগুলি তুলে ধরেই মানবপ্রজাতিরই কাহিনিকার। 'মেঘমল্লার', 'নাস্তিক', 'বউচণ্ডীর মাঠ', 'পুঁইমাচা', 'অলসত্র', 'হাসি', 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি', 'যাত্রাবদল', 'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ', 'রামশরণ দারোগার গল্প', 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প,' 'বাটিচচ্চড়ি', 'বিষ্ণু মাস্টার', 'কিন্নরদল', 'মাস্টারমশায়', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'ক্যানভাসার কম্বুলাল 'তালনবমী', 'নসুমামা ও আমি', 'ভূতন বোষ্টমি', 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা', 'সুহাসিনী মাসিমা,' 'রূপো - বাঙাল', 'ব্ল্যাকমার্কেট', 'আচর্য কৃপালনি কলোনি', 'নীলগঞ্জের ভালমন সাহেব', 'হিংয়ের কচুরি,' 'কুশল পাহাড়ী', 'মৌরীফুল', 'বুধীর বাড়ি ফেরা', 'দাদু' ইত্যাদি প্রায় সোয়া দুশোর কাছাকাছি ছোটোগল্প তিনি লিখেছেন এবং সেগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে 'মেঘমল্লার' 'মুখোশ ও মুখশ্রী', 'ছায়াছবি', 'অলৌকিক' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে। প্রত্যক্ষ বাস্তবের অভিনব এক রূপকথা নির্মাতা এই লেখক আমাদের অনেকেরই ভুলে যাওয়া শৈশবকালের বিস্তৃত কিশোরদের ডাক দিয়েছেন, শহরের যান্ত্রিকতার ধূলিমলিন জীবন থেকে 'সব পেয়েছির দেশ'-এ Eldorado-র মণিমুক্তো-ছড়ানো মায়াচ্ছন্ন ভুবনে। তাঁর ছোটোগল্পের উপাদান—নিসর্গপ্রকৃতি আর মানুষ—মানবমানবীর জীবনের সহজ সুখদুঃখ, সরল বাসনাকামনা, পাওয়ার আনন্দ আর হারানোর বেদনা। প্রকৃতির সংসারে যেমন, তেমনি মানবসংসারেও সহজ সৌন্দর্যকে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর মনের গানে প্রকৃতির সোঁদা সোঁদা গন্ধ, অনকে রকম ফুলের ঘ্রাণ, শ্যাওড়ার ঘ্রাণ, কলমিদামের ঘ্রাণ, পুরোনো দিঘির ঘ্রাণ, সরু পথের মাটির ঘ্রাণ—নীলকণ্ঠ পাখি যে-দূরের দেশে উড়ে যায়, সেই দূরের পথিক লেখক-বাউল তিনি। তাঁর 'উপেক্ষিতা' গল্পটি যখন প্রথম বেরোয় 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায়, তখন থেকেই তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে তোলেন বাঙালি পাঠককে। যে-কোনো সামাজিক স্তরনিরপেক্ষ আধা গ্রামীণসমাজে মানুষে-মানুষে যে প্রীতিসাপেক্ষ মানবিক সম্পর্ক তা নিয়েই তিনি লিখেছেন সবচেয়ে 'বেশি। তাই দেখি, খুব গরীব পরিবারের এক বালিকার রসনার তৃপ্তির বাহক 'পুঁইমাচা', ধনী পরিবারের বধু ও গরিব পরিবারের বন্ধু প্রায় একই পরিবেশ রচনা করে মানবিক মৈত্রী 'মৌরীফুলে', এবং 'কিন্নরদলে'র মতো কাহিনিতে পাই পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ মেয়েদের সঙ্গে আত্মগত হওয়া কলকাতার এক সৃষ্টিশীল পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ে ওঠা মানবিক সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরি করে মানবপ্রজাতিই, তা কখনো জাতপাতভিত্তিক হতে পারে না, কেননা জাতপাত তৈরি করে সমাজ- অমলিন সম্পর্কের মরমি ছবিটি পাই যেমন 'রূপো বাঙাল'-এ, তেমনি একটি গ্রামীণ মুসলিম মেয়ে শহরে এসে দেহোপজীবিনী হয়ে দু-মুঠো অন্ন জোটানোর সুযোগ পেয়ে সুখী হয়, আর সেই সুখের ভাগ নিতে আমন্ত্রণ জানায় গ্রামীণ ব্রাহ্মণ যুবককে, অর্থাৎ মানুষকে কীভাবে মিশে

যেতে হয় বিশেষ বিশেষ পরিবেশে তা দেখিয়েছেন ‘হাসি’ গল্পে। নিপীড়ন ও দেবী উপাসনার ভিন্ন চেহারা ধরা পড়ে ‘রুক্মিণীদেবীর খড়্গ’ রচনায়।

বড়ো ছোটো মিলিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের সংখ্যা যেমন দুশোর কাছাকাছি তেমনি আকারে-প্রকারে নানারকম, গড়নে বিস্তারে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। বেশ কিছু গল্প তাঁর পরিকল্পনামাফিক যেন গণিতের quoderat demonstrandum [Q.E.D], বেশ কিছু Tale-এর মতো, অনেক রচনাই জীবনের স্বাভাবিকতাবিস্তৃত, স্বতঃপ্রকাশিত। ধীরস্থির সূচনা, চরিত্রের যথার্থ বিকাশ কখনও কখনও একাধিক ক্লাইম্যাক্সের সৃষ্টি, অবশেষে ব্যঞ্জনাধর্মিতার চেয়ে তাঁর গল্পে কাহিনি পরিণাম প্রধান হয়ে ওঠে। জৈবিক তাড়না ও মানবিক বোধের দ্বৈরথে যেমন জনসমাজের বিভিন্ন স্তর, বিচিত্র ভঙ্গিমা, মানসিক বোধের জাগরণ সহ অনেকানেক অবস্থান ধরা পড়ে তাঁর ‘রসকলি’, ‘অগ্রদানী’, ‘তারিণী মাঝি’, ‘ডাইনী’, ‘দেবতার ব্যাধি’, ‘নারী ও ‘নাগিনী’, ‘বোবা কান্না’, ‘প্রতীক্ষা’, ‘প্রসাদমালা’, ‘হারানো সুর’ ইত্যাদি গল্পে, তেমনি মানুষের স্বভাবের মধ্যে বিচিত্র বৈপরীত্য, অস্বাভাবিকতা, সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, পাশব হিংস্রতার সমান্তরালেই অমলিন সরলতা, বিকৃত বা জান্তব ক্ষুধার পাশাপাশি বিশুদ্ধ আবেগ কিংবা শিল্পীর সৃজনশীল সত্তা এনে এমন এক আপাতবিরোধ শিল্পের বুনোট গড়ে তোলেন ‘তাসের ঘর’, ‘আখড়াইয়ের দিঘি’, ‘কান্না’,‘জটায়ু’, ‘তমসা’ প্রভৃতি রচনায় যার তুলনা বাংলা ছোটোগল্পে প্রায় নেই বললেই চলে। আবার ‘কালাপাহাড়’, ‘নারী ও নাগিনী’, ‘ডগি-অ্যালশেসিয়ান নয়’, ‘চিনু মণ্ডলের কালাচাদ’, ‘গবিন সিংয়ের ঘোড়া’, ‘আফজল খেলোয়াড়ি ও রমজান আলি’, ‘উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড’, ‘সর্বনাশী এলোকেশী’ ইত্যাদি গল্পে তিনি নানা-ধরনের জন্তুর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে মর্মে মর্মে চারিয়ে দেন মানবিক আবেদন---স্নেহ-মায়া-মমতা-ক্রোধ- প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমনকি নিঃসঙ্গতা, অসহায়তাবোধও। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের সূর্যাস্তকালীন ম্লানিমা, যন্ত্রণা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ার পাশাপাশি কীভাবে ধনতন্ত্রের ঔদ্ধত্য, উঠতি ব্যবসায়ীদের অহংকার, বিলাসবৈভব, অমানবিকতা ভিতরে-বাইরে তেড়ে আসছে তার ছবিটিও পাই ‘জলসাঘর’, ‘রায়বাড়ি’, ‘রাজা ও প্রজা’, ‘সমুদ্রমন্থন’, ‘বন্দিনী কমলা’ প্রভৃতি গল্পে। তারাশঙ্কর চিনেছেন জীবনকে, দেখেছেন সমাজকে, আবিষ্কার করেছেন বাংলার যথার্থ ব্রাত্য জনগণকে। আর কোলাজের মতো সেসবই তিনি ধরেছেন তাঁর ছোটোগল্পে, গড়েছেন জীবনের খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত-আবেগ-স্বপ্ন-ক্রোধ-বেদনা-সংগ্রাম-বিচ্যুতি-বৈপরীত্য অসহায়তা নিয়ে গীতিকবিতা -গাথা- খন্ড কবিতা-মহাকাব্য।

নির্ভার, নির্মেদ, নিরাবেগ রচনার মধ্য দিয়ে বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ছোটোগল্পে হয়ে উঠেছিলেন একেবারে একটি প্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে কম শব্দ খরচ করে দু-একটা আঁচড়ে, ছোটো ছোটো রেখার টানে আন্তর্ভেদী আলো ফেলে তিনি যেমন একটা সময়, সমাজ, মানবমনের অলিগলির খোঁজ দিয়েছেন তেমনি তারই ভিতর ঘটিয়েছেন



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

জীবনের উদ্ভাস। গভীর আবেগের উৎসমুখ দিয়েও বনফুল মহাকাব্যিক অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেকে খানিকটা দূরেই সরিয়ে রেখেছিলেন। সযত্নে রচিত এই দূরত্বের অবস্থান থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ বিচারবোধ, সংযম ও বিশ্লেষণী ক্ষমতায় জীবনটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছেন, কৌতুক করেছেন, দরকার মতো ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন, খুলে দিয়েছেন ভণ্ডামির মুখোশ। ‘স্থাবর’, ‘জঙ্গম’, ‘তৃণখণ্ড’, ‘অগ্নি’, ‘সে ও আমি’, ‘দ্বৈরথ’, ‘মৃগয়া’, ‘নির্মোক’, ‘মানদণ্ড’, ‘পঞ্চপর্ব’, ‘স্থাবর’, ‘জঙ্গম’,‘তৃণখণ্ড’, ‘অগ্নি’, ‘সে ও আমি’, ‘রৈরব’, ‘মৃখয়া’, ‘নির্মোক’, ‘মানতে পরপর’, ‘লক্ষ্মীর আগমন’, ‘মানসপুর’, ‘হাটে বাজারে’, ‘অগ্নীশ্বর’, ‘ডানা’ ইত্যাদি উপন্যাসের পাশাপাশি ‘বনফুলের গল্প’ (১৯৩২), ‘বনফুলের আরো গল্প’ (১৯৩৮), ‘বাহুল্য’ (১৯৪৩); ‘বিন্দু বিসর্গ’ (১৯৪৪), ‘অদৃশ্যলোকে’ (১৯৪৬), ‘তন্বী’ (১৯৫২), ‘নবমঞ্জরী’ (১৯৫০), ‘উর্মিমালা’ (১৯৫৫); ‘অনুগামিনী’ (১৯৫৮), ‘দূরবীন’ (১৯৩১) ইত্যাদি গল্পগ্রন্থসহ ছয়শোর কাছাকাছি ছোটোগল্প তিনি লিখেছেন। এর মধ্যে কোনো কোনো লেখা খানিকটা ধর্মী, কোনে কোনোটি যেন গল্পের উপকরণ মাত্র, আমার আসরে বলা চুটকি গল্পের রূপ, অনেক গল্পেই আবার পাঠককে অনুমানের সাহায্যে লাফ দিয়ে শুন্যতা পেরোতে হয়। আকস্মিকতার তীব্রতা, চাবুক- হাঁকড়ানো সমাপ্তি, নৈঃশব্দ্যের বিস্তারও জড়িয়ে থাকে তাঁর ছোটোগল্পের শরীরে, মনে ও মেজাজে, যেমন—“বাড়তি মানুল”, “খেঁকি”, “ট্রেনে”, ‘বুধ্নী’, ‘অলকনন্দা’, ‘পাঠকের মৃত্যু’, ‘স্ত্রী-চরিত্র’, ‘শ্রীপতি সামন্ত’, ‘শরশয্যা’, ‘জাগ্রত দেবতা’, ‘নাথুনির মা’, ‘ছোটলোক’, ‘গণেশ’, ‘কাত্যায়নী’,‘গণেশ-জননী’, ‘অর্জুন মণ্ডল’, ‘শিল্পীর ক্ষোভ’, ‘বিজ্ঞাপন’, ‘স্বাধীনতার জন্ম’, ‘ঘুঁটে’, ‘টোপ’, ‘বন্য মহিষ’, ‘শিল্পী’, ‘চোখ গেল’, ‘ভাটিয়ালি’, ‘বুড়িটা’, ‘অমলা’, ‘খেঁদি’, ‘আত্ম-পর’, ‘সার্থকতা’, ‘ভৈরবী ও পূরবী’, ‘ক্যানভাসার’, ‘কশাই’, ‘পরিবর্তন’, ‘মালিয়া’, ‘কালো’, ‘তাজমহল’ ইত্যাদি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন ছোটোগল্পে সেই বিরল ব্যক্তিত্ব সুদুর্লভ নৈপুণ্যের অধিকারী, নিজেকেই যা নীরবে প্রচ্ছন্ন রাখে। বাংলা ছোটোগল্প তাঁর লেখনীর জাদুতে জীবনের রহস্য, বিস্ময়, বৈচিত্র্যে ও গভীরতার অনাস্বাদিতপূর্ব রসলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর রচনায় দেশ-কাল সমাজ, মানুষের দুঃখ-বেদনা-অসহায়তা-বিকৃতি-বিভ্রান্তি-কদর্য কামনা-হিংসা-ব্যভিচার সন্দেহ-ঈর্ষা অর্থাৎ একালের মানুষের অন্তর-বাহির, সময়ের নানা জটিলতা, সমাজের বৈপরীত্য চোরা ঘূর্ণি সব কিছুই আশ্চর্য সংবেদনশীলতায় ধরা পড়েছে, আর বাংলা ছোটোগল্পকে পৌঁছে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক স্তরে। প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘শুধু’, ‘করানী’ থেকে তিনি বিষয়ের বিস্তারে, বৈচিত্র্যের বিস্ময়করতায় যেমন — ‘পাঁক’, ‘মিছিল’, ‘কুয়াশা’, ‘সূর্য্য কাঁদলে সোনা’ ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেন, তাঁর হাত দিয়েই বের হয় ছোটোগল্পের ‘বেনামী বন্দর’ (১৯৩০), ‘পুতুল ও প্রতিমা’ (১৯৩২), ‘মৃত্তিকা’ (১৯৩২), ‘ধূলিধূসর’ (১৯৪৩), ‘মহানগর’ (১৯৪৩) প্রভৃতি। ‘পুন্নাম’, ‘কুয়াশায়’, ‘হয়তো’, ‘শৃঙ্খল’, ‘ভবিষ্যতের ভার’, ‘সংসার সীমান্তে’, ‘পুনর্মিলন’, ‘সাগর-সংগম’, ‘স্টোভ’, ‘রবিনসন ক্রুশো মেয়ে

ছিলেন', 'ভস্মশেষ', 'অনাবশ্যক', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'মল্লিকা', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'দিবাস্বপ্ন', 'এই দ্বন্দ্ব', 'ভূমিকা','পাশাপাশি', 'পরাভব', 'লজ্জা', 'শুরু ও শেষ', 'একটি রাত্রি', 'যাত্রাপথ', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'লাল', 'তারিখ', 'চুরি', 'জ্বর', 'সহস্রাধিক দুই', 'ময়ূরাক্ষী' ইত্যাদি এক-একটি হিরের টুকরো গল্পে কোথাও অন্তর্মুখিনতা ও মনোবিশ্লেষণ, 'মানসতমসা' পরিক্রমা, হিংস্রতার দমবন্ধ করা চেহারা, রোমান্টিক পুরাভিসার, অতি-বাস্তবতা নিয়ে খুলে যায় একালের পাঠকের অন্দরমহলের এক-একটি দরোজা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন নিষ্ঠিত জীবনশিল্পী। ছিলেন বস্তুবাদী নৈর্ব্যক্তিক সচেতন গল্পলেখক ও উপন্যাসিক। জীবনবোধে উজ্জ্বল, দায়বদ্ধতায় দীপ্ত। মানিক বিশ্বাস করতেন লেখক হলেন তিনিই "পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে, সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন।" মানবমনের জটিল রহস্য উন্মোচনে তিনি ছিলেন অক্লান্ত অভিযাত্রী। অনাবশ্যক আবেগ-বাহুল্য, রোমান্টিক বিলাস বর্জন, সমাজসচেতনতা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অতসী মাসীও অন্যান্য গল্প' তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেকার গল্পের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধোত্তর গল্পের ফারাক বড়ো বেশি। 'আত্মহত্যার অধিকার','প্রাগৈতিহাসিক', 'কে বাঁচায়', 'কে বাঁচে', 'হারাণের নাতজামাই', 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী', 'কুষ্ঠরোগীর বউ','শিল্পী, 'সরীসৃপ', 'দুঃশাসনীয়', 'হলুদপোড়া' তাঁর বিখ্যাত ছোটোগল্প। তাঁর লেখায় মানুষের ক্ষুধা, দেহগত জীবন এবং পরবর্তী কালে বেঁচে যাবার সংগ্রামের ছবি জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ছোটোগল্প নতুন ব্যাপ্তি ও মাত্রা পায়।

এই সমকালে বা তার খানিকটা আগে-পরে প্রবোধকুমার সান্যাল ও সরোজকুমার রায়চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা যায়, চল্লিশের দশকে বাংলা ছোটোগল্প আবার বাঁক নেয়, যেমন নিয়েছিলো বিশে ও তিরিশের দশকে। অর্থাৎ

বাংলা ছোটোগল্প বারেবারে বাঁক নিয়েছে, নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হয়েছে ঋদ্ধ, বেগবান। কাহিনিকে এড়িয়ে বা না-এড়িয়েও মনস্বিতায় উজ্জ্বল থেকেছে, জটিল থেকে জটিলতর মানব মনের খোঁজে পাঠককে বিনিদ্র রাত কাটাতে বাধ্য করেছে এবং এ সবই করেছে ছোটোগল্প: ইতিহাস নতুন তাৎপর্য পেয়েছে গল্পকারদের সৃষ্টিতে, তছনছ হয়ে গেছে দেশ-কালের গণ্ডি। আঙ্গিকে নতুনত্ব এসেছে, শব্দ খেলা করেছে খোলা তরোয়ালের মতো, গুলে গিয়েছে উৎসের অভিজ্ঞতা, ডানা মেলেছে ছকভাঙা শিল্প। বাস্তবতা, অতি-বাস্তবতা, অবাস্তবতা, পরাবাস্তবতা থেকে আবেগ-আবেগশূন্যতা, নান্দনিকতা-অনান্দনিকতা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র সাম্যভানা আধুনিকতা-উত্তর আধুনিকতা—সব কিছুই এসেছে, আসছে, আসবে। এসব নিয়েই গতকালের আজকের—আগামীকালের বাংলা ছোটোগল্প। কোনো গল্পে, কারও কারও গল্পে, কোথাও কোনোটা দাপট দেখাল, কোথাও দেখাল না। প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা, প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেমন স্বতন্ত্র, নদীর





প্রত্যেকটি ঢেউ যেমন নতুন, তেমনি সব গল্পকারের কণ্ঠই স্বাতন্ত্র্যে ঝকমক করল। আবার একই লেখকের একটি গল্প থেকে আর একটি গল্প আলাদা হয়ে গেল ট্রিটমেন্টে, বলার কৌশলে, এক-একটি কথার মোচড়ে। কারও সঙ্গে যেন কারও মিল নেই, মিল ছিল না, হয়তো, বা মিল ছিল; কেউ কাউকে চেনেন না, আবার প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনেন।

এই যে নতুন সময়, নতুন বোধ, নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আর বিচিত্র, আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝাঁপি উজাড় করে পাঠককে চমকে দেওয়া, সমঝে দেওয়া, তাঁদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে যাওয়া এই সমস্ত কথাকারেরই একজন হলেন সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)। বাসের কন্ডাক্টর থেকে সার্কাসের ক্লাউন, ঝাড়ুদার থেকে ঠিকাদারের কর্মী, স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে কারাবাস করা থেকে প্রাইভেট টিউটর হওয়ার তিক্ত স্বাদ নেওয়া, সংগঠক থেকে সাংবাদিক — নানা চেহারায় তাঁর অভিজ্ঞতার পাত্রটি অনেকটাই ভরে উঠেছিল। আর সেই সব অভিজ্ঞতা তিনি ঢেলে দিলেন তাঁর লেখায়। লজ্ঝরে মোটরগাড়ি তাঁর হাতে হয়ে ওঠে যেন বাউলের প্রাণভ্রমর, 'এক তারাটি', 'ফসিল' যেন মানবিক সত্তার শিকড় ধরে টান মারে, জনজাতির সংগ্রাম-বিপর্যয়-বঞ্চনা-চেতনা যেন চাবুক মারে মধ্যবিত্তের ভ্রান্তিবিলাসকে। তাঁর কলমের ডগায় হিরন্ময় পাত্রখানি যেন উন্মোচিত হয় জীবনের রহস্য-বিস্ময়-বৈচিত্র্য-গভীরতায়।

প্রথম দিকেই 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' গল্প লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। একেবারে নতুন বিষয়, নতুন দৃষ্টি, অভিনব বলার ভঙ্গি ও জীবনবোধ। তারপর থেকেই সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সৃষ্টিকার্যে নিজেকে সঁপে দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল। ফসিল 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা', 'ভারত প্রেমকথা', 'কিংবদন্তীর দেশে', 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস' প্রভৃতি।

একটু এদিক-ওদিক মেনে নিয়েও বলা যায় সমসাময়িক হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী, সাবিত্রী রায়, সোমেন চন্দ, নরেন্দু ঘোষ, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, লীলা মজুমদার, যাযাবর, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ রায়, ইন্দ্র মিত্র, শংকর, লিপি। প্রমুখ খ্যাতকীর্তি কথাশিল্পী। যুদ্ধ-মহামারী-দাঙ্গা-দেশভাগে দীর্ণ রুধিরাক্ত বাঙালি সমাজকে নানা দিক থেকে এঁরা ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন।

বাংলা ছোটগল্পের এই ঐশ্বর্যময় প্রবাহ ধরে আরো যাঁরা সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, মিহির আচার্য, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বুদ্ধদেব গুহ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, কবিতা সিংহ, দিলীপ মিত্র, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তুলসী সেনগুপ্ত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়,

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ, যশোজীবন ভট্টাচার্য, প্রলয় সেন, নিখিলচন্দ্র সরকার, ধীরেন্দ্র দত্ত, সমীর রক্ষিত, সুভাষ সিংহ ভগীরথ মিশ্র, রমানাথ রায়, আশিস ঘোষ, শেখর বসু, কল্যাণ সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত, শৈবাল মিত্র, ভগীরথ মিশ্র, সুবিমল মিশ্র, বলরাম বসাক, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, তারাপদ রায়, বাণী বসু, সমরেশ মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, আবুল বাসার, অণিতা অগ্নিহোত্রী, অভিজিৎ তরফদার, নলিনী বেরা, অমর মিত্র, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদার, উল্লাস মল্লিক, সৌরভ মুখোপাধ্যায়, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, নন্দিতা বাগচী, সুবর্ণ বসু, নন্দিতা নাগ, সিজার বাগচী, স্বর্ণেন্দু সাহা, প্রচেত গুপ্ত, শেখর মুখোপাধ্যায়, এণাক্ষী রায়, সুভাশিষ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সান্যাল, রাজেশ গঙ্গোপাধ্যায়, শাশ্বতী নন্দী, সঞ্জীব গোস্বামী, অম্লানকুসুম চক্রবর্তী, বিপুল দাস, জয়দীপ চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র, বাণীব্রত চক্রবর্তী, তাপস রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় বাংলা ছোটগল্প ক্রমশ সমৃদ্ধ এবং বিস্তৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

বাংলার পূর্বপারে (প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশ) বাংলা সাহিত্যের যে বিস্ময়কর সার্বিক বিকাশ ঘটেছে ছোটগল্পও তার অন্যতম শরিক। যাবতীয় কুসংস্কার, রক্ষণশীল সমাজের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ছোটগল্পের যে উত্থান দেখা দিয়েছিল, ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন এবং ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তা নিত্য নতুন মাত্রা পেয়ে বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার পথে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের ছোটগল্পের বিজয়-বৈজয়ন্তীর পথে যেসব ছোটগল্পকার তাদের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন বা হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সরদার জয়েনউদ্দীন, আবদুস শাকুর, আতোয়ার রহমান, রাজিয়া মাহবুব, লায়লা সামাদ, হেলেনা খান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, নাজমুল আলম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল গাফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হাসান আজিজুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আশারাফ সিদ্দিকী, সইফুল আহসান বুলবুল, বশীর আল হেলাল, আখতারুজ্জমান ইলিয়াস, অসিহাবউদ্দিন অহম্মদ, অভিজিৎ সেন, রিজিয়া রহমান, রশীদ হায়দার, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সেলিনা হোসেন, কায়েম আহবেদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, হারুন রশিদ, হেনরী স্বপন, দীপংকর চক্রবর্তী, শহীদুর রহমান, কামরুল নাহার মুন্নি, সৈয়দ ওমর হাসান, রাহাত খান, শহীদ আখন, বিপ্রদাস বড়ুয়া, আনিস চৌধুরী প্রমুখ।

ছোটগল্প হল শিল্পীর আত্মার মুকুব। জীবনযন্ত্রণার রক্ত-অশ্রুময় অনুভূতি প্রকাশে-ক্ষতবিক্ষত সমাজ ও মূল্যবোধের উপস্থাপনে, আন্তর্জাতিক মানসতার পাশাপাশি স্থানিকতায় বিশ্বস্ততা অর্জনে, প্রতীতির উদ্ভাসনে ছোটগল্পেই ঘটে স্রষ্টার নিজেকে নিরন্তর আবিষ্কার।

তাই বাংলা ছোটগল্প বহন করে বাঙালির মর্মপরিচয়। তা তার যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের, সার্বিক জীবনের অন্তরঙ্গ মহাদেশ। এখানেই সগৌরবে সুমুদ্রিত হয়ে আছে যেমন বাংলা





সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও সমুন্নতির স্বাক্ষর তেমনি তা- বিশ্বমানে প্রদীপ্ত। যথার্থই বাংলা ছোটগল্পের পূর্ণতায় সমুজ্জ্বল হয়েও এখনও বেগবান, নিত্য নতুন পরীক্ষানিরীক্ষায় ক্লান্তিহীন ভগীরথ।

এবং প্রমাণও পাই মুহূর্তেই। হাতে এলো অগ্রন্থিত অবস্থায় একটি ছোটোগল্পের সংকলন; 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের গল্প,' লেখক হলেন কবি-প্রাবন্ধিক-অধ্যাপক জয়গোপাল মণ্ডল। ঝলকেই চমক—নানা আকারের ছাব্বিশটি গল্পেই ঘটে যায় ব্যক্তি, রাষ্ট্রে, সময়, সমাজেকে ফালাফালা করে দেখা ও দেখানোর পাশাপাশি আবিষ্কারের আকর্ষণ। নতুন স্বরের সম্মোহন। ঘটালো শারদী প্রসন্নতায় বোধের বিস্তার, বোঝা যায় সত্যের জোর।

কোনো কোনো প্রাজ্ঞ সমালোচক মনে করেন, বাংলা গল্পে এখন প্রাক্-অমাবস্যা। অবশ্য আমাদের বিশ্বাস এর বিপরীত। বাংলা গল্প, বিশেষ করে ছোটোগল্প বেঁচে আছে বহাল তবিয়তেই। অগ্রগতিও অব্যাহত। নৈরাজ্যের দৌরাত্ম্য, মানুষের সংকট ও সমাজের ভাঙচুর নিয়ে এখনো গল্প লেখা হচ্ছে। জীবনের অঙ্গীকার হরপ্পায় মিশে যায় নি। জয়গোপালকে অভিনন্দন তাঁর অসামান্য শিল্প-সৃজনের জন্য। স্বস্তি বোধ করি তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তায়।

আলোচ্য সংকলনের প্রথম গল্প 'রাজা খেলে হোলি'। এ রাজা কোন্ রাজা? এ হোলি কীসের হোলি? শিরোনামের মধ্যেই অপ্রচ্ছন্ন থাকে লেখকের সচেতন দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছন্দে চলে ব্যঙ্গের তরবারি চালনা। গোপন থাকে না রাষ্ট্রব্যবস্থার পঙ্গুতা, বহুচারিতা, ন্যায়দণ্ডের মাজাভাঙা নতজানুত্ব। তাঁর খরশান তিরস্কার শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের স্থিতাবস্থার প্রতি। শব্দের পরতে পরতে, বয়ানের স্তরে স্তরে গল্পকার মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন মানবতার চূড়ান্ত লাঞ্ছনার ছবি।

'মেঘযামিনী'তে ঘটে ঘুমিয়ে থাকা বাসনার আচমকা জাগরণ, উষ্ণতার বিষণ্ণ বলয়।

'এক কমরেডের গল্প' হলো বাস্তবতার ঠাসবুনোটে স্বপ্ন ধরার প্রবল প্রয়াস। অথচ অভিজ্ঞতায় থাকে শুধু অন্ধকার, তিক্ততার নরক গুলজার।

'মীমাংসার সাতকাহনে', মেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তামস বিলাস। কলেজে কলেজে চলে পাইয়ে দেবার লুটে খাবার রাজনীতি, ছাত্রনেতাদের অসাধুতা, অধ্যাপকদের মধ্যে শুভ-অশুভের খেয়োখেয়ি, আবার আপস রফার বাধ্যতা।

'অন্তরিন স্রোত অন্তরায় বোধ' যেন কল্পনার কোমল ক্যাকটাস, দ্বন্দ্বদীর্ণ হৃদয়ের মায়াচর।

'চাঁদের কিরণতরী আজও ভাসে' আঙ্গিকের অভিনবত্বে রোমান্সের তলদেশে অশ্রুময় আর্তি। 'ব্যাম্বুভিলা' মানেই কি হুড়কো দেবার জিম্মেদারি? না, সেখানেও দেখা দিতে পারে অধরা স্বপ্ন ঘিরে অদ্ভুত টানাপড়েনের মরমি বাস্তবতা।

'অপরাজিত' গল্পে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে এক সময়কার অভিজ্ঞতা। স্কুলে স্কুলে পাই পুস্তক নির্বাচন নিয়ে শিক্ষকে-শিক্ষকে রেষারেষি, মায় ধুন্ধুমার। নোংরামিতে হাতযশ

ছিলো কখনো প্রধান শিক্ষকেরও। টকাপয়সার ভূমিকা, উপহারের ঢল-কোনো কিছুরই খাম্‌তি হতো না। এ ছাড়া, স্কুল যদি কো-এড হ'তো, প্রধান শিক্ষকও যদি পুরুষ হতো তা হলে শিক্ষিকাদের প্রতি বিশেষ নজরও রাখতেন। এ সব নিয়ে গল্পটি একটু অন্য রঙের ও স্বাদের। সর্বোপরি বাস্তবের কাছাকাছি। খণ্ডিত গোলাপ বাগান-ও।

'আবর্তন'-এ ঘুরেফিরে আসে দুটি বহুল ব্যবহৃত কথার পুনরুদ্ধার তাহল, পাপ ছাড়ে না বাপকে, আবার পুত্র মরে জনকের পাপে। নির্মম রেপ্লিকা।

'এক ফালি চাঁদ' যেন অগণন গবেষকের অন্তর্দহন, অবমাননার অশ্লীল আঁধার। যেন—

"পায়ে হাতে ধরা বোঝা? হাড়ে হাড়ে কান্না জমে, কেউ কিছু বলতেও করে না;<br>—পিপেট এবং এইচপিএলসি পিপিআর ক্রোমোটোগ্রাফিও।<br>প্রজেক্ট দেখিয়ে শুদ্ধ টাকা আসে। নয়ছয়। অথচ মেধাকে<br>উদ্‌বেগে রেখেই চলে চালকের সিঁড়িভাঙা, পতাকা ওড়ানো।<br>হয়রানির শেষ নেই। গবেষক অধমৃত। তারাদের ছায়ায় ছায়ায়<br>অবমাননার খেলা অবিরাম, গালিলেই গালিলেয়ো যেন।"<br>অস্তসূর্য উঁকি মারে, হরিণীর মাংস নেই যেহেতু শরীরে।<br>কিংবা ঠিক, "পৃথিবীর সব গ্লানি কুরে কুরে খায় বুক রিসার্চ ফেলা'র"

"হৃদয়-লালন' হয় ফ্ল্যাট বাড়ির খণ্ড চিত্রে। ঘর ঘরকা কহানি, অশ্রুজমাট পাথরের কথা। সন্তানেকে ঘিরে মধ্যবিত্ততায় বন্দি শিক্ষিত বাঙালির স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের মরুশ্বাস এই গল্পের শিরায় শিরায়। ধমনীতে ধমনীতে একাকিত্বের করুণ কাতরতা।

'অসমাপন' হ'লো করোনা-কালের ভয়ংকরতাকে উপেক্ষা করা হার-না-মানা ভালোবাসার এক আশ্চর্য কাহিনি। 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের গল্প-ভুবনের অন্তর্গত 'অসমাপন'কে বলা যায় জীবন, আজীবনের কোমল গান্ধার।

রসের ভিয়েনে অনুকরণীয় ব্যঙ্গাত্মক সৃষ্টি 'এক রাক্ষুসির গল্প।' এ কালের শানিত কুঠার।

'রঙ্গ রাজার ভঙ্গ প্রদেশ' হ'লো শব্দতরবারির চমকপ্রদ নিদর্শন। রূপকের আবরণে খসে যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিধ্বংসী চেহারা। বিদ্রুপের তীক্ষ্ণতায় দ্যুতিময় হয় মানবদ্রোহী রাজনীতির খেলা, দুর্নীতির উলঙ্গতা।

নির্মল মজাদার গল্প 'দুঃস্বপ্ন'।

'আকাল' স্থানিক খণ্ডচিত্র।

'শঙ্খবলয়' অনিঃশেষ জীবনের বিরল বলয়, বাঁচার মঞ্জরি। কোভিড-মারিতে বিশ্ব জুড়ে শরীরীমৃত্যুর মিছিল শুধু নয়, ঘরে ঘরে ঘটে যায় মানসিকতারও মর্মন্তুদ বিপর্যয়। কিন্তু সভ্যতার শেষ নেই। ধ্বংসের ভিতর থেকেও জাগে জীবন, ঘটে প্রাণের আহবান।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

'সুতোর খেলা'য় এসেছে শাদায়-কালোয় রাজনীতির দেউলেপনা, বাণিজ্যিকতার খচ্চরিবিলসন।

'পরমার গান' আশ্বাসের আশ্রয়, মানুষের অপরাজেয়তা।

'লড়াই' গল্পটি যথার্থই তিমির হননের গান।

ঠাসবুনোটে 'স্বপ্নচোর' উত্তর-উপনিবেশিক প্রখর প্রযুক্তিক সময়ের স্বপ্নসর্বস্বতার কথকতা।

বিশ্বত্রাস কোভিডের কালেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানবিক সম্পর্কের অনন্য আলেখ্য 'একবুক গঙ্গাজল'

'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন' চলছিল অর্থাৎ নোভেল করোনার বিপুল বিধ্বংসী আক্রমণে মানবসমাজ যখন মহাসর্বনাশের আওতায় তটস্থ, মৃত্যুমিছিলে সন্ত্রস্ত, সেই সংকট কালে চিকিৎসক-নাস-স্বাস্থ্যকর্মিগণ সমবেত ভাবে দিন-রাত এক করে গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধ। গল্পের কথকল আপন অজান্তেই সেই মারণমুক্তি আন্দোলনের একজন প্রতিরোধী যোদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। পর্যবেক্ষণে, উপকরণে, উপস্থাপনোর চমৎকারিত্বে এখানে পাওয়া যায় ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের উজ্জ্বল উপস্থিতিও।

কাহিনির একমুখিতায়, পাশাপাশি সমান্তরালতায়, দুঃসাহসিক তির্যকতায়, প্রতীকত্বে, ব্যঞ্জনাগর্ভে, সংকটের স্বরূপ উন্মোচনে এক-একটি গল্প ছুঁয়ে আছে অসামান্য তার তুঙ্গশৃঙ্গ। চিত্র, চিত্রকল্প, চিত্রলতায় রচনাগুলির ঋদ্ধি ও সিদ্ধি অভাবিত। তাঁর গল্পের শিরদাঁড়ায় দেখি অভিজ্ঞতার আলো, সময়ের বোধ। মানুষের অসহায়তা, বিক্ষোভ-সংক্ষোভ, বেদনা-যন্ত্রণা, সংকট ও সংকল্পের তাৎপর্যপূর্ণ ইশারায় এখানে পেয়ে যাই সাহসী ও সংস্কারমুক্ত এক গল্পলেখককে। তাঁর রচনায় দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের মুহূর্ত। রাগি চোখের স্বপ্নসন্ধান সেখানে। ব্যক্তিমনস্কতা ও সমাজমনস্কতার অভিন্ন আবেগ।

# উত্তরায়ণের দিন
## অমর মিত্র

২২ ডিসেম্বর, ৭ পৌষ থেকে সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়, দিন বড় হতে শুরু করে। শীতের দিনগুলোয় আমাদের খেলার সময়টুকু কত না কম হয়ে যেত। স্কুল ডিসেম্বরে ছুটি থাকত। ডিসেম্বরের ২৬-২৭ তারিখে রেজাল্ট, বুক লিস্ট, তারপর জানুয়ারিতে নতুন ক্লাস।

আমাদের দন্ডীরহাট গ্রামে বড়দিন বলে কিছু ছিল না। আমাদের দিন বড় হত খেলার মাঠে। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্রে একটু একটু করে। আষাঢ়ে কত বড় দিন। তারপর মেঘে মেঘে সেই বড়দিনে অকালসন্ধ্যা নামত। অকালসন্ধ্যায় কত বড়দিন হারিয়ে যেত।

কিন্তু এই যে জীবন, এই জীবন চায় চিররৌদ্রালোকিত বড় একদিন, যার ব্যাপ্তি ২৪ ঘন্টা নয়, অনেকটা সময়, ধরা যাক জীবনব্যাপী থাকবে তার রেশ। সেদিন কি আসে মানুষের জীবনে, চিরকাল কি এই জীবন রৌদ্রালোকিত থাকে? না থাকতে পারে? ছোট-বড় কত না বড়দিন জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে আসে। সে বড়দিনের কথা এখন খুব মনে পড়ে। আসলে এই জীবনে অনেক ম্যাজিক আছে। জীবনের জাদু জীবনকে বদলে দেয়। সেই বদলে যাওয়ার দিন, সময়, পর্ব- ই আমাদের বড়দিন। বড়দিন সেই দিন, যা, এই ক্লান্তিকর জীবন বদলে দিতে পারে। উৎসবের কাজও তাই। ক্যালেন্ডার মেনে যে উৎসব আসে, তা তো কেবল ক্ষণিক আলোর ঝলকানি। উৎসব শেষ হয়ে গেলে জীবন আবার একঘেয়ে।

উৎসব আর কতটুকু বদলাতে পারে জীবন? জীবনের চলন বদলায় যে দিন, যে সময়কে ধারণ করে, তা এক উৎসবেরই দিন। তাকে বড়দিন বলি বা পৌষপার্বণ বলি। সেই উৎসব এই জীবনের উৎসব। একটু ঘুরিয়ে বলি, জীবনই এক উৎসব। সেই উৎসব সবসময় আনন্দময় থাকে না বটে, কিন্তু তা বড়দিন তো নিশ্চয়ই। আমার জীবনে বড়দিন এসেছে, চলে গিয়েছে, আবার এসেছে, আবার চলে গিয়েছে। এক একটা পর্ব, দিন জীবনের চলনকে বদলে দিয়েছে। সেই একটা সময়ের কথা বলি, ৩ বছর আগের এই শীতের সময়। সে-বছর আমার বদলি হয়েছিল দূরে। কত দূরে? কলকাতা থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে তো হবেই। প্রোমোশনে বদলি। যেতেই হবে। দুয়ারে দুয়ারে ঘুরলাম, মানে টপ বসের কাছে গেলাম দরখাস্ত নিয়ে, কন্যার বয়স তখন দেড় বছর, স্ত্রী একটি স্কুলে সবে চাকরি পেয়েছে, আমার বদলি না হলেই কি নয়। কলকাতার কাছাকাছি কোথাও দেওয়া হোক আমাকে। মাত্র পাঁচ বছর আগে ফিরেছি মেদিনীপুর জেলার নানা গঞ্জে সাত বছর কাটিয়ে। কিন্তু ওপরয়ালারা খুব কঠিন হৃদয়ের হন মনে হয়। উঁহু, বদলির তালিকার বদল হবে না। অথচ কতজনকে দেখলাম, ইউনিয়ন, সরকারি দলের কঠোর সমর্থক, রাজনীতি করেন বলে প্রোমোশন পেয়েও নিজের দুয়ারের কাছেই আছেন। বছর দশ এক জায়গায় আছেন। বড়জোর বহুতল অফিসবাড়ির এইটথ ফ্লোর থেকে সিক্সথ ফ্লোর। তখন তিনি সহৃদয়। তাহলে কার কাছে যাব। কলকাতা, লেখালিখির জগৎ, লেখক-বন্ধু সকলকে ফেলে আমাকে চলে যেতে হবে ২০০ কিলোমিটার দূরে। বিমর্ষ হয়ে পড়লাম।





যেতে হবে সেই কত দূর। সেই বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিমে, পুরুলিয়া জেলা সংলগ্ন শালতোড়া ব্লকে। আমি পদোন্নতির আদেশ ব্যাগে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না। আমার স্ত্রী মিতালি বললেন, এরপর তোমার প্রোমোশন অর্ডার বাতিল হয়ে যাবে, জয়েন করো আগে, আমি পারব একা থাকতে।

মা-বাবা তখন বেঁচে। কলকাতায় সকলে মা বাবা দাদাদের কাছে রেখে আমি এক তরুণ লেখক বন্ধু তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে হাওড়া থেকে 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে রওনা হলাম। সে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফেরত আসবে। আমাকে তো জয়েন করতে হবে অমুক তারিখের মধ্যে। হাতে আর সময় ছিল না। হোল্ডলে বিছানাপত্র, সুটকেসে জামাকাপড়, কাঁধের ব্যাগে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেনে চললাম দুর্গাপুর। যাওয়ার পথ জেনে নিয়েছিলাম। ব্ল্যাকডায়মন্ড এক্সপ্রেস ট্রেনে গেলে কানেকটিং বাস মিলবে। নতুবা ঘণ্টা তিন-চার অপেক্ষা করতে হবে। এমনও হতে পারে সারাদিন বাস মিলল না। তবে ট্রেন টাইমের বাস পাওয়া যাবেই। পেলাম বাস। দুর্গাপুর থেকে ঘণ্টা তিন লাগল। বাস লজঝড়ে। তৃণাজন যাচ্ছে নতুন জায়গা ভ্রমণের আনন্দে, আমি চলেছি নির্বাসনে বুঝি বা আবার কবে কলকাতার কাছে বা শিগগির কলকাতায় ফিরতে পারব কি?

শীতের দিন। এদিকে শীত পড়ে বেশি, গরমও। বর্ষা তেমন নয়, যেমন হয় কলকাতায়। সব জেনে এসেছিলাম। আমার লেখক-বন্ধু দীপঙ্কর দাস বছর চার বাঁকুড়ায় ছিলেন। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়র। আমাকে বলে দিয়েছিলেন, বাঁকুড়া সদরে তাঁর সহকর্মী-বন্ধু নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, কবি রবি গঙ্গোপাধ্যায় আছেন, সমস্যায় পড়লে ওঁদের কাছে যেতে। সমস্যায় পড়িনি। পরে গিয়েছিলাম তাঁদের কাছে। ব্যাগে ছিল নতুন লেখা গল্প। পড়ে শোনাব।

বাস চলছিল যত না গতিবেগে, তার চেয়ে বেশি শব্দ করে। শীতের হিমেল হাওয়ার ভেতরেও মাথায় মাফলার জড়িয়ে জানালা খুলে রেখেছি, দেখব তো পথের পাশে কী আছে। পথের দিকে চোখ মেলে দিয়ে দেখে নিচ্ছি রুক্ষ প্রকৃতিকে। রুক্ষই বটে। গাছপালা কম, লালমাটির কাঁকুরে ডাঙা-ডিহি বেশি। গাছপালা বলতে বনসৃজনে সৃষ্ট গাছ-গাছালি, বেশিরভাগ ইউক্যালিপটাস। দুর্গাপুর ব্যারেজ পার হল গাড়ি। ধু ধু বালুচর। শীতের নদ যেন সাপের খোলসের মতো পড়ে আছে।

বাঁকুড়া জেলা আরম্ভ হল। তারপর এক গঞ্জে গিয়ে থামল। বড়জোড়া। সেখান থেকে ডাইনে ঘুরে বাস চলল যেন নিরুদ্দেশে। দূরে দূরে গ্রাম-ছায়া। সড়কপথ খুব ভাল নয়। আমার বিমর্ষতা যাচ্ছিল না। শিশুকন্যার জন্য মনখারাপ হচ্ছিল। বড়জোড়া থেকে মালিয়াড়া গ্রাম হয়ে মেজিয়া। সেখানে তখন এক থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট হয়েছে। বাতাসে ছাই উড়ছে। খোলা জানালা বন্ধ করে দিলাম। শীতের বাতাসের কামড় খুব। মেজিয়া ছাড়াতেই দু'-ধারে শালবন। জানালার কাচ দিয়ে সব দেখা যাচ্ছিল। এরপর বাস আবার ডানদিকে ঘুরল। আর যাত্রাপথের বিবরণ নাই-বা দিলাম।

বাস প্রায় ঘণ্টা তিন বাদে বেলা ১টা নাগাদ এক পাহাড়ের গোড়া থেকে ওপরে উঠে

গেল। বেশ চড়াই। চড়াইয়ের ওপর বাজার। শালতোড়া। আমি আমার উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেলাম। শালতোড়া আমার জীবনকে বদলে দিয়েছিল। শালতোড়ার দিনগুলোই আমার কাছে বড়দিন। উচ্ছ্বল রৌদ্রালোকিত দিন। লেখালেখি করব, লিখব তা ছিল আমার জীবনের পথ। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। লেখায় বদল আনতে হবে। দেখতে হবে দেশটাকে। কলকাতায় থেকে নিজে খুব সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না নিজের ওপর। নিজের যে বিস্তার চাই, তা ছিল হয়তো মনের অতলে সঞ্চিত। বুঝতে পারছিলাম না। কী করব? উপন্যাস লিখব। কিন্তু কী লিখব? এমন কিছু লিখতে চাই, যা লিখে আমি নিজেকে আলাদা করে নিতে পারি আর পাঁচজনের থেকে। কোন পত্রিকা ছাপল বা না ছাপল, তা নিয়ে আমার ভাবনা ছিল কম, যত ভাবনা লেখা নিয়ে। লিখতে পারতে হবে তো। গড় লেখা লিখে বেশি দূর যাওয়া হবে না। আমাকে দেখতে হবে আরও। কিন্তু এসব এখনকার ভাবনা। তখন খুব বিমর্ষ হয়েই শালতোড়া গিয়েছিলাম। চারদিক ছোট-বড় টিলা পাহাড় ঘেরা। তখন সেখানে সেই শীতের দিনে পোশাক-আশাক, শীতবস্ত্র, মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি নিয়ে বাজার বসেছিল। ভ্রাম্যমাণ বাজারিয়ারা এসেছিল। অঘ্রান মাসের শেষ। পুবের দিকে ধান কাটতে যাওয়া মানুষ ঘরে ফিরছে পয়সা নিয়ে। তাদের জন্যই বাজার। আমার অফিসের জানালা দিয়ে বড় পাহাড় বিহারীনাথ দৃশ্যমান।

ক'দিন বাদে তৃণাঞ্জন বাড়ি ফিরে গেল। আমি একটি মেসে থাকি অধস্তনদের নিয়ে। মন বসতে লাগল। মনের বিমর্ষতা কাটতে লাগল। এ আমি কোথায় এসেছি? আমার কত সময় অফিস বাদ দিয়ে বাকিটা সবই আমার। অফিসের কিছুটা তফাতে বাজারের ধারে ভিডিও হল, নাম 'মা তারা কফিহাউস', 'টুম্পা কফিহাউস'। আসলে কফি হাউসের নাম করে ভিডিও দেখানো হয়। টেলিভিশন সেটে ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার যুক্ত করে বাংলা ও হিন্দি ছবি দেখানো হয় টিকিট বেচে। রীতিমতো সিনেমা হল। 'বাবা তারকনাথ' চলছে এক মাস ধরে, ম্যাটিনি-ইভনিং হাউসফুল। নাইট শোয়ে ইংরেজি ছবি। ইংরেজি ছবি মানে সফ পর্নোগ্রাফি। সেখানে ভিড় করে ইশকুলের ছাত্ররাও।

বসে আছি মেসবাড়ির বারান্দায়, বেদের দল এল। বুড়ো বেদে দেখাল, ময়াল ধরে এনেছে বিহারীনাথ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে। তখন চৈত্রমাস। পলাশ ফুল ফুটে গিয়েছে কাছে দূরে। দেখায় আগুনের শিখার মতো। এক বিকেলে এল কালবৈশাখী। মেঘে ছেয়ে গেল পাহাড়চূড়া। মেঘ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত আকাশে। ঝড় এল, তারপর এল শিলাবৃষ্টি। তা শেষ হলে চলে যাওয়া শীত ফিরে এল। তুলে রাখা কম্বল আবার গায়ে দিতে হল। এক ঝটকায় তাপমাত্রা যেন ১৪-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এল। আশ্চর্য্য! আমি 'জল ও বায়ু' নামে একটি গল্পে শিলাবৃষ্টির কথা লিখেছিলাম। কতরকম গল্প না শুনি বাউরি যুবক ফকির ক্ষেত্রপালের কাছে। একবার এত বড় শিলা পড়েছিল যে, তা গলতেই নাকি একমাস সময় লেগেছিল। ফিরে এসেছিল শীত। আমি ভরে গেলাম। বছরে দু'বার শীত চলে এল।

আর তারপর চৈত্র থেকেই সেখানে জলের অভাব শুরু। ইশকুলের সামনে একটি বড় বাঁধানো কুয়ো ছিল। নাম 'বিধান কুয়ো'। বিধান রায় মৃত্যুর আগে শালতোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন নির্বাচনে। তাঁর স্মৃতিতেই জলের ব্যবস্থা। সে কুয়োর জল চৈত্রে নিঃশেষ হয়ে যেত প্রায়। কুয়োয় বালতি নেমে যেত, একদম নীচে গিয়ে পাথরে ধাক্কা খেত। জলের সঙ্গে বালি উঠতে আরম্ভ করল। জল ফুরলে লোকে জলের জন্য ছোটাছুটি শুরু করল। ভোর রাত থেকে বিধান কুয়োয় সারি দিত বালতি কলসি, নানারকম জলপাত্র। সারা রাত চুঁইয়ে-চুঁইয়ে যে জল জমা হত কুয়োর নীচে, তা সংগ্রহেই শেষ রাত থেকে সকলে কুয়োতলায় হাজির। চৈত্রের মাঝামাঝি থেকেই পইছা হাওয়া বা পশ্চিমি হাওয়া ঢুকতে শুরু করত। সেই গরম হাওয়া প্রবেশ করার সময় টিলা পাহাড়ে আছড়ে পড়ত। গুমগুম শব্দে চমকে উঠতাম। ওই অঞ্চলে মাটির নীচে কয়লা। প্রচুর বেআইনি খাদান ছিল তখন। সেই কয়লা সারা রাত্তির ধরে গরুর গাড়িতে পাচার হত। আবার মিনি লরিও কয়লা নিয়ে উধাও হত গভীর রাতে। গ্রামের ভিতরেই কুয়ো কেটে খনি থেকে কয়লা তোলা হত। সে ছিল আজ থেকে ৩৬ বছর আগের কথা। আমি নিজে জায়গাটির নাম দিয়েছিলাম ন'পাহাড়ি। কল্পনায় সাজিয়ে নিয়েছিলাম নয়টি পাহাড় ঘেরা সেই অঞ্চল। জলের অভাব, বৃষ্টির প্রতীক্ষা, চাষ নষ্ট হয়ে যাওয়া, পইছা হাওয়া, আশ্চর্য প্রকৃতি আমাকে যা দিয়েছিল, তা সারাজীবনের সঞ্চয়। এরপর জলই হয়ে ওঠে আমার লেখার প্রধান বিষয়। এখনও তা আছে। 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের পটভূমি ২০০০ বছর আগের উজ্জয়িনী নগর।

শালতোড়া না গেলে আমি ধ্রুবপুত্র লেখার কথা ভাবতেই পারতাম না। 'হাসপাহাড়ি' নামের একটি উপন্যাস লিখেছিলাম সেই নামের একটা জায়গা নিয়ে। অনেক লিখেছি। সব লিখিয়েছে সেই জনপদ। মনে হত ওই জায়গা বুঝি আমার জন্মভূমি। নবজন্মই হয়েছিল শালতোড়ায় গিয়ে। এখনও নানা লেখায় শালতোড়া ফিরে আসে জায়গাটি যেন কুহক করেছিল আমাকে। সেই কুহক এখনও ছাড়েনি।

একটা জায়গা মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। তাকে একনিষ্ঠ করে তুলতে পারে। কতরকমভাবে চিনেছিলাম আমি আমার গ্রাম- ভারতকে। জানলাম, নিম্নবর্গের গৃহে ভাত খেয়েছি বলে ভৎর্সনা করেছিলেন আমার অফিসের ব্রাহ্মণ হেড ক্লার্ক মশাই। ভাদ্র সংক্রান্তির আগের রাতে তিলুড়ি নামের গ্রামে গোষ্ঠ বাউরির কন্যার মুখে ভাদু গান আমি ভুলব না। গ্রামবাসীর সঙ্গে রাত জেগেছিলাম আমি। এসব এখনও লেখায় আসে।

তিলুড়ি থেকে পছন্দপুর নামের গ্রাম খুব কাছেই। পছন্দপুর নামটিও আমার কল্পনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। জলবায়ু গল্প ছাড়া এই সেদিন লিখলাম একটি উপন্যাস, 'ও আমার পছন্দপুর। সেই বড়দিন রয়েছে আমার সঙ্গে। এখনও লিখে যাচ্ছি। রসদ ফুরয়নি। নয় পাহাড়ি, হাঁসপাহাড়, শামুক পাহাড় হয়ে ওই জনপদ ফিরে ফিরে আসে। হে পাহাড়, হে অরণ্য, ডাহি, ডুংরি, ছোট নদী আমি তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা আমার জীবনকে এখনও রৌদ্রালোকিত করে রেখেছ।

উত্তরায়ণের দিন ফুরচ্ছে না।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

## নারী স্বাধীনতার মৃদুস্বর : অবতরণিকা

**পিউ মণ্ডল**

***'Reality is an impossible hypothesis— Reality means different things in different contexts'–1***

সাহিত্য যেমন একাধিক বর্গনিয়ে গঠিত হয় তেমনি মানবজাতিও বিভিন্ন বর্গ বা শ্রেণির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আর সেই একএকটি পর্যায় যেন জীবনের এক একটি দিকের ইঙ্গিত দেয়। ঠিক তেমনি সাহিত্যের ইঙ্গিতময়তা থেকে আমাদের মনে বিভিন্ন রসবোধ জাগ্রত হয় আর সেই রসবোধের ফলেই আমরা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমরা যেমন সমাজের অংশ ঠিক তেমনি সাহিত্যিকরাও সমাজের অংশ। সাহিত্যিকরা তার চারপাশের পরিবেশ, দেশ-কাল-সমাজ ও নিজের সঞ্চিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাকে পরিস্ফূট করে সাহিত্যে তাঁর লেখনির মাধ্যমে। উত্তাল চল্লিশের দশকের যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও তার পরবর্তীতে বাঙালির দুঃসহ জীবনের বিবর্তনগত ইতিহাসটি যেসব সাহিত্যকরা তাদের বিভিন্ন লেখালেখিতে তুলে ধরেছিলে তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র ভারতবর্ষের অন্নসংকট, বস্ত্রসংকট, জীবন সংকট ও তৎকালীন মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থা কেমন ছিল তিনি তুলে ধরেছিলেন তাঁর বিভিন্ন ছোটো গল্পে।

তৎকালীন মধ্যবিত্ত পরিবারে নানা বিপত্তি থাকলেও পুরুষের তুলনায় নারীদের বাধা বিপত্তি একটু বেশীই দেখাযায়, কেননা সেই সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারনা ছিল—

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে"[২],

এছাড়া পুরুষরা মনে করত অন্তঃপুর সামলানোর দায়িত্ব মেয়েদের আর বর্হিজগত সামলানোর দায়িত্ব ছেলেদের। সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অর্থের প্রয়োজনে বহু মধ্যবিত্ত নারীকে সেদিন অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে পার হতে হয়েছিল বাড়ির চৌকাঠ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত নারীদের সেই সাবলম্বী হওয়ার পথ কখনই মসৃন ছিল না। প্রতিপদক্ষেপে তাকে লড়তে হয়েছিল আপন পরিবার ও বাইরের সমাজের নানা নিয়মও সংস্কারের বিরুদ্ধে। নগেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা এমনই এক ছোটো গল্প হল 'অবতারণিকা'। গল্পটি আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা বার্ষিকীতে ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি সম্পর্কে সমালোচক প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্র দত্ত মহাশয় বলছেন—

"ইংরেজি চল্লিশের দশকের শেষদিকে রচিত এই গল্পে সে সময়ের দেশীয় সামাজিক





অর্থনৈতিক সমস্যা ও সময়ের চিত্র পাঠকরা অবশ্যই আশা করতে পারেন। গল্পটির প্রেক্ষাপট শহর কলকাতা এবং এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক গৃহবধূর সংসার জীবন ও চাকরি জীবনের বাহ্যিক মানসিক টানাপোড়েন ও তজ্জনিত অসহায়তা সর্বশেষ- চাকুরে রমনীর ব্যক্তিত্বের অভাবনীয় উত্তরণ। একেই গল্পকার স্থির- নিপুন পর্যবেক্ষনে এঁকেছেন 'অবতারণিকা' গল্পে। এগল্পে গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গি দেশ কালের পটে বাঁধা।"[৩]

'অবতারণিকা' গল্পটি ছোটো বড়ো বেশ কিছু চরিত্রর্র নিয়ে গঠিত হয়েছে। তবে গল্পের নায়ক সুব্রত ও নায়িকা আরতি হলেও গল্পের প্রধান চরিত্র আরতিই। কেননা গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র অসাধারণ দক্ষতায় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা শহরের মাঝে মধ্যবিত্ত পরিবারে জীবন ধারনের জন্য ও সংসারের প্রয়োজনে এক শিক্ষিত সাধারণ কূলবধূর বাইরে গিয়ে চাকুরিরতা নারীর দাম্পত্যের যে সংকট তা তুলে ধরেছেন আরতি চরিত্রের মধ্য দিয়েই। এছাড়াও গল্পকার দেখিয়েছেন স্বাধীন হওয়ার প্রশ্নে আরতিকে কিভাবে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করতে হয়েছে মধ্যবিত্তের সনাতন সামাজিক সংসার ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে। তাই বীরেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কথায় বলা যায়— "আরতি গল্পের মধ্যে ক্রমশ তার পারিবারিক সত্তা থেকে ব্যক্তিসত্তায় এসেছে এবং সেই ব্যক্তি সত্তা থেকে নিগূঢ় সামাজিক মানসিক সত্তার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছে।"[৪]

গল্পের শুরুতেই দেখি আরতির চাকরি নিয়ে পারিপারিক অশান্তি। আরতির এই চাকরি করার বিষয়টি তার পরিবারের শ্বশুর ও শাশুড়ী কেউই ভালো চোখে দেখেনি। তাই আরতি চাকরি থেকে দেরি করে ফিরলে শাশুড়ি যেন তাকে কিছুটা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বলেন—"এই বোধ হয় এলেন আমাদের মহারাণী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর সংসারের কথা মনে পড়ল। দুদিন ধরে মেয়েটার যে জ্বর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।"[৫]

আবার কোথাও যেন আরতির শাশুড়ি তার এই কাজ করাটাকে মনে মনে সমর্থন করেন সংসার চালানোর জন্য কেননা তার স্বামী বেকার ও ছেলের কাজ চলে যায়। আরতির একার রোজগারেই যে তাদের এত বড় সংসার চলে। যে কাজ তার স্বামী ও ছেলের করা উচিত সেই কাজ তার বৌমাকে করতে হচ্ছে। তাই শ্বশুড় প্রিয়গোপাল আরতিকে যখন শুনিয়ে বলে—"এত রাত অবধি কোনগৃহস্থের বউ বাইরে থাকে! এমন যে হবে, আমি আগেই জানি। আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ-ঝি'র রাশ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায়-"[৫]

তখন সরোজিনী বাধা দিয়ে বলে—"থাকথাক তোমাদের কার যে কতখানি মুরোদ, তা দেখা গেছে।"[৬]

আরতির স্বামীও ধীরে ধীরে তার চাকরি করাকে অপছন্দ করতে শুরু করে অথচ স্বামী

সুব্রত নিজেই ছয় মাস আগে তার বাবা-মা'র বিরুদ্ধে গিয়ে আরতিকে নিজেই চাকরি করার পথ দেখায়। কিন্তু কেন পথপ্রথদর্শক সুব্রত আরতির চাকরি করাকে পছন্দ করেনা তা আমরা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে দেখি। নিজেকে নিয়ে নয় জন সদস্যের পরিবার সুব্রতর। তাঁর একার রোজগারেই এত বড়ো একটা সংসার চলে। অফিস থেকে যা মাইনে পায় তা মাসের পনেরো দিন যেতে না যেতেই শেষ হয়ে যায় ফলে প্রত্যেক মাসেই তার আয়ের থেকে ব্যয় বেশী হয়। তাই বাধ্য হয়ে সংসারের শ্রী ফিরিয়ে আনার জন্য অবশেষে স্ত্রী আরতির সরাণাপন্ন হয় এবং তাকে বলে—

"পুরুষ হোক মেয়ে হোক আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো? চেষ্টাচরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না বিশ হোক পঁচিশ যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।"[৭]

সুব্রত নিজে অফিস থেকে আরতির চাকরির আবেদন নিজেই টাইপ করে আনে এমন কি আরতিকে ইন্টারভিই দিতে নিয়ে যায় ও তার সাহস জোগায়। শেষপর্যন্ত সুব্রত জয়ী হয় এবং আরতি মুখার্জী কোম্পানিতে জয়েন্ট করে। এই কোম্পানিতে জয়েন করার পর আরতিকে সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। ফলে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও মানিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেকে বদলাতে হয় কিন্তু মানসিক দিক থেকে সে একই রকম থেকে যায়। সংসার ও সংসারের বসবাসকারী লোকজনের প্রতি থাকে তার আগের মতই সমানদরদ। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সে সংসারে সবাইকে খুশি করতে সবার জন্য নানা খুটিনাটি জিনিসপত্র কিনে আনে। এমনকি স্বামী সুব্রতর জন্যও। আয় বাড়ার জন্য আরতি অক্লান্ত পরিশ্রম করার সাথে সাথে আর পাঁচজন গৃহস্থ বধূর মতই পারিবারিক ভারসাম্য রেখে চলেছে। সংসারের ভেতরে মান-অপমানকে বড়ো করে না দেখে সে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে রোজগার বাড়ানোর প্রচেষ্ট করেছে মূলত পরিবারের সকলকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সুব্রতর মধ্যে মধ্যবিত্তের মেন্টালিটি, ধ্যান-ধারনা জাগ্রত হতে থাকে। চাকরি করতে গিয়ে আরতির ট্রামে-বাসে ঘোরা,অচেনা স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করা, রাত করে ঘরে ফেরা ইত্যাদি মধ্যবিত্তের মানসিকতাকে সজাগ করে। আরতি চাকরির মাহিনার টাকা সব সংসারেই খরচ করত কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কপালে জোটে গঞ্জনা। চাকরি করতে করতে দিনের পর দিন আরতি স্বাধীন হয়ে ওঠে, স্বামীর প্রতি নির্ভর- শীলতা তার অনেকাংশেই কমে যায়, সমস্ত বিষয়ে সে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নেয়। সুব্রত স্ত্রীর চাকরি করাকে পছন্দ করত সংসারে অর্থের প্রয়োজনে কিন্তু স্ত্রীর এই স্বাধীনচেতা মনোভাবকে সে কখনই মেনে নিতে পারে না তার সর্বদাই মনে হয়েছে আরতি বাইরে যাওয়ায় নিজে অধিকার খর্ব হচ্ছে।

ঠিক 'সেতার' গল্পের সুবিমলের মতো। 'সেতার' গল্পে দেখা যায় নিম্ন মধ্যবিত্ত





পরিবারের সুবিমল যক্ষ্মা—রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। অন্য কোনো উপায় না থাকায় তার স্ত্রী নীলিমা শেষ পর্যন্ত গান শেখানোর টিউশন শুরু করে এবং ধীরে ধীরে গান শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে সেতার শেখা ও শেখানো। সে আবিষ্কার করে তার মধ্যে থাকা শিল্পীসত্তাকে। এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করে নীলিমা তার স্বামী সুবিমলকে সুস্থ করে তোলে। আর সুবিমল সুস্থ হয়ে নীলিমার সব ইচ্ছা ,তার শিল্পীসত্তাকে অবদমন করে।

ভাবতে অবাক লাগে যে, নীলিমা ও আরতির মতো স্ত্রীরা স্বামীদেরকে নানা বিপদে -আপদে এমনকি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিশ্রম করে। অনবরত সুবিমল ও সুব্রতের মতো স্বামীরা সুস্থ হয়ে। বিপদ থেকে উন্মুক্ত হওয়া মাত্রই স্ত্রীকে বদ্ধ করে দেয় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। আসলে সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমে নীলিমা ও মুখার্জী কোম্পানিতে চাকরির মাধ্যমে আরতি কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই পায়নি, একই সঙ্গে তারা অর্জন করেছিল নারীর নিজস্ব space,কিন্ত প্রাতিষ্ঠানিক পুরুষতন্ত্রের পক্ষে নারীদের এই স্বাধীনতা মেনে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আর তাই ফ্রেডিক এঙ্গেলস যথার্থই বলেছেন—

"মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রী-জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়।

পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল,স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী,সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।"[৮]

সুবিমল ও সুব্রত ততদিন পর্যন্ত স্ত্রীর অর্থনৈতিক জীবন মেনে নিয়েছে, কে যতদিন তারা অক্ষম ছিল।

যে মুহূর্তে তারা স্ত্রীর অর্থতে সক্ষম হয় উঠেছে সেই মুহূর্তই তারা স্ত্রী দের ব্যক্তিগত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

আর এখান থেকেই শুরু হয় আরতি ও সুব্রতর সংঘাত। ঝগড়ার চরম মুহূর্তে আরতিকে চাকরি ছাড়তে বলে—

"তোমায় হয় চাকরি ছাড়তে হবে,নয় আমাকে। চাকরি যদি করতে হয়, অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা কর।"[৯]

কিন্তু আরতি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে, সে সংসারের প্রয়োজনে নিজের প্রয়োজনে চাকরি করবে এবং সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবে। আরতি চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে নিজের পরিবারের আর্থিক সংকট দূর করার জেদ, তেমনি অপরদিকে রয়েছে নিজের বন্ধু এডিথের চরম অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্খা।

বলাবাহুল্য আরতি চরিত্রের মধ্যে আমরা এক স্পষ্টব্যক্তি সত্তা ও প্রতিবাদী সত্তাকে প্রবিলক্ষিত করি। তাই স্বামী যখন আরতিকে বলে—

‘আগে জবাব দাও আমার কথার। আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন অফিসে গেলে আজ?’[১০]

আরতি কোনো দ্বিধা না করে স্বামীর প্রশ্নে স্পষ্ট জানায়—

‘না গেলে চলবে কী করে? মেয়ের অসুখের জন্যে বলছ তো? মন্দিরার সামান্য জ্বর কি পেটের অসুখের জন্য তুমি কামাই করতে পার অফিস’?

“তা ছাড়া একা তো ফেলে যাইনি তোমার মেয়েকে।বাড়িতে আদর যত্নের মানুষ আরও না ছিল,তা তো নয়।”[১১]

চাকরি জীবনে আরতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। মিঃ মুখার্জীর সঙ্গে কমিশন নিয়ে ঝামেলা হওয়া বন্ধুর হয়ে প্রতিবাদ করেছে সে। বান্ধবীকে অশালীন মন্তব্য করায় চরম অপমানে সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কেননা এই অপমান শুধু এডিথের নয়, এই অপমান সমগ্র নারী জাতির। তাই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সময় আরতি শুধু অপমানটাই বড় করে দেখেছে, সংসারের অভাবের তাড়না সেই সময় তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সময় তাই সে মন্তব্য করেছে—

“মানসম্মান নিয়ে ওখানে আর কাজ করা যায় না।”[১২]

আরতি তার বান্ধবী এথিডের অপমানের জবাব দিতে বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অফিসের বসের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে সে। আরতি বলেছে—

“আপনি যা বলেছেন উইথড্র না করলে কোনো ভদ্রলোকের মেয়েছেলে আপনার এখানে কাজ করতে পারে না।”[১৩]

তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিংশ শতাব্দীর সেই মেয়েদের কথা, যাদের কাছে সংসারের অভাবের থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে নিজের মানসম্মান ও আত্মমর্যাদা। তাই আরতি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যেন সমাজের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মেয়ের হয়ে প্রতিবাদ ঘোষনা করেছে। গল্পের শেষাংশে আরতির এই স্বচেতন মনোভব মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের ‘সুচেতনা’ কবিতাকে। তাই এই কবিতার অংশবিশেষকে একটু পাল্টে নিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—

> “সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে-
> এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।
> সে অনেক শতাব্দীর মানবীর কাজ;”[১৪]

অবতরণিকা শব্দের অর্থ হল—ভূমিকা বা সূচনা। আরতি যেন তার অফিসের বসের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নারী সমাজে এক নতুন অধ্যায় ‘অবতরণ করে যা গল্পকে ছাপিয়ে যায় জীবন যে জীবন অপরিমেয় হল ও অনাবিল আনন্দের নবধারা।





**তথ্যসূত্র :**

১. নবেন্দু সেন : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্নাবলী-২০২০,কলকাতা,পৃষ্ঠা-১৭২।
২. https-www.bangla-kobita.com
৩. ড. সরোজমোহন : স্বাধীনতার প্রাক ও উত্তরের বাংলা ছোটোগল্প বিচিত্রা: মননেও বিশ্লেষণে, পৃষ্ঠা-১০৭
৪. তদেব : পৃষ্ঠা-১১০
৫. নরেন্দ্রনাথ মিত্র- “অবতরণিকা”,এ কালের ছোটগল্প সঞ্চয়ন(২য় খণ্ড) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-১০৪
৬. তদেব :পৃষ্ঠা-১০৪
৭. তদেব: পৃষ্ঠা-১০৮
৮. ফ্রেডরিক এঙ্গেলস,পরিবার,ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি,ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা.লি.., তৃতীয় সংস্করণ; আগস্ট১৯৯৯,পৃষ্ঠা-৪১।
৯. নরেন্দ্রনাথ মিত্র-“অবতরণিকা” একালের ছোটোগল্প সঞ্চয়ন(২য় খণ্ড)কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃষ্ঠা-১২৬
১০. তদেব: পৃষ্ঠা১০৬
১১. তদেব: পৃষ্ঠা ১০৬
১২. তদেব: পৃষ্ঠা ১৩২
১৩. তদেব: পৃষ্ঠা ১৩৪
১৪. http : sbangalarkobita.com

# অচরিতার্থ কামনার লেলিহান আগ্রাসন এবং 'সোনালি মোরগের গল্প'

ড. পৌলোমী রায়

একবার আনন্দবাজার পত্রিকার দপ্তরের সামনে আগুন লাগা দৃশ্য দেখে সাংবাদিক অরুণ চক্রবর্তীকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কথার ছলে বলেছিলেন যে, আগুন যত বিধ্বংসীই হোক তার সামনে দাঁড়ালে মানুষের মনে একটা যৌনতার অনুভূতি জাগে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন—

'আমাদের রাঢ় অঞ্চলে খড়ের চাল ছিল। গ্রীষ্মকালে প্রায়ই আগুন লাগতো রাতে। এই যে আগুন জ্বলছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে, চারদিকে মেয়েরা কাঁদছে, সর্বস্ব জ্বলছে, এই নিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম। আগুনের মাতাল নাচযার একদিকে ভীষণ ভয়, অন্যদিকে বিস্ময়। এই শক্তিটা, এই ধ্বংসটা ছোটবেলা থেকেই আমাকে আকৃষ্ট করতো। প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলতে এগুলোই বুঝি আমি। এটার Parallel চলে আসে যৌনতাও। আগুনের ফুলকির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। মানুষ তখন অন্ধ। তার ভেতরে যে আগুনটা জ্বলে ওঠে, ওটাও সর্বনেশে আগুন। নারীর মনে পুরুষের মনে। এটা খুবই পুরনো প্রতীক। প্রাগৈতিহাসিক। যুগপৎ আনন্দ এবং ভয়।'[১]

আসলে ছেলেবেলা থেকে প্রকৃতির পাঠশালায় শিক্ষিত সিরাজ প্রকৃতি বলতে শুধু গাছপালা, নদী- নালা, আকাশ বোঝেননি। প্রকৃতিচর মানুষের মতো প্রকৃতির অন্দরমহলে প্রবেশ করে তার ভেতরের সত্যে অবগাহন করেছেন, যে সত্যে প্রকাশ পেয়েছে অবাধ স্বাধীনতার স্বাদ। মানুষের মধ্যেও এই স্বাধীনতার স্বাদ থাকে। আধুনিক সভ্যতার আলোকস্পর্শে মানুষ যতই আধুনিক হোক না কেন তার অন্তরের অন্তস্থলে অন্য এক জগৎ খেলা করে। যা আদিম, প্রাগৈতিহাসিক। তাই হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের উড়োজাহাজকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলের উপর দিয়েই উড়ে যেতে হয়। সব মানুষের মনেই এই প্রকৃতি জগতের বাস। কী নারী! কী পুরুষ! তবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যাদের যত বেশি গাঢ়, হয় তাদের মধ্যে এই স্বাধীনতার প্রকাশ তত বেশি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের "সোনালি মোরগের গল্প" মানুষ এবং তার সেই আদিম প্রবৃত্তির এক অনবদ্য প্রকাশ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর গল্পের সূচনাতেই আভাসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের অন্তরে এক ঔৎসুক্য তৈরি করেন। এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়, তাই এই গল্পের সূচনাতেই লেখক বলেন—

'সেই মোরগের সোনালি পালক, মাথায় লাল ঝুঁটি। মধ্যরাতে বাং দিলে হুলস্থুলস পড়ে যায়।..ঘর তখন মুহূর্তে শত্তুর। উঠোনে দাঁড়িয়ে চেরা গলায় চেল্লায়। দাওয়ার ঘুমন্ত বুড়ো শ্বশুর লোকটা ফোকলা মুখে রাতের পান্তার স্বাদ নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, ধানক্ষেতে পোকা পড়েছে, হলদে হলদে পোকা, ডানায় চিত্তিরবিচিত্তির,ফর ফর ফর চিরিক চিরিক



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

শব্দ। তার ঠ্যাং ধরে টানতেই হাউমাউ করে জন্মকান্না কাঁদে। হাওয়ায় কটু গন্ধ।হাওয়া যেন ডাক-ডাকিনি হয়ে ওত পেতে বসেছিল গাঁয়ের গাছ গাছালির ডালেডালে। মোরগের বাং শুনেই এলোচুলে ওলঙ্গিনী উথালপাথাল দোলে, ওড়ে, শনশনিয়ে হাসে। ঘর তখন শত্তুর। সবাই তখন ঘর ছেড়ে বাইরে।কারো চোখে স্বপ্নের নোনতা ঘোর,কারও মিঠে। কেউ ঘুমের নদী সাঁতরে আসার ক্লান্তি নিয়ে কষ্টে জাগে। কানে আসে মধ্য রাতের ভয়ংকর সেই সোনালি মোরগের বাং মাথায় লাল বিশাল ঝুঁটি আকাশ নাড়া দিয়ে দোলে।'[২]

সোনালি মোরগের বাং অর্থাৎ ডাক এটি একটি প্রতীক মাত্র। রাঢ় বাংলার গ্রামের খরার দু-তিনটি মাসে এ এক রেওয়াজ। প্রতিবছরই কোনও না কোনও গ্রাম এই সোনালি মোরগের বাং-এর মতন আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এইসব রাতে বড় উত্তেজনা থাকে গাঁ-গঞ্জে।দিনে দুপুরেও সারা গাঁ, কারো ভুলে পুড়ে লাল হয়ে যায়। কিন্তু ওই আগুন ভুলের আগুন নয়। চলতি ভাষায় এই আগুনের নাম সোনালি মোরগ। এর মধ্যে গ্রামীণ মানুষের শত্রুতার ব্যাপার আছে। খরার মাসগুলোর অপেক্ষা করে কিছু গ্রামীণ মানুষ ঝগড়া বিবাদ হলে মনে মনে বলে—

'থামো, খরা আসতে দাও। সোনালি মোরগ ছেড়ে দেবো ঘরের মটকায়। বাং শুনে তাগ লেগে যাবে।'[৩]

এই রকমই এক গ্রামীণ রীতির পটভূমিকায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর কাহিনীর অবতারণা করেন। তবে লেখক সিরাজের বিশেষত্ব অনুযায়ী শুধু একটি বিশেষ ঘটনা নয় বরং সেই ঘটনাগুলির ঘটার প্রেক্ষিতটাও আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে। জীবন্ত হয়ে ওঠে একটা গোটা অঞ্চল, তার প্রতিকূলতা, তার সঙ্গে এলাকার মানুষের অসম লড়াই এবং মানুষের অন্তরের অবদমিত আর এক আগুনের গল্প। তবে প্রথমে আসা যাক প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে।

প্রকৃতি নির্ভর গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনে খরার মাসগুলি এক ভয়াবহতার বার্তা নিয়ে আসে। বিশেষত রাঢ়অঞ্চেল যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টির দেখা মেলে না।সকাল বিকাল দিগন্তে এক চিলতে শুয়োপোকার মতো মেঘের আভাস টের পেলেই গাঁ সুদ্ধ মাঠে বেরিয়ে পড়ে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আবহবিদের মাপজোকের হিসেব না করে এরা মেঘের উপর মানবত্ব আরোপ করে। সেখানে কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পরোয়া না করেই যেন প্রিয়জনের কাছে আসার আর্জি জানিয়ে তারা বলে,' মেঘা রে মেঘা! নিদয় হোস নে সোনা!'[৪]

শুধু এইটুকুই নয়— সরস পৃথিবীর আশায় গ্রামের বৌ-ঝিরা এই সময়ে অমাবস্যার রাতে তাদের বাড়ির পুরুষদের ঘুম পাড়িয়ে মাঠে হাজির হয়। মেঘের পরব করে তারা। পরনের কাপড় -চোপড় খুলে নেচে নেচে খিস্তি গায় মেঘের দেবতার উদ্দেশ্যে। প্রথম

স্তব-স্তুতি, তারপর প্রেম ভালোবাসা, তারপর শরীরে শরীর যোগ করার লোভ দেখানো, শেষে মুক্ত লজ্জাহীন স্বাধীনতায় বর্ণাতীত কামকেলি।

আসলে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রায় সমস্ত পরবের সঙ্গেই উর্বরতা কেন্দ্রিক মানসিকতা মিশে থাকে। মিশে থাকে কর্ষণজনিত যৌন আকাঙ্ক্ষা-প্রাকৃতিক নিয়মে যা সত্যি, প্রাণ ধরণের ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য। গ্রামীণ অপ্সরীদের মেঘাকে প্রলুব্ধ করা আসলে প্রতীক। সৃষ্টির আদি নিয়মেরই প্রবর্তন ঘটাতে চায় তারা। আকাশ ও মাটি যেখানে একত্রিত হয়ে জন্ম দেয় নতুন সম্ভাবনার। এ বড় কঠিন সময়। তাই তুখোর নগর পুরুষও গ্রামীণ ললনাদের নির্লজ্জ কামকেলিতে চোখ বন্ধ করে, কানে আঙুল দেয়। স্বাধীনতার ওই স্রোতে তারও ভাষার সাধ্য নেই। মেঘার পরব মানে চকিত শিহরণ! বিষাদ! গ্রাম পুরুষের আত্মা হাহাকার করে ওঠে কারণ তার বৌ-ঝিরা চরম সম্মানের বদলে বৃষ্টির প্রার্থনা করছে। এই সম্মানের দাম কম নয়, হাজার বছরের নিক্তি কষে বের করে আনা এই সম্মান।

কিন্তু তবুও প্রকৃতির রাজ্যে নির্দয় মেঘের ধ্যান ভাঙে না। আর তখনই অসহায় মানুষগুলো বিডিও সাহেব, এসডিও, ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ সরকারি আমলাদের কাছে একটা বিহিতের প্রত্যাশায় হত্যে দেয়। গঙ্গার পশ্চিমপাড় এইভাবেই ধূ ধূ খরায় শুকিয়ে মরে। ন্যাড়া বাজপড়া তাল গাছের ডগায় চিল ডাকে। কুকুরের জিভ বেরিয়ে যায়। দূর বিলের তলা খুঁড়ে জল নিয়ে আসে মানুষ। চাতক পাখি গাছের ডালে ফটিক জল করে ডেকে ফেরে।

এইরকম পরিস্থিতিতে ঘরের চালে সোনালি মোরগের বাং শুধু ভয়াবহ নয় বিপদজনকও বটে। কারণ ক্ষ্যাপা হাওয়ার সঙ্গে লেলিহান অগ্নিশিখার নৃত্য মানুষের পরিশ্রম, স্বপ্ন সবকিছুকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। খালবিল শুকনো শুকনো। অভ্যাসবশত গ্রামের মানুষ বালতি নিয়ে ছুটে আসে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাতে জল থাকে না। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেই লোকের ঘরের চালের সোনালি মোরগ বাং দেয়। সেই সোনালি বাং চোখে দেখা গেলেও তার নেপথ্যে থাকা মানুষের হিংসার আগুন দেখা যায় না। তা নারী- পুরুষ ভেদ ছাড়াই প্রতিহিংসার লকলকে ফনা নিয়ে অপেক্ষায় থাকে খরার এই তিন মাসের জন্য। গ্রামীণ রীতিতে তাই কারো ঘরের চালের সোনালি মোরগ বাং দিলেই লোকেরা বলবে- এ মোরগ চেনা চেনা লাগে। এতক্ষণে পাঠক বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে, সোনালি মোরগ আসলে আগুনেরই গ্রামীণ এক রূপক।

এমনই পটভূমিতে সোনালি মোরগ বাং দিয়ে গিয়েছিল মহুলা গ্রামের ছাপোষা দুই মানুষ মোহন-পবনের ঘরে। চচ্চড় ফটফটাং বাঁশ ফাটছে, শনশন হু-হু লকলকে শিখা কালো ধোঁয়া মাথায় নাচানাচি করছে। তোলপাড় হাওয়ায় ধান পোড়ার কটু গন্ধ ভাসছে। পবনের বউকে ধরে আছে পাড়ার বৌ-ঝিরা,ধস্তাধস্তি করছে সে তার সংসারটাকে আগুনের মধ্যে থেকে তুলে আনার জন্য। দূরে দাঁড়িয়ে আছে ছোটভাই মোহনের বউ শৈল।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

কিছুদিন আগেই পাশের গাঁ কাপাসি থেকে বিয়ে হয়ে এসেছে মোহনের সংসারে। তার মুখে এক আশ্চর্য থমথমে ভাব! যেটা সুখের না দুঃখের তা বোঝা যায় না,অন্তত লেখক তা বুঝতে চাননি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর রচনার মধ্যে কখনো সরাসরি উপস্থিত হন না। বরং পরিণতিতে পৌঁছবার অনেকগুলো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে দেন এবং পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে নানা সম্ভাব্য অসম্ভবদের মধ্যে দুলতে দুলতে তিনিও প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান।

তাই শৈল সম্পর্কে কিছু জানানোর আগে সিরাজ আমাদের বলে দেন আগুনের ভয়াবহতার মধ্যে যারা সৌন্দর্য খোঁজে তারা অনেকেই কল্পনায় মোহনের বউকে পাশে শুইয়ে রাত কাবার করে দেয়। এই আগুন,তাকে ঘিরে চিৎকার, সমস্ত সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের। তাই দিশেহারা মোহন পবনে যখন সর্বস্ব শেষ হয়ে যাওয়ার শোকে হাহাকারে রত, চালে চালে শুরু হয়ে গেছে আগুন এর সঙ্গে ভয়ার্ত মানুষের লড়াই সেই সময় হঠাৎই চরণ চৌকিদারের বউ চেরা গলায় বলতে শুরু করে—

'বের করে দাও ওই কাপাসির খানকি বেবুশ্যাকে। চুল কেটে ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে বের করো গাঁ থেকে।ওরে গাঁ-মাতানি পাপ!ওরে সর্বনাশী আট- কুড়ি গতর ঢালানি ছুঁড়ি। তোর মনে এই ছিল রে?'[৫]

ভয়াবহতার মাঝেও এই চিৎকার দোষারোপে সাড়া দেওয়ার মনের অবস্থা কারো ছিল না। তবুও লোকের মনে কোথায় যেন সন্দেহ আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকে। এই আগুনে আরো ঘি ঢালে কাপাসির টগর। যে একসময় ছিল শৈলোর পানিপ্রার্থী। অভাব ছিল তার।যে অভাবের কারণে মহুলার মোহন দু-কুড়ি টাকা পন দিয়ে শৈলকে বিয়ে করে আনে। শৈলের প্রতি আকর্ষণ এবং মোহনের প্রতি আক্রোশ উভয়কে সোনালি মোরগের সঙ্গে একিভূত করতে চায় গণেশ, যার তীব্র প্রতিবাদ জানাই টগর। তার কিছুক্ষণ পরে তাকে আমরা দেখতে পাই অন্যভাবে। দাউ দাউ বিশাল আগুনের সামনে উঁচুতে একটা মূর্তি। কালো বলিষ্ঠ শরীর,গলায় রুপোর শক্তি, ঝাকরমাকর চুল আকাশে নাড়া দিয়ে জোরালো দুই বাহুর চাপে উপরে তুলছে বাঁশের কাঠামো। পটপট করে বাবুই দড়ির গিট ছিড়ছে।আগুনের ছটায় রাতের আকাশের পটে ওই মূর্তি দেখে অবাক লাগে।বিপদের বিশালতায় সে এক আদিম সৌন্দর্য- যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বীরপূজার মাহাত্ম্য এবং যৌনতা। তাই বারোয়ারি বটতলায় দাঁড়িয়ে শৈলও নির্নিমেষ চক্ষে পান করছিল সেই সৌন্দর্য।

যদিও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কাহিনী শুরু থেকে শৈলের আসক্তিকে এত সহজ ভাবে প্রকাশ করেননি, কারণ এর অন্তরেই ছিল আগুনের আসল ফুল্কি। তাই রাতের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া মহুলার মানুষের কাছে সকাল আসে বিষন্ন সর্বহারা এক মানুষরূপে।যে মাটিতে তিরিশ ঘর মানুষের সুখের দিনরাতগুলো কেটে যেত সেখানে আর কিছু নেই।

অলস চৌকিদার শহরে পা বাড়িয়েছে রিলিফের আশায়। এ গাঁয়ে জমিজমা তেমন বিশেষ কারোর নেই। বেশিরভাগ খেত মজুর আর ভাগচাষী। বে-মরশুমে পুরুষগুলো বিলে জলায় যায় শামুক গুগলি ধরতে। মেয়েরা হয় মাঠকুড়োনী। তবুও এই জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, যা এক রাতে পুড়ে সব শেষ হয়ে গেল।

তাই সকালে বারোয়ারি সভা বসেছিল মহুলায়।সোনালী মোরগের বাং -এর রহস্যভেদ করার জন্য।যে রহস্যভেদের সূত্র শেষ পর্যন্ত এসে থামে শৈলের চৌকাঠে। কেননা পবন-মোহন দুজন নির্বিবাদী মানুষ, পবনের বউ পাড়া-কুঁদুলী হলেও এইবার সে কিছু করেনি। বাকি ছিল শৈল; বিশেষত চরণ চৌকিদারের বউ তাকে অন্ধকার রাতে গ্রামের মাঠে পরপুরুষের সঙ্গে দেখেছে—এ সংবাদ তাকে কোন ঠাসা করে। এতক্ষন লোক-লজ্জার ভয়ে চুপ শৈল স্বীকার করেছে এই লজ্জার কথা এবং অপরাধীর নাম বলেছে টগর বা টগরা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে,আধুনিক জীবনযাত্রা গ্রামবাংলায় কিছু কিছু পরিবর্তন আনলেও কোন কোন জায়গায় আজও আদিম কৌম সমাজের নিয়ম চলে। যার মধ্যে একটি হল সম্মান ঘঠিত কোনো প্রশ্ন, নারী মিথ্যা কথা বলতে পারে না। তাই অসহায় শৈল যখন শিকার করে আগের রাতের কাহিনী তখন তার স্বীকারোক্তিতে গ্রাম সমাজ কোন দ্বিধা রাখেনি; বরং শৈলের বক্তব্য—

‘কাপাসির টগর কালকে মাঠে আমার হাত ধরেছিল। আমি উকে নাথি মেরেছিলাম।ওর রাগ হয়েছিল। শসালো। বললে, জ্বলে পুড়ে মরবি।’[৬]

সমস্ত মহুলার স্তব্ধতা ভেঙে খান খান করেছিল।মুহূর্তে আগের রাতে টগরার সাহসিকতার কাহিনী ধূলিসাৎ হয়ে যায় মানুষগুলোর কাছে। কারণ কৌম সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, নিজের সম্মানকেন্দ্রিক কোন ঘটনায় নারী মিথ্যাচার করতে পারে না। মহুলার মানুষদের দল যাত্রা করে কাপাসির দিকে। তখন শৈলর বাপের কথায় বিতণ্ডার অবসান ঘটে। কারণ যুধিষ্ঠিরের কথা থেকে জানা যায়, শৈলর বিয়ের আগে টগর তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সহজ সমীকরণে মহুলাবাসী এবং কাপাসিবাসী, গ্রামীণ মানুষগুলোর বুঝতে অসুবিধা হয় না দোষী কে? গল্পের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাঠকেরাও মোটামুটি ভাবে যেন একটা সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হই। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প মানেই এমন এক সত্যের সম্মুখীন হওয়া যা প্রচলিত সমস্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। তাই যখন মহুলা ও কাপাসির মানুষেরা টগরকে ধরার জন্য মুখিয়ে থাকে তখনই আমরা তাকে দেখতে পাই বিলবাগে। খরার মরশুমে সে শামুক-গুগলি ধরতে গেছে সেখানে। গণেশ তাকে পালাবার কথা বলতে গেলে সে হাহাকার করে বলে উঠেছে—

‘শৈল আমাকে বুলেছিল -আমাকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাও। ভিনগাঁয়ে চলো। আমি বুললাম, তা হয় না। তুমি পরের বউ. গভীর দুঃখে অভিমানে নদের চাঁদের ছেলে হাঁসফাঁস





করে এসব কথা বলে। আরও বলে শৈল তখন শাসাল,বুঝলি গনশা? বুললে তুমাকে জ্বালাব পোড়াব,দগ্ধে মারব।’[৭]

বাস্তবিকই শৈল তাকে দগ্ধে মারল। মোহনের সঙ্গে বিবাহিত জীবনে শৈলর কাম তৃপ্তি হয়নি। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের মতো চেহারার জোয়ান যুবক পুরুষ টগরের মধ্যে দিয়ে সে যৌন চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সামাজিক বাধা,আর্থিক অনটন, খরা, অনাহারে আক্রান্ত টগর, এ কাজে সায় দিতে পারেনি। সে প্রত্যাখ্যান করেছিল শৈলর আহ্বানকে। সে প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে পারিনি শৈল। নিজের অন্তরে জ্বলতে থাকা প্রাগৈতিহাসিক আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে চেয়েছে টগরকে। এ এক ভয়াবহ প্রতিহিংসা, যেখানে কামনা এবং ধ্বংস একই সঙ্গে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত এই লেলিহান শিখায় শৈল তার পৈত্রিক ভিটাতেও অগ্নিসংযোগ করতে দ্বিধা করেনি। পরিনামে টগরের মাথা দাবি করেছে এলাকার লোকে। কিন্তু শৈলর কোন বিকার নেই-অতৃপ্ত যৌন চাহিদা, প্রতিহিংসা, প্রত্যাখ্যানের জ্বালা, তার চোখে তখন সোনালি মোরগ রূপে ক্ষ্যাপা নৃত্য করছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতেই হয় যে, এই কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত নারী সম্পর্কিত ধারণার বিরোধিতা করেছে। নারীদের সামাজিক শিষ্টাচারে গণ্ডিবদ্ধ করে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অন্তত দেখতে চাননি। কারণ তাঁর কাছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষই প্রকৃতির সন্তান, তাই তাদের কামনা-বাসনাও অনেক বেশি জৈবিক, প্রাকৃতিক। মানুষের সামাজিকসত্তা সেই জৈবিক সত্তার উপর সভ্যতার আস্তরণ চাপায়। কিন্তু সে আস্তরণের নিচের মানুষটি তো একান্তভাবে জৈবিক; আর সেই জৈবসত্তায় আঘাত মানুষকে উন্মত্ত করে তোলে। আসলে কাম মানুষের জীবনে যেমন পরিতৃপ্তি নিয়ে আসে তেমনি অচরিতার্থ বাসনা তার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। এই প্রতিহিংসা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান। কোথাও তার প্রকাশ অবদমিত, কোথাও তার প্রকাশ ভয়ংকর।

**তথ্যসূত্র :**


১। “সাক্ষাৎকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ”, অরুণ চক্রবর্তী গৃহীত, বিনির্মাণ ১২ ( জানুয়ারি ২০১৩),পৃ.৭
২। “সোনালি মোরগের গল্প”,/ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ/৫০টি গল্প,দে’জ, কলকাতা,পৃ.১৮৫
৩। তদেব,পৃ.১৮৬
৪। তদেব,পৃ.১৮৮
৫। তদেব,পৃ.১৮৮
৬। তদেব,পৃ.১৯০
৭। তদেব,পৃ.১৯৩

# সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নির্বাচিত ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা

মোহ : নূরুল আমিন

প্রত্যেক মানুষ জন্মসূত্রেই একটি সমাজের মধ্যে এসে পড়ে। সে সমাজ ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন। সেখানেই সে বড় হয়ে ওঠে। সে সমাজ কিন্তু সে নির্বাচন করতে পারছে না। তার চেতনার জাগরণের সঙ্গে তার নিজস্ব সমাজ বাস্তবতা তাঁর মনের মধ্যে মিশে যায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্পে মানুষকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখে ও বুঝে নেবার গাঢ় উপলব্ধি আছে। সেই উপলব্ধির অন্যতম অবলম্বন মানুষ আর মানুষকে ঘিরে থাকা সমাজ। সমাজের কোন এক শ্রেণি নয়, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের রূপায়ণ তাঁর গল্পে আমরা দেখতে পাই। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের নানা রূপ দেখেছেন তিনি; দেখেছেন তার লোভ, বাসনা, হিংস্রতা - আবার তারই মধ্যে মানবিকতার আশ্চর্য প্রকাশ।

নাগরিক মানুষ এবং নাগরিক সমাজের কথা আছে তাঁর গল্পে তবুও গ্রামের মানুষের, নগ র- প্রান্তিক মফস্সলের মানুষের বৃত্তান্ত রচনাতেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য। রাঢ় বাংলার সীমান্তবর্তী এক বিশেষ অংশের গ্রামীণ প্রকৃতি আর নরনারীর জীবন বাস্তব হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। সেই এলাকার মানুষের মধ্যে গ্রামীণ জোত জমি ওয়ালা মানুষ, বড়লোক ও মাঝারি ব্যবসায়ী থেকে সর্বস্বান্ত ভিক্ষাজীবী পর্যন্ত সকলেই আছে। আছে নিরন্ন মানুষ এবং গণিকাদেরও বিবরণ তাঁর লেখনীতে শ্রেণি- সংঘর্ষ, শক্তিমানের শোষণ —পীড়ন, বলহীনের অসহায়তা সবই স্থান পেয়ে যায়। এলাকার মানুষগুলি চোরা চালান করা হয়ে উঠেছে জীবন বাঁচাবার অঙ্গ। আইন এখানে চলে না। সাধারণ মানুষ পায় না শ্রমের মূল্য। যেন বেঁচে থাকায় এখানে অধিকাংশ মানুষের কাছে একমাত্র সত্য। সভ্যতা এখানে অনেক সময় আদিম স্বভাবের কাছে পরাজিত। সভ্য সমাজের নিয়ম -নীতি এখানে অর্থহীন হয়ে যায়। নির্দিষ্ট মানুষের নিয়ম দিয়ে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না - এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং সাহিত্যে তাকেই রূপ দিয়েছেন।

রূপ দিয়েছেন বিবিধ শ্রেণির মানুষের ব্যক্তি-জীবন, পরিবার জীবন, তাদের প্রেম — দাম্পত্য, প্রেমহীনতা, লোভ-লালসা, সরলতা, কোমলতা, সহানুভূতিশীলতা। ভন্ডামি, শঠতা, ধর্মীয় জীবন, আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি। শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শ্রেণিশোষণ স্বভাবতই রূপায়িত হয় কিন্তু শ্রেণি সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ছক অনুযায়ী কোন বক্তব্য, কখনই প্রতিষ্ঠিত করতে যান না সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। কোনো কল্পিত আদর্শ দিয়ে জীবনের উদ্দামতা কে কখন ও মাপা যায় না-এ সত্য তিনি আকৈশোর অনুভব করেছেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী লেখক। তাঁর লেখা সমাজ বাস্তবতার উপর যে গল্পগুলি পাই ‘মাটি; ‘বৃষ্টি রাতের আগন্তক’, ‘হেবজু, নারাং বাবু ও মাকড়া ডোমের বৃত্তান্ত’, গোঘ্ন’, ‘চোর পুলিশ এবং ভালোবাসা’ ‘কাঁটা’, ‘পুষ্প বনে হত্যাকান্ড’, ‘দিও জেনিসের মৃত্যু’, ‘





বৃষ্টিতে দাবানল’, ‘কবির বাগানে’, ‘পদ্ম বনে মত্ত হাতি’, ‘কালুহাটির বৃত্তান্ত’, ‘রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত’, ‘প্রহরী’, ‘জামাইবাবু’, ‘নটবর বাবুর গল্প ‘, ‘হিজল কন্যা’, ‘হিজল বিলের রাখালের’, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সমাজ বাস্তবতার ছবি আরও অসংখ্য গল্পে আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি গল্প আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

সামাজিক বাস্তবতার বিভিন্ন দিকআছে। প্রধান একটি দিকহল শোষণ। বিশ্ব সভ্যতায় আবহমান কাল থেকে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষমতাবান সে তার চেয়ে যে দুর্বলতর তার প্রতি অত্যাচার করে। মানব সমাজ শ্রেণিবিভক্ত, অতএব মানব সমাজের এই কাঠমো আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। এই সমাজের পরিবর্তনের কথাই কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) তাঁর’ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ‘তে বলেছিলেন ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে। সেই আদর্শের অনুসরণে কোথাও কোথাও শ্রেণি বৈষম্য হীন’ সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও কিছুকালের জন্য হয়েছিল। অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র তার উদাহরণ। কিন্তু এই ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারে নি তার কারণ মানুষের মস্তিষ্ক।মানুষের মস্তিষ্কের গঠনে যে সব উপাদান আছে তার অন্যতম হলো আধিপত্যবাদ। এই আধিপত্যবাদ মানুষকে তার সমস্ত কাজেই পরিচালিত করে -জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। এই আধিপত্যবাদ সমাজ বাস্তবতার অন্যতম এক লক্ষণ। প্রতিটি পরিবারে ও আধিপত্যবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায় কারণ পরিবার সমাজেরই একক। বাস্তব জীবনের যে কোনো গল্পে এই আধিপত্যবাদ লক্ষ করা যাবে।

সামাজিক বাস্তবতার প্রধান একটি দিক হল দারিদ্র। দারিদ্র মানুষের নিরন্তর জীবন সংগ্রাম। সেখানেও পরোক্ষে শ্রেণির শোষণের সত্য বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্বেও জন্মগত দারিদ্রই লেখকের গল্পে বাস্তবের সেই চিত্রকে তুলে ধরে। ভারতের মতো দরিদ্র দেশে বাস্তবের এই চিত্র প্রথম উঠে আসতে শুরু করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে কল্লোল কালি কলম ইত্যাদি পত্রিকার লেখকদের কলমে। লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এবং ঈষৎ পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’ এবং ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্প এই সময় লেখা। বাংলা ছোটগল্পে এই দরিদ্র জীবনের অসাধারণ সব আখ্যান রচিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জগদীশ গুপ্তের লেখায়। এবং তাদেরই উত্তরসুরি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখাতে। দৃষ্টান্ত ‘মাটি’ গল্পটি।

গ্রামের সাধারণ নিঃস্ব মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন লেখক আলোচ্য গল্পে। ব্যক্তি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চরিতার্থতার জন্য মানুষ প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে তা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়- মুস্তাফা সিরাজ তেমন গল্প অনেক লিখেছেন। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে লেখক কতটা অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন

তা দেখা যায় এই গল্পটিতে। ফৈজু নামে এক দরিদ্র গ্রাম যুবক যার জমিজমা কিছুই নেই। পঞ্চায়েত প্রধান মোতাই মিঞা ফৈজুকে খানিকটা ভেস্টেড ল্যান্ড করে দিয়েছিলেন ফৈজু চাষ-আবাদ করে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিল। সমবায় সমিতি থেকে লোনের মাধ্যমে সার বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ধান চাষ করেছিল। ইতিমধ্যে এক বোবা কালা মেয়ের সঙ্গে ফৈজুর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয় প্রতিবেশী এক বুড়ি। কার্তিক মাসে জমিতে নতুন ধানের শিস দেখে ফৈজু খুব খুশি। আরও খুশি হয়েছিল ফৈজু বাপ হতে চলেছে এই খবরে।

অগ্রহায়ণ মাসে জমির পাকা ধান কাটতে গিয়ে ফৈজু ও তার স্ত্রী মাঠে দেখে তাদের জমিতে একটিও শিস নেই। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে শুরু করে ফৈজুর। বোবা মেয়েটি ইশারা ইঙ্গিতে ফৈজুকে সান্তনা দেয়। পঞ্চায়েত- থানা- পুলিশ করেও কিছু সুফল পেলো না ফৈজু। জমির মালিক কানুহরি অর্থবলে পুনরায় জমি পুনরুদ্ধার করে। আর ফৈজু আবারো চাষ করতে গেলে মার খেয়ে বাড়ি ফেরে। সব ভুলে গিয়ে ফৈজু নতুন করে সংসারে মন দেয়। বাড়ি আলো করে নবজাতক এলো ফৈজুর মন খুশিতে ভরে ওঠে। তাই সে নতুন উদ্যোগে কোমর বাঁধে বাঁচার জন্য।

ছেলের জন্য বাঁচতে চায়। নতুন করে রোজগারের উপায় খোঁজে। দূর শহরে যায় উপার্জনের জন্য। পয়সা উপার্জন করে দীর্ঘদিন পরে ঘরে ফেরে। বাড়ি ফিরে দেখে ঘর শূন্য। বুকের মধ্যে জ্বলে ওঠে আগুন। প্রতিবেশী সেই বুড়ি খবর দেয় অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় তার সন্তান মারা যায়। আর বোবা কালা বউটি বাপের বাড়ি চলে যায়। ফৈজু চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

গল্পটিতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ একজন ভাগ্য বিড়ম্বিত সাধারণ মানুষের ছবি তুলে ধরেছেন। সেই সময়ের সেই এলাকার বাস্তব ছবি। এখানেও আমরা দেখলাম সেই আধিপত্যবাদের চিত্র। পুলিশ এবং জমি -মালিকের আচরনে তার প্রকাশ। যদিও গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয় হলো দারিদ্র্যের যন্ত্রণা।

মানব- সমাজে আধিপত্য বাদের এক আদিম দৃষ্টান্ত হলো নারীর প্রতি পুরুষের প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস। এই মানসিকতার মূল কারণ কিন্তু সভ্যতার আদি যুগের সমাজ কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। আদিম কৌম সমাজ ছিল আণ্যরক। সেখানে মানুষকে শিকার করে এবং ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন যাপন করতে হত। সেখানে গোষ্ঠীর লোকবল ছিল অন্যতম সহায়। লোক বেশি হলে শিকারের সুবিধা, খাদ্য-সংগ্রহেরও সুবিধা। কৃষিভিত্তিক সভ্যতা কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজন লোকবলের। জমি - মালিকের অনেক লোক না থাকলে একা একা কৃষিকার্য হয় না। এছাড়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও জীবনের অঙ্গ। যুদ্ধ করবার জন্য লোকবলের প্রয়োজন। সমাজের জনবৃদ্ধির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদিত হয়। কাজেই গোষ্ঠী — পতি এবং পরিবারের প্রভু প্রত্যেকেরই প্রয়োজন হয়েছিল নারীর



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

গর্ভের প্রতি অধিকার স্থাপন করা। এ কারণেই একজন পুরুষ বহু নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারত বিবাহ সূত্রে অথবা বিবাহ বহির্ভূত ভাবে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা এবং দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও সমাজ অনুমোদিত ছিল। নারীর অনিচ্ছা সেখানে কার্যকর হত না কারণ শারীরিক ভাবে নারী পুরুষের তুলনায় সাধারণত দুর্বল। এ জন্যই নারীর প্রতি আধিপত্য স্থাপন করা এবং নারীর প্রতি যৌন কামনাকে সংযত না রাখার অভ্যেস পুরুষতান্ত্রিক সমাজে খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নারী- পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদের সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে লেখা হয়েছে। 'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' গল্প।

'অঘ্রাণে অন্নের ঘ্রাণ' গল্পটির বিষয় হয়েছে অর্থবান মানুষ কতৃক এক অন্ত্যজ নারীর উপর বলাৎকারের কাহিনী। পিতৃহীন মেয়ে চিরুণী নবান্ন খেতে মাসির বাড়ি ধামালি তলাতে যাচ্ছিল মোড়ল ধনহরির সঙ্গে। গরু হারিয়েছে তাই গরুর খোঁজে গুনিনের বাড়ি ধামালি তলায় যাচ্ছিল ধনহরি মোড়ল। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সদ্য যৌবনা চিরণীর প্রতি কামনায় উন্মত্ত হয় ধনহরি। চিরুণীকে গুড় মুড়ি খেতে দেওয়ার মূল্যে মোড়ল চিরণীর সারা দেহে হাতের খেলা নেন। এরপর উদ্যত হন চিরুণীর সতীত্ব খুলবে নিতে। এবার চিরুণী বাধা দিতে থাকে। সে বাধা না মেনে জোর করতে থাকেন ধনহরি মোড়ল। আর সেই সময় অসহায় চিরণীকে রক্ষা করে মাঠের এক ঘাস কাটা মুনিষ। কিন্তু সবকিছু দূরে ঠেলে চিরুণ ধামালিতলায় ছোটে নবান্ন খাওয়ার বাসনা বুকে নিয়ে।

গল্পটিতে দেখা যাচ্ছে সমাজে অর্থবান মানুষ অর্থ ও অন্নের জোরে অন্ত্যজ তথা নিম্নবিত্ত মানুষের উপর কিভাবে অন্যায় অচরণ করতে পারে। নিম্নবিত্ত মানুষ সেখানে নিতান্ত অসহায়। শুধু পেটে দু -মুঠো খাওয়ার জন্য তারা নিজেদের দেহকেও সঁপে দেয়। লাঞ্চিত ও অপমাণিত হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

অবশ্য এই গল্পে লেখক পুরুষের স্নেহ ও সহৃদয়তারও স্বাক্ষর রেখেছেন- সেই মুনিষের চরিত্রে। সে পুরুষ হলেও ধনী নয়, চিরণীরই শ্রেণিভিত্তিক মানুষ। তাই টাকার জোরে আধিপত্য প্রদর্শন তার অভ্যাস হয় নি। কিশোরী চিরণীকে সে কন্যাস্নেহে গ্রহণ করেছে। মানব স্বভাবের একটি শুভময় দিক এখানে লেখক দেখিয়েছেন।

গল্পটিতে সামাজিক আধিপত্যবাদের আরও একটি দিক লক্ষণীয়। এই দিকটির বিশেষ ভাবে ভারতীয় সমাজে এবং তার মধ্যেও হিন্দু সমাজে লক্ষণীয়। হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রমে বিভাজিত। সেখানে শূদ্র এবং নিম্নবর্গের মানুষ উচ্চ বর্গের দ্বারা অত্যাচারিত হবে এই বিধি ছিল শাস্ত্র সম্মত। এই গল্পটিতে সেই সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। অন্তজ্য শ্রেণির পরে উচ্চবর্ণের চিরশালীন আধিপত্যবাদ এখানে চিত্রিত হয়েছে

বিভিন্ন ধরনের সংস্কার, অলৌকিকতায় আস্থা সামাজিক বাস্তবতার অন্যতম দিক। বিশেষভাবে স্বল্প শিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে এই ধরনের সংস্কার বেশি। কিন্তু শিক্ষিত

নাগরিকরাও এই অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত নয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের এই ধরনের সংস্কারান্ধ মানুষের একাধিক চিত্র আছে। লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরের নিকটবর্তী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি ছিল বর্ধিষ্ণু। সেই খোসবাসাবুর গ্রামে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার যথেষ্ট আছে যেমন তেমনি লোকজন একেবারে সংস্কার মুক্তও ছিল না। গ্রামটি একেবারে যাকে বলে এঁদো গ্রাম তা নয়। আর ও বলতে পারি, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পরিবারে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির চর্চা বহুল পরিমাণে ছিল। তাই একদিকে গ্রামীণ শিক্ষিত উদার সংস্কৃতি- সম্পন্ন এবং সভ্রান্ত পরিবারের ছাপ যেমন তাঁর গল্পে আছে তেমনি আছে সাধারণ পরিবারের কথা, আছে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের কথা। 'গাছটি বলেছিল' গল্পটিতে এই ছবি আমরা দেখতে পাই -তা আলোচনা সাপেক্ষ।

গল্পটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আধুনিক জীবন- জিজ্ঞাসার অন্যতম উদাহরণ। লেখক গ্রাম জীবনের বিশ্বাস- সংস্কার গ্রামীন মানুষের আচার- বিচারকে সর্বদাই মান্যতা দিয়েছেন, যদিও তিনি অন্ধ আনুগত্য করেন নি। এক গ্রামীণ অন্ধর সংস্কারকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এবং তার শেষ পরিমান এই গল্পে দেখিয়েছেন।

গ্রামের নো - ম্যানস ল্যান্ডের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে একটি গাছ দাঁড়িয়েছিল। কোনও দিন কোনও ফুল না হওয়ার জন্য গ্রামের মানুষেরা তার নাম দিয়েছেন বৃহন্নলা। লেখকের ভাষায়, "সারা শরীরে চন্দ্রচূর্ণ মেখে উজ্জ্বল সে রহস্যময় সৌন্দর্য্য। নর নও, নারীও নও তুমি কি বৃহন্নলা অর্জুন"। কোনও দিন এই গাছটির প্রতি নজর দেয় নি কেউ। কিন্তু হঠাৎ-ই এক বিশেষ মুহূর্তেএই গাছটি হয়ে উঠল সমগ্র গ্রামবাসীর কেন্দ্রবিন্দু। তার মর্মর ধ্বনিতে মানব -জগতের ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটল, আর সে বলে উঠল,'র্মর্মর্ম'। আর আশচর্য্য সব ঘটনা ঘটতে লাগল। সকাল বেলা পাতাকুড়ানি বুড়ি বাড়ি ফিরে এসে জুটেছিল গাছ তলায় পাতা কুড়োতে। আর হঠাৎ-ই বাতাসের ভাষায় ভর করে গাছটা বলে উঠেছিল 'র্মর্মর্ম'। আর অমনি পাতাকুড়নি বুড়ি বাড়ি ফিরে এসে বউ এর হাতে জল খেতে চেয়ে মরে গিয়েছিল। গ্রামের আর সবাই বিষয়টিকে মেনে নিলেও গ্রামের গাঁজাখোর বৃদ্ধ নেলো চক্কোতি বিষয়টি মানতে চান নি। তার চির অবিশ্বাসী চোখে গাছটিকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বুড়ির ফেলে যাওয়া ঝুড়িটিকে যথেষ্ট লাথি মেরেছিলেন তিনি। বুড়ির ফেলে যাওয়া খ্যাংরা ঝাঁটা দিয়ে এই গাছটিকে এলোপাথাড়ি মারতে মারতে নিজের চিরকেলে বদ্ধ বিশ্বাসটিকে জোরালো করেছিলেন তিনি, যা বুড়ির মৃত্যুর আকস্মিকতায় ধাক্কা খেয়েছিল প্রবলভাবে। প্রতি মুহূর্তে তিনি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিলেন গাছটিকে। আর তখনই মাঠের দিকথেকে বাতাস ঘনিয়ে এল- চারপাশের বৃক্ষ গুলোর আলোড়নের মধ্য দিয়ে গাছটা বলে উঠল- 'র্মর্মর্ম'। সারা জীবন অবিশ্বাসী নাস্তিক গাঁজাখোর বুড়ো এই আকস্মিকতায় চমকে উঠেছিলেন গাছটিকে শেষবার চ্যালেঞ্জের সাক্ষাৎ প্রবল জোরে লাথি



ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VIII, Issue : XVII

মারতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটল। লোকেরা পরে আবিষ্কার করল তাঁর মুখের কষায় চাপ চাপ রক্ত লেগে রয়েছে আর সারা শরীরে আছে ঘোরতর অবিশ্বাসের ছাপ।

আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক এই ঘটনাগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখা দিলেও গ্রামের মানুষ মেনে নিতে পারে না। তাই পুলিশ তদন্তে এলে গ্রামের প্রাচীন মানুষ বলেছে ,এই গাছ আরও রক্ত খাবে। গাছটির কাছে জড়ো হওয়া জনসমষ্টি থেকে উঠে আসছিল বিভিন্ন দাবি।যার প্রতিবাদে লাঠি উঁচিয়ে পুলিশকর্তা তেড়ে যেতেই সহসা মাঠের দিক থেকে বাতাস বয়ে এল, পান্ডুর মুখে আইন -রক্ষক ফিরে গেলেন নিজের ডেরায়। নার্সিংহোমে বুকে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হলেন আইন রক্ষক। মারা গেলেন।

আর একটি মৃত্যু ঘটেছিল ডাক্তার অসীমের। শহর থেকে গ্রামে এসেছিলেন ডাক্তারি করতে। প্রতি মুহূর্তে ডাক্তারের মনে পড়ত তার প্রেমিকার কথা। একদিকে গ্রামীণ জীবনের প্রতি প্রেমিকার তীব্র অনাসক্তি ,অন্যদিকে ডাক্তারের চাকরি বাধ্য-বাধকতা দুজনের সম্পর্কের মধ্যে বাড়তে থাকা অবিশ্বাস ক্রমাগত হতাশা গ্রস্ত করেছিল ডাক্তারকে। তাই প্রচন্ড বেদনাবিধুর এক রাতে খানিকটা নিজের ভাগ্য যাচাই -এর ভঙ্গিতেই লেখকের সঙ্গী করে। হঠাৎ-ই তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন বৃহন্নলার কাছে। মৃত্যুর চিন্তায় জর্জরিত ডাক্তারও প্রকৃতির কাছেই তার জীবনের উত্তর খুঁজতে গিয়েছিলেন আর বৃহন্নলা শুনিয়ে ছিল তার মর্মর ধ্বনি। মানুষের ভাষার অনুপ্রবেশে যা হয়েছে- 'র্মর্মর্ম'। পরের দিন ডাক্তার অসীম বোসের মৃত্যুর খবরে গ্রামে হইঁচই পড়ে যায়।

গল্পে পর পর যে সমস্ত মৃত্যু ঘটেছে তার প্রতিটি ঘটনায় ডাক্তারের মত অনুযায়ী তা কোন অলৌকিক ক্রিয়ার অনুসরণ নয়, বরং প্রায় সবটাই ইহ জগৎ কেন্দ্রিক। কোনোটা হার্ট অ্যাটাক, কোনটা ক্ষয়, রোগ, কোনটা আত্মহত্যার ঘটনা, কিন্তু গ্রামীণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষজন প্রত্যেকটি মৃত্যুকে সংস্কার বলে তীব্রভাবে বিশ্বাস করে। আলোচ্য গল্পে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কিন্তু সংস্কার বিশ্বাস করেন না। তাই সংস্কারের পাশাপাশি মৃত্যুর আসল রহস্য কি তা জানিয়েছেন স্কুল শিক্ষক মঞ্জর হোসেনের মাধ্যমে। মঞ্জর হোসেন আজকের দিনের যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর মতে গাছের জৈবিক সত্তা স্রেফ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের ঘটনা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ জানতেন এবং মানতেন যে, এই সমাস্ত তথাকথিত অলৌকিকত্বের পেছনে লোকিক জগতের কারণ বিদ্যমান। গল্পের শেষ পর্যায়ে দেখতে পাই সেখানে আরও কতগুলি মৃত্যু ঘটেছিল- বোমা বারুদের আঘাতে। অন্ধ বিশ্বাস এবং তাকে কেন্দ্র করে এর রটনা কে আশ্রয় করে স্বার্থন্বেষী মানুষ এই মৃত্যুগুলি ঘটিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজন মনে করেন মৃত্যুগুলির পেছনে বৃহন্নলার ক্ষোভই ছিল মূল কারণ।

গ্রামের মানুষের সংস্কার কি ধরনের হতে পারে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তা দেখাতে

চেয়েছেন আলোচ্য গল্পে। যা সমাজ-বাস্তবতার প্রকট উদাহরণ। তৎকালীন সমাজে মানুষের সংস্কার কিভাবে বাস্তব রূপ পেয়েছিল তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন লেখক তুলে ধরেছেন।

**তথ্যসূত্র :**

১) তরুণ মুখোপাধ্যায় কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, করুণা প্রকাশনী কলকাতা -৯, ২০১৩,

২) সৈয়দ খালেদ নোমান :সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ :স্মরণে,চিন্তনে, সম্পাদক -তরুণ মুখোপাধ্যায় মেইন স্ট্রিম, পাবলিকেশন, জগদীশ নাথ রাই লেন-কলকাতা ৬, ১৪২২,

৩) ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী: ছোটগল্পের বিষয়—আশয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-২০০৪,

৪) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, সমকালের জিয়নকাঠি, সম্পাদক- নাজিবুল ইসলাম মন্ডল, কলকাতা-২০১৩,

৫) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের-ছোটগল্প মানবজীবনের বহুমাত্রিক আখ্যান -পৌলমী রায়- বুকস স্পেস।



# সমরেশ বসুর ছোট গল্প : এক জীবনবাদী প্রত্যয়ের সুর

**দিলরুবা খাতুন**

দীর্ঘ সংগ্রামের পর১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয়। তবে স্বাধীনতা নিয়ে মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্ন পূরণের চেয়ে স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশা অনেক বেশি দেখা দিল। স্বাধীনতা এলো, তবে তা দেশ মাতৃকাকে খন্ডিত করে। আগমনের বিপর্যস্ত দেশ সংগ্রামের পর১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয়। তবে স্বাধীনতা নিয়ে মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্ন পূরণের চেয়ে স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশা অনেক বেশি দেখা দিল। এক অস্থির ও চঞ্চল সময়। দাঙ্গা অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সমাজ জীবনের অধোগতি , পুরোনো মূল্যবোধের অবসানে বাঙালির যেন জন্মান্তর হল। সাহিত্যিক আর আকাশে ডানা মেলে উঠতে পারলেন না, কিংবা প্রেমের অভিযানে সামিল হতে পারলেন না। এই অস্থির সময় তাঁর সমস্ত বিক্ষোভ, সুতীক্ষ্ণ জীবন জিজ্ঞাসার সাক্ষ্য রেখেছে এই পর্বের ছোটগল্পে। কথাশিল্পী কান পাতলেন মানুষের ক্ষুধা, আর্তনাদে। কলমে উঠে এল প্রতিবাদের ভাষা।

তবে এই গ্লানিময়পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ও অনেক শিল্পী মানবতার, জীবনের জয়গান করেছেন। সমরেশ বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তথাকথিত ভদ্রলোক না হওয়া, ব্রাত্য সমাজের চরিত্রগুলোকে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে এঁকেছেন। নিজে এক সময় চট কলে কাজ করতেন, হকারি করতেন। শ্রমিক জীবনে সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে তাদের ভাষা সহ তাদেরকে অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। বিস্তৃত সৃষ্টির পরিসর থেকে কিছু সৃষ্টির ফসল তুলে আলোচনা করলে আমরা সমরেশ বসুর জীবনবাদী প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচিত হব।

"আলোর বৃত্ত" গল্পে দেখি নায়ক দরিদ্র নমঃশূদ্র কেদার। তার বয়স ২৬, নায়িকা তার স্ত্রী টগর, বয়স কুড়ি। কেদারের সঙ্গে টগরের যখন বিবাহ হয় তখন তার বয়স সাত। তারা উদ্বাস্তু, বস্তিবাসি কেদারের হাতে কোন কাজ নেই, সরকারী ডোল বন্ধ। সে অনেক রকম কাজের চেষ্টা করেও পায়নি। কখনো ঝাঁটা মুখে কখনো মাল খালাসের কুলি। কিন্তু তাতে পেট চলে না। মানুষ পরিচয়টাই যেন ভুলতে বসেছে সে।

তাই কেদারের বুদ্ধিতেই সন্ধ্যাবেলায় সেজেগুজে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে বস্তি ছেড়ে বেরোলো টগর। "শুধু টোপ দেখিয়ে মাছ ধরা" পথ দেখিয়া এগিয়ে নিয়ে যেত বিষ্টু আর রতন। তারা দূরে দূরে থাকতো। ফুর্তি নিতে কোন মানুষ এলে তারা টগরকে সচেতন করে বলতোত্ত শিকার সামনে। আস্তে চলো। আরো আস্তে। একটু হাসো। বারে বারে তাকাও। অন্য দিকে তাকাবার অবসর দিও না। আরেকটু হাসো। ভয় নেই চোখ নামিও না। দাঁড়াও দাঁড়িয়ে পড়।'

—এরপরে জালের মধ্যে ধরা পড়তো শিকার। বিষ্টু রতন এগিয়ে এসে শিকার বুঝে দরাদরি, টানাটানি। হাতের মুঠোয় ধাতু আর কাগজের মুদ্রা। ভীত সন্ত্রস্ত টগর রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে ফিরে আসত। শূন্য নিস্পলক নত দৃষ্টি, লজ্জায় সে মরে যেত। কিন্তু কেদার বলতো 'নে রাখ, এই নিয়ে আবার লজ্জা! এতে তোরই বা কি আমারই বা কি। তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।'

সেই কেদার আজ টগর কে সন্দেহ করে। সেটা টগরকে টেনে নিয়ে চলেছে রেললাইনের উপর, কসবীকে সে খুন করবে। সে পুরুষালি তর্জন গর্জন করে টগরের উপর। নষ্ট মেয়ে মানুষ ঢেমনি তকমা দেয়। টগরের চোখেও একটা হিংস্রতা জ্বলে ওঠে। সে চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে "লজ্জা করে না"। কারণ তুমি বলেছিলে এ কাজ করতে। প্রথমে যা ছিল দুজনের বোঝাপড়ার খেলা পরে তা হয়ে উঠলো মর্মান্তিক। ব্যবধান গড়ে উঠলো দুজনের মধ্যে। কেদার তাকে অসৎ কুলটা বলে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। তার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে, মুখের একপাশে কাদা। দুজনের কথা কাটাকাটির মাঝে টগরের চুলের মুঠি ধরে তাকে ঠেলে দিয়ে বলল—'চল। ওই উঁচুতে তোকে টুকরো করে রেখে যাবো।' টগর চলতে লাগলো। বিদ্যুৎ সারা আকাশটাকে একটা ফালা দিল। বায়ু কোন থেকে সারা আকাশে ঘন ঘন চমক লেগেছে। বদ্ধ বাতাস খুলে গেছে। এই প্রলয়ের অন্ধ আকাশ তলে দুটি নরনারী। আর দূরে একটি অস্পষ্ট আলোর ইশারা ও ইঞ্জিনের ঝকঝক শব্দ এগিয়ে আসছে

'চাপা গলায় কেদার বিড়বিড় করে ওঠে, তোর চিহ্ন আমি শেষ করব। লোপাট করব। আমি আর পারছি না।তোকে নিয়ে আমি আর.......'

—তখন হঠাৎ কেদারের খেয়াল হল টগর তার আগে আগে দ্রুত বেগে ছুটছে, যেখানে তীক্ষ্ণ আলোর বৃত্তটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে, ধোয়া উড়িয়ে মালগাড়ি বেগে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। কেদার চকিতে একবার থমকে দাঁড়ালো এবং মুহূর্তে তার সমস্ত অনুভূতি কাঁপিয়ে মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো "ও মরতে যাচ্ছে".......

কথাটা মনে হতেই তার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বিদ্যুতের মত চিরে দিয়ে গেল। হঠাৎ ভয়ে এবং তিরবিদ্ধ কষ্টে চিৎকার করে উঠল "টগর যাস না, টগর বড় কষ্টে" কথা শেষ হলো না কেদার ছুটলো আলোর বৃত্তের সামনে। সেই আলোর পানে যেন তীর বেগে ছুটছে টগর। ইঞ্জিনের গর্জনে একটা ক্ষুধার চিৎকার উঠছে এবং টগর তখন উচ্চারণ করছিল "বলোনা ও কথা বলোনা"

প্রাণপণ বেগে ছুটতে ছুটতে কেবল উচ্চারণ করছিল "টগর আমাকে ফেলে যাস না, টগর তোর সাত বছর......"

আলোর বৃত্তটা পার হয়ে গেল তারপরে নিকস অন্ধকারে লাইনের বাইরে সম্ভবত জড়াজড়ি করে পড়ে গেল দুজনে।





সমস্ত ক্রোধ, অবিশ্বাস ও সন্দেহের উপরে জয়ী হলো তাদের ভালোবাসা—জীবনের জয় হলো। জীবন যতই অধঃপতিত, লাঞ্ছিত হোক না কেন শেষ পর্যন্ত জীবনের জয় হবে—এই পরম আশ্বাসের বাণী দিয়ে গেলেন সমরেশ বসু এই গল্পে।

"মানুষ রতন" গল্পটি তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। কয়েকজন রিক্সাওয়ালা অর্থাৎ রং ওঠা ময়লা চাপা প্যান্ট পরিহিত পুনিয়া, শুধু দিদিমণিদের রিক্সায় তুলতে যাওয়া সোতে, হিসেবে খিস্তিভাজ তেবড়া সারাদিন নর্দমার পাশে পাতা চটের ফলের উপর পড়ে থাকা জগা সন্দেহ প্রবণ গণশা, কোমর দুলানো ধুমসি চেহারার যমুনা—এই কয়েকটি চরিত্র নিয়ে এই গল্পটি গড়ে উঠেছে। গল্পের সূচনা চরিত্র গুলির ইশারায় কথা বলা এক উত্তেজনা, এক অজানা গল্পের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তাদের পারস্পারিক নীরব কথোপকথনে চরিত্রগুলি সম্পর্কে এক বিমিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করে পাঠকের মনে 'আবার কথা চোখে চোখে। ত্যাবড়া এমন ভাবে ঘাড় কাত করে, জিভটা একপাশে বের করে ঝুলিয়ে দিলে মরা মানুষের মুখের কথা মনে হয়।........ সোতে এমন মুখ চোখ করল আর শক্ত হাতে হর্ন টিপলো যে কারোর গলা টিপছে। ঠোঁটের কোন হেসে বলল, "ভাগ শালা।"

এই প্রথম অংশটি পাঠ করার পর আমাদের বুঝতে অসুবিধা থাকে না যে এটি কোন মধ্যবিত্তের ড্রয়িং রুম-এর গল্প নয়, এটি পথের গল্প, সর্বহারাদের গল্প। গল্পটিতে প্রেম শরীর যৌনতা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি সবই আছে ,আর আছে গতানুগতিকতার মাঝে একটি দিনের বিবরণ। যেদিন তারা একটি শকুনের কাছ থেকে মৃতদেহকে কেড়ে নেয়, মানুষ শকুন হয়ে ওঠে এই মৃতদেহকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

সিনেমা ফেরত লোক আর বাজারের মাঝখানে সাজিয়ে রাখে এই দেহটিকে সৎকারের জন্য টাকা তুলে সেই টাকায় তারা আমোদ করবে, ফুর্তি করবে। দেখে বড়লোকের ছেলেমেয়েরা ফিস্টি করতে যায়, গান বাজাতে বাজাতে। যদিও প্লাটফর্মে শোয়ানো মৃত দেহটাকে ঘিরেই তাদের যাবতীয় উত্তেজনা তবুও তারই মাঝে তথাকথিত অমানুষেরা বারবার ফিরে আসে শবদেহের কাছে। ত্যাবড়া নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে মরা লোকটার দিকে। হঠাৎ খুব অবাক হয়েছে চোখের পলক পড়ছে না। তাদের একজন বিরক্ত হয়ে বলল 'কি হলো কি? যেন বাপের মুখ দেখছিস শালা'। ত্যাবড়া ঘাড় নেড়ে বলল 'আমার বাপ? এরকম ভালো মানুষ হতে হলে আমার বাপকে আবার জন্মাতে হবে।'

যমুনা মড়ার মাথার কাছে রাখা নিভে যাওয়া ধূপকাঠি যত্নে জ্বালিয়ে দেয়। এই গল্পের ভাষা, স্ল্যাং চরিত্রগুলোকে আরও জীবন্ত করে দেয়। শেষে যখন তাদের মনে হয় শ্মশানে শব দেহের আচার পালন অসম্পূর্ণ থাকছে চোখের জলের অভাবে তখন তারা যমুনাকে কাঁদবার জন্য জোর করতে থাকে—

'কাদ না কাদ, যমুনা তুই কাদ।' যমুনার মেয়ে মানুষ্যত্ব যেন নিহিত রয়েছে ওই কান্নার

মধ্যে। এই কান্নাটুকু দেখলে যেন তেবড়াদের পুরুষত্ব সম্পূর্ণতা পায়। প্রতিমুহূর্তে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব হয়। মড়া নিয়ে আমোদ করার অপরাধ বোধ তাদের অবচেতনে নিশ্চিতভাবে নিহিত থাকে বলেই তারা ওই গিল্ট বা অপরাধবোধকে লাঘব করতে চায় কান্নার মধ্যে দিয়ে। যখন অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে যমুনা তখন অদ্ভুত বদল ঘটে পুনিয়াদের মধ্যে। তারা পাঁচজনই এই মুখাগ্নি করে বৃদ্ধের এবং প্রত্যেকেই চোখের জল লুকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেত্তত্তসমস্ত ক্লেদ ধুয়ে যেতে থাকে। তারা অনুভব করে মৃতদেহ সৎকারের পয়সায় ফুর্তি করার মধ্যে কতটা গ্লানি লুকিয়ে আছে। সমাজ শ্মশানের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে তাদের এ জীবন যাপন অর্থহীন।যাদের কিছু নেই তাদের মধ্যেও এই মানবিক চেতনার উদগীরণ হয়। আত্ম দহনে তারা মানুষ রতন হয়ে ওঠে। সমস্ত গ্লানি ক্লেদ কে ছাড়িয়ে জয় হল মানবতার।

"আটাত্তর দিন পরে" গল্পটি ওয়াগেন ব্রেকার ফটিকের জীবন নিয়ে লেখা। ওয়াগেন ব্রেকার হওয়ার জন্য ফটিক নিজের জেলা থেকে বহিষ্কৃত। ফটিক কে নিজের জেলায় দেখা গেলে গ্রেফতার করা হবে। গ্রেপ্তারে বাধা দিলে গুলি করারও নির্দেশ আছে। কিন্তু সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে আটাত্তর দিনের পরের দিন পরে তার একমাত্র সহচর কার্তিকের সঙ্গে চলন্ত খালি মাল গাড়ির ওয়াগনে চেপে চলেছে নিজের জেলার অভিমুখে।

ঝনটির মানসিকতার জন্যই আজ ফটিক বিপদকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে। ঝন্টি কে সে মাতালের বিবাহ বাসর থেকে বাঁচিয়েছে, তারপর ঝনটির সঙ্গে প্রেম ও শারীরিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। কিন্তু ঝনটির প্রেমে সে এক ধরনের শীতলতা অনুভব করেছে। তাই ছুরির মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সে ঝনটিকে বলেছে

"আজ তোকে বলতেই হবে আজ শেষদিন ,অভয়কে......."

অভয় ফটিকের অসুস্থ ভাই। ফটিকের প্রতি ঝন্টির একরকম কৃতজ্ঞতা আছে, কিন্তু সেটা ভালোবাসা নয়। ফটিকের যৌন লালসা মেটানোর জন্য দেহটা সে তাকে দিয়েছে, কিন্তু মনটাকে সে উজাড় করে দিয়েছে অভয়কে। ঝনটি চায় এক সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যেটা সে ফটিকের মত আসামীর কাছে পাবে না।

ফটিক ওয়াগেন ব্রেকার হয়েছে পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। সে যেকোনোভাবে তার ভাই বিধবা মা ও বিধবা বৌদিকে বাঁচাতে চেয়েছে। সে জানে তার টাকা ছাড়া তাকে তার পরিবারের সবাই ঘৃণা করে। তা সত্ত্বেও জেলার বাইরে গিয়েও পরিবারের দায়িত্ব সে ভুলেনি—এখানেই তার মহত্ব। সে ঝন্টিকে বাঁচিয়ে তার ভালোবাসার আশ্রয়ে সে নিজে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু আশ্রয় সে পায়নি। তাই ঝনটির সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার জন্য সমস্ত আদেশ অগ্রাহ্য করে আটাত্তর দিন পরে সে নিজের জেলায় প্রবেশ করেছে। প্রেমিকাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে গিয়েও সে থমকে গিয়েছিল তার স্বীকারোক্তিতে, সে ফটিককে





ভালোবাসে না। দ্রুত সে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে এসে বন্দুকটা খালের জলে ফেলে দেয়। এখানে ফটিকের ক্রিমিনাল সত্তার উপর জয়ী হয় মনুষ্যত্ব, তার প্রেমিক সত্তা।

"এসমালগার" গল্পে একজন তের বছরের ছেলেকে দারিদ্রের টানে হতে হয়েছে স্মাগলার। এই স্মাগলার -এর নাম গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস, বয়স তেরো, অপরাধ বেআইনি চাল বহন করা(১৫ সের)। গোরাচাঁদের মুখ দিয়ে "স্মাগলার" শব্দটি বের হয় না, তাই সে নিজেকে বলে গোরাচাঁদ এসমালগার।

এই বয়সেই তাকে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে। তার পরিবারে আছে ছোট ছোট পাঁচ ভাই বোন, একটি মায়ের পেটে বাড়ছে বাপ না থাকার মধ্যেই। এই বাচ্চার বাবা ছিল নিম্নবিত্ত ভদ্রলোক, আশা ছিল বিত্তবান হওয়ার। কিন্তু রিফিউজি ক্যাম্পে বসে সে আশা উধাও হয়ে গেছে, উপরন্তু সে গোরার রোজগারের উপর নির্ভরশীল এক অবাঞ্ছিত বোঝা।

এই অবস্থায় গোরার এসমেলগার হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। মাত্র ১৫ কেজি চাল পাচার করে গোরা ও তার পরিবারের দিন অতিবাহিত হয়। এক সময় গোরা পুলিশের হাতে চরম নির্যাতিত হয়। সামান্য চালসহ সে ট্রেনে নিরাপদ জায়গা পর্যন্ত পেল না। তাকে উলঙ্গ করে চাল গুলো ফেলে দেওয়া হলো। একে গোরাচাঁদের মতো শিশুরা সমাজের চোখে ব্রাত্য, তার উপর বিনা টিকিটের যাত্রী, সঙ্গে চাল চালানের ব্যবসা—সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের চোখে ঘৃণার পাত্র। বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারটুকু যাদের নেই, তারা বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে কিভাবে এগিয়ে চলে এ গল্পে তার সকরুণ প্রশ্ন উঠেছে। একজন শিশুর পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ, পরিবারের জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে সকলকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছার মধ্যেই সমরেশ বসুর জীবনবাদী প্রত্যয়ের সুর শোনা যায়।

আমরা "সোনাটার বাবু" গল্পটিতে দেখি নিম্নবিত্ত বিষ্টুপদ ছয় সন্তানের পিতা। সাত নম্বর আসার সংবাদে সে রুষ্ট হয়ে ওঠে। কুলীন বংশের হয়েও বিষ্টুপদ মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটার বাবু, গ্রামের লোকের উচ্চারণে হয় সোনাটার বাবু। এক নম্বর ওয়ার্ডের কুকুর মারার অর্ডার পায় বিষ্টুপদ, সঙ্গী হয় ফ্যালাডোম। বিষ মিশানোর রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে তারা ছোটে কুকুর মারতে। ফ্যালাডোমের খুব ইচ্ছে করে তার অন্তঃসত্ত্বা ডোমনীর জন্য মিষ্টি নিয়ে যেতে। কুকুর মারতে মারতে ভাবে মানুষকে এমনি বাড়তি হয়ে গেছে। দুজনেই তারা একটা ভাবনায় তলিয়ে যায়। অনেক খুঁজে শেষ অব্দি তারা তাদের ঈপ্সিত খেপি মাদি কুকুরটার সন্ধান পায় কিন্তু সাবধানী কুকুর মা বিষ মেশানো রসগোল্লা না খেলে বিষ্টুপদ ক্ষেপে যায়। তবে সমস্ত দিনের শেষে ক্লান্ত বিষ্টুপদ যখন দেখে মা কুকুর তার সন্তানদের দুধ খাওয়াচ্ছে তখন তার মনের পরিবর্তন ঘটে। তার মনে পড়ে যায় তার ঘরেও এরকম সন্তান পালনের রত জননী রয়েছে—

'এমনি, তবে সেটা গাছের তলায় নয়, ঘরে নিরালা কোণে একটা মানুষের দুপুরের

অথবা মধ্যরাত্রে শুয়ে থাকার ছবি। এমনই, কিন্তু বাচ্চাগুলো মানুষের। এমনই কিন্তু সে তার শিবি, খেপি নয় তবু খেপি।'

কুকুরটিকে আর মারা হয় না। ফ্যালার কাছ থেকে চার আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে বিষ্টুপদ ছোটে গর্ভবতী শিবির জন্য লঙ্কার আচার কিনতে। সমরেশ বসু দেখিয়ে দিলেন জীবনে দারিদ্র, গ্লানি ,হিংস্রতা আছে ঠিকই কিন্তু তার ঊর্ধে রয়েছে অপরিসীম ভালোবাসা সমরেশ বসুর সময় কালে দারিদ্র্য, মূল্যবোধের অবনমন, নৈতিক অবক্ষয় ছিল ঠিকই কিন্তু সেটাই যে সব নয় তা সমরেশ বসু তার ছোটগল্পের পরতে পরতে দেখিয়েছেন। সমাজের শবদেহের উপরে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। সমস্ত গ্লানি ঊর্ধ্বে মানবতা, জীবনবাদী প্রত্যয়ের সুর শোনা যায়। তিনি যেন জীবনানন্দ দাশের মতোই বলতে চেয়েছেন

'সৌন্দর্য রাখিছে হাত ক্ষুধার বিবরে'।

**তথ্যসূত্র :**

১) ড. ঝুমা রায়চৌধুরী —"কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিকমূল্যায়ন" দ্বিতীয় খন্ড। পৃ.
২) ড: নিতাই বসু—"সমরেশ বসু গল্প সমগ্র"২
৩) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, —"সমরেশ বসু রচনাবলী"—১



## ভাষা বৈচিত্র্যে সমরেশের ছোটগল্প

**চন্দ্রিমা মৈত্র দুবে**

বিশ শতকের চারের দশকে সমরেশ বসুর ছোটগল্পের ভাষা বিশেষভাবে পাঠকমন আকর্ষণ করেছে। সমরেশ বসুর প্রথম দিকের ছোটগল্পে বারবার ফিরে এসেছে সাধারণ মানুষের কথা ,যাদের শ্রম ছাড়া পুঁজি নেই তাদের কথা, যারা অর্থনৈতিক- সামাজিক -রাজনৈতিকভাবে শোষিত তাদের কথা।সমরেশ বসুর শিল্পী জীবন ছিল অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ,তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গল্প -উপন্যাস লিখেছেন।অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী মিসেস লীলা রায়কে এক সাক্ষাৎকারে সমরেশ বসু বলেন - 'আমি লিখি মানে ,ধরুন জানবার জন্য লিখি। মানুষকে জানবার জন্য।'[১] সমরেশের গল্পে গল্প থাকে যতখানি,তার থেকে অনেক বেশি থাকে জীবনের কথা, মানুষের কথা—যে মানুষকে জানবার জন্যই তিনি লেখা শুরু করেছিলেন।

সমরেশের জীবনধারার মতো তাঁর সৃষ্টির ভাষাও বিচিত্র।তার নিজের মুখের কথা, মনের কথা, চিন্তা ভঙ্গি যে ভাষায় বর্ণিত তার সাথে চরিত্রের মুখে বসানো ভাষার বৈচিত্র অনেকখানি।নানা অঞ্চলের নানা জীবিকার মানুষ তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে উঠেছে সমরেশের গল্পে। তাঁর গল্পের চরিত্ররা সবসময় নিজের ভাষায় কথা বলে, যা শুনলে সহজেই চরিত্রের শ্রেণি এবং পেশাগত পরিচয় বুঝে নেওয়া যায়।

সমরেশ বসু পাঁচের দশকে এসে যেসব কালজয়ী গল্প উপন্যাস রচনা করেন তা পাঠকমনে দাগ কাটার মতই। তার গল্প বলার ভঙ্গিমা ছিল সহজ-সরল-আটপৌরে। তার গল্পের ভাষা বা কথনভঙ্গি সাধারণ মানুষের মর্মে সঞ্চারিত হয়। সমরেশ বসুর গল্পে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের কথা এসেছে ঘুরেফিরে। গল্পের মধ্যে মূল্যবোধ, দারিদ্র্য, শোষণ, বড় লোকের ভন্ডামি যেমন এসেছে, তেমনি ছোটগল্পে বৈচিত্র্য আনার জন্য বারবার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে তিনি তুলে ধরেছেন।

সমরেশ বসুর নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—'বেশিরভাগই অভিজ্ঞতা প্রসূত লেখা। তবে একেবারে কোথাও কল্পনা নেই তা তো নয়, কল্পনাও কাজ করেছে। নইলে উপন্যাস হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আমার ধারণা এই আর কি যে,যেকোনো শিল্প, তাতে বোধহয় একটু খাদ মেশানো দরকার হয়। নইলে কিছু করা যায় না। খাদটা সেজন্যই মেশানো। খাদ এই কারণেই মেশানো হয়, সে জিনিসটা বানিয়ে তোলার জন্য। সোনা দিয়ে কিছু তৈরি করতে গেলে....সুতরাং খাদটাকে আমি ধরছি অতি আবশ্যিক জিনিস। শিল্পের ক্ষেত্রে ....পদ্য উপন্যাস বা গল্পের ক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে কল্পনা।.......একটা

কিছু গড়বার জন্য'[২] বিশ শতকে চারের দশকের এক অভাবনীয় গল্প "আদাব"। লেখক যখন এই গল্প লেখেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর কিন্তু গল্প পড়ে তার মধ্যে লেখকের অপরিণত বয়সের ছাপ ধরা পড়ে না। এই গল্পের মধ্যে তিনি খুব বেশি চরিত্র, ঘটনার আধিক্য আনেননি। কেবলমাত্র দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়েই এক ভয়াবহ দাঙ্গা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মানবতার বার্তা দিতে চেয়েছেন।

লেখক এই গল্পে হিন্দু সুতাকলের শ্রমিক এবং মুসলিম নৌকার মাঝির মুখের কথার মধ্যে দিয়ে সমাজের অধিকাংশ মানুষের মনের কথার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট তৎকালীন মুসলিম লীগ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" এর ডাক দেয়, শুরু হয় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় হিংসা- দ্বেষ- ঘৃণা- ভয়। এই প্রেক্ষাপটে লেখা হয় "আদাব"।

'আদাব' গল্পটি লেখার ক্ষেত্রে তিনি মূলত প্রথম পুরুষের ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রথম পুরুষ হিসাবে যে দুই চরিত্রের মুখে তিনি কথা বলিয়েছেন তাদের কোন নির্দিষ্ট নাম তিনি দেননি। গল্পটি পড়ে দেখলে দেখা যায় যে নাম না দেওয়ার জন্য মূল বক্তব্য কিন্তু কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি।

গল্পে লেখক যখন সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার কথা বর্ণনা করেন, তখন তার ভাষা এবং চরিত্রের মুখের ভাষা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। তাছাড়া হিন্দু সুতামজুর এবং মুসলিম মাঝি দুজনের ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই কারণ দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। অবিভক্ত বাংলাদেশের ভাষার প্রয়োগই এখানে করা হয়েছে। যাকে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি পূর্ববঙ্গের ভাষা। এ গল্পে পুলিশ অফিসারের মুখে বসানো হয়েছে আরেক রকম ভাষা,'ডাকু ভাগতা হ্যায়'। যাতে করে চরিত্রের বৈচিত্র্যময়তার সঙ্গে ভাষার ভিন্নতাও ধরা পড়েছে। "হল্ট","ডাকু ভাগতা হ্যায়" এই যে ইংরেজি-হিন্দি মিশ্রিত ভাষা তা শুধুমাত্র আমরা গল্পে পুলিশ অফিসারের মুখেই শুনে থাকি।অর্থাৎ মানুষের শ্রেণিগত অবস্থান অনুযায়ী ভাষার যে বদল হয় তার দৃষ্টান্তই রেখেছেন এখানে লেখক। গল্পের মধ্যে লেখক ব্যবহার করেছেন "বাপজান", "পোলা","মাইয়া", "বিবি", "মিয়াসাহেব" এসব শব্দ যা সাধারণত মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পর্কের কথা বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করা হয়। সমগ্র গল্পে লেখক কোথাও হিন্দু এবং মুসলিমের ভাষার মধ্যে পার্থক্য করেননি। গল্পের শেষে গিয়ে মুসলিম মাঝি যে শব্দগুলো ব্যবহার করে তা অঞ্চলভেদে ভাষার পার্থক্য নয়, জাতিগত ভাষার ভিন্নতা।

"প্রতিরোধ" গল্পটি ১৯৪৩ সালে ঘটে যাওয়া তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা একটি গল্প। এই গল্প শুধুমাত্র ৪৩ - এর মন্বন্তরের গল্প নয়, এ হল মন্বন্তরের শেষে নতুন





আশায় বুক বাঁধা কৃষকের আরেক প্রতিরোধের গল্প।গল্পে লেখক তাঁর ভিন্নধর্মী ভাষার মাধ্যমে কবি গায়ক সুবলের মুখ দিয়ে অনেক না বলা কথা বলিয়ে নিয়েছেন। এই গল্পের একটি নতুন বিষয় হল "গান"। গানের মধ্যে দিয়ে লেখক অনেক কথা সহজেই ব্যক্ত করেছেন নিপুণ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে। মানুষের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা যখন অন্য জনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায় মানুষ তখন একেকজন বক্তা তার মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী এক এক রকমের প্রকাশ মাধ্যম বেছে নেয়। এই প্রকাশ মাধ্যমের পার্থক্য অনুসারে শিল্প পৃথক পৃথক রূপ নেয়। শিল্পী যখন তার সুরকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন, তখন সংগীত নামক শিল্পটি গড়ে ওঠে। এগল্পে গানের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজ, অতীতের দুর্দশা এবং রাধার রূপের বর্ণনাও ফুটে উঠেছে।

যে প্রেক্ষাপটে এই গল্প লেখা হয়েছে সেখানে একটি প্রধান ঘটনা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে লেখক এক নারী মনের ব্যথা বেদনাও ব্যক্ত করেছেন—'কিন্তুক- আমার যে পোলা হইবো না গো! আমি যে—'এই যে কিছু না বলেও লেখকের অনেকখানি বলে যাওয়া তাই পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। রাধা যে "বন্ধ্যা" সেকথা সে নিজের মুখে বলতে গিয়েও ডুকরে ওঠে। কারণ নারী মনে এই এক স্পর্শকাতর জায়গা, একথা লেখক যেমন কোন অতিরিক্ত ভাষার ব্যবহার না করে শুধুমাত্র চুপ থেকেই পাঠক কে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঠিক তেমনই তুলে ধরেছেন গ্রাম্য নারীদের আটপৌরে ভাষা।

গল্পে দেখানো হয়েছে পুলিশের যখন মনাই কে ধরে নিয়ে যাবার সময় আসে সেই সময় রাধা মনাইকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয় এবং তখন এক গ্রাম্য নারী পরিণত হয় বীরাঙ্গনা নারীতে—'আমি শিবদাস মোড়লের মাইয়া না? ধান কাড়বো নি আমার কাছ থেইক্যা? কত মায়ের দুধ খাইছে ঢ্যামনারা দেইখ্যা লমু'[৩]। ধানের গোলা পাহারা দেওয়ার কাজ নেয় সে। নারী কণ্ঠে এই ভাষা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে লেখক তেভাগা আন্দোলনে (কৃষক আন্দোলন) যে মেয়েরাও সমানভাবে লড়াই করেছিল তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সমরেশ বসুর একটি অন্যতম রাজনৈতিক ছোটগল্প হল "জলসা"। এখানে লেখক অনেকগুলি চরিত্রের ব্যবহার করেছেন এবং তাদের মুখে ব্যবহার করেছেন প্রাসঙ্গিক ভাষা।কোম্পানির লাইনে একটি জলসা হবে, সেই জলসাকে ঘিরে প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে যে উন্মাদনা তাই হল এই গল্পের মুখ্য বিষয়বস্তু।কোম্পানির লাইনে ভিন্ন শ্রেণির মানুষের বাস আর সেই ভিন্ন শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষাও ভিন্ন। এই গল্পে "বিবি", "তবিয়ত", "তোবা তোবা" ইত্যাদি তুর্কি আরবি শব্দের প্রয়োগ করেছেন যা দেশি-বিদেশি শব্দের সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

মুসলমান লাইনের পরেই আছে বিলাসপুরী লাইন। সেখানে ভগৎ তার "মেহেরারু"র

চুল বেঁধে দেওয়া, অথবা তাদের দুজনের "মোহব্বত" দেখাতে গিয়ে বিভিন্ন ভাবে ভাষার তারতম্য ঘটিয়েছেন লেখক। সাধারণত বিলাসপুরের সরকারি ভাষা হিন্দি এবং এই রাজ্যের অধিকাংশই ছত্তিশগড়ীয় ভাষায় কথা বলে যা হিন্দি ভাষার উপভাষা। এছাড়াও "সর্দার", "মর্দানা", "সাবুন", "আদমি" এইসব শব্দের ব্যবহারও করেছেন লেখক।

তারপরের লাইনে বাস বিহারীদের। সেখানে লেখক যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তা মূলত "খোট্টা" ভাষা - "কাঁ হো শুকালু, গান্ধীবাবাকি তর্পণকো জলসা হো রাহা হ্যায়?" বা মহাদেও-র গানের ভাষা—"কালী কেলকাত্তামে বৈঠল বারম্বার ভারতমে"। এই খোট্টা ভাষা সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী এলাকার লোকেদের মুখের ভাষা।খোট্টাভাষীদের মুখে ভাষাটি উচ্চারিত হয় হিন্দির মত বা উর্দুর মত আর এর বাক্য গঠনও প্রায় হিন্দির তবে বাংলার কিছুটা প্রভাব এর মধ্যে আছে।

উড়িয়াদের লাইনেও জলসা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হওয়ার সময় উঠে আসে তাদের ভাষা—'নইলে বাবুসাহেব আর লিবারবাবু সাদা টুপি মাথায় দিয়ে খাটতে আসিল কাঁই?', 'সড়া',তাছাড়া মাধবের গানেও এই ভাষা ধরা পড়েছে—'নন্দের নন্দন বক্কাকোঁ রাই'[৪]। এই ভাষার সঙ্গে বাংলা এবং অসমীয়া ভাষার অনেকখানি সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

জলসা কে কেন্দ্র করে যখন কারখানার ম্যানেজার ইংরেজ সাহেবকে নিয়ে আসে তখন তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে ইংরেজ সাহেবের কথা—'বুলাড়ি ডামগুড', 'বহুটআচ্ছা ', 'জোয়হিন্ড'। অতএব দেখা যাচ্ছে ভাষা নিয়ে সমরেশ বসু কখনোই কোনো ছুঁৎমার্গ করেন নি। আমরা জানি ভাষার জন্ম হয় সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে। সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক কাঠামো ভাষার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই ভাষা হল একটি সামাজিক সংস্থা। মানুষের জীবনের প্রয়োজনেই ভাষা সৃষ্টি হয় এবং সংস্কৃতি -শিল্প- সাহিত্য-সভ্যতা ভেদে তার পরিবর্তনও হয়। তাই তিনি এই গল্পে অবলীলায় গল্পের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখে বসিয়েছেন বিভিন্ন ভাষা।

সমরেশ বসুর "সানা বাউরীর কথকতা" গল্পে বর্ণনামূলক রীতি এবং লোকায়ত কথোপকথনের মাধ্যমে সংলাপ-ভাষ্য তৈরি করে অন্যান্য গল্পের মতই এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। গল্পের মধ্যে লেখক যেমন ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রান্তীয় নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রাকে দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনভাবেই তুলে ধরেছেন শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের পার্থক্য। গল্পের শুরুতেই লেখক সাঁওতাল পরগণার পূর্বে বীরভূম ঘেঁষে এক গ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজাতিকে কোথাও যেন এক করে





তুলেছেন—'অন্ধকারে, গায়ে গায়ে জড়ানো বন মেঘের মতো জমে আছে এখানে ওখানে, উঁচু-নিচু উঁচুতে। শালবন,তারপর হঠাৎ খাড়া-খাড়া তালের সারি।সারি নয় তো ঘিরে থাকা জটলা'[৫]। এই একসঙ্গে থাকা শালবন যেন গ্রামে একসাথে জটলা বেঁধে থাকা মানুষেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে।তৎকালীন সময়ে প্রান্তীয় নিম্ন বর্গীয় মানুষরা অত্যাচারিত হত, তাদের অসহায়তা অর্থাৎ অর্থ-সম্পত্তি-নিরাপত্তার অভাব যা এই গল্পে ছত্রছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন তার অনবদ্য ভাষার মাধ্যমে।শোষিত নিপীড়িত হতে হতে তারা যেন বৃক্ষের মতো নেই রূপ ধারণ করেছিল—'নিশ্চল বোবা'।

গ্রামের এক শ্রেণির মানুষ যারা একসময় গ্রামে বাস করত কিন্তু বর্তমানে তারা উপার্জনের তাগিদে গ্রামের বাইরে বাস করে,"আপিসে" কাজ করে। এই "আপিস" কথাটির মধ্যে দিয়ে গ্রামে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সঙ্গে অবস্থাপন্ন মানুষের সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য তিনি দেখিয়েছেন। আবার পরক্ষণেই তিনি বলেছেন তাদের সঙ্গে কিন্তু নিম্নবর্গীয় মানুষের ভাষার কোন ফারাক নেই—'ভদ্র-অভদ্রের এক ভাষা, মাতৃভাষা'[৬]। অর্থাৎ তৎকালীন বঙ্গদেশের মাতৃভাষা যে বাংলা এবং অঞ্চল ভেদে ভাষার যে কেমন পরিবর্তন হয় তা গল্প পড়লেই আমরা জানতে পারি। গল্পজুড়ে লেখক সানা বাউরি এবং অন্যান্য চরিত্রের মুখের ভাষার মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল পরগনার গ্রাম্যভাষাকে ধরতে চেয়েছেন।

গল্পের মধ্যে লেখক একই শব্দের ভিন্ন উচ্চারণ রীতি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন চরিত্র্যের মুখে। গল্পের একটি চরিত্র "সুন্দর রায়" লেখকের জবানিতে "সুন্দর" হলেও গল্পের এক চরিত্র্যের মুখে তা হয়েছে "সুঁদোর"। আবার "শুয়্যা", "গ্যালছে", "যাবেক", "ছোটকত্তা" এই সমস্ত শব্দগুলি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষার ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে।

"জোয়ার ভাঁটা "গল্পটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে গল্পটি নদীর সাথে সম্পর্কযুক্ত।মানুষের পেটের খিদে তাদের জীবনের সুখ দুঃখ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে তারই প্রমাণ এই গল্প।

গল্পের শুরুতে লেখক বলেছেন 'মেয়ে ছিল জনা-পাঁচেক, পুরুষ ছিল পনের জন'। এখানেও কিন্তু লেখক কারও নামকরণ করেননি,কারণ এই মানুষগুলোর জীবিকা হল নৌকা থেকে মাল নামানো,দিনমজুর হিসেবে এরা সামান্য মজুরি পায় তাও অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত কাজ এবং পেটের স্থায়ী খিদের একটি সম্পর্ককে লেখক গল্পে ভাষার মধ্যে দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন—'এ ছন্নছাড়া আয়ের মত জীবনও ছন্নছাড়া। কম হোক,বেশী হোক কোন বাঁধা আয় নেই অথচ বাঁধা আছে পেট'। এখানে তারা যে কাজ পেয়েছে তার আনন্দ প্রকাশ করতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সূর্য্যোদয়ের কথা

'সূর্য উঠেছে খানিকক্ষণ আগে'। সকাল বেলার সূর্য্য মানুষের কাছে একটি নতুন দিনের সূচনা ঘটায়, তার সাথে নিয়ে আসে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সফলতা।

লেখক প্রথমদিকে এই কুলিকামিনদের নাম না দিলেও পরে পরে তাদের নানান পরিচয় পাওয়া যায়, আড়তের বাবুর কাছে এরা 'জানোয়ারের দল' আবার কুলির চোখে 'শালা লুচ্চা লাফাঙ্গার দল'। এখানে যেমন দিনমজুরদের পরিচয় স্পষ্ট করেছেন তেমনি কিন্তু ভাষা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে লেখক খুব সহজেই সমাজের শ্রেণিবিভাজনও করে দিয়েছেন। আড়তের বাবু এক সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষ, তারপর আসে "বাঁধা কুলি" অর্থাৎ সে কুলি কিন্তু বাঁধা কাজের মানুষ তাই সেই আভিজাত্যবোধে দিনমজুরদের থেকে গা বাঁচিয়েছে। আর তারপর সমাজে স্থান সেই দিনমজুর কামিন এবং তাদের পুরুষ সঙ্গীদের, যাদের কোনো স্থায়ী কাজ নেই।

গল্পের শুরুতেই দিনমজুরদের মুখের ভাষার সঙ্গে আড়তের বাবুর মুখের ভাষার পার্থক্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে লেখক—"ক'টা লাও আসবে বাবু?' উত্তরে আড়তের বাবু বলে— 'বললাম তো, সাত নৌকো বালি আর তিন নৌকো টালি।' ভাষার পার্থক্য এখানে স্পষ্ট। এছাড়াও "শরীর" হয়েছে "শরীল", "লাইসেন্স" হয়েছে "লাইসেন, "বিল্ডিং" হয়েছে "বিডলিন", "একটা" থেকে "এট্টা" ইত্যাদি।

লেখক এই দিনমজুরদের অসহায়তা বোঝাতে 'নেংটি পরা খালি গা', 'স্তূপাকার করা বেঢপ মাল', 'শূণ্য দৃষ্টি' , 'গোবরের ভাঙাচোরা মুখটা কালো, মাটির ডালার মত ধসধসে' এসব শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

প্রকৃতির ধীরে ধীরে বদলে যাওয়ার ছবি যা মানুষ গুলোর মানসিক পরিবর্তনের রূপরেখা হয়ে উঠে এসেছে এই গল্পের মধ্যে।প্রথমে দেখানো হয়েছে 'সূর্য উঠেছে খানিকক্ষণ আগে' অর্থাৎ দিনমজুরদের নতুন দিনের শুরু। তারা নতুন দিনের নতুন কাজের আশায় বুক বেঁধেছে। এরপর দেখানো হয় 'সূর্য কখন লাটিমের মত পাক খেয়ে উঠে এসেছে মাথার উপরে' অর্থাৎ কাজের অপেক্ষায় তারা বসে আছে কিন্তু নৌকার দেখা নাই। নৌকা না এলে তাদের পেটের খিদেও মিটবে না। বৈশাখী সূর্য জ্বলে গনগনকরে মাথার উপর'-কাজের অপেক্ষা করতে করতে মানুষগুলো হয়ে ওঠে 'বাঘাকুত্তার' মত, রাগে তারা গনগনকরতে থাকে। 'ন্যাড়া গাছগুলো মরা কাঠের খুঁটির মত যেন মানুষগুলোর চেহারা হয়েছে সারাদিনের অপেক্ষায়। এরপর সূর্য চলে গেছে, ছুটির ভোঁ বেজে গেছে চটকলগুলোতে অর্থাৎ সারাদিন অপেক্ষা করার পরও কাজ পাওয়ার যে আশা তাও যেন 'সূর্য ডোবার সাথে সাথে শেষ হয়ে এসেছে। এরপর আবার পুবে উঠেছে আধখানা চাঁদ, ভাঁটার জলে তার ঝিলিমিলিতে দেখা যায় ....মানুষগুলোর সব আশা শেষ হয়ে যাওয়ার



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

পরও দূরে নৌকা দেখে তাদের মনে আবার আশার আলো দেখা যায়। ভাঁটার পর যেমন জোয়ার আসে তাদের জীবনে সেই নৌকাগুলো ঠিক সেরকমভাবেই এসেছে আশার আলো নিয়ে, দু'মুঠো খাওয়ার জোগান নিয়ে।

"ও আপনার কাছে গেচে" গল্পের বিষয়বস্তু ভারি অদ্ভুত এবং অন্যরকম।লেখক গল্পের শুরু করেছেন গল্প কিভাবে লিখবেন, গল্পের বিষয়বস্তু কি হতে পারে, একটা গল্প তাঁকে লিখতেই হবে এই ভাবনাচিন্তার মধ্যে দিয়ে।গল্পের মধ্যে গল্প লিখতে বসার এই ভাবনা তা সমরেশ বসু খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনের মধ্যে নিয়ে লেখক গল্পের বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল থেকে আসা একটি চিঠিকে। এই চিঠি এসেছে তার এক নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে। চিঠির 'স্যাঁতস্যাঁতে দোমড়ানো, কাদার দাগ লাগা, জলে ধুয়ে যাওয়া অক্ষর, ভাঁজের মুখে ছিঁড়ে যাওয়া' এই যে রূপ লেখক বর্ণনা করেছেন তা যেন বন্যা কবলিত এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরই প্রতিচ্ছবি। চিঠিটা খোলার পর চিঠির একেবারে মাথায় লেখা 'শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়' ডান দিকে তারিখ। গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে লেখক একটি চিঠি কিভাবে লেখা হয় বা চিঠি লেখার গঠন বর্ণনা করেছেন সুদক্ষ কৌশলের সঙ্গে।

এই গল্পে লেখক তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের কথাই তুলে ধরেছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির হওয়া সত্ত্বেও অঞ্চলভেদে ভাষার পার্থক্য তুলে ধরেছেন। লেখক কলকাতাবাসী হওয়ায় তাঁর মুখের ভাষার সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার দাসপুর অঞ্চলের ছেলেটির ভাষার পার্থক্য আছে অনেকখানি। লেখক যখন জানতে চায় ছেলেটি ওরকম বিধ্বংসী বন্যা কবলিত এলাকা থেকে কলকাতা এলো কিভাবে, তার উত্তরে ছেলেটি জানায় 'নৌকায় আর পিপের ভেলায় করে ঘাটাল-পাঁশকুড়া চাতালে এয়েচি, সেখান থেকে পাঁশকুড়া ইস্টিশনে, মিছিলগাড়িতে কলকাতা'। এই কথা শুনে লেখকের কাছে "চাতাল", "মিছিল গাড়ি" এই শব্দগুলো একদমই অচেনা ঠেকেছে। দাসপুরের ভাষায় "স্টেশন" হয়েছে "ইশ্টিশন", "এসেছি"—"এয়েচি","বিষ্ণুপুর"—"বিষ্টুপুর"।

"সোনাটরবাবু" গল্পে লেখক নামকরণেই ভাষার বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র বিষ্টুপদ মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করে, তার ডেজিগনেশনে লেখা আছে ,কনসারভেন্সি সুপারভাইজার কিন্তু বিষ্টুপদ নিজে বলে, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। ডোম মেথররা বলে, "ছোট সোনাটরবাবু" অর্থাৎ "স্যানিটারিবাবু"। পাড়ার ছোঁড়ারা আড়ালে বলে,"শালা ধাওড়ার ভূত, ধাঙ সর্দার। এখানে একটি ছোট্ট শব্দ দিয়ে লেখক সমাজের ভদ্রলোক-মেথর, ডোম এবং কম বয়সী পাড়ার ছেলে ছোকড়াদের ভাষা পৃথক করেছেন।

বিষ্টুপদর চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক তার উদাহরণস্বরূপ যে ধরনের ভাষার

ব্যবহার করেছেন—'গায়ের রং ক্ষয় পাওয়া রোদে পোড়া ন্যাড়া গাছের মত','গুলিভাটা গোল চোখ', 'আগুনের সেঁকা বাঁশের মতো শিরাবহুল পা'। আবার বিষ্টুর স্ত্রী শিবির আট'টি সন্তান প্রসবের পরও তার শরীরের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন উপমার ব্যবহার করে 'যেন পাতিহাঁসটার হাজারবার জলে ডোবানো, তবু ঝরঝরে শরীরটার মত'।

বিষ্টুপদ মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে কাজ করে বলে তার একটা সম্মান আছে। লেখক এখানে বিষ্টুর মুখে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার করেছেন। অল্প কিছুতে সে যখন বিরক্ত হয় তখন বিরক্তি প্রকাশ করে 'অল শালা ব্লাডি বোগাস' বলে। এই একই ইংরেজি ভাষা যখন ফ্যালা ডোমের মুখে ব্যবহার করা হয় তখন তার তারতম্য ঘটে "ব্লাডি" হয়ে যায় "বেলাডি"। অবশ্যই শুধু ফ্যালা নয়, বিষ্টুও মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকে কথায় কথায় কিন্তু তা সব সময় যে ঠিক হয় তা কিন্তু নয়—'তা এবার আমার ওই ডেকিচনেশন বা ডেকচিনেশনে সোপারভাইজার টা কেটে ডোম করেই দেওয়া হোক'[৭]। এখানে বিষ্টুর কথায় বা কথা বলার ধরনে বোঝা যায় যে সে ফ্যালা ডোমের থেকে উঁচু জাত এবং ভালো পোস্টে চাকরি করে বলে তাকে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে হবে, তা ঠিক হোক বা ভুল।

সমরেশ বসুর ছোটগল্পগুলিতে তিনি গল্পহীন মানুষের থেকে শুরু করে সমাজে সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষের গল্প বলার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতার পরিচয় রেখেছেন। চরিত্র অনুযায়ী ভাষার ব্যবহারও করেছেন যথাযথভাবে। বিভিন্ন অঞ্চল এবং প্রদেশের ভাষা যেমন চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন, তেমনি শহুরে উচ্চবিত্ত মানুষ তাঁর গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাদের ভাষার হাত ধরে। আবার আঞ্চলিক ভাষারও প্রভেদ তৈরি করেছেন সূক্ষ্মভাবে।

এখানে আমরা যে গল্পগুলি আলোচনা করলাম তার মধ্যে "আদাব", "প্রতিরোধ", "জলসা" গল্পগুলিতে আমরা অবিভক্ত বাংলাদেশের ভাষা,বঙ্গালী উপভাষা যেমন দেখতে পাই তেমনই আমাদের চোখে পড়ে সদ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে নানা জাতি নানা বর্ণের মানুষের বৈচিত্র্যময় ভাষা। আমাদের দেশ ভারত বর্ষ যেহেতু নানা জাতি নানা বর্ণ নানান শ্রেণির মানুষের মিলনক্ষেত্র ,তাই সমরেশের ছোটগল্পের চরিত্রগুলি শুধুমাত্র ভাষায় জোরে নয়, পরিবেশ পরিস্থিতি সহ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে গল্পের মধ্যে।আবার কিছু গল্পে উঠে এসেছে খেটে খাওয়া মানুষের কথা। তাদের ভাষাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাদের জীবনবোধ ,অসহায়তা। এই পর্বে আলোচ্য গল্পগুলি ছাড়াও "পশারিনী", "পাড়ি", "আইন নেই" গল্পেও জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের কথা বলেছেন লেখক। সমাজের নিচু তলার মানুষের সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে লেখক তাদের মুখে ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন গল্পগুলিতে।





"পাড়ি" গল্পে অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে অবিকল তাদের মুখের ভাষাই প্রয়োগ করেছেন লেখক। খরস্রোতা গঙ্গাবক্ষে জানোয়ারগুলোকে পার করার সময় চরিত্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে যে সংলাপ তা একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব মুখের ভাষা বলে বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। "পশারিনী" গল্পের প্রথমে নামহীন হকার শ্রেণির মানুষগুলোর কোন নামকরণ না করে লেখক বলেছেন, 'মনে হচ্ছিল, সব মিলিয়ে দেহস্তূপটা নিশ্চল, নিস্তব্ধ।' সেখানেও হকারদের কোডনাম, তাদের নিজেদের মধ্যে যে কথোপকথন খুব সহজভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

সমরেশের 'লিখব। লিখেই বাঁচবো' সংকল্প নিয়ে যে কালজয়ী রচনার বিপুল সম্ভার তার মূল বৈশিষ্ট্য হল ভাষার ভিন্নতা। ভাষার যে বৈচিত্র্যময় বিশাল রূপ,সক্ষমতা,শক্তি তা যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক সমরেশ বসু। লেখকের চিন্তাশক্তি ও সাবলীল বর্ণনাকে কুর্নিশ জানাই।

**তথ্যসূত্র :**


১. https-www.jaladarchi.com.2020.12.samaresh-basu.html
২. https-//pagefournews.com/samoresh-basu-ramkinkar-samaresh-basu/
৩ আমি তোমাদেরই লোক, সমরেশ বসু, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৩৪
৪ বাছাই গল্প, সমরেশ বসু, মলয় প্রকাশনী, ১৪২৯, পৃষ্ঠা ১৮৭
৫ আমি তোমাদেরই লোক, সমরেশ বসু, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ৪৭৬
৬ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭৭
৭ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪২

# মধ্যবিত্তের রুচির বিপরীতে : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য

ড. মাধুরী বিশ্বাস

অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে অখন্ড বাংলায় ধনতান্ত্রিক সমাজ বা শিল্পসভ্যতার প্রভাবে সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উপাদান ভিত্তিক গ্রাম ব্যবস্থায় চিড় ধরে। ফলে গ্রাম সমাজে বড়সড় ভাঙ্গন ধরে। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক সমাজ আবেষ্টনীপরিত্যাগ করে শহরে বাঁচতে আসা উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মানুষেরা মধ্যবর্তী এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়। এই নতুন শ্রেণীর মানুষদেরকে সাহিত্যিক ভাষায় বলা হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের মধ্যে ভাঙা গড়া শুরু হয়। এই ভাঙা গড়ার মধ্যে সৃষ্টি হয় নতুন মানুষ। এরা বেড়ে ওঠে নতুন পরিবেশে, এদের জীবনযাত্রার মানও হয় নতুন প্রকৃতির, আর এই নতুন মূল্যবোধ ও নতুন বিশ্বাসে গঠিত বৃহত্তর বাঙালি-সমাজ।

শিল্প ও সমাজ একে অন্যের পরিপূরক—একই সময়ে হাত ধরাধরি করে চলে। তাই তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পথ চলা অথবা সময়ের ভাবধারায় গড়ে ওঠা ব্যক্তি- সমাজ - সংস্কৃতি ও জীবনের কথা বলায় সাহিত্যের কাজ বিশেষত কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সাহিত্যে, বিশেষত গল্প -উপন্যাস ধারায় স্বাধীনতা- পূর্ব এবং স্বাধীনতা -পরবর্তী সময়ে ষাটের দশক বিশেষভাবে উজ্জ্বল। এই সময়েরই নক্ষত্রসম উজ্জল কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আবির্ভাব। তিনি বাংলা সাহিত্যে বিরল প্রতিভাবান শিল্পী। তাঁর গল্প -উপন্যাসের মানুষজন রাজধানী ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত অট্টালিকাবাসী থেকে শুরু করে রিক্সাচালক, ট্রাক-ড্রাইভার, কবরখোদক, পাগল, নেশাখোর এবং গ্রামের সাধারণ মানুষজন চাষী, কলু, নাপিত, মাঝি, রাজনীতিবিদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তারকে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রাণবান লেখক শিল্পীদের জীবনাভিজ্ঞতা ও শিল্পসাফল্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে তাঁর অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, অনুভব -অনুভূতির গভীরতা ও বিস্তৃতি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্যোগ করে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম বই 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' এর আলোচনায় হাসান আজিজুল হক বলেছিলেন, 'কোঁত কোঁত আবেগ'। সেইসব আবেগের কোনওটারই এতটুকু মূল্য দেন না ইলিয়াস। শ্মশানে মড়া পুড়িয়ে চন্ডালের যে অবস্থা ইলিয়াসেরও তাই, চোখের একদম ভেতরেও-যে একটু আবেগ থাকে তা তাঁর লেখায় নেই। তবু এ সময়ে তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে আমাদের সেই অস্বস্তিময়তা যায় না।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সেই অস্বস্তি তৈরি করেন বটে। সেই অস্বস্তি আসলে মধ্যবিত্ত সাহিত্যপাঠের ভিতরেই লুকিয়ে আছে। এতদিন ধরে নির্মিত কথাসাহিত্য পাঠের





যে- প্রক্রিয়া, ভোক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে যার বেড়ে ওঠা, সেখানে এই মোচড় সবসময় খুব সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না।

পূর্ববাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক বিধিবিধান এবং তার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা ঐতিহ্য- আবহমানতার গভীরে একদিকে ধর্মব্যবসায়ীদের শরিয়াতের মোড়কে মিথ্যা সম্ভাষণ অন্যদিকে আত্মপরিচয় উন্মোচনে প্রয়াসী জনগোষ্ঠীর নৈব্যক্তিক চেতনায় ক্রিয়াশীল জাগরণের তীব্র পিপাসা। ফলে গ্রাম শহরের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় বিপুল তফাৎ আর তাই নিরাপত্তাহীনতা সমাজের নানা স্তরের প্রবাহমান। ভিতরে ভিতরে হতাশার হাত ধরে জায়মান সংস্কার- কুসংস্কার- দ্বিধা- জ্ঞানহীনতা। স্বার্থবুদ্ধি- চক্রান্ত- প্রতারণা -প্রবঞ্চনার এই ক্রমব্যাপ্তির মুখে দেশীয় পটভূমিতে বিক্ষত মূল্যবোধ, নীতিবিচ্যুতি, লোভ -ঈর্ষা- যৌনাকাঙ্ক্ষা- রিরংসাবৃত্তির জটিলতা মধ্যবিত্ত - নিম্নবিত্ত চেতনায় যে মনোবিকার ও প্রতিবাদী অসংলগ্নতা মূর্ত করে তোলে; জীবনচর্চার অনুপুঙ্খ ধারাবাহিকতায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্থাপন করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যের শরীরে।

ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ "অন্য ঘরে অন্য স্বর" প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে ছয়টি গল্প—"নিরুদ্দেশ যাত্রা", "উৎসব", "প্রতিশোধ", "যোগাযোগ', "ফেরারী", "অন্য ঘরে অন্য স্বর"। "মেমোরি- মর্মরিত" পরাবাস্তব ভাবনায় আপ্লুত রঞ্জু স্মৃতিকাতর। "নিরুদের যাত্রা"র এ রঞ্জু তার মানসিক বৈকল্যের যে চিত্র পাঠকের সামনে হাজির করে তা সমাজের নানামুখী জটিলতা- যান্ত্রিকতা- ক্ষোভ - যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত। মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট, মানসিক যন্ত্রণা-কাতর,প্রতিবাদহীন অসংলগ্নতার পরিস্ফুটনে রঞ্জুর নির্মাণ সার্থক বলা যায়। "উৎসব" গল্পে আনোয়ার কে সামনে রেখে ইলিয়াস মধ্যবিত্তের ভিতরের স্তরগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এই স্তরবিন্যাস মূলত অর্থনৈতিক। ফলে সামাজিক আচার-আচরণেও তা প্রকাশিত হতে বাধ্য। শহরের মধ্যবিত্ত অনেক সময়ই নিজের ব্যক্তি জীবনকে উদ্দীপ্ত করতে চায় তার চেয়ে উচ্চমধ্যবিত্তের জীবনধারাকে অনুসরণ করে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কল্পনাবিলাসী মানসপ্রবণতা ও রাজনৈতিক- সামাজিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে লেখা ইলিয়াসের প্রতিশোধ গল্পটি। এই গল্পের প্রধান চরিত্র ওসমান। 'মানুষের শাসিত স্পৃহা ও দমিত সংকল্প'[১] এর ধারক ও সমান। তার কল্পনা - প্রবণতা নিষ্ফল আবেদন, প্রতিশোধের পরিকল্পনা করেও তা গ্রহণে ব্যর্থতা কার্যত সমকালীন যুবসমাজের অস্থিরতা ও মানসিক দোলাচলাটাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। এছাড়া এই গল্পে সুবিধাবাদী মধ্যস্বত্বভোগী মুখোশধারী চরিত্র হিসেবে আনিস ও আব্দুল গনি স্বাধীনতালব্ধ বাংলাদেশকে প্রতিক্রিয়াশীলতার অতল গহ্বরে টেনে নামানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

রুচিহীন সংস্কৃতি যখন দিনের পর দিন ধসিয়ে দেয় সমস্ত মূল্যবোধ আর নৈতিকতার ভিড় তখন সমাজ জীবনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সত্তাগত অনস্তিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা।

মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নের বাংলাদেশের উল্টোপিঠে তখনই আঁচ করা যায় চোরাবালির উপস্থিতি। অবক্ষয়িত মিডল ক্লাস ইয়ং জেনারেশনের জীবনভা ইলিয়াস সমকালীন হতাশা নৈরাজ্যের চির্তে প্রয়াসী হয়েছেন ‘ফেরারি’ গল্পে। ‘ইস্টুডেন হালারা কি করব তুমি জানো না, না? কেলাব থাইকা, হোটেল থাইকা সায়েবরা বারাইব মাল টাইনা, আর হেই গাড়িগুলি ধইরা মালপানি কামায় মাগিউগি পছন্দ হইলে ময়দানের মইদ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়। অহন বুঝলি হালারা বাঙ্গুচোদা, বুঝলি? দিন তো অহন হালায় ইস্টুডেন গো, হালায় ইস্টুডেনের মারে বাপ!’[২]

হিন্দু মাইনরিটি সমস্যা নিয়ে লেখা “অন্য ঘরে অন্য স্বর” গল্পের বয়ান। যা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ উচ্চমধ্যবিত্ত মুসলমান শাসকদের ক্ষমতায়নের এক বিকল্প পাঠ।

ইলিয়াসের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘খোঁয়ারি’। বিশ শতকের সাতের দশকের মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত সময়পর্বে এই গ্রন্থের, ‘খোঁয়ারি’, “অসুখ -বিসুক”, “তারা বিবির মরদ পোলা”, ও “পিতৃবিয়োগ” গল্পগুলি রচিত হয়েছে।

এই সময়ের সমাজ-প্রতিবেশ, নিম্নবিত্ত পরিবারের মানসিক টানাপোড়েন, মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মূল্যবোধ, রোগগ্রস্ত মানসিক বিকারে আচ্ছন্ন বাংলাদেশের সমাজ মানসিকতার মর্মান্তিক হৃদয়বিদার কাহিনী নিয়ে এই গল্পগুলি লেখা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের তৃতীয় গল্প গ্রন্থ “দুধেভাতে উৎপাত”। এই গল্প গ্রন্থে আছে “মিলির হাতে স্টেনগান”, “দুধেভাতে উৎপাত”, “পায়ের নিচে জল”, “দখল”--এই চারটি গল্প। গ্রাম জীবনের চিত্রণে গ্রামীণ অর্থনীতির সারকথা ব্যক্ত হয়েছে “দুধেভাতে উৎপাত” গল্পে নিম্নবিত্ত পরিবারে মৌলবি কসিমুদ্দিন দিনযাপন করে পাঁচ পুত্রকন্যা আর স্ত্রী জয়নাবকে নিয়ে। এই পরিবারের রোজগারের অন্যতম অবলম্বন ইমামতি ও মুয়াজ্জিনের কাজ। ঘরে পোষা কালো গাইয়ের দুধ বিক্রি করেও কিছু অর্থ আছে। এই পরিস্থিতিতে জয়নাবের অসুস্থতা জনিত কারণে দুধে ভাত খাওয়ার সাদ হলে হারুন মৃধার পরিবার তাচ্ছিল্য করে, এই বাসনাকে -‘দুধ ভাত খাইলে তর মায়ে ফাল পাইড়া উঠবো, না?’[৩] কিংবা ‘তর মায়ে- বুইড়া মাগীটার ঢঙ্গের হাউস হয়েছে দুধ খাইবো।’[৪]

আতিক চরিত্রের রূপায়নে “পায়ের নিচে জল” গল্পটি রচিত হয়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। মধ্যপন্থী। মধ্যবিত্তসুলভ ভদ্রতা এবং গ্রামের নিঃস্ব-রিক্ত মানুষের সরলতা - এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আতিক সংকোচবোধ করে, আবেগে আপ্লুত হয়, স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। আবার মানুষের সম্মিলিত উপস্থিতিতে ভয় পায় এবং শেষ পর্যন্ত গ্রাম থেকে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ফিরে আসে। আবার জোতদার হিসেবে আলতাফ মৌলবির পেটি - বুর্জোয়া মানসিকতা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাবার নয়। এই গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প “দখল”। সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত মোয়াজ্জেম হোসেন তোষণে পটু। তার নীতিহীনতা পুত্র মোবারক হোসেনকে প্রতিবাদী করে তোলে। মোবারক বামপন্থার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পাকিস্তান সরকারের আমলে জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশের গুলি খেয়ে মরে। স্বামীর মৃত্যুর পর মোবারকের স্ত্রী পুত্র ইকবালকে বড় করে তোলে। কিন্তু ইকবাল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতার সম্পত্তির অংশ দাবি করলে ইলিয়াস আমাদের সচেতন করে দেন-‘বাবা যখন ব্যক্তি-মালিকানার বিরুদ্ধেই ছিল এবং পৈতৃক সম্পত্তির কথা তোলার আগেই যখন তার মৃত্যু হয়েছে, তখন বাবার কাছে সে কি করে সেখানে ভাগ বসাবার চেষ্টা করে? শরিয়াতে এরকম বিধান নেই। বাবা বেঁচে থাকতে ছেলের মৃত্যু হলে মৃতপুত্রের ছেলে-মেয়ে কিছুই পায় না।’[৫] পিতামহ-পিতৃব্যের অনুদার- অর্থলিপ্সু স্বার্থকেন্দ্রিক চরিত্র- বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের পক্ষে আলোচ্য উক্তিটিই যথেষ্ট। শরিয়াতের ধুয়ো তুলে সমগ্র সম্পত্তি হস্তগত করার ক্ষেত্রে “বাবার- বাবা” মোয়াজ্জেম এবং বড় চাচা “মোতাহার” এর ভূমিকা এখানে তুলে ধরার মতো।

“দোজখের ওম” ইলিয়াসের শেষ গল্পগ্রন্থ। বিশ শতকের আশির দশকের শেষ লগ্নে লেখা—“কীটনাশকের কীর্তি”, “যুগলবন্দী”,“অপঘাত”, “দোজখের ওম”। ধনাঢ্য মনিব সরোয়ার কবিরের এক নগণ্য ভৃত্য রমিজ। গ্রাম জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত নিম্ন মধ্যবিত্ত রমিজ নাগরিক জীবনের সবটুকু ভোগকারী সাহেব - মেমসাহেব ও তাদের পুত্র- কন্যাদের জীবনযাপনের প্রতি প্রকাশ করে শ্রেণীবিদ্বেষ - ক্রোধ - প্রতিহিংসা। বোন সদ্য যুবতী অসিমুন্নেসার অকাল মৃত্যু এবং মনিব কন্যা শাম্মির প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনরঙ্গ রমিজের মাথায় মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে যায়। তৈরি হয় সাইকো সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার, রামিজ ভাবি ‘পোকার ওষুধে যদি এতই শক্তি থাকে যে বুবুর নীল দেহ নিঃসাড় করে ফেলতে পারে।তাহলে সাহেবের মেয়ের ঠোঁটে এ জিনিস লাগিয়ে দিয়ে দেখা যাক না কি হয়।’[৬]

“কীটনাশকের কীর্তি” গল্পের এই মানসিক বিকার বাংলাদেশের সোশিয়-ইকোনমিক স্ট্রাকচারের ত্রুটি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে। ‘যুগলবন্দী’ গল্পটিও বেশ উল্লেখযোগ। অবসরপ্রাপ্ত পোস্টমাস্টারের পুত্র আসগর এবং তার মনিব সরোয়ার কবিরকে নিয়ে লেখা। এই দুজনের কেউই তার বর্তমান অবস্থানে সন্তুষ্ট নয়। কবির যেমন উচ্চবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত হওয়ার চেষ্টায় রত তেমনি আসগরও চায় যেনতেন প্রকারে মালিকের ইকোনোমি স্ট্যাটাসকে ছুঁতে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত হতে। একাত্তর পরবর্তী মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্তের এই অকারণ অর্থলিপ্সা প্রবণতাকে লেখক উপস্থাপিত করেছেন আলোচ্য গল্পে। সঙ্গত

কারণেই ইলিয়াসের একটি ব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ্য: ‘মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত কী উচ্চ-মধ্যবিত্তের চরিত্র অনুসরণ করা কঠিন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং আর বাপ-দাদার শ্রেণীতে পড়ে থাকতে চায় না, সবারই টার্গেট বড়লোক হওয়া। যে যে পেশায় থাকুক না, ওর মধ্যেই পয়সা বানানোর ফন্দিফিকের বার করার তালে থাকে।

মোবারক আলির মানসিক পরিবর্তন এবং মধ্যবিত্তের নিশ্চিত সুখের ছোট বিবর থেকে তার বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা চিত্রিত হয়েছে “অপঘাত” গল্পে। কেরানি মোবারক আলির ছেলে বুলু মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয়। বাড়ির খুব কাছেই পাক সেনাবাহিনীর ক্যাম্প হাওয়ায় বুলুর বাবা মা উচ্চস্বরে কাঁদতেও পারে না। পাছে সেনাবাহিনীর লোকজনের অত্যাচার শুরু হয়। কিন্তু মোবারক আলি নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে সাহস সঞ্চয় করে এবং মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক হয়ে ওঠে মানসিকভাবে। নিশ্চিত সুখের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে তুচ্ছ করে মিলিটারির অত্যাচার আর মৃত্যু ভয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সে গ্রামের সবাইকে ডেকে নিয়ে বুলুর বীরচিত মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করে গর্বের সঙ্গে। মোবারক চরিত্রের এই পরিবর্তন আখ্যানকারের অভীষ্ট। “দোজখের ওম” গল্পের ধর্মীয় শোষণ ব্যবসা ভক্তিবাদের আধিপত্য, রাজনৈতিক লুটেরাদের আগ্রাসন অংকুরে বিনষ্ট করেছিল মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্তের বাঁচার স্বপ্নবীজ - পার্টিশন- পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশকে। ব্যঙ্গ আর দ্বিধাদীর্ণ - কামালউদ্দিন চরিত্রেরা মাধ্যমে ইলিয়াস এই সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়েছেন।

ইলিয়াসের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ‘জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল’ গল্পগ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় কলকাতার অনুষ্টুপ প্রকাশনী থেকে। পরবর্তীকালে ঢাকা থেকেও এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গল্পগ্রন্থে মোট পাঁচটি গল্প আছে-“প্রেমের গপ্পো”, “ফোঁড়া”, “জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল”, “কান্না”, “রেইনকোট”। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে যে সত্তাগত বিচ্ছিন্নতা, অপরিণামদর্শী অদূরদর্শী উন্মত্ততা গেঁড়ে বসেছিল তা জাহাঙ্গীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে “প্রেমের গপ্পো” গল্পে লেখক উন্মোচিত করেছেন। “ফোঁড়া” গল্পে শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতন মামুনরা তাদের মধ্যবিত্ত সুলভ মূল্যবোধ আর সংস্কৃতির দৃষ্টিপেক্ষায় রিক্সাওয়ালাদের মত শ্রমজীবী মানুষকে বুঝতে পারে না। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে রয়ে যায় শত যোজন দূরত্ব -’.... তার আহ্বানে সাড়া দিতে গেলে মামুনের চোখে পড়ে রিক্সাওয়ালার নুনু ও বিচি। ফোঁড়ার ব্যথায় লোকটা কি পাগল হয়ে গেল? “আরে মিয়া কাপড় পরো ঠিক করে!” বলে তার দিকে পাঁচ টাকার একটা আস্ত নোট ছুঁড়ে মামুন বাড়ির দিকে পা ফেলে।’[৮] বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না মামুনের আত্মত্যাগ কপট বামপন্থার প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

“কান্না”, গল্পটি দরিদ্র ও নিরাপত্তাহীনতার এক বিকল্প পাঠ। মৌলবি আফাজ আলির



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

মানসিকগুলা চলতা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। “জাল স্বপ্ন,স্বপ্নের জাল” গল্পে আছে স্বাধীনতা বিরোধী নাজির আলির স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে হয়ে ওঠা মধ্যস্বত্বভোগী দেশপ্রেমীদের একজন কাহিনী। আর “রেইনকোট” গল্পে আছ মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন-এর ক্ষত-বিক্ষত অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বমান হয়ে ওঠার কাহিনী। ভীতু সংসারে প্রভাষক হুদা সুবিধাবাদের অনস্তিত্ব থেকে বিপরীতমুখী সদর্থক চেতনায় অস্থাশীল হয়ে একাত্ম হয়ে যেতে পারে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যা মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু চেতনায় সংযোজন করে সদর্থক সংকল্প এবং নাস্তি থেকে অস্তিমান হয়ে ওঠার ইতিবাচক প্রবৃত্তি- প্রবণতার- প্রচেষ্টা।

এইসব গল্প- উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতার থেকে খুব সহজেই বলা যায় আমাদের আলোচ্য কথাকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এক ব্যতিক্রম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। যা মধ্যবিত্ত রুচির বিপরীত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। একটা সময় পর্যন্ত বাংলা গল্প উপন্যাসের রচয়িতা তাঁদের জনরুচির জন্য প্রলেপ দিয়েছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে কোথাও আর কোন মোচড় দেননি। কোথাও নতুন রুচি নির্মাণের চেষ্টা করেননি। এমনকি মধ্যবিত্ত জনজীবনের সমস্ত বঞ্চনা অপ্রাপ্তির বাইরে যে বিপুল জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখেননি। আর দেখেননি বলেই সেই বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনের ভিতরে যে উত্তাপ, মধ্যবিত্ত রুচির বিপরীতে যে “শ্লীল” আর “অশ্লীলতা”র মাত্রা যা বাইরেই থেকে যায়। তাই বাংলা গল্প উপন্যাসে নিম্নবর্গের জীবন মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখা, মধ্যবিত্ত রুচি বোধেরই প্রকাশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। আর আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সেই রুচিবোধের সবচেয়ে বড় প্রকাশক। হয়তো সেই কারণেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মধ্যবিত্ত জনজীবনের বাইরে জীবন আর মধ্যবিত্তজীবনের ভিতরের পঙ্কিলতা ক্লেদ খুঁচিয়ে নাড়িয়ে দেখান। তখনই আমাদের অভ্যস্ত রচিতে ঘা লাগে। ঘা লাগে এইজন্য, মধ্যবিত্তজীবনের বাইরে যে বিপুল জনগোষ্ঠী - তাদের জীবনযাপন, ভাব আর ভাষার বিনিময় তো মধ্যবিত্ত রুচিস্নিগ্ধ জীবনের সঙ্গে মেশে না। মেশার কথাও না। ওই ভাষা ওই জীবনেরই চালিকাশক্তি। ওই জীবনযাপনের প্রধান উৎস আর অবলম্বন যে কায়িকশ্রম সেখানে ওই ভাষা আর চিন্তাই সমস্ত প্রকার চলমানতার উৎসমুখ। এইদিকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখায় আমাদের মধ্যবিত্ত রুচিতে ঘা বা ক্ষতেরও সৃষ্টি হয়। ফলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনা যখন পড়ি, তখন আমাদের সামনে আসে- বাইরের জীবন থেকে এসে লাগে, “আমাদের মধ্যবিত্ত রুচিবোধের ধাক্কা”। মধ্যবিত্তের জনরুচিকর সমস্ত বিনোদনের সঙ্গেও জীবনের তফাৎ বিস্তার- এতটাই যে তা কখনও কখনও প্রায় মেলেই না। সে বানানো কৃত্রিম জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু, সে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। ইলিয়াসের লেখা

আমাদের ঘা কে খুঁচিয়ে বেঁচে থাকাকে বাস্তব করে তোলে প্রতিদিন। বানানো জনরুচির সঙ্গে যা যায় না, তার থেকে দূরে থাকার প্রবণতার বাইরে নিয়ে যান ইলিয়াস। ফলে প্রতিদিনের মেকি আর আপাত স্বস্তিকর জীবনের মুখোমুখি হতে বারবার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখাকে পাঠ করা সম্ভব-বলেই আমাদের মনে হয়।

**তথ্যসূত্র :**

১. হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোট গল্পের বিষয় ও প্রকরণ, সরিফা সালোয়া ডিনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমি ২০১০, পৃষ্ঠা ২৭ ৪

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস সম্পাদিত, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা ৫০

৩. ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৮

৪. ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৮

৫. ঐ, পৃষ্ঠা ২১৪

৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: নির্মাণে বিনির্মাণে, আলাউদ্দিন মন্ডল, ঢাকা, মাওলা বাদার্স, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩৬১

৭. হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের বিষয় ও প্রকরণ, শরিফা সালোয়া দিনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩২৯

৮. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র ১,ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩৫০



## আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের যন্ত্রণা ও প্রত্যয়ের সংকট

**অসীম মুখার্জি**

ছয়ের দশকে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আত্মস্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল। তিনি তাঁর সমকালীন গল্পকারদের মতো নিরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন না। সময় সমাজের দ্বন্দ্বময় উত্তরণের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত রেখেছেন নিজেকে, নিজের সৃষ্টিশীল জগৎকে। ছয়ের দশকের বৈশিষ্ট্য, নিজস্বতার সন্ধান, তাঁর গল্পে পূর্ণমাত্রায় ধরা পড়ে। দ্বন্দ্ব -সংঘাতময় জীবনের অস্তিত্ব সংকট, অর্থনৈতিক নিপীড়ণ, শোষণ,জুলুমে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষের গভীর জীবনসত্য শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁর গল্পে। সমকাল থেকে লেখক গ্রহণ করেছেন গল্পের উপাদান।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯ সময়পর্বে বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমকালীন দেশকালের সুস্পষ্ট পদচিহ্ন দৃশ্যমান। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পালাবদলে পূর্ব-পাকিস্তানের জনজীবনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। শুরু থেকেই পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বিরোধ বাধে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই শোষণ-জুলুম, অন্যায় অত্যাচার চালায়। সেই কারণে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের ছোটোগল্পকাররা গল্প রচনার অনুকূল পরিবেশ পাননি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তখন খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি ও পুরনো ধ্যান-ধারণারকে মেনে নেওয়া হয়েছে। সমাজের ক্রমাগ্রগতি ও মুক্তবিশ্বাস পালনের মতো অনুকূল পরিবেশের সুযোগ তখন ছিল না। সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিরুদ্ধ পরিবেশ, অবিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি-এই দুই প্রতিকূল পরিবেশ বাংলাদেশের লেখকদের হৃদয়কে আরো সংকীর্ণ করে তোলে। তাই তাদের গল্পে লক্ষ্য করা যায় পুনরাবৃত্তি।তাঁরা এই সময়ে মুখ্যত গ্রামজীবনকেই গল্পের প্রধান ভিত্তিভূমি করেছেন। ঠিক সেই সময়পর্বে আখতারুজ্জামানের জন্ম।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ সচেতন লেখক। তিনি সমাজের অলিতে, গলিতে ঘটে যাওয়ার অতি সাধারণ বিষয়গুলিকে সাহিত্যরূপ দিয়ে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।তাঁর রচনায় সামাজিক অন্যায়, শাসন,শোষণ, অত্যাচার, কুসংস্কার, হিংসা, ক্রোধ, উদারতা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি কাহিনি রূপ পেয়েছে। বিত্তবৈভব যদিও সামাজিক মর্যাদার আসল মানদণ্ড নয়, তবুও আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মানুষ হিসেবে সকলের আসন একই জায়গায়, এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করানোর প্রয়াসেই লেখক “উৎসব” গল্পের ফাঁদ পেতেছেন। আনোয়ার আলি, কাইয়ুম, হাফিজ, গল্পে এরা একই কলেজে পড়ে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এরা প্রত্যেকে ভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়। কয়েক বছর পর কাইয়ুমের বিয়ের উৎসবে গিয়ে আনোয়ারের নিজেকে বঞ্চিত,

হীন, দরিদ্র বলে মনে হয়। ধানমণ্ডির সুসজ্জিত উৎসবের বাড়ি থেকে ফিরে, পুরনো ঢাকায় তার নিজের বাড়িতে আসার পর  তার সবকিছু যেন পানসে বলে মনে হয় । ধানমণ্ডি ও পুরনো ঢাকার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ইলিয়াস দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি মানুষের জীবনচিত্রকে অন্যভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পকার প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত চিন্তাধারার ক্রম পরিবর্তনকে দেখিয়েছেন—

'বিরাজ করছে রহস্যময় মহা শূন্য। দেশী-বিদেশী মেয়েমানুষ ভরা গাড়ি একেকটা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, উড়াল দিচ্ছে অন্য কোন ইন্দ্রপুরীর দিকে'[১]।

স্বাধীনতা পরবর্তী এক হিন্দু পরিবারের জীবন কাহিনি নিয়ে লেখক "অন্য ঘরে অন্য স্বর" গল্পটি রচনা করেছেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই গল্পে। নারায়ণগঞ্জের এক ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান ননী, দেশভাগের কারণে স্বাধীনতা পূর্বে ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তার আত্মীয়-স্বজন চলে যায় কলকাতায়। অপর দিকে কলকাতা পরিবারের সন্তান হল প্রদীপ। সে ভিন্নকাজ নিয়ে আসে বাংলাদেশে।কাজের ফাঁকে সে দেখতে যায় তার কলকাতার পৈতৃক বাড়ি, আত্মীয় স্বজনদের। অপরদিকে ননীও কাজের ফাঁকে নিজের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে ফিরে আসে। ননী তার কাজ সম্পর্কিত অন্তরে জমে থাকা অনেক কথা ইদ্রিশকে বলে—

'কীসের বিজনেস ? এই দ্যাশে ক্যামনে থাকি ? বিজনেস এট্টু যদি ভালো হইছে তো চান্দা লইয়া ব্যাকটি পয়সা খসাইয়া লইবো'।[২]

ইলিয়াস এই গল্পে দেশের সার্বিক সাবলীল পরিস্থিতি বর্ণনা করে আশ্চর্য অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

কে না বাঁচতে চায়? ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের একটাই ইচ্ছে একটু ভালো করে বাঁচা। অজ্ঞানতা, অশিক্ষা সমাজকে পিছিয়ে দেয়, এই বাস্তব সত্য সর্মকে ওয়াকিবহাল করার লক্ষ্যেই 'অসুখ-বিসুখ' গল্পটির অবতরণ। আতমন্নেসা একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ নারী, সে প্রতিমুহূর্তে ঈর্ষান্বিত হয় লোকের সুস্থ জীবনযাপন দেখে। এই ঈর্ষায় তার অক্ষমতা প্রকাশ পায়। যারজন্য তার মনে জন্ম নেয় ক্ষোভ।তাই তার কথায় প্রকাশিত হয় নিম্নবিত্ত পরিবারের না পাওয়া হাজারো ফর্দের কথা। আতমন্নেসার মেয়ে মতিবানুর স্বামী তার আতমন্নেসার জন্য সবসময় ফলমূল নিয়ে এলেও ওষুধ নিয়ে আসে না।  কারণ তার অসুস্থতাকে কেও পাত্তা দেয় না। তাই সে নাতি আলমকে পান ও পয়সার লোভ দেখিয়ে মতিবানুর কাছে রাখা সমস্ত ওষুধ নিজের কাছে এনে রাখে সুস্থ হবার লোভে। এবং সমস্ত ওষুধ খেয়েও ফেলে, ফলে তার অসুস্থতা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, সেখানে চেক আপ করার সময় তার ক্যানসার ধরা পড়ে। যা অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার ফল। এই রোগ থেকে তাঁর বাঁচার একটি উপায় তা হল- মৃত্যু। তবুও সে এই আশায় বাঁচে ডাক্তার তাকে অনেক ওষুধ দিয়েছে বলে। এখানে আতমেন্নসার শারীরিক





ব্যাধি থেকে মানসিক ব্যাধি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পটির মধ্যে দিয়ে লেখক নিম্নবিত্ত মানুষের অসুখ-বিসুখকে জীবনসঙ্গী করেছেন।এটাকে পাশে রেখেই চলতে হবে  তাদের সারাজীবন।

সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেরও শ্রমজীবী মানুষগুলো প্রতিমুহূর্তে নানাভাবে শোষিত হচ্ছে। অথচ এরাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই সভ্যত্যাকে ধরে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ এদেরকে বলেছেন 'সভ্যতার পিলসুজ'। চরিতত্রগত দিক দিয়ে এরা অতি সহজ সরল হয়, তাই এরা বুঝতে পারে না শোষণের কূটকৌশল।প্রতিনিয়ত জমিদার, জোতদার, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদেরকে শোষণ- জালে আবদ্ধ করে রেখেছে, এটা তারা বুঝতেই পারে না। তাই তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না, কারণ তাদের প্রতিবাদের ভাষাও জানা নেই। ভাঙন কবলিত শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা বর্ণনাই 'পায়ের নিচে জল' গল্পের প্রেক্ষাপট।  যমুনা পাড়ে বসবাসকারী মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে নদীভাঙনের ফলে, তবুও এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এদের মুখের ভাষা গল্পের কাহিনিকে আরও বেশি বাস্তবোচিত করে তুলেছে।

জীবন-মৃত্যু, বাস্তব-কল্পনা, বিশ্বাস - অবিশ্বাস, কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবন -সংগ্রাম ও সংঘর্ষ এই সমস্ত 'কান্না' গল্পের বিষয়বস্তু। এই গল্পে আফাজ আলী তার পুত্র হাবিবুল্লাকে তার মত জীবানদর্শে দীক্ষিত করতে চায় নি, চেয়েছিলো স্বাবলম্বী ভাবে তাকে গড়ে তুলতে।কিন্তু হাবিবুল্লার অকালমৃত্যু তার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত হতে দেয় নি।প্রতিনিয়ত মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে তার আশাতীত বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানায়।কিন্তু বাস্তবে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে তারা আশানুরূপ ফল পায় না, এতেই তাদের জীবন চলার পথে সংকট তৈরি হয়।আর এই সংকটই তাদেরকে হতাশায় নিমজ্জিত করে। এইরকম হতাশা, যন্ত্রণা থেকে উত্তারণের পথ হিসেবে লেখক নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে বলেছেন।

'দুধভাতে উৎপাত' গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্য দিয়ে আখতারুজ্জামান নতুন পর্বের সূচনা করেন। শহর জীবন থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন গ্রাম- বাংলার জীবনে। বিশেষত 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক সংকট ও দরিদ্র্যতা মধ্যবিত্ত বাঙালি মানুষকে কীভাবে গ্রাস করেছে তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। আধমণ চালের দাম শোধ না করতে পারায় জয়নাবের কালো গরুটা নিয়ে যায় হারুণ মৃধা। ঋণ শোধ করে দিলেও পরে আর সেই গরু তার কাছ থেকে ফেরৎ পায় না।জয়নাব এখন রোগে ভুগে বিছানায়।তার সাধ ওই কালো গরুটার দুধ দিয়ে সে ভাত খাবে, এবং ছেলেমেয়েদেরও খাওয়াবে। ছেলে ওহিদুল্লা দুধের জন্য তার কাছে  যায়, পরক্ষণে সে বলে ওঠে- 'তর মা বুইড়া মাগীটার ঢঙের হইছে দুধভাত খাইবো'[৩]। জয়নাবের বড় জা হামিদা চালের গুড়ি জ্বাল দিয়ে তার কাছে নিয়ে আসে। জয়নাবের নিজের হাতে মাখা দুধভাত ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে

এগিয়ে দেয়, মেয়ে খাদিজা ইচ্ছে করে তার মায়ের মাখা দুধভাত আঙুল সমেত চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে। অপরদিকে দুধভাত খেয়ে জয়নাবের বমি শুরু হয়। ওহিদুল্লারও ইচ্ছে করে স্ত্রীর হাত থেকে সানকিটা কেড়ে নিয়ে দুধভাত সমেত চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে। দুধের অনটনের পাশাপাশি ভাতের অনটনকে লেখক কৌশলে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এই গল্পে।

'দোজখের ওম' গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক শহর ও গ্রামের দ্বান্দ্বিক অবস্থানকে নিপুণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। আর্থিক অনটনের জন্য নিরীহ মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে, শহরে ভিড় জমিয়েছে। তারই করুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই গল্পে।

গ্রামের অর্থনীতির দুরবস্থা, মাতব্বর ধনিক শ্রেণির শোষণ, এবং দ্রুত অপরিকল্পিত নগরায়ণের চালচিত্র প্রকাশ পেয়েছে 'কীটনাশকের কীর্তি' গল্পে। রমিজ আলি গ্রাম্য যুবক। ঢাকায় এক ধনী সাহেবের বাসায় কাজ করে সে। তার বোন আছিমুন্নেছা দাম্পত্য কলহে অতিষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করে। রামিজ আলি এই খবর শোনার পর বাড়ি যেতে চায়।কিন্ত উচ্চবিত্ত প্রভাবশালী মনিবের পারিবারিক নানান কাজের চাপে সে বলতে পারে না বাড়ি যাবার কথা, টাকার প্রয়োজনের কথা। এতে তার রাগ, দুঃখ আর ক্ষোভ পরিণত হয় প্রতিহিংসায়।মালিকের কন্যা শাম্মীকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয় সে। আলি জানতো এই হত্যাকাণ্ডের পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে। তবুও সে তাকে হত্যা করে। লেখক ব্যর্থ রামিজের শাস্তি বর্ণনা করেছেন :

"গ্যারেজের ভেতর বাঁদিকে একটা থামের সঙ্গে রামিজের দুই হাত বাঁধা। কুণ্ডলী পাকানো শরীরে সে বসে রয়েছে। লাল টয়েটো গাড়ির পেছনের চাকায় মাডগার্ডে তার মাথা ঠেকানো"[৪]। এই গল্পে গ্রামের শ্রেণি বৈষম্যকে ইলিয়াস তুলে ধরেছেন শক্ত হাতে।

হত-দরিদ্র-নিরন্ন মানুষের জীবনকাহিনি নিয়ে "ফোঁড়া" গল্পটি রচিত। "আমাদের সমাজে দিন আনে দিন খায় বলে একটি শ্রেণি আছে"[৫], যাদের অবস্থা 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়'। এদের একদিন রোজগার বন্ধ থাকলে উপোস থাকতে হয় পরিবারের সকলকে নিয়ে। ঈদের আনন্দ কিংবা অসুস্থতা এদের স্পর্শ করে না। লেখক ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন এইরকম মানুষদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে, যা নিঃসন্দেহে নিখুঁত এবং বাস্তব।

বাংলাদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থার চরম ভগ্নদশা তুলে ধরেছেন ইলিয়াস 'অতন্দ্র' গল্পের মাধ্যমে। চিকিৎসা ব্যবস্থার ভগ্নদশা চিত্রায়ণের পাশাপাশি ভগ্নস্বাস্থ্য ও অবদমিত যৌনচারের চমৎকার বর্ণনা আছে গল্পটিতে যার মধ্যে দিয়ে সেই সময়কার সমগ্র দেশ- জাতির স্বাস্থ্যহীনতার কথা জানা যায়।

'শোষণের চূড়ান্ত সীমায় বিপ্লব অনিবার্য'[৬]-এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'দখল' গল্পে, যা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ব্যক্তিবিশ্বাসের খানিকটা প্রমাণও বটে। এই গল্পে





বিপ্লবীদেরকে ক্ষণিকবিজয়ী হিসেবে দেখানো হয়েছে। যাতে দেশের তৎকালীন শাসন চিত্র লেখকের নিপুণ দক্ষতায় প্রকাশ পেয়েছে।

'পরিচয়' গল্পের মাধ্যমে লেখক ব্যক্তিচরিত্রের মুক্তিকে দেখিয়েছেন। শোষকের দ্বারা শোষিত মানুষের শোষণ পূর্বেও ছিল সমানভাবে বর্তমানেও তা বিদ্যমান। ইংরেজ শাসনের অবসানের সাথে সাথে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পায় সেইসময়কার বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষেরা।পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ সভ্যতায় এক নতুন শাসনব্যবস্থা মাথা নাড়া দেয়, তা হল এদেশীয় জোতদার, মহাজনদের শাসন। তাদের চোখ রাঙিনেতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে খেটে খাওয়া নিরন্ন, অসহায় মানুষগুলো। দেশভাগের জন্য অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায় বাংলাদেশে,সেইজন্য নিম্নবিত্ত মানুষগুলো নতুন রুজি-রোজগারের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে বাধ্য হয়। শহরে আসার পর এই নিম্নবিত্ত মানুষগুলো বুর্জোয়াদের নতুন চালে পণ্যতে পরিণত হয়। লেখক জুম্মন আলীকে সামনে রেখে এই গল্পের অবতরণ করেছেন।জুম্মন আলী ফকিরচাঁদ মহাজনের কাছে কাজ করে। জুম্মন আলী মহাজনের জন্য মদ আনতে গিয়ে ধরা পড়ে, তাতে তার কারাবাস হয়। এই খবর শোনার পর মহাজন আলীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিতে আসে। দারোগা জুম্মনের বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে মহাজন জানায় সে জারজ সন্তান। তাই মহাজন এইরকম সন্তানের অভিভাবকত্ব নিতে নারাজ হয়। জুম্মনের বাবা হল নাজিম পাগলা। নাজিমের পাগল অবস্থায় তার স্ত্রীর দায়িত্ব নেয় ফকিরচাঁদ। পরে যখন নাজিম সুস্থ হয়ে ওঠে তখন সে বুঝতে পারে মহাজনের আসল মুখোশ। পরবর্তী সময়ে নাজিম পাগলা আর পুত্র জুম্মন মহাজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। এই গল্পের মাধ্যমে লেখক সেইসময়কার মহাজনদের মেকি মানুষকতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

উচ্চবিত্ত এক পরিবারের কাহিনি নিয়ে 'যুগলবন্দি' গল্পটি রচিত। ব্যবসাবাণিজ্য ও অগাধ সম্পত্তির কারণে উচ্চবিত্ত শ্রেণির যোগাযোগ থাকে প্রায় সকল ধরনের মানুষের সঙ্গে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু লোভী মানুষ প্রভাবশালীদের লেজুড়বৃত্তি করে নির্দ্বিধায়।এই লেজুড়বৃত্তি বর্তমান সমাজে এক নতুন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারই পরিচয় আছে এই গল্পে।

ইলিয়াস সাহেবের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে যন্ত্রণা ও হতাশার মধ্য দিয়ে ,এই অবক্ষয়ের বিষাদময় রূপকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর ছোটগল্পের অন্তরে প্রকাশ করেছেন। ইলিয়াস বয়সের ভারে জীবন পরিণতির দিকে এগিয়েছেন কিন্ত তিনি কাঁটাতারে ঘেরা মধ্যবিত্ত মানুষের প্রয়োজনকে মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। পরিণতিহীন সময়ের বুকে মধ্যবিত্তের অবক্ষয় তাঁকে ঘুমোতে দেয়নি কারণ তিনিও মধ্যবিত্ত জীবনে বেড়ে উঠেছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের অকাল প্রয়াণ হোক এটা তিনি চাননি, আর চাননি বলেই কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন। যারফলে তাঁর ছোটগল্পে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের সেই স্বপ্ন,

স্বপ্নভঙ্গ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বিন্যাসের দিকটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যাতে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাঁর বিষয় নির্বাচনের গভীরতা গুরুত্ব ,রচনাশৈলী, ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা, বক্তব্যের বলিষ্ঠতার কারণে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল আসন করে নিয়েছেন।

**তথ্যসূত্র :**

১) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র (১ম খণ্ড) ষষ্ঠ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, মাওলা ব্রাদার্স,৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, পৃষ্ঠা-২৫
২) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০
৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৬
৪) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৫
৫) শামিমা নাসরিন ,আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সমাজগতির রূপায়ণ , ঢাকা-১১০০, পৃষ্ঠা-৭০
৬) মোস্তফা মোহাম্মদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে জীবন ও সমাজ, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, প্রতিভাস, ১৮ এ গোবিন্দা মণ্ডল রোড , কলকাতা- ৭০০০০২, পৃষ্ঠা-১৬৪



## ডোমের চিতা : নিম্নবর্গের অস্তিবাদী চেতনার আখ্যান

**মধুসূদন সাহা**

সমস্ত সাহিত্য, শিল্পই মানব জীবনের আখ্যান। তাই সেখানে প্রেম, ভালোবাসা, রাগ, হিংসা, ক্রোধ, জটিলতা থাকবেই। কিন্তু সর্বোপরি যে বিষয়টা সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল বেঁচে থাকার লড়াই বা অস্তিবাদ। বাঁচার জন্য এই লড়াই অস্তিবাদী দর্শন সম্পৃক্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের আধুনিকতা ও দ্বিতীয় পর্বের উত্তর-আধুনিকতা বা উত্তর-গঠনবাদী প্রেক্ষিত পর্যন্ত এই অস্তিবাদ সতত পরিবর্তনশীল। সমাজ-সংস্কৃতি অনুযায়ী বা বলা ভালো স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অস্তিত্ববাদ নিজের সংরূপ বদলায়। আর সেই ইতিহাসই সাহিত্যকারের লেখনীতে "master narrative" হয়ে ওঠে।[১] অনেকের মতে সোরেন কিয়ের্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫)-ই প্রথম অস্তিত্ববাদী দর্শনের জনক। প্রথমদিকে অস্তিত্ববাদী দর্শনে উঠে আসে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন। সেই প্রশ্নকে খানিকটা এড়িয়ে গিয়েই জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) ঈশ্বরবর্জিত এক অস্তিবাদী দর্শনের কথা বলেছেন। আসলে যে মুহূর্ত থেকে সাহিত্যে মানুষ সর্বাধিক গুরুত্ব পেল, সেই মুহূর্ত থেকেই ঈশ্বর, অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ এইসবকিছুর থেকে মানুষের অস্তিচেতনা অনেক বড়ো হয়ে উঠলো। কিয়ের্কেগার্দের বক্তব্য এক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য "Because I exist because I think–therefore I think that I exist I must exist in order to think.।"[২] অর্থাৎ "আমি" নামক সত্তাটি বা "আমিত্ব"টি সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেল। এই বিষয়টিই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কল্লোলিয়ানরা এবং তারও পরবর্তীকালের সাহিত্যিকগণ এড়িয়ে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমি" কবিতা অস্তিবাদকেই চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করে। রমেশচন্দ্র সেনের 'ডোমের চিতা' গল্পটি সেই অস্তিত্ব সংকট ও সংকট থেকে উত্তরণের নূন্যতম প্রয়াসের কথাই বলে।

গল্পকার গল্পের শুরুতেই দুজন প্রান্তজ তথা নিম্নবর্গের মানুষের কথা বলেছেন। নিম্নবর্গ বা সাব-অলটার্ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আন্তেনিও গ্রামশি ১৯২৯-১৯৩৫-এর মধ্যে লেখা তাঁর "Prison Notebooks" বা "কারাগারের নোটবই" গ্রন্থে। মুসোলিনির কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি মার্কসীয় পরিভাষা বর্জন করে বেশ কিছু নিজস্ব শব্দ যেমন মার্কসবাদকে "প্রাক্সিসের দর্শন", এবং শোষিত বা "প্রলেটারিয়াট" কে "সাবলটার্ন" (ইতালীয় পরিভাষায় যা সুবলতের্নো) এবং পুঁজিপতি শ্রেণিকে "বুর্জোয়াসি" বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে তিনি শাসক ও শোষিত শ্রেণির অবস্থানটি চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিলেন ঠিকই কিন্তু পাশাপশি দুটি শ্রেণির কতৃত্ব, প্রভুত্ব, ইতিহাসবোধ,

ধর্মবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি যে পৃথক সেটিও বুঝিয়ে দিলেন।[৩] গল্পকার রমেশচন্দ্র সেন স্বল্প বাক্যে, বেছে বেছে কয়েকটি ঘটনা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী দুজন ডোম হারু ও বদনের জীবনের কথা বলেছেন।

গল্পটির কাহিনিবৃত্ত রচিত হয়েছে একটা প্রকাণ্ড শ্মশান ও জলাভূমিকে কেন্দ্র করে। জলের মধ্যেই কচুরিপানা, তার মাঝে "রক্তশাপলা" ও "রক্তকমল"। এই দুটি ফুলের নামকরণের মধ্যেই লালের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। এই 'রক্ত' বা লাল হয়তো গল্পের শেষের মৃত্যুদৃশ্যকেই ইঙ্গিত করে। আর ঘাসের মধ্যে ফুটেছে ছোট ছোট নীল, বেগুনি বা ধবধবে সাদা ফুল। গভীর প্রশান্তি। এই জলরাশির মাঝে 'শুষ্ক প্রাণহীন' মাদারের ভিটে; 'যেন প্রকৃতির একটা অনিয়ম'। এখানে লক্ষ্যণীয় দুটি শব্দ প্রকাণ্ড বিল অর্থাৎ জলরাশির মধ্যে 'শুষ্ক প্রাণহীন" একটা ঘর। অর্থাৎ এখানে যে মানুষেরা থাকে তাদের যাপিত জীবন প্রাণবন্ত নয়। এবং তাদের এই জীবনযাত্রার জন্যই তারা যেন 'প্রকৃতির একটা অনিয়ম'। আসলে এরা ডোম। সমাজের প্রান্তে এরা বাস করে। চর্যাপদের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীতেও এরা সমাজের অচ্ছুৎ, কিন্তু সমাজের মৃতদেহ সৎকারের বিষয়ে এদের একান্তই প্রয়োজন। অথচ চর্যাপদের সময় থেকে সমাজের মধ্যে এদের কোন জায়গা হয় না "নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।" গল্পের তৃতীয় অনুচ্ছেদে এসে গল্পকার তাদের সঙ্গে পরিচয় করান—

"এই ভিটায় দুটি ডোম থাকে হারু ও বদন। দুজনেই প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান, কালো মিশমিশে তাদের গায়ের রং। হারুর মাথায় ছিল একটা বাবরি। বদনের চুল কদম ফুলের মতো চারদিকে সমানভাবে ছাঁটা"।[৪]

প্রকাণ্ড জলরাশির মধ্যে এই মাদারির ভিটেটি কেন্দ্র করে শ্মশান। দুদিকে দশ মাইল দূর থেকে এখানে মানুষ আসে অন্তিম সংস্কারের জন্য। এরাই প্রান্তজ। কুড়ি বছর ধরে এই 'দুটি' মানুষ এই কর্মে একইভাবে নিযুক্ত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'দুটি ডোম'; তারা দু'জন নয়। 'দুটি' শব্দটি সংখ্যাবাচক। অর্থাৎ ওই দুজন মানুষ ও তাদের জীবন সমাজের কাছে নিতান্তই অবহেলিত সেকথা বোঝাতেই গল্পকার এই সংখ্যাবাচক শব্দ ('দুটি')-টি ব্যবহার করেছেন। আর এই নির্জন আস্তানায় তাদের আত্মীয়-পরিজন বা আপন-পর কেউ নেই। তারা দুজনেই দুজনের সঙ্গী। আর আছে চূড়ান্ত দারিদ্র্য। তারা সমাজ বিচ্ছিন্ন। তারা দুজনে কোন সম্পর্কসূত্রে একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ সেকথা গল্পকার কোথাও বলেননি। আসলে এর মধ্যে দিয়ে গল্পকার উভয়ের মানবিক সত্তাটিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নূন্যতম অর্থ উপার্জন করে পেট চালানোর জন্যই তাদের এই জীবিকা নির্বাচন। তাদের যাপনের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন কাঠ বিক্রি করে, মাছ ধরে, 'মৃতের উদ্দেশে প্রদত্ত



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

চাল, ডাল, ফল-ফলারি সিদ্ধ' করে তাদের উদরান্নের সংস্থান হয়। এখানেও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো, সাধারণ মানুষের ইহলৌকিক কর্ম সম্পাদনের বা শেষকৃত্যটি সম্পাদন করে এই দুজন ডোম। কিন্তু তাদের ইহলোকে জীবনযাপন ভীষণভাবে দুরুহ। এর পরের অংশটি পড়ে আমাদের খুব অবাক লাগে দুটি মানুষের এই অদ্ভুত জীবনযাত্রা দেখে। সমাজ বহির্ভূত হয়েও বদন ও হারু অসামাজিক বা অমানবিক নয়। তাদের হৃদয়বত্তা আছে। মৃত্যু যেখানে মানুষকে জীবনের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় অজানা কোনও পারে, সেই পার ঘেঁষেই বাস করে এই দুটি মানুষ। অনেকটা 'সোনার তরী' কবিতার কাণ্ডারির কথা মনে আসে। গল্পকার বলছেন—

"সমাজ সংসার সবই তাদের পরস্পরকে লইয়া। বাহিরের জগত এই ডোম দুটির কাছে অর্থহীন। জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহই যেন প্রাণবন্ত।"[৫]

জীবনের সার যখন মৃত্যু সেকথা জানার পরও মানুষ আশাবাদী, মানুষ ভোগবাদী, সব থেকে বড়ো বিষয় অস্তিবাদী। মানুষের মৃত সত্তাটিকে নিয়েই এই দুটি মানুষের দিন-রাত্রির কারবার। তাই তাদের কথোপকথনে কোনও জীবিত মানুষের কথা নেই। কোন মৃতদেহ কিভাবে পুড়লো, কোনটার হার কতখানি শক্ত এইসবই তাদের নিত্যনৈমিত্তিক যাপিত জীবনের আলোচ্য বিষয়। তার সঙ্গে আছে শুধুই অভাবের অনুষঙ্গ। মৃতদেহ নিয়ে কাটাতে কাটাতে তাদের মধ্যে এক অসম্ভব জান্তবসত্তা যে বিরাজ করেছে তার উল্লেখও আছে। আসলে মানুষের দৈনন্দিন যাপন ব্যক্তিসত্তা নির্মাণ করে। তাই 'মৃতদেহের অস্বাভাবিকতা' নিয়ে 'হিংস্র জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো বিকট'ভাবে তারা হাসে।

এরপরের অংশটি গল্পের ক্ল্যাইম্যাক্স পর্যন্ত নিয়ে যায়। দুদিন ধরে ওই শ্মশানে কোনও মৃতদেহ আসে না। চূড়ান্ত অভাব। ঘরে একমুঠো চালের বন্দোবস্তও নেই। চাল কিনতে যেতে হয় প্রায় এক ক্রোশ পথ। তার উপর বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি। প্রথম দিন অতিবাহিত হয় শুকনো ছোলা চিবিয়ে। আর যা অর্থ তাদের সঞ্চয়ে আছে তা দিয়ে দুই সেরের বেশি চাল হবে না। এইরূপ কঠিন পরিস্থিতিতেই বদন "শূকরের মতো অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিল' এ রাজ্যে দুদিনের মধ্যে এক বেটাও মরল না। মানুষগুলো দিন দিন অমর হয়ে উঠেছে।"[৬]

মানুষ হয়ে মানুষের মঙ্গলকামনার থেকে তারা মানুষের মৃত্যুকামনা করে। আসলে হারু ও বদন সমাজ বহির্ভূত। খিদে ও অভাব তাদের মধ্যে নূন্যতম মানবিকসত্তাটিকে প্রকাণ্ড বিলের জলে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করেছে। কারণ সমাজের কাছে তারা অস্পৃশ্য। নিম্নবর্গের ধর্মবোধ যেভাবে সমাজ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বদলায়, শুধু তাই নয় শ্রেণিভেদেও বদলায়। তাই তারা মানুষের মৃত্যুকামনা করে নিজেদের অস্তিত্বটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

গভীর রাতে উচ্চ পদ্মরাজ জাতির এক পিতা এসেছে মধ্যরাত্রে। অথচ পদ্মরাজ জাতিতে উচ্চ। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে তাকেও আসতে হয়েছে সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী এই দুটি মানুষের কাছে। কোলে তার মৃত সন্তান। পকেটে সম্বল মাত্র এক টাকা। কিন্তু এক টাকায় বদন কোনমতেই রাজি হয় না। অবশেষে সেই পিতা নিরুপায় হয়ে, হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে অদৃষ্টকে দোষারোপ করতে থাকে। শিশুর মৃতদেহটিকে জলে শকুন ও কাছিমের মুখে ফেলে দিতে বাধ্য হয়। তখন আমরা হারুর মধ্যে তার লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্বকে স্বল্প জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাই। হারু বদনকে অনুরোধ করে "দে ভাই, অমন করে কাঁদছে।" বদনের প্রত্যুত্তরটি আমাদের বিশেষ করে হতবাক করে "আরে না মরলে আমাদের কাছে কেউ আসে না। মড়ার দুখু দেখে গললে চলবে কেন?"এ যেন তাদের অস্তিচেতনাকেই চূড়ান্তভাবে সত্য করে তোলে। সৎকার এখানে একটি সংস্কার কিন্তু বেঁচে থাকাটাকেই বেশি থাকাটা জরুরি। গল্পের এই অংশেই অস্তিবাদী চেতনার বিকাশ। যে পিতা তার সন্তানকে হারিয়ে শশ্মানের প্রান্তে শিশুর মৃতদেহটি নিয়ে অপেক্ষমান অন্তিম সংস্কারের জন্য, অর্থের অভাবে সেই কার্যটি অসম্পন্ন থেকে যাওয়ার উপক্রম হয়। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অনুভূতি সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব যুক্ত মানুষের সমাজের মধ্যে। কিন্তু গল্পের এমন পরিণতির সামনে দাঁড়িয়ে তা মিথ্যা হয়ে যায়। কারণ সেই আমরা কেউ গড়ে তুলতে পারিনি। তাই এত জাতি-বর্ণ-বর্গগত ভেদাভেদ। এরপর সেই শিশুর পিতা আরও এক টাকা পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বদন সেই শবদেহের সংস্কার করতে রাজি হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গল্পকার তৎকালীন সমাজ-অর্থনীতির দিকটিকেও আলোকপাত করেছেন। কিন্তু পরপর দুদিন না খেতে পাওয়া দুটি মানুষ তখনও ক্ষুধার আগুনকে অস্বীকার করতে পারে না। বদন সেই এক টাকা ও কয়েক আনা পয়সা দিয়ে ওই শিশুর পিতার সামনেই হারুকে বলেছে—জলদি গিয়ে চাল নিয়ে আয়। চিতা নিবে যাওয়ার আগে ফিরবি। তা না হলে আবার জ্বালানি কাঠ লাগবে।[৭]

একথা শুনে শিশুর পিতা অবাক বিস্ময়ে বদনের মুখের দিকে নির্বাকভাবে তাকিয়ে থাকে। এখানেও অস্তিবাদ চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। এরপরেই আমাদের কাছে গল্পের প্রকৃত পরিণতিটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে।

চিতা নিভে গেলেও হারু আর ঘরে ফেরে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদনের ক্ষুধা আরও বাড়তে থাকে। দুদিনের অভুক্ত যাপনে নিজের মেজাজ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিঙি ছাড়া সেও অসহায়। চারিদিকে 'বাতাসের সো সো', কাকের ক্ক-ক্ক। কোনও জনমানুষের অস্তিত্ব নেই। সেই নির্জন এক জলাভূমিতে অভুক্ত, ক্ষুধার্ত বদন একবার পূর্বদিকে এবং



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

দক্ষিণদিকে হারুকে উচ্চস্বরে খুঁজতে থাকে। "দূর হইতে একটা শকুনি চীৎকার করিয়া উঠিল কর্-র-র-র-।"[৮] এখানে এই তিনটি শব্দই রূপক হিসেবে গল্পকার ব্যবহার করেছেন। এবং এই শূন্যতা বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দগুলি মৃত্যুকেই ইঙ্গিত করে। শকুনির কণ্ঠস্বর মৃত্যুরই ইঙ্গিতবাহী। আমাদের পরিণতি বুঝতে আর ততটা অসুবিধা হয় না। বৃষ্টি থামলে একটা ন্যাড়া গাছের উপরে উঠে সে চারিদিক চেয়ে দেখে। ন্যাড়া গাছও এখানে প্রতিকী। এভাবেই ওই রাতটাও অভুক্ত অবস্থায় কাটে বদনের।

পরের দিন নতুন সংগ্রাম। সকালের দিকে 'একদল ভদ্রলোক' একজন স্ত্রীলোকের শবদেহ সংস্কারের জন্য আসে। কিন্তু শ্মশানে তখন দাহ করার মতো কোন কাঠ নেই। বদন তাদের কাছে হারুর খবর জানতে চাইলে তারা কোনও খবর দিতে পারে না। তাদেরই নৌকাটি নিয়ে সে কাঠ জোগাড় করতে যায়। ঘন্টাখানেক পর আমরা দেখি বদন সেই নৌকাটির সঙ্গে আর একটা ডিঙি বেঁধে নিয়ে আসে। তার উপর একটি নীল, ফুলে যাওয়া শবদেহ। আমাদের কাছে প্রভাতের আলোর মতোই হারুর মৃত্যুটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এক ভদ্রলোকের প্রশ্নে বদন বলে

পাতিয়ার বিলে। সাপে ওর হাত কামড়ে দিয়েছে। ডিঙির মধ্যে সের দশেক লাল মোটা চাল এবং কয়েকটা কই মাছ ছিল। কই মাছগুলি হারুর দেহের দুচার জায়গা খাইয়া ফেলিয়াছে, পাখিতে ঠোকরাইয়া শবটিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে।[৯]

খুবই ভয়াবহ এক মৃত্যু দৃশ্য। এর মধ্যে দিয়েই গল্পের নামকরণ সার্থকতার দিকে এগিয়েছে। যদিও তা নিয়তি দ্বারা পরিচালিত। আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের শুরুতেই হারুর মৃত্যুর সঙ্গে 'ডোমের চিতা' গল্পের ডোম হারুর অকাল মৃত্যুর সাদৃশ্য লক্ষ করতে পারি। এক অদৃশ্য নিয়তির শিকার হারু। খানিকটা বদনও। আত্মীয়-পরিজনহীন, সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় দুটো মানুষ এক অসীম জলরাশির মধ্যে লোকজীবন বহির্ভূত যে যাপন জারি রেখেছিল তার কোনও ইতিহাস নেই কিন্তু তাদের বেঁচে থাকাটা একটা লড়াই। সমাজের প্রান্তে বাস করার জন্য এদের লড়াইটা নিম্নবর্গের লড়াই। তাদের সমাজ না থাকলেও আমাদের সমাজে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

হারুর মৃতদেহটি নিয়ে এসে বদন ওই স্ত্রীলোকের শবদেহটির সংস্কার করে। তারপর ভিটের পুরনো গাছের কাঠ দিয়েই সুন্দর করে হারুর চিতা সাজায়, যত্ন সহকারে হারুর দেহটি উপরে তোলে। নীল রঙের ধোঁয়া সাপের কুণ্ডলির মতো আকাশের দিকে উঠতে থাকে। এই নীল ধোঁয়া আসলে সাপের বিষের পাশাপাশি সময় তথা সমাজের বিষবাষ্পের প্রতীক। যে সমাজ শ্রেণি ও বর্ণ বৈষম্যে আজও বিশ্বাসী সেই সমাজে দাঁড়িয়েই আমরা মুক্তির সপ্ন দেখি। সেই সমাজের বাইরে এক নির্জন জলো প্রান্তরে হারু ও বদনের এই

নির্বাসন আসলে সমাজ ব্যবস্থার নিষ্করুণ দিকটিকেই চিহ্নিত করে। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া একটা গুমোট হয়ে আসা পরিস্থিতি। সেই ধোঁয়ায় বদনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। বিশ বছর ধরে হারু ও বদন এই মৃতদেহ সৎকারের কাজে নিযুক্ত। কিন্তু আজকের অবস্থার কথা সে দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। এইরূপ ধোঁয়া বদন আগে কখনো দেখেনি। ধীরে ধীরে তার মনে হয় ‘লোলজিহ্ব অগ্নিশিখা’, ‘যেন কতগুলি লাল সাপের ফণা; ক্রুদ্ধ তার গর্জন, অফুরন্ত তার হিংসাবৃত্ত’।[১০] প্রত্যেকটি শব্দ গল্পকার সমাজ ব্যবস্থার দিকেই অঙ্গুলিসংকেত করেছেন।

গল্পকার বদনের বেঁচে থাকার বাস্তবতাকেই শেষ অংশে বড়ো করে দেখিয়েছেন। এখানেই বড়ো হয়ে উঠেছে বদনের অস্তিবাদ, বদনের বেঁচে থাকার লড়াই। গল্পকারের বর্ণনা

হারুর চিতায় বদনের চাল চড়িল। বদন একদৃষ্টে হাঁড়ির দিকে চাহিয়া রইল। হাঁড়ির ভিতর চালের সঙ্গেই গোটা দুই মাছ সিদ্ধ হইতেছিল। ফুটন্ত ভাতের টগবগানি, চিতার চড়, -চড়াৎ চড় শব্দ—তাছাড়া সবই নিস্তব্ধ।[১১]

এই নিস্তব্ধতা বিশ বছরের একান্ত সঙ্গীকে হারানোর বেদনাকে প্রতিভাত করে। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকীত্ব আছে, নির্জনতা আছে। ভবিষ্যতের জন্য একটা চাপা হতাশাও বদনকে নিস্তব্ধ করে দেয়। লোকশ্রুতি আছে, কাক কখনো কাকের মাংস খায় না। শেষ পরিণতির জন্য বদন কখনোই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু পেশায় ডোম হওয়ার কারণে এই কাজটি তাকে করতেই হয়েছে। হারুর মৃত্যুতে বদন চূড়ান্ত অসহায়তা অনুভব করেছে। এটাও লক্ষণীয়, সমাজের উচ্চ শ্রেণি থেকে নিম্ন শ্রেণির সকল মানুষই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু অদৃশ্য নিয়তি স্থান-কাল ভেদে তার ভয়ানক রূপ নিয়ে হাজির হয়। বদনের জীবিকা বদলের কোন সম্ভাবনা বা সুযোগ সমাজে নেই, ভবিষ্যতের জন্য তার কোন সঞ্চয় নেই। সমাজ তাকে কখনোই আপন করে নেবে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে বদনের চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পরে। এই মর্মান্তিকতাই বদনের জীবনের সার সত্য। গল্পের নামকরণে তাই রমেশচন্দ্র ব্যঞ্জনার পাশাপাশি রূপককেও ব্যবহার করেছেন। ‘ডোমের চিতা’ যেমন ডোমের জ্বালানো চিতা অর্থেও বলা যায়, আবার এক ডোম বদন যে আর এক ডোম অর্থাৎ হারুর সৎকার করবে সেকথা গল্পের শুরুতে কোনভাবেই আমরা আন্দাজ করতে পারি না। গল্পের এই নামকরণ ব্যঞ্জনাময়। তাই নিম্নবর্গের এই আখ্যান আমাদের কাছে অস্তিবাদী চেতনাকেই বেশি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। কারণ তা না হলে কখনোই হারুর চিতায় বদনের ভাতের হাড়ি চাপতো না।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

**তথ্যসূত্র :**

১. অর্ক চট্টোপাধ্যায়, “অস্তিবাদ ও সাহিত্য সাহিত্যে অস্তিবাদ”, নবেন্দু সেন সম্পাদিত, “পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা”, রত্নাবলী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : মে ২০১৮, পৃ. ৩৬৫
২. তদেব, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭
৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, “ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস”, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, “নিম্নবর্গের ইতিহাস”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ২-৫
৪. রমেশচন্দ্র সেন, “ডোমের চিতা”, অশ্রুকুমার শিকদার ও কবিতা সিংহ সম্পাদিত “বাংলা গল্প সংকলন” (২ য় খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ১৪
৫. তদেব, পৃ. ১৪
৬. তদেব, পৃ. ১৫
৭. তদেব, পৃ. ১৫
৮. তদেব, পৃ. ১৬
৯. তদেব, পৃ. ১৭
১০. তদেব, পৃ. ১৮
১১. তদেব, পৃ. ১৮

# নারীমুক্তির প্রেক্ষিতে আশাপূর্ণার সুবর্ণলতা : মাতৃত্বের ভিন্ন স্বর

**অভিজিৎ শীট**

'- সব সমাজই চায়,মেয়েরা গৃহিনী হবে,মা হবে, তারা মানুষ হতে চাইলে যে সমাজে শান্তি থাকবে না।

-মানুষের সমাজ হলে সে-সমাজ মেয়ে -পুরুষ সকলকেই মানুষ হতে বলবে- কাউকে মা হবার নামে,সাধ্বী হবার নামে দাসী করে রাখতে চাইবে না?

- মা হয়ে,গৃহিনী হয়েই নাকি তোমরা মানুষ হও?

-না,না,তাতে সবাই ঠকছি।বরং মানুষ হয়েই আমরা যেন গৃহিনী হই,সাধ্বী হই, মা হই।'

এই কথোপকথন বিমলাপ্রভা দেবীর "নতুন দিনের আলো" উপন্যাসের এক পুরুষ ও এক নারীর।

সমাজে ভালো স্ত্রী, ভালো মা হয়েও ভালো মানুষ নারীরা কেন হতে পারবে না সেই দাবী তুলেছেন মহিলা ঔপন্যাসিকেরাই। সমাজের দাবী অনুযায়ী মেয়েরা স্ত্রী-ও হয়,মা-ও হয় কিন্তু সেখানেই শেষ হবে কেন নারীর পরিচয়? নারীর কেন পুরুষের মত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নারীদের মনেও।মেয়েরাও ভালো স্ত্রী, ভালো মা হয়েও তো ছুঁতে পারে মানুষের মহিমা।' তাই ভূমিকার দায়বদ্ধতায় মানুষ হওয়া নয়, মেয়েদের চাহিদা প্রকাশ পাচ্ছে এই ভাষায়- মানুষ হয়েই যেন তারা গৃহিনী হয়, সাধ্বী হয়,মা হয়'

প্রত্যেক সন্তানের বেড়ে ওঠার পিছনে মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সন্তান ধারণ করা থেকে তাকে মানুষ করে গড়া পর্যন্ত মায়ের যে কত আত্মাহুতি থাকে তা লিখে শেষ করা যাবেনা।একাধিক সন্তানের জন্ম দিতে দিতে নারী যে ক্রমশ শারীরিক দিক থেকেও দুর্বল হয়ে যেত তার উদাহরণ দিতে গিয়ে একালের এক নারীবাদী লেখিকা মল্লিকা সেনগুপ্ত তার 'মাতৃত্ব ও সামাজিকীকরণ ' প্রবন্ধে রাসসুন্দরী দেবীর কথা উল্লেখ করেছেন। রাসসুন্দরী দেবীর বারোটি সন্তান ছিল। তিনি লিখেছেন '১৮ বৎসরে আমার প্রথম সন্তান টি হয়,আর ৪১ বৎসরে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না...আমি ঐ ছেলে গুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম।উহাদের খাওয়ানো হইলে পরে অন্যান্য কাজ মিটাইয়া বিগ্রহ সেবায় যাহা দিতে হয় তাহা সমুদয় দিয়া আমাদের ঘরের রান্না সকল আয়োজন করিয়া পাক করিতাম।'





পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে অবরোধবাসিনী হয়ে সন্তান পালন করা থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হয়। যাতে মাতৃত্বের বিকাশ ঘটলেও নারীত্বের অবমাননা ঘটে। আর শুনতে হয় নারীর পূর্ণতা তার মাতৃত্বে তাই তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মানদীর মাঝি" উপন্যাসে ছেলে কোলে রোগা মালাকে রাজরাণী বলে মনে হয়।

হাজার হাজার সুবর্ণকে বাঁচানোর ইচ্ছে নিয়ে সুবর্ণর মা সত্যবতী তাঁর মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য 'ভুবনেশ্বরী' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মুক্তির যে পথ দেখিয়েছিল, সেই পথেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭) উপন্যাসের নায়িকা সুবর্ণ। যে তার মায়ের দেখানো আলোয় পথ চিনে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছে। স্বামী ত্যাগিনী মায়ের কলঙ্কের ইতিহাস মাথায় নিয়ে সুবর্ণ যখন তার শাশুড়ী মুক্তকেশীর শ্রীহীন বাড়িতে সংসার করতে আসে তখন তার বয়স মাত্র নয়।অথচ তাঁর মা কোনদিন চায়নি এতো কমবয়সে সুবর্ণর বিয়ে হোক। মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঠাকুমার ষড়যন্ত্রে বাবার সম্মতিতে সুবর্ণর যখন বিয়ে হয় তখন সে বিয়ের অর্থই বোঝে না। সে বুঝেছিল তার মায়ের অজান্তেই সে কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে তখন 'কুন্ডলী পাকানো চেলী মোড়া শরীরটা তার কান্নার উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠেছে' কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে না যেয়ে মাতৃশাসিত মুক্তকেশীর সংসারের মেজ বৌ হয়ে প্রবেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' এর মৃণালও ছিল মেজোবৌ। বিন্দুর উপর অত্যাচারে সেও স্বামীর ঘর ছেড়ে গিয়ে শ্রীক্ষেত্র থেকে স্বামীকে চিঠি লিখেছিল শ্বশুর বাড়ি আর কখনো ফিরবে না এই খবর জানিয়ে। বাংলা সাহিত্যে মনে হয় প্রথম স্বামীর আচরণে বিদ্রোহিনী হয়ে ঘর ছাড়তে চেয়েছিলেন মধুসূদন এর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকার জনা। তারপর 'স্ত্রীর পত্র' এর মৃণাল।আর সুবর্ণ, সে তো বহুবার। অথচ সুবর্ণর সংসারের প্রতি স্বামীর প্রতি আসক্তি ছিল। সেই আসক্তিতে আর কিশোরী মনের চাপল্যে স্বামী প্রবোধচন্দ্রের কাছে আবদেরে গলায় একটা 'বারান্দা' দেওয়া ঘরের প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছিল—'বারান্দার ধারে চমৎকার সুন্দর একখানি ঘর। বড় বড় জানালা, লাল টুক টুকে মেঝে, সেই ঘরটিকে মনের মতো সাজাবে সুবর্ণ।' সুবর্ণর সাধ পূরণ হয়নি কারণ স্বামী প্রবোধ প্রতিশ্রুতি রাখেনি। সুবর্ণ বোবা অভিমানে নতুন বাড়ির পিছন দিকে সবচেয়ে খারাপ অন্ধকার একটি ঘরকে বেছে নিয়েছে নিজের জন্যে। ভার্জিনিয়া উলফ এর মতো লেখিকা 'A room one's own' যখন পাননি। সুবর্ণ তো কোন ছার।

সুবর্ণর মা সত্যবতী তাকে যে আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিল সেখানে ছিল সংস্কার মুক্তির ভাবনা, আদর্শবাদ, উদার রুচিশীল শিক্ষিত মন। সুবর্ণর ভাগ্যদোষে তার বিপরীত ঘটেছিল। সুবর্ণ যখন নিজের জন্য ঘর পেলোনা তখন ছাদে ওঠার সিঁড়ির জন্য তার মন

আকুল হয়েছে কারণ সে আকাশ ছুঁতে চায় আর তাই সে স্বপ্ন দেখে 'যদি রাত পোহালেই দেখতে পেত সুবর্ণ, ন-বছরের সুবর্ণ তাদের সেই মুক্তারাম স্ট্রীটের বাড়ি থেকে স্কুল যাচ্ছে বই খাতা নিয়ে'। এই স্বপ্নকে সম্বল করে সুবর্ণ খাঁচা ভেঙে বেরোতে চায় কিন্তু পারেনা বরং তার পায়ের বেড়ি আরও শক্ত হয় যখন তার আঁতুড়ঘর পাতা হয়। বড় জা উমাশশী নাকে অঁচল চাপা দিয়ে ময়লা ছেঁড়া কাঁথা কাপড় গুলো দিয়ে গেলে প্রসব যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠলেও সুবর্ণ স্পষ্ট প্রতিবাদ করে এই অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার প্রতি আর বউ এর ঔদ্ধত্যে শাশুড়ী মুক্তকেশী জ্বলে উঠেছে। প্রবলের সঙ্গে দুর্বলের সংঘাতে বারবার বিপর্যস্ত সুবর্ণ নিজের মৃত্যু কামনা করেছে। সেইক্ষণও উপস্থিত হয় সন্তান প্রসবকালে যমে মানুষে টানাটানিতে।কিন্তু যমের মুখে ছাই দিয়ে সুবর্ণ একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান জন্ম দেয়, যা মুক্তকেশীর 'মাটির ঢিপি' মনে হয়েছে।

সুবর্ণর দু'চোখে চাপা আগুন আর ঠোঁটের কোনে ঔদ্ধত্যের ঝিলিক শুধু স্বামী প্রবোধের নয়, শাশুড়ী মুক্তকেশীরও অসহ্য ছিল। অথচ সংসারের স্তুতি নিন্দা কোনোকিছুই স্পর্শ করতে পারেনি সুবর্ণকে। কেবলই তার মন মুক্তির তৃষ্ণায় উন্মুখ হয়েছে। তাই মনে সমুদ্র দর্শনের বাসনা জাগে। তার জানতে ইচ্ছে করে 'সমুদ্র কি ওই আকাশের মতো?' কিন্তু স্বামীর অমতে সে যেতে পারেনি নোনাজলের স্বাদ নিতে।অথচ সংসারের অনটনের আশংকায় মুক্তকেশী বৌদের বাপের বাড়ি পাঠাতে চাইলে সুবর্ণ 'আমি যাবো না' বললে মুক্তকেশীর মাতৃভক্ত ছেলেরা মায়ের এই অপমান সহ্য করেনি। তারা জোর করে সুবর্ণকে বাপের বাড়ি যেতে বাধ্য করেছে। সেখানেও বাবা দাদারা যখন মিষ্টিমুখে বিদায় দিয়েছে তখন এক নিরলম্ব বিপন্নতায় অন্ধক্রোধে সে কেবল নিজের মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে জীবন ইতিহাসের ব্যর্থতার উত্তর খুঁজেছে। অহরহ অবদমিত হয়ে চলা এক নারী নিজের জীবনের কক্ষপথ বেছে নিতে চেয়েছে আত্মহত্যাকে আশ্রয় করে। কিন্তু বিধি তার সহায় হয়নি। সে পুনরায় সংসারে ফিরে এসেছে।

সংসারে ফিরে আসলেও প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন তাঁর ভালো লাগেনি। পুত্র কন্যা থাকলেও সব সম্পর্কের সঙ্গে তাকে অভিনয় করে যেতে হয়-যাতে তার মন সাড়া দেয়নি। নিরস প্রেমহীন সংসারে শুধু কর্তব্য করে যেতে তাকে সংসারে থাকতে হয় ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তার জীবনে মুক্তির একটু আলোর ঈশারা এনে দিয়েছিল মল্লিক বাবুর আলমারি থেকে এনে দেওয়া বই। 'স্বদেশী' হাওয়া লেগেছিল সুবর্ণর মনে, যার উন্মাদনায় প্রবোধের বিলিতি কাপড় গুলিকে পুড়িয়ে দিয়েছিল। যার জন্য শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তাকে পাগলাগারদে পাঠাতে চেয়েছিল। "স্বদেশী" হাওয়া দর্জিপাড়ার মানুষ গুলোকে স্পর্শ করতে না পারলেও, প্লেগ রোগের প্রভাব কলকাতার মানুষগুলোকে আতঙ্কিত করেছিল।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

তারই সুবাদে সুবর্ণর স্থান হয়েছিল সুবলার শ্বশুর বাড়িতে। আর এখানেই সুবর্ণ জীবনে অন্তত একবার "স্বর্গের কাছাকাছি " পৌঁছাতে পেরেছিল, পেরেছিল স্বস্তির শ্বাস নিতে। এই ঘরের মানুষ গুলোকে তার মনে হয়েছিল আপনজন।বিশেষ করে অম্বিকার স্বরচিত কবিতা তার মনে তুফান তোলে। সে উপলব্ধি করে শিক্ষা দীক্ষা হীন মেয়েদের অবরুদ্ধ প্রাণের বেদনা আর দেশমাতৃকার পরাধীনতার বেদনা একই। তাই সে বিচলিত হয়। সে উপলব্ধি করে মেয়ে মানুষ জাতটাকে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করতে গেলে চাই শিক্ষা - তাই সে বাড়ির ছেলেমেয়েদেরকে পড়াতে বসে।যা বাড়ির মেজোকর্তার কাছে মনে হয় 'কুশিক্ষার চাষ'। এর বিরুদ্ধে সুবর্ণ তর্কে প্রতিবাদে প্রতিরোধে মুখর হয় কিন্তু মা সত্যবতীর মতো সংসারত্যাগী হতে পারে না।

'বাপ কা বেটা' কথাটা অনেকবার শুনেছি কিন্তু 'মা কা মেয়ে' কথাটা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। বরং পড়েছি 'রূপহীনা হয় কি গো মা যার অপ্সরী'। অর্থাৎ মেয়েদের গুণের নয় রূপের কদর। মেয়েদের গুনের প্রশংসা কে বা কবে করেছে? যদিও করেছে তা পুরুষ নিজের স্বার্থে নইলে সুবর্ণর এতো গুণ সংসারে মানুষদের চোখ এড়ালো কি করে? আসলে এ যেন 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। সুবর্ণ বারবার মুক্তকেশীর সংসারের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে যা কিছু অসুন্দর, যা কিছু অশোভন তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। এবার সে সত্যি সত্যি মুক্তকেশীর দর্জিপাড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে উঠলো দক্ষিণ খোলা গোলাপি বাড়িটায়। তার বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন যেন সত্য হল। স্বপ্ন পূরণের এ আনন্দের মধ্যও চলতে থাকল তার লড়াই। এই লড়াই-এ বারবার হার হয়েছে সুবর্ণর কিন্তু সে থেমে থাকেনি।আসলে হারজিতটা তার কাছে বড় জিনিস ছিলনা,লড়াইটাই ছিল তার কাছে সব। এ লড়াই প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। যাতে সে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, বারবার পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়িয়েছে। সুবর্ণ প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল তার ছেলেরা যেন স্বামী প্রবোধের মানসিকতায় গড়ে না ওঠে কিন্তু 'সেই হাসির আভাষ ফুটে ওঠে ভানুর মুখে, যে হাসি এবাড়ির প্রথম গ্র্যাজুয়েট প্রভাসচন্দ্রের একচেটে আর তখনি ধরা পড়েছিল ওর মুখের গড়নটা ওর সেজোকাকার মতো'।সুবর্ণর অতীত ভবিষ্যৎ সব নষ্ট হতে বসেছিল। শেষ আশাছিল সন্তানেরা কিন্তু তারাও 'মানুষ' হল না। তখন সুবর্ণ নিজের জীবনের ব্যর্থতা দেখল ছেলেদের মধ্যে। তাদের পূর্বপুরুষের মানসিক সংকীর্ণতা ছেলেদের মধ্যে দেখে সুবর্ণ শিউরে উঠেছে।বুঝতে পেরেছে মা হিসাবে তার ব্যর্থতা।আসলে মাতৃত্ব একটা মোড়ক,সেই মোড়ক খুলে যখন এক নারী কথা বলে তখন সন্তানের চোখে মা হয় অপরাধী। সম্পর্ক সূত্রেই সে মা বলে চেনে, একটা গোটা মানুষ হিসাবে সমাজ তাকে চিনতে শেখায়না। সমস্ত পুরুষ সমাজের

মনের বাসনা সুবর্ণর মুখ দিয়ে আশাপূর্ণা বলিয়ে নিয়েছেন—'তোমার রূপবতী মূর্তির কাছে আমি মুগ্ধ ভক্ত, তোমার ভোগবতী মূর্তির কাছে আমি বশম্বদ,তোমার সেবাময়ী মূর্তির কাছে আমি আত্মবিক্রীত, তোমার মাতৃমূর্তির কাছে আমি শিশু মাত্র।..... কিন্তু এগুলি একান্তই আমার জন্য হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ, আমাকে অবলম্বন করে যে 'তুমি' সেই 'তুমি' টিকেই মাত্র বরদাস্ত করতে পারি আমি। তবে বাইরের 'তুমি' হচ্ছ বিধাতার একটি হাস্যকর সৃষ্টি।'

সুবর্ণ চেয়েছিল তার পুত্ররা হোক আধুনিক মনের কিন্তু তারা বাবা কাকার মতোই পুরুষতান্ত্রিক সংস্কারের ঐতিহ্য নিয়ে মেয়েদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে। বোন পারুলকে স্কুলে ভর্তি করতে চায়নি। সুবর্ণর মেয়েবেলা স্বর্গভূমি নিজের স্কুলটাকে একবার শুধু চোখের দেখা দেখতে চেয়ে ছেলে ভানুর কাছে আবদার করলে, সদ্য গোঁফ ওঠা ষোলো বছরের ছেলের কাছে শুনতে হয়েছে 'মেয়ে মানুষকে নিয়ে রাস্তায় যাওয়া আমার দ্বারা হবে না।' তখন সুবর্ন আত্মজের মুখে শুনতে পায় পুরুষতন্ত্রের কণ্ঠস্বর। মানবাত্মার এই চরম অপমানে সুবর্ণ হতবাক হয়ে যায়। তবে সে দমে না গিয়ে প্রতিবেশী ছেলের সাথে মেয়ে পারুলকে স্কুলে ভর্তি করতে পাঠিয়ে দেয়। এরজন্য সে লাঞ্ছিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে বিধ্বস্ত হতে হতে সে একসময় হারিয়ে ফেলেছে মনের মাধুরী। পুত্র কন্যাদের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়েছে। তারাও মায়ের দুর্ভেদ্য বলয় ভেদ করে তার কাছে আসতে চায়নি। ফলে সুবর্ন যখন একা ঠিক তখনই সে খবর পায় বাবার মরণাপন্ন অবস্থার সে ছুটে গেছে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবার কাছে। বাবা ক্ষিন কণ্ঠে সুবর্ণর কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলে সুবর্ণর অন্তর এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ডুকরে কেঁদে ওঠে। মনের যখন এরকম অবস্থা ঠিক তখনই সে পায় তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ।

মাত্র নয় বছর বয়সে তাকে ছেড়ে যাওয়া তার মা, তারপর সারাজীবন অন্তরালে থেকে যাওয়া মায়ের প্রতি সুবর্ণর একটি অভিমান ছিল ঠিকই কিন্তু তিনি সুবর্ণর অন্তরে ছিল। তাই আজ মাকে নতুন করে হারানোর এক অব্যক্ত বেদনায় ব্যথাতুর হয়েছে সুবর্ণ। তার মায়ের শক্তি ছিল তার পিতা রামকালী,আর সুবর্ণর পিতা নবকুমারের পুরুষোচিত কোন শক্তিই ছিল না। তাই সুবর্ণর ছেড়ে যাওয়া মায়ের দীক্ষায় ছিল তার আদর্শ। তার মায়ের দেখানো পথেই সে পথ চলতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। তার মা বলেছিল 'বিদ্যাই হচ্ছে আসল বুঝলি? মেয়ে মানুষের বিদ্যে সাধ্যি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা... তাই তাদের সবাই হেনস্তা করে'। এই কথাকে অন্তরে গেঁথে নিজের জীবনের অপূর্নতাকে পূর্ণতা দিতেই সুবর্ণ তার দুই মেয়ে বকুল পারুলকে স্কুলে পাঠিয়েছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরোধিতায় আত্মভিমানী পারুল স্কুলে ভর্তি হয়েও সেই জগৎ থেকে মুখ





ফিরিয়ে ঘরের নিভৃত কোণে স্বরচিত কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে নিজের জগৎ খুঁজে নিয়েছে আর বকুল সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে স্কুলে পড়েছে। সুবর্ণও তার অবরুদ্ধ জীবনের অনুভূতিগুলিকে মুক্তি দিতে চেয়েছে খাতা কলমকে আশ্রয় করে। ভরসা করেছে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র পাতায়। বিশ্বকবির বন্ধন মুক্ত প্রাণের উল্লাসে উল্লাসিত হয়ে সুবর্ণর এতদিনের রুদ্ধ হৃদয়ের কপাট খুলে আবেগ ছড়িয়ে পড়েছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়। নয় বছরের মেয়েটির মায়ের অসম্মতিতে বিয়ে হয়ে যাওয়া,বেথুন স্কুলের স্মৃতি, প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন,নতুন করে প্রেমে পড়ার ইচ্ছের কথা, মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা সবই স্থান পেয়েছে লেখায়। আর তা ছাপার আশায় ছুটে গেছে জগু ঠাকুরপোর কাছে। যে তার সংসার যাপনের যন্ত্রণার কথা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত করেছিল। যা চরম অবজ্ঞায় অবহেলায় পাঠ করেছিল তারই আত্মজ ভানু—'আমি একটি নিরুপায় বঙ্গনারী, আমার একমাত্র পরিচয় আমি একটি অন্ধপুরের মেজ বউ '।ব্যাঙ্গের হাসির উচ্চরোলের মধ্যে ভানু যখন আরো পড়ে 'আমার মন আচে,বুদ্ধি আচে, কিন্তু কেহ আমার সত্তাকে স্বীকার করে না'। তখন সুবর্ণ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সদ্যজাত সৃষ্টির এই অবমাননা নিজের আত্মজর দ্বারা হচ্ছে দেখে সুবর্ণ ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো ভানুর হাত থেকে বইটি কেড়ে নিয়ে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। সুবর্ণর অজান্তেই সেদিন ছাদের এককোনে দাঁড়িয়ে বকুল পুড়ে যেতে দেখেছিল মায়ের সারা জীবনের অলিখিত বেদনার ইতিহাস।

জীবন যুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়েছে সুবর্ণ কিন্তু সুবর্ণর অন্তত একবার জিততে পেরেছে বলে মনে হয়েছিল পুত্র কে শিক্ষা দীক্ষায় মানুষ করে তোলার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পুত্রও যখন 'রূপের চেয়ে রুপোর কদর' বেশি দিয়েছে তখন মা সুবর্ণ আবার হেরে গেছে। অথচ সুবর্ণ জীবনে বেশি কিছু চায়নি। চেয়েছিল একটা বারান্দা দেওয়া ঘর, আর ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষ হিসাবে গড়তে। কিন্তু বউ সুবর্ণ তো ব্যর্থ হয়েছিলই মা সুবর্ণও ব্যর্থ। ব্যতিক্রম কেবল বকুল। তবে তাতে মায়ের কতটা অবদান আর কতটা নিজের আত্মবিশ্বাস সেই নিয়ে তর্ক চলতেই পারে তবে বকুলের আত্মবিশ্বাস,সেটা যে মায়ের কাছ থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সারাটা জীবন ধরে বারবার জীবন থেকে ছুটি চাওয়া সুবর্ণ যখন সত্যি সত্যিই ছুটি পেল তার আগেই পুনর্জন্মের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ভাবি প্রজন্মের কাছে রেখে যেতে চেয়েছিল আগামী দিনের লড়াইয়ের বীজ মন্ত্র। বকুল তার মায়ের জীবন খাতার শেষ পাতাগুলো অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছে কিন্তু তার চিহ্নমাত্র না পেয়ে সেই জ্বলন্ত আগুনের দিকে চেয়ে শপথ করেছে—'মা, গো। তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না-লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো,সব কথা আমি নতুন করে লিখবো।দিনের

আলোয় পৃথিবীকে জানিয়ে যাবো অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস'। বকুলের এই শপথের মধ্যেই ছিল মা-মাতামহীদের জীবনব্যাপী লড়াই সংগ্রামের গোপন ইতিহাসকে আলোয় উন্মোচিত করে তাদের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার অঙ্গীকার।

**তথ্যসূত্র :**


১) সুবর্ণলতা-আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ
২) প্রথম প্রতিশ্রুতি-আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ
৩) বকুল কথা -আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ
৪) আশাপূর্ণা দেবী, শতবার্ষিকী সংকলন-মিত্র ও ঘোষ
৫) মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা-ঘোষ সুদক্ষিণা, দে'জ পাবলিশিং
৬) ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল-চিত্রা দেব
৭) সে নহি নহি-সুতপা ভট্টাচার্য
৮) গদ্য সমগ্র-মল্লিকা সেনগুপ্ত
৯) মেয়েলি পাঠ-সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি
১০) মেয়েদের স্মৃতি কথা-সুতপা ভট্টাচার্য
১১) নারীবাদ-রাজশ্রী বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ
১২) প্রাচীন ভারতের মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার-সুজিত চৌধুরী, প্যাপিরাস




# গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প : কুসংস্কারমুক্ত সমাজ ভাবনা কিংবা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য

**অনিন্দিতা দাস**

"মানুষের সত ভাই চায় সুধু ফ্যান;
তবু যেন সভ্যতার ভাঙেনাকো ধ্যান!"[১]

একশ্রেণীর মানুষ সমাজকে উন্নত করতে সদা তৎপর। তারা শুধু দেখে সমাজকে কি করে আবর্জনা মুক্ত করে, তাকে এক উন্নত রূপ দেওয়া যায়। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় গোড়ামী ইত্যাদি কালো দিকগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই আমাদের সমাজ সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। কিন্তু সেই ভাবনা ভাবতে হবে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষকে। যেখানে এক শ্রেণীর মানুষের অন্তরে শুধুমাত্র ক্ষুধার জ্বালা ও বাঁচার আকুতি, সেখানে সভ্য সমাজের সমাজ গড়ার ভাবনা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

১৩৫০-এর সময়পর্বে যে ভয়াবহ মন্বন্তরের সাক্ষী থেকেছে বাংলা, তার নিদর্শন আমরা পেয়েছি বাংলা সাহিত্যের বহু উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প ও কবিতার মধ্য দিয়ে। সেখানেও আমরা দেখেছি, একশ্রেণীর মানুষের কাছে থাকে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি কিছু, আর অপর শ্রেণী সেই সামান্য প্রয়োজনটুকু মেটাতেও অক্ষম। আর এই অধিক থাকার কারণে তাদের চিন্তা ভাবনার বিষয়ও অন্য, যা শুনলেও হয়তো গায়ে জ্বালা ধরে অপরশ্রেণীর মানুষগুলোর। ঠিক এমনই একটি বিষয় নিয়ে রচিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গল্পটি প্রবাহিত হয়েছে। যেই গ্রামে আমরা দেখতে পাই, তথাকথিত কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ও তার দলগত কিছু মানুষদের আর অপরদিকে দেখতে পাই, ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি নিয়ে মৃতপ্রায় অনাহার ক্লিষ্ট এক পরিবারকে। প্রথমটির প্রতিনিধি হিসেবে আমরা গল্পে সুরেন্দ্রকে পাই, যে কিনা গ্রামকে বোঝাতে চায় ভূত বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। সুরেন্দ্রর পিতার মৃত্যু হয়েছিল নাকি ভূতের হাতে পড়েই। "পবন আবার বলল, তোর বাপকেও ভূতে ঘাড় মটকেছিল।"[২] কিন্তু সুরেন্দ্র জানে এবং বিশ্বাস করে সেই কাজ ছিল মানুষ ঘটিত। আমরা গল্পে দেখি সুরেন্দ্র মাস্টার মশাইকে বলছে, "আমার বাবার ট্যাঁকে সেদিন ধান-বেচা টাকা ছিল। তার এক আধলাও পাওয়া যায়নি। কে নিলো সেই টাকা, আত্মা না পরমাত্মা? কার বেশি টাকার দরকার?..."[৩] এই অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করতেই তার পরিকল্পনা 'ভূত ধরার ব্যবসা'।

গল্পটি শুরু হচ্ছে এক রোমাঞ্চকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে এইভাবে, "ওরা আসে নিশুতি রাতে প্রতি অমাবস্যায়।"[৪] শুনলে মনে হতে পারে এখানে ভূতের কথাই বলা

হয়েছে। আসলে এখানে বলা হয়েছে সুরেন্দ্র এবং তার দল বলের কথা, যারা সংখ্যায় এগারো জন, এরা প্রতি অমাবস্যার রাতে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জানায় যে তারা ভূত কিনতে এসেছে। এক একটি ভূতের দাম নগদ দশ টাকা। আসলে এই কৌশলের মধ্য দিয়ে সুরেন্দ্র গ্রামের মানুষকে শিক্ষা দিতে চায় যে, ভূত বলে প্রকৃত অর্থে কিছুই নেই, আত্মা বলে কিছু হয় না। কিন্তু ভূত সম্পর্কিত মানুষের মনে যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, তাকে দূর করার যে কৌশল সুরেন্দ্র বেছে নিয়েছিল তা যে কতখানি ভুল এবং ভয়ংকর; তারই উদাহরণ স্বরূপ লেখক গল্পে নিবারণের পরিবারকে উত্থাপন করেছেন। সুরেন্দ্রর অবস্থা সচ্ছল, তার পকেট ভর্তি টাকা। অথচ গ্রামের মানুষগুলোর করুন পরিণতি কিংবা নিবারণের মতো পরিবারকে দেখে তার অন্তরে একবারের জন্যেও এ ভাবনার উদয় হয়নি যে, তার পকেট ভর্তি টাকার মধ্যে সামান্য দশটা টাকা পেলেও এই বুভুক্ষ মানুষগুলোর অন্তত দুই বেলার ভাত জুটবে, তারা দুমুঠো গরম ভাত খেয়ে তৃপ্তি পাবে। পেটে ভাত এবং পকেট ভর্তি টাকার জোরে তার চিন্তাভাবনার গতিপ্রকৃতি পৌঁছে গেছে অনেক উচ্চ অবস্থায়। সে অনেক আধুনিক মানসিকতা একজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার সেই চালচলনে নিবারণের মতো মানুষগুলোর মনোভাব ঠিক কেমন, তা গল্পে একাধিকবার নিবারণের মুখ থেকেই আমরা শুনতে পাই। "যেতে যেতে তার বারবার মনে পড়ছে সুরেন্দ্রর কথা। সুরেন্দ্রকে সে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। সুরেন্দ্রর স্বাস্থ্য ভাল। পকেটে পয়সা ঝমঝমিয়ে বেড়ায়। এসব মানুষ একবার গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে আর ফেরেনা। সুরেন্দ্র ফিরলো কেন? আবার বিদায় হলেই তো পারে। পকেটে তার শয়ে শয়ে টাকা, কিন্তু এমনি তো সে কারুকে দেবে না। ভূত কেনার বায়না! নিবারণের গা জ্বালা করে। একশোটা টাকা পেলে তার এখন কত দিকে সুরাহা হত। সেই টাকা একজনের পকেটে আছে, অথচ সে পাবে না।"[৫] যেখানে ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য সামান্য অন্ন জোটে না, সেখানে আদৌ ভূত বা আত্মা আছে কি নেই, সেইসব বিষয় নিয়ে ভাবনার অবকাশ কখনোই মনে আসতে পারে না। বরং এ কথা মনে হয়, যদি একটা ভূতের হদিস পাওয়া যেত তাহলে কিছু টাকা তো হাতে আসতো। যা দিয়ে তার পরিবার দুবেলা দুমুঠো গরম ভাত খেতে পারতো। এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পের কথা। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গল্পটির চার বছর পরেই। এখানে আমরা দেখতে পাই, বুড়ো কত্তার মৃত্যুর পর যখন বড় পিসিমা সমস্ত রান্না পথে ঢেলে দিয়ে আসতে বলেছিল ,তখন উচ্ছব নাইয়ার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বাসিনী যখন তাকে অশুচ বাড়ির ভাত না খাওয়ার জন্য বারণ করছিল তখন, "উচ্ছব ফিরে দাঁড়ায়। তার চোখ এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র। দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্র ভঙ্গি করে।"[৬] অর্থাৎ সেই মুহূর্তে তার কাছে কেবল হাড়ি ভর্তি ভাত টুকুই সত্যি, বাকি সমস্ত যুক্তি তর্ক অর্থহীন, মূল্যহীন। ঠিক সেরকমই মূল্যহীন আমাদের আলোচ্য গল্পে নিবারণের মতো



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বুভুক্ষ মানুষের কাছে সুরেন্দ্রর ভূত ধরার ব্যবসার অর্থ। যা সুরেন্দ্রর মতো মানুষেরা কোনদিন কোন কালে বোঝেনি। আমাদের সভ্য সমাজ বরাবরই উদাসীন থেকেছে এই সমস্ত মানুষগুলি সম্পর্কে।

গল্পের প্রথমেই আসে সুরেন্দ্র আর তার সমবয়সী যুবকের দল। যারা অমাবস্যার রাতে বেরিয়েছে ভূত ধরে দেওয়ার সংবাদ দিতে। গান গেয়ে আর পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচ করতে করতে জানায় যে তারা ভূত কিনতে এসেছে। প্রথমে তারা এক একটি ভূত বাবদ নগদ দশ টাকা দেবে বলে জানায়, যদিও পরে তা বেড়ে গিয়ে কুড়ি এবং শেষমেষ একশো টাকায় এসে দাঁড়ায়। এরপরই গল্পে আমরা পবন নামে এক বৃদ্ধের সন্ধান পাই। যার বয়স চার কুড়ি না পাঁচ কুড়ি তা সে হয়তো নিজেও জানে না। এই বৃদ্ধেরই ছোট ছেলের নাম নিবারণ। নিবারণের পরিবারে সদস্য সংখ্যা তাকে নিয়ে মোট পাঁচজন। তার দুই ছেলে মেয়ে পান্তি ও গেনু। এদের পোশাক সম্পর্কিত যে বর্ণনা করেছেন লেখক তা শুনলেই বোঝা যায় পরিবারটির দুর্দশা। তেরো বছরের মেয়েটির পরনে সেই শীতের মধ্যেও খালি একটা 'ইজের'৭। লজ্জা নিবারণের জন্যে দু'হাত আড়াআড়ি করে বুক ঢেকে রাখতে হয় তাকে আর ছেলেটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আর দেখতে পাই নিবারণের স্ত্রীকে, যে হলো গর্ভবতী। আলোচ্য গল্পে সমগ্র গ্রামটির মধ্যে লেখক কেবলমাত্র একটি পরিবারকেই তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে দিয়ে ভেসে উঠেছে অনাহার ক্লিষ্ট গ্রাম বাংলার নিদারুণ এক পরিবারের দৃশ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সমগ্র গল্পটি আবর্তিত হয়েছে নিবারণ এবং তার পরিবারকে কেন্দ্র করে। বৃদ্ধ পবনের অবস্থা এতই করুন যে, সামান্য তামাক খাওয়ার নেশাও তার পূরণ হয় না। তবুও শখ মেটাতে পবন শুকনো আম পাতা আর গোবর মিশিয়ে মসলা তৈরি করে কল্কেতে ভরে তামাক খাওয়ার আশা পূরণ করে। "অনেক কালের তামাক টানা অভ্যাস, না মলে যাবে না। তামাক পাই না। তাই শুকনো আম পাতা আর একটুখানি গোবর দিয়ে মশলা তৈরি করেছি। আমার তো বেশ লাগে।"৮ সুরেন্দ্রদের বর্শায় একটি সজারু গাঁথা পড়েছিল। বিনোদ যখন জানায় যে সেটি কেটে তারা মাংস রান্না করে খাবে, তখন বৃদ্ধ ক্ষুধার্ত পবনের মনে ভেসে ওঠে লাল লাল, নরম নরম, তেলে ভরা সুস্বাদু সজারুর মাংসের দৃশ্য। সে মনে মনে বলে "ইস,কতকাল সে মাংসই খায়নি। এখান থেকে বিনোদের বাড়ি প্রায় ক্রোশ খানেক দূরে। কাল দুপুর বেলা যদি হেঁটে হেঁটে যাওয়া যায়, গিয়ে বলবে অ বিনোদ, একটু মাংস চাখতে এলাম। তাহলে কি আর দেবে না একটু।"৯ এ হেনো মারাত্মক ক্ষুধা অন্তরে পোষণ করে শীর্ণকায় জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ পবন সুরেন্দ্রর দেখানো দশ টাকা পাবার লোভে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে, বলে তাদের ভাগ্যে কেন একটা ভূত জোটে না, তাহলে অন্তত তারা নগদ দশটা টাকা দিয়ে সাত সের চাল কিনতে পারতো। এরপর গল্পে এসেছে, সুরেন্দ্রর জীবনের কথা; নিজের গ্রাম ছেড়ে তাকে কেন একদিন চলে যেতে হয়েছিল এবং তার জীবনে ঠিক কি কি ঘটেছিল সেসবের বর্ণনা।

এসেছে গ্রামের জমিদার বাবুদের কথা এবং শিক্ষিত যোগেন মাস্টারের সঙ্গে আত্মা সম্পর্কিত সুরেন্দ্রর যুক্তিতর্ক। তারপর গল্পে লেখক পুনরায় নিয়ে এসেছেন নিবারণকে। নিবারণের বংশ পেশা ছিল ঘরামি। এখন গ্রামে গ্রামে খরের বদলে টালি দিয়ে চাল দেওয়ার কারণে শহর থেকে আসে মিস্ত্রি। তাই নিবারণের কোনো কাজ জোটে না। গ্রামে একটি পুরনো খাল ছিল, সেই পুরনো খাল আবার পুনরায় নতুন করে সরকার থেকে কাটানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেই দায়িত্ব পায় গ্রামের রহমান সাহেব। গ্রামের সকলেরই তখন হাতে কোন কাজ নেই, তাই কাজ জুটে যায় সকলের, কাজ জুটে যায় নিবারনেরও। দৈনিক সাড়ে চার টাকা এবং একবেলা খোরাকি। ঘরামির ছেলেকে হতে হয়, মাটি কাটা কুলি। লেখক বলছেন, “আজকাল অত কিছু ভাবলে চলে না, ভাত এমন চিজ খোদার সঙ্গে উনিশ বিশ।”[১০] কিন্তু পরপর দুদিন এক ব্যক্তি কাজ করতে পারবে না তাই নিবারণের আজ কাজ নেই। এরপর নিবারণের ভাবনায় আসে তার বউ। গর্ভবতী বউটি ভালো-মন্দ খাওয়াতো দূরের কথা, নিবারণ তাকে দুবেলা ভাত পর্যন্ত খাওয়াতে পারে না ঠিকমতো। আর দুধ, সে যে নিবারণ কোন জন্মে কিনেছে তা হয়তো তার মনেও পড়ে না। তাদের ঘরে খাবার বলতে এখন পুকুর পাড়ে গজানো কলমিশাক সেদ্ধ আর হয়তো সামান্য ফ্যান ভাত। নিবারণের যে নিজের জমি ছিল তাও তাকে দিতে হয়েছে বন্ধক। সেই বন্ধকী জমিতে এখন সে ভাগ চাষী। সেখানে ফুলকপির চারা লাগিয়েছিল নিবারণ। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস শীতের দিনেও টানা তিনদিন বৃষ্টি হওয়ায় আর পাশের জমির আল ভেঙে গিয়ে জল ঢুকে পড়ায় সমস্ত চারা পচে নষ্ট হয়ে যায়। সেই দৃশ্য ছিল নিবারণের কাছে সহ্যাতীত। এদিকে টানা বৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে যায় মাটি কাটার কাজও। তাই বৃষ্টি বন্ধ না হওয়া অব্দি সে দুদিনই হোক বা তিন দিন তাকে ‘পেটে কিল মেরে’[১১] বসে থাকতে হবে। গল্পে বর্ণিত হয়েছে নিবারণের অসহায় অবস্থা “এখন মনে হচ্ছে সাড়ে চার টাকায় কত কিছু কেনা যায়। মাত্র সাড়ে চার টাকায় এক পৃথিবী ভর্তি সুখ।”[১২] আকাশের দিকে দুহাত তুলে নিবারণের বিলাপ, “এ জন্মে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে গেলাম, হে ভগবান পরজন্মে একটুখানি সুখ দিও, যেন দুবেলা পেট পুরে দুটো ভাত খেতে পাই। আর ছেলেপুলেগুলোদের হাতে একটু নাড়ু-বাতাসা দিতে পারি।”[১৩] এ যেন নিজের জন্য, পরিবার তথা সন্তানের জন্য হতদরিদ্র চিরদুর্দশা গ্রস্থ এক পিতার মর্মস্পর্শী আকুল আকুতি। যা মনে করিয়ে দেয় আমাদের চির পরিচিত সেই উদ্ধৃতি, পাটুনীর দেবী অন্নপূর্ণার কাছে চাওয়া এক এবং একমাত্র বাসনা “আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।”[১৪] কিংবা ‘ভাত’ গল্পে উচ্ছব নাইয়ার স্টেশনে বসে,হাড়ি ভর্তি ভাতের মধ্যে হাত ডুবিয়ে, ভাত খাওয়ার সময়ে নিজের হারিয়ে যাওয়া মৃত পরিবারকে স্মরণ করে সেই বিলাপ “আরো ভাত খেয়ে নি। চন্নুনিরে! তুইও খা, চন্নুনির মা খাও, ছোটো খোকা খা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা!”[১৫] প্রতি



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

মাতা কিংবা পিতার অন্তরেই নিহিত থাকে এই ভাবনা। নানা বিপর্যয়ের মাঝেও তারা ভোলেনা সেই মুখগুলোর কথা। যার ছবি খুব সুন্দর ভাবে এঁকেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘গরম ভাত অথবা নিছক ভুতের গল্পে’।

গল্পটির আরেকটি দিক রয়েছে। যেদিকে উঠে এসেছে, এক কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধ বিশ্বাসের ছবি। এখানে আছে সর্বানন্দের পুত্রবধূ শান্তির কথা। যাকে নাকি ভূতে ধরেছে বলে গ্রামের লোক মনে করছে। এখানে দেখতে পাই এক নির্মম দৃশ্য , শরীর থেকে ভুত ছাড়ানোর জন্য ওঝার নিষ্ঠুর প্রহার এক স্ত্রীলোকের উপরে। শান্তির স্বামী বিভূতি দুর্গাপুরে কাজ করে। তাই ন'মাস ছ'মাস অন্তর সে বাড়ি ফেরে।[১৬] শান্তির এখনো অব্দি কোন সন্তান না হওয়ায় গ্রামের লোক ভাবতে শুরু করেছে সে নাকি ‘বাঁজা’[১৭]। যাইহোক, এতদিনে একটা ভূতের হদিস পাওয়ায় গ্রামের লোক ডেকে আনে সুরেন্দ্রকে। কিন্তু সুরেন্দ্র এসে ওঝার নির্মম প্রহারের হাত থেকে প্রথমেই শান্তিকে বাঁচায় এবং শান্তির অবস্থা দেখে সে বুঝতে পারে তার বড় রকম কোন অসুখ হয়েছে এবং সুরেন্দ্র এও বুঝতে পারে যে শান্তি গর্ভবতী। তাই তাকে সে সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। এখানে সত্যিই সুরেন্দ্রর উন্নত মানসিকতা কুসংস্কার মুক্ত ভাবনার পরিচয় আমরা পাই। সুরেন্দ্র গ্রামের লোককে আবারও বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যে ভূত বলে কিছু হয় না। কিন্তু এই ঘটনার পরেও কি গ্রামবাসীর আবৃত চক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল? যদি হতো তাহলে এর পরবর্তী যে ভয়ংকর তথা মর্মস্পর্শী ঘটনাটি ঘটে, তা বোধহয় গল্পে বর্ণিত হতো না। পকেট শূন্য, ঘরে দানাপানি পর্যন্ত নেই, এক পৃথিবী ভর্তি ক্ষুধা নিয়ে নিবারণ ধুঁকতে ধুঁকতে আর রাজ্যের চিন্তা ভাবতে ভাবতে নিজের বাড়ির দিকে যায়। ক্ষুধার জ্বালা যে কত বড় জ্বালা তা আলোচ্য গল্পের শেষাংশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন। ভগবান কেও তার শত্রু বলে মনে হয়। ফুলকপির চারা গুলোর কান্না শুনতে পায় নিবারণ, তার বুকে বাজতে থাকে সেই কান্নার প্রতিধ্বনি। তারপর বাড়িতে ঢুকতেই বাতাবি লেবু গাছের কাছে সে এক প্রেতমূর্তি দেখতে পায়। এই প্রেতের বিবরণ কিছুটা এরকম “প্রেতের বুকের পাঁজরার সবকটা হার স্পষ্ট, কঙ্কালসার একটা হাত সামনে বাড়ানো।[১৮] এই প্রেতমূর্তি আর কেউ নয় নিবারণের বাবা বৃদ্ধ পবন। যে মানুষটার উঠে দাঁড়ানোর পর্যন্ত শক্তি নেই, কথা বলার ক্ষমতা নেই, শুধুমাত্র ক্ষুধার জ্বালায় এই বৃষ্টি তথা শীতকে উপেক্ষা করে সে বাইরে এসে অধীর আগ্রহে সন্তানের আসার প্রতীক্ষা করে। কেননা সে বুকে একরাশ আশা নিয়ে বসে আছে তার সন্তান কিছু না কিছু তার জন্য আনবেই। মন্বন্তর সমসাময়িক বা তার পরবর্তী গ্রাম বাংলার নিতান্ত দরিদ্র মানুষ গুলোর কি দুর্দশা তা এখানে স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। সারাদিনের খাটুনির পর অসহ্য খিদে নিয়ে বাড়িতে এসে নিবারণের জোটে না কোন খাবার। বউয়ের কাছে গত রাত্তিরের বেঁচে থাকা সামান্য পরিমাণ আটার খোঁজ করলে বউ বলে, ছেলে মেয়েরা সেই আটা খিদের জ্বালায় জল দিয়ে গুলে খেয়ে ফেলেছে।[১৯] সেই নিয়ে খানিক বচসা হয় পরিবারের মধ্যে। পেটে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা আর

মনে একরাশ অশান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিবারণের পোয়াতি বউ আর তার ছেলে মেয়ে। ঘুম আসে না নিবারণের, ঘুম আসে না বৃদ্ধ পবনের। আর তারপরেই ঘটে যায় সেই পৈশাচিক ঘটনা। মাঝরাতে সুরেন্দ্র আর তার দলবল বেরিয়ে পড়ে ভূত ধরার ব্যবসার কাজে। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুনতে পায় নিবারণ এক ক্ষীণ রুনুঝুনু শব্দ। নিবারণের রাগে গা জ্বালা করে ওঠে। "ওদের পকেটে টাকা আছে, গায়ে শক্তি আছে, তাই ওরা এইসব আমোদ আহ্লাদ করতে পারে। ওরা নিবারণের মতো লোকদের আরো কষ্ট দেবার জন্য আসে।..."[২০] এই কথায় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তথাকথিত সভ্য সমাজের এই ভরং দেখে নিবারণের মতো মানুষগুলোর মন- পরিস্থিতি। শেষমেষ সুরেন্দ্রর গ্রামের মানুষের মন থেকে ভূত নামক বস্তুটাকে দূর করার যে শিক্ষার পথ, সেই 'পথ' নিবারণ এর কাছে হয়ে ওঠে ক্ষুধা মেটানোর রাস্তা আর বাঁচার উপায়। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাঝ রাত্তিরে একরাশ হিংস্র ভাবনা অন্তরে নিয়ে নিবারণ বাবার কাছে এসে জেনে নেয়,তার বাবা মরলে ভূত হবে কিনা? বৃদ্ধ পবনের সরল নিষ্পাপ মন, সে বুঝতে পারেনি এর অর্থ। তাই সে বলে "হ্যাঁ আমি ভূত হবো নিশ্চয়। সে কি আর তোকে বলতে হবে...নাতি নাতনি দুটোর মুখ চেয়েও...সুরেন্দ্র কে ডেকে আনিস...আমি বোতলে ঢুকে যাব, তুই একশো টাক..."[২১] আর ঠিক তখনই নিবারণ করে ফেলে সেই পৈশাচিক কান্ড, হত্যা করে তার পিতাকে। যুক্তিতর্ক,কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস,সমস্ত কিছুর ঊর্ধে গিয়ে একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায় তার পেটের খিদে তার বাঁচার আকুতি। ঠিক একইভাবে দেখা যায়,মৃত্যুর সময়ও বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মনের না মেটানো সাধ আর প্রচন্ড ক্ষুধা নিয়ে বৃদ্ধ পবনের অসহায় আর্তনাদ, "...একটু গরম গরম ভাত দিস... দুটো দিন একটু পেট ভরে খেয়ে যাই...এক ছিলিম তামাক...ও বাবা নেবারণ, তোর পায়ে পড়ি... আর দুটো দিন... একটু গরম ভাত... তোর পায়ে পড়ি, ও বাবা নেবারণ, আর দুটো দিন..."[২২]

সুরেন্দ্রর মতো মানুষেরা নিজেদের খামখেয়ালে যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তার পরিণতি কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে তারই জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত আমাদের আলোচ্য গল্পে নিবারণের পরিবার। অযৌক্তিক ভাবনা দূর করার যে পন্থা সুরেন্দ্র বেছে নিয়েছিল তা ছিল নিতান্তই ভুল,আর সেই ভুলের শিকার হতে হয়েছিল নিবারণের পরিবারকে। তীব্র বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল বৃদ্ধ পবনকে। তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প" একদিকে কুসংস্কার মুক্ত সমাজ ভাবনা এবং অপরদিকে দারিদ্র্যতার গল্প নিয়ে রচিত হলেও সেখানে সব কিছুকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে ক্ষুধার জ্বালা অর্থাৎ দারিদ্র্যতা। ক্ষুধার জ্বালার কাছে এ সমস্ত ভাবনাচিন্তা তথা সমাজ গড়ার ভাবনা যে নিতান্ত মুল্যহীন তা আবারো প্রমাণিত হয়ে যায় এই গল্পে। তাই বলা চলে এই গল্প কুসংস্কার মুক্ত সমাজ ভাবনা বা নিছক ভূতের গল্প নয়, সব কিছুকে ছাপিয়ে এই গল্প হয়ে উঠেছে গরম ভাত অথবা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের গল্প।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

**তথ্যসূত্র :**


১. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'ফ্যান', 'ফেরারী ফৌজ', ডঃ সরোজ মোহন মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত, "প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা", গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৯৬, পৃ. ৯৮
২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প', 'স্বনির্বাচিত একশো গল্প', গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রীট কলকাতা, পৃ. ১৬
৩. তদেব, পৃ. ২০
৪. তদেব, পৃ. ১৩
৫. তদেব, পৃ. ২০
৬. মহাশ্বেতা দেবী, 'ভাত', সুধাংশুশেখর দে প্রকাশিত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট ২০১৩, পৃ. ২১৬
৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প', 'স্বনির্বাচিত একশো গল্প', গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রীট ,কলকাতা, পৃ. ১৬
৮. তদেব, পৃ. ১৪
৯. তদেব, পৃ. ১৫
১০. তদেব, পৃ. ২০
১১. তদেব, পৃ. ২৮
১২. তদেব, পৃ. ২৭
১৩. তদেব, পৃ. ২১
১৪. শ্রী ভারতচন্দ্র রায়, 'অন্নদামঙ্গল', কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত, সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১৭৭৫ শক, পৃ. ১৮৭
১৫. মহাশ্বেতা দেবী, 'ভাত', সুধাংশুশেখর দে প্রকাশিত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট ২০১৩, পৃ. ২১৬
১৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প','স্বনির্বাচিত একশো গল্প', গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ২৪
১৭. তদেব, পৃ. ২৪
১৮. তদেব, পৃ. ২৯
১৯. তদেব,পৃ. ৩০
২০. তদেব, পৃ. ৩০
২১. তদেব, পৃ. ৩১
২২. তদেব, পৃ. ৩১

# গল্পকার ভগীরথ মিশ্রের গল্পে প্রতিফলিত লৌকিক সংস্কৃতির রূপরেখা

**মানস ঘোষ**

ভোগবাদী বিশ্বায়ন ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের যুগেও গ্রামীণ মানুষের লোকসংস্কৃতি গভীর প্রভাব রেখে চলেছে বাংলা সাহিত্যে। ভোগবাদী ভুবনায়নের চাপে পিষ্ট গ্রামজীবন তার লোকচর্যাকে আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তা একটি স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ রাখে। লোকসংস্কৃতি আসলে সমাজবদ্ধ গ্রামীণ মানুষের গোষ্ঠীচেতনা থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি অসংখ্য উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট এবং এগুলি লোকায়ত গ্রামীণ জীবনের উপরিসৌধ বা সুপার স্ট্রাকচার। বিশিষ্ট গল্পকার ভগীরথ মিশ্র আদ্যন্ত গ্রামের মানুষ, সংগত কারণেই তাঁর গল্পে বিপুল প্রভাব রেখে চলেছে গ্রামীণ লোকায়ত ভুবন। ভগীরথ মিশ্রের গল্প সৃষ্টির মর্মমূলে প্রকৃতি ও লোকায়ত জীবন ভাবনা গভীরভাবে সক্রিয় ছিল। গল্পকার তাঁর গল্পে লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাদান অকাতরে ব্যবহার করেছেন, ফলে গল্পের লোকায়ত চরিত্রগুলি বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। ভগীরথ মিশ্রের অজস্র গল্পে যথা 'পটিদার', 'অচিনপাখি', 'হুলমারার ভোমরা মাঝি', 'জনকুঁদরা', 'পুত্রেষ্টি', 'বলিদান' 'জগৎপুরে বিশ্বায়ন', 'ফসলকাটার গান', 'চিকনবাবু', 'আত্মপীড়ন', 'বানের জল', 'লেবারন বাদ্যিগর', 'প্রায়োপবেশন', 'ঘাতক', 'ইন্দরযাগ', 'কুটুম-কাটাম', 'বাঁশফুলের কাব্য', 'প্রয়াগ বেজের হাই' প্রভৃতি গল্পে অজস্র লৌকিক উপাদানের বিচিত্র কিন্তু অনিবার্য প্রয়োগের পরিচয় আমরা পেয়েছি। এছাড়াও 'সুবচনী', 'আত্মপীড়ন', 'বিষকপ্পুর', 'রাবণ', 'ঝোরবন্দী', 'কুঁজোপানা মানুষ', 'নাবাল', 'দুধকোহরা', 'কাকচরিত্র' প্রভৃতি গল্পে লোকচর্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

'জনকুঁদরা'১ গল্পের প্রধান উপাদান-ই হল লোকাচার এবং অন্ধবিশ্বাস। জনকুঁদরা গ্রামীণ লোকদেবতা যিনি সন্তানহীন নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। সন্তানহীন নারীর কোনো মূল্যই নেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাই 'জনকুঁদরা থাপনা' করা হয় বন্ধ্যা নারীও সন্তান ধারণ করবে এই আশায়। সুখেন লোহার ও অণিমার দাম্পত্য জীবন সন্তানহীন। অণিমার একান্ত ইচ্ছায় তাদের ভিটেতে 'জনকুঁদরা থাপনা' করা

সুখেনের ভিটেয় জনকুঁদরা থাপনা করবার কালে গুণ্‌নিবাসের লটবর গুনিনকান কামড়ে বলেছিল, থাপনা হইল্যাক কি হইল্যাক নাই সে তুই আপসেই মালুম পাবি।

এই দেবতা অত্যন্ত লাজুক অন্ধকারে একাএকাই সে আসে এমনই লোকবিশ্বাস। সন্তান পালনের জন্যে অর্থের প্রয়োজন তাই অণিমা লটবর গুনিনের কাছে জনকুঁদরার পাশাপাশি ধনের দেবতা ধনকুঁদরাকেও চেয়েছে। গল্পকার বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—





রাঢ়ভূমের বাসিন্দাদের কাছে জনকুঁদরা কিছু অপরিচিত নাম নয়। ধনকুঁদরা ঘরে থাকলে যেমন গেরস্থের সম্পদ বাড়ে রাতারাতি, জনকুঁদরা থাকলেও তেমনি ঘর ভরে যায় কাচ্চা-বাচ্চায়।

এই গল্পে কয়েকটি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে যেমন বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা, বারো মাসে তেরো পার্বণ, বাড়া ভাতে গরম ছাই প্রভৃতি। এই গল্পে ওঝা লটবর গুনিন যেমন লোকচিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেছে তেমনি লোক-ঔষধ হিসাবে শিকড়-বাকড়, হাড় নখের প্রসঙ্গও এসেছে। গল্পে উল্লেখ আছে কোনও কারণে মেয়ের বাধক থাকলে পেটে বাচ্চা আসে না তার জন্য জলপড়া, তেলপড়া খেতে লাগে, তাবিজ-মাদুলি পরতে লাগে, ঠাকুরের থানে ঢেলা বাঁধতে লাগে...

এই গল্পে দাঁতের মাজন ও ভৃঙ্গরাজ তেল বিক্রেতা ও প্রচারক রচিত একটি ছড়ারও উল্লেখ আছে,

দাঁত নড়ে, পুঁজ পড়ে,<br>
কনকন করে, টনটন করে,<br>
মাড়ি ফোলে, ব্যথা হয়,<br>
শক্ত কিছু চিবাতে ভয়,<br>
গরমে আরাম, ঠাণ্ডায় কাবু,<br>
একটিবার পরখ কইর‍্যে দেখেন বাবু।[১]

এছাড়া বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত সামগ্রী এবং লোকতৈজসের উল্লেখ আছে গল্পে যেমন, ধূপ, ধুনা, আলতা, সিঁদুর, কাজলতি, বেড়াজাঁতি, বেলকাঠের মালা, লালরঙের ঘুনসি, মাটির হাঁড়ি, কলসি, মালসা প্রভৃতি।

ভগীরথ মিশ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গল্প 'পটিদার'২ আর এই গল্পের মূল থিমও লোকসংস্কৃতি। পটচিত্র আঁকাও তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংগীত রচনাই যাদের জীবিকা তারাই হলেন পটিদার। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন করেই পটিদাররা গান রচনা করেন এবং জীবিকা নির্বাহ করেন। বিশ্বায়ন তথা চটুল সংস্কৃতির আগ্রাসনে হারিয়ে যেতে বসেছে এই জীবিকা। পটিদারদের জীবনের করুণ আখ্যান তুলে ধরেছেন গল্পকার। রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত একটি গানের উল্লেখ আছে গল্পটিতে

সবাই রাবণ কোনও ভেদ নাই একজনে,/অঙ্গদ বলে, কথা কইবো কুন রাবণের সনে?/ সবেমাত্ত ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে/পুত্র হইয়েঁ পিতার মুণ্ডি ধরিবেক কুন লাজে!/অঙ্গদ বলে, সত্যি কইর‍্যে কওরে ইন্দ্রজিতা/এতগুলি রাবণের মইধ্যে কুনটি তুয়ার পিতা।[২]

রামায়ণ গানটি যে কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি'র দ্বারা প্রভাবিত এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। এই রামায়ণ গান দ্রুত তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছে তার পরিচয়ও পাওয়া

যাচ্ছে গল্পে তারপর দেশে গাঁয়ে সিনেমা-থেটার এল। মানুষের মন ঘুরে গেল ওদিকে। আধুনিক হিরো-হিরোইনরা একেবারে মগজ অবধি সেঁধিয়ে গেল। তখন আর রামায়ণ - মহাভারতের পচা গল্পে মন ভরে না বাবু-বিবিদের।

গাঁয়ের কলেজে পড়া উত্তম দাস দিল এক বুদ্ধি। ওসব রামায়ণ-মহাভারত ছাড় হে, উসব আর কেউ এখন দেখবেক নাই। তুমরা বরং সিনেমার পটআঁক। অমিতাভ বচ্চন, মাধুরি দিক্ষিত...। আঁক দেখি তাদের কেচ্ছা লিয়ে বেশ ক'খান ডগোমগো পট।'

বলিউডি আগ্রাসন তিল তিল করে নিঃশেষ করে দিচ্ছে বাংলার চিরকালীন লোকায়ত সংস্কৃতিকে। এই গল্পে দেবী মনসার গান বা সাপ ধরার গানেরও উল্লেখ আছে

মা মনসার বেটি তুমি ফণা চক্রধর হে
মস্তকে বিষ্ণুরো পদ জোড়া খড়ম ধর হ
আদাড়ে-বাদাড়ে থাকো, গর্তে থাকো, ঝোপে থাকো,
মহাদেবের গলায় থাকো
কালীয় দমন কালে শীকিষ্ণের পায়ের তলায় থাকো,
আমি বটি হেতাল মুনির বাপ,
এবার তুমি আমার পেড়িতে থাকো হে,
কার আজ্ঞায়?
সপ্পের যম হেতাল মুনির আজ্ঞায়,
মা-মনসার আজ্ঞায়,
মহাদেবের আজ্ঞায়।[৩]

এই গল্পে কয়েকটি প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'মামার গুয়ালে বিয়াল্যাক গাই। সেই সম্পক্কে মামাতো ভাই', বা 'রাবণের চিতা' প্রভৃতি।

'কাক চরিত্র'৩ গল্পটির থিম লোকাচার কেন্দ্রিক। এই গল্পে আছে 'কাক সাধনা'র কথা একে আবার 'বীর সাধনাও বলা হয়েছে। এই গল্পে কাক সাধনা করেছে খোঁড়া কেশব তার ভৈরবী বা সাধন সঙ্গিনী হল এই গল্পের প্রধান চরিত্র ভানুমতী। এই গুপ্ত সাধনার পরিচয়ও আছে গল্পে খোঁড়া কেশব বিতাং করে বলত তার সাধনার কথা। কাক সাধনা। কাক নিয়ে হাজার গল্প শোনাত! কাক ভারি রহস্যময় প্রাণী। ছদ্মবেশী মহাকাল। সর্বদা অমঙ্গল আর মৃত্যু ঘোরে ওর পিছু পিছু। তবে সাধনায় বশ করতে পারলে সে হবেক ত্রিকালদর্শী। তুমার দাসানুদাস। তুমার আজ্ঞায় অসাধ্য সাধন করবেক উ। খোঁড়া কেশবের চোখ মুখ চকচকিয়ে ওঠে। একটি বার কাকসিদ্ধ হতে পারলে কী সব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলা সম্ভব! শুধু মুখ থেকে বচন খসা মাত্তর এ দুনিয়াকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যায়। আবার পুড়ে ছাইও করে দেওয়া যায়।'[৪]

কাক সাধনার বিচিত্র বর্ণনাও দেওয়া আছে গল্পটিতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে একদিন বাঁকাদহ





বাজার থেকে পূজার সামগ্রী কিনে আনল খোঁড়া কেশব। কালো পাড় ধুতি, লাল পাড় শাড়ি, লাল গামছা, মালা-ঘুনসী, সিঁদুর, রকমারি বেনে মশলা। দিনটা ছিল অমাবস্যা। সন্ধে-সন্ধেয় তেঁতুল তলায় আসন পাতল খোঁড়া কেশব। বসে গেল গর্তের পাশটিতে তাবৎ সামগ্রী সাজিয়ে। ধূপ-ধুনো জ্বালাল। চটের থলি থেকে একে একে বের করল হরেক সামগ্রী। শুয়োরের মাথার হাড়। পেচকের বিষ্ঠা। টিকটিকির জিভ। কালও বিড়ালের নখ। মাদী ভালুকের দাঁত। মাটির মালসায় মৈথুন করেনি এমন পাঁঠার রক্ত। হাবিজাবি আরও অনেক কিছু। কাকটাকেও খাঁচাশুদ্ধ এনে রাখল গর্তের পাশটিতে। ভানুমতী বসে বসে অপার বিস্ময়ে দেখতে থাকে সবকিছু।

গল্পের অনেকটা অংশ জুড়েই আছে গভীর রাতের ভীতিপ্রদ পরিবেশের মধ্যে তন্ত্রসাধনার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা। গল্পটিতে লোকবিশ্বাসের পরিচয় ফুটে উঠেছে নিখুঁতভাবে। এছাড়াও এই গল্পে একটি লোকপ্রবাদ ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি হল 'গরু-হারা, বউমরা আর দাউদ-চরা, এই তিনের কষ্টে পাষাণ কাঁদে'। এই ধরনের তন্ত্রসাধনা ও যজ্ঞের পরিচয় আছে 'ইন্দর যাগ'৪ গল্পটিতে। লোকবিশ্বাস ও লোকাচারই এই গল্পের মূল থিম। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বিবাগী 'লখিন্দর'। লখিন্দর তন্ত্রমন্ত্র ও কুহকবিদ্যা জানে 'লোকটা মাঝে মাঝেই বড় আচানক কথা কয়। দাবি করে, সে আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি নামাতে পারে। বলে হুকুম করুন হজুর। আগাশ ফাইট্যে হদহদিয়ে পানি লামাই আইজ্ঞা।'[৫]

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার গ্রামজীবন। বাংলার গ্রামজীবন থেকে অলৌকিক শক্তির প্রতি নির্ভরতা আজও মরে যায়নি লখিন্দরের গাঁয়ের মানুষকে শুধোলে তারা আধা-অবিশ্বাসে হাসে। এসবের বারো আনাই বুজরুকি আইজ্ঞা। বেশিরভাগই ভেল্কি ছো। তেবে আছে। পৃথিবীতে বিদ্যা আছে। ভোজবিদ্যা কুহকবিদ্যা, মধুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, কাকচরিত্র কতই না বিদ্যা আছে এ দুনিয়ায়। সঠিক থানে, আসল গুরুর কাছে পাঠ নিলে আর প্রক্রিয়া মতো সাধন করলে বিদ্যা ফলে বই কী। অবশ্য শুধু সাধন করলেই হয় না। আধারটি ভালো হওয়া চাই। আর জন্মাঙ্কুর থাকা চাই। লচেৎ লয়। এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তর্কাতর্কি চলে। শেষমেষ সাব্যস্ত হয়, সব আছে। ভালা-খ্যারাব, আসল-নকল, উস্তাদ-ধড়িবাজ এ দুনিয়ায় সব আছে। তেবে লখিন্দরটা কিছো জানে।

নিঃস্ব লখিন্দর মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে কাতর কুলডাঙরের গ্রামবাসী সকলে মিলে এসে প্রার্থনা করে 'অঝা চূড়ামণি' লখিন্দরের কাছে দাবি জানায় বৃষ্টি নাবানোর জন্য। এই প্রথম ভেঙে পড়ে লখিন্দর 'হাত জোড় করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মোকে ক্ষমা দেন বাপ সকল। উসব ছা-ভুলানো কাজে মন আর নাই ভরছে আইজ্ঞা। বাণ মারা, তেল মন্ত্রানো, মেয়া ভুলানো, ভূত ছাড়ানো, গর্ভপাত ইসব কুনো বিদ্যালয় আইজ্ঞা। হুজুর, ইসব হইল্যাক পাতাল-বিদ্যা। মইরবার পর এ বিদ্যা যাবে পাতালে লরকে'।[৬]

.............................................................................................................

লখিন্দর ম্লান চোখে তাকায়। ধরা গলায় বলে, 'এই দুনিয়ার মানুষ আটাগুলা জলকে দুধ বলে খেঁইয়ে মচ্ছে আইজ্ঞা। আসল দুধ চাখে নাই। মিছাকথা নাই বইলব হুজুর। উসব দু-লম্বরি বিদ্যা। সাপ ধরাটা কিছো কঠিন কাম লয়। শুধু আইজ্ঞা সাহস আর হাতের কৌশল।

চমকে ওঠে মাদল বাউরি। উস্তাদ কি পাগল হয়ে গেল! বিদ্যার গুপ্ত কথা ভাঙে কেউ? এসব বিদ্যায় মানুষের বিশ্বাসটাই আসল। বিশ্বাস ভাঙলে ধ্বন্বন্তরীও ঠুঁটা জগন্নাথ। ফিসফিসিয়ে ওস্তাদকে থামাতে চায় মাদল বাউরি।

.............................................................................................................

'আর অন্য বিদ্যাগুলান? তেলপড়া, জলপড়া, বাণ মারা, ভূত ছাড়ানো?'

'সবই এক হুজুর।' লখিন্দর অকপটে স্বীকার করে, 'কিছো দ্রব্যগুণ, কিছো হাতের কৌশল। বেশিরভাগই মানসিক চিকিচ্ছা। মনটাই তো আসল হুজুর। মনেই রোগ জন্মায়। মনেই সারে।'[৭]

কিন্তু খরাপীড়িত জনগণ লখিন্দরের সত্যভাষণে আস্থা রাখতে পারে না। লখিন্দর ব্যয়বহুল 'ইন্দ্রযজ্ঞ' বা 'ইন্দরযাগ'-এর বিধান দেয়। এই যজ্ঞের আয়োজনে লাগবে বিপুল লোকউপাচার দ্রব্য ও তৈজস 'খাঁটি ঘি, কালি গাইয়ের দুধ, ধুনা, গুগগুল, শুট, পিপুল, ধনুশ পাখির হাড়, রুদ্রাক্ষ, মড়া চিরের মাটি, কালপেঁচার নখ, আরো শতেক চিজ। রুখা প্রান্তরের মধ্যিখানে শালকাঠ দিয়ে বৃত্তাকারে সাজানো হবে ন-খানা ধুপি। ওই জ্বলতে থাকবে একনাগাড়ে। সারা গায়ে খাঁটি ঘি মেখে ওই জ্বলন্ত ধুনির বৃত্তের মধ্যে বসে অষ্টপ্রহর বীজমন্ত্র জপ এবং তৎসহ নানান উপাচার, মুদ্রা, অনুষঙ্গ চলবে, যতদিন না আকাশ ভেঙ্গে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি জলেই নিভবে ধুনির আগুন। অন্য কোনো উপায়ে নয়। ধুনির আগুনে ঘন ঘন ঘি ঢালতে হবে প্রক্রিয়া মতো। গায়েও ঘিয়ের জমাট প্রলেপ। আগুনের সংস্পর্শে গায়ের ঘি গায়েই গলবে। সূর্যের আর চারপাশের আগুনের তেজে ভাজা ভাজা হবে শরীর। শুকিয়ে আমসি হবে গায়ের চাম। সে সময় এক ফোঁটা থুথুও গেলা যাবে না। সে এক ভয়ানক ক্রিয়াকাণ্ড।'

কিন্তু এই বিপুল যজ্ঞের ব্যয়ভার বহন করতে পারবে না খরা ক্লিষ্ট ক্ষুৎপীড়িত জনগণ। যোলোআনা কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না লখিন্দর সারাক্ষণ ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকে যোলো-আনার মুখের পানে। সেই কবে কোন ছেলেবেলায় খরা-পীড়িত এই জেলার কোন এক অজ গাঁয়ে রামায়ণ গানের আসরে ইন্দ্রযজ্ঞের কাহিনী শুনেছিল সে। চতুর্দশ বৎসর অনাবৃষ্টি চলছে। জগৎ সংসার পুড়ে খাক। প্রজাদের হাহাকার আর আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভরে আছে। যজ্ঞ শুরু করেছিল রাজা। ইন্দ্রযজ্ঞের শেষ দিনে





চরাচর কাঁপিয়ে বৃষ্টি। অবিরাম, অবিশ্রাম। সে বৃষ্টিতে ধরিত্রী শীতল হলেন। চাষের খেত ফের সবুজ হল। গাছে গাছে ফল, বনে বনে পাখি। মানুষের মুখে ফের ফুটল হাসি।

এই গল্পে লোকবিশ্বাস, কুহক, যাদু, বিশ্বাসের অচলায়তন, লোকাচার, প্রবাদ (যেমন হাত ঠুঁটো জগন্নাথ), মিথ, লোককথার বিপুল ব্যবহার ঘটেছে এবং রাঢ়ের গ্রামজীবনের চিত্রও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

গল্পকারের উল্লেখযোগ্য গল্প 'ফসল কাটার গান'[৫] গল্পটিতেও লোকগান, লোকওষধি ও লোকখাদ্যের কথা নিপুণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। জোতদার নিশিকান্তের আদেশে ধান রুইতে রুইতে গান ধরে আদিবাসী কৃষক রমণীরা

"বুরু হুরেম দাড়ান দুলাড় জিইয়ে রেয়াড় গে
এতম ফঁয়ে বেঙ্গেৎ এ্ঞেল হাড়িয়ার গে
বুরু চেঁড়ে চেহর বেহর নেহরাতে ক রাগ
চেবেজাবা বাহা মোহেৎ লেগেজ লেগেজ রড়।
টিরু মাণ্ডি গানের অর্থ বুঝিয়ে দেয় মালিক নিশিকান্তকে
পাহাড়-পথে চলতে গিয়ে জুড়িয়ে যায় মন/যে দিকে চাও ডাঁয়ে-বাঁয়ে ঘন সবুজ বন/পাহাড় পাখির কিচির-মিচির মিষ্টি মধুর ডাক/ থোকা থোকা ফুল ফুটেছে মনমাতান বাস।"

শোষক, নির্যাতনকারী, নারীলোভী জোতদারের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয় আদিবাসী কৃষকেরা। তাই গল্পের শুরুতেই যে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি রোমান্টিক কিন্তু গল্পে ব্যবহৃত শেষ গানটিতে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদের সুর

"বলতে বলতে কোরাসে গান ধরে ওরা :
উবরং রাঙ চাঙ, পিতলে বাঁধাব ডাং
মাইর্ব ডাং-এর বাড়ি, ঘুচাব মজুতদারী
নিশিকান্ত বিষম খায়। খকখক করে কাশতে
থাকে সে। চোখদুটো আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে।"
..........................................................................
উব হিঁড়গি খিজা, ধান নাই সাগ-মিজা
লুকান চাল হামারে, বাঁইচ্‌তে আনগ কেড়ে...।

গাইতে থাকে ওরা। নিশিকান্তর চমকিত দৃষ্টির সুমুখে ওদের কাস্তে আকাশের পানে ওঠে, নামে...। গানের তালে তালে।"

আদিবাসীদের প্রাণের লোকগীতি, তাদের লড়াইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে এবং হয়ে উঠেছে গল্পটির মূল চালিকা শক্তি। এই গানটি ছাড়াও গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে 'সব সখীকে পার করিতে লিবো আনা আনা/আর রাধিকাকে পার করিতে লিবো কানের সোনা।' গানটি।

গল্পটিতে লোক ওষধি হিসাবে নিমতেল, কাচড়া তেল, ও কুসুম তেলের প্রসঙ্গ আছে এবং লোকখাদ্য হিসাবে মাছ-কাঁকড়া, গেঁড়ি-গুগলি, বেগুন-পোড়া, সুসনি শাক প্রভৃতির কথাও আছে। সাধারণ গ্রামবাসীর মাছ ধরার লোক প্রযুক্তি হিসাবে 'খুনী-খুগী' ও বড়শির উল্লেখ আছে।

'ঘাতক'৬ গল্পটিতে আছে বলিদানের নির্মম প্রথার বৃত্তান্ত। বলিদান প্রথা ও ঘাতক চরিত্র করালী বাগদিই এই গল্পের মূল বিষয়কে ধারণ করে আছে। করালী বাগদি সারা জীবন ধরেই শিয়রবিঁধার রটন্তী কালীর মন্দিরে শতশত ছাগশিশু বলি দিয়ে আসছে। এই কাজে সে সিদ্ধহস্ত। গল্পে বলিদান ও বলিদান পরবর্তী প্রথার নিখুঁত এবং বিস্তৃত বর্ণনা আছে শিয়রবিঁধা কালীর থানে বলি অবশ্যি অঢেল হয়। বলির পর পিছলি-চাল একখানা পূজা 'কুমোটি'কে দিতে হয় ধড়খানা লিয়ে যায় ব্রতী। মুণ্ডুগুলো পায় পীতাম্বর আর করালী। সেটা ফের ভাগাভাগি হয় চেলাদের মধ্যে। বলি তো আর একলার দ্বারা হয় না। করালী তো কেবল হেতার বাগিয়ে খাড়া থাকে। পশুকে হাড়িকাটে সেঁধানো, উয়ার ঠ্যাং-চারটি পেছনে থেকে খিঁচে ধরা, বলির পর মুণ্ডুগুলো গুছিয়ে রাখা, কাটা গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরোনো রক্তের ধারায় ক্ষিপ্রহাতে মাটির মালসা পেতে দেওয়া এসবের জন্য অন্তত জনা দুই চেলা লাগে। পূজার জোগাড়যন্তরের জন্য পীতাম্বরেরও থাকে জনা দুতিন জোগাড়দার।

.............................................................................................................

বছরে পার্বনের ক'টা দিন মাংসটাংস খাওয়া যায়। তাই বলে শুধু মাংস খাবার লালসায় এবলি, অমন কথা মুখ ফুটে বলে কেউ? একি শুধু পাঁঠাটাকে এক কোপে কেটে ফেলা? এ হোল জ্ঞান-খড়্গ দিয়ে প্রকৃতির বিনাশ। কত তার নিয়ম। কত তার উপাচার। প্রথমে খড়্গাকে সিনান করাতে লাগে। তার গায়ে চোখ আঁকতে হয়। এক অক্ষরী বীজমন্ত্র লিখতে হয়। পূজা করতে হয় হেতারকে। ওঁ হ্রীং কালি কালি ব্রজেশ্বরী লৌহদণ্ডায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব শক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ। ওঁ খড়্গায় খরধারায় শক্তি-কার্য্যার্থ তৎপর/পশুচ্ছেদ তয়া শীঘ্র, খড়্গানাথ নমস্তুতে। শুধু হেতার লয়, পূজা করতে হয় অন্য 'আবরণ' দেবতাদেরও। মহাদেব থেকে মুণ্ডুমালা, পানপাত্র, ডাকিনী-যোগিনী, শিবা-সবাইকে'।৮ মায়ের থানে পূজা পড়ে ব্রতীর কল্যাণে। ঘাতকের নামেও পূজা পড়ে। মা গো, ঘাতক তুমার আদেশে কাজ করছে মা। উয়ার যেন কোন অকল্যাণ না হয়।

বলির পরেও কত ক্রিয়াকাণ্ড। প্রথম পশুটির ঘাড় থেকে একগুচ্ছ লোম কেটে মাটির মালসায় রাখা হয়। সঙ্গে থাকে পাকা কলা। বলির পর পশুর রক্ত ওই মালসায় ধরে রাখা হয়। ওই রক্ত বটুক ঠাকুরের নামে নিবেদন করা হয়। আরও আছে, প্রথম পশুর শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে একশ-আটখানা খণ্ড নিয়ে বিভিন্ন বীজমন্ত্রসহ সেগুলো হোমাগ্নিতে আহূতি দেওয়া হয়।





এই বর্ণনা থেকেই লোকপ্রথার নিবিড় বর্ণনা যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় গল্পকারের অসামান্য পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয়। বলিদানের ব্রাহ্মমুহূর্তের আবেগপূর্ণ বর্ণনাও দিয়েছেন গল্পকার একটি কুচকুচে কালো ছাগশিশু। তার কপালে দগদগে সিঁদুর। গলায় জবাফুলের মালা। সে স্থির নীলাভ চোখে দেখতে থাকে করালীকে।

করালী জানে, এটি সাধারণ পশু নয়। এর শরীরে কোনও খুঁত নেই। এখনো সংগম করেনি সে।

পীতাম্বরের তখন দেখেশুনে কাজ করার অবসর নেই। সামনে এখনো দুশো ছাগলের লাইন। সে কখনো চোখ মুদে, কখনো চোখ আকাশের দিক তাক করে পরম নিরাসক্তি নিয়ে আউড়ে যাচ্ছে পশুর উদ্দেশ্যে গায়ত্রী মন্ত্র। ওঁ পশু পাশয় বিদময়ে/বিশ্বকর্মণে ধীমহী/অন্নোজীব প্রচোদয়াৎ-। বলতে বলতে ঘটি থেকে খানিকটা জল নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে পশুর পায়ের দিকে। এতদপাদ্যং, ওঁ ছাগপাশবে নমঃ। যান্ত্রিক হাতে তুলে নিচ্ছে একমুঠো জবাফুল আর বেলপাতা। গলা অল্প চড়িয়ে শুরু করেছে সম্প্রদানের মন্ত্র। ওঁ বলি গৃহাং মহাদেবি/পশু সর্বগুণান্বিতাম/ যথোতেন বিধানেন অভ্যমস্ত সমর্পিতম অর্ধেক বেলপাতা, ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে দেবীর পায়ের দিকে। বাকি অর্ধেক পশুর দিকে।

কত পশুই তো জন্মায় এ দুনিয়ায়। কজনার ভাইগ্যে অমনটি জুটে? মাদিগুলানের তো মুক্তির কুনো উপায় নাই। শাস্ত্রে সাফ বলে দিয়েছে, বলির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পশু সর্বদাই বর্জনীয়।... তুইও উয়াদ্যার একজন। যা, যা, ছাগজনমথিকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে যা!

এই বর্ণনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি বাংলার লোকজীবনে ধর্ম বিশ্বাস ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা কত তীব্রভাবে বিদ্যমান। এছাড়াও গল্পটিতে অনেক প্রবাদ প্রবচন ব্যবহৃত হয়েছে যেমন 'ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর', 'আদার ব্যাপারী তুমি জাহাজের খোঁজে তোমার দরকার নাই', 'আরশুলা হয়েছে পাখি' প্রভৃতি।

একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক গল্প 'প্রায়োপবেশন'৭ এও অজস্র প্রবাদের শিল্পসম্মত ব্যবহার ঘটেছে 'সর্প হয়্যা দংশ তুমি, ওঝা হয়্যা ঝাড়', 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়', 'ঝাঁকের কই ঝাঁকেই ফিরিয়া যাবে', 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগরও শুকায়ে যায়', 'অভাগা চোর যে পথে যায়, হয় কুকুর ডাকে, নয় রাতপোহায়', কপালে নেই ঘি, তার ঠকঠকালে হবে কি?' 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়', 'কপাল খারাপ হলে নলরাজার পোড়া মাছটিও ধোওয়ার সম পালায়', 'এক মাঘে শীত যায় না' প্রভৃতি। এছাড়াও আরও অনেক গল্পে প্রবাদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় যেমন 'পাকা ধানে মই', 'রজ্জুতে সর্পভ্রম', 'খেতে হয় চেখে চেখে, পা ফেলবে দেখে দেখে', 'সাপের ছুঁচো গেলা, না পারে গিলতে না পারে ওগরাতে', 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা', লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়', (গুহা)৮, 'জ্যালের ঘানি, কালাপানি, উয়ার চে ভালা পরাণ হানি', 'যমন ঠাগরের তমন পূজা', (হুলমারার ভমরা মাঝি)৯, 'আয় বাঘ গালায় লাগ' (চিকনবাবু), 'চোরের সাত দিন, গিরস্থের একদিন',

'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে' (আত্মপীড়ন), রাজনৈতিক গল্প 'বানের জল'১০ এ একটি সুন্দর লোকগান ব্যবহৃত হয়েছে

'ভরা নদী ভয় করিনে, ভয় করি সই বানের জল,
ও জলের হরেক রীতি, হরেক নীতি, হাজার পেকার ছল
(তাই) ভয় করি সই বানের জল।'

'জনকুঁদরা' গল্পের মতো আরও একটি গল্প 'দুধকোহরা' গল্পটিও নির্মিত হয়েছে একটি মিথকে অবলম্বন করে। এটি একটি লোকবিশ্বাস। কোনো কোনো গাভী দুধ না দিলে লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সেই গাভীকে 'দুধকোহরা' বলা হয়। গভীর রাত্রে এই গাভীর 'বাঁট' চুষে সমস্ত দুধ খেয়ে ফেলে কোনো কাল সাপ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক। গ্রামীণ মেলার প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় 'হুলমারার ভোমরা মাঝি', 'জগৎপুরের বিশ্বায়ন', 'জনকুঁদরা', 'পুত্রেষ্টি', 'কুঁজোপানা মানুষ' প্রভৃতি গল্পে। গল্পকার ভগীরথ মিশ্রের গল্প পাঠ করে বোঝা যায় লোকসংস্কৃতির ওপর তাঁর গভীর আগ্রহ আছে এবং তাঁর সৃষ্টির মূলে লোকায়ত ভাবনা নিয়ত সক্রিয় থাকে।

**তথ্যসূত্র :**


১. ভগীরথ মিশ্র, সেরা ৫০টি গল্প, জনকুঁদরা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ ৪৩৩-৪৫৬
২. পটিদার, ঐ, পৃ ১১-২৩
৩. কাকচরিত্র, ঐ, পৃ ৫০৪-৫১১
৪. ভগীরথ মিশ্র, শ্রেষ্ঠগল্প, ইন্দর যাগ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ, নভেম্বর ২০২২, পৃ ২২৯-২৪১
৫. সেরা ৫০টি গল্প, ফসলকাটার গান, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮২-৪৯৫
৬. ঘাতক, ঐ, পৃ ৩৪০-৩৫২
৭. প্রায়োপবেশন, ঐ, পৃ ১৯০-২০০
৮. গুহা, ঐ, পৃ ২৯৩-২৯৮
৯. হুলমারার ভমরা মাঝি, ঐ, পৃ ৭৪-৮২
১০. বানের জল, ঐ, পৃ ১৫৮
১১. দুধকোহরা, ঐ, পৃ ৪৫৬-৪৬৫




## আবুল বাশারের গল্প
## রুকু দেওয়ান : এক রূপাজীবার আলোকোজ্জ্বল পরণকথা

**রফিয়া সুলতানা মোল্লা**

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে আবুল বাশার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কথাসাহিত্যিক হিসাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, হিন্দু - মুসলমান সম্পর্কের নানা দিক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকাচারকে তিনি অনায়াসে তুলে আনেন তাঁর সাহিত্যে। সত্যিকার অর্থে তাঁর কথা সাহিত্যে মানবপ্রেমই জয়যুক্ত হয়েছে সবসময়। আবার আরব মরুর লোককল্প, আরবি উপকথা তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিভিন্ন আঙ্গিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাঁর কথায় — 'এসব আমি ছোটবেলা থেকেই দাদি, নানীর মুখে শুনেছি। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তির থেকেও শোনা। যেখানে ইসলাম গেছে, আরবি এই লোককথাগুলিও সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে।'[২] মরুভূমিতে বিচরণশীল ধর্মে নিহিত মানুষের আদি অস্তিত্ব স্বর্গের কল্পনা করেছিল। এই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজন হয়েছে নারীর, আবুল বাশারের সাহিত্যে যারা উঠে এসেছে নানা রূপে। তাঁর কথায় -'মরুভূমিকে আমি সুর - অসুরে বিভক্ত করতে পেরেছি, এ কারণে বহু দেব-দেবী ধর্মের সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মরুভূমির আদি - পুরাণের উদ্দেশ্যে, যার বয়ানে দেবতাও দোষেগুনে চিত্রিত।'[৩]

একথা আবশ্যক যে ধর্মের সহাবস্থানকে মান্যতা দিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে। ধর্মের বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিলেই তবে নানা ধর্মের সহাবস্থান সম্ভব। আবার ধর্মের সঙ্গে মানবিক সাম্যের বিরোধ হলে নির্ভীক ও দৃঢ় সংকল্প সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন। 'প্রচলিত ধর্ম যেখানে মানুষে মানুষে মিলনের পথে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর গড়ে তোলে সেখানে সেই প্রাচীর ভাঙাটাই মানবিক ধর্মের কর্তব্য।'[৪] আবুল বাশারের সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাগুলি সর্বঅর্থে সার্থক হয়ে ওঠে। 'বাশারের মুর্শিদাবাদকে বলা যেতে পারে মারেফতি - শারিয়া ইসলামের ও বৌদ্ধের এবং বৈষ্ণব হিন্দু, শূদ্র ও ব্রাত্যের মুর্শিদাবাদ। এ মুশিদাবাদ লোকস্তরে সমন্বয়বাদী ধর্ম সংস্কৃতির পুণ্যতোয়া......।'[৫] এই মুশিদাবাদের ভূমিপুত্র আবুল বাশার সমন্বয়বাদী চেতনারই বার্তাবাহক।

মানুষের অস্তিত্বের এক চিরন্তন সত্য হিসাবে 'যৌনতা' আবুল বাশারের সাহিত্যের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। বাশারের মতে — 'যৌনতাই আসলে মানুষের আদিম অস্তিত্ব, চালিকাশক্তি। যৌনতাকে এড়িয়ে তো মানুষ হয় না।'[৬] তিনি আরো বলেছেন 'যৌনতা জটিল হয়েছে আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে। নারী মনের মুক্তির কথা যৌনতার পথ ধরে আসছে। তার নানা রকম রূপ-বৈচিত্র্য আছে। যুগে যুগে তা বদলাচ্ছে।'[৭]

আমাদের আলোচ্য আবুল বাশারের 'রুকু দেওয়ান' গল্পটিকে সাহিত্যিকের এইরকম নানা রচনা বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে বিচার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

আমাদের চলার পথে কখনো কখনো কোনো অর্জিত বিশ্বাস, প্রচলিত গল্পগাথা বা কথকতা মন-মনন-অনুভবে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে একান্ত চালিকা শক্তিরূপে যেন ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা দেয়। আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা হয়ে ওঠে গড়ে তোলে নিজস্ব মূল্যবোধ, নিজস্ব জীবনদর্শন। সত্য সন্ধানী পূর্ণ দৃষ্টিকোণে চেতনার বিবর্তন - অপ্রাণ থেকে প্রাণের যাত্রায় বৃহত্তর জীবনবোধে উত্তরণ। 'রুকু দেওয়ান' গল্প প্রসঙ্গে এ কথা সর্বৈব সত্য হয়ে ওঠে।

**এক.** চোখে যার সুলেমানি সুমিষ্ট কয়রা

'রুকু দেওয়ান' সুন্দরী, যথার্থ অর্থে। কথায়, চলনে-বলনে তাঁর চারপাশে যেন এক আভিজাত্যের ছোঁয়া অনেকের মাঝে এক সুস্পষ্ট স্বতন্ত্রতা যেন তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডল রচনা করেছে। 'দেওয়ান' একটি ইরানি বংশীয় নাম। আবার সুলতানের আমলে পরগণার মালিককেও 'দেওয়ান'বলা হত। রুকু দেওয়ানের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে এমনই কোনো বনেদিয়ানার যোগ অনুমান করা যেতে পারে। আজ অবশ্য রুকু দেওয়ানের চোখে আলো নেই, সে অন্ধ। তবে চোখ দেখে বোঝার উপায় নেই - তিনি চোখে দেখেন না। সুন্দরীর এই অন্ধ চোখকে আবুল বাশার বলেছেন - 'দুই চোখ সুলেমানি ৮ সুমিষ্ট কয়রা।' সাত বছর বয়স অবধি অবশ্য রুকু দেওয়ান এ পৃথিবীকে দেখেছে তার চোখের তারায় — উজ্জ্বল আলোর নীচে। আজ ফেলে আসা পৃথিবীকে তাঁর নিজস্ব অনুভবে ছোঁয়ার চেষ্টা করে আপ্রাণ।

**দুই.** ধর্ম আর দারিদ্র্য নিয়ে তে-ভাগা জীবন

রাজশাহির তিরাইল জোয়ারির মসজিদ পাড়ার বসত-এ বাপ-মায়ের স্নেহে রুকু দেওয়ানের বেড়ে ওঠা। মসজিদ পাড়া ধার্মিক জায়গা। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত আজান আর নামাজে মশগুল জনপদ। ধর্ম আর দারিদ্র্যের সহাবস্থানে তাদের জীবন যেন তিনভাগ দারিদ্র্যের সাথে একভাগ ধর্মের গাঁটছড়া বেঁধে চলা। যদিও সেই ধার্মিক একভাগ, তিনভাগ দারিদ্র্যের অপেক্ষা কোনও অংশে কম জোরদার ছিল না। আবুল বাশারের কথায় - 'তথায় রোজা-নমাজ-ফিতরা- জামাত- মহরম- আকিকাহ- তসবিহ- সুন্নাহ- হারাম- হালাল- কলমা- সুরমা- নুর- ফরিস্তা- জাকাত- জুর্মানা- হুরি- হুসনা- কেয়ামত- কোর্মা- শিরনি- খোর্মা- মুর্দা- হাসর- গোর- দোয়া- দরুদ- জন্নত- জহন্নম- তল্লাক- নিকাহ জানেজা- সজদা ছাড়া কথা ছিল না'।

দারিদ্র্যের জ্বালা দুঃসহ। জীবনকে জটিল করে তাকে বিপথগামী করে, শিক্ষা-দীক্ষা নীতি-নৈতিকতার কণ্ঠরোধ করতেও পিছপা হয়না। মসজিদ পাড়ায় দারিদ্র্য আর অশিক্ষা ছিল নিত্যসঙ্গী। এক সময় ধর্মের ধুয়ো তুলে অজ্ঞ মোল্লাদের যথেচ্ছ তালাক বিধি এখানে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

জাঁকিয়ে বসেছিল। মাঝে মধ্যে মেয়েমানুষ তালাক হয়ে যেত। আবার দারিদ্র্যতার সুযোগে বিয়ে বা কাজের প্রলোভনে হঠাৎ হঠাৎ দু-একটা কচি-কাঁচা বালিকা বা তালাকী মেয়ের গাঁ থেকে উধাও হওয়াটা নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল। এসব মেয়েদের জায়গা হত দেহব্যবসার অন্ধকার জগতে। আবার কখনো কখনো ভিনদেশী পুরুষ দলবল জুটিয়ে বিয়ের অভিনয় করে পাত্রীকে নিয়ে তুলে দিত পাচারচক্রে। এমনই এক নির্মম পরিণতির নিয়তিচক্রে বাঁধা পড়ল রুকু দেওয়ানের জীবন।

**তিন.** গাই-বকনায় বাটা জীবনরুকু হল রুক্মিণী

যখন রুকু দেওয়ানের বয়স চোদ্দো — ধীরে ধীরে তাঁর চোখের আলো গেল নিভে চক্ষুহীন নিত্যযন্ত্রণাময় জীবনকে মেনে নিয়ে রুকু বেড়ে উঠছিল। সে মায়ের শরীর ধরে ধরে নামাজের ওঠা-বসা-সিজদা-মোনাজাত-সালাম শিখেছে আর কলমা শিখেছে মুখে মুখে।

একবার একদল উর্দুভাষী মুসলমান বিয়ের যুগ্যি কনের খোঁজে হাজির হল তিরাইল জোয়ারির এই মসজিদ পাড়ায়। তাদের দেশে নাকি কনের টান। জুম্মা সেখ ছিল এই দলের বাঙালি যুবক। রুকুর বাপ বরকতি দেওয়ান মেয়ের জন্য বাঙালি 'দামাদ' পছন্দ করলে অচেনা জুম্মার সাথে রুকুর শাদি হয়ে গেল। ছদ্মবেশের আড়ালে জুম্মা ছিল ওই উর্দুভাষী কনে-শিকারি দলের বাঙালি দালাল। অন্ধ সুন্দরী কনেকে সে পদ্মাপার করে আনলে হারু ডাঙার চরে। মাঠ-কুঁড়েয় রেখে ভোগ করলে মাস খানেক। তারপর স্বরূপগঞ্জ দাশপাড়ায় গোরুর ব্যাপারী ধনাই-এর উঠোনে 'তালাক' দিয়ে বাটা করলে ধনাইয়ের গাই বকনার সঙ্গে। ধনাই দালাল রুকুকে নিকাহকরে দু-মাস সাধ-আহ্লাদ

মিটিয়ে দাশপাড়ার পতিতা পল্লিতে চালান করে দিল। আটষট্টির দুর্ভিক্ষের আকালে বদরুহ কেওড়া নামে এক হিন্দি-উর্দুভাষী রুকু দেওয়ানকে এক টিফিন কেরিয়ার কোরবানীর মাংস ভাতের বাটায় নিজের ইচ্ছেপূরণ করে আরও মাংস-ভাতের লোভ দেখিয়ে তাকে সোনাগাছি এনে তুলল। সুন্দরী অন্ধ রুকু নিয়তির নিষ্ঠুর খেলায় ইজ্জত-সম্মান হারিয়ে হাতবদল হতে হতে মসজিদ পাড়া থেকে গভীর অন্ধকারে নেমে এল। বুকে তার দুঃসহ যন্ত্রণা — 'চোখ পাইলে মুই মসজিদ পাড়ায় ফিরা যাইতাম পুটু। কলকেতায় আলো নাই সোনা।' নিষিদ্ধ পল্লিতে এসে রুকু দেওয়ানের নাম হয়েছে রুক্মিণী দাসী। সবচেয়ে রূপমতী রূপাজীবা। তারকনাথ নাহা নামে এক বাবুর রাতের রক্ষিতা — যার ঔরসে রুকুর গর্ভে পুটুর জন্ম। এই পুটুকে পরণকথা শোনানোয় ব্যগ্র রুকু দেওয়ান।

**চার.** আরব মরুভূমির তারা জহুরা

একটি সুন্দরী অন্ধ বেশ্যা পড়ছেন সন্ধ্যার নামাজ - সংসারের এ একটি অতিবিরল দৃশ্য সন্দেহ নেই। শুচিতা কী কেবল শরীর ঘিরে ? অথবা ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনকে মেনে নিয়েও এক নিরুপায় মহিলার ঈশ্বরানুরাগ অথবা জহুরার মতো ঈশ্বরের ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের

আপ্রাণ আকুলতা। মাগরিব অশ্বগমনে চলে গেলে নামাজ পড়ে মোনাজাত শেষে তিনি পুটুকে শোনাবেন একটি নক্ষত্রের কাহিনী, যা তিনি বহুকাল অন্তরে ধারণ করে বয়ে এনেছেন মসজিদ পাড়া থেকে। রুকু দেওয়ান তাই গণিকালয়ের ছাদে অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছেলেকে বলবেন, দেখতো পুটু, দেখতে পাও কিনা আসমানে তাকাও। কথা শুনে তার কালো সোনা আকাশে তাকাবে। আরব মরুভূমির তারা জহুরার খোঁজে। জহুরাতুল কোবরা। আসমানের এই তারা চিনতে পারলে সওয়াব করেন খুদা। এই জীবনের শতেক পাপ দূর করেন আল্লা মাবুদ।

এর আলো যদি অন্ধের চোখের পাতায় 'সিধা আইসা পড়ে', তবে সে আলো পায় - অন্তর চক্ষুও প্রস্ফুটিত, প্রসারিত হয়ে ওঠে। পুটুর চোখ দিয়ে সে তারার আলো দেখতে চাইতেন মা রুকু দেওয়ান।

এক অন্ধ সুন্দরী পতিতা চাইতেন তাঁর হিন্দুপুত্র হবেন সম্বুদ্ধ সন্ন্যাসী - আর তাঁর সমস্ত পাপ দূর করবে সেই পুত্র। পুটুর পিতৃপরিচয় দিতে অস্বীকার করেছিল তারকনাথ। স্কুলে ভর্তির সময় সত্যানন্দ মহারাজ এগিয়ে এসে পুটুর পিতৃত্ব ভিক্ষা দিয়েছিলেন। 'সেই অলৌকিক দান পুত্রের জন্য গ্রহণ করতে পেরে রুকু দেওয়ান স্বপ্ন দেখেন, তাঁর পুত্রই তাঁর পাপ দূর করবে।' পুট যেন তাঁর জীবনের আর এক জহুরা হয়ে ওঠে — 'তুমি বিদ্বান সন্ন্যাসী হবে।'

এরপর অনেক কষ্টে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ছেলেকে এম. এ. পাস করান রুকু। আর নরকের স্পর্শ বাঁচিয়ে পুটু কিভাবে সম্বুদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন সে আর এক মস্ত ইতিহাস।

**পাঁচ.** আশ্চর্য এক জ্যোতির উর্ধ্বগমন

অবলা মুমূর্ষু এক পথ - কুকুরকে জলপান করিয়ে করুণাময় স্রষ্টার পক্ষ থেকে এক রূপাজীবার ক্ষমা ও পুরস্কার প্রাপ্তির কথা হাদীসে৯ আছে। এ ঘটনা বহুশ্রুত। সাহিত্যিক আবুল বাশার এই হাদীস থেকে জহুরার কাহিনী বুনেছেন। আর এই জহুরাই হয়ে উঠেছে রুকু দেওয়ানের অভীষ্ট লক্ষ্য।

মরু আরাবার দ্বিপ্রহর । উত্তপ্ত বিস্তৃত বালুকারাশির এ নির্জন মরুপ্রান্তর যেন প্রজ্জ্বলিত লেলিহান শিখা । সাক্ষাৎ যমদূত । আর মরুদিগন্তে মরীচিকার মায়াবী জলের তরঙ্গ - যেন ওৎ পেতে বসে আছে মৃত্যুর প্রহর গুনে। জহুরা নাম্নী এক মহিলা বাজার থেকে একাকী পথ চলেছেন অনোন্যপায় হয়ে। চারিদিকের ভয়ংকর পরিবেশ আর দিগন্তে মরীচিকার ছলনা প্রত্যক্ষ করে তিনি শিহরিত হলেন। প্রার্থনা করলেন'হে খোয়াজা খিজির, হে পানির ফরিস্তা, কাউকে যেন পানির মায়ায় বিভ্রান্ত না করেন... দয়া করে এ গণিকার কথা শুনুন... মরু আরাবার সকল জীবকে জ্ঞানদান করুন, যাতে তারা বুঝতে পারে - দিগন্তে যা ছলছল করছে, তা জল নয়।'

জহুরা নিজেকে পতিতা ভাবত আর মনে করত খোদাকে ডাকার অধিকারও সে হারিয়েছে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

মানুষের সংসারে তাঁর জায়গা নেই পাপের ভারে ডুবে মরার মতো জলও নেই এই মরু আরাবার কোথাও। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর নিকৃষ্ট নরকেই তাঁর ঠাঁই হবে। তবুও জহুরা প্রার্থনা করলেন।

আপনমনে পথ চলেছেন জহুরা। হঠাৎ দেখলেন মরুভূমির তৃষ্ণায় ছটফট করে মারা যাচ্ছে একটি কুকুরের ছানা। জিভ বের করে সে হাঁফাচ্ছে, নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর। মরীচিকার ছলনা সে বোঝেনি - কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে দিকভ্রান্ত হয়ে এখানে এসে পড়েছে। যেভাবে সে ধুঁকছে তাতে কতক্ষণ প্রাণ থাকে বলা দায়। মায়া ভরা এক অব্যক্ত তীব্র টান বুকের মাঝে অনুভব করে জহুরা। আহা! এতটুকুন বাছা, অবলা জীব তেষ্টায় এমনি করে মরবে। জনবিরল এ প্রান্তে অন্য কারো সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা জেনে সে এদিক, ওদিক দৃষ্টিনিক্ষেপ করে জলের জন্য উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করতে লাগলো। দু-একটি মৃত কূপের সন্ধান পেলেও জলের চিহ্ন নেই কোথাও। জল! জল! এক ফোঁটা জল!

জহুরা ছোটাছুটি করছেন আর করুণাময়ের কাছে করুণ প্রার্থনা করছেন। আর পরিস্থিতি সাপেক্ষে আমাদের প্রার্থনা কখনো কখনো আন্তরিকতায় সম্পৃক্ত হয়ে করুণাময়কে স্পর্শ করে। সৃষ্টিকূলের অতি সামান্য এক জীবের মায়ায় জহুরার এ আর্তিকে সৃষ্টিকর্তা গ্রহণ করলেন আর তাঁকে উন্নীত করলেন ও ক্ষমা করলেন পূর্বেকার সকল ভ্রান্তিগুলিকে। হঠাৎ জহুরা এক জলভরা কূপের সন্ধান পেল। কিন্তু জলতো কূপের একেবারে গভীরে নাগালের বাইরে। এই জল তুলে আনার উপায়?

অন্তরীক্ষ থেকে যিনি জলভরা কূপের খোঁজ দিলেন, এবার তিনি বুদ্ধিও জোগালেন। জহুরা তাঁর পরনের বসনকে ছিঁড়ে ফালি ফালি করে পরস্পর জুড়ে রশি করলেন আর পায়ের একটি জুতো বেঁধে নামিয়ে দিলেন কুয়োর মধ্যে। উঠে এল জুতা ভর্তি জল। আর অতি যত্নে ছানাটির মুখের সামনে তুলে ধরলেন। জল পেয়ে কুকুর ছানাটি বেঁচে গেল। তুমি অপবিত্র জীব, আমিও নাপাক ঔরত, এসো আমরা একসঙ্গে বাঁচি।

এরপর একদিন রূপাজীবা জহুরার আকস্মিক মৃত্যুতে কুকুরটি আকাশের দিকে মুখ তুলে প্লুতস্বরে অত্যন্ত করুণ এক হাহাকারে এ বার্তা ঘোষনা করল। তবু কেউ এল না জহুরার খোঁজে। হঠাৎ দেখা গেল মৃতদেহ থেকে ঠিকরে বার হচ্ছে আশ্চর্য এক জ্যোতি আর ধীরে ধীরে দেহটি যেন জ্যোতির্বলয়ে বদলে যাচ্ছে। 'দেখতে দেখতে দেহটিই আর রইল না। আলোর বলয়টি ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে আকাশের দিকে উড়ে চলল। এবং সংহত হতে লাগল। তারপর সেই আলোক-বলয় নক্ষত্রে পরিণত হয়ে আকাশে স্থির হয়ে দীপ্তি পেতে থাকল।' জন্ম নিল 'জহুরাতুল কোবরা'- এক মহান শ্বেত - উজ্জ্বল তারকা।

এক দেহপসারিনী মহিলার 'জহুরাতুল কোবরা' হয়ে ওঠার গল্পতো কম কথা নয়। পাঠক এ গল্পপাঠে শিহরিত, রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! এ গল্প

তো সত্য- যেখানে জহুরা হয়ে উঠেছে রুকু দেওয়ানের বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা, অন্ধকার যাত্রা পথের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

**তথ্যসূত্র :**

১. আবুল বাশার, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০১২, পৃ- ২২৯
২. আবুল বাশারের সাক্ষাৎকার (গ্রহণে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়)— বইয়ের দেশ, জানুয়ারি - মার্চ (২০১৯)
৩. আবুল বাশার, রাজাবলি, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ — এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ- ১৬
৪. দত্ত অম্লান, যে কথা বলিতে চাই, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ- ১৪
৫. আবুল বাশার, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০১২, পৃ- ৮
৬. আবুল বাশারের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত
৭. ঐ
৮. হজরত সুলায়মান নবী সম্পর্কিত
৯. হজরত মুহাম্মদ (স) এর বাণী



## উদ্বাস্তু নারীদের জীবনযুদ্ধ ঃ নির্বাচিত উপন্যাসে

**গৌতম অধিকারী**

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী জন্মসূত্রে পরিযায়ী। বাধ্যত বাস্তুহারা হওয়া মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করে মানবাধিকারের প্রতিটি প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চনা। বিশ্বব্যাপী নারী অভিবাসনের ঘটনা ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পরিবেশ সঙ্কট, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বাতাবরণে এবং অপহৃতা, নির্যাতিতা হয়ে নারী এক পুরুষ হতে অন্য পুরুষের হাত বদল হয় পণ্যের ন্যায়। তাদের শরীর পুরুষের আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হয়। সাম্প্রতিক টালমাটাল বিশ্বে সমগ্র উৎপাটিত মানুষের অর্ধেকেরও বেশি নারী সম্প্রদায়। ২০০১ এর জনগণনা মতে, ৩০৯ মিলিয়ন অভিবাসনকারীর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ২১৮ মিলিয়ন ও পুরুষ ৯১ মিলিয়ন। সারা বিশ্বে বাস্তুহারা রমণীদের ক্রমশ সংখ্যাবৃদ্ধি জাতিসংঘের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য ১৯৭৫ সালে উদ্বাস্তু মেয়েদের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকোতে। এই সালটিকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ রূপে চিহ্নিত করা হয় ও সমগ্র বিশ্বের নারী সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। আর এক্ষেত্রে উদ্বাস্তু মেয়েদের বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। বহু দেশেই উদ্বাস্তু মেয়েরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। ভারতবর্ষ এর ব্যতিক্রম নয়। ঊনিশশো সাতচল্লিশের বিভাজন উপমহাদেশে মানবিক বিপর্যয়ের সূচনা করে জন্ম দেয় উদ্বাসনের। আর এই দ্বিখণ্ডনের আবর্তে নারীর জীবন হয়ে ওঠে অধিক সংকটপূর্ণ। অসহায় মেয়েরা সব দেশেই সর্বকালেই নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার। দাঙ্গা ও দেশবিভাগের সময়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বাস্তুহারা নারীদের হাত বদল হয়েছে ভালোবেসে, কখনও বা বাধ্য হয়ে। বিভাজন পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতাবানরা মেয়েদের অপহরণ ও ধর্ষণ করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরিত, বিবাহ এমনকি যৌনদাসত্বে বাধ্য করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই নারী নির্যাতন বিদ্যমান। যার মূল কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এতে ক্ষমতা পুরুষের হাতে কুক্ষিগত থাকে এবং নারীর অবস্থান হয় প্রান্তিক। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষদের লালসার শিকারে পরিণত হয় নিরপরাধ মেয়েরা। তবে বাংলা ও পাঞ্জাবের ছিন্নমূল মেয়েদের নির্যাতনের চরিত্রগত ভিন্নতা লক্ষণীয়। দুই প্রদেশের গৃহহীন নারীর পুনর্বাসন কিংবা ত্রাণ প্রকল্পে পক্ষপাতদুষ্ট সরকারি দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় মেলে। পাঞ্জাবি উদ্বাস্তু মেয়েদের নানান সুযোগ সুবিধা প্রদান ছিল বাংলার তুলনায় অধিক উল্লেখ্য, বিভাজন লক্ষ লক্ষ হিন্দু, শিখ ও মুসলমান রমণীকে অনিশ্চিত জীবন পথে ঠেলে দেয়। বাস্তুহারা সংকট ভারতবর্ষের পাশাপাশি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আর্থ — সামাজিক পরিমণ্ডলকে সমস্যা সঙ্কুল করে তোলার সাথে সাথে বাঙালি নারীর জীবন মানসকে জটিল ও আশঙ্কাজনক

পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ অভিবাসন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ওঠে। যা এপার বঙ্গের রাজনীতি, সমাজ, কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যাকে ত্বরান্বিত করে তোলে। দেশভাগ জনিত হিংসা সন্ত্রাস, বাঙালি সংস্কৃতিতে এক বিপর্যয় নামিয়ে আনে। সামগ্রিকভাবে মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছে। ছিন্নমূল মানুষ যখন সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে নিরাপত্তার সন্ধানে চলে যায়, তখন তার একদিকে স্মৃতির মধ্যে থেকে যায় ছেড়ে আসা অতীত, অন্যদিকে বর্তমানে তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হয় জীবন।

মোটামুটি অর্ধশতকের নিস্তব্ধতার পর ১৯৪৭ সালের দেশভাগ-এর প্রাসঙ্গিকতা বা সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে গবেষক মহলে যে তথ্যের, তত্ত্বের বা বিশ্লেষণের ঝড় উঠেছে তাতে একটা বার্তা স্পষ্ট উঠে আসে যে তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিতে 'দেশভাগ' অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ঘটনা প্রবাহে এই অমোঘ পরিণতি প্রসঙ্গে নেহেরুও স্বীকার করেছিলেন যে— "সত্যি কথা এই যে, আমরা ছিলাম ক্লান্ত মানুষ, বয়সও বেড়ে যাচ্ছিল আবার জেলে যাওয়ার ভবিষ্যত আমাদের অল্প লোকই সহ্য করতে পারত...ভারত ভাগের পরিকল্পনা এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ হাজির করেছিল, আমরা সেটাই গ্রহণ করলাম। আমরা আশা করেছিলাম, এই বিভাগ হবে সাময়িক, পাকিস্তান আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য। কিন্তু এই দেশভাগ বাংলার মানুষের মধ্যে অদ্ভুত এক ভীতি ও স্ব স্ব রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে, যে চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে শুরু হয় ব্যাপক বাস্তুত্যাগ ও সুরক্ষার খোঁজে অন্য রাষ্ট্রে অভিপ্রয়াণ"। সরকার যখন অনুভব করে যে, বেশ কিছু উদ্বাস্তু আর ফিরে যাবে না, তখন ভারত সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য চিরস্থায়ী ভাবে কিছু বন্দোবস্তের কথা ভাবতে শুরু করে ১৯৫০-এর দশকে যেমন ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন টাউনশিপ গড়ে তোলার পরিকল্পনা তুলে ধরে, যার মধ্যে নদীয়া জেলার ফুলিয়া নামক অঞ্চল ছিল অন্যতম। কাঁচড়াপাড়াতেও ১২ হাজার একর জমি নিয়ে এই ধরণের একটি টাউনশিপ গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৮-৫৮ সালের মধ্যে প্রায় ৩৮৯টি সরকারী আনুকূল্যে রিফিউজি কলোনী দেখা যায়, যার মধ্যে ৫৪ শতাংশ কলোনী ছিল ২৪ পরগণা জেলায়। ১৯৫২ সালের পর থেকে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করে, চেষ্টা করা হয়েছিল উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশকে অপেক্ষাকৃত কম করা। কিন্তু ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পুনর্বাসন মন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে এই সময়ের মধ্যেই ২৫ হাজার লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। কোনো পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই। দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য কিন্তু জনসংখ্যার হিসাবে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পঞ্চম। অমলেন্দু দে উল্লেখ করেছেন যে, উদ্বাস্তুদের ভিড় খণ্ডিত বাংলার নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল; তবু এটি ছিল এক ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস। মূলত এই সময়েই অন্ধকার থেকে নতুন আলোর দিকে এক অভিযান শুরু হয়েছিল। বাঙালির ইতিহাসে এটি এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল সর্বার্থেই খুব সঙ্কটময়।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

স্যার যদুনাথ সরকারও উল্লেখ করেছেন ১৯৫১-৫২ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জনসংখ্যা তুলনায় ক্রমশঃ কমে গিয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলকাতার কড়চা'-য় ১৯৬৬ সালেও এই একই ধরণের সঙ্কটের তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং মধ্যবর্তী কয়েক বছরেও যে উদ্বাস্তুদের অবস্থা ও অবস্থান খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি তা বলাই বাহুল্য। ১৯৬০-এর দশকে উদ্বাস্তুরা মূলত রাণাঘাট ও চাকদায় থাকতে শুরু করেছিল। রাণাঘাটেই প্রায় ৩ লাখ উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং সেখানে ১৯টি সরকারী কলোনী গড়ে ওঠে, যাতে প্রায় ৫৩ হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় পেয়েছিল। এই সময়ে কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলাতে অনেকগুলো ব্যক্তিগত কলোনী গড়ে ওঠে। সি. এম. ডি. এ.-এর একটি রিপোর্টেও দেখা যায় যে, এই সময়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গে ১১০৪টি কলোনী গড়ে ওঠে, যার মধ্যে ৪৬.১৯ শতাংশ (৫১০টি কলোনী) কলকাতা শহরের মধ্যে এবং ৫৩.৮১ শতাংশ (৫৯৪টি কলোনী) পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলাগুলিতে তৈরি হয়েছিল। আমার আলোচিত এই সন্দর্ভ পত্রে আমি এই সমস্ত বাস্তুহারার দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে উঠে আসা দুটি নারী চরিত্র- বিমলা ও সুতারা নিয়ে আলোচনা করবো। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো কীভাবে তারা বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সংগ্রাম করেছেন।

সরল অনাড়ম্বর শক্তিতে চেতনার আলোকে, নানা স্তরের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে ব্যক্তির টানাপোড়েনকে যুক্ত করে, প্রান্তরে প্রাঙ্গনে এক অচ্ছেদ্যতার আবহাওয়া রচনা করেছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর কাল পর্বে যুদ্ধ কালোবাজারী রক্তক্ষয়ী মৃত্যু গঙ্গার পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছিল এক বাস্তুহারা যাযাবর শ্রেণির জীবনসংগ্রাম। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-এই তিনটি চাহিদা মেটাতেই আমাদের জীবন সংগ্রাম করতে হয়। তেমনি যুদ্ধকালে উদ্বাস্তু এই মানুষগুলি বাঁচবার তাগিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একদেশ থেকে অন্যদেশে পাড়ি দিয়েছিল সমস্ত টানাপোড়েন কাটিয়ে। 'নির্বাস' উপন্যাসটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপ। 'নির্বাস' উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলা, তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের সূচনা-পরিসমাপ্তি, তার অতীত স্মৃতি রোমন্থনেই উপন্যাসের গতিময়তা পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসের সাতটি পরিচ্ছেদ জুড়েই রয়েছে বিমলার সতেরো বছরের রোদ-জল সহ্য করে টিকে থাকার কাহিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মায়ানমারের উপর মিত্রপক্ষের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে বিমলাকে রেঙ্গুন ছেড়ে তার দিদি ও ভুবনবাবুর সাথে বেরিয়ে পড়তে হয়। রেঙ্গুন থেকে বজ্রযোগিনী, বজ্রযোগিনী থেকে কলকাতার পথ ছুঁয়ে হলুদমোহন এই দীর্ঘ সতেরো বছরের উদ্বাস্তু যাত্রাপথের অনেক ঘটনাই তার স্মৃতিপটে ছায়া ফেলেছে। চেতনায় ছায়া এসে পড়লে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছায়াটাকে বিশ্লেষণ করে দেখা, অতীত কথা বলে দিয়ে নিজেকে কিছুটা হালকা করাবিমলাও তাই করেছে। উপন্যাসে বর্তমানে দুই বছর হল যে ও ভুবনবাবুর

সঙ্গে মিলে ঘর করছে, একই ছাদের তলায় থাকছে — যেন দুজনের পার্টনারশিপে সংসার চালানোর মতন কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হতে পারেনি তারা। বিমলা ভুবনবাবুকে বলেছে "আমরা অদ্ভুত ভাবে স্বাধীন হয়ে গেছি।" অতীত উদ্বাস্তু জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিমি বার বার বর্তমানের স্থিতিশীলতাকে হারিয়ে/ মিশিয়ে ফেলেছে। একটু সচেতন দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখা যায় বিমলা তার অতীতকে ঝেড়ে মুছে ফেলতে চায়। আবার বর্তমান সম্মানকে টিকিয়ে রাখার জন্যও বিমলা তার উদ্বাস্তু জীবনের কথা গোপন করেছে মালতীর কাছে। বিমি হার্টের মেলায় শখ করে ঝাড়ন কিনেছে, চাকরির টাকায় কিনেছে দুখানা বেতের চেয়ার-কুশানকরতে করেছে ফিটফাট, সৌম্যকে প্রশ্ন করেছে পরিষ্কার লাগছে কিনা? বিমলা আসলে বার বারই অতীতের নোংরা, কালিমালিপ্ত জীবন থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে। ভুবনবাবুর দেওয়া বালাজোড়া বিমলার কাছে মনে হয়েছে বন্ধনের প্রতীক। হলুদমোহন ক্যাম্প ও ভুবনবাবুর ঘরের মধ্যে দিবা-রাত্রি মানসিক দ্বন্দ্বের মাঝে দেখা যায় বালা জোড়া খুলে সে ছুটে গেছে ক্যাম্পে, এমনকি দণ্ডকারণ্যে যাবার বাসে উঠেও মনের দোলাচলতায় শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দে নেমে বাড়ি ফিরে আসে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে বিমি আবার সেই বালা জোড়া ভুবনবাবুর কাছ থেকে পড়ে নেয়, খোলা বারান্দাটাকে ঘিরে দিতে বলেএ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বিমি এক বন্ধনে আবদ্ধ। একজন স্কুলমাস্টারের আদর্শ পত্নী হতে গিয়ে বিমি শুধু নিজের অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানে যোগ্য সম্মান পেতে চেয়েছে। বিমলার তীব্র ব্যঞ্জনাময় প্রশ্নে উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে।

সুতারা দত্তকে হয়তো পাঠকের মনে আছে। অ্যাসিট্যান্ট প্রফেসর। দিল্লির হস্তিনাপুর যাজ্ঞসেনী কলেজের ছাত্রীদের ইতিহাস পড়ান। যেটুকু পড়ানোর কথা বলে দেওয়া হয় সেইটুকুই। অথচ জানেন বেশ, যা পড়ান তা ইতিহাসের খন্ডাংশ মাত্র। লিখিত ইতিহাসেরও ভগ্নাংশ। যতটুকু শাসকের অনুমোদন পায়। আর যে ইতিহাস লেখা থাকে না? সবাই জানে, তবুও যে ইতিহাসের দিকে চোখ বুজে থাকাই দস্তুর? আসলে সুতারা নিজেই ধারণ করে ছিলেন সেই ইতিহাস। সেই সময় তিনি ম্যাট্রিক দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। বাবা গ্রামের স্কুলের শিক্ষক। দাদারা সব কলকাতায়। সেই সময়ে শুরু হয় দাঙ্গা। নোয়াখালির গ্রামের সচ্ছল গার্হস্থ্য, বাবা-মা-দিদির স্নেহ সব এক রাতে 'নেই' হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় নতুন গল্প। লিখলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। উপন্যাসের নাম 'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা'। প্রথম বেরোল প্রবাসীতে, সময় ১৯৬৭। জ্যোতির্ময়ী দেবী 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-তে সুতারাকে এক হৃদয়বান মুসলমান পরিবারে রাখলেন। আর সেই মুসলমান বাড়িতে থাকার অপরাধে মেয়েটা সারা জীবন কেমন হিন্দু আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে অবজ্ঞা আর ঘৃণা পেল তাই দেখালেন। যতদিন না পর্যন্ত ব্যতিক্রমী হিন্দু যুবক সুতারাকে বিয়ে করল। হয়তো তিনি সমাজের সঠিক ছবিটাই দেখিয়েছেন। হতভাগিনীর নিজের কোনো অপরাধ ছাড়াও সারাটা





জীবন বঞ্চনা, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। মুসলমান সমাজে হৃদয়বান পরিবার নেই এমনটাও নয়। অবশ্যই আছে। তারা সন্তানের মতো সুতারাকে রাখতেও পারেন। তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সেই সংখ্যাটা নেহাতই হাতে গোনা ছিল। তা না হলে দেশভাগের পরেও যেমন এপার বাংলায় মুসলমানরা থেকে গেছেন, সংখ্যার প্রতিপত্তিতে বেড়েছেন, তেমনটাই ওপার বাংলায় হিন্দুদের হতো। হয়েছে তো উল্টো। হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে ওপার বাংলায়। তার কারণ অবলা, অসহায় সুতারাদের সঙ্গে যে ব্যবহার হয়েছে তা দেখলে বনের পশুরাও লজ্জা পাবে। আচ্ছা এই অত্যাচার, মানবতার চরম অপমানের কথা কি সাহিত্যে উঠে আসা উচিত ছিল না? অনেকের যুক্তি ছিল সমাজের জঘন্য নিষ্ঠুরতা সাহিত্যে প্রকাশ করতে নেই। সেটুকু বাদ দিয়ে শুধু ভালো কথা বললেই সাহিত্য কালজয়ী হয়. রসোত্তীর্ণ হয়। সুতারার চাপা কান্না সেকালের নারীর যন্ত্রণাকে যেন ছুঁয়ে যায়। যুগ যুগ ধরে নারী এভাবেই লাঞ্ছিত। কেবল এই ঐতিহাসিক কালগত বিস্তার নয়, ভৌগোলিক স্থানগত বিস্তারের মধ্যেও তিনি স্পর্শ করে যান কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার-পাঞ্জাবের রক্তাক্ত পটভূমিকে। শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের নানা প্রান্তে দাঙ্গা হয়েছে, বিদ্বেষের শিকার হয়েছে নারী, সব প্রান্তেরই যন্ত্রণাদগ্ধ নারীর আর্তিকে তিনি যেন ছুঁয়ে যান। তাই, সুতারা দিল্লিতে পড়ায়, নানা প্রদেশের ছাত্রীকে আপন করে নেয়, কৌশল্যাবতীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে মনের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারে। পাঞ্জাবীর মাতাজীকে দেখে ও তার বিষাদময় জীবনকথা শুনে তার মনে হয় — "এ সবই তার জানা কথা। শুধু দেশের আর মানুষের নামগুলিই আলাদা।" জ্যোতির্ময়ী দেবীর এ উপন্যাসের সমাপ্তি বিষাদময়তায় নয়, স্বপ্ন সৃজনের মধ্য দিয়ে। সাকিনার দেওয়া প্রস্তাব সুতারা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, কিন্তু যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে প্রমোদ-সুতারা মিলিত হবেএ ইঙ্গিত উপন্যাসের উপসংহারে মেলে। সুতরাং, দেশভাগ-দাঙ্গার ঐতিহাসিক কাহিনি পরাজয়ের হতে পারে, সুতারার মতো একটি লাঞ্ছিত নারীর কাহিনি সম্ভাবনার কাহিনি। প্রমোদের পক্ষে মনের অন্ধকার দূর করা তথা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হবে-এ প্রত্যাশাও তো ঔপন্যাসিক জাগিয়ে তোলেন।

সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর মানুষজনদের সর্বদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, কিন্তু নারীদের আরও একটি জিনিসের জন্য সর্বদা লড়াই করতে হয়, তা হল নিজের সম্মান, নিজের ইজ্জত, আব্রু। উদ্বাস্তু জীবন সংগ্রামের মাঝে বড় হয়ে ওঠা দুই ভিন্ন ধরনের চরিত্র- বিমলা ও সুতারা, যারা এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে বড় হয়ে উঠেছে। দুজনের লড়াই ভিন্ন হলেও জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার প্রশ্নে কোথাও তারা যেন উত্তীর্ণ হয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**


১। গঙ্গোপাধ্যায় অভিজিৎ: 'দেশভাগের পটভূমি; বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে', স্কলার পাবলিকেশন, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত ৭৮৮ ৭১১

২। গোস্বামী অর্জুন, সম্পা: 'দেশভাগের প্রেক্ষাপটে গান্ধী-জিন্না পত্রালাপ', কলকাতা, চয়নিকা, ২০০৫।

৩। গোস্বামী অর্জুন, সম্পা: 'হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক: স্বপ্নপূরণ না স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস', কলকাতা, রক্তকরবী, ২০০৪

৪। দে অমলেন্দু: 'দ্বিজাতিতত্ত্ব ও মুসলিম লিগ', রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২

৫। দে অমলেন্দু: 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২

৬। দে অমলেন্দু: 'স্বাধীন বঙ্গভূমি পরিকল্পনা: প্রয়াস ও পরিণতি', রত্না প্রকাশন, কলকাতা ১৯৭৫

৭। সিকদার অশ্রুকুমার: 'ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ২০০৫

৮। উদয়চাঁদ দাস ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত): 'দেশভাগ ও বাংলা উপন্যাস' সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন বেঙ্গলি, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫

৯। মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসাদ: 'শিকড়ের সন্ধানে', ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ২০০২

১০। চট্টোপাধ্যায় গৌতম (সম্পাদিত): 'ছিন্নমূল ছেলেবেলা: বাংলায় দেশভাগজনিত পরিস্থিতির একটি দিক', ইতিহাস অনুসন্ধান, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০

১১। চট্টোপাধ্যায় গৌতম (সম্পাদিত): 'বার্ধক্যে বাস্তুচ্যুতি: বাংলায় দেশভাগজনিত দুর্ভোগের একটি দিক', ইতিহাস অনুসন্ধান, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১।

১২। দাস সুরঞ্জন: 'কমিউনাল রায়টসইন বেঙ্গল', ১৯০৫-১৯৪৭, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ১৯৯১

১৩। সিকদার সুনন্দা: 'দয়াময়ীর কথা', গাঙচিল, ২০০৮

১৪। সেনগুপ্ত অমলেন্দু: 'উত্তাল চল্লিশ: অসমাপ্ত বিপ্লব', পাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১

১৫। ঘোষ সেমন্তী: 'দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা', গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১

১৬। জ্যোতির্ময়ী দেবী: 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' রচনা সংকলন, ১ম খন্ড, দেশ প্রকাশনী, ১৯৯১

১৭। বাগচী যশোধরা: পরিযায়ী নারী মানবাধিকার, সেতু প্রকাশনী কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৪

১৮। মজুমদার অমিয়ভূষণঃ 'নির্বাস', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩




## দুই পৃথিবীর সংঘাত: প্রসঙ্গ রমানাথ রায়ের 'ক্ষত ও অন্যান্য গল্প'

**মানসী কুইরী**

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে রমানাথ রায় এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। ১৯৬৬ সালের শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব রমানাথ রায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে, বলা ভালো, যে সময় বাস্তবকে কেন্দ্র করে লেখালেখির শুরু ঠিক এরকম সময়েই রমানাথ রায় সাহিত্যে নিয়ে এলেন এক নতুন রীতি। বলা যায়, কথাসাহিত্যে এক নতুন বাঁক নিয়ে এলেন তিনি। তাঁর মতে, প্রচলিত রীতি বহু ব্যবহারে জীর্ণ। সেই জীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে চাইলেন তিনি। রমানাথ রায় সম্যক ভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে বাস্তববাদী রীতি আজকের মানুষের কথা স্পষ্ট রূপে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম তার অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ করার পক্ষপাতি তিনি নন। তাই সাহিত্যে তিনি নিয়ে এলেন এক নতুন রীতি যা দারুণ ভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি গল্পের মধ্যে অন্যের সমস্যার কথা না বলে নিজের মনের মধ্যে জমে ওঠা সমস্যাকে গল্পের রূপ দিতে চাইলেন। তিনি নিজেই নিজের অনন্ত বিষয় হয়ে উঠলেন।

রমানাথ রায় প্রতিদিনই স্বপ্ন দেখেন নিজের তৈরি একটা পৃথিবীর। যে পৃথিবীতে তিনি একা থাকতে পারবেন আর সমস্ত কিছুর আড়ালে। কিন্তু তা যে কোনোভাবেই সম্ভব নয় তিনিও সেটা জানেন। আর তাই বাইরের পৃথিবীর থেকে তিনি দূরে থাকতে পারেন না। কারণ এঁদের সঙ্গেই তাঁকে প্রতিটি দিন কাটাতে হয়। তাই বাইরের পৃথিবীকে অস্বীকার করা অসম্ভব। এভাবেই লেখকের মনের মধ্যে চলতে থাকে দুই পৃথিবীর সংঘাত। এবং সেকথা লেখক রমানাথ রায় তাঁর 'আমার কথা' প্রতিবেদনে জানিয়েছেন—

"বুঝতে পারি আমার নিজস্ব পৃথিবীর সঙ্গে এই পৃথিবীর কোন সাদৃশ্য নেই। ফলে দুই পৃথিবীর মধ্যে সংঘাত বাড়তে থাকে। আমার দুঃখ বাড়তে থাকে। আমি কি করবো তা বুঝে উঠতে পারি না। হয়ত এই কারণেই 'ক্ষত ও অন্যান্য গল্পে ছড়িয়ে আছে এক বিষন্নতা, যার হাত থেকে আজো নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি।"(১)

রমানাথ রায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ —'ক্ষত ও অন্যান্য গল্প'(১৯৬৪)। তাঁর গল্পের সংখ্যা প্রায় আড়াইশোর মতো। ছয়টি খন্ডে তাঁর গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়াও তিনি লিখেছেন ১৪/১৫ টি'র মতো উপন্যাস। "বাণীশিল্প" থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন। আমার আলোচ্য বিষয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থকে নিয়ে। প্রথম গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পের নাম হল 'দুর্বোধ্য'। গল্পের কথক গল্পকার নিজেই। ব্যক্তিবাচক সর্বনাম 'আমি' দিয়ে গল্পের শুরু, বলা যায় "আমি"-ই গল্পের আধার। গল্পের শুরুতেই গল্পের কথক জানান যে আজকাল প্রায়ই তাঁর মাথা ধরে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, বেশি কথা বললে মাথা দপ দপ করে। তাঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবে তিনি এরকম অনুভব করেন। এই অসুখ যখন

তিনি প্রথম টের পান তখন তাঁর বয়স পনেরো / ষোলো। দিনের পর দিন তাঁর এ অসুখ বেড়েই চলেছে। ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলো পর্যন্ত তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না, অথচ ওই একই লেখা আর পাঁচজন পরিস্কার দেখতে পাচ্ছেন। তিনি অনুমান করলেন হয়তো তাঁর চোখ খারাপ। কিন্তু না তা নয়। গল্পটিতে তিনি বললেন— “কিন্তু কেন যে আর পাঁচ জনের মতো পরিষ্কারভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তার কারণ বুঝতে পারতাম না।”[২]

তাহলে তিনি কী সত্যিই চোখে কম দেখছিলেন? নাকি এভাবে চোখ ঝাপসা হয়ে আসার মূলে লুকিয়ে আছে অন্য কোনও তির্যক ইঙ্গিত? আর পাঁচজন যা দেখছেন তা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না নাকি দেখতে চাইছেন না? আসলে আর পাঁচজনের দেখা হল সাধারণ মানুষের দেখা। সেই দেখার সঙ্গে লেখকের দেখার দৃষ্টির বিস্তর একটা পার্থক্য রয়েছে। একজন লেখক হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে তাঁর এই দেখার দৃষ্টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেখার এই তারতম্যে লেখকের ভাবনার খানিকটা মিল খুজেঁ পাই তাঁর ‘আমার কথা’ অংশে যখন তিনি বলেন—

“ধনতান্ত্রিক সভ্যতা আজ মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছে, তার চিরকালের আদর্শ ও বিশ্বাসকে কেড়ে নিয়ে তার সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে, তাকে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, তাকে একটা মুনাফা সৃষ্টির যন্ত্রে পরিণত করেছে অথচ সে সব দুঃখের কথা ভেবে কাউকে একবারও দীর্ঘঃশ্বাস ফেলতে দেখতাম না।”[৩]

স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে দেশ-কাল-সমাজের দিকে চোখ বুলিয়ে কথাকার রমানাথ রায় এই ভেবে শিহরিত হয়েছেন, তৎপরবর্তীকালীন প্রজন্মের সঙ্কট কতখানি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। এবং তা ভেবে সত্যিই তিনি স্থির থাকতে পারছেন না। সেইসব মানুষের অনাগত সমস্যাগুলো লেখনীর মধ্যে তুলে ধরতে চাইলেন তিনি। তাঁদের সমস্যার কথা ভেবে তিনি কষ্ট পেতে থাকেন। গল্পে কথকের ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলো দেখতে না পাওয়ার মধ্য দিয়ে আসলে লেখকের অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় পাই আমরা। তাহলে কী বাস্তব পৃথিবীর মানুষদের দুঃখ কষ্টই লেখকের দৃষ্টি ঝাপসা করে তুলেছে? শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে কথকের এই দেখতে না পাওয়া শুধু একটা ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, তাঁর এই না দেখতে পাওয়া ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বচরাচরজুড়ে। গল্পের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সেই সূত্র যখন তিনি বলেন—

“কিন্তু সকলে যখন রাত্রে এক আকাশ তারা দেখত, দেখত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, কিংবা বর্ষার মেঘ, শরতের আকাশ তখন আমার কাছে সব ধোঁয়াটে লাগত।”[৪]

পাঠক একটু সচেতন ভাবে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন যা কিছু সুন্দর, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত সেগুলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। লেখক হয়তো এখানে বোঝাতে চাইছেন স্বস্তির নিঃ





শ্বাস ফেলার মতো সময় আসেনি এখনও। তাছাড়া আবার এভাবে গুম মেরে বসে থাকার সময়ও যে এখন নয়, লেখক তাও বোঝাতে চাইছেন।

গল্পের কথক শেষ পর্যন্ত এই চোখ খারাপের কথা বাড়িতে জানান এবং ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তার দেখানোর পর তিনি জানতে পারেন, তাঁর চোখ অসম্ভব রকমের খারাপ। দিন দুই পর তিনি একটা চশমা ব্যবহার করতে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে যেন সমস্ত কিছু পাল্টে গেল। কি আশ্চর্য! সমস্ত কিছুই তিনি যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কে এই ডাক্তার যিনি তার চোখ খুলে দিলেন? চোখ না খুললে কেউ একজন এরকম লিখতে পারেন—

“গোটা পৃথিবী হঠাৎ এত বেশি নগ্ন হয়ে উঠেছিল যে সহ্য করতে পারিনি, চশমা চোখে দিয়েই খুলে রাখতে হয়েছিল।”[৫]

একটু আগেই আমরা দেখলাম যে সৌন্দর্যের ঝলসানি তাঁর চোখে পড়ছে না। কিন্তু কোন সৌন্দর্য? নাকি বাস্তবতা চোখে পড়ছে না? যা তিনি এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তা আসলে চরম বাস্তব। যে রূপে পৃথিবীকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, সেই রূপে পৃথিবীকে দেখতে পাবেন না বলেই হয়তো তিনি দেখতে চাইছিলেন না। সৌন্দর্য তিনি দেখতে পান নি নয়, তিনি আসলে দেখতে চান নি পৃথিবীর কুৎসিত এ নগ্ন রূপ। পৃথিবীর এই কদর্য রূপ তাঁকে ব্যাথিত করেছে এবং তাই তিনি বেশিক্ষণ এই চশমা পরে থাকতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গেই চশমা খুলে ফেলেছেন। লেখক ঠিকই বলেছেন— “মাঝে মাঝে ভেবেছিলাম, চশমাটা না নিলেই ভাল হত”।[৬]

কথক বৃদ্ধ হয়ে গেলে পর সেই পুরোনো চশমা দিয়ে তিনি আবার অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু সময়ের পার্থক্যে এখন একটু পার্থক্য লক্ষ করা গেল। তখন অর্থাৎ পনেরো ষোলো বছর বয়সে তিনি দূরের জিনিস দেখতে পেতেন না আর এখন তিনি কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। আবার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চশমার পরিবর্তন করলেন। এবং অদ্ভুতভাবে কথক জানালেন—

“সবকিছুই অর্থাৎ বাইরের এই চোখটা দিয়ে যা সম্ভব,অর্থাৎ সকলেই যা দেখে, তা এখন আমিও দেখতে পাই কোনো অসুবিধে হয় না।”[৭]

এখানে যেন লেখকের অন্তর্জগত ও বহির্জগতের লড়াই চলছে প্রতিনিয়ত। বৃদ্ধ বয়সে এসে তিনি আর পাঁচজনের মতো গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন অর্থাৎ বহির্জগতের চোখ দিয়ে তিনি সমস্ত কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ভেতরে ভেতরে (অন্তর্দৃষ্টিতে) লেখক যেন সমস্ত কিছুই ঝাপসা দেখতে পাচ্ছেন। এরপর আমরা দেখতে পাই কিছুদিন পর কথকের আবার চোখের সমস্যা দেখা দেয়। সেই নতুন চশমা দিয়ে তিনি আবার ঝাপসা দেখতে পাচ্ছেন। আবার ডাক্তার দেখান তিনি, সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন আবার সেই পুরনো চশমা দিয়ে তিনি সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। ডাক্তারও

অবাক হয়ে যান। তিনি কিছু ওষুধ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ওষুধ খেয়েও তাঁর চোখ সারলো না। তিনি এখনও এটা আবিষ্কার করতে পারলেন না যে—

“এখনো পৃথিবীতে এমন কোন দৃশ্য রয়ে গেছে যার জন্যে আজো আমার মাথা ধরে, চোখ দিয়ে জল পড়ে।”(৮)

শেষপর্যন্ত নিজের কাছেই নিজের অসুখ যেন দুর্বোধ্য ও রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগলো।

লেখকের ছোটবেলার কথা যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে দেখতে পাই, একটা মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে রমানাথ রায়ের বাল্যকাল কেটেছে। ১৯৪০ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও স্বাধীনতাকামী আকাঙ্ক্ষায় বুঁদ হয়ে থাকা এক অগ্নিময় দশকে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। এবং এ সমস্ত কিছুই লেখককে স্থির থাকতে দেয় নি। এই অস্থিরতা, এই বিষন্নতা ছড়িয়ে রয়েছে রমানাথ রায়ের গল্পের পরতে পরতে।

অতঃপর এই গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্পে আসা যাক। গল্পের নাম ‘ঝাড়লণ্ঠনের তেকোণা কাচ’। এই গল্পটিও ব্যক্তিবাচক ‘আমি’ সর্বনামে বর্ণিত হয়েছে। কথক জানিয়েছেন ছেলেবেলায় একটা ঝাড়লণ্ঠনের তেকোণা কাচ সবসময় তাঁর সঙ্গে রাখতেন। এই কাচ তাঁর কাছে মহামূল্যবান বস্তু ছিল। তিনি সময় পেলেই এই কাচ নিয়ে একটি নির্জন জায়গায় চলে যেতেন। নির্জনে এই কাচটি চোখে ধরলেই এক রঙিন পৃথিবী চোখের সম্মুখে জ্বলজ্বল করে উঠতো। সমস্ত কিছুই তিনি নতুনরূপে দেখতে পেতেন। তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে অদ্ভুত এক প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ত—

“এই রঙিন পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে আমি আমার সমস্ত দুঃখ ভুলে থাকতে পারতাম।”(৯)

কিন্তু একদিন তাঁর কাছ থেকে কাচটি হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেন কিন্তু সেই কাচ তিনি আর খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ একদিন সেই কাচ তাঁর বড় ছেলের হাতে দেখতে পেলেন। তিনি ছেলের কাছ থেকে ওই কাচটি হাতানোর বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করলেন। কিন্তু কোনোভাবেই তিনি সেই কাচ তাঁর ছেলের কাছ থেকে নিতে পারলেন না। বুকচাপা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় দিন কাটতে লাগলো কথকের। ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। অন্যদিকে কথকের সেই ছেলেও যুবক হয়ে ওঠে। কথক একদিন সেই কাচ তাঁর ছেলের কাছে চেয়ে বসেন। তাঁর ছেলে জানায় সেই তেকোণা কাচটি হারিয়ে গেছে। হারানোর কথা শুনে কথক উদভ্রান্তের মতো সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। খুঁজতে খুঁজতে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যেন কাচটি ছাড়া তাঁর আর চলবেই না। অবশেষে ব্যর্থমনোরথে তিনি মেনে নিলেন বাস্তবকে। জীবনের শেষ সময়ে অর্থাৎ কথক যখন বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করেন ঠিক সেই সময় তিনি তাঁর নাতির হাতে সেই তেকোণা কাচটি আবার দেখতে পেলেন। দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন,



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

আমার নাতি আমায় খুব ভালোবাসে, অতএব খুব সহজেই কাচটি ফিরে পাবেন নিজের হাতে। কিন্তু এবারও তিনি ব্যর্থ হলেন। বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু সেই কাচ তাঁর নাতি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। কাচটি দাদুকে আর ফেরত দিল না। এবং এভাবেই গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

এই গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক বার্ধক্যে এসে লেখকেরই সেই ছেলেবেলাকে যেন জীবন্ত রূপে ফুটে উঠতে দেখেন। কাচের মধ্য দিয়ে দেখা কথকের সেই রঙিন পৃথিবী যেন লেখকের কাঙ্ক্ষিত সেই পৃথিবী। যে পৃথিবীর ছবি আজীবন তিনি এঁকেছেন অথবা চোখের সম্মুখে দেখতে চেয়েছেন। এই পৃথিবীর স্বপ্ন হয়তো আমরাও ছোটবেলায় দেখে থাকি। এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার একটা প্রয়াস প্রত্যেকেই আমরাও যেন করে থাকি। লেখকও হয়তো তাই করেছেন। কিন্তু ছোটবেলায় সেই সামর্থ্য কারোরই থাকে না। আমরা ক্রমশ গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। টেরও পাই না এমন এক বন্ধনে আমরা জড়িয়ে পড়ি। এবং তা থেকে মুক্তি নেই আমাদের। যখন আমরা সেখান থেকে বেরোতে চাই তখন দেখি জীবনের অন্তিমলগ্নে পৌঁছে গেছি। আর তখন আমাদের কিছুই করার থাকে না। আমরা বেরিয়ে পড়ি আমাদের হারানো সময়ের সন্ধানে। কিন্তু হায়! আমরা ব্যর্থ হয়ে যাই। লেখক প্রথমে সেই স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু তিনি তা পূরণ করতে পারেন নি। তিনি দেখলেন তাঁর ছেলে, নাতি সেই একই কাজ করছে একসময় তিনি যা করেছেন। এই নিয়মের কোনো পরিবর্তন নেই।

এই গল্প গ্রন্থের তৃতীয় গল্প ‘ক্ষত’। এই গল্পেও কথক ‘আমি’। কথক হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলেন তাঁর বুড়ো আঙুলে একটা ঘা হয়েছে। হয়তো আর কিছুদিন পর দেখলে সেই ঘায়ে ছোট ছোট পোকার সৃষ্টি হয়ে যেতে পারতো। অল্প অল্প ব্যথা অনুভব করতেন বটে কিন্তু ঘায়ের এই মারাত্মক পরিণতির টের পর্যন্ত পাননি। তিনি বলেছেন—

“এই প্রথম মনে হল, বহুদিন পর মনে হল, আমি একজন মানুষ, দুর্ভাগ্যক্রমে যে আজও জীবিত রয়ে গেছে, অনুভূতি নামক বস্তুটি যার এখনও অসাড় হয়ে যায়নি। আর এইভেবে আনন্দিত হলাম। কেননা বেচেঁ আছি, এই বোধ দিনের পর দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হতে বসেছিল।”(১০)

কথক এতটাই বিষন্নতার মধ্যে বেচেঁ আছেন যে, তাঁর গায়ে এত বড়ো একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে অথচ তিনি তা টের পাননি। এ কি করে সম্ভব! যা পাঠককেও দারুণভাবে ভাবিত করে তোলে। তাহলে কী তিনি কোনো গভীর ভাবনার মধ্যে ডুবে রয়েছেন? কথক আরও জানিয়েছেন, তাঁর মধ্যে কোনো সাধ, স্বপ্ন, কিংবা আহ্লাদ কিছুই ছিল না এভাবেই তিনি দিনযাপন করছিলেন। অর্থাৎ মানুষ যখন জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না তখনই হয়তো এরকম একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ছোটবেলায় তাঁর বাবা মা কে হারিয়েছেন বলে কথক তাঁর বিধবা পিসিমার সঙ্গে থাকতেন। নতুন

একটা সকালের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিরাত্রে ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু প্রতিদিন সেই একঘেঁয়েমির জীবন। তাই তিনি এসব থেকে মুক্তি পেতে অথবা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য অন্ধকারে বসে থাকতেন একা। অন্ধকার একা একা নিজের ভাবনায় বসে থাকতে তাঁর ভালো লাগতো। তিনি ঘা এর এরকম পরিণতির কথা ভেবে ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তারের কাছে গিয়ে তিনি দেখেন অনেক রোগী —

“যেন এদের এ পৃথিবীতে রোজ ডাক্তারের কাছে আসা ছাড়া কিছু করার নেই।”[১১]

কথককে ঘায়ের ওপর লাগানোর জন্য একটা মলম দেন ডাক্তার। কথক ভাবেন হয়তো এরপর তিনি সেরে উঠবেন কিন্তু না ঘা সারেনি বরং তাঁর ঘা যেন আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। তিনি আবার অন্য ডাক্তার দেখালেন কিন্তু কোনো ফল হল না। আবারও অন্য ডাক্তার দেখালেন তাতেও কোনো ফল হল না। ডাক্তার শেষপর্যন্ত জানান —

‘এ ঘা খুব কম লোকেরই হয়। হলে বড় একটা সারে না’[১২]

তবে ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাবেন। এবং এভাবেই গল্পের সমাপ্তি।

এখানে এই গল্পের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি লেখকের এই ক্ষত যেন শারীরিক ক্ষত নয়। এ ক্ষত মনের। যে ক্ষত আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। এই ক্ষত একটু একটু করে বড় হতে থাকে আমরা মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকি। অথচ আমরা টের পাই না। লেখক এই ক্ষত সারানোর অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী তিনি পেরেছেন এই ক্ষত সারিয়ে তুলতে? নাকি এই ক্ষত নিয়েই জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি পৌঁছে গেছেন? এ ক্ষত সেরে ওঠার ক্ষত নয়। মানুষমাত্রই আশাবাদী, লেখকও তাই ভেবেছেন এই ক্ষত হয়তো একদিন সেরে যাবে। কিন্তু সেই ক্ষত শেষপর্যন্ত ক্ষতই থেকে যাচ্ছে।

এরপর আসা যাক চতুর্থ তথা শেষ গল্প ‘দিনের শেষে’। “দিনের শেষে” গল্পটি শুরু হয়েছে একজন প্রেমিক তাঁর প্রেমিকার জন্য একমুঠো অন্ন আর একটুখানি আশ্রয় খুঁজে দেওয়াকে কেন্দ্র করে। “দিনের শেষে” নামকরণের মধ্য দিয়ে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে আসে। “দিনের শেষে” অর্থাৎ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে লেখকের মতো আমরাও হিসেব করি কী পেলাম আর কী-ই বা অধরা রয়ে গেল। লেখক সত্যিই কী সেসব পেয়েছেন যা সারাজীবন ধরে তিনি চেয়েছেন? গল্পটিতে এমন একটা প্রশ্ন পাঠকের জন্য তুলে রেখেছেন তিনিন আসলে “দিনের শেষে” গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা একজন মানুষের সারা জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে পারি। নির্ণয় করতে পারি তার পাওয়া না পাওয়ার হিসেব। জীবনের উপান্তে এসে একজন মানুষ বুঝতে পারেন ঠিক কতটা ক্ষোভ, যন্ত্রণা অথবা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তিনি, সেইসঙ্গে তিনি এও বুঝতে পারেন তাঁর প্রিয়জনের



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

জন্য তাঁকে কতটা পরিমাণ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। গল্পটিতে দেখি প্রেমিক তাঁর প্রিয়জনের জন্য একটা ভালো ঘর জোগাড় করতে পারেননি। তাঁদেরকে থাকতে হয়েছে একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে যেখানে কোনোদিন সূর্যের আলো পর্যন্ত পৌঁছে না। তিনি তাঁর প্রিয়জনকে কথা দিয়েছেন এই বাড়িতে বেশিদিন তাঁকে রাখবেন না। সুন্দর জীবনযাপনের জন্য তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে হয়েছে একটা আশ্রয় অথবা এক মুঠো অন্ন। এই অন্নের খোঁজে সারাজীবন যেন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। এ কি কেবলই প্রেমিকের ছবি? নাকি এ প্রতিটি মানব জীবনের চলমান ইতিহাস? তাই খাবার নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে তিনি যখন আয়নার সামনে দাঁড়ান তখন নিজের চুল গুলোকে সাদা দেখতে পান। অর্থাৎ এভাবেই সময় ফুরিয়ে আসে। চুলের রঙ এভাবে সাদা হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি বয়সজনিত কারণে মানুষের চুল সাদা হয়ে যায়। একই সঙ্গে এই বিষয়টিও আমাদের কাছে স্পষ্ট যে এক জীবনে মানুষ অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করেন। কত পাওয়া না পাওয়ার হর্ষ বিষাদ বয়ে বেড়ান প্রতিটি মানুষ। দিনের শেষে অর্থাৎ সারাজীবনের শেষে এসে একজন মানুষ বুঝতে পারেন যে সারাজীবন তিনি কেবল ছুটেই বেড়িয়েছেন। কেবল একটু অন্ন সংস্থান উপার্জনের জন্যই সারাজীবন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যা কিছুই আমরা বাস্তব জীবনে দেখি সেই দেখার আনন্দকে আমরা কী আবার ফিরে পাব? নাকি ফিরে পাওয়া যায় কখনো? গল্পকার সেই আনন্দ আবার ফিরে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু দিনের শেষে তিনি কী তা ফিরে পাচ্ছেন? না পাচ্ছেন না, কেউই ফিরে পান না। শুধুই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ছাড়া আর কিছুই থাকে না মানুষের। তাই হারানো সময়ের সন্ধানে বুঁদ হয়ে থাকে প্রতিটি মানব হৃদয়।

‘ক্ষত ও অন্যান্য গল্প’ গল্পগ্রন্থের চারটি গল্পেরই কথক গল্পকার নিজেই। অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ‘আমি’র ব্যবহার গল্পগুলিকে লেখকের নিজের করে তুলেছে। এই আমির মধ্য দিয়ে আমরা গল্পকার রমানাথ রায়কে অনায়াসেই খুঁজে পাই। ‘দুর্বোধ্য’, ‘ঝাড়লণ্ঠনের তেকোণা কাচ’, ‘ক্ষত’, ও ‘দিনের শেষে’ গল্পগুলির নামকরণের মধ্য দিয়েও যেন এক রহস্যময়তার আভাস লুকিয়ে আছে। রমানাথ রায় যে পরিবেশে বড় হয়েছেন সেই পরিবেশের ছবি যেন এই গল্পের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। লেখক ‘আমার কথা’ অংশে বলেছেন—

“আমাকে লিখতেই হবে। কিন্তু কিভাবে লিখব আমার এই গোপন দুঃখের কথা, যাতে আমার দুঃখ আর আমার থাকবে না, হয়ে উঠবে সকলের, প্রতিটি মানুষের।”[১৩]

এই ‘ক্ষত ও অন্যান্য গল্প’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। গল্পগুলি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অসম্ভব রকম প্রাসঙ্গিক। লেখক যে গণ্ডি থেকে বেরোতে চেয়েছিলেন সেই গণ্ডিতেই জড়িয়ে পড়েছেন, গতানুগতিক জীবনের জালে যেভাবে সকলেই জড়িয়ে পড়েন। আমরা! আমরাও কি পেরেছি? এই ছকেবাঁধা জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে

রাখতে? পারি নি। লেখকও পারেন নি। তাই দিনের শেষে এসে সেই হারানোর দিনগুলির সন্ধান করেছেন লেখক। এই বাস্তবতা লেখককে অসুস্থ করে তুলেছে। লেখক রমানাথ রায় নিজেও এসব থেকে বেরোতে পারছেন না শেষ বয়সে এসে। যে পৃথিবী রঙিন চাদরে ঢাকা থাকবে এমন এক নিজস্ব পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। কাচের মধ্য দিয়ে তিনি সেই পৃথিবীকেই দেখতে চেয়েছেন যেখানে দিনের পর দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়, কোনো ক্লান্তি আসে না জীবনে। ক্লান্তিহীন জীবনের মুক্তি সেই তেকোণা কাচ। আমরা প্রত্যেকেই সেই কাচে চোখ রাখতে চাই।

**তথ্যসূত্র :**


১) রমানাথ রায়, ‘গল্পসমগ্র’ (প্রথম খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা—১০
২) ঐ পৃষ্ঠা—১৫
৩) ঐ পৃষ্ঠা—১০
৪) ঐ পৃষ্ঠা—১৫
৫) ঐ পৃষ্ঠা—১৬
৬) ঐ পৃষ্ঠা—১৬
৭) ঐ পৃষ্ঠা—১৭
৮) ঐ পৃষ্ঠা—১৭
৯) ঐ পৃষ্ঠা—১৮
১০) ঐ পৃষ্ঠা—২১
১১) ঐ পৃষ্ঠা—২৩
১২) ঐ পৃষ্ঠা—২৫
১৩) ঐ পৃষ্ঠা— ১০




## সুকান্তি দত্তের ‘মহেন-জো-দারোর নগ্নিকা’ : মধ্যবিত্ত যৌনজীবন-চেতনার আধুনিক ভাষ্য

**শ্রেয়া ভদ্র**

বাংলা কথাসাহিত্যকে বিনোদন-সর্বস্বতার বাইরে প্রতিষ্ঠা দিতে সাতের দশক থেকে নিরলস প্রয়াস নিয়েছিলেন একদল কথাশিল্পী। তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি নয়ের দশকের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সুকান্তি দত্ত (জন্ম- ১৯৬৫)। স্বতন্ত্র সেই বহমান ধারার পুষ্টিসাধন এবং তার বাইরে নিজস্ব নির্মাণ-স্বাতন্ত্র্যে তিনি বাংলা সাহিত্যে ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছেন। এখনও লিখে চলেছেন। তাঁর সদ্য লেখা থ্রিলার উপন্যাস ‘হননসন্ধ্যা’ (২০২৩)। তবে এই উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল “প্রকাশক বলছেন থ্রিলার উপন্যাস, সেভাবেই বিজ্ঞাপিত করবেন। আমি বলছি উপন্যাস, থ্রিলার কিনা জানি না।”[১]

তিনি সৃষ্টির লক্ষ্যে কলম ধরেছিলেন ছাত্রজীবন থেকে। তবে, লিটল ম্যাগাজিনের ছত্রছায়ায় তাঁর নিয়মিত সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত নয়ের দশকে, তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশ পায় ১৯৯১ সালে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গল্প সংকলন ‘দহনবেলার পাণ্ডুলিপি’ (১৯৯৯), “আলাদিন ও আলাদিন’ (২০০৪), ‘স্বপ্নে নদীর খোঁজ’ (২০০৭), ‘এই শহরে কান্না নেই’ (২০১১) এবং ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ (২০২০)। ‘হননসন্ধ্যা’ বাদে প্রকাশিত উপন্যাস ও নভলেটের সংখ্যা আট—‘যুধান কথা’ (২০০১), ‘বৃষ্টি অবৃষ্টি’ (২০০৫), ‘মায়া উড়ান’ (২০০৮), ‘ইমন’ (২০১৪), ‘স্মৃতি সত্তার আলোছায়া’ (২০১৪), ‘কেয়ার স্মৃতিময় সকাল’ (২০১৪), ‘দুঃ খরাতের আনন্দগাথা’ (২০১৭), ‘অংশুমানের গঙ্গা’ (২০২২)। প্রতিটিই শিল্পবোধসম্পন্ন ধীমান পাঠকের কাছে সমাদৃত। ‘অভিযান বুক ক্যাফে’র ২০২২ নভেম্বরের বেস্ট সেলার তালিকার ১-নং এ স্থান ছিল গঙ্গাদূষণ সমস্যাকেন্দ্রিক উপন্যাস ‘অংশুমানের গঙ্গা’র। নবব্যারাকপুর কোরাস থিয়েটারের পক্ষ থেকে দেবাশিস মৈত্রের নির্দেশনায় ‘আশ্চর্য হাড়ি’ নাম দিয়ে একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে তাঁর বিখ্যাত গল্প ‘আশ্চর্য হাঁড়ি ও ল্যাংড়া বিশে’, গল্পটি তাঁর ‘আলাদিন, ও আলপিন’ গল্পের মতোই জাদুবাস্তবতার উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হিসাবে পাঠকমহলে পরিচিত। আমাদের অপরিসীম অন্যায্য ক্ষুধা পরিবেশ প্রকৃতিকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পরিবেশ সচেতক এই কথাশিল্পীর লেখায় সেসব সমস্যা ফিরে ফিরে এসেছে, যার যথেষ্ট মূল্য আছে; ‘যুধান কথা’, ‘লেবুপাতার ঘ্রাণ’ (গল্প) এজাতীয় রচনাগুলিকে আলাদা মূল্য দিতে আমরা বাধ্য। তাঁর লেখা শতাধিক গল্পের মধ্যে ‘উচ্ছেদ’, ‘বিধু বিশ্বাসের খিদে’, ‘মহেন-জো-দারোর নগ্নিকা’, ‘পর্নোগ্রাফির দিনরাত’ ইত্যাদি বহু গল্পই কোনো-না-কোনোভাবে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। বিশদ আলোচনার পরিসর হতে পারে তাঁর গল্প-উপন্যাস-নভলেটগুলি।

'মহেন-জো-দারোর নগ্নিকা' গল্পটি ২০০৬ সালে 'অমৃতলোক' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। পরে শ্রেষ্ঠ গল্পেও স্থান পেয়েছে। গল্পটি একবিংশ শতকের বহুমাত্রিক মধ্যবিত্ত যৌন-জীবনচেতনার অনবদ্য রূপনির্মাণ। যে চরিত্রগুলি পাওয়া যায় তারা সকলেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও লেখক এই সম্প্রদায়টিকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত মনে করেন না। একাধিক নারী-পুরুষ, তাদের দাম্পত্য-জীবনের সংকট গল্পের নিগড়ে স্থান পেয়েছে। খোদ গল্পকথক কুশল ও তাঁর স্ত্রী অনু, তাঁর বাবা-মা, উদয় ও মুক্তি এবং গৌতমদার একাঙ্ক নাটক 'বৃষ্টির জন্যে'র নবদম্পতিমোট চারজোড়া দাম্পত্য সম্পর্ক সামনে এসেছে। কোথাও মনে হয়নি এদের নিয়ে লেখক মুখরোচক কাহিনি বা টান টান প্লট গড়ে তুলতে চেয়েছেন। পাঠকের মন জয় করার জন্যে কোনো ফাঁদ তিনি তৈরি করেননি, যে প্রবণতা পঞ্চাশ-ষাট দশকের কতিপয় লেখকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ত্রিকোণ সম্পর্কের কোনো রগরগে বিবরণ নেই। বঙ্কিম-রবীন্দ্র যুগের যৌন-রসায়নের তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ও যৌনতার নবরূপায়ন রবীন্দ্র-পরবর্তী গল্পকে যেভাবে পাল্টে দিয়েছে তাতে সেইসময় থেকে গল্পাকাররা অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। আমরা ভিখু (প্রাগৈতিহাসিক/ মানিক) বা রাধিকার (বেদেনী/ তারাশঙ্কর) মতো কালজয়ী চরিত্রও পেয়েছি। কিন্তু এজাতীয় আদিম প্রবৃত্তির মর্মোদ্ঘাটনও সুকান্তি দত্তের গল্পে মুখ্য নয়। আধুনিক জীবনভাষ্যে দাম্পত্য সম্পর্কে কিংবা যৌন-জীবনযাপনে যা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তার ব্যবচ্ছেদ ও সঠিক দিশা অন্বেষণই কথাকারের মূল লক্ষ্য।

উদয় ও মুক্তির কাহিনিতে লেখক যৌন অতৃপ্তিজনিত সমস্যাকে সামনে এনেছেন, যে সমস্যার কারণে উদয়ের মনে হয়েছে মুক্তির সঙ্গে আর থাকা যাবে না, সে বিভ্রান্ত। যৌনযাপনের মাধ্যমেই দাম্পত্যে ভালোবাসা তৈরি হয় বলে তার ধারণা। অন্যদিকে মুক্তি বিশ্বাস করে যৌন বিষয়গুলি নোংরা কাজের মধ্যে পড়ে, কাঁদা ঘাঁটাঘাঁটি ব্যাপার, এসব যত কম হয় ততোই ভালো। যৌনতাকে সে মনে করে নেহাত সন্তান ধারণের একটা উপায় মাত্র, এর বেশিকিছু নয়। উদয়ের তাতে সন্দেহ হয়েছে, মুক্তি মেডিক্যালি ফিট কিনা। গাইনোর সঙ্গে কথা বললে গাইনো ডাক্তার কাউন্সিলিং-এর কথা বলেছেন। অর্থাৎ, মুক্তি মেডিক্যালি ফিট, সমস্যা মানসিক। বোঝা যায়, এই মানসিকতার বীজ লালিত-পালিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর পিছুটান থেকে। লেখক দেখাচ্ছেন, উদয়ের মনোভাবের মধ্যেও রয়েছে সমস্যা। স্ত্রী অনু কুশলকে জানিয়েছে "উদয়দা মনে করে সেক্সসুয়াল ব্যাপারে মেয়েদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো দাম নেই, তাদের যখন খুশি যেভাবে খুশি আসলে সেক্সুয়ালিটি যত না শারীরিক তার থেকে যে অনেক বেশি মানসিক এটা বুঝতে চায় না।"[২] সামন্ত-সমাজ কিংবা পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের





কাছে নারী ভোগের বস্তু, এই ব্যাধি সমাজ বহন করে চলেছে আজও। দশ বছরের সুখী দাম্পত্য-জীবনের অধিকারী কুশলও উদয়-মুক্তির সমস্যার মধ্যস্থতা করতে গিয়ে অনুর কাছ থেকে জেনেছে কখনো কখনো সেও যৌন-তাড়নার বশবর্তী হয়ে অনুর ইচ্ছে-অনিচ্ছাকে বোঝার চেষ্টা করেনি।

স্মৃতির পথ ধরে প্রজন্মের ব্যবধানে গল্পে এসেছে কুশলের বাবার যৌন-জীবনচর্যার খণ্ড পরিচয়। এসেছে কুশলের ছোটবেলার যৌন-চেতনাকেন্দ্রিক পরিবার-কাঠামোর কয়েকটি বিষয়। আপাত দৃষ্টিতে সেগুলিকে সাধারণ ঘটনামাত্র মনে হলেও সামাজিক সংকটের প্রশ্নে তাৎপর্য রয়েছে সেগুলির মধ্যে। ছোটবেলায় রেডিওতে নাটক শোনার সময় কোনো সংলাপে বিন্দুমাত্র যৌনতার আভাস থাকলে তখনই কুশলের নাটক শোনা বন্ধ হতো বাবার নির্দেশে। নারী-সংক্রান্ত কোনো স্বাভাবিক কথা বলাও ছিল তার মায়ের কাছে দোষের। এমনকি, ছাব্বিশ-সাতাশ বছরে কুশল কারোর পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বলায় তার মা চোখমুখ কুঁচকে বলেছিলেন, 'চুপ কর, আর শুনতে চাই না'[৩]। কুশলের নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল। কিন্তু যৌনতাকে নিয়ে এই যে গোপনীয়তা, সমাজের পক্ষে সেটাই কি মঙ্গল, না যৌনতা বিষয়ে খোলামেলা হওয়াটা যুক্তিযুক্ত এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কুশল চরিত্রে দেখিয়েছেন লেখক। আসলে এই দ্বিধা বা সংশয় লেখকেরও। কুশলের ভাবনার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে সেই সংশয় "আচ্ছা এইটাই কি ভালো? নাকি খোলামেলা হওয়া ভালো? যৌনতা নিয়ে খোলামেলা হলে কি নারী-পুরুষ খুব অসংযমী হয়ে যাবে? লুকোছাপা করতে গিয়ে এক ধরনের বিকৃত যৌনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না কি?"[৪]

যৌনতাকে নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখলে বা সেটাকে নিষিদ্ধ গোপন পাপ কাজ হিসাবে দেখলে সমাজে যে ইতিবাচক কিছু ঘটে না বরং ভণ্ডামি বাড়ে সেই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কুশলের বাবার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। তিনি খবরের কাগজ ইত্যাদিতে নারী-শরীরের প্রদর্শনী নিয়ে সদা সরব। এসব দেখলে তাঁর মুখের কথা 'দেশটা উচ্ছন্ন দিল এরা'।[৫] তাঁর চোখে দশ বছরের ছেলেকে গরমের কারণে জাঙিয়া পরিয়ে রাখা অশ্লীল। বাইরে থেকে এই পুরুষটিকে দেখে যৌন-বিকৃতির কথা কল্পনাও করা যায় না। অথচ, তিনিই দরজা বন্ধ করে টিভিতে ফ্যাশন চ্যানেলে শনিবার রাতের ব্লু-ফিল্ম দেখেন। কুশলের জন্মের পর বাড়ির কাজের জন্যে সর্বক্ষণের যে মহিলাকে কাজে রাখা হয়েছিল তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন কুশলের বাবা, যা নিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কে অনেক অশান্তি হয়। যে কারণে কুশলের মা যৌবন আছে এমন কোনো মহিলাকে কাজের লোক হিসাবে রাখেননি কোনোদিন। একদিন তিনি রাগের মাথায় স্বামীকে শুনিয়েছিলেন, "না, না, ওই বয়সের কোনো কাজের মহিলা রাখব না বাড়িতে, তোমার যা চরিত্র, আহা!"[৬] দ্বিতীয়

সম্পর্কটি বিয়ের দু’বছরের মাথায় কুশলের মায়ের পিসতুতো বোন উনিশ-কুড়ি বছরের বিনুর সঙ্গে। মধ্যবিত্তসুলভ লোকলজ্জা, সমাজভয় ইত্যাদির কারণে সম্পর্ক ছেদ হলেও, কুশলের বাবা পিছিয়ে এলেও বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বিনু পাগল হয়ে যায় সারাজীবনের মতো।

মধ্যবিত্ত কীভাবে এই যৌন-সংকট থেকে মুক্ত হবে? যৌন-অবদমন, না মুক্ত যৌনতা বা যৌনমুক্তিতে? এই প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নের সমাধানসূত্র হিসাবে গৌতমদা প্রসঙ্গ, মহেঞ্জোদারোর নৃত্যরত নগ্নিকা ও অম্বুবাচির ব্রততে-যেদিন বসুন্ধরা ঋতুমতী হয় সেই দিনে তাঁকে খুশি করতে নগ্ন শবর পুরুষদের ঢাকের তালে তালে যৌন অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য অতিমাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কুশলের চেয়ে দশ বারো বছরের বড় গৌতম সু-অভিনেতা, নাট্যকার। তার ‘বৃষ্টির জন্যে’ একাঙ্কটি দু’বারের বেশি অভিনীত হতে পারেনি। কারণ, নাটকে যে দম্পতির দাম্পত্য সংকট আছে, সেখানে পুরুষটির বিরুদ্ধে নারীর মূল অভিযোগযৌন অতৃপ্তিজনিত। নারীর দিক থেকে এই অভিযোগ, তাই ফিউডাল সেন্টিমেন্টের পুরুষতান্ত্রিক দর্শকদের মধ্যে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, নাটকে একটি লোকগান ও লোকনৃত্য ছিল, যার মূল থিমবৃষ্টিদেবতার সঙ্গে সেই মেয়েদের যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা। তাদের বিশ্বাস এই মিলন বৃষ্টিহীন খরাপীড়িত জমিতে বৃষ্টি এনে দেবে, সোনার ফসল ফলবে। সেইসময় কুশলও অন্যদের মতোই অপসংস্কৃতি রুখতে এই নাটক অভিনয়ের বিরুদ্ধে ছিল। সমাজবক্ষে বয়ে চলা মানসিকতা থেকে সেও বেরিয়ে আসতে পারেনি। নারীর যৌন-স্বাধিকারের বিষয়টি তার কাছে গুরুত্ব পায়নি। মুক্ত-যৌনতা বলতে সে বুঝেছে ‘অবাধ বাছবিচারহীন যৌনতার ছাড়পত্র’[৭]। যদিও যৌবন ছাড়িয়ে সে যখন জীবন-মধ্যাহ্নে পৌঁছায় তখন গৌতমদার মতাদর্শকেই বহুলাংশে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে। ধারণা করা যায়, এই গৌতমের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যৌন-চেতনাসম্পন্ন যে সমাজের প্রত্যাশা গৌতমের, তা লেখকেরও। গৌতমের দৃষ্টিভঙ্গি“সমাজমুক্তিসমাজ বদলের রাজনীতি-আন্দোলন কি যৌনমুক্তিকে বাদ দিয়ে হয়? যে ক্ষমতা সমাজকে দমন করে সেই ক্ষমতাই যৌনতাকেও দমন করে”[৮]। সে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে ও ভিতরে যৌন সম্পর্কের স্বীকৃতিতে বিশ্বাসী। নানা কারণে যদি কেউ বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সম্পর্কে খুশি না থাকে সেক্ষেত্রে অন্য সম্পর্ক স্থাপনকে সে স্বাভাবিক ও ন্যায্য বলে বিবেচনা করেছে। সেটাকে ব্যাভিচার ভাবেনি। এমনকি বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্ককে পাপ বলে মনে করেনি। কমবয়সীদের সঠিক যৌনশিক্ষা দান, যাতে বিষয়টিকে তারা নিষিদ্ধ পাপ কাজ না ভেবে আনন্দময় স্বাভাবিক ব্যাপার ভাবে তার পক্ষে সওয়াল করেছে। এককথায় সে চেয়েছে স্বাভাবিক যৌনতার





অবদমনের বিরুদ্ধে মুক্ত মানবিক যৌনতা, যা মধ্যবিত্তকে যৌনবিকার থেকে মুক্ত করে সুস্থ সহজ জীবন দিতে পারে।

এই সহজ যৌন-জীবনচেতনাই সাংকেতিত হয়েছে অম্বুবাচি ব্রততে শবর পুরুষদের যৌন অঙ্গভঙ্গি করে নাচ ও মহেঞ্জোদারোর নগ্নিকা মূর্তির মধ্যে দিয়ে। সিন্ধু-সভ্যতার মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত এই নগ্ন ব্রোঞ্জ মূর্তি সাড়ে চার হাজার বছরের পুরানো বলে অনুমান করা হয়। বাস্তববাদী শিল্প-শৈলীর নিদর্শন হিসাবে নিগ্র চেহারার এই মূর্তিটি সমগ্র বিশ্বে বিখ্যাত। ৪.১ ইঞ্চি উচ্চ শীর্ণ দণ্ডায়মান যুবতী মূর্তিটির গলায় রয়েছে হার, দু’হাত ভরা চুড়ি, ডান হাতের মুষ্ঠি ডান উরুর উপর, বাম পায়ের ভঙ্গিমায় ভাঁজ এবং বাম হাতের মুষ্ঠি হাঁটুর একটু উপরে রাখা। স্তনযুগল এতোই ছোট, আছে কি নেই বোঝাই যায় না। তার ভঙ্গিমায় রয়েছে আত্মবিশ্বাস। অনুমান করা যায় নারী-পুরুষের যৌন-জীবন চেতনা তখন সহজ ছিল। শরীর নিয়ে, যৌনতা নিয়ে কোনো ছুঁতমার্গ ছিল না। যৌনতা নিষিদ্ধ কোনো পাপকর্ম বলে বিবেচিত হতো না। প্রাচীনকালে শবর পুরুষেরা পুরুষাঙ্গে গাছের পাতা জড়িয়ে, সর্বাঙ্গে কাদা মেখে, ঢাকের তালে তালে নানা যৌন অঙ্গভঙ্গি করে মা বসুন্ধরাকে সন্তুষ্ট করতো। অর্থাৎ, সেখানেও যৌনতা ছিল জীবনযাপনের স্বাভাবিক অঙ্গ।

প্রথমত, লেখক মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিক যৌন-জীবনযাপনের সংকট-পরিচয়ে হাজার হাজার বছরের পুরানো যৌন জীবনচেতনাকে টেনে আনলেন। দ্বিতীয়ত, গল্পের নামকরণে ব্যঞ্জনায় গৃহীত হল ‘মহেন-জো-দারোর নগ্নিকা’। ফলত, আমাদের উপলব্ধিতে খুব স্পষ্টভাবেই ধরা দেয়, তিনি মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিক যৌনজীবন-সংকটের সমাধান হিসাবে যৌন-অবদমনের পরিবর্তে মুক্ত-যৌনতার পক্ষে সওয়াল করছেন। কিন্তু আদৌ কি সমস্ত পিছুটান ছেড়ে সেই সহজ জীবনের বাসিন্দা হয়ে ওঠা যায় সহজেই! সমর্থন সত্ত্বেও কি সেই জীবনকে গ্রহণ করা যায় দ্বিধাহীনভাবে? হয়তো যায় না। মধ্যবিত্তের সে ক্ষমতা নেই। নেই বলেই গল্পের নায়ক কুশল ইচ্ছে থাকলেও শবরদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে পারে না। স্বপ্ন-কল্পনায় সিন্ধুতীরের নগ্নিকাকে পাশে পেয়ে জড়িয়ে ধরতে চেয়েও পারে না, হাত দিয়ে ছুঁতে চেষ্টা করেও পারে না। আজন্ম লালিত সংস্কার বা কুসংস্কার শুকনো শীতল হাত হয়ে তাকে চেপে ধরে রাখে। সম্ভবত, শুকনো শীতল হাত সেই অর্থেই গল্পে সাংকেতিত। গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে সাংকেতিক ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়েই, যা আধুনিক কালের ছোটগল্পের সার্থক শিল্পগুণ।

বিশ শতকের আট-নয় দশকের লেখকদের চিন্তা-চেতনায় যৌনতার বিষয়টি ভিন্ন মাত্রা বহন করেছে। এই পর্বের ভিন্ন ঘরানার লেখকরা যৌনতাকে কেবলমাত্র প্রবৃত্তি-সর্বস্ব

হিসাবে না দেখে জীবন-যাপনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সুকান্তি দত্ত তাঁদেরই একজন এবং তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'মহেন-জো-দারোর নগ্নিকা'। উক্ত পর্বের ভিন্ন ঘরানার গল্প হিসাবে সুকান্তি দত্তের এই গল্প একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে গল্পটি লেখকের স্বকীয়তাকেও প্রতিষ্ঠা করে। এর বিশেষ শৈলী, আখ্যানের বয়ান, মন মজানো প্লটকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রচলিত ছক ভেঙে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া, প্রতীকী আভাস সৃষ্টি, সর্বোপরি আধুনিক কালোপযোগী চিন্তা-চেতনার স্বাতন্ত্র্য গল্পটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করায়।

**সূত্রনির্দেশ :**


১। ফেসবুক পেজ, সুকান্তি দত্ত, ২৯-১২-২০২২

২। সুকান্তি দত্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১১৮

৩। তদেব, পৃ. ১১১

৪। তদেব, পৃ. ১১১

৫। তদেব, পৃ. ১১২

৬। তদেব, পৃ. ১১১

৭। তদেব, পৃ. ১১৩

৮। তদেব, পৃ. ১১৫।




## অভিজিৎ সেনের নির্বাচিত ছোটগল্প : উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষের অনালোকিত যাপনকথা

**কৌশিক পান্ডে**

প্রবল কাল সচেতন কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন—সত্তরের এর দশকের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মানসিক নিবীর্যতা ও অন্ধকার অবক্ষয়ের চূড়ান্ত চেহারা দেখলাম। দেশ ও মানুষ যেখানে প্রত্যহ রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় দীর্ঘ-বিদীর্ণ হচ্ছিল, সেখানে বাংলা সাহিত্য এত বড় যন্ত্রণার শিক্ষাকে অস্বীকার করে পরীর দেশের অলীক, স্বপ্নাশ্রয়ী বাগানে মিথ্যে ফুল ফোটাবার আত্মঘাতী খেলায় ব্যস্ত হয়ে গেল। কেন এমন হলো তার বিশ্লেষণ করল না কেউ সামগ্রিকভাবে, খুব কম লেখাই সময়ের দলিল হয়ে রইল।[১]

এই সত্তরের দশকের দীর্ণ - বিদীর্ণ মানুষের কথা, দেশের কথা তাদের গল্প উপন্যাসে তথা সাহিত্যে যারা নিবিড় বিস্তীর্ণ পরিসরে "সময়ের দলিল " হিসেবে লিখেছেন তাদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর আশীর্বাদ ধন্য শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন হলেন অন্যতম।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু চর্চিত একজন শক্তিশালী মরমীয়া কথাসাহিত্যিক হলেন সেই অভিজিৎ সেন। ১৯৭০-৭১ সাল থেকে বর্তমান কাল অবধি তিনি লিখে চলেছেন অনেক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক ইত্যাদি। তাঁর লেখার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বালুরঘাট, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং এর সংলগ্ন স্থানের কৃষিজীবী, আদিবাসী, নমঃ শূদ্র থেকে শুরু করে হাড়ী (ব্যবচ্ছেদ), লোহার সমাজ (দেবাংশী),-এর মানুষের কথা। বঙ্কিমপুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৯২) উপন্যাস "রহু চন্ডালের হার" এ আছে বাজিকর দের কথা। লেখক অভিজিৎ সেনের বেশির ভাগ উপন্যাসেও উঠে এসেছে প্রান্তিক মানুষের ঘরের কথা। মেঘের নদী উপন্যাসটির রসদ মালদহ জেলার মাটি থেকে সংগৃহীত। এখানে চরিত্ররা বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া এবং এই উপন্যাসে মূলত নমঃশূদ্র শ্রেণীর আত্ম প্রতিষ্ঠার লড়াই, কৃষি জমি, প্রশাসন,স্থান, নদী, নারীর অসহায়ত্ব সবই এমনভাবে স্থান পেয়েছে যে তা হয়ে উঠেছে তৎকালীন (১৯৯৬-২০০১এর) মালদার সংশ্লিষ্ট স্থানের অনালোকিত লিখিত ইতিহাস। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো "ছায়ার পাখি", "হলুদ রঙের সূর্য", "নিম্নগতির নদী", "রাজ পাট ধর্ম পাট" ইত্যাদি।

তাঁর লেখার একটা বড় অংশের ছোটগল্পেই উত্তরবঙ্গের গ্রাম -গ্রামীণ সম্প্রদায়-সংস্কার -নদী -স্থান-শহর- রাজনীতির ঘরের কথা দারুন ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। আমরা এখানকার

প্রকৃতি ঐতিহ্য ধর্ম সংস্কার থেকে শুরু করে সব কিছুর সঙ্গেই খুব সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠব এই গল্পগুলিতে। মূলত নব্বই-আশির দশকে লেখা গল্পগুলিতে সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি, আবেগ, আশা-নিরাশার দৃশ্যপট চিত্রিত। আটের দশকের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাইলফলক অপারেশন বর্গা নিয়ে লেখা তার বেশ কিছু গল্পে "বর্গক্ষেত্র", "দেবাংশী", "আইন শৃঙ্খলা", "অসাধারণ" "ঈশানী মেঘ", "মৌরসি পাট্টা","ব্যবচ্ছেদ" ইত্যাদিতে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের রূপরেখা ফুটে উঠেছে। আর অনেকটা জুড়ে আছে উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক অনালকিত জমির কাছে থাকা একদল গ্রাম্য মানুষের কথা। এর মাঝে ফুটে ওঠে সেখানের কৃষক, মজুর, মিস্ত্রি, সাধারণ মধ্যবিত্ত গ্রাম্য ভূস্বামী সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষের ঘরের চালচিত্র।

এই নিবন্ধে আমরা লেখকের কিছু নির্বাচিত গল্প নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই গল্পগুলি প্রায় সবই ১৯৭১ থেকে ২০০৪ এই সময়কালের মধ্যের। তাঁর রচিত গল্পগুলির গ্রামীণ আর্থসামাজিক পটভূমি আর লোকায়ত সংস্কার কৃষি জমি,জমি আশ্রয়ী মানুষজন ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে। কৃষক, ব্যাংক কর্মী, রাজনৈতিক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব, পানের বরজের মালিক, বিড়ি শ্রমিকসহ নানা পেশার মানুষ এসে হাজির হয়েছে তাঁর গল্পের আখ্যানে পঞ্চাশটি গল্পসংকলনের ভূমিকায় লেখক বলেছেন —

বিচিত্র বিশ্বাস, বিচিত্র আচার- বিচারে আবদ্ধ নানা অপরিচিত পেশার মানুষ। এইসব গল্পের অধিকাংশ বয়ান সাহিত্যের অঙ্গনে ইতিপূর্বে অপরিচিত সেই সব মানুষকে নিয়ে।[২]

আর বলা বাহুল্য এই সবের বেশির ভাগই উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক তার বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্র সংলগ্ন মানুষের দিন যাপনের কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা "আমাদের ছোট নদী" খ্যাত "নাগর" এর "পার্শবর্তী একটি গ্রাম" আখিরা "যার নাম উক্ত নাগর নদীর একটি দহের (নদীর বাঁকে খরাতেও গভীর জলযুক্ত থাকা অংশ) নাম অনুযায়ী। তার কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ব্যাংকের সাহায্য, রাজনীতি, উন্নয়নে বাধা ,ভাগ চাষীদের স্বত্ব, জোতদার দ্বারা ভাগচাচির শোষণ এর ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে কমিউনিস্ট সরকারের আমলেই কমিউনিস্ট দলের সদস্যদের গরিব চাষীর জমি জোতদারদের হাতে তুলে দেওয়া, নতুন ধরনের অত্যাচার, পুকুরে বিষ প্রয়োগ, ডাকাতি, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি নানা বিশ্বাসযোগ্য আখ্যান হয়ে উঠেছে অভিজিৎ সেনের "আইনশৃঙ্খলা" (১৯৮০) গল্পটি।

নাগর নদীর তীরে উত্তরবঙ্গের একখ্যাত গ্রাম "আখিরা" একটি প্রাচীন উর্বর জমির গ্রাম লেখক এর ভাষায়—মাটি খুঁড়লেই এখানে জল পাওয়া যায়, খুঁড়লে বিষ্ণু মূর্তিও পাওয়া। যায় আখিরা গ্রামে প্রচুর পুরনো ইঁট ও ভগ্ন দেউল আছে।[৩]



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

একজন প্রাজ্ঞ নিবন্ধকারের লেখনীর ছাপ স্পষ্ট এই গল্পে যা গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে বলা যায়। এহেন "আখিরা" গ্রামে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োগে এগ্রো সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা যজ্ঞ শুরু হয়েছে। স্থানীয় ব্যাংকের প্রচেষ্টায় সেমিনার ও ঋণদান করা হয়। মাঠে ভালো ধান হলে কৃষি বিভাগের কর্তারা এবং আমেরিকান সাহেব এসে রাজবংশী কৃষক টুইলা ও তার স্ত্রীর ছবি নেয় তাদের ধান উৎপাদনের সাফল্য ক্যালেন্ডার কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেওয়া হবে। সেই দম্পতি জানেনা এর বদলে ওই ক্যামেরাম্যান ভালো দাম পাবে আর তারা তাদের প্রাপ্যটুকু থেকে বঞ্চিত হবে। এর মধ্যেও সরল রাজবংশী কৃষকের বঞ্চনার দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অভিজিৎ সেন একজন ইতিহাসের ছাত্র আর ১৯৭৯ এর মাঝামাঝিতে স্বনামধন্যা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে তার পরিচয় এর পরে তার পরামর্শ মত যে গ্রাম সমীক্ষা তিনি করেছিলেন তার স্পষ্ট ছায়া এ গল্পে দেখা যায়। ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাই ধরা পড়েছে—নলকূপ বোরিং এর সময় তিন ফুট দৈর্ঘ্যের এক চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি মাটির তলা থেকে উঠেছিল।[৪]

বিশ্বায়নের যুগে এদেশের ঐতিহাসিক সম্পদের হাত বদল, তার পুরা তাত্ত্বিক নিদর্শন এর আমেরিকা যাত্রা প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে যখন আখিরা গ্রামের ওই বিষ্ণু মূর্তি এদেশ ত্যাগ করে।

সাহেবের সঙ্গে বিষ্ণু ও জিপে ওঠে।[৫]

ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি যে রাজধানী শহর থেকে অনেক দূরের এই উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে এভাবে সংরক্ষণের অভাবে অবহেলিত হচ্ছিল তার এক জীবন্ত দলিল এই লাইনটি।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ধান উৎপাদন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তবে গম ও আলু চাষে যারা ঋণ পেয়েছিল সেইসব চাষিরা ভালো লাভ পেল এদের মধ্যে আলু পটলের মিশ্র চাষ করে আসল ভেলকিটা দেখিয়েছিল টুইলা বর্মন। সে নিজের বুদ্ধিও চেষ্টায় সদর শহরের কাছাকাছি একটি অঞ্চল থেকে আলুর সঙ্গে মিশ্র চাষ হিসেবে পটল লতা বপন করাও শিখে এসে তার প্রয়োগ করে নিজের আলু চাষে। কৃষি ব্যবস্থা চিরাচরিত বাধা ধরা ছকের বাইরে গিয়ে পুরো গ্রামে ধান - গম - আলু চাষে এক বিরাট পরিবর্তন যজ্ঞ সূচিত হয়। এতে ভাগচাষী টুইলারা, ক্ষেতমজুর সিধু হাঁসদারা আর জমির মালিক বা জোতদার সতীশরা নানা রূপে আন্দোলিত হয়। নানা কারণে আন্দোলন ও পরিবর্তনের ঢেউ তাদেরকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে।

"আইনশৃঙ্খলা" গল্পটি মূলত কংগ্রেসের সরকার পরিবর্তন হয়ে বামফ্রন্ট সরকার আসার প্রথম দিকের সময়ের। পরিবর্তনের বীজ সেখান থেকে রোপিত তার। ফসল হিসেবে আসে বর্গাআইন, ক্ষেতমজুরদের স্বশক্তিকরনের নানা পদক্ষেপ, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থসাহায্য আর সবুজ বিপ্লবের ঢেউ এ আন্দোলিত এই পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তের এক অনামী প্রান্তিক গ্রামের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে সেই সময়ের গ্রামীণ কৃষি নির্ভর চালচিত্রের বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করিয়েছেন লেখক অভিজিৎ সেন। আর তার নিজ গুনে ও নিজ অভিজ্ঞতার জারকে অনবদ্য আখ্যান হিসেবে পূর্ণরূপে আমাদের সাহিত্য তৃষ্ণার নিবৃত্তি করেছে।

গল্পটি মূল স্রোতে প্রবাহিত হতে শুরু করে গল্পে উল্লিখিত নিম্নলিখিত লাইনটির পরপরই—টুইলার আলু পটলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিস্ফোরণ ঘটালো জোরদার এবং বড় চাষীদের মাথায়। তারা প্রায় সবাই পরিকল্পনা করল আগামী হেমন্তে অন্তত দুই একর করে আলু লাগাবে প্রত্যেকে।[৬]

এই জোতদার দের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র সতীশ টুইলা বর্মনকে যখন জানায় যে ইবার ঠিক করনো পলির জমিটা নিজ-হালে করমো।

তখন টুইলা ও মহেন্দ্র প্রতিবাদ করে, আইনের কথা স্মরণ করায়। বংশপরম্পরায় টুইলারা আধিয়ার। তাই জমির উপর আইন মোতাবেক তার অধিকার। এই সময়ে চাষীদের নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার চেতনা যে জেগে উঠছিল তা এখানে স্পষ্ট।

এরপরই সদ্য কমিউনিস্টর দলে আশা সতীশ যায় পোড় খাওয়া কমিউনিস্ট যোগেন রায়ের কাছে যোগেনের মতো স্বার্থপর দুর্নীতি পরায়ণ কমিউনিস্ট কিছু নেতা জোতদার ও আধিয়ার এর মধ্যে মিউচুয়াল করিয়ে বেশ ভালোই কামিয়ে নিচ্ছিল একথা পার্টির ওপর মহল জানলেও ভোট ধরে রাখার স্বার্থে এদের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির অসহায়তা বা নিষ্ক্রিয়তা ধরা পড়েছে এই গল্পে।

যোগেনের সঙ্গে তার পার্টির স্ট্র্যাটেজি হলো একদম না ঘটানো।[৭]

তাই বুক ফুলিয়েছে সতীশের সাথে রফা করেছে—ফাজিল কথা রাখ সতীশ, কত এক্কর খালাস করা হবে আর এক্কর কোটি প্রতি কত দিবা কও।[৮]

কিন্তু যোগেন রায়ের কথায় ডাল গলে না।

এরপর মহেন্দ্র আর টুইলার নেতৃত্বে মিউচুয়াল বন্দোবস্তের রাজি না হয়ে নিজের আইনি অধিকার বুঝে নিতে বেশ কিছু আদিয়ার সংঘটিত হয় মহেন্দ্রর ঘরে। মহেন্দ্ররা সবাই মিলে ঠিক করে, তারা আগ বাড়িয়ে দাঙ্গা করবে না কিন্তু দখল উচ্ছেদ করতে চাইলে তারা একজোট হয়ে বাধা দিবে শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে আইনি অধিকার বুঝে নিতে





এই লড়াই সত্যি এই সময়ের (সত্তর আশির দশকের) বাস্তব গ্রাম্য চিত্রকেই দর্শায় একথা বলাই বাহুল্য।

একদিকে মহেন্দ্র না ছিল কোন আধিয়ার না, কোন নিজস্ব জমির মালিক। কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে প্রকৃত প্রতিবাদী চরিত্র হয়েছিল সে। এর ফল হিসাবে নেমে আসে ধনী জোতদারদের প্রতি আক্রমণ। তার পুকুরের মাছ বিষ প্রয়োগে মারা হল। অন্যান্য প্রতিবাদীরা ও নানাভাবে হেনস্থা হল। এরপর সতীশ টুইললাকে প্রস্তাব দেয়— সাত বিঘা আধ করিস টুইলা, দুই বিঘা তোকলেখাপড়ি করাই দি, বাকিটা ছাড় দে।[৯]

এ কথার উত্তরে উত্তেজিত হয়ে পুরো জমির উপর তার মালিকানা জানিয়ে বলে "জমি হামার"। তার কথায় প্রকৃত কৃষকের অন্তর ব্যথা প্রতিধ্বনিত হয়। বন্ধ্যা জমিকে তার ও তার বাবা হাঁড়িপা বর্মনের অমানুষিক পরিশ্রমে শস্য শ্যামলা করে তোলার কথা জানায় সে। আইনের কথা স্মরণ করিয়ে বলে—বারো আনা হামার, এক সিকি তুমার, আইনের ভাগ।[১০]

বহুকালের চলে আসার নিয়মের সঙ্গে নতুন আইনের সংঘাতে একটি খুব ভীষণভাবে ফুটে উঠেছে এই গল্পে। টু টুইলার বাড়িতে ডাকাতি হয়, তার গর্ভবতী স্ত্রীকে একাধিক "প্রমত্ত পশু" ধর্ষণ করে। কুশলী জ্ঞান হারায়। টুইলাকে হত্যা করা হয়। এক গরিব চাষের উপর চলে জোতদারের অকথ্য অত্যাচার। এসবের মূলেই সেই জমি।

জোতদার সতীশ আবার আইনের দারস্থ হয়ে জমি অনাবাদি ফেলে রাখার দায়ে টুইলার বিধবা স্ত্রী কুশলীর বিরুদ্ধে আধিয়ার স্বত্ব হারানোর নালিশ আনে। কিন্তু টুয়লার মৃত্যু হলেও আদালতের হিজড়া সে কুশলী টু হুইলার ছেলের জন্ম দেয় মহেন্দ্র উত্তেজনায় ফেটে পড়ে আর গল্পের ব্যাঞ্জনা ফুটে উঠে টুইলার ছদ্ম ভূমিষ্ঠ ছেলের চিৎকারে লেখকের বর্ণনায় টুইলার ছেলে উদ্দাম চিৎকার করে। সেই শব্দে বন্ধ ঘরের কাঁচের দরজা, জানালা ঝনঝন করে ওঠে।[১১]

আসলে এই চিৎকার নতুন প্রজন্মের প্রতিবাদের প্রতীক যাকে এতদিন ধরে চলে আসা অন্যায়ের ভীত নড়িয়ে দেওয়ার প্রতীক হিসাবেই এই গল্পে খুব সচেতন ভাবেই প্রতিকায়িত করেছেন লেখক অভিজিৎ সেন। আর তা বয়ে এনেছে দিন বদলের ইঙ্গিত।

"দেবাংশী" গল্পে উত্তরবঙ্গের এক গ্রামের মাটিতে অন্ধবিশ্বাস থেকে উত্তরণের এক বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী লিখেছেন লেখক। "দেবাংশী" কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো দেবতার অংশ এক মানুষ। অন্ত্যজ লোহার সমাজ তার প্রকৃত আর আদি জৈবিক বিশ্বাসে মনসা থানের ভর ওঠা সারবানকে দেবাংশী বলে স্বীকার করে নিয়েছে। গল্পকারের ভাষায় দেবাংশী সারবানের বর্ণনাত্ত মানুষটা অসাধারণ পাতা অর্থাৎ পাত্র। এক্ষেত্রে পাত্র মানে

আধার। হয়ত মিডিয়ম শব্দটা অধিক বোধ্য। তিথি - নক্ষত্র গুণে মনসা কিংবা তার থানের অন্য কোন ঐশী শক্তি ভর করে তার উপর। তখন সে যা বলে তাই সত্য হয়। তখন "হাঁ" বললে" হাঁ "ই হয় আর" না "বললে "না"।[১২]

গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জন্য সারবানের মনের গভীর ভাবনাগুলিকে এই গল্পে প্রকাশ পেতে দেখি। তার প্রতি অন্ধবিশ্বাসী মানুষগুলোর জন্য মনেপ্রাণ ভালো চায় সারবান। যদিও সে জানে বিষহরির ভর ওঠা সারবানকে  গ্রামবাসীরা "মাতাজি" বলে মানলেও আসলে নিজের চারপাশে গড়ে ওঠা ভক্তি আর বিশ্বাসের প্রসাদ  কারাগার থেকে মুক্তি চেয়েছে সে নিজেই। তাই সে বারবার দেবীকে বলে মাও মাওরে, ই দায় থিকা রেহাই দে মা ও আর পারিনা, মোক ছুট করাই দে মাও।

দেবাংশীর নির্মোক বর্জন করতে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে সারবান। এই গল্পটি প্রসঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মন্তব্যটি উদ্ধার করা যাক।

এই গল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় সংস্কার আর শ্লোক আর প্রবাদ যেন হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে দেবাংশীকে নির্মাণ করে তুলেছে। মনে হয় গল্পটি কাল নিরপেক্ষ। এই গল্প হাজার বছর আগেরও হতে পারত। হিউ এন সাং যখন এসেছিলেন পুণ্ড্রবর্ধন আর সোমপুরের বিহার নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে আশপাশের গ্রামগুলিতে উঁকি দিলে তিনি এই দৃশ্য দেখতে পেতেন। কাহ্নপা লুইপার আমলেও দেবাংশী ছিল।....সমুদ্রের ওপার থেকে সাহেবরা এলো, সাহেবরা গেল, নতুন সাহেবরা চেপে বসলো, দেবাংশীদের বিনাশ নাই। বাংলা জুড়ে কত কালের শয়তানি, জোচ্চুরি আর হারামি পোনা চলে আসছে, প্রতিবাদ হচ্ছে আবহমান কাল ধরে। এসবের এই সর্বকালীন চেহারাটি অভিজিৎ নিয়ে এসেছেন অসাধারণ শক্তির সাহায্যে। কাহিনীর শেষে দেখি থিক থিক করছে ক্রুদ্ধ ও প্রতিবাদী মানুষের ভিড়। শয়তান এসে  তাড়া খাওয়া কুত্তার মতো আশ্রয় নিয়েছে খেরা থানের গণ্ডিতে। ওই জায়গাটা তখন পর্যন্ত ফাঁকা এখনো ওটা ফাঁকাই রয়েছে। ওইটা দখল করার জন্য অভিজিৎ কোন উপদেশে দেন না। জায়গাটা কেবল দেখিয়ে দিলেন। এর বেশি ইঙ্গিত কি কোন শিল্পী দিতে পারেন?[১৩]

তবুও সেতুর মতো নিরীহ প্রজাদের উপর নেমে আসে দুর্জন শাসক দৈত্যারির অত্যাচার সে মেনে নিতে পারে না। তার প্রতি তার ভেতরের প্রতিবাদ  মনসার রোষ হয়ে আছড়ে পড়ে। ইতিমধ্যে সাপের কামড়ে  দৈত্যতারির মৃত্যু হলে,তাকে লোহারা গ্রামবাসীরা মনে করে দেবাংশীর অভিশাপ। দৈত্যতারির মৃত্যুর পর কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে আসে তার আধুনিক কেতাদুরস্ত ছেলে বিনোদ। সে দেবাংশীর প্রতাপ বলে যে আদতে কিছুই গ্রাহ্য করে না। তার কামুক নজর পড়ে যায় সেতুর যুবতী মেয়ে বারুনীর ওপর। বাপের





আমলে পাওনা জমির কোবালা ধরে সেতু বর্মনের কাছে অবিলম্বে বারোশো টাকা চাই সে। সেতুর তাচ্ছিল্যভরা প্রত্যুত্তরে জ্বলে ওঠে বিনোদ। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি একরাতে কণ্ঠিত ধর্ষিতা হয় বারুণী। লোহার গ্রামের মানুষ আসে সারবান এর কাছে বারুনির ধর্ম নাশের বিচার চাইতে। সে দেবাংশী। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে লোহার আর মেলা হয়। মনসার থানে অপেক্ষা করে এ গল্পের ক্লাইম্যাক্স।

গ্রামের সকলের সাথে এসে এবার স্বয়ং বারুণী চিৎকার করে সারবানের কাছে তার প্রতি ঘন্টা এ পাপের প্রতিকার চায়। কিন্তু এবার আর সাররবানের দেহে ভর ওঠে না। সে জানয় সে একজন সাধারণ মানুষ কোন ঐশী নয়। আর ঘটে যাওয়া পাপের প্রতিকারের সকল শক্তি রয়েছে গ্রামবাসীর হাতেই।

দেবাংশী সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের দায়বদ্ধতা, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের কথা। ধর্ষক অপরাধীরা চিহ্নিত হলে আহবান জানাই সকলকে—তুমরা যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, সোয়ামী আছেন, আপন আপন বেটির, বুনের, ইস্তিরির ইজ্জত বাঁচাবার দায় তুমাহোরের, সব্বার। তুমরা যদি সব্বাই চান ই পাপ বন্দ হউক, তবেই ই পাপ বন্দ হবে। ই দায় দেবাংশীর একার লয়।[১৪]

এবারে পাপী নিধনের ভার স্বয়ং গ্রামবাসিরা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সারবান লোহার এর আত্মিক সংকট এ গল্পে প্রথম থেকে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গ্রামের প্রতি সকল অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে ভরসা একমাত্র সে, অথচ হীরামন লোহারের ছেলে সারবান জানে যে মানুষের অকপট শ্রদ্ধা আর অন্ধবিশ্বাসই তাকে তাদের চোখে ভগবান করে রেখেছে। গল্পের আদ্যপ্রান্তে দেখা যায় সারবান চরিত্রে স্ববিরোধ ব্যক্তিজীবনের সমস্যা আর বাস্তবের সংঘাত থেকে পরিত্রাণ না পাওয়ার ব্যর্থতার পাশাপাশি অন্ধ ভক্তির মোহ ঘেরাটোপ আর অলৌকিক শক্তির প্রতি অবিচল বিশ্বাস থেকে মুক্তি না পাওয়ার যন্ত্রনা তার জীবনে এক প্রবল আত্মিক সংকট তৈরি করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সারবান একটি মুক্তি রূপী আলোর সন্ধান পেয়েছে। সে কারণেই গল্পের শেষে সারবার নয় বরং অন্ধ বিশ্বাসের জায়গায় মানুষই বিচারকের আসনে বসেছে। একক মনুষ্য প্রকৃতির থেকে অধিকতর কাম্য সংঘবদ্ধ জনচেতনা যা  গল্পের শেষে প্রবল শক্তি রূপে প্রকাশ পেয়েছে। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তার "দেবী" গল্পে ব্যক্তির যে ট্র্যাজিক পরিণতি দেখান তা থেকে দেবাংশী গল্পের সারবান লোহার চরিত্রটি অনেকাংশে আলাদা হয়ে যায়, তার ব্যাক্তিক উত্তরনের মধ্যে দিয়ে। আর এখানেই অভিজিৎ সেনের অভিনবত্ব।

মালিহার গ্রামের এক প্রাচীন গোষ্ঠী হল বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক ঋষিদাসদের গোষ্ঠী। মালিহার গ্রামটি প্রত্যন্ত হলেও তাতে আধুনিক উন্নয়ের স্পর্শ লেগেছে গ্রামেরই এক

দাপুটে রাজনৈতিক ব্যাক্তির প্রভাবে। কথক সেই গ্রামেরই ব্যাংকের শাখার ম্যানেজার। তিনি সংগীতপ্রেমী। ভীম হাট খোলার দোকানে বসে খোল, মাদল, ঢোল, ঢাকইত্যাদি নানা ধরনের যন্ত্র বানায়। রিজিওনাল ম্যানেজার সুরঞ্জন সেন পরিশ্রমী। দরিদ্র ভীম গোষ্ঠীর উন্নতি কল্পে গল্পের কথক একটি প্রকল্প তৈরি করলে তিনি বলেন—অজা যুদ্ধে ঋষির শ্রাদ্ধে বহ্বারম্বে লঘুক্রিয়া?[১৫]

অতএব তিনি ওই প্রকল্পের সঙ্গে হাউজ ডেয়ারি প্রকল্প যুক্ত করলেন। কিন্তু ভীম এই প্রকল্পের ব্যাপারে বলে উঠলো—গাই পোষা আমাদের কাজ নয়, স্যার। ও কাজ আমরা করতে পারি না। ও টাকা ঋষিরা নষ্ট করে ফেলবে। আমি এতে সায় দিতে পারি শায়।[১৬]

সবশেষের ছয়জন ঋষি দুটো স্কিমেরই টাকা নিল আর চারজন নিল শুধু চামড়ার কাজের জন্য। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হাউজডিয়ারে প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো আর চামড়ার প্রকল্প একটি বিশেষ বৈষ্ণব গোষ্ঠীর তৈরি সস্তা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে লোকসানের কবলে পড়ল। ভীম ঋষি ভবিষ্যৎবাণীই সফল হল—যাদের যা কাজ নয় তারা সেই কাজ পারে না।

রামকেলিতে ঢোল মৃদঙ্গ বেচতে গিয়ে ভীম ঋষিরা যে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিল তা তাদের কাছে ছিল একেবারে নতুন বিষয়। গল্পের ভাষায় বিষয়টা উঠে এসেছে এভাবে—ভীম একটি বৈষ্ণব গোষ্ঠীর নাম করল যারা বেশ বিখ্যাত তাদের সাধুরা কোথা থেকে খোল নিয়ে এসে সস্তায় বিক্রি করছে মেলায়। যে দামে বিক্রি করছে, সে দামে ভীম মাল বিক্রি করলে ডাহা লোকসান হবে। এ ভারি অন্যায়—। দাদা পরদাদা তার দাদার আমল থেকে ভীমেরা রামকেলিতে খোল মৃদঙ্গ বেচছে, এরকম কাণ্ড কোনদিন হয়নি।[১৭]

এরপরে ভীম বলে—সাধুরা কি ঋষিদের মতো চামড়া কেটে খোল বানাতে শুরু করল নাকি? এ কাজ তো তাদের নয়।[১৮]

বংশ পরম্পরায় নির্দিষ্ট জীবীকা নির্বাহের ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা বারবারে উঠে আসতে দেখা যায় এই গল্পে। এসবের মধ্যে দিয়েই এই গল্পে আমরা আমাদের মধ্যবিত্তের পরজীবী অস্তিত্বের নিস্ফলত্ব প্রমাণিত হতে দেখি। তাই গল্পের কথক তথা ম্যানেজার চরিত্রটিকে আমরা দেখি শহরে এসে মালিহার গ্রামের কথা ভুলে যেতে। গল্পের মধ্যে ভীম বারবার বলেছে এ কাজ আমাদের নয় ও কাজ ওই বৈষ্ণব সাধুদের নয় ইত্যাদি। তাই লেখকের গভীর প্রশ্ন পাঠকের কাছে—আমাদের উন্নয়নের মডেল টা কি এইরকমই হওয়া উচিত ছিল? এক রকম গোষ্ঠী বৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি ? হাজার হাজার বছর ধরে উৎপাদনের যে গতিটা এ সমাজ বয়ে এনেছে, উপনিবেশিক শাসনে তা ভেঙে পশ্চিমে মডেল ধরেছি আমরা। তাতে কারিগর, শিল্পী, পন্ডিত, বিশেষজ্ঞ তৈরি হয় শিক্ষায়তনে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

তাই কি এই ব্যর্থতা? তাই কি শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে আমরা এমন নিঃস্ব? আমাদের নিজস্ব মডেলের বিবর্তিত রূপের মধ্যেই কি আমাদের মুক্তি?[১৯]

আসলে এই গল্প ভারতীয় গৌরবময় রীতি নীতি, আমাদের নিজস্ব শ্রম বিভজন মূলক সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পশ্চিমী উৎকর্ষতাকে নির্বিচারে গ্রহণের যৌক্তিকতার বিষয়ে যে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তা লেখক অভিজিৎ সেনের গভীর সমাজবোধ ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট বার্তাবাহক বললে অত্যুক্তি হবে না। আর এর প্রভাবে মালদার ঐতিহ্য পূর্ন রমকেলি মেলাতে যে ঋষি গোষ্ঠীর লোকদের চামড়ার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যুগের পর যুগ রুটিরুজির সংস্থানে বিকিকিনিতে হাজির হয়ে আসত তাদের বিপন্ন ক্ষুন্নিবৃত্তির বাস্তব সমস্যা তুলে ধরেছেন অভিজিৎ সেন। আর তা এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর একটা বাস্তব যাপন কথাকেই উজাগর করেছে।

ছিন্নমূল মানুষের আত্মিক যন্ত্রণাকে অভিজিৎ সেন দারুণভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর নানা গল্প-উপন্যাসে এই দেশভাগের, ভিটা হারানোর যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। তাঁর "সীমান্ত", "হিমঘর", "কাক", "শেয়াল", "মেঘের নদী" সহ অনেক লেখাতেই অনুরণিত হয়েছে একদল আশ্রয়হীন অথচ এককালীন সব থাকা মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের যন্ত্রণার কাহিনী। তবে শুধুমাত্র যন্ত্রনা নয় সেখান থেকে নতুন করে বেঁচে ওঠার এক অদম্য লড়াইয়ের বাস্তব ইতিহাস আমরা দেখতে পাই এই লেখাগুলিতে। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর "মেঘের নদী" উপন্যাসটির বিষয়ে বলতে গিয়ে অভিজিৎ সেন বলেছেন—সেখানে দু একজন মানুষের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল, যারা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা একটি কমিউনিটির।.... পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্ররা অত্যন্ত powerful জাতি। তারা চাষাবাদ অনেক ভালো করেন, সেটা পূর্ববঙ্গে থাকতেই আমরা জানতাম। আর এখানে যখন তারা রিফিউজি হয়ে এসেছে তারা নিজেদের হাতের, পরিশ্রমের ভরসায়। তারা যেখানে গেছে নিজেদের লোকজনকে ডেকে নিয়ে এসেছে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২০]

লেখক এর মনোভূমির এই অভিব্যক্তি যে গল্পগুলির মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি সেগুলির মধ্যে "শেয়াল" গল্পটি একটা আলাদা মাত্রা বহন করে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি গুলি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে—.... শেয়াল আরো খানিকটা এগিয়ে এলো অর্থাৎ খবরদার! এ জায়গা আমার, খবরদার !সহদেব এবার বেশ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, না ভাই, এ জমি আমার। সরকার আমাকে বন্দোবস্ত দিয়েছে। বলে পা ঘুরে মাটির উপর সজোরে কোদালের একটা কোপ বসায় সে। যেন দাবি প্রতিষ্ঠা করল সে এইভাবে।[২১]

মানুষ এবং পশুর মধ্যে আশ্রয় স্থান দখলের জন্য শুরু হয় এক অনিবার্য মরণ বাঁচন

লড়াই। এ যেন নিজ ভূমে নিজের বাসস্থান হারানো অভিজিতের অন্তর্বেদমার মূর্ত রূপ ।মানুষ আর যূথবদ্ধ পশুর বাসভূমি দখলের এই লড়াইকে যে অকৃত্রিম হৃদয়স্পর্শী আঙ্গিকে লেখক তুলে ধরেছেন তার তুলনা একেবারেই বিরল।

বাসস্থানের জন্য লড়াইয়ে মানুষ এবং পশুর মধ্যে যেকোনো অন্তর নেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লেখকের বর্ণনায় এভাবে—একটু আগে শেয়াল কে সে ভাই বলে সম্বোধন করেছিল এখন মুহূর্তে জিঘাংসা তাকেও অধিকার করল।[২২]

বা "সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শেয়াল, এ ভুঁই আমার।"

শরণার্থীরা শুধু একটা পরিবার নয় পুরো একটা পাড়া বা একটা গ্রাম নিরাপত্তার সন্ধানে চলে আসছিলেন এবং সীমান্ত অতিক্রম করার পর খোলা আকাশের নিচে হলেও একসঙ্গে থাকার চেষ্টা করছিলেন। এই চেষ্টার অর্থ ছিল তারা তাদের অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিলেন না। অজানা জায়গায় চারপাশে কিছু পরিচিত মুখ দেখতে পেলেও তারা কল্পনা করতে পারতেন যে পুরনো অভ্যস্ত জীবন থেকে তারা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন নি। ("হস্তান্তর"১ম খন্ড শংকর ঘোষ)

এই গল্পের সহদেব বিশ্বাস ও চেয়েছিলেন যুথবদ্ধ জীবন কাটাতে তার সাথে আসা ছিন্নমূল তার সমাজের একদল মানুষকে নিয়ে। এজন্য "গোষ্ঠীর বহু মানুষ তার উপর ভরসা করে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছে।" কিন্তু গল্পে সহদেবের মধ্যে দিয়ে মানবিক দিকটিও ফুটে উঠেছে। সহদেব পাঁচ ছয়টা জানোয়ারকে আহত নিহত করে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল ঠিকই আবাসভূমি ছেড়ে জানোয়ারেরা পিছুও হতে গিয়েছিল কিন্তু শেয়াল গুলোর মধ্যে অনুভব করেছিল।তার অতীতের বাস্তহারা হওয়ার যন্ত্রণাকে

লেখকের বর্ণনায়—

শেয়ালগুলো পালাতে থাকলেও বারবার পিছন ফিরে দেখছিল, নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে এদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে ফের এগিয়ে গেল তারা। খাড়ি পার হয়ে ওপারে উঠে ফের পিছন দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা।.... কোথায় যেন নিজেদের সঙ্গে ওই পশুগুলোর একটা সাদৃশ্য খুঁজে পায় সে। তার বুকের মধ্যে একটা বেদনা হু হু করে উঠল।অনধিকার দখলদারী মনে করতে লাগলো সে নিজেকে। তার মনে হতে লাগলো এই শিয়ালগুলো আরো একটু সাহসী হলে খতম করে ফেলতে পারত তাকে আজ। ফিরে আয়রে শেগাল! খতম কর আমাকে। সে বিড়বিড় করতে লাগল।[২৩]

কিন্তু এই যন্ত্রণা এই সংবেদনশীলতা আমাদের বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নতুন ভাবে ভাবতে বাধ্য করে। স্বজন হারানো, শিকড় উপড়ানো, আশ্রয়হীন, এক ধরনের outsider– লক্ষ লক্ষ সহদেব, এই যন্ত্রণা, এই কষ্টকে মহাদেবের মতোই কণ্ঠে ধারণ





করে নীলকণ্ঠ হয়ে আমাদের সমাজে আজও বাঁচছে। এই সহদেবের মত অনেক মানুষকে একসময় নিজের বাসস্থান ছেড়ে এই পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে, কলকাতার নানা উদ্বাস্তু কলোনি থেকে শুরু করে, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সেদিন এভাবেই জায়গা করে নিতে হয়েছিল। অভিজিৎ সেন এই গল্পে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উদ্বাস্তুদের জ্বলন্ত সমস্যা যেভাবে তুলে ধরেছেন তা এক কথায় অনবদ্য, এ কথা সহজেই বলা যায়।

চেতা ও বাওনা ঘরে শুয়ে থাকে মুখ লুকিয়ে, অক্ষমতার লজ্জা ও আফোস নিয়ে।এক কঠিন মর্যাদাহানি, যা চাষী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। এ যেন বাপের সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করছে দস্যুরা। অথচ নিষ্ফল আক্রোশে হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছুই করা যাচ্ছে না, আর সেই অসহায় কন্যা অভিশাপ দিচ্ছে বাপ ভাইকে।[২৪]

এভাবে আর কজন চাষীকে আর তার জমিকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে পেরেছে? "ধানপোকা", "শেয়াল" সবেতেই মানুষ, পশু আর জমি এক হয়ে গেছে। অভিজিৎ সেনই পেরেছেন দেবাংশীর উত্তরণ ঘটাতে। যে গ্রামের মানুষকে একজোট করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন। আইনশৃঙ্খলায় মহেন্দ্র কে দিয়ে একজোট হয়ে শ্রেণীশত্রু জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এর পথ দেখিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর মতো স্পষ্ট প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ হয়তো তিনি জ্বালাননি কিন্তু অভিজিতে জীবনের যে আবহ নির্মাণ, বিভিন্ন গ্রাম নিয়ে বিস্তার লিখলেও উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক উপেক্ষিত মানুষদেরকে নিয়ে অভিজিতের যে বিমিশ্রতা তা যেন মহাশ্বেতায় তেমন ভবে ধরা পড়ে না। ধারাবাহিক পাঠে পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না যে অভিজিৎ সেন বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্যের কাছে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ আর কথাসাহিত্যের সার্থক উত্তর সাধক। তাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য সমকালীন সহসাহিত্যিকদের মধ্যেও স্পষ্ট। নলিনি বেরা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র এঁদের সামর্থ্যের পাশে তা যথেষ্টই আলাদা। সবাইকে নিয়েই তো সমাজ। নিজে গুনে কেউ নগণ্য নন। সবাই আমাদের চেতনা- উপলব্ধিতে পুষ্টি দেবার জন্য প্রয়োজনীয়। ধান্দাবাজির আবর্জনা সড়িয়ে চলতে হয়। অভিজিৎ তা করেছেন। তাই তাঁর আমাদের প্রত্যাশার শেষ নেই।

**তথ্যসূত্র :**

১. "উপন্যাস ভাবনা", মহাশ্বেতা দেবী, এবং মুসারেরা, জানুয়ারি, ১৯৯৮
২. ভূমিকা, অভিজিৎ সেন,পঞ্চাশটি গল্প,দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩. আইনশৃঙ্খলা, ঐ, পৃ. ৫৮
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
১২. দেবাংশী, অভিজিৎ সেন,পঞ্চাশটি গল্প,দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১১৪.
১৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ, কোরক শারদীয় পৃ. ৬৩
১৪. দেবাংশী, দেবাংশী, ১৯৯০ , পৃ. ২৬
১৫. ঋষির শ্রাদ্ধ, অভিজিৎ সেন, পঞ্চাশটি গল্প, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১৮২
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫
২০. সঞ্জয় কুমার দাস কে দেওয়া অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকার, ০৫/০১/২০১৯ মনভুমি, আভিজিত সেন বিশেষ সংখ্যা, ষষ্ঠ সঙ্খ্যা, আগস্ট, ২০১৯
২১. অভিজিৎ সেন, শেয়াল, প্রতিলিপি, ১৯৮১
২২. ঐ
২৩. ঐ
২৪. অভিজিৎ সেন, বিষ, দেবাংশী, ভূর্জপত্র, ১৯৯০, পৃ. ১০৮



## নলিনী বেরার গল্পে মানবজীবন: 'তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন'

**উজ্জ্বল প্রামাণিক**

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।"[১]
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতীতকে পুরানো খাতার বাতিলের তালিকায় যতই রাখার চেষ্টা করি না কেনো, সেখানেই আমাদের ঐতিহ্যের শিকড় পোঁতা। সমাজ-সাহিত্যে তাকে ভুলে যাওয়া মানেই আত্মবিস্মৃত হওয়া। একসময় মনে করা হত সাহিত্য কতিপয় ভদ্রলোকের যাপিত-জীবন ও অভিজ্ঞতার ফসল। যদিও তারাশঙ্করের মতো কেউ কেউ অনার্য আদিবাসী, কাহারা, বেদেদের নিয়ে সাহিত্য মনোভূমি নির্মাণ করেছেন। আসলে, অনার্যরাই তো ভারতের আদিম অতীত। পরবর্তী সময়ে সতীনাথও সেই পথে হেঁটেছেন। তবু, তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির কাহিনিকে সেসময় বাঙালি পাঠক সাদরে গ্রহণ করেননি। মুখে যতই সাম্যের কথা বলা হোক না কেন এই অস্পৃশ্যতার গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। অপেক্ষা করতে হল আরও বেশ কিছুদিন। 'রহু চণ্ডালের হাড়', মহিষকুড়ার উপকথা', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর হাত ধরে নতুন ভাবে শুরু হল পথহাঁটা। ততদিনে ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিকদের 'সাবলর্টান' নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তত্ত্বকথা দিয়ে তো আর জীবনের বিচার হয় না আর বাইরে থেকে দেখাও সম্পূর্ণ দেখা হয় না। যারা অতীত, অনাদি অতীত যুগান্তরের ঢালে- সেই অনার্যদের মূল সাহিত্যের বিষয়কেন্দ্রে জায়গা দিতে অনেকটা লড়াইয়ের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। সাতের দশকে একদল মাটিঘেঁষা মানুষের কথা শোনাতে চাইলেন। দীঘল শাল-আঁটারি-চরচু-চিহড়ের-শিরিষের বনে যারা কামধেনু চড়ায়, আড়বাঁশি, ধামসা মাদলের বোল তোলে, লেখক নলিনী বেরা তাদেরই একজন। তাঁর লেখায় আমরা পেলাম ভাষাহীন মৌনমুখর নীরব কণ্ঠস্বর।

১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই অধুনা ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী বাছুরখোঁয়াড় গ্রামে গল্পকার নলিনী বেরার জন্ম। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের কাছাকাছি জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামটির এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারের সন্তান তিনি। লোধা- সাঁওতাল -ভুঁইয়া-ভূমিজ-কামাহার-কুমাররা তাঁর একান্ত আপনজন। সুবর্ণরেখা তীরবর্তী জল- জঙ্গল -মাটি গায়ে মেখে তাঁর বড় হওয়া। নদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নিবিড়তা,"ছলাৎ ছলাৎ শব্দের কাছে/ বাধা পড়ে আছি আজীবন/ হে নদী হে আমার প্রেম"।[২]

এ নদী পুণ্যতোয়া সুবর্ণরেখা। ঐতিহ্যবাহী হিমালয়ের কোনও তুষারশৃঙ্গের আশীর্বাদ

বহন করে না সে। প্রত্যন্ত ছোটনাগপুর মালভূমির আঁকেবাঁকে যার জন্ম। মাত্র চারটি রাজ্য- বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষা গা বেয়ে যার স্রোতধারা। তার চলমান প্রবাহস্রোতের দুপারে কত মানুষজন, কত জনপদ, ফুল-ফল-পাখপাখালি-জন্তু জানোয়ার। নদীর বুকে হীরা, জহরত, স্বর্ণরেণু হয়তো নেই কিন্তু তার দুপাশে যে মানুষজন, তাদের বিচিত্র সংস্কৃতি তা সত্যিকারের সোনার জলে আঁকা। সুবর্ণরেখা আসলে বহুসংস্কৃতির সুবর্ণরেণুর ধারায় পুষ্ট। হাফ ওড়িয়া, হাফ বাংলার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা বিচিত্রভূমির কথা বলা হয়েছে এখানে। জঙ্গলমহলের এই মানুষজন অপার দুঃখ, যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেও বাঁচিয়ে রেখেছে জীবনের বৈচিত্র্যকে। নলিনীর গল্প এক অর্থে তাদেরই নীরব বাণী।

অক্ষরজ্ঞানহীন এই মানুষগুলির নৈতিকতা ও সুকুমারবৃত্তি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে লেখকের "শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব" গল্পটি। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষের এক বিচিত্ররূপী মানুষ শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত গরিব হলেও আত্মসম্মানবোধ প্রবল। বাবা মা মারা যাবার পর একদিকে তার নিম্নবিত্তের ভীষণ জ্বালা, চরম দরিদ্রতা অপর দিকে ভাইকে মানুষ করার স্বপ্ন। ভাইয়ের পড়াশুনার খরচ চালাতে তার জমি জিরিতের অনেকটাই বিক্রি করতে হয়, শেষ সম্বল প্রিয় বলদ জোড়াটাও চলে যায় কাকার বেইমানিতে। সেবার বর্ষায় তাঁর প্রিয় বলদ মহেশটাও রোগে মারা গেল। সারা বর্ষাটা চাষাবাদ ছেড়ে তার মন খারাপে দিন কাটল। তখনও ছোট ভাই নলিন বেকার, দাদার জন্য পঁচিশ টাকার বলদ কিনে দেওয়ার সামর্থটুকু নেই। এরপর নলিন পড়াশুনা করে ভালো চাকরি পায়, একটা ভালো বাড়ি বানায় কিন্তু দরজা জানালা বসাতে পারেনি। বীজতলাতে কলমকাঠির চারা বেড়েই চলেছে- একহাত থেকে দুহাত, প্রান্তিক চাষী শ্রীকান্তের মনে হয়েছে,

'...একটা গরু নেই তো হয়েছে কি? জোয়াল কাঁধে নিজেই টানব। আমি কি মহেশ্বর হতে পারি না? কিন্তু আমি তো একা মানুষ —হালের বোঁটা চেপে ধরবে কে?[৩]'

সারা বছর ধরে জঙ্গলমহলের মানুষগুলি যাত্রাগান নিয়ে মেতে থাকে। আসলে এইসব কিছুর মধ্যে দিয়ে তারা ভুলে থাকতে চায় অর্থনৈতিক কষ্টকে, চরম দ্রারিদ্রক্লিষ্ট জীবনকে। কিন্তু অভাব তাদের কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। "আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ" গল্পটির শেষ অংশে দেখা যায় গ্রামের অন্ত্যজ মানুষগুলি দুবেলা মাড়ভাতের জন্য হাহাকার করে, সেখানে মাংসভাত দূরহস্ত। গ্রামের লোক মারা গেলে শ্রাদ্ধের দিন মাঠে মৃত ব্যক্তির নামে মাংসেরঝোল ভাত রেখে আসা হয়। তেমনই মৃত হারু বেহারার "আশ পালনার" মাংস ভাত মাঠের মধ্যে রেখে আসে তার পরিবারের লোকেরা। মরামানুষের ভাত কেউ ছুঁয়ে না, শেষপর্যন্ত কাক পক্ষীরাই তা ভক্ষণ করে। কিন্তু সেবার সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা ঘটে গেল। ভজহরির ক্ষুধার্থ ছেলেটা মাঠের মধ্যে এক হাঁড়ি বাসিভাত, হলুদমাখা খাসিমাংসের তরকারি দেখে আহ্লাদে স্তম্ভিত হয়ে ক্ষুধাতুর কাকেদের খাবার পরম তৃপ্তিতে খেয়ে ফেলল। লোকসংস্কার মতে মরা মানুষদের ভাত খেলে নাকি মৃত্যু অনিবার্য। এসব কথা ভজহরির কানে গেলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে; 'তুই



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

অভাগা খে' ফেলিলি? বাঁচবি না, আর তোকে বাঁচানো গেল না রে! এখন যে কী-ই ওষুধ দিঁই তোকে। আতঙ্কিত ভজহরি অস্থিরতায় ছটফট করল। ...মরা মানুষের ভাত জ্যান্ত মানুষের পেটে পড়লে মানুষ কি আর বাঁচে। অতএব মরে যাবার ভাবনায় ভজহরির ছেলেটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে বলে, একটা কিছু ওষুধ এনে তুই আমাকে দে বাপ![৪]'

সাঁওতালি নর-নারীর জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি উঠে আসে "ঘবা, তিহা'র গল্প" এ। এরা চিরকালের দাস। নিজেদের জমি জায়গা তেমন না থাকায় অপরের ক্ষেত খামারে কাজ করে দিন চলে তাদের। মেদিনীপুর জেলার বড়চাষী শ্রীসর্বেশ্বর সাঁপুই। তার খামারে ধানঝাড়া কাজ করে রতন মুর্মু। এক সন্তানের জননী। বয়স তার কোন মতেই তিরিশের বেশি নয়, উন্মুক্ত উদর যে কোনো পুরুষের লালসার কারণ। রতনকে দেখে সর্বেশ্বরের সুপ্ত কামনা জেগে ওঠে। বিকেলের ধানঝাড়া শেষে মড়ায়ের তলার ধানটুকু ঝুড়েতে তুলে নিচ্ছে এমন সময় সর্বেশ্বর সোয়াগ করে "টি-উ-ল-টু-টু!" পাখিটার ডাক শোনার ছলে কাছে আসে। অসভ্য ইঙ্গিত দেয়,

"দ্যাক, ডাকটা চিনিস কি নাই? কত বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াস।"

"কী?"

"টি-উ-ল-টু-টু"

"ধুর বাবু! বললাম, তোর ব্যাটাকে জিগাস কর। তোর বউকে জিগাস কর"

"যা ঘুমা, আর লয়ত"

"কি?"

"তোর বউ সুধারানীর কাছে যা।"

'সুধারানী আর সুধা নাই রতনি। এখন তুই আমার চোখের মণি, রতনরানী!"

বলেই আচমকা ধানের গোলায় ফেলে রতনমণিকে তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ষণ করলেন সর্বেশ্বর।'[৫]

এরকম রতনের মতো বহু আদিবাসী নারীরা সভ্যবাবুদের লালসার শিকার হয়। কিন্তু আদিবাসীরা বনে জঙ্গলেও থাকলে বন্য নয়। নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে তার সবকিছু করতে পারে। মেয়ে-বউদের সম্মানহানী হলে নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে গর্জে ওঠে মনিবের বিরুদ্ধে। সেবারও ঘন শালবন যেন প্রতিবাদের হুঙ্কারে নড়ে উঠল। আদিবাসীরা সিধু-কানুর জাত ভাই। সিধু-কানু যেভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল তারাও আজ সেভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। গোটা জঙ্গলমহল কেঁপে ওঠে ধামসা মাদলের শব্দে। কিন্তু তাদের সমস্ত তর্জন গর্জন থেমে যায় শাসকের রক্তচক্ষুর কাছে। সর্বেশ্বরের মতো পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে না তারা। টাকা দিয়ে পুলিশ, প্রশাসন সকলকেই কিনে ফেলে সে। মেদিনীপুর থেকে সশস্ত্র বাহিনী আসে। বন্দুকের নলের কাছে পিছু হাঁটতে বাধ্য হয় কাঁড়বাশ-টাঙ্গি বল্লম বাহিনী। কিন্তু পুঁজিবাদী শাসকের

লোলুপতার বিরুদ্ধে আদিবাসীরা যে বিদ্রোহের আগুনটা জ্বালিয়ে দিয়েছে তা অনন্তকাল ধরে ”রাবণের চিতা”র মতোই জ্বলছে। সে আগুনে পুড়ছে আদিবাসীরাই।

সত্তের পরবর্তী দশক থেকেই রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল গ্রামের মানুষ। জোতাদার মধ্যসত্তভোগীদের পাশাপাশি শুরু হল সুবিধাবাদীদের আগ্রাসন। হিংসা আর ভোগ দখলের রাজনীতি টুকরো টুকরো করে দিল গোষ্ঠীজীবনকে। ভটা সাঁওতাল, ধনু, ছোটরাই মুর্মুর মতো কত নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ যাদের হয়ত দুবেলা ঠিক মতো খাবার জোটে না কিন্তু সৌভ্রাতৃত্বে তারা একে অপরের পাশে ছিল, আজ রাজনৈতিক দলাদলি তাদের ক্রমশ দূরে ঠেলে দিচ্ছে। গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পরমেশ্বর এসব কথাই মনে আসে।

‘কুলহি রাস্তার দুধারে জ্যোৎস্নায় আলোকিত মাটির দেওয়ালে আঁকা দলীয় রাজনীতির প্রতীকচিহ্নগুলো দেখতে দেখতে। একটি দেওয়ালও অবশিষ্ট পড়ে নেই। সব দেওয়ালই চিত্রিত, বিচিত্রিত। হারাধন, অমূল্য, শম্ভু, শ্রীনিবাস, সুদর্শনসকলেই যেন পিঠে ছাপ্পা লাগিয়ে রাস্তার দিকে পিঠ পেতে বসে।[৬]

একমাত্র পরমেশ্বরের দেওয়ালে কিছু লেখা নেই। অর্থাৎ তার পরিবারটি কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে নয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এটাই পরমেশ্বর ও তার পরিবারের আশঙ্কার বিষয়। বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন না করলে সেই পরিবারটির প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠে গ্রামের নেতারা।

সময়ের অভিঘাত বক্ষে ধারণ করে একজন লেখক সমাজ মধ্যস্থ রাজনৈতিক উত্থান-পতন কে পারেন না এড়িয়ে যেতে। নলিনী বেরাও পারেননি। তাই, তার গল্পে এসেছে মাওবাদী প্রসঙ্গ। রাতদিন তারা আদিবাসী পাড়ায় ঢুকে মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করতে সকলকে বাধ্য করে। তাদের মিটিং-এ না গেলে মেরে ফেলার ভয় দেখায়। সরকার এবং প্রশাসনের কাজে যুক্ত থাকা সকল মানুষের প্রতি তাদের মারাত্মক বিদ্বেষ। নয়াগ্রামের এক ঠিকাদারের তিনটি “টাক্টর” একটি “পে-লেডার” পুড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশের চর সন্দেহে বহু মানুষকে খুন করে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে। খবরে আতঙ্কের বার্তা প্রকাশ পেয়েছে—

“...কয়েক শ” মাওবাদী গরিলা “নাইন এম এম” “এ কে ফর্টি সেভেন”-এর মতো মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে টহল দিচ্ছে তপোবন-পাঁচকাহানিয়া-খড়িকামাথানি-ঘোড়াটাপুর জঙ্গলে”[৭]।

এই আতঙ্কের কারণেই গ্রামে থাকা বড়দা ছোটভাইকে সতর্ক করে দেয়-‘এখন আসিস না’। প্রিয়জনের এই ভয়ানক আতঙ্কের কথা শুনে শহরের নিরাপদ আশ্রয়টিতে থেকেও চোখে ঘুম আসে না গল্পকথকের।

“আসা চাই” গল্পের মধ্যে মাওবাদীদের নাশকতামূলক কার্যকালাপের বর্ণনার পাশাপাশি তদের জীবনের একটি বৈচিত্রময় দিককেও ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। তাদের মধ্যেও





একটা সমাজ তৈরি হয়েছে। নারী পুরুষ একসঙ্গে থাকতে থাকতে হয় প্রেম ভালোবাসা, তারাও শেষপর্যন্ত আবদ্ধ হতে চায় বিবাহবন্ধনে। গল্প প্রসঙ্গে উঠে আসে কমরেড ডমনের সঙ্গে কমরেড চামরমণির বিবাহ। বিবাহের পর জঙ্গলের ভেতর তারা বৌভাতের আয়োজন করে। বৌভোজে নিমন্ত্রণ করে গ্রামের সাধরণ মানুষকে। কিন্তু ভয়ে শিয়রে ওঠে তারা। সকলের মনে জাগে সংশয়। গেলে বিপদ, না গেলেও বিপদ! গ্রামের দাদা শহরে থাকা ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে। শেষপর্যন্ত রাতের জঙ্গলে একবুক ভয় নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গল্প কথকের দাদা এগিয়ে যায়। উপহার স্বরূপ ক্ষেতের “বৈতাল” আর একটা “খুকড়া ষাঁড়া”ও সঙ্গে নিয়ে যায়। এইসব কিছু পাঠকের কাছে মুর্হূতে অন্ধকার মধ্যে একটু আলোর ঝলকানি মনে হলেও নিরস্ত্র গ্রামবাসীর কাছে শধুই আতঙ্ক ছাড়া কিছুই নয়। পুলিশ, প্রশাসনকে জানালে আসে খুণ হয়ে যাওয়ার হুমকি। জঙ্গলমহলের শিকড়ে পোঁতা মানুষগুলো ভিটেমাটি ছেড়ে যেতেও পারেন না। মুখ বুজে পড়ে থাকাটাকেই মনে করে তাদের নিয়তি।

এইভাবেই তাঁর গল্পে ব্যথা, বেদনা, রাজনীতি, হা-হুতাশা থেকে নির্মিত হয়েছে এক একটি যন্ত্রণাদগ্ধ মনবজীবন। যেন,

“...প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে”।[৮]

আপাত সারল্যের আড়ালে চিত্রিত হয়েছে অসহায়, অপাংক্তেয়, ব্রাত্যজনের বিষণ্ণ ব্যথাতুর মন ও মনন আর তরঙ্গহীন মৌনতা।

**তথ্যসূত্র :**

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘অতীত’, সঞ্চয়িতা, স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৩৮০
২। নলিনী বেরা, ‘সুবর্ণরেখিক নদী-মানুষের উৎস সন্ধানে’, গুণিন বৃত্তান্ত ও ভূতপুরাণ, কৃতি, বইমেলা ২০১৮, পৃষ্ঠা-১১০
৩। নলিনী বেরা, ‘শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব’, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪৭,৪৮
৪। নলিনী বেরা, ‘আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ’, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, কলকাতা বইমেলা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১
৫। নলিনী বেরা, ‘ঘবা, তিহা’র গল্প’, শ্রেষ্ঠগল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, বইমেলা-২০০৩, পৃষ্ঠা-৬৭
৬। নলিনী বেরা, ‘বর্ষামঙ্গল’, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৭৪
৭। নলিনী বেরা, ‘আসা চাই’, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৮৭
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘প্রশ্ন’, সঞ্চয়িতা, স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৫৩৭

# বাংলা ছোটগল্পে ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রতিফলন

**বিজেন্দ্র দালাল**

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে শুরু হয় ইতিহাসের সবথেকে জঘন্যতম কলঙ্কময় অধ্যায়। শুরু হয়েছিল সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন ভীত সন্ত্রস্ত ঠিক সে সময়ই শকুনির পাশার মতন তারা কষে ফেলে এক কুৎসিত চক্রান্ত। ধর্মভীরু দেশবাসীর মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে এক মরণ কামড় বসায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। কলকাতার সেই ভয়াবহ দাঙ্গার 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এর নায়ক ছিলেন হাসান শাহিদ সুরাবর্দী। সাধারণ মানুষের উপর চলেছিল ধর্মের নামে অমানুষিক নির্যাতন। ১৯৪৬ সালের ১৬ অগাস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয় মুসলিম লিগ। 'পাকিস্তানই মুসলমানদের একমাত্র উন্নতির পথ', এই মন্ত্রে লিগ নেতারা গ্রামগঞ্জে প্রচার শুরু করেন। ১ মার্চ নির্বাচনে শুধুমাত্র 'পাকিস্তান' স্লোগান দিয়েই ১১৯ টা মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪ টি আসন অর্জন করে লিগ। ইতিমিধ্যেই মুসলিমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের চেতনা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ এর মে মাসে "ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব" প্রকাশিত হওয়ার পর তলে তলে জমে ওঠা হিংসা, দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন এক বিরাট বিস্ফোরণ হয়ে ফেটে পড়ে ১৬ অগাস্ট। দেশজুড়ে শুরু হয় আত্মস্বার্থভোগীদের উস্কানিতে এক উন্মাদ হিংস্র লড়াই। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত। দাঙ্গা শুরু হয় সমগ্র কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাব জুড়ে। সমকালীন পত্রপত্রিকা থেকে উঠে আসে কেবল রক্তের কালো অক্ষর। দেশজুড়ে চলতে থাকে অরাজকতা। দেশে কোনোরকম আইনশৃঙ্খলা ছিল না। লুটেরা, গুন্ডা, দাঙ্গাবাজেরা প্রকাশ্যে রাজপথে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

সুবিধেভোগী শ্রেণী সেসময় দাঙ্গাকে কীভাবে বাংলার রাজনীতির মাধ্যম করে তুলে কি জঘন্য রাজনীতি চালিয়েছে তার গোপনীয়তাকে সবার সামনে বাংলার গল্পকারেরা তাদের লেখনীতে তুলে ধরেন। পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, হিংসার উগ্র প্রকাশ আর সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতির নির্মম কুচক্রীর জালে সাধারণ মানুষ কীভাবে রক্ত আর সম্পর্কের বিনিময়ে মূল্য চুকিয়েছে তার সাক্ষী বাংলার ছোটগল্প। মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে তারা হৃদয়ধর্মে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'মুসলমানির গল্প'এ করেছেন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সমরেশ বসুর 'আদাব' যেন এক মৃত্যুর বিভীষিকা। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উস্তাদ মেহের খা'তে আমরা দেখি কীভাবে ধর্মের দৈব বেদীর সামনে এক শিল্পীর পরাজয় ঘটেছে। কামাক্ষীপ্রসাদের 'বুলবুলি' তো এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডেরই ছবি। এই নৃশংসতার মাঝে জ্যোতির্ময়ী দেবী 'সেই ছেলেটা' গল্পে তুলে ধরলেন একদিকে মাতৃস্নেহ ও অন্যদিকে মাতৃকলঙ্কের দ্বন্দ্ব। দুই মাকে দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে





তুলে ধরেছেন রমাপদ চৌধুরীও তাঁর 'অঙ্গপালি' গল্পে। নির্বাকের লাশের ইমানত গড়েছেন মানিকও। 'কাফের' যেমন একদিকে ভ্রাতৃত্বের ঠিক তেমনই রমেশচন্দ্রের 'সাদা ঘোড়া' অন্যদিকে করেছে মানবতার সন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের একজন মানবতাবাদী লেখক ছিলেন। সমাজে কৃত্রিম ধর্মান্ধতার প্রতি তিনি তীব্র কষাঘাত এনেছেন। দাঙ্গা কালের সমাজের অরাজকতার তীব্রতা এতটাই ছিল যে, পরিস্থিতির চাপে পড়ে কমলা তার কাকির কাছে হয়ে উঠেছিল "সর্বনাশের মশাল "। তৎকালীন সময়ে পরিবারে কোনো সুন্দরী যুবতী থাকলে তা গৃহকর্তার রাতের নিদ্রাহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়াত। রবীন্দ্রনাথ মানবতার জয় পতাকা উত্তোলিত করেছেন তার 'মুসলমানির গল্পে'র হবির খাঁর মধ্য দিয়ে। সমাজ এমনকি নিজের আপনজনদের থেকে বিতাড়িত এক ব্রাহ্মণকন্যা কমলাকে তিনি মধুমোল্লার ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন। মুসলিম হবির খাঁর বিশালাকার বাড়ির একদিকে আছে শিবমন্দির আর অন্যদিকে আছে বাড়িতে হিন্দু ধর্ম পালনের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা। ধর্মের বাঁধন শিথিল করে কমলা হবির খাঁকে জানিয়েছে, 'বাবা আমার ধর্ম নেই আমি যাকে ভালোবাসি সে ভগবানই আমার ধর্ম। তাকেই আমি পুজো করি, তিনি আমার দেবতা। তিনি হিন্দু নন মুসলমানও নন।' রবীন্দ্রনাথ যেন তার শেষ জীবনে এসে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আনছেন কমলার মধ্যে দিয়ে। গল্পে তিনি দেখিয়েছেন দীর্ঘদিনের অন্ধ ধর্মভেদের থেকে মিলনের তথা প্রেমের ধর্ম অনেক বড়।

ছেচল্লিশের ভয়াবহ আতঙ্কিত পটভূমিকায় সমরেশ বসু লিখলেন অসামান্য গল্প 'আদাব'। চারিদিকে চলছে লুটতরাজ। আগুন জ্বলছে। আকাশে নারী-শিশুর হাহাকার শোনা যায়। আর তার মধ্যেই চলছে নির্বিচারে গুলি। চারিদিকে ভীতসন্ত্রস্ত থমথমে আবহাওয়া। এই পরিবেশের মধ্যে লেখক ফুটিয়ে তুললেন মানবতার ছবি। গল্পকার দেখাচ্ছেন ডাস্টবিনের ধরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা একজন শ্রমিক আরেকজন নৌকার মাঝিকে। এরা দুই ধর্মের অথচ এই অস্থিরতার মধ্যেও তারা যেন এক আন্তরিকতার আবেদনে নিজেদের বাঁধতে চাইছে, এইতো শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানব ধর্ম। তাদের মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই' নেতারা হেই সাততলার উপর পা দিয়া হুকুম কইরা বইয়া রইল, আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।' আমরা দেখি মুসলমান মাঝির জন্য হিন্দু শ্রমিকের ভগবানের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা—'মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে'। ঈদের চাঁদ দেখার বাসনা নিয়ে যখন মাঝি পরিবারের কাছে ফিরতে চায় তখন একটা গুলির তপ্ত শাণিত ফলায় চাঁদের অনেক কাছে পৌঁছে গেছে মুসলমান মাঝি। এক মৃত্যুর বিভীষিকায় হিংস্র দাঙ্গার নগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে এই গল্পে। "আদাব" এখানে কোন ধর্মীয় অভ্যর্থনা নয় এখানে তা মানবিকতার আহ্বান।

শিল্পীর শিল্পসত্তা যখন ধর্মের অন্ধবিশ্বাসের কাছে হেরে যায় তখন শুধু শিল্পীর নয়,

শিল্পের অবক্ষয় ঘটে। সুন্দর সুন্দর সম্পর্ক গুলো যখন টিকি আর দাড়ির নিরিখে খন্ড খন্ড হয়ে যায় আর মনের মধ্যে জন্মায় অন্ধবিশ্বাসের বীজ যা আস্তে আস্তে রূপ নেয় ধ্বংসের, হত্যার। বাংলা মুলুকের নরোত্তমপুর গ্রামে শঙ্করের বাড়িতে তার বাবার আমল থেকে প্রায় দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সঙ্গীত সাধনা করে চলেছেন উস্তাদ মেহের খাঁ। ১৯৪৬ এর দাঙ্গায় অবিশ্বাসের যুগে শঙ্করকে পাড়ার ছেলেরা বোঝায়, 'ও কেউটে সাপের জাত শংকর দা।' শঙ্করের মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে দেওয়া হয় তখন থেকেই। আধুনিক কলকাতা রূপান্তরিত হয় সুন্দরবনে। তার পদে পদে হিংস্র জানোয়ারের পদসঞ্চার। অবিশ্বাস ভয়ঙ্কর কীটের মতো, কেবলই কুরে কুরে দংশন করতে থাকে। তাই একসময় শঙ্করেরও উস্তাদজিকে শিল্পী নয় মুসলমান বলে মনে হয়। পারিবারিক বন্ধুর শিল্পীসত্তাকে হারিয়ে ফেলে ধর্মের বিষাক্ত ধোঁয়াশায়। বিষাক্ত বিষ যখন শঙ্করের অন্তরাত্মাকে ছেয়ে ফেলেছে তখন একদিন শংকর তার পিতার গুরুকে "বেইমান", "বিশ্বাসঘাতক" আখ্যা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়, আর কলকাতার পথে উন্মুক্ত দাঙ্গাবাজ গুন্ডাদের হাতে খুন হয় উস্তাদ মেহের খাঁ। ধর্মান্ধতার মূঢ়তায় হারিয়ে যায় শিল্পী, আর মাথানত করে শিল্প।

গল্পকার কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বুলবুলি গল্পে যেন দাঙ্গার ভয়াবহ রূপকে প্রত্যক্ষ তুলে ধরেছেন। চারিদিকে হানাহানি, লুটতরাজ অবাধ। প্রকাশ্যে শাসনব্যবস্থার সামনে চলেছে অরাজকতা মানুষের কাতর প্রার্থনা হয়ে উঠেছে দাঙ্গাবাজদের উল্লাসবস্তু। এই গল্পে বুলবুলির পরিবারের উপর যখন রক্তপায়ী মুসলমানরা আক্রমণ করে তখন আসন্ন মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়ে তিন টোটা গুলি নিয়ে হাজারো খুনির মাঝে বলিদান দেয় বুলবুলির বরদা। এই তিন টোটা গুলি যেন মানবিকতা নিয়ে আসার মিসাইল হয়ে উঠেছে। গল্পের মানবিক আবেদন আরো জোরালো হয়ে উঠেছে যখন খিড়কির দরজার কাছে যাওয়ার আগে বুলবুলির বাবা তার মাকে বলে, 'আমাদের গলার স্বর যখন আর পাবে না তখন আর অপেক্ষা করো না ছাদে উঠে ঝাপ দিয়ো। চারতলা থেকে রাস্তায় পড়লে আর কেউ বাঁচে না।' মা তার ইজ্জত বাঁচাতে সন্তানকে উপেক্ষা করে উঠে যায় চারতলায়। ছেচল্লিশের রক্তখেলার নেশায় মানুষ আর মানুষ নেই সবাই ধর্মের তরবারিধারী। একটা ছোট্ট শিশু যখন তার টিয়া পাখিকে স্বাধীন করে দেয় মুক্ত আকাশে তখনই ধর্মের ধ্বজাধারী মানুষগুলো পশুর মত শিকার করতে আসে। লেখক দেখাচ্ছেন কিভাবে নারীত্বের কলঙ্ক রক্ষার্থে নারী তার মাতৃত্বকে বিসর্জন দিচ্ছে।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা কিভাবে এক নারীকে তার সন্তানের কাছ থেকে আর এক নারীকে তার মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছিল তাই গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন। রাজকুমারী ওরফে রাজ ছোটবেলায় তার পরিবারের সাথে যখন দাঙ্গা এদেশে পালিয়ে এসেছিল তখন সেই দুর্যোগের ভয়াবহ রাতে তার মাকে তাদের সেই পুরোনো বাড়িতে শেষবারের মতো



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

দেখেছিল। লেখিকা এই গল্পে দুই নারী মনের দুই সূক্ষ্মতম অন্তর্দৃষ্টি এঁকেছেন। রাজ পার্কে তার মা কে এক ভিখারিনীর বেশে একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে ভিক্ষা করতে দেখেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে এও দেখেছে যখন সেই ভিখারিনী তার কাছে এসে ভিক্ষা চাইলো তখন তার নাম ঠিকানা শুনে সেই ভিখারিনীর মুখে ফুটে উঠেছিল 'আ মেরি রাজ'। আর তৎক্ষণাৎ সেই মহিলাটি ভিক্ষা না নিয়েই তার ছোট ছেলেটার হাত ধরে ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নেয়। রাজ তার মাকে চিনতে পারলেও সে ছেলেটাকে চিনতে পারে না। এক গভীর সত্যের সম্মুখীন হয় রাজ। প্রতি রাতে সেই সত্য তাকে তাড়িত করে। এক মা তার লজ্জা ঢাকতে নিজের মেয়ের থেকে পালিয়ে যায় আর এক রাজ যে মায়ের 'সেই ছেলেটা'কে মেনে নিতে পারে না অথচ মা কে আপন করে নিতে চায়। সমাজের ধর্মস্বার্থের কারণে সামান্য এক শিশু প্রাণও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানবতার তথা বন্ধুত্বের তথা ভ্রাতৃত্বের গল্প হল কাফের। ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর লেখা একটি মর্মস্পর্শী বন্ধুত্বের প্রতিবাদের গল্প কাফের। গ্রামগুলো দাউদাউ করে জ্বলছে। মানুষের মাংস পোড়া গন্ধ যেন অতৃপ্ত প্রেতের মত গ্রামময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্মবোধ ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। কিন্তু লেখক গল্পে দেখিয়েছেন মানবতার মধ্যেও টিকে আছে পরান ও হাসিমের বন্ধুত্ব। হিন্দু বন্ধু পরান কে বাঁচাতে নিজের জাতভাইদের চোখ এড়িয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে আসতে সাহায্য করতে চায় হাসিম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বন্ধুত্বের বন্ধনকে ছিন্ন করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ মাখানো সেই ধারালো হাতিয়ারটি। গল্পের শেষে দেখি হাসিম তার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিবাদে দুজন কাফেরকে অর্থাৎ যারা বিধর্মী, যারা হিন্দু নয়, যারা মুসলমান নয়, যারা মনুষ্য ধর্ম বর্জিত দুই কাফের; তাদেরকে গোর দেয়।

এ রকমই আরেকটি বন্ধুত্বের গল্প হলো অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "স্বাক্ষর"।

দাঙ্গার মত অবিশ্বাসের যুগে শেষ হয়েছে কত আবাল্য বন্ধুত্ব। এরকমই একটি গল্প স্বাক্ষর-এ লেখক দেখাচ্ছেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে ইট ছোড়ে দীননাথ আর মুসলমান সম্প্রদায় থেকে বোতল ছোড়ে তারই বাল্যবন্ধু জহুরালী। তবে গল্পের শেষে লেখক সেই অন্ধকার রাতে দুই বন্ধুর মিলনের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের তথা মানবতার তথা ভ্রাতৃত্বেরই জয়গান গেয়েছেন।

দাঙ্গার পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে সবিতার জাত ধর্ম কালিমালিপ্ত মাতৃত্বের সন্ধান করেছেন রমাপদ চৌধুরী তার "অঙ্গপালি" গল্পে। রক্তপায়ীদের কোলাহল আর অসহায় নারীর আর্তনাদ ভরা কালো আকাশে যেদিন ধর্মের নামে মানবতাক্ষয়ী জাতের মশাল জ্বলে উঠেছিল সেদিন সেই পিশাচদের সামনে নিজেকে হরিণ শাবকের মত ধরা দিতে হয়েছিল সবিতাকে। মধ্যবিত্ত পরিবারের শুচিগ্রস্থ সবিতার মাও সে দিন বাদ পড়েনি ওদের লোলুপতা

থেকে। তাইতো লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন, ‘লজ্জা আর অস্বস্তি ওর একার নয়, মাও ওর চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চায়।’ মধ্যবিত্তের মানবিক মুখোশ পরা ভদ্রলোকের আড়ালে যে স্বার্থপর মানসিকতা কাজ করছে তা টেনে আনলেন যখন আমরা দেখি সবিতার মা-ই সেই অন্ধকার রাতের ঘৃনা আর বিদ্বেষের বিনিময়ে পাওয়া সবিতার সন্তানকে কোলে নিয়ে রাতের বেলা জাত খোয়ানোর ভয়ে কলঘরে গিয়ে স্নান করে। একদিকে সবিতার কলঙ্কিত অসম্মানের মাতৃত্ব যেন পবিত্র হয়ে উঠছে আর অন্যদিকে সবিতার মায়ের সামাজিক সম্মানের মাতৃত্ব যেন কোথাও গিয়ে মাতৃত্বের আসল অর্থ “ পবিত্রতা” কে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে।

‘মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়’- একথা আমরা যেন ভুলতে বসেছি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র আর সলিল চৌধুরী দাঙ্গার নগ্নতাকে প্রতিফলিত করেছেন সামান্য দুই আসবাব “পালঙ্ক” আর “ড্রেসিং টেবিল” কে সাক্ষী রেখে। ড্রেসিং টেবিল গল্পে লেখক দেখাচ্ছেন, কীভাবে সমাজ মুসলিমকে আর বাঙালি ভাবতে পারছে না। রহিমুদ্দিন তার স্ত্রী আমিনাকে কলকাতায় রেখে কাজে এসেছে পাকিস্তানে আর অন্যদিকে পাকিস্তানবাসী অধ্যাপক অমল তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যের করুণ উপহাসে ধর্মের নামে বর্ডারেই অমলের স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যায় অত্যাচারী দাঙ্গাবাজেরা। বাধ্য হয়ে সন্তানকে নিয়েই অমল কে চলে যেতে হয় বর্ডার পেরিয়ে। পাশাপাশি লেখক দেখাচ্ছেন কিভাবে সংবাদমাধ্যমগুলো ধর্মের বিষবাষ্প সবার মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর আনোয়ারের মতন গুন্ডারা কিভাবে দাঙ্গাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়তুষ্ট করে তাও লেখক দেখাচ্ছেন। কলকাতায় আমিনাকে হিন্দুরা মেরে ফেলতে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা নন্দা কাপড় দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। আমিনার পুড়ে যাওয়া শরীরটার হাহাকার যেন ওই আয়নার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে। রহিম তার স্ত্রীকে আর কোনো দিন কাছে পাইনি, চিরকালের মতো দূরে সরে গিয়েছিল।

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র তার “পালঙ্ক” গল্পে দেখাচ্ছেন রাজমহন ওরফে ধলাকর্তা যিনি বুড়ো বয়সে তার ভিটেজমি, সম্পত্তি নিয়ে এখনো পাকিস্তানের রয়ে গেছেন আর তার নাতি নাতনি পুত্র পুত্রবধূ সবাই কলকাতায়। বৌমার বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া পালঙ্ক বেঁচে টাকা পাঠাতে বললে আত্মসম্মানে অভিমানী ধলাকর্তা মকবুলকে তা বেঁচে দেয়। তবে পালঙ্কের টান তাকে ছিন্ন করতে পারলো না। শেষে লেখক দেখাচ্ছেন রাজমোহন অসুস্থ হওয়ার পর তার নিঃসঙ্গ জীবনে বৈষয়িক জিনিসের টান তুচ্ছ হয়ে যায় এবং নিজের নাতি-নাতনির প্রতিচ্ছায়া দেখতে পান মকবুলের ছেলে মেয়ের মাঝে। সারা জীবনের সঞ্চিত দেশপ্রেম” সহায়-সম্পত্তি আপন অস্তিত্বের অনুপস্থিতিতে ক্ষণিকের জন্য





নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমন সময় ধর্মভেদ ভুলে মানবতার ছায়ায় রাজমোহন মকবুলের দুই সন্তানকে খুঁজে বেড়ায়।

মধ্যবিত্ত মানসিকতায় দাঙ্গা কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল মধ্যবিত্তের মন নিয়ে তা ফুটিয়ে তুলেছেন মানিক তার ‘স্থানে ও স্তানে’ এই গল্পে। নরহরির মেজশ্যালক শ্যামলের মধ্যে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন মধ্যবিত্তের হিংস্র প্রতিশোধের বাসনাকে। তাই উড়িষ্যায় বাঙালি যুবতীদের হেনস্থার প্রতিশোধে শ্যামলরা মুড়ি-মুড়কির দোকানের অর্জুনের বউ আর সুধীনবাবুর বাড়ির উড়িয়া ঝি টাকে ধরে অপদস্ত করতে পেরেছে। অনেক হিংসা বিবাদ, অনেক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর বাস্তবতা ওলট-পালট করে দিয়েছে। এমনকি খিল দেওয়া ঘরের নির্জন নিরিবিলি মাধুর্যের ভূমিকা পর্যন্ত ভাবাক্রান্ত হয়েছে কোটি জীবনের গুরুভার সমস্যায়। এই গল্পে লেখক দেখাচ্ছেন, একজন সাধারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত পূর্ববঙ্গের চাকরির নিশ্চয়তা করতে কলকাতায় তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে এসেছে কিন্তু সমাজের নারীদের বর্তমান সুরক্ষার কথা ভেবে বাড়ির কেউ পূর্ববঙ্গে একজন হিন্দু নারীকে পাঠাতে রাজি নয়। একজন মধ্যবিত্তের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান যোগানোর তাগিদ আর বিপরীতে তার স্ত্রীর জীবন সংশয়ের যে দ্বন্দ্ব তা ফুটে উঠেছে এই গল্পে। লেখক এর ভাষায় ‘এ শহরে হিন্দুও থাকে না, মুসলমানও থাকেনা, এটা বজ্জাতদের আস্তানা।’

একটা নিরীহ পশুকে কেন্দ্র করে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় কে তুচ্ছ করে রমেশ চন্দ্র সেন এই গল্পকে নিয়ে গেছেন মনুষ্য হৃদয় ধর্মের অন্তরালে। লেখক দেখাচ্ছেন, দাঙ্গায় ভীতসন্ত্রস্ত পাড়াটির মধ্যে চাঁদ নামের ঘোড়াটি কিভাবে শান্তির উন্মাদনা নিয়ে আসে। সাদা ঘোড়াটা যেন সারা পাড়ায় শান্তির দূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছে এই দাঙ্গাকালে। কিন্তু হঠাৎই একদিন সাদা ঘোড়ার গায়ে ঘা হয়। অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। কারও হাতে জলস্পর্শ করে না সে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ওদের হিন্দুপাড়ায় লুঙ্গি আর মাথায় ফেজ টুপি পরা এক মুসলমানের স্পর্শে চাঁদ সাড়া দিয়ে ওঠে। যেন তার প্রাণস্পন্দন জেগে ওঠে সেই হাতের স্পর্শে। সে বৃদ্ধ মুসলমান সহিসের হাতে খাবার খায়। বৃদ্ধ মুসলমানের কাছে সবাই ভবিষ্যতের দাঙ্গাবিহীন স্বপ্নের শান্তির দিনের কথা শোনে। যে স্বপ্নে চাঁদ আর সে আনন্দে বাঁচবে। হঠাৎই দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ হয় সেই পাড়ায়। পাড়ার হিন্দু যুবকরা বৃদ্ধ মুসলমান সহিসকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করে তার প্রাণ। আর অন্যদিকে সৈন্যদের গুলিতে রাস্তার মধ্যে সাদা ঘোড়া পড়ে থাকে নিস্তেজ অপলক দৃষ্টিতে। এখানে যেন মূক পশুর নির্বাক বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে মানব সম্প্রীতির বিদীর্ণ রূপরেখা। শাসকশ্রেণীর স্বার্থে বলি হওয়া মনুষ্যত্ব যেন মিলিটারির গুলিতে নিহত ‘সাদা ঘোড়ার’ প্রতীকে পরিস্ফুট। এখানে বৃদ্ধ মুসলমান সহিস আর হৃষিকেশের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। কৃত্রিম ধর্মসৃষ্টিকারী মানবতার বিরুদ্ধে এক গভীর হতাশা বোধ এই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার রমেশচন্দ্র

সেন।

**তথ্যসূত্র :**

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা শেষ মুদ্রণ পৌষ ১৪১৮, পৃষ্ঠা ৭৪৭
২। কমলেশ সেন, 'দাঙ্গাবিরোধী গল্প', ধ্রুপদী, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১১০
৩। কমলেশ সেন, 'দাঙ্গাবিরোধী গল্প', ধ্রুপদী, প্রকাশকালঃ মার্চ ১৯৬২, পৃষ্ঠা ১১৩
৪। ভদ্রেশ্বর মন্ডল, "ভেদ — বিভেদ" দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা - বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প সংকলন, জ্ঞানভবন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২০৫
৫। ভদ্রেশ্বর মন্ডল, "ভেদ — বিভেদ" দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প সংকলন, জ্ঞানভবন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৩২০
৬। ভদ্রেশ্বর মন্ডল, 'ভেদ বিভেদ' দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প সংকলন, জ্ঞানভবন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৩৩
৭। ভদ্রেশ্বর মন্ডল, "ভেদ — বিভেদ" দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা - বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প সংকলন, জ্ঞানভবন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২৮৭
৮। ভদ্রেশ্বর মণ্ডল, "ভেদ বিভেদ" দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা - বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প সংকলন, জ্ঞানভবন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ১৪০



# শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ঃ বাংলা ছোটগল্পের ভিন্নতর ধারা

**বিশ্বজিৎ বিশ্বাস**

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য বদলে যায় বয়নে বয়ানে। সব দেশে সব কালে সাহিত্যের এই ভোলবদল অর্থাৎ নতুন হয়ে ওঠা চলতেই থাকে। বিজয়গুপ্তের থেকে ভারতচন্দ্রকে যেমন, তেমনিই মধুকবির থেকে রবিঠাকুরকে আলাদা হয়ে উঠতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন, তখনও কল্লোলের কলরব শোনা যায়। তবে শুধুমাত্র একবার বা দুবারই নয়, এই প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে দেখা গেছে বার বার। কখনো একা একা তো কখনো দলবদ্ধ ভাবে এই বহমানতাকে পেরিয়ে যেতে চেয়েছে তারা। বিশ শতকের ছয়ের দশকে বাংলা সাহিত্যের এই বহমান ধারায় একের পর এক আঘাতের জোয়ার আসে। কখনো হাংরি কখনো শ্রুতি তো কখনো শাস্ত্রবিরোধী বা প্রকল্পনা প্রভৃতি নামধারী সাহিত্য আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে। কখনো তারা ম্যানিফেস্টো রচনা করে সরাসরি বিরোধিতার কথা ঘোষণা করেছিলেন, আবার কোথাও কোনো ঘোষণা ছাড়াই নতুন ধরনের সাহিত্য সৃজনের মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তবে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের তুলনায় গল্প ও কবিতাই মূলত আক্রান্ত হয়েছিল আন্দোলনকারীদের হাতে।

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। তবে "সবুজপত্র" (১৯১৪) এবং ঠিক তার দশ বছরের মাথায় "কল্লোল" (১৯২৪) বাংলা ছোটগল্পকে কিছুটা বদলে দিতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের গল্পকে কিছুটা বদলেছে। ১৯৫৮-৫৯ সাল নাগাদ বিমল কর কয়েকজন তরুণ লেখকদের নিয়ে নতুন ধরনের গল্প লেখার অঙ্গীকার করেছিলেন। শুরু হল 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' আন্দোলন।

এর পর 'শাস্ত্রবিরোধী' আন্দোলন দানাবাঁধে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে 'বিদিশা' নামে একটি ছোট পত্রিকার মধ্য দিয়ে। 'বিদিশা' দু-একটি সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে শাস্ত্রবিরোধীরা বের করলেন 'এই দশক' বুলেটিন। এই বুলেটিনে প্রথাবিরোধী গল্প -কবিতা ছাপা হ'ত। তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই 'এই দশকে'র কবিরা ক্রমে আলাদা হতে থাকলে বন্ধ হয়ে গেল পত্রিকার প্রকাশ। কবিরা ১৯৬৫ তে 'শ্রুতি' আন্দোলনে সামিল হলেন। গল্পকাররা আবার ১৯৬৬ সালের মার্চে বের করলেন শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলনের মুখপত্র 'এই দশক'। শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলনের লেখক ছিলেন প্রধানত পাঁচ জন। রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ, শেখর বসু ও কল্যান সেন। পরবর্তী কালে 'এই দশক' গোষ্ঠীতে আসেন আরও তিন জন অমল চন্দ, বলরাম বসাক এবং সুনীল জানার মত লেখকরা। দু-দশক ধরে (প্রথমে নিয়মিত পরে অনিয়মিত) প্রকাশিত এই পত্রিকার চব্বিশটি সংখ্যাই শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের মূল্যবান দলিল বলা চলে।

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন জাত ছোটগল্পগুলি বাংলা ছোটগল্পের যে বাঁকবদল ঘটিয়েছিল তা অন্যান্য সাহিত্যিক বাঁকবদলগুলোর থেকে অনেকটাই আলাদা। মেকি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা নয়, প্রতিষ্ঠার তোয়াক্কা না করে শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা গল্পে গল্পে নিজেদের বার বার ভেঙেছেন। অন্তরাত্মার জটিল অনুভব তাদের গল্পের বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। অনিবার্য ভাবে আঙ্গিকেও এসেছে নতুনত্ব। আন্দোলনে সামিল গল্পকারদের মতে, গল্পের উদ্দেশ্য কোনো কাহিনি বর্ণনা নয়, অদ্ভুত চরিত্র উপস্থাপন করা নয়, বিশেষ মনস্তত্ব ব্যাখ্যা বা সামাজিক আলোচনা নয়, শুধু আপন অন্তর্জীবনই হবে গল্পের বিষয়। আন্দোলনকারীরা বললেন শিল্প সৃষ্টির অন্যতম উপাদান যে ভাষা তা প্রায়ই অযথার্থ ও সংকীর্ণ, মিশ্র অস্পষ্ট অনুভব প্রকাশে অক্ষম। এরকম বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ভাবনার ফলশ্রুতিতেই সংগঠিত হয়েছিল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন।

এখন এই শাস্ত্রবিরোধী তথা "এই দশক" লেখক গোষ্ঠীর গল্প ভাবনা এবং বিষয়-বিন্যাসের অভিনবত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গল্পগুলি যেভাবে ভিন্ন ধারার প্রবাহিত হয়েছে তা দেখব।

**রমানাথ রায় ঃ**

"গতকাল পর্যন্ত আমরা ছিলাম অন্ধ। শাস্ত্রের হাতে বন্দী। আজকে আর কোনো তত্ত্ব দিয়ে নয়, খোলা চোখে সবকিছু দেখব। সমস্ত সংস্কার বর্জন করব। পুড়িয়ে ফেলব সমস্ত শাস্ত্রকে। কী দিয়েছে শাস্ত্র ? কি দিয়েছে ঐসব ধার্মিক, পন্ডিত আর দার্শনিকের দল ?"[১]

যে রমানাথ রায় সোজা কথাকে এতটাই সোজাসুজি বলতে পারেন, সেই রমানাথ এবং তার গল্প উভয়ই যে স্বতন্ত্র হবে এটাই স্বাভাবিক। গল্প আন্দোলনের ইতিহাসে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন বাংলা ছোটগল্পের ধারাকে যতটা আন্দোলিত করেছিল, ততটাই বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছিলেন রমানাথ রায়। আর তাই, যে সকল গল্পকার শাস্ত্রবিরোধী আখ্যা নিয়েছেন, গল্প শোনাচ্ছেন, তাদেরই অন্যতম একজন রমানাথ।

'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় রমানাথ রায়ের প্রথম গল্প 'বলার আছে'। কথায় বা লেখায় বলে ফেলার তাগিদই রয়েছে গল্প জুড়ে। কিন্তু বলা কথারই হদিস নেই। যতি ছেদ কিছুই নেই অথচ রমানাথের ভাষা ও ভাবনার সঙ্গে বিচ্ছেদ গড়ে ওঠেনি এতটুকু। বলে ফেলার এক অস্থির আবেগে আপ্লুত গল্পটি যেন স্বপ্নভাঙ্গা নির্ঝরের মতো। পারিপার্শিক বিরুদ্ধতায় বলা আর হয়ে ওঠে না কিছুতেই। তিনি যে পারিপার্শিকের বিরুদ্ধেই বলতে চান। তাই রমানাথ লেখেন—

'আমি বলব বিরুদ্ধে সবার বিরুদ্ধে .... সবকিছুর বিরুদ্ধে গাছের পাতা গজানোর বিরুদ্ধে ঝরে পড়ার বিরুদ্ধে যৌবনের বিরুদ্ধে বার্ধক্যের বিরুদ্ধে সূর্যের বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিরুদ্ধে তোমার বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে সকলের বিরুদ্ধে'।[২]





এই ঘোষিত বিরুদ্ধতায় বলা কথাটি অঘোষিত থেকে যায় বার বার। মুখে কিংবা লিখে বলার একান্ত ইচ্ছে অসহায় পরিস্থিতি তৈরি করে মাত্র। অথচ সে পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার নাম মাত্র তাগিদে গড়ে ওঠে বলার আগ্রহে, অন্তত বলাটা যখন এইটাই জরুরি 'আমি বলব আমার কিছু বলার আছে আমি এতকাল পারিনি আজ পারবো পারতেই হবে'। এহেন প্রতিজ্ঞা আর নিখুঁত প্রস্তুতির পরেও গল্পটির আচমকাই পর্ব বদলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বিষণতায় বিভোর হয়ে যায় গল্পের কথক 'আমি। আসলে গল্পের মধ্যে কোথাও একটা নিজেকেই খুঁজে চলেন রমানাথ। তাই তার "বলার আছে" গল্পটি উত্তম পুরুষই হয়ে ওঠে। নিজস্ব সত্তাকে বর্তমানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার আক্ষেপ, হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা তাকে ক্রমশ বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। 'বলার আছে'র পরিণতিতে তাই ই দেখা যাচ্ছে। এ গল্পের কথক "আমি" তথা রমানাথের এই বিচ্ছিন্ন বা একাকী হয়ে যাওয়া যেন সময়েরই দায় হয়ে রয়ে যায় ।

একথা বলাই যায় যে রমানাথ রায়ের 'এই দশক' পর্যায়ের গল্পগুলি আর যাই হোক কাহিনিলোভী পাঠককে কখনই তৃপ্তি দিতে পারে নি। 'বলার আছে' 'গোগা' 'কোকো', 'গাড়ি, 'ধুলো, 'জাল কলকাতা' প্রতিটা গল্পেই তিনি বেছে নিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন বলার ধরন। শব্দের বা বাক্যবন্ধের পুনরাবৃত্তিতে ধরতে চেয়েছেন দিন যাপনের ক্লান্তি। চরিত্রের অর্থহীন নাম ব্যবহার করে তিনি নামকে গুরুত্বহীন করে তুলতে চেয়েছেন। গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন চরিত্রের অন্তর্জগতকে। এখানেই তিনি বেরিয়ে এলেন প্রচলিত সাহিত্যের গোঁড়ামি, সংস্কার কিংবা নিয়মের বেড়াজাল থেকে। আর এভাবেই তিনি সাহিত্যকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন নতুন এক জগতে। নতুন এক ভবিষ্যতে।

**সুব্রত সেনগুপ্ত ঃ**

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যে সকল ব্যক্তি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাদের মধ্যে অন্যতম একজন সুব্রত সেনগুপ্ত। সমস্ত রকমের পুরোন ফর্ম,'কন্টেন্ট', 'স্টাইল,'সিস্টেমকে' নস্যাৎ করে দিয়ে নতুন এক রীতিতে মেতে উঠলেন সুব্রত। এতেই তুলে ধরলেন জীবনের আকর দিকটি। তবে শুধু কোন এক গোষ্ঠীর রীতিতে গা ভাসিয়ে মেতে উঠে নয়, নিজস্ব রীতিতে, বৈশিষ্ট্যে আলাদা হলেন সুব্রত। এমন কি প্রকরণ, বিন্যাস, ভাবনা ও আঙ্গিকেও। লেখক বিশ্বাস করতেন —

"শিল্পীর ভূমিকা নিছক গল্প শোনানো মাত্র নয়, এর থেকে বহু দূরে। কাহিনী, গল্পের বিভিন্ন উপকরণ গুলির একটি মাত্র। যা প্রয়োজনে পরিহার করা চলে।"[৩]

যুগ যুগ ধরে গল্প লেখার অলিখিত নিয়ম নীতি গড়ে উঠেছিল। সেই নিয়মে সুব্রত বাঁধতে পারেননি নিজের অন্তরের ভাঙা গড়া। তাই তাকে খুঁজতে হয়েছিল প্রকাশের ভিন্ন পথ। কাহিনি, উপকাহিনি, শাখাকাহিনীর মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া গল্পলোভী পাঠককে,

ভালোবাসা বাস্তবতা মনস্তত্ত্বের কাহিনি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া পাঠককে তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। আর তাই ব্যক্তি অভিজ্ঞতাকেই তিনি গল্প বানিয়ে তুললেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

"এই দশকের" প্রথম সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৬৬) প্রকাশিত হয় একটি গল্প 'চারিদিকে'। গল্পটি বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। এখানেও গল্পের চরিত্র 'সে'। হঠাৎ মাঝরাস্তায় একটি বাসের 'তাকে' নামিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া। তারপর পরের বাসে উঠে চলে যাওয়ার ইচ্ছে দিয়েই গল্পের শুরু এবং জটিল মনস্তত্ত্বের এক আশ্চর্যজনক দোলাচলের শুরু। মুহুর্মুহু বদলে যায় সিদ্ধান্ত এবং আসে একটি করে প্রতিবন্ধকতা। উন্মোচিত হয় অন্তর্জগত। গল্পের সে ক্রমশ স্থবির হতে শুরু করে।

গল্পটিতে বস্তুজগতের খবর আসার মূল চারটি মাধ্যম চোখ-কান-নাক-জিভ লুপ্ত হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয়ময়তা থেকে গল্পটি ক্রমশ প্রবেশ করেছে ইন্দ্রিয়হীনতায়। এই ইন্দ্রিয়গুলো লোপ পেলে ব্যক্তি যেমন বাধ্য হয় বস্তুজগৎ থেকে অন্তর্জগতে বন্দী হয়ে যেতে এখানেও ঠিক তেমনই হয়েছে। 'সে' এর ইন্দ্রিয়হীনতাই জন্ম দিয়েছে চরম শূন্যতার। এভাবেই "সে" তথা লেখক আপন অন্তর্জীবনের সুগভীর অভিজ্ঞতা তুলে এনেছেন আলোচ্য গল্পে। ইন্দ্রিয়বাস্তব সন্ধান দিয়েছে প্রকৃত বাস্তবের।

**আশিস ঘোষ ঃ**

নিটোল গল্প রচনার সহজলভ্য কৌশলকে হেলায় পরিহার করে আখ্যানগত রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে, নতুন রীতির গল্প সৃষ্টির প্রয়াস বাংলা ছোটগল্পে দেখা গেছে, অনেক আগে থেকেই। এই দশক গোষ্ঠীর শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা সেই প্রয়াসকে সূচনাবিন্দু রূপে গ্রহণ করে, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার, ভিন্ন বিষয় ভাবনা ও রীতিবোধের সঞ্চারে নতুন দিগন্তের সন্ধান করলেন। আর এদেরই একজন আশিস ঘোষ। যিনি বিশ্বাস করতেন—

'আমাদের আন্তরিক জীবনটাই হচ্ছে আমাদের গল্পের বিষয়। গল্পকে আমরা সব দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে একেবারে নিরঙ্কুশ করতে চাই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি শিল্পের কোনো বিশেষ কনটেন্ট থাকতে পারে না। লেখক আর যাই হন না কেন তিনি বক্তা নন। তিনি কোন 'বাণী' নিয়েও আসেন না বা তার কোনো বিশেষ বক্তব্যও থাকতে পারে না, যার জন্য তিনি কলম ধরবেন।"[৪]

এমন বলিষ্ঠ উচ্চারণেই তিনি গতানুগতিকতা থেকে আলাদা হয়েছেন। এভাবেই তিনি সংজ্ঞার বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন। আর এখানেই তার ছোটগল্প হয়ে উঠেছে কবিতার মত স্বাধীন, মুক্ত।

আশিস ঘোষের ছোটগল্প, বিশেষ করে প্রথম দিকের 'এই দশকে'প্রকাশিত একটি ছোটগল্প "খুন" (পঞ্চম সংকলন, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪)। 'খুন' গল্পে লেখকের বর্ণনার নৈপুণ্যে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

প্রায় একটি রহস্য কাহিনির বুনট ফুটে ওঠে। তবে গল্পটি অনেকটা আত্মহননের রূপক আখ্যান বলা চলে। গল্পটির দুটি চরিত্র 'আমি' আর "সে"। এখানে দ্বিতীয় তথা অভ্যন্তর সত্ত্বা, যে সচেতন, বিচারক্ষম, জাগ্রত, বিবেকপ্রতিম ওর গোটা শরীরটা কাঁপছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আবছা আলোয় রক্ত আর ধুলোতে মিশে ও ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে। ক্ষত জায়গাগুলোর মুখ থেকে "এমন একটা শব্দ হচ্ছে যেন মনে হয় তা আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। এই আকস্মিক হনন কাণ্ডে ব্যক্তি সত্ত্বা খণ্ডিত হয়ে তমসায় ডুবে যায়। সকল সংবেদনা তথা প্রাণসত্ত্বা লোপ পায়।"

**শেখর বসু ঃ**

প্রাথমিক ভাবে "শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে"র সূত্রপাত যে পাঁচজন লেখকের হাতে, তাদর মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন শেখর বসু। তার গল্পগুলি শুধুমাত্র বিষয়বস্তু ধরে নিয়ে বোঝা কঠিন। গল্পের ভাষা সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বাক্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্নধর্মী। কখনও একটি বা দুটি শব্দেই বাক্য শেষ। আসলে তিনি লেখার ক্ষেত্রে চিরকালই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি বলতে পারেন —

"আমাদের শাস্ত্রবিরোধিতার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমরা শাস্ত্র বলে বোঝাতে চেয়েছিলাম সাহিত্যের বহু চর্চিত প্রচলিত ধারাকে। ওই ধারাটি মুক্তি দেওয়ার বদলে শৃঙ্খল পরিয়ে দেয় হাতে। তার ফলে সাহিত্যের বিকাশ রুদ্ধ হয় এবং লেখকের পক্ষে মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। আমরা সাহিত্য করতে এসে প্রথমেই যা চেয়েছিলাম তা হল সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা।"[৫]

'এই দশক' পত্রিকার সপ্তম সংকলনে (শ্রাবণ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয় 'অথচ'গল্পটি। যা প্রচলিত গল্পের থেকে অনেকটাই আলাদা। তবে অন্যান্য শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের মত এখানেও গল্পের চরিত্র 'আমি'। তবে আমি অস্তিত্ব সংকটের শিকার হলেও এখানে তা এতটা তীব্র হয়ে ওঠেনি। তবে বোঝা যায় 'আমি' তার প্রেমিকাকে খুঁজছে। খোঁজটি আন্তরিক, কিন্তু অদ্ভুত।

"অথচ" গল্পের কথক রোদ্দুর মাথায় করে প্রেমিকাকে খুঁজতে গিয়ে পৌঁছেছেন একটি অন্ধকার ঘরে। অভ্যর্থনাহীন সে ঘরে ঢুকে সেখানে পরিচিত হয়েছে একজন বলিষ্ঠ অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে। ভয়ে আর বিস্ময়ে কথকের ইন্দ্রিয়গুলি প্রায় অসার হয়ে গেছে। অতিপ্রাকৃত পরিবেশে ভয়ঙ্কর মানুষটির নির্দেশ মত মেঝেতে ফুটে ওঠা অজস্র পায়ের ছাপ থেকে সে খুঁজে নিতে চেয়েছে তার প্রেমিকার সন্ধান। কিন্তু পারেনি। পারা সম্ভব নয় সেটা বুঝে গেছে। পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে কথক ঢুকে পড়েছেন অন্য এক জগতে। অবশেষে ঘরে জ্বলে ওঠে আলো। প্রেমিকাকে চিনে নিতে বলা হয় তাকে। তাতেও সে ব্যর্থ হয়। সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বিচিত্র শব্দ-দৃশ্যগন্ধের মাঝে। আলোচ্য গল্পে কথকের উদ্ভ্রান্ত

আচরণই তার মনের কথাটির হদিস দেয়। যাকে সে ভালোবাসে তার পারিপার্শ্বিক খবরদারি সে সহ্য করতে চায়নি। গল্পটিতে তেমন চমকপ্রদ কোনো গল্প নেই অথচ একটি উদ্ভট কাহিনীর আশ্রয়ে মানুষের ভিতর ও বাইরের দ্বন্দ্ব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

**কল্যাণ সেন ঃ**

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের মধ্যে কল্যান সেন নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্য কোন ধরনের গল্পের কথা তিনি ভাবেননি। অন্তর্মুখ স্বভাবের এই স্বল্পভাষী লেখক মনের ভিতরের উপলব্ধিকে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল থাকতেন প্রতিনিয়ত। তবে সে লেখা সবসময় পাঠকের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেনি। তার একটি কারণ অবশ্যই গল্পের মধ্যে গল্পহীনতা হতেই পারে। তবে তিনি মনে করেন তখনও পাঠকের কার্যকারণ, শৃঙ্খলা বিন্যাসের তথা আঙ্গিকের পূর্ব পরিকল্পিত রূপের মোহভঙ্গ না হওয়া। আসলে "আঙ্গিক" ব্যাপারটিকেই বাহ্যিক ভাবে অস্বীকার করতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর কথায়—

"অন্তর্নিহিত কয়েকটি প্রক্রিয়ার টানাপোড়েনেই শেষ পর্যন্ত একটি গল্প তার চরিত্র অর্জন করে বা বলা যায় শেষ পর্যন্ত "গল্প" হয়ে ওঠে। তাই ব্যাকরণের 'ণত্ববিধান' অথবা 'তদ্ধিত প্রত্যয়ের' মত বাইরে থেকে 'আঙ্গিক'কে প্রকাশ অথবা প্রমান করার চেষ্টা শুধু অপচেষ্টাই নয়, হাস্যকরও।"[৬]

কল্যাণ সেনের গল্পের দিকে তাকালে আমরা অবশ্যই দেখতে পাব এক নিভৃত জগৎ। সেখানে আছে বিষণ্নতা বোধ এবং একলা হ'তে হ'তে আরও একলা হয়ে যাওয়া। সর্বোপরি নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুতে ডুব দেওয়া। আর তাই যে সকল গল্পলোভী পাঠক একাকিত্বের নিভৃত জগৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসেন, ভাষার অবয়বে বিষণতাকে ছুঁতে চান তাদের কাছে কল্যান সেনের গল্প অবশ্যই অন্যরকম তৃপ্তি নিয়ে আসবে।

কল্যাণ সেনের একটি অসামান্য গল্প 'জিরাফ'। গল্পটি প্রকাশিত হয় "এই দশকে'র অষ্টাদশ সংকলনে (মাঘ, ১৩৮০)। পটভূমিতে আছে কলকাতা শহর। আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালের নগর জীবনের ছাপ। আছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষাদ ও একাকিত্ববোধ। গল্পটির প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে একটি 'জিরাফ'। তৎকালীন কলকাতা শহরের কদর্য ঘিঞ্জি পরিবেশে নীলমাধাব নামে এক ব্যক্তির সাথে পাঠকের পরিচয় করান লেখক। আর সেই নীলমাধবের সঙ্গেই আশ্চর্যভাবে জুড়ে যায় এক রহস্যময় 'জিরাফ'। এই জিরাফের অস্তিত্ব শুধুমাত্র নীলমাধবের মনেই। অন্য কোথাও তার অস্তিত্ব নেই তাই অন্যকেউ তাকে দেখতেও পায় না। আর এভাবেই একটি প্রতীকী জিরাফ এক বাস্তব মানুষের আত্মিক জগতে ছাপ ফেলে এক সুগভীর ক্ষতের মতোই চিরস্থায়ী হয়।





**অমল চন্দ ঃ**

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ, কল্যান সেন ও শেখর বসুর হাতে। এই দশকে অমল চন্দের অন্তর্ভুক্তি ঘটে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে। সেই শুরু। এতে আন্দোলনও বেশ খানিকটা শক্তিশালী হয়েছে। অমল চন্দের নিজস্ব সত্ত্বা তার গল্পে বার বার প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি নিজে বামপন্থার সমর্থক হলেও কখনোই তার গল্পে সে ছোঁয়া লাগেনি। বার বার দেখা যায় তার গল্পের চরিত্ররা বেশ খানিকটা একাকিত্বের শিকার। জাগতিক সম্পর্ক গুলো মেনে নিয়ে সেগুলো বজায় রাখতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যায় তারা। আর সেকারণেই মানুষ, পৃথিবী আর প্রতিষ্ঠান সব কিছুকেই তিনি দেখেছেন আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে, যা সাধারণের থেকে অনেকটাই আলাদা। যা বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই দুরকম সত্তাই লেখকের মধ্যে সবসময়ের জন্য বর্তমান থেকেছে।

'এগোতে লাগল' গল্পটি প্রকাশিত হয় 'এই দশকে'র একাদশ সংকলনে। গল্পের শুরুটা এই রকম—"তারপর হঠাৎ একদিন সে কোত্থেকে এসে দাঁড়াল। দরজার ভিতর দিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে দিলো। আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। আমি কিছুক্ষন কথা বলতে পারলাম না। আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম। সে হাত বাড়িয়ে দিল। দরজা দিয়ে ঢুকে তার হাত আমার টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে এল আমি সরে গেলাম। ওর হাত আরও লম্বা হতে লাগল।

এভাবেই এগিয়েছে বর্ণনা। ক্রমশ সৃষ্টি হয়েছে এক গা ছমছমে পরিবেশ। নির্মিত হয়েছে এক আতঙ্কের জগৎ। সে জগতে মূলত দুটি চরিত্র 'আমি' আর 'সে'। গোটা গল্পজুড়ে রয়েছে "আমি" কে 'সে' এর তারা করে বেড়ান। ঘরের ভেতর তার হাত, ঘরের বাইরে তার পা, রাস্তায় বুক কাঁধ, নদীর ধারে মুখ। 'আমি' নিরুপায় হয়ে প্রতি আক্রমণ করলে তার সর্বাঙ্গ তারা করে। শত আবেগ কৈফিয়ত সত্ত্বেও তার এই 'তারা" করে চলার নিবৃত্তি নেই। এটাই এক অস্তিত্বের সংকট ব্যক্তি জীবনে। আর এটাকে পাথেয় করেই সারাজীবনটা নির্বাহ করে নিতেই হয়।

**বলরাম বসাক ঃ**

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র "এই দশক" পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীতে প্রথম থেকেই ছিলেন না বলরাম বসাক। তার অন্তর্ভুক্তি ঘটে এই দশকের ষষ্ঠ সংকলনে (বৈশাখ, ১৩৭৫)। ততদিনে শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্প আন্দোলন বেশ শক্তপোক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। তার প্রথাবিরোধী মানসিকতাই তাকে নিয়ে এসেছিল এই শাস্ত্রবিরোধী লেখকগোষ্ঠীর মাঝে। আর এই অতৃপ্ত প্রথাবিরোধী মানসিকতা নিয়েই শুরু হয় তার শাস্ত্রবিরোধী পথ চলা। প্রকাশিত হয় তার প্রথম গল্প "নিষেধ"। এরপর সপ্তদশ সংকলন

পর্যন্ত প্রায় সব সংকলনেই প্রকাশিত হয়েছে তার গল্প, শুধুমাত্র নবম সংকলনটি বাদে। শুধু গল্প লেখাই নয় শাস্ত্রবিরোধী পাঠকদেরও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন 'এই দশকে'র পাতায়। কিন্তু হঠাৎ তিনি এই আন্দোলন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ব্যক্তিগত কিছু মতবিরোধের কারণে। আর তাই পরবর্তী অষ্টাদশ সংকলন (মাঘ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) থেকে তার কোনো লেখা বের হয়নি 'এই দশকের' পাতায়। 'নিষেধ' (বৈশাখ,১৩৭৫) গল্পটি উত্তম পুরুষে লেখা। নির্দিষ্ট কোন কাহিনি বলার প্রয়াস নেই গল্পটিতে। তবে কাহিনির ঘনঘটা না থাকলেও কাহিনির একটি ছায়া লক্ষ করা যায়। নিষেধ গল্পের কথক সেই 'আমি'। যে 'আমি'র জীবন সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল। আর ছিল সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গি। সে গাছ, পাতা, পাখি, ডাল সবকিছুর দিকেই বিভোর হয়ে তাকিয়ে থাকত। এ এক নিরপরাধ দৃষ্টি। যে দৃষ্টি কখন শিশুর দিকে কখনও তার মায়ের দিকে। আবার কখনও এই দৃষ্টি একই সাবলীলতায় কোনও এক নারীর দিকে। কিন্তু এতেই নেমে আসে অতর্কিত আক্রমণ।

... এই আক্রমণই প্রথম 'নিষেধ'। কথকের দৃষ্টির উপর প্রথম নিষেধ। সে অনুভব করছে কোনো কোনো দেখা অপরাধের। আর এখানেই শুরু হয় অপরাধ বোধের। শিশু কালের ছাদে ঘুড়ি ওড়ান, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা অথবা বদ ছেলের সঙ্গে মেশা এগুলো যেমন অপরাধ বলে জেনে যেতে হয় মায়ের কাছে। এটাও এক নিষেধ। কিন্তু পূর্ব মুহূর্তের অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এসে সে আবারও তাকায়। তবে এবার অবশ্য পিছন থেকে। এবার আর বাইরে থেকে আঘাত এসে তার দৃষ্টিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বরং অভিজ্ঞতা জনিত অপরাধ তার দৃষ্টিকে "নিষেধ" করে দিয়েছে। কথক তাই পিছন থেকে তাকাতে তাকাতে একসময় আবারও চোখের নিষেধ অনুভব করেন। দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে ঘটনা এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মানব সম্পর্কের মূল্যায়নকে যেভাবে বদলে ফেলে, সেভাবেই অনিবার্য হয়েছে নিষেধ গল্পের পরিনাম।

**সুনীল জানা ঃ**

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে পরবর্তীকালে যারা যোগ দিয়েছিলেন সুনীল জানা তাদের মধ্যে একজন। পুরোনো ঐতিহ্যকে পেরিয়ে এসে নতুন উদ্যমে গল্পের বাঁক বদলে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন সুনীল জানা। তার কথায়—

"শিল্প সাহিত্য এভাবেই সতত বিশুদ্ধ ও পরিণততর হয়ে ওঠে এবং ঐতিহ্য পরান্মুখ না হয়েই তার এই শুদ্ধতা লাভের প্রয়াস অন্তহীন। কিংবা উল্টোভাবেও বলা যেতে পারে যে, সব নতুন আন্দোলনই আর মূলগত ঐতিহ্যকে পূর্নবয়াণের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলে। তা না হলে তো ঐতিহ্যকে পিতৃপুরুষের গচ্ছিত সম্পদ ভেবে সযত্নে শিকেয় তুলে রেখে আপনাকে চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সন্তুষ্ট থাকত হয়।"[৭]

সুনীল জানার বেশিরভাগ গল্পেই 'আমি'র উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এক নিরুপায় অসহায়



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

'আমি'। সে আমি অতি সাধারণ, মাটির কাছাকাছি থাকা আমি। সে 'আমি' আপনি আমি বা যে কেউ হতে পারি। তার গল্পগুলোতে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সেই আমি কে কোনো না কোনো পরিস্থিতিতে খুঁজে পেয়েই যাই। আর তাই এই 'আমি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। গল্প যতই এগোতে থাকে ঘটনা, পরিস্থিতি, সংলাপ সবকিছু অনিবার্য ক্রমে একের পর এক দ্রুত রূপান্তরিত হ'তে হ'তে শেষে এক উপলব্ধিতে পৌঁছায়। আর এই উপলব্ধির তাড়নায় এক অদৃশ্য গতিই শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে গড়ে তোলে শব্দ শরীর। শব্দ শরীরই ক্রমশ গল্প হয়ে ওঠে আমাদের আন্তর্জাগতিক বিষণ্ণতায়। যা সুনীল জানার গল্পে সবচেয়ে বেশি করে পরিলক্ষিত হয়।

**তথ্যসূত্র ঃ**


১। রমানাথ রায়। খোলা চোখ ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য, এই দশক, দ্বিতীয় সংকলন, ১৩৭৩
২। রমানাথ রায়। খোলা চোখ ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য, এই দশক, দ্বিতীয় সংকলন, ১৩৭৩
৩। সুব্রত সেনগুপ্ত। আধুনিক গল্পের ভূমিকা, এই দশক, দ্বিতীয় সংকলন, ১৩৭৩
৪। আশিস ঘোষ। পালাবদল, এই দশক, তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৩
৫। শেখর বসু। শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলন, এবং মুসায়েরা, জুন-২০০৯
৬। কল্যাণ সেন। আঙ্গিক প্রসঙ্গ, এই দশক, তৃতীয় সংকলন ,১৩৭৩
৭। সুনীল জানা। আলোচনা, এই দশক, ত্রয়দশ সংকলন, কার্তিক -১৩৭৭

## প্রচেত গুপ্তের উপন্যাস 'ধুলোবালির জীবন': যৌনতা, প্রেম এবং দাম্পত্য

সম্পদ দে

আধুনিক যুগের একটি দগদগে সমস্যা বিবাহ বিচ্ছেদ। সমস্যা না বলে সমাধানও বলা যেতে পারে। নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার সমাধান। নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত এমন একটি দর্শন যা নারীর সমতা অর্জন এবং পুরুষের সমতুল্য স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। আজকের সমাজে নারী স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই দাম্পত্য গিয়ে থামে ডিভোর্সে। সময় এবং সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে মেয়েরা নিজেদের সময়োপযোগী করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। স্বাধীনতা খর্বকারী আদ্যিকালের নিয়মনীতি তারা আধুনিক শিক্ষায় এবং যুক্তিতে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না। শিক্ষার আলোকে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার যে স্ফুরণ ঘটছে তাতেই পরিবার এবং দাম্পত্যে ধরছে ভাঙন।

বর্তমান সমাজে ডিভোর্স আখছার ঘটছে। অনেকে মনে করেন নিতান্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে চলেছে। অনেকে আবার নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকে নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা বলতে নারাজ। আলোচ্য উপন্যাস প্রচেত গুপ্তের 'ধুলোবালির জীবন'-এ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে যৌন অতৃপ্তির কারণে। মানুষের অন্যান্য চাহিদার মতই যৌনতাও একটি প্রকৃতিগত জৈবিক চাহিদা। প্রতিটি নারী পুরুষেরই একটি যৌনজীবন আছে বা থাকে; সে বিবাহিতই হোক বা অবিবাহিত। যখন নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবন শুরু হয় তখন তারা নিজ নিজ স্বামী বা স্ত্রীর কাছ থেকে যৌন চাহিদা পূরণ করে। তাই স্বামী বা স্ত্রীর যৌন অতৃপ্তিও বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হতে পারে।

উপন্যাসের নায়িকা শ্রীজীতা শিক্ষিতা আধুনিক। বিবাহিত জীবনে স্বামীর সব রকম নিস্পৃহতা তাকে যন্ত্রণা দেয়। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই সে সংসার করতে এসেছিল। যদিও সাধারণভাবে সে বিয়েটা করেনি। বিয়েটা সে করেছিল একতরফা জেদ করে। বিয়ের পর সে অনুভব করে স্বামী হিসাবে বিধান অযোগ্য অক্ষম অপদার্থ ব্যক্তিত্বহীন। স্বামীর দিক থেকে সে যত নিস্পৃহতার আঘাত পেয়েছে ততই তার রান্নাঘরের উচ্ছে বেগুনে ইন্টারেস্ট চলে গেছে। বেশি করে কাজে মন দিয়ে হয়ে উঠতে চেয়েছে আর্থিক ও মানসিক ভাবে স্বনির্ভর।

বিধান ধুলোমাটির মানুষ। এই বিশ্বে তার কোন মূল্য নেই বলেই সে বিশ্বাস করে। তাইতো শ্রীজীতা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বিধানের বাড়িতে গেলে বিষম খাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল। সে তৈরি ছিলনা। একতরফা জোর করেই তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর শারীরিক মিলনে বিধানের শরীর সাড়া দিলেও মন সাড়া দেয়নি। স্ত্রীর সঙ্গে মিলন কে সে সংসারের আর পাঁচটা সাধারণ কাজের মতই দেখেছে। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীজীতা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বুঝতে পারে বিধান তার শরীরের প্রতি নিস্পৃহ, শুধু তাই নয় গোটা জীবনের প্রতি তার একধরণের উদাসীনতা রয়েছে। শ্রীজীতা বরাবর জেদি স্বাধীনচেতা মেয়ে। বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী জীবনে সে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেয়নি। সন্তান ধারণের ক্ষেত্রেও বিধানের আপত্তি সত্ত্বেও সে সন্তান কে বাঁচিয়ে রেখেছে। সংসারের অর্থকষ্ট ও স্বামীর উদাসীনতায় সে দ্রুত কাজের মধ্যে ঢুকে পরেছিল। নিজের ক্ষমতা, যোগ্যতার বেহিসাবি খরচ করেনা সে। এমনকি হাসিটুকুও মেপে খরচ করে। স্বার্থের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ মানুষের জ্বালাতন নিজেই আহ্বান করে।

বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক নারীবাদে যৌনতাকে আনন্দমূলক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখান হয়। বৈপ্লবিক নারীবাদ মনে করে বিবাহ বহির্ভূত, প্রজনন বহির্ভূত সমকামী যৌন সম্পর্ককে ভুল বা অস্বাভাবিক আখ্যা দিয়ে থাকে সমাজ। এই উপন্যাসের নায়িকা শ্রীজীতা বৈপ্লবিক নারীবাদে বিশ্বাসী বলা যেতে পারে। সমাজের পুরাতন নীতি নৈতিকতা ভেঙে স্বাধীন যৌনজীবন কাটায় সে। তার মনে হয়-"শরীর নিয়ে বস্তাপচা মূল্যবোধ আসলে এক ধরণের ভ্রান্তি, অক্ষম, অযোগ্য মানুষ এসব নিয়ে বড়াই করে। মিইয়ে যাওয়া পাপড়ের মত অর্থহীন জীবনকে তারা বলে নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র।"[১] তাই শরীর দিয়ে পুরুষকে মোহাচ্ছন্ন করে কাজ আদায় করে নিতে, অতৃপ্ত যৌন তেষ্টা মেটাতেও তার মনে কোনো দ্বিধাবোধ নেই। এটাকে সে প্রয়োজন মনে করে, আসলে জীবনকে ভোগ করাটা একটা যোগ্যতা।

অন্যদিকে উপন্যাসে আরেক নারী চরিত্র ঝুমুর। পারিবারিক অর্থকষ্টে পরে বাধ্য হয়ে যৌনতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। পুরুষ মানুষকে সে ঘেন্না করে। পুরুষের কামলোলুপ আহ্বানকে সে এড়িয়ে চলতে চায়। রাস্তা থেকে বিধানকে তুলে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে, সেবা শুশ্রুষা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছিল সে। বিধানের ছন্নছাড়া ঘরে চালডাল হাতরে ভালবেসে তাকে খিচুরি রান্না করে খাইয়ে একমুহুর্তের সংসারের সাধ পেতে চেয়েছিল। কয়েকঘন্টা বিধানের সঙ্গে থেকে সে বুঝতে পেরেছিল পুরুষ মানুষকে শুধু ঘেন্না নয় ভালবাসতেও পারে।

ব্যক্তিগত স্বাধীন জীবন কাটিয়ে শ্রীজীতার মন দেহহীন শুদ্ধ ভালোবাসার স্তরে উন্নিত হয়েছে।সেই ভালবাসা খুঁজে চলেছে শ্রীজীতা। পুরুষ বন্ধু অরণির সঙ্গে মৈথুনের চরম মুহুর্তে শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে যেতে সে ভাবে —"এই রতিক্রিয়ায় একটুও কি ভালবাসা আছে? না, নেই। শরীরের ভাললাগা ছাড়া সব ফাঁকা।"[২] 'ভালবাসার টানে বিধানের অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে কিশোরীগঞ্জ ছুটে গিয়েছে। অফিস কেরিয়ার নিয়ে অত্যন্ত কনসার্ন থাকা সত্ত্বেও নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর পরই তিনদিনের ছুটি নিয়ে বিধানের সেবা করেছে। বিধানকে ঝুমুরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার রাগ হয়েছে- "তোমার সমস্যা হচ্ছে? অন্য মেয়ের হাত ধরে গদগদ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তো সমস্যা হয়না, নাকি আমি এসে পড়ায় সেসব আটকে গিয়েছে? আমিও এখন বাইরের

মেয়ে, কিন্তু একটা সময় তো তোমার স্ত্রী ছিলাম। এই মেয়ে তোমার কে? শুধু হাত ধরেনি রেধে খাইয়েছেও”[৩] বিবাহ বিচ্ছেদের পরও বিধানকে চোর অপবাদ থেকে বের করে আনার জন্য শ্রীজীতা মরিয়া হয়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছে বিধান ধুলোমাটি মাখা একজন ভালমানুষ। আর এই মানুষটিকে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি ঝেড়ে ফেলার ভান করেছে মাত্র।

উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে একজন ধুলোমাটির মানুষ। যাকে ঘিরে রয়েছে দুটি নারী চরিত্র। একজন যৌনসুখে বঞ্চিত হয়ে তাকে ত্যাগ করলেও সম্পূর্ণ ভাবে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। আর একজন যৌনতাকে ত্যাগ করে এই মানুষটিকে ঘিরে এক মুহূর্তের সংসারের সুখ পেতে চেয়েছে। প্রচেত গুপ্ত উপন্যাসটির মধ্যে নারী স্বাধীনতা ও দাম্পত্যের এক সমন্বয় সুত্র দেখিয়েছেন। যেখানে নারী স্বাধীনতা প্রাধান্য পেলেও দাম্পত্যের প্রতি রয়েছে এক প্রচ্ছন্ন পবিত্রতা এবং ভালোবাসা। উপন্যাসের শুরুতেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক-

“জীবনের ধুলোবালি থেকে দূরে থাকা কোনও কাজের কথা নয়। একটা সময়ের পর তাকে চিনতে হয়। বেঁচে থাকার ধুলোবালি যত তাড়াতাড়ি চিনতে পারবে ততই মঙ্গল। তত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে সব ময়লা ঝেড়ে ফেলা যায় না, ঝেড়ে ফেলার ভাণ করা যায় মাত্র।”[৪]

আধুনিক যুগে তবুও ভোগসর্বস্ব জীবনের হাতছানি মানুষ উপেক্ষা করতে পারেনা। জীবনযাপনের হাজার বিলাসিতা, অবাধ যৌনতা জীবনের স্নেহ, প্রেম, মমতা ইত্যাদির মত কোমল অনুভূতিগুলি ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে অতল গহ্বরে। একালের মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বে সম্পর্কগুলোর রূপ বদলাচ্ছে। ঘুচে যাচ্ছে বৈধ অবৈধের রূপরেখা। প্রতি মুহূর্তে চলছে ব্যক্তি স্বাধীনতা খোঁজার লড়াই। প্রচেত গুপ্ত জীবনের লড়াই লড়ার জন্য ধুলো বালিকে বাদ দেননি। বরং ধুলো বালিকেই জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেখেছেন। উপন্যাসের শুরুতে জীবনের ঘটনা যা বালির কনা বলে মনে হয়েছে উপন্যাসের শেষে তা জীবনকে দিয়েছে হীরক খণ্ডের উজ্জ্বলতা।

**তথ্যসূত্র :**

১। দেশ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪২৫, পৃঃ ৩১৯
২। দেশ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪২৫, পৃঃ ৩৫৬
৩। দেশ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪২৫, পৃঃ ৩৭৬
৪। দেশ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪২৫, পৃঃ ৩১৮



# নজরুল দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

**ড. অরুণাভ মুখার্জী**

বাংলা কাব্যাকাশের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। একজন সূর্য, অপরজন চন্দ্র। রবিজ্যোতি ও নজরুল-চন্দ্রিমার সমন্বিত কিরণে বাংলা সাহিত্যবিশ্ব আলোকদীপ্ত ও মহৎ মহিমায় আকীর্ণ। উদ্বেলিত যৌবনোচ্ছ্বাসে আত্মহারা কবি কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীন জাতির বুকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজ প্রতিভার স্বতন্ত্র দীপখানি জ্বালালেও রবি-জ্যোতির আলোকে তাঁর হৃদয় হয়েছে মুগ্ধ বিভোর ও তন্দ্রাতুর। আর সেই মুগ্ধতার প্রকাশ বর্তিকা ‘নজরুল দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ’ এই শিরোনামে আলোচ্য রচনায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

‘রবীন্দ্র-যুগ’ বলতে আমরা ১৮৬১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে ধরে থাকি। এই সময় আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্র-নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়তির মতো বাঙালির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিচালিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন — “কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই”১। আর এই সময় পর্বেই বস্তুত ১৯১৯-’২০ সাল থেকে ১৯৩০-’৩১ সাল পর্যন্ত নজরুলের সাহিত্য সাধনার উৎকৃষ্ট সময়। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে নজরুল কেবলমাত্র কয়েকখানি কবিতাই শুধু রচনা করেন নি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর ভাবের গুরু, তাঁর আদর্শের গুরু। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র ভাব-ভাবনা তাঁকে আজীবন যেমন অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনি, নজরুলের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র কবি বা ঋষি ছিলেন না, নজরুলের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ‘প্রিয় পরমসুন্দর’—

“বক্ষে তব চির-রূপ-রসবিলাসীরে!
হারায়ে ফেলেছি সেথা সত্তা আপনার
কাঁদিয়াছি রূপমুগ্ধা রাধিকার মতো।
হে কবি, আজিও শুনি সে চির-কিশোর
তোমার বেণুতে গাহে যৌবনের গান।
সেথা তুমি কবি নও, ঋষি নহ তুমি,
সেথা তুমি মোর প্রিয় পরম সুন্দর!”

(‘অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি’, ‘নতুন চাঁদ’)

আসলে নজরুল ছিলেন ‘রবীন্দ্র-বহ্নিলোকে ঝড়ের পাখি’। কবিতার ক্ষেত্র ছাড়াও নজরুলের গান-গল্প-উপন্যাস-নাটক-চিঠিপত্র-অভিভাষণ—সর্বত্রই একটা রবীন্দ্রভাব -পরিমণ্ডল আমরা লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুলের অকপট স্বীকারোক্তি — “বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে, .... ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধধূপ ফুল চন্দন দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করেছি”[২]।

এককথায় নজরুল ছিলেন একনিষ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত। আর তাঁর এই ভক্তির অর্ঘ্য কখনো প্রগাঢ় শ্রদ্ধায়, কখনো বা অভিমান ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় বর্ষিত হয়েছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের চরণকমলে।

রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি আত্মসাৎ না করলেও বাল্যাবস্থা থেকেই নজরুল ছিলেন গভীর রবীন্দ্র-অনুরাগী। লেটো দলে গান গাওয়ার সময় থেকেই রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার গভীর প্রবণতা বালক নজরুলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথের ‘আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি’ গানটি প্রায়ই নজরুলের কণ্ঠে শোনা যেত।[৩] বারো-তেরো বছর বয়সে বালক নজরুলের লেখা একটি লেটো গানে ‘রবি’ বন্দনার চমৎকার নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি —

“নিষ্প্রভ এ শশী, তব বদন শশী,
বেরুল না হাসি, শশিমুখে।
পূরব আকাশে রবি প্রায় সমাগত।
কোকিলা ঝংকারে কুহু অবিরত।
তব মুখের আভা যেন বিদ্যুৎ প্রভা
পরিণত শোভা ক্ষীণালোকে।।....”[৪]

এখানে লক্ষণীয়, তৎকালীন যুগ পরিবেশে, যখন পরাধীন জাতির জীবন-আলো প্রায় নিষ্প্রভ, সেই সময় ‘পূরব আকাশে’ সমুপস্থিত ‘রবির কিরণ’ জাতির অন্তঃসত্তাকে কীভাবে জাগরিত করে দিতে পারে, আভাসে যেন সেই তথ্যই এখানে পরিবেশিত করেছেন নজরুল। সত্যিই ‘বাল্যকাল থেকে গ্রাম বাংলার একটি ছোট্টগ্রাম চুরুলিয়াই বসে লেটোগান, বাউল গান, শ্যামাসংগীত, ইসলামী ধর্মসংগীত শোনার মাঝখানে কখন তাঁর মনে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের জন্য গেঁথে গেছে, তার খবর তিনি ছাড়া আর কেউ হয়তো জানতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ছবি সামনে রেখে সকাল-সন্ধ্যা ধূপদীপ জ্বেলে আরাধনার মধ্যে নিজেকে রবীন্দ্রময় করে তোলার যে বাসনা, তা বাল্যকালে নিছক বালকোচিত খেয়াল মনে হলেও রবীন্দ্র-ভাবাদর্শ তাঁকে শেষদিন পর্যন্ত অনুভাবিত করেছে’।[৫] বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলের ভাবের গুরু — আদর্শের গুরু, একথা নজরুলের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক জীবনের বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্র প্রীতিই নজরুলকে প্রথম সুপরিচিত করে তোলে সুদূর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর সিমলা গ্রামের নিকটবর্তী দরিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯১৪ সালে নজরুল যখন উক্ত বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন সেখানে শিক্ষক মহিমচন্দ্র খাসনবিসের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে নজরুল বিনা মহড়ায় তাঁর মানসগুরু রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি’ ও ‘পুরাতন ভৃত্য’ কবিতা দুটি আবেগ ভরা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

কণ্ঠে আবৃত্তি করে একদিকে যেমন উপস্থিত শোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন, অন্যদিকে সেই সময় থেকেই নিজের রবীন্দ্র অনুরাগী মনের পরিচয় দিয়েছেন।

নজরুলের রবীন্দ্র-ভক্তির প্রগাঢ়ত্বের আরো একটি উৎকট অথচ উজ্জ্বল প্রমাণ রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলের ছাত্রাবস্থার একটা ঘটনা, যার জন্য কয়েক ঘণ্টা নজরুল আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে যখন নজরুল চরম খ্যাতির শীর্ষে হুগলিতে অবস্থান করছেন, তখন সেই বন্ধুই তাঁকে বলেছিলেন, ‘তোর হাতের আঘাত আজ আমার কপালের জয়টীকা হয়ে রইল’।[৬] পরবর্তীকালে প্রবন্ধের মধ্যে নজরুল উপরিউক্ত ঘটনায় স্বীকারোক্তি দিয়ে লিখেছেন — “এমন কী আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্রবিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজও অক্ষয় হয়ে লেখা আছে! এবং সেই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরে পড়েছিল।.... আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ কথা ফাঁস করে দিলেন। কবি হেসে বললেন, ‘যাক, আমার আর ভয় নেই তা হলে!’”[৭] প্রসঙ্গত মনে পড়ে সাহিত্যিক ও সমালোচক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি। তাঁর ভাষায় — “এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে, সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে, সুর স্রষ্টাদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই অনায়াস স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে গেছেন রবীন্দ্র-প্রভাবের মন্ত্রপূত গণ্ডী। বাংলা কাব্য সাহিত্যে, বাংলার সঙ্গীতে, বাংলার সুর সৃজন লোকে নজরুলের নেই কোনো পিতৃপুরুষ, নেই কোনো উত্তরাধিকার”।[৮] অথচ এই স্বাতন্ত্র্য সমুজ্জ্বল নজরুল যে কতবড় রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলেন, তা তাঁর কাব্য সাধনার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়েই সুস্পষ্ট।

নজরুলের প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ (১৩২৩ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা) রচনার আঙ্গিক, লেটো গানের ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন, করাচি সেনানিবাসে থাকাকালীন নিজের কাছে রবীন্দ্র স্বর লিপির বই রাখা, পত্রপত্রিকায় ও উপন্যাসে রবীন্দ্র সংগীত এবং কবিতাকে শিরোনামে ‘কোড’ হিসাবে ব্যবহার প্রভৃতি নজরুলের রবীন্দ্র শ্রদ্ধার নিদর্শন বহন করে। যেমন, ‘ব্যথার দান’ গ্রন্থে দারার মুখে রবীন্দ্র সংগীত —

“তুমি আমারই যে তুমি আমারই
মম বিজন জীবন-বিহারী”

অথবা, ‘সয়ফুল-মুলকের কথায়’ —

“আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া মোর এ জগতে আর কেহ নাই, কিছু নাই গো!”

‘উপেক্ষিত শক্তির উদবোধন’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রবাণী —

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান”।

প্রভৃতি উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, নজরুল রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার তো করেনই নি; বিপরীতে রবীন্দ্র ভাবনাই ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস বিন্দু - মূলীভূত শক্তি।

আবার নজরুলের কবিতার সর্বপ্রথম সৃজনমূলক সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়। সম্ভবত এই সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছ থেকেই রবীন্দ্রনাথ নজরুল-প্রতিভা সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবহিত হন। পরে নজরুলের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কথোপকথনে তা বিবৃত হয়ে রয়েছে — "সত্যি বলতে কি' বললেন সত্যেনদা, গুরুদেবই আমাকে একদিন নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছি কি না'! তাঁর মতে 'ভাবের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনায় এই এক নতুন অবদান আনছ তুমি'।[৯] আসলে নজরুলের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'শ্রীচরণারবিন্দেষু গুরুদেব' আর রবীন্দ্রনাথের কাছে নজরুল 'স্নেহভাজনেষু'। তবে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎ-সমাচারের বিষয়টি আজও প্রহেলিকাপূর্ণ। এই বিষয়ে আমার "নজরুলের চেতনায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎসমাচারের বিষয়টি গবেষণাধর্মী ভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। যাই হোক রবীন্দ্র-নজরুল এই সম্পর্ক অন্তরে অন্তরে নজরুলকে যেমন সমৃদ্ধ করেছিল, অনুরূপভাবে এর ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য। নজরুল তাঁর 'আমার কৈফিয়ৎ', 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি', 'বড়োর পিরিতি বালির বাঁধ' প্রভৃতি রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথকে চিরকালীন কবির মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় নজরুলের বক্তব্য —

"গুরু ক'ন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা! ....
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে"।

'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে 'মহাকবি' আখ্যা দিয়ে নজরুলের নিবেদন —

"সঞ্চিত যে আছে আজও স্মৃতির দেউলে
তব স্নেহ করুণা তোমার, মহাকবি!
ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম"

নিজেকে বিশ্লেষিত করতেও নজরুল রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে লিখেছেন —

"দ্রষ্টা তুমি দেখিতেছ আমাতে যে জ্যোতি
সে জ্যোতি হয়েছে লীন কৃষ্ণঘনরূপে!
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্বাদে!"





তবে এও উল্লেখ্য যে, এই উভয় কবির স্নেহ-মধুর সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষের বিষবাষ্প 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' সংঘটিত করেছিলেন 'মুরগী' বা 'সজনে'-রূপি কিছু রবীন্দ্র-বিদূষকবর্গ। আর এই বিষবাষ্প ছড়ানো সাহিত্যাকাশে ব্যথিত নজরুল তার 'শ্রীচরণারবিন্দেষু গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একরাশ অভিমান নিয়ে লিখলেন 'বড়োর পিরিতি বালির বাঁধ' শিরোনামে একখানি প্রবন্ধ। অভিমান ক্ষুব্দ এই রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুল নিজের শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুভবকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছেন, লিখেছেন —

"বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘোরাতে দেখলে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। .......

কবিগুরুর চরণে, ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন—যদি আমাদের দোষ-ত্রুটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নেব। ... বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন রবিলোক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহু উর্দ্ধে"।[১০]

বাস্তবিকভাবেই রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভকে নজরুল নিজের ভাগ্য বলে মনে করতেন; রবীন্দ্র প্রশংসায় নিজে উচ্ছ্বসিত অনুভব করতেন; রবীন্দ্র অনুযোগে নিজেকে গৌরবান্বিত করতেন; রবীন্দ্র দর্শনকে পূজা মনে করে তাঁর আশিসকে দেবতার বরদান বলে মনে করতেন নজরুল।

আসলে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকার মধ্যদিয়ে নতুন যুগের সাহিত্য কান্ডারীকে একদিন খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আহ্বান করেছিলেন বসন্তের দূত, নবযৌবনকে; যা সুপ্তিমগ্ন বাঙালি জাতিকে যাবতীয় সংকীর্ণতা ও জড়তা থেকে জাগিয়ে তুলবে প্রবল ঝাঁকুনিতে। 'আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'— 'সবুজপত্রে'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'সবুজের অভিযান' কবিতায় যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল রবীন্দ্রন্ট্রে, নজরুলের মধ্যে সেই চিরযৌবনের দূতকেই প্রত্যক্ষ করে 'ধূমকেতু'র মর্মকথা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ —

"কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,......
২৪শে শ্রাবণ, ১৯২৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা থেকেই, প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নামের ঠিক নিচে সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপরেই রবীন্দ্রনাথ হস্তলিখিত কবিতাটি ব্লক করে মুদ্রিত করা হতো রবীন্দ্র শুভেচ্ছার নির্দেশক রূপে। নজরুলের ধূমকেতু ঘোষণা করলো "রবীন্দ্রনাথ ... বাঙ্গালার দেবতা, (তাঁর) পূজার জন্য বাঙ্গালার চোখের জল চির নিবেদিত থাকবে" ('ধূমকেতু', সম্পাদকীয়, ১৪ই কার্তিক, ১৩২৯ সংখ্যা)। আবার দেখি, নজরুল পরিচালিত 'The Labour Swaraj

Party of the Indian National Congress' বা 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজদল'- এর মুখপত্র 'লাঙ্গল' পত্রিকার প্রচ্ছদপটেও তিনি শিরোভূষণ করেছেন রবীন্দ্র আশীর্বচন—

"ধর হাল বলরাম আন তব মরু-ভাঙ্গা হল
বল দাও ফল দাও স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল"।

নজরুল পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যেমন রবীন্দ্র আশিসকে পাথেয় করেছেন, অনুরূপভাবে বিভিন্ন কবিতা-কাব্যগ্রন্থের নামকরণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন। সম্ভবত তিনি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' নামকরণে 'অগ্নিবীণা' শব্দটি গ্রহণ করেন কবিগুরুর গানের পংক্তি — "অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে' এই উৎস থেকে। আবার 'সঞ্চিতা'র উৎসর্গ পত্রে বিশ্বকবির করকমলে বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে লেখেন —

"বিশ্বকবি সম্রাট
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু"।

নিজের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য সবচেয়ে শ্রদ্ধার জনকেই উৎসর্গ করেছিলেন নজরুল। আবার নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার নামকরণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'কাঙালিনী' কবিতাটির প্রভাব লক্ষণীয়। এই কবিতায় নজরুল রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে তীর্যকভাবে লিখেছেন—

"রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে,
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধ কারার বন্ধ ঘরে।"।

বস্তুত নজরুলের এই অভিযোগ বহুদিন পর রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁর 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের 'ঐকতান' কবিতায়। কবিগুরু লিখেছেন—

"তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অসম্পূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

যদিও আমরা মনে করি, এ কবির দীনতা নয়, মনের ঔদার্যের কাব্যিক প্রকাশ; তবুও রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে নজরুলের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট সমালোচনা আমাদের বিস্মিত করে। আবার নজরুল কত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে জেনেছিলেন, তার নিদর্শন নজরুলের 'চক্রবাক' কাব্য গ্রন্থের '১৪০০' সাল কবিতায় ধরা পড়েছে—

"আজি হতে শতবর্ষ আগে
হে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের
শত অনুরাগে,
আজি হতে শতবর্ষ আগে! ..."





রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা কত গভীর হলে কথা বলা যায় তা সহজেই অনুমেয়। আবার বিনম্র চিত্তে স্মরণ করেছেন কবিগুরুর সহৃদয়তার কথা। 'নবযৌবনের প্রতীক' কবিকে ঋতুরাজ বসন্তের জয়মাল্য পরিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখলেন -

"উৎসর্গ
শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম
স্নেহভাজনেষু"
১০ই ফাগুন, ১৩২৯"[১১]

এর পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের 'চোখের জল চোখেই শুকিয়ে যায়'। 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে নজরুল জানালেন -

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব জ্বালা-যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। .... আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার 'সুন্দরের' আশীর্বাদ এসেছিল জেলের যন্ত্রণা ক্লেশ দূর করতে"।[১২]

আর এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও প্রণিধান যোগ্য — "নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ পত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করেনি, অবজ্ঞা ভরে চোখ বুলিয়েছে মাত্র। ....... কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের অদ্ভুত আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন এই সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনাই যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐক্যতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করতে হবে বৈ কি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত"।[১৩] রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন নজরুল হচ্ছেন নবভাব ও আদর্শের প্রতীক। তাই জেলে থাকাকালীন নজরুল প্রয়োপবেশন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ না করে টেলিগ্রাম লিখলেন — "Give up hunger strike–our literature claims you"।

কারাগার জীবনে নজরুলের রবীন্দ্র বিভোরতার আরও এক প্রগাঢ় আলেখ্য পাওয়া যায় নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে' (১৩৭৭) গ্রন্থে। তাঁর কারা বিবরণী থেকে জানতে পারি — "তাদের অবরুদ্ধ জীবনে প্রায়ই মুক্তির দূত হয়ে আসত নজরুলের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান।... 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' দিয়ে সূচনা, সঙ্গে গোটা শরৎ বন্দনা। রবীন্দ্রনাথকে সশরীরে টেনে এনেছেন কাজী জেলখানার মধ্যে। ... কাজী বলছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথা। ভারতবর্ষ কোনদিনই কবির কাঙ্গাল নয়। ... ছিলেন

বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস। ... 'তবুও'.. - 'রবীন্দ্রনাথের সমতুল সম্ভবত কেউ নয়'। 'কেউ নয়? কেন'? প্রশ্ন করলে কাজীর উত্তর - 'কেউ নয়, কারণ এঁরা সবাই ছিলেন শুধু সাহিত্যিকই। কেউ কবি, কেউ বা আর কিছু। বাস্তব জীবন রূঢ-নিষ্ঠুর, ভালো-মন্দ মেশানো এই পৃথিবীর সঙ্গে, কিংবা দেশ বা জাতির সঙ্গে এঁদের কারো বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। রবীন্দ্রনাথও একাধারে কবি, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক ও দার্শনিক। তিনিও তপোবন গড়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে গড়েছেন শ্রীনিকেতন। ...... শান্তি ও রূপ খুবই উচ্চাঙ্গের সম্পদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও রূপের আরাধনায় একটা জাত গড়েও ওঠে না, বাঁচেও না। রবীন্দ্রনাথ তাই তা চাননি। শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি গড়েছেন শ্রীনিকেতন।... কাজীর কথা শেষ হতেই পূর্ণবাবু বলে উঠলেন, 'তাই ও শ্রী বেশিদিন টিকবে না। ধোপে ধুয়ে যাবে'।

"হয়তো যাবে, সবই একদিন যায়। ... তবুও এর একটা বিস্ময়কর নতুনত্ব আছে। কবির এই চেষ্টা শুধু অভিনয় নয়, রূপহীন, গানহীন, আনন্দহীন দেশের বুকে এই নতুনত্ব হয়তো আবার নবীনতাও এনে দেবে। জবাব দিলেন কাজী"।[১৪]

রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত নজরুল নিজের প্রেমময় জীবনেও অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। নার্গিসের সঙ্গে বিবাহ উপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ পত্রটি রচিত হয়েছিল, কাব্যিক ভাষায় লেখা সেই নিমন্ত্রণ পত্রের সূচনাতেও নজরুল উদ্ধৃতি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রেম বিবাহ পর্বের একটি গানের অংশ—

"জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগৎ মাঝারে,
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে"। —রবীন্দ্র[১৫]

রবীন্দ্রনাথে নিবেদিত প্রাণ নজরুল এইভাবে তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাব্যবাণীকে পাথেয় করে এগিয়ে গেছেন বর্তমানের বুকের উপর ভবিষ্যতের পথে। তাই দেখি, নজরুল তাঁর শেষের দিকের কবিতা-গান-কথিকায় যে অধ্যাত্ম রসের নির্ঝরণী ঝরিয়েছেন, সেই নিগূঢ় রসের সাধনায় ও অনুভবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রভাব যে কতখানি, তার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —

"প্রার্থনা মোর, যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে,
আসি যেন শুধু গাহণ করিতে তোমার কাব্য গীতি"।
('তীর্থ পথিক' — 'বুলবুল')

আবার রবীন্দ্র-মহাপ্রয়াণে নজরুলের মর্মন্তুদ শোকাহুতি 'রবিহারা' কবিতাটিতে ভাবে-ভাষায়-ছন্দে-সুরে তুলনারহিত - যা মর্মের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ আকুতি ও মর্মনির্যাস দিয়ে অশ্রুসিক্ত রচনা—



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

"ভারত ভাগ্য জ্বলিছে শ্মশানে, তব দেহ নয়, হায়!
আজ বাঙলার লক্ষ্মীশ্রীর সিঁন্দুর মুছিয়া যায়!.....
মাথার উপরে নিত্য জ্বলিতে তুমি সূর্যের মত,
তোমারি গরবে ভাবিতে পারিনি - আমরা ভাগ্যহত!"—
('রবিহারা')

কবিতাটির প্রতিটি পংক্তি অনুরাগে - বেদনায় অশ্রুপ্লুত হৃদয়ের সমহীম লেখনীর জাদুকরী ব্যঞ্জনায় প্রতিটি পাঠক চিত্রকে করে আর্দ ও অশ্রুসিক্ত। অনুরূপভাবে রবীন্দ্র প্রয়াণ উপলক্ষে নজরুল রচিত নিম্নোক্ত কোরাস সঙ্গীতটির সান্ত্বনা বাণীটিও বড় বেদনা করুন ও হৃদয়হর -

"ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না, জাগায়ো না,
সারাটি জীবন যে আলো দিল, ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়ো না।।"

নজরুলের এই লেখনী রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঘন মননের আবেগোজ্জ্বল ভক্তিতে ভরপুর। আজও এ অশ্রুধৌত শ্রদ্ধা-নিগূঢ় সুরবাণী কবি-গুরুর মাধ্যমে যেন তাঁরই কাছে ফিরে আসে; আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মরমের মর্মমূল স্পর্শ করে; চিত্তনদী ভরে উঠে দু'কুল ছাপিয়ে। হৃদয়ের মহানুভূতি, সহানুভূতি ও সমানাভূতি না থাকলে এবং ভক্তি নিবেদিত চিত্ত ও নিজে গুনগ্রাহী না হলে আত্মার মহাজাগরণ ঘটে না, মহোচ্চারণ সম্ভব হয় না; আর এই জাগৃতি তো তাঁরই স্বীকৃতি। তাই বলতে পারি, আত্মগত দিক থেকে রবীন্দ্র-নজরুল ছিলেন আত্মার আত্মীয়; আর ভাবগত দিক দিয়ে নজরুল ইসলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরই মানস সন্তান, যেন খাপ খোলা বাঁকা তলোয়ার; মূর্তিমান শক্তির প্রচলিত প্রতীক।

**তথ্যসূত্র :**


১) রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে শরৎচন্দ্র রচিত মানপত্র।
২) ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, 'নজরুল চরিত মানস', পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ২৬
৩) তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩৫
৪) বদ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'পুঞ্জিত নীরবতা', 'লোকসাহিত্য ও নজরুল', প্রান্তর, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ১৩, প্রথম প্রকাশ ১৪১৬, পৃষ্ঠা ৬২
৫) ড. হারাধন দত্ত, 'রবীন্দ্রভক্ত নজরুল', 'কথার মালায় নজরুল', তৃতীয় খন্ড, সংস্করণ দোল পূর্ণিমা ১৪০৯, নবজাতক প্রকাশনী, কলকাতা ০৭, পৃষ্ঠা ১২
৬) বিশ্বনাথ রায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৪, কোরক, কলকাতা ৫৯, পৃষ্ঠা ৩৯৯

৭) তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯৭
৮) ড. অরুণাভ মুখার্জী, 'নজরুল চেতনায় রবীন্দ্রনাথ', প্রথম প্রকাশ ১৪২০, অংশুমান প্রকাশনী, কলকাতা ০৯, পৃষ্ঠা ৮৮
৯) পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন', দ্বিতীয় খন্ড, ১৩৬১
১০) কাজী নজরুল ইসলাম, 'বড়োর পিরিতি বালির বাঁধ', অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র', চতুর্থ খন্ড, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০১০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০, পৃষ্ঠা ৫৪২
১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বসন্ত' গীতিনাট্যের উৎসর্গ পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশ ত বা র্ষিকী সংস্করণ, পঞ্চম খন্ড, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৪১৯
১২) কাজী নজরুল ইসলাম, 'আমার সুন্দর', 'নজরুল রচনাবলী', দ্বিতীয় খন্ড, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১লা পৌষ ১৩৯১, পৃষ্ঠা ৬৩৪
১৩) উদ্ধৃতি, বিশ্বনাথ রায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৪, কোরক, কলকাতা ৫৯, পৃষ্ঠা ৪১৯
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা ৪২১
১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেম বিবাহ পর্যায়, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, জুলাই ১৯৮৭ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৯



## প্রবহমান বাংলা কবিতা : অপ্রতিরোধ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়

**ড. মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি**

পৃথিবীর প্রায় সব সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই নান্দীমুখটুকু রচনা করে এসেছে, কবিতা। বাংলা সাহিত্যেরও পথ চলা শুরু চর্যাপদের হাত ধরেই। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেছে বাংলা কবিতাও। চল্লিশের দশকে বাংলা আধুনিক কবিতার ধারায় দেখা মেলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি কবিতায়- সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদের কথাকে সোচ্চারে প্রকাশ করেছিলেন। ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যেন কবিতাকেই হাতিয়ার হিসেবে দাঁড় করিয়ে ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কবিতার খুব চেনা অবয়বকে বদলে ফেলেছিলেন, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কবিতা রচনার একেবারে সূচনালগ্নেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন— 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।' অর্থাৎ নিছকই তিনি যে প্রেমের কবিতা লিখবেন না, তা স্পষ্ট করে দিলেন। কবিতা যেন আসছে এক দিশা নিয়ে, নিজস্ব লক্ষ্য প্রতিস্থাপনের প্রয়াসে। বুদ্ধদেব বসু তার 'কালের পুতুল' গ্রন্থে লিখেছেন—

"সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতি একটি সামাজিক লক্ষণ। হয়তো দুর্লক্ষণ। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হ'য়েও ঝলসাচ্ছে।"[১]

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। এরপর কিছু বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হতে থাকে- 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকুট' (১৯৫০), 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৭), 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২), 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), 'এই ভাই' (১৯৭১), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২), 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯), 'জল সইতে' (১৯৮১), 'চই চই চই চই (১৯৮৩), 'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫), 'যারে কাগজের নৌকা' (১৯৮৯), 'ধর্মের কল' (১৯৯১), 'একবার বিদায় দে মা' (১৯৯৫), 'ছড়ানো ঘুঁটি' (২০০১),

**অনুবাদ কবিতা**-

নাজিম হিকমতের কবিতা (১৯৫২), 'দিন আসবে'(১৯৬১), 'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ' (১৯৭৩), 'হাফিজের কবিতা' (১৯৮৪), 'চর্যাপদ' (১৯৮৬), 'অমরুশতক' (১৯৮৮), 'গাথা সপ্তসতী' (১৯৮৯) ইত্যাদি।

এছাড়াও তিনি —'হাংরাস'(১৯৭৩), 'কে কোথায় যায়' (১৯৭৬), 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' (১৩৯০ বঙ্গাব্দ), 'কাঁচা- পাকা'(১৯৮৯), 'কমরেড কথা কও' (১৯৯০) প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছিলেন।

কবিতা ও রাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে।ধ্বংসের

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ রোমান্টিসিজমে আত্মহারা হয়ে বৃথা দিনযাপনের আর কোনো অর্থ নেই বলেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে। পাঠক যখন প্রথম পড়ছেন- ‘কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?’ শিরায় শিরায় যেন খেলে গেছে বিদ্যুৎ। ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থের সূচনা অংশেই কবি সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন— ‘একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে’ সম্মিলিত পদসঞ্চারে মুখরিত হবে পৃথিবী, এই কামনা ছিল তাঁর অন্তরে।

**‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থের মৌলিকত্ব নির্ধারক উপাদানসমূহ**

‘দলভুক্ত’ কবিতায় নির্ভীক মিছিলে নেতৃত্ব প্রদানকারীর খোঁজ রয়ে গেছে আগাগোড়ায়।

‘নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ’ অর্থাৎ নিজেকে আড়ালে রেখে আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। নিজেদের সুস্পষ্ট অবস্থানটুকু নিজেদেরকেই চিহ্নিত করতে হবে। আসলে নিজের প্রকৃত স্বরূপকে কোনোদিনই তিনি গোপন করেননি। ‘পদাতিকের’ পদক্ষেপে উদাসীন ঈশ্বর সত্যিই কি কেঁপে উঠবে? এই জিজ্ঞাসা কবির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও। ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতায় দুর্দান্ত উদ্যম চোখে পড়ে। কবিতাগুলির মধ্যে যেন এক বেপরোয়া টান রয়ে গেছে।

“রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি ;
হৃদয়- জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প
ম্লান হয়ে যায় সব-হারাদের বস্তি।।”[২]

কবিতার নাম ‘রোমান্টিক’ অথচ এ এক স্বতন্ত্র ভালোবাসা। সংকল্প ভেঙে ছারখার



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

হয়ে যায়, সর্বহারাদের বস্তির কথাও মাথা থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়। বৃত্তটুকু বড়ো হয় না আমাদের। কবি যেন আঙুল তুলে দেখিয়ে দেন, মনে করিয়ে দেন বার বার সংকল্পগুলির কথা।

‘চিরকুট’ কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা ‘চিরকুট’ খানিকটা ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কবলে জর্জরিত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের করুণ পরিণতির কথা উঠে এসেছে এই কবিতায়। খরা কবলিত মাঠ, অন্নের যোগান শূন্য। চারিদিকে কান পাতলেই তীব্র হাহাকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ প্রান্তিক চাষীরা দরবার করছেন খাজনা মকুব করার জন্য।

“পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হোলে
জ্বলে উঠবে আগুন।।”[৩]

এই সম্মিলিত প্রতিবাদের আগুনে সব অন্যায়কারী ভস্মীভূত হবেই এই স্থির বিশ্বাসের লক্ষ্যেই অবিচল থেকেছে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলম।

‘স্বাগত’ কবিতায় কবি দেখাচ্ছেন মন্বন্তরের ভয়াবহ ছবি। তবুও বসন্তের আগমন ঘটেছে, তা দেখাতে ভোলেননি তিনি। এ চিত্রকল্প কষ্টকল্পিত নয়, এই বাস্তবকে যে চাক্ষুষ করেছেন কবি। গ্রাম শূন্য হয়ে গেছে, ধান বোনা জমি পড়ে আছে ,তুলসী মঞ্চও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সমস্ত শূন্যতার ছবি আঁকলেও সবশেষে নবান্নের ইঙ্গিতটুকু কিন্তু রয়ে গেছে। জীবন যে হাজারও প্রতিবন্ধকতার মাঝে বাঁচার রাস্তা খুঁজে ঠিক বের করে। মৃতপ্রায় জনস্রোতও তাই হয়তো মাঠে ফসল ফলবেই সেই দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জন জাগরণকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন ‘অগ্নিকোণ’ কাব্যগ্রন্থে। তীব্র রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা উজ্জীবিত এই কাব্যগ্রন্থটি। অত্যাচারীদের পাড়ায় পাড়ায় আছড়ে পড়বে প্রতিবাদ ‘অগ্নিকোণ’ কবিতায় সেই সুর ক্রমেই যেন চড়া হয়েছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ যতই ঠুসে দেওয়া হোক, কামানের মুখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেও সম্মিলিত সত্তার প্রতিবাদ অক্ষত থাকবেই। কোটি কোটি কণ্ঠস্বর বজ্রকেও হার মানাবেই।

‘মিছিলের মুখ’ কবিতায় একটি মুখকে তিনি দেখেছিলেন যার শাণিত হাত ছিল আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত অমন তেজময় সত্তার অনুসন্ধানই তিনি করে গেছেন। ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বলে সেই মিছিলের মুখকেই তিনি খুঁজে গেছেন আজীবন। মিছিলের সেই মুখটি আসতে আসতে অবয়ব লাভ করে। এই কবিতায় প্রেমের অনুষঙ্গ। এই শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসা হৃদয়ের সেতুপথ অনায়াসে পারাপার করতে সক্ষম। কবি নিজেই বলেছেন—

"মিছিল দেখা আর মিছিলে থাকা-এ-দুইয়ে তফাৎ আছে।দেখার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ সম্ভব হলেও থাকার ক্ষেত্রে ঘটে সংশ্লেষণ। প্রভাবের প্রক্রিয়া ঘাটতে আমার মন ওঠে না।"[৪]

'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত একটি কবিতা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' বসন্তকে আগল দিয়ে রাখা সম্ভব হয়তো নয়,সে আসবেই। নাগরিক সভ্যতার প্রতীক সেই কাঠখোট্টা গাছটির সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হলেও প্রাণশক্তিটুকু কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। সেই অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়েই সে কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে হাসছে এ হাসিই যে জীবন সংগ্রামের দ্যোতনাবাহী। কঠিন জীবনের লড়াই কিন্তু অসম্ভব নয়; একথা জানিয়েছে প্রতীকী গাছটি।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দিনগুলির কথা কবি মনে করিয়ে দেন।কত মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, অন্ধকারের আবর্তে ঢেকে যায় চতুর্দিক —এইসব কালো দিনগুলি যেন আর ফিরে না আসে।

হরবোলা সেই ছেলেটির কথা আইবুড়ো মেয়েটি ভাবছিল মনে মনে। তাকে সে আর বহুদিন দেখতে পায়নি। সে যুদ্ধে মারা গেছে কিনা, থাকলেও কোথায় আছে এই সমস্ত সংশয় দ্বিধাকে বুকে নিয়েই মেয়েটি থেকে গেছে। সেই সময়ই এক রঙিন প্রজাপতি মেয়েটির গায়ে এসে বসে —এভাবেই জীবনের আশাটুকু জিইয়ে রেখেছেন কবি। মেয়েটি বলেছে-" আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!" অমিত সম্ভাবনার আভাস নিয়েই যে পৃথিবী আজও রয়ে গেছে। সেই কাঠখোট্টা গাছটি কিন্তু সমগ্র কবিতার অনুষঙ্গে বারংবার ফিরে ফিরে এসেছে অর্থাৎ সমস্ত কবিতার প্রেক্ষাপট জুড়েই তার অবস্থান। সমস্ত চড়াই-উতরায় ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেও যেন টিকে থাকারই অন্য নাম জীবন।

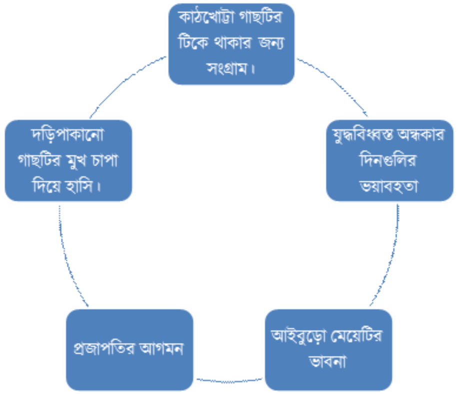


**ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতার চলনক্রম**





শুধু ভাঙনের কথা নেই তাঁর কাব্যে।কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে জীবনকে গেঁথেছেন বারবার। 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'শুধু ভাঙা নয়', আশ্চর্য এক জীবনী শক্তির সঞ্চার করেছে পাঠকদের হৃদয়ে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা রচনার শুরুর দিকেই জানিয়েছিলেন-ফুল খেলবার দিন আজ আর নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি 'পাথরের ফুল' কবিতায় লিখলেন-—

"ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল জমতে জমতে পাথর।
পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।"[৫]

সেই কবিই সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বকে কাটিয়েউঠে বিশ্বব্যাপী মানবতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছেন। এবার ভাঙাকে নয়, জোড়াতেই তিনি বিশ্বাসী হয়েছেন। ছেড়ে গেলে কোনো হাত দেওয়ালকে ধরে উঠে দাঁড়ানোর সাহস যুগিয়েছেন।

"তবু যদি দুটি একটি করেও পাপড়ি
খুলে যায়,
কাছে থেকো-
পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে
সেটুকুও হয় থেঁতো।
ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে
যারা হয়ে গেছে অন্ধ
তাদের নাকের কাছে ধ'রে দিও
ফুলের একটু গন্ধ।"[৬]

সনাতনী, গোঁড়া সংস্কারবাদী যারা, তাদের 'রিজিডিটি' ক্রমশ বেড়েই চলে তারা যেন পৃথিবীতে কোনোকিছুই ভালো হচ্ছে না —এই ধারণার বাইরে বেরোতে চান না। তাদের নাকের কাছেই একটু ফুলের সৌরভ বিতরণ করতে বলছেন। আখেরে জীবনেরই রঙকে তুলে ধরতে বলেছেন তিনি।এবার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ফুলের উপরই আস্থাবান।জীবনের চলার পথে সমস্ত কিছুই কিন্তু জীবনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়; আর কবি সুভাষ সেই জীবনেরই জয়গান গেয়ে চলেছেন বারংবার।

'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের 'মুখেজ্যের সঙ্গে আলাপ' কবিতায় কবি নিজের সঙ্গে নিজেই যেন আলাপচারিতায় মগ্ন। যেন নিজেকেই নিজে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।সমাজ, অর্থনীতি,

রাজনীতি, সংস্কৃতির খোলামেলা পোস্টমর্টেম চালিয়েছেন তিনি এই কবিতায়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চলেছে মনোজ্ঞ আলোচনা। তাঁর মনে হচ্ছে পুরোনো মানচিত্রে আর চলবে না।ভূগোলও নতুন করে শিখতে হবে। সমাজতন্ত্র একদিন এই মাটি গেড়ে বসবে এই আশ্বাস বুকে নিয়েই তিনি এগিয়ে গেছেন। কবিতাটির দীর্ঘ পরিসরে এক জমাটি বুনট রয়ে গেছে। পরিস্থিতির ক্রম অবনতির দিকেও তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন, সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ছবিকেও তুলে ধরেছেন।

"কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছি না যখন দেখছি-—
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
যার ভাত আছে তার হাত নেই।
তবু যদি একটু পালিশ থাকত।
তা নয়,
মুচির দোকানের লাশে-চড়ানো জুতোর মতো
মাথার ওপর ঝুলছে।"[৭]

তবুও সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবি সমস্ত রকম অসাম্য অবলোকন করেও আশা রাখেন বদল ঘটবেই। আড় হয়েই ঘি ওঠাতে হবে সোজা আঙুলে না উঠলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবেই সমাজের বুকে; এ যেন তাঁর স্থির বিশ্বাস।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কাল মধুমাস' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'কাল মধুমাস'। দীর্ঘ এই কবিতায় কী সহজ সরল ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি! একবারই পৃথিবীতে আসার সুযোগ পেয়েছি, আর একবারই শুধু যেতে হবে পারাপার। সে যাওয়া বীরের মতো যেন হয়। কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে প্রৌঢ়ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে, তবুও ভবিষ্যতের অগ্রন্থিত পৃষ্ঠাগুলি লিপিবদ্ধ করার সাহস রয়েছে তাঁর, তা তিনি জানিয়ে দেন। তৃতীয় পর্বে রেলগাড়ি চড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি এসেছে। চতুর্থ অংশে নওগাঁ শহরের কথা, স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে তাদের জীবনে। দেনাগ্রস্ত বাবার কথা, দিদির উপর তার শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের ছবি গুলিই ধরা পড়েছে। নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে উজাড় করে দিয়েই গেঁথেছিলেন 'কাল মধুমাস' কবিতাখানি।নিজেকে এতখানি স্পষ্ট করে এর আগে অন্য কোনো কবিতায় তুলে ধরেছিলেন কিনা সন্দেহ রয়েই যায়।

কবিতা জীবনের চেয়ে বড় নয় তাঁর কাছে। জীবনের মূল্য সবকিছুর তুলনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

"আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি-
এই আমার ছুটি —
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।।"[৮]

আসলে বিবেকবান, সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে কবিতার রস পরিতৃপ্তি সমাজের আগে স্থান পায়নি কোনোদিনই।

'ছড়ানো ঘুঁটি' কাব্যগ্রন্থ ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা শেষ কাব্যগ্রন্থ এটি। এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'ছড়ানো ঘুঁটি'। এ কবিতা যেন এক ইতিবাচকতারই প্রতীক। ছড়ানো ছেটানো মণি মুক্তগুলো খুঁজতে যে হবেই তাঁকে। সেই পথই যে দোসর তাঁর।

সামনের দরজা হয়েছে বন্ধ। সে দোর খিল দিয়ে আঁটা। কবির চোখ আর সামনের দিকে স্থির নয়, এবার তিনি পিছনের পথেই হাঁটেন। সবুজ ঘাসের উপর ভর দিয়ে হলদে পাখির সেই পালক তাকে যেন দেখতে থাকে।

নতুন মুখেরা ভিড় জমায়। নতুন উদ্যমে শুরু হয় কাজ। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কবিকে যতটুকু দেখা যায়, তাঁর দগ্ধ অন্তরের রূপ যেন বেরিয়ে আসে। তিনিই লিখেছিলেন-

'সাম্য অতি খাসা চিজ ! অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ!' সেই অনুচিত কাজকেই তো উচিত মনে করে ঝাঁপিয়েছিলেন তিনি। পার্টি তাকে সরিয়ে দিয়েছিল ঠিকই। তবু থামেননি তিনি। আসলে বড্ড বেশিই সততা, আদর্শকে পুঁজি করে যে পথ হাঁটতেন। পাঁক ঘাটার ইচ্ছে ছিল না তাঁর কোনোদিনই।

চেনা সমস্ত ছক উলটে, ছড়িয়ে যায় সব ঘুঁটি। আজন্ম পথের সন্ধানী, কেমন করে স্থবির হয়ে থাকবেন! জীবন যে বহমান; প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে দুহাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নেন সেই চলিষ্ণু জীবনকেই। ছড়ানো ঘুঁটিগুলো খুঁজে আনবেন, সাজিয়েও ফেলবেন সেই সব ঘুঁটিকেও তিনি। এই জীবন পথই হয়ে উঠেছে আমৃত্যু তাঁর দোসর।

নাজিম হিকমতের কবিতা বরাবরই পছন্দ করতেন তিনি। মূল তুর্কী ভাষা না জানার কারণে ইংরেজিতে পড়েই অনুবাদ করেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

'শয়তানদের জন্যে যেন না মরি' নাজিম হিকমতের লেখা এই অনুবাদকৃত কবিতাটিতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব কিছু ছাপ রয়ে গেছে। নবজাত শিশুর মতোই কবি নীল

আকাশ দেখছেন। শয়তানদের জন্য কবি মরতে চান না। বেঁচে থেকে সেইসব অনিষ্টকারীদের শাস্তি প্রদান করতে চান তিনি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। জীবনের সব রকম অবস্থানকেই তিনি স্বীকার করে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। শ্রেণিসংগ্রাম, জনগণকে অধিকারে সচেতন করে তোলাকে তিনি কোনোরকম বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখতে নারাজ ছিলেন। এগুলো একজন সচেতন মানুষের অবশ্য পালনীয় কর্ম বলেই মনে হয়েছিল তাঁর। প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, কবিতায় মিলে মিশে একাকার হয়ে রয়ে গেছেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

**তথ্যসূত্র :**

১। বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৬, তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৮১।

২। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পদাতিক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ : ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৮।

৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩০।

৪। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক), কবিতা-পরিচয়, স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২৯১।

৫। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫৬।

৬। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সমগ্র, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ১১১।

৭। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৩, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০০৮, পৃষ্ঠা ৭২।

৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সমগ্র, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৮৫।



# শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : মহাভারত অনুসঙ্গ

সোমা মুখার্জি

রামায়ন-মহাভারত আমাদের আদি মহাকাব্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঐতিহ্যের মর্মসত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এই মহাকাব্যদ্বয়ে। বাংলা সাহিত্যে এই কাব্য দুটির চর্চা ও প্রভাব প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আদি-মধ্যযুগ থেকে এ চর্চার সূত্রপাত। উনিশ শতকে এর ব্যপ্তি লক্ষনীয়। বিশ ও একুশ শতকেও এ ধারা বহমান।

রামায়নের তুলনায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব আরও ব্যাপকতর। মহাভারতের আত্তীকরণ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-এর বেশ কিছু সনেটের কথা। নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' মহাভারতের ভক্তিরসে ভেসেছে। রবীন্দ্রনাথ তো আত্মানুভবে নব রূপসাগরে লিখেছেন 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' বা 'গান্ধারীর আবেদন'। এমন অনেক উদাহরণ আছে। রবীন্দ্র-সমকালীন দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা', কামিনী রায়ের 'পৌরাণিকী', মানকুমারী বসুর 'বীরকুমার বধ', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'মহাভারতী কাব্য' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। কল্লোল যুগের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের 'যযাতি', 'কঞ্চুকী', 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থের 'উর্বশী', বিষ্ণু দের 'পদধ্বনি', বুদ্ধদেব বসুর 'কালসন্ধ্যা', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', পুরাণ অনুষঙ্গ লালিত। এছাড়াও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উদ্বাস্তু', সুকান্ত ভট্টাচার্যের বৈশম্পায়ন', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর 'মধুবংশীর গলি', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অকাল সন্ধ্যা', মণীন্দ্ররায়ের 'আমাকে বাঁচতে দাও', বনফুলের 'শকুনি' প্রভৃতি কবিতাতেও মহাভারতীয় তাৎপর্যকে আধুনিক যুগোচিত ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিশ শতকে উজান সত্তার টানে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় কখনো কখনো পৌঁছে গেছেন পুরাণ প্রসঙ্গে। জীবনের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আত্মদ্রোহ ঘোষণা করেছেন 'জরাসন্ধ' কবিতায়। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'জরাসন্ধ'।

মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র জরাসন্ধ। বৃহদ্রথের সন্তান বিপ্রচিত্তি নামের দানব পৃথিবীতে জরাসন্ধ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডকৌশিক ঋষি তাঁর দুই মাকে সন্তান লাভের জন্য একটিমাত্র মন্ত্রঃপূত আম দান করেন। কিন্তু দুই মা সেই আম ভাগ করে খান। এর ফলে দুজনেরই অর্ধাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। জরা নামের এক রাক্ষসী পরিত্যক্ত এই দুই বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। তার নাম হয় 'জরাসন্ধ'। এই জরাসন্ধের কন্যার সাথেই কংসের বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণের নির্দেশে ভীম জরাসন্ধের দেহ খন্ডিত করে দুটি বিপরীত পার্শ্বে নিক্ষেপ করে তাকে নিধন করেন।

মহাভারতের এই চরিত্রটিকেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জরাসন্ধ' নাম কবিতায় এক অদ্ভুত সাংকেতিকতায় নির্মাণ করেছেন। অস্তিত্ব নয়, অস্তিত্বহীনতাই দাবি করেছেন কবি,

'আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।'[১]

অর্থাৎ তিনি চান না অপূর্ণ সত্তাকে। এ জন্মটা তাঁর কাছে বৃথা। জরাসন্ধের অপূর্ণ শরীরের খণ্ডাংশ দেখে তার মায়েরা বা বাবা যেমন তুষ্ট হতে পারেনি, ঠিক তেমন ভাবেই 'মায়ের হাতে ছুঁয়ে' যেন কবি ফিরিয়ে নিতে বলছেন। কারণ এ জীবনটাই যে বরবাদ। অন্ধকারের মতো শীতল মুখ বা রিক্ত হ্রদের মতো চোখ দেখে অর্থহীন বেঁচে থাকা আরও বেশি অর্থহীন হয়ে পড়ে কবির কাছে। 'ধানের নাড়া' যেমন ফসলহীন মাঠের শূন্যতাকে তুলে ধরে, তেমনি এ 'নাড়ায় বিঁধে' ক্ষত-বিক্ষত হওয়া যেন জীবনের সংকুল পথের একাকী যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে এগিয়ে চলাকে বোঝায়। 'সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে' অর্থাৎ যে জীবনের ক্ষেত্রটাই দলিত হয়ে গেছে সেইখানে অর্থহীন জীবন-অস্তিত্ব।

কবির অনুভবের ভাঁড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। তিনি সেই 'অনঙ্গ অন্ধকারের' হাত পা কিছুই দেখেন না। এই অঙ্গহীনতা তো সমাজেরই ক্ষত। 'কোমল বাতাস' এলে কবির মনে হয় হয়তো কিছু সুন্দরের স্পর্শ তিনি এখনও পেতে পারেন। কিন্তু 'তার অন্ধকার নিয়ে' সুন্দরের কাছে দাঁড়ালে সেও সরে যায়, এমনকি মৃত্যুও। এই তমসা জীবনের ভুলেই প্রসব হয়েছে। যন্ত্রণাদীর্ণ এই হা করা শহরের তমসা থেকে অব্যাহতি পেতে চান কবি। মহাভারতের জরাসন্ধের মতো অপূর্ণতা নিয়ে, কবি বাঁচতে চান না। তাই জীবন-কুরক্ষেত্র থেকে মুক্তিই তার একান্ত কাম্য। সেই মৃত্যু চেতনাই ব্যঞ্জিত হয়েছে 'জরাসন্ধ' কবিতায়।

মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে সমাপ্ত, লক্ষ শ্লোকে গ্রথিত। জীবনের উত্থান পতনের পথ নির্দেশক মহাভারত। আমাদের নৈতিক অবক্ষয়েরও আশ্রয় এই মহাকাব্য। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বাঙালি জীবন ও সাহিত্যে তার প্রভাবে নতুন আঙ্গিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা শুরু হয়েছিল মহাভারতের। জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারও লক্ষ করা গেল। মধ্যযুগীয় চিন্তা বা ইউরোপীয় চেতনা দিয়ে ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপের উদ্ধার সম্ভব ছিল না, তার জন্য প্রয়োজন ছিল ঐতিহ্যের পুনরুত্থান। এই আত্মার অনুসন্ধান বিশ শতকেও লক্ষ করা গেল। একবিংশ শতকে মহাভারতের বিনির্মাণে তা সমাজ ও রাজনীতির বিষয়ে বেদনা ও ক্ষোভের প্রকাশ রূপে দেখা দিয়েছে।

বিংশ শতকের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতে আমরা মহাভারতের চরিত্রের নবনির্মাণ নয়, দেখি রূপক-প্রতীক রূপে অন্য এক বাস্তবায়নে। বাস্তব জীবনের দীর্ণতা, হতাশা, গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে কবি আশ্রয় খুঁজেছেন পুরাণ চরিত্রের মধ্যে। একদিকে





ঐতিহ্যের আত্তিকরণ, অন্যদিকে আধুনিক চেতনার নব রূপায়ণে এক অনন্য মাত্রা লাভ করেছে তাঁর কবিতা। প্রসঙ্গত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'পরশুরামের কুঠার' কাব্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লক্ষণীয়, একটি কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে মহাভারতের চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। তিনি ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে বর্তমান ছিলেন। মহর্ষি ভৃগুর পৌত্র তিনি। পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ব্রাহ্মণ হলেও মা রেণুকা ছিলেন ক্ষত্রিয়। ভাগবত পুরাণ অনুসারে এক সময় সমাজে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ওঠে ধরাতল। ক্ষত্রিয়দের দমন করার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বরে পরশুরামের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ সন্তান পরশুরাম ক্ষত্রিয় কৌশল রপ্ত করতেই অধিক আগ্রহী ছিলেন। দেবতাদের কাছ থেকে অস্ত্রলাভের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তাকে বরদান করেন এবং মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাকে কুঠার দান করেন। এই অস্ত্রের দ্বারা তিনি অনেক অসুর নিধন করেন।

একদা পিতৃ আদেশ পালনের জন্য পরশুরাম তাঁর কুঠার দিয়ে মাতৃ-হত্যা করেন। পিতার উপদেশ অনুসারে তিনি লোহিত সরোবরে ব্রহ্মপুত্র নামক মহাকুন্ডের জল পান করেন এবং স্নান সমাপন করে মাতৃহত্যার পাপ খণ্ডান এবং তুষ্ট পিতার কাছে মায়ের পুনরায় জীবন দানের বর প্রার্থনা করেন।

ক্ষত্রিয়ের দ্বারা পিতা জমদগ্নির হত্যার ফলস্বরূপ প্রতিশোধস্পৃহ পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করতে শুরু করেন। প্রতি দশ বছর অন্তর-অন্তর তিনি পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয় নিধনে ব্রতী হন। এভাবেই তিনি একুশবার ক্ষত্রিয়দের দর্পচূর্ণ করেন। প্রায় বারো হাজার রাজাকে নিহত করেন। তাদের রক্তে স্নান করে পরশুরাম পিতৃতর্পণ সারেন। এরপর হনুমান এবং পরশুরামের যুদ্ধ। পরিশেষে পরশুরামের ক্রোধের সমাপ্তি ঘটে। গুরু কাশ্যপের কাছে সব বিজিত রাজ্য প্রত্যার্পণ করেন পরশুরাম।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মহাভারতের এই পরশুরাম চরিত্রটির অনুষঙ্গ এনেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার গদ্য ব্যাখ্যায় তিনি জানিয়েছেন,

'আমাদের মধ্যে শরীরে মনে একজন ক্ষত্রিয় আর একজন ব্রাহ্মণের বসবাস। চিরদিন। দুজন একসঙ্গে জেগে নেই। দিনরাতে মতো। এক জাগলে, অন্য ঘুমায়। এবং কখনো এই দুজনের জেগে থাকা আবশ্যক হয়ে পড়ে শিল্পের জন্যে, সমাজের জন্যে দুজনের আবহমান যুদ্ধ বিগ্রহ। নিজের ভিতরের সেই অংশ, যে বিচার চায় সে জেগে ঘুমোলে, তার ঘুম ভাঙানো জরুরি হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে কখনো শখনো শান্তির বিঘ্ন ঘটাতেই হয়। আপদ নিশ্চিহ্ন করতে হয়। পরশুরাম সেই কাজে নেমে আসে। মানুষও নামে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বিচারের নিজস্ব খাঁড়া হাতে নিয়ে। আমরা এমন ঘটনা দেখেছি। ভবিষ্যতেও দেখতে হবে। অস্ত্রকে জীবিত করতে হলে তাকে রক্তের স্বাদ,

প্রয়োজনে নিজের, দিতে হবে। নতুবা সে ঘুমন্ত, মৃত, চলচ্ছক্তিহীন। দক্ষিণ হাতের কুঠার বাম হাত কাটে। স্বাস্থ্য রাখতে গেলে এমন কাটাছেঁড়া অনিবার্য।'[২]

পরশুরামের কুঠার যেমন হিংসা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রক্ত পান করেছিল, তেমনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও মনে করেন সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে পরশুরামের কুঠারের নির্মম ব্যবহার এখন খুবই প্রয়োজন। আজ মানুষের কাছে মানুষের ভালোবাসা মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাই কবি লেখেন,

'মনে হয় মানুষের কাছাকাছি স্থির দুঃসময়
এসে গেছে, পরিত্রাণ কোনোদিকে শিকড় মেলে না'[৩]

সত্তর দশকের রাজনীতির অস্থিরতা, হিংসা, বাদলা পোকার মতো একদল তাজা যুবকের সেই হিংসার আগুনে আত্মাহুতি সবই সমাজ-মনুষ্যত্বের পক্ষে চরম অপচয় বলে মনে করেছেন কবি। মানুষ পিঁপড়ের চেয়েও নগন্য বলে মনে হয়েছে তাঁর। কবি নিজেকে তাই সমাজবন্ধন থেকে দায়িত্বমুক্ত ভাবতে চান। 'পরশুরামের কুঠার' এর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

'আমি অসামাজিক। ফলত সমাজ নামক বিশ্বমানবকল্যানের কর্ম আমার দ্বারা হবে না।'[৪]

এই বোধেই হয়তো তিনি সব রাজনৈতিক সংসর্গ ত্যাগ করেছিলেন। তবে রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সংযুক্ত না থেকেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন আত্মঘাতী রাজনীতির বিরুদ্ধেই। এই অবক্ষয় রোধে তাঁর হাতিয়ার পরশুরামের কুঠার। তাই কবি লেখেন,

'মুখের ওপর এঁটে নেবো মুখোশ
হাতে নেবো টাঙি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে
আমার নিজেরই রক্ত'[৫]

এ রক্তবীজ থেকে জন্ম নেবে শুভ বুদ্ধির। কবির আশা সম্প্রীতি গড়ে উঠবে 'দলমতধর্ম নির্বিশেষ মানুষে মানুষে' (মানুষের মধ্যে থেকে)। শান্তিকামী কবি যেন আশ্রয় লাভ করতে চান প্রকৃতির সুনিবিড় ছায়া শীতল আবেষ্টনীতে,

'স্বস্তিতে আজ থাকতে দে না আপনমনে'[৬]

জীবন ছুঁয়ে ছুঁয়ে কবি নিজেকে জাগাতে চেয়েছেন। মৃত্যুময় হয়ে বেঁচে থাকা নয়, মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারেন এই ছিল তাঁর বাসনা।

আলোচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের চিরন্তন জীবন সাধনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি ব্যক্ত করেছেন তিনি 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে,

'মহাভারতের যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতের কর্মেই কর্মের চরম প্রাপ্তি নহে। তাহার





সমস্ত শৌর্য বীর্য, রাগ-দ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরব সংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।'[৭]

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়ও সেই ভৈরবসংগীত ধ্বনিত হতে দেখি। জীবনের দীর্ণতা, হতাশা, গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে তিনি আশ্রয় খুঁজেছেন পুরাণ চরিত্রের মধ্যে। একদিকে ঐতিহ্যের আত্তিকরণ, অন্যদিকে আধুনিক চেতনার নবরূপায়ণ আমাদের মহাপ্রস্থানের পথ যেন নির্মাণ করে দিয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**


১। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য', পদ্যসমগ্র ১, আনন্দ, অষ্টম মুদ্রণ ২০১৯, পৃষ্ঠা২২

২। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম কবিতা প্রসঙ্গ, পদ্য সমগ্র ৩, আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা১৯২

৩। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সশস্ত্র ও অস্ত্রহীন, পরশুরামের কুঠার, পদ্য সমগ্র ৩, আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা১৯০

৪। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পদ্যাপদ্য সম্পর্কে সামান্য, পরশুরামের কুঠার, পদ্য সমগ্র ৩, আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা১৬৬

৫। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম, পরশুরামের কুঠার, পদ্য সমগ্র ৩, আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা১৯১

৬। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'আপন মনে', পরশুরামের কুঠার, পদ্য সমগ্র ৩, আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৫, পৃষ্ঠা২০৬

৭। 'কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা', প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয়খন্ড, পৃষ্ঠা-৭১৭

# নব্বই দশক পরবর্তী মহিলা কবিতায় অন্য বয়ান

ড. শান্তনু সাহা

আধুনিক বাংলা কবিতার গুরুত্বপূর্ণ কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৬০-২০১১) তার 'মধুর কবিতার বিরুদ্ধে' প্রবন্ধ টিতে প্রেমের কবিতাকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছেন। প্রেমের কবিতার ধারণা এত বেশি চর্চিত ও জনপ্রিয় যে এই নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক লেখা দিয়ে পাঠকের খুব কাছে পৌঁছনো যায়। এই 'মধুর' কবিতাগুলো, যেগুলো পাঠক খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে কারণ এই ধরণের লেখাগুলো প্রথাগত ধারণার বিপ্রতীপে গিয়ে কথা বলে না। সামাজিক নীতি নৈতিকতার বাধ্য ধারণার বশংবর্তী হয়ে ক্রমাগত লেখা হতে থাকে আর এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ কবিতার বিষয় হিসেবে প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি গতানুগতিকভাবে উপস্থিত লেখালেখির ভিতর। তাদের উপস্থাপনার ধরণগুলিও অনেকটা একই রকম যা খুব স্বাভাবিক ভাবেই সর্বজনের ভালোলাগার বিষয়। যাকে লেখিকা 'জনমনোরঞ্জন' -এর বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। তার মনে হয়েছে লেখালিখির শুরুর সময়ে একজন কবির কলমে প্রেমের ব্যর্থতা, বিরহ, আবেগ ইত্যাদি বিষয় হিসেবে উঠে আসতেই পারে। যা সাধারণ মানুষের মন ছুঁয়েও যায়। কিন্তু যখন ক্রমাগত লেখালিখির পরেও কবিতাগুলো একই বিষয়ের চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে তখন স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে বিষয়ের বৈচিত্র্য কমে যায়, বিভিন্নতা নষ্ট হয়। মনে হয় তারা যেন একই কানাগলির ভিতর ঘোরাঘুরি করে। তার মনে হয়, " কিন্তু কবিতা তো লোক রঞ্জন অপেরা নয়, বরং কবিতাই হল সমাজের বিবেক, সেই সমাজের সেখানে প্রেম আছে, ধর্ষণও আছে; মধুর আছে কর্কশও আছে। সবচেয়ে বেশি আছে অপ্রেম, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও দারিদ্র। সমাজের এই পুরো ছবিটা তুলে ধরাই কবিতার কাজ"[১]।

যথার্থই অনুধাবন করেছেন তিনি। আমার লেখার ভিতরও আমি এই বিষয়টিকে আরও একটু গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাই। এবং তার জন্য যে সময়কালটাকে আমি বেছে নিয়েছি তার পেছনে কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। সাহিত্য সৃষ্টির ধারার কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল হয় না। আমিও নব্বইদশক পরবর্তী সময়কালকে বেছে নিয়েছি মানে এই নয় যে তার আগের দশকগুলো ধরে আলোচনা করা যেত না। আসলে আমি দেখতে চেয়েছি যে এই গোত্রের রচনার সংখ্যার বিস্তৃতি লাভ করেছে এই দশকের পরবর্তী সময়ে। পূর্বের তুলনায় কবির সংখ্যা বেড়েছে , বেড়েছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। প্রেম-ভালোবাসার আধুনিকায়ন, ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দ, ইমেজ -এর বাইরে বেরিয়ে আসা আর "পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ" নিয়ে লেখালিখির যা মস্তানি রবীন্দ্র-পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা যায়, একই সময়ে মহিলা কবিদের ভিতর, হাতে গোনা কয়েকজন কে বাদ দিয়ে ঐ ধারা সেভাবে পরিলক্ষিত হয়



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

না। মল্লিকা সেনগুপ্তের ভাবনা ধার করে বলা যায় বর্তমানের কবিরা অনেক বেশী সমসাময়িক। বিশ্বায়নের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলা কবিরা অনেক বেশী যেন পৃথিবীজুড়ে নারীবাদী চর্চায় চর্চিত আর সময়ের দাবী মেনে সাহিত্যের গণ্ডী কে প্রসারিত করা এই ভাবনারই সক্ষম প্রয়োগ। তিনি বলেন "আসলে জীবন থেকেই তো কবিতা, জীবনে মধু ও প্রেম যতটুকু, মধুর প্রেমের কবিতার স্থানও প্রায় ততটুকু। বাকি জীবনের লড়াই এবং বিপন্নতা, বিষাদ এবং বহির্জগত, কাশ্মীর এবং কন্যাভ্রূণ হত্যা, পোখরান এবং পরিবেশদূষণ, বিজেপি এবং রামায়ণ, ক্লিনটন এবং কোকাকোলা-সাম্রাজ্যবাদ, হতাশা আর হিংস্রতা কে পাশে সরিয়ে রেখে মধুর কবিতা লেখা যায় না। লিখলে, কবিতার প্রতি এবং নিজের প্রতি অন্যায় করা হয়"[২]। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারই "রক্তচিহ্ন" কবিতায় নারীর বয়ানে পাই পুরুষকে উল্লেখ করে বলা এক নতুন বয়ান যেখানে নারীর কণ্ঠে এক নম্র অনুযোগ উঠে আসছে। পুরুষ যেভাবে এতদিন যে ভঙ্গিমায় নারীকে দেখে নিতে চেয়েছে তার অভিমুখ তিনি ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন। নারীকে দিলেন উচ্চারণের স্বাধীনতা, "যে মাটিতে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ তাঁর অপমান কোরো না/পুরুষ, আমি তো কখনো তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলিনি।"[৩] এই কবিতার মাধ্যমে নারীর বয়ানে যে অভিযোগের তীর উঠে আসতে দেখি সেখানে উচ্চারণের তীব্রতা অতটা নেই, যতটা আছে যুক্তি বোধ সম্বলিত যথার্থ বয়ান। মহিলাদের লিখিত কবিতায় একটা ধারা খুব স্পষ্ট করে লক্ষ্য করা যেতে পারে যেখানে তারা কবিতার মাধ্যমে সোজাসুজি বা তির্যক ভঙ্গিতে পিতৃরূপ চরিত্রের সঙ্গে কথোপকথনে যুক্ত হয়। আর সেই কথোপকথন মাধ্যমে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নগ্নদিক টিকে নজরে আনে। নারীবাদী লেখিকা আড্রিয়ান রিক তার "Of Woman Born" গ্রন্থে যথার্থ মন্তব্য করেছেন এই সমাজ ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে :

> Patriarchy is the power of the father - a familial–social, ideological, political system in which men – by force, direct pressure or through ritual, tradition, law and language, customs, etiquettes, education, and the division of labour determine what part of women shall or shall not play, and in which the female is everywhere subsumed under the male.[৪]

এই সমাজ ব্যাবস্থার চাপের কাছে নারী সমাজ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে আলোচ্য কবিতাগুলোতে সেই চাপের মুখে রুখে দাঁড়ানো দেখতে পাই আমরা।

পরবর্তী কবিতাগুলোতে মল্লিকা একটু দৃঢ় কণ্ঠে আক্রমণ সাজালেন সমাজের প্রতিভূদের বিরুদ্ধে। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হয়েও প্রশ্ন করার ক্ষমতা দেখলেন কাল মার্ক্স-কে তার কবিতায়। মার্ক্স এখানে কোনো তত্ত্বের সৃষ্টি কর্তা শুধু নন, একজন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সফল প্রতিনিধি-যিনি শ্রমের মূল্য বুঝিয়েছেন, প্রলেতেরিয়ত, বুর্জোয়াদের হাতে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের দুর্দশার বর্ণণা এবং তার তত্ত্বগত বাঁচার উপায় ভেবেছেন। সেই পুরুষের

প্রতিনিধির কাছে মল্লিকা প্রশ্ন রেখেছেন “আপনি বলুন, মার্কস” কবিতায়, “ছড়া যে বানিয়েছিল, কাঁথা বুনেছিল/ দ্রাবিড় যে মেয়ে এসে গমবোনা শুরু করেছিল / আর্য্যপুরুষের খেতে, যে লালন করেছিল শিশু/ সে যদি শ্রমিক নয়, শ্রম কাকে বলে”?[৬] বাকী কবিতাটিতে এভাবেই একের পর এক প্রশ্নতুলে জর্জরিত করছেন যেন মার্কসকে। এই প্রশ্ন তুলতে বুকের পাটা লাগে। মল্লিকা পেরেছেন আর একই ভাবে পারছেন পরবর্তী কবিরা। ভালোবাসার কবিতাও তিনি লিখেছেন। আলোচ্য উপরিউক্ত প্রবন্ধে তিনি বারবার করে ‘মধুর’ কবিতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন ভালোবাসার মৌলিক শর্ত গুলো যাদের সঙ্গে তথাকথিত পৌণঃপুনিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃত ভালোবাসা বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যায় না যদি না ব্যবহারকারীর দৃষ্টিভঙ্গি এক পাক্ষিক হয়। লিঙ্গ রাজনীতির দোষে দুষ্ট হয়। তাই মল্লিকাকে ভালোবাসার কবিতায় প্রচলিত বয়ন ভঙ্গিমা থেকে সরে এসে একটু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় পুরুষ মনোভাবাপন্ন ভালোবাসার বিপক্ষে।

মল্লিকার পরবর্তী কবি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। তিনিও যেন মল্লিকার ব্যাটন তুলে নেন হাতে এবং বাচন ভঙ্গি একই রেখে প্রথাগত ধ্যানধারণার মূলে কুঠারাঘাত বজায় রাখেন। ক্লিশে হয়ে যাওয়া প্রেম-ভালোবাসার গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক না খেয়ে স্বচ্ছ-সরল জীবনদর্শন তুলে ধরেন যেখানে চোখে ঠুলি পড়া ভালোবাসা নয় বরং সামাজিক দায়দায়িত্ব বোধ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যুক্ত থাকতে চান সবকিছুর সঙ্গে,“অন্ধ নই আমি যে, অন্ধকারগুলোকে/ ফেলে দেব, শ্রীময়ী কথাই বলে যাব শুধু। / ভুলে যাব আন্দোলন , ব্যার্থতা, আর কালি-ধরা/ রান্নাঘরের হুইশল! ভুলে যাব নুন-চাপা-হাড়ী, কিংবা/নার্স-ডাক্তারের ঝাঁঝে মরে-যাওয়া কন্যাভ্রুণ, সে না পড়ল গল্পগুচ্ছ,/বসন্ত দেখল না কখনও! ভুলে যাব ওইসব, মারাত্মক! বলছি, আমারও তো ইচ্ছে হয়,/ গান শুনতে এই ক্লীবজগতের ধূলবালি ছেড়ে /আবার ঠিকঠাক জন্ম নিতে”[৭] (দেবব্রত বিশ্বাসের বসন্তসঙ্গীত, ২৩)। নারী কবিতা প্রসঙ্গে সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় তার “আমার কবিতা ভাবনা”- য় ব্যক্ত করেছেন যে ব্যক্তিগত উপলব্ধি তা যেন সার্বজনীন হয়ে দাঁড়ায়। তার কাছে সমস্ত নারীলিখিত কবিতার পর্যালোচনা, “কবিতা মানে আমার কাছে এই। নিজেকে রক্তাক্ত হতে দেখা ও একই সঙ্গে সেই রক্ত পান করা”[৮]। যদিও ব্যক্তিগতভাবে একাকী, আসলে কিন্তু সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবি। তাই একদমই আশ্চর্যের বিষয় হয়ে ওঠে না যখন আমরা শুনি এক নারীর কণ্ঠ অন্য আরেক নারীর জীবন যাত্রার পরিচায়ক। যেমন চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি কৃষ্ণা বসুর আলোচনার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। তিনি বলেন, “নারীর মেধার মূল্য সমাজ চিরদিনই কম দিয়ে এসেছে। নারীর সামাজিক একগামিতাকে সমাজ এতখানিই মূল্য দিয়েছে যে তার অস্তিত্বের অন্য দিকগুলিকে প্রায় চাপাই দিয়ে দেওয়া হয়েছে”[৯]।

একজন নারীর তাত্ত্বিক আলোচনা আরেকজনের কবিতার পংক্তি হয়ে ওঠে। এবং





সেই কবিতা যথার্থ কবিতা হয়ে উঠতে তার কাব্যিকগুণের কোন খামতি থাকেনা। তাই “মেয়েরা আবার লিখতে পারে নাকি?”-এই ধরনের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরোধিতা করতেই যেন নব্বই দশক পরবর্তী কবি হিসেবে একের পর এক মহিলা কবির উত্থান এবং লিখতে লিখতে সেই অচলায়তনের ধ্বংস উপস্থিত যেন। খুব সচেতন এবং সাবলীল বিষয় চয়ন, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, মৌলিক শব্দবন্ধ, খুব পরিচিত গণ্ডী থেকে রূপকের বা উপমার জন্ম দেওয়া- এই বিভিন্ন দিক থেকে যেন প্রস্তুত হয়েই তারা মাঠে নেমেছেন। এবং সেটা যে কতটা যথার্থ তা সংযুক্তার সমালোচনা থেকে অনুধাবনযোগ্য, একথা জেনেও যে, নারীকবিতা আজও একটি মার্জিনাল অবস্থানে রয়েছে। কত কী-ই যে লিখতে দেওয়া হয়নি মেয়েদের- সাফো বা অ্যাড্রিয়েন রিচ সত্ত্বেও নারী সমকামিতা কি জায়গা পেয়েছে তেমন করে কবিতায়? কোথায় অন্তেবাসীর উচ্চারণ? কালো মেয়েদের ব্লুজ গানের সঙ্গে আমাদের ছাদ পেটানো মেয়েদের গান কে কী তুল্যমূল্য করা হয়েছে? নারীর যৌনতা, পুরুষ শরীরের প্রতি নারীর মুগ্ধতা কবিতায় কতটুকু?”[১০]।

তাই যখন চৈতালি বলে ওঠেন, “না আমি বস্তাপচা বিরহের গানগুলো মোটে শুনবো না।/ না, আমি পাচার হওয়া মেয়েটার গুঁড়ো টিপ চোখে তুলবো না”[১১] বা “তখন চট করে, আমি আবেগ ধুয়ে মুছে ফেলে/ স্থানীয় সংবাদ পড়ব/ খুন ও গণধর্ষণগুলো নোনতা বিস্কুট এর মত চায়ে ভিজিয়ে নিয়ে খাব”[১২]; আমরা তার বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্মিত হই না। কারণ খুব প্রয়োজনীয় ভাবেই তার অপরিহার্যতা নিজের কবিতা কেন্দ্রিক আলোচনার ভেতর ব্যক্ত করেছেন, “আমার বিয়ের রাত, বিয়ে ভাঙ্গার দুপুর, সব দেখতে পাচ্ছি। ছবি তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক,সামাজিক নিগ্রহ জানতে জানতে।[১৩] সময়ের ভাঁজে ভাঁজে নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছেন। গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন না কেবল দুঃখবিলাসে। তাই তিনি যেখানে শেষ করেন অন্য আরেক কবি ঠিক সেই ব্যাটন তুলে নেন হাতে। তিনি যেকোনো কবিই হতে পারেন। যেমন সুতপা সেনগুপ্ত, আরেক সমসাময়িক কবি, কবিতায় বিষয় চয়নের বিষয়ে উপোরক্ত কবিদের ধারণাকেই ধারাবাহিক রূপ দেন। তিনি লেখেন ঃ

এমন ছেলেভুলানো মনোহর কবির যে সত্যসন্ধ রূপ, তাতে আমার ধিক্কার এসেছে। আমি আর তেমন কবি হতে চাই না। লোভে, ভয়ে, ক্ষমতায় বিবশে জর্জর যে সত্য, যে অনেক কিছু পারে না, যার অনেকখানি অসম্পূর্ণ থেকে গেল, সেই সদা-তুল্য সত্য যদি মন খুলে দেখাতে পারি কখনও, অন্তত যেটুকু আমি খুঁড়ে খুঁড়ে জাগাতে গিয়ে ক্লান্ত সর্বশান্ত হয়ে পড়তে পারি - তবেই আবার কবির কলম ছোঁব আমি।[১৪]

যথার্থ এই চিন্তন। গতানুগতিক রূপ আবর্তিত হতে হতে যখন শাশ্বতর মর্যাদা পেয়ে যায় তখন সেখান থেকে সরে আসা বাস্তবিকভাবেই খুব কঠিন হয়ে দেখা দেয়। পুরুষতান্ত্রিকতা সেরকমই প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে প্রথাগত ধ্যান-ধারণাকেই মাপকাঠি বলে মেনে নেয়ার বিধান দেয়া হয়। চাপিয়ে দেয়া হয় তথাকথিত সামাজিকভাবে দুর্বল,

শারীরিক ভাবে কম শক্তিমান মহিলাদের ওপর। যদিও এই ভাবনাও লিঙ্গ-রাজনীতির ফসল। আসলে দুর্বল করে রাখা, অক্ষম করে দেওয়া- সামাজিক লাভ ভোগের নামান্তর মাত্র। তাই যে মহিলা এই রাজনীতির গভীরে গিয়ে ঐ অসাম্যের ব্যাঞ্জনাকে অনুধাবন করতে পারে, সে তার লেখার ভিতর এই "বঞ্চনা" গুলোকে তুলে না এনে থাকতে পারে না। যেমন কমলা দাস, যিনি ইংরেজী ও মালায়ালাম ভাষায় লেখালিখি করেছেন, উদাত্ত স্ট্রেই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কবিতা লিখতে এসেছেন মূলত "সামাজিক স্থিতাবস্থাকে বিরক্ত করতে"- সোজা কথায় বলতে গেলে এক ভীষণ আঘাত দিতে চাইছিলেন তিনি এই সমাজ ব্যবস্থার গালে। এবং তার কবিতাগুলো পড়লে বলা যায় তিনি সক্ষম হয়েছেন। তাই সুতপা সেনগুপ্ত যখন সেই 'সত্য'-কে লেখার কথা বলেন, বোঝা যায় এই অসাম্যের গল্পটিকে তিনি করায়ত্ত করেছেন এবং যথারীতি তার কবিতাও আর ক্লিশে হয়ে যাওয়া প্রতীক, ছবি বা চিহ্নে ভর্তি থাকবে না। তাই " ছোকরা ছোকরা শ্যাম রায় বাই"-এ পুরাণের পুনঃনির্মাণ করেছেন। শ্যাম বা কৃষ্ণ কে উপস্থাপিত করেছেন বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে- যেন সে পাড়ার বখাটে যুবক যে প্রেম প্রস্তাব দেয় আর লিখিত হয় ব্যক্তিগত প্রেমের গান। বা পৌরাণিক কৃষ্ণের আদলে এখানেও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপিত হয় শ্যামরায়ের সঙ্গে কিন্তু বিনির্মিত ভাষায়, নতুন পরিপ্রেক্ষিতযেখানে রাধার উল্টোদিকে এই প্রেমিকা কিন্তু অতটা বেদনা-বিধুর নয়, বরং প্রকাশ করতে জানে নিজের ভালোলাগা বা বিরক্তি, "মাইরি আচ্ছা ছেলে/ টিপিকাল মেয়ে নই বলে কখনো কি মুখে না না/ মনে মনে হ্যাঁ বলতে পারি না?"[15] (৩১) এই টিপিকাল মেয়ে হয়ে ওঠার বা তৈরী করার রাজনীতির বাইরে গিয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার সাহস যোগায় আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনগুলো।

নারীর লেখালেখির এই নিজস্বতার পেছনে পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া স্বীকারোক্তিমূলক লেখার অবদান অনেকটা যে ধারা আমেরিকা, ইংল্যান্ডে Confessional School of Poetry হিসেবে শুরু হয়েছিল; সিলভিয়া প্লাথ, অ্যান সেক্সটন ও অ্যাড্রিয়ান রিচ- দের হাত ধরে নারীদের লেখালিখিতে ক্রমশ বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে পড়ে। এবং ভারতবর্ষেও কমলা দাসের(১৯৩৪-২০০৯) হাত ধরে তাঁর প্রবেশ ঘটে এবং বাংলা সাহিত্যও তাকে গ্রহণ করতে পিছপা হয়নি। তার একটি বড় কারণ হলো যে এই ধরনের কবিতা ভাবনা শুধুমাত্র তত্ত্ব মুখাপেক্ষি নয়; শুধু গুরুগম্ভীর বাকচাতুর্য্যের অবতারণা নয়, বরং অস্তিত্বের তাড়না এই কবিতাগুলোর সৃষ্টির উৎস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে অস্বস্তির সংকট ঘটেছিল মানুষের জীবনে তারই ফলশ্রুতি এই ঘরানার কবিতায় প্রকাশিত হয়। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই সাহিত্যের ভিতর প্রতিভাত হয়ে থাকে। এবং নারীদের কবিতায় অন্য আর এক মাত্রা যোগ করে। নারী লেখকরা বিশ্বের এতদিন যাবৎ অপ্রকাশিত পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ভয়ানক রূপগুলো প্রকাশ করতে শুরু করে। কবিতায়





প্রকাশিত "আমি" খুব সোজাসুজি পাঠকের চোখে চোখ দিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে। নারীদের লিখিত কবিতা নতুন এক মাত্রা পায়। বাংলা কবিতায় তার প্রবেশ ঘটলেও ব্যপ্তি ঘটে প্রধানতঃ নব্বই দশকের পরে। ইতিমধ্যে নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে। যশোধারা রায়চৌধুরীর ভাষায়:

গোড়ার দিকে দ্বৈতবাদকে মেনে নিয়েই নারীবাদের প্রথম প্রণেতারা ভেবেছিলেন, নারীকে হতে হবে পুরুষের সমান ও সমকক্ষ। সেই হয়ে ওঠার তাগিদে এমনকি নিজের নারীত্বকে বিসর্জনও দিতে হতে পারে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীদের কাছে চিন্তাটা পাল্টেছে বলেই, নারীবাদী এখন আর নারীকে নির্য্যাতিত, পুরুষের শাসনের বলি হিসেবেই শুধু দেখাননা, বরঞ্চ নির্মাণ করতে চান নারীর নিজস্ব বিশ্ব। আর সেখানেই এসে পড়ে নারীকে বিষয়ী করে তোলার প্রচেষ্টা।[১৬]

এবং নারীর এই "বিষয়ী" হয়ে ওঠার ব্যাপারটা এই ধরনের স্বীকারোক্তিমূলক বা আত্মজৈবনিক লেখার ভিতর খুব স্পষ্ট ভাবে উঠে আসে। পুরুষদের প্রথাগত কবিতায় বা নারীদের অন্যান্য কবিতাগুলোকে নারী কেবল মাত্র একটা বিষয় হয়ে থেকে গেছে দীর্ঘকাল। যাকে মডেল করে কবিতার পর কবিতা লেখা হয়েছে। ভিন্ন ধরনের কবিতার ভিতর ভিন্ন নারী মূর্তি তৈরি হয়েছে যেখানে। সুতপা ভট্টাচার্য তার মেয়েলী পাঠ গ্রন্থে খুব ভালো করে দেখিয়েছেন তথাকথিত পুরুষদের কবিতায় কিভাবে নারী প্রধানতঃ অনুপ্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠে আসে। কিন্তু তার নিজের বেলায়? "বিষয়" থেকে "বিষয়ী"-তে পরিবর্তিত হতে গেলে যে সংঘর্ষ লাগে, পরিবর্তনের পরিশ্রম লাগে, আজকের নারীদের কবিতায় সেই ব্যাপ্তি আছে। কারণ "নিজেকে বিষয়ী হিসেবে জানতে গেলে কোন মেয়েকে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেই পরম্পরার বিপরীতমুখে"[১৭]। নব্বই দশক পরবর্তী লেখালিখিতে খুব প্রাসঙ্গিকভাবে সেই ঘুরে দাঁড়ানো আছে। সম্মুখ সমর নয় তা বলে, আছে অন্তর্লীন লড়াই। সমাজের সঙ্গে তো আছেই তার থেকে বেশী আছে নিজের সঙ্গে। নিজস্ব মেয়েলী সত্তা থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাতের দাগ ঘষে ঘষে তুলে দেওয়ার ভীষণ প্রচেষ্টা। প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ অত সহজে তুলে ফেলা সহজ নয় জেনেই মাঝে মাঝে সমূলে কুঠারাঘাত করতে হয়। এবং বিনির্মাণ করতে হয় নতুন চেতনার। ভাষায়, অলঙ্কারের, ভাবনায় পরিবর্তিত হতে থাকে নারীর দেখার চোখ। তাই এই সময়ের আরেক কবি মন্দাক্রান্তা সেন যখন বলেন, " মেয়েদের লেখালিখিতে যৌনমুক্তির বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। যৌনতাকে তারা নিজেদের কনট্রোলে এনে একটা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে"।[১৮] একটা ব্যাপার পরিস্কার হয়ে যায় যে একজন পুরুষ কবি যেভাবে তাদের যৌন চিন্তার ভিতর নারীদের নিয়ে এসেছে, স্বভাবতই একজন নারী সেভাবে কখনো ভাববে না। এবং

এই ভাবনাটা সুপ্রকাশিত হতে পেরেছে এই কবিদের হাত দিয়ে। তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত কবি যখন লেখেন :

শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরী-
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে[১৯]

সেই নারীর বিষয় রূপান্তরই উঠে আসে পুরুষ-নারী সম্পর্কের ভিতর। তাই মন্দাক্রান্তার মতো কবি পরিপ্রেক্ষিতটা বদলে দেন। যৌন আনন্দ পাওয়ার মতো ক্ষমতা, যেটা আসলে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের একটা প্রকাশ ভঙ্গি, মন্দাক্রান্তার কবিতায় নারীর হাতে উঠে আসে। একধরণের অন্য নিয়ন্ত্রণ সে তুলে নেয় নিজের হাতে। তাই যৌন-নিয়ন্ত্রণও তার কাছে নারীবাদী মনোভাবের একটা দিগন্ত। তিনি ব্যাখ্যা করেন, “যৌনতা আমার আত্ম-উন্মোচন। নিজেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফালাফালা করে আত্মজিজ্ঞাসা। যৌনতা যেখানে একটা শক্তির ক্রমবিকাশ, যা ধীরে ধীরে আমার আত্মার সঙ্গে নিজেরই পরিচয় ঘটাচ্ছে। আমার কাছে যৌনতা শারীরিক নয়, তার স্থান আমার মেধায় । আবহমান যৌন অবদমনের পর অবশ্যম্ভাবী যৌন মুক্তির মারাত্মক প্রকাশে ফেটে পরতে চায় আমার লেখালিখি”[২০]। এবং তাই তার কবিতা প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে প্রথাগত কবিতা চর্চার উল্টোদিকে অবস্থান করে। আর শুধু মন্দাক্রান্তাই নয়, পরবর্তী সময়ে লিখতে আসা মহিলা কবিরা স্বাভাবিকভাবেই অন্য বয়ানের চর্চা করে চলেছেন।

**তথ্যসূত্র :**


১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, “ মধুর কবিতার বিরুদ্ধে”। পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১০০
২। তদেব, পৃ. ১০০
৩। তদেব, পৃ. ৪২
৪। মল্লিকা সেনগুপ্ত । কবিতাসমগ্র, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮(২০১২), পৃ.১১৫
৫। Rich– Adrienne– Of Woman Born- Motherhood as Experience and Institution. London– W.W.Norton & Company– 1995.
৬। মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবিতাসমগ্র, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮(২০১২), পৃ.১১৫
৭। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বিরহ নামের মন কেমনগুলি, কলকাতা, সিগনেট প্রেস,২০১৮। বন্দ্যোপাধ্যায় ,সংযুক্তা, “আমার কবিতা ভাবনা”। কবিতা প্রতিমাসে, কলকাতা, প্রতিভাস, জুন,(৩:২) ২০০৭। পৃ: ১৯-২০
৮। কৃষ্ণা বসু,“আমি নারী এবং কবি- দুইই সমান সত্তা”। কবিতা প্রতিমাসে, কলকাতা, প্রতিভাস, জুন,(৩:২) ২০০৭, পৃঃ ১৪-১৫




ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII


৯। সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, “ আমার কবিতা ভাবনা”। কবিতা প্রতিমাসে , কলকাতা, প্রতিভাস, জুন, (৩:২) ২০০৭। পৃ: ১৯-২০
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, আলোকাকিমা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ২০১৩।
১০। তদেব, পৃ. ১৯
১১। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, “ নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে”। কবিতা প্রতিমাসে, কলকাতা, প্রতিভাস, জুন,(৩:২) ২০০৭। পৃ: ২০-২১
সেনগুপ্ত, সুতপা, “সত্যের বুনোট খেলা”। কবিতা প্রতিমাসে, কলকাতা, প্রতিভাস, জুন, (৩:২) ২০০৭। পৃ: ২২-২৩
১২। সুতপা সেনগুপ্ত, ছোকরা ছোকরা শ্যাম রায়-বাই। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স,২০০৩। রায়চৌধুরী, যশোধারা। “অনবদমনের অসম্পূর্ণ আকাশ”।
১৩। https-//yashodhara1965.wordpress.com///2014/04/21/
১৪। অনবদমনের-অসম্পূর্ণ-আকাশ/ ১০.০১.২০২৩
১৫। সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েলি পাঠ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০।
১৬। সেন, মন্দাক্রান্তা। “মন্দাক্রান্তা সেনের সঙ্গে আলাপচারিতায়” শুধু বিঘে দুই। হাওড়া, জানুয়ারি ২০১৪ (২) পৃ: ৫-২৭
১৭। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সমগ্র ১। কলকাতা, আনন্দ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫(১৯৯২)।
১৮। মন্দাক্রান্তা সেন, “মন্দাক্রান্তা সেনের সঙ্গে আলাপচারিতায়”, শুধু বিঘে দুই। হাওড়া, জানুয়ারি ২০১৪ (২) পৃ: ৫-২৭
১৯। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ ১, কলকাতা, আনন্দ , ১৯৯৫, পৃ. ৬৭

# বন্দে আলী মিয়ার গান : একটি পর্যালোচনা

নাফিসা ইয়াসমিন

বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক হলেন বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬ - ১৯৭৯)। সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ এই সাহিত্যিক, সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই অকাতরে কলম চালিয়েছেন, ফলিয়েছেন অজস্র ফসল। কবি- কথাসাহিত্যিক- শিশুসাহিত্যিক-নাট্যকার-চিত্রশিল্পী বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পাবনা শহরতলী রাধানগরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত কবি হিসাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। তাঁর আবির্ভাবের সময় বাংলা কাব্য ধারায় চলেছিল নানা পালাবদল। একদিকে তিরিশের কবিদের সরব উপস্থিতি এবং অন্যদিকে রবীন্দ্রবিরোধিতার নতুন সুরে ঝংকৃত হয়েছিল বাংলা কাব্যের আঙিনা। বাংলা কাব্যের এই বিচিত্রধারায় আবির্ভূত হয়েও তিনি রচনা করেছিলেন নিজস্ব কাব্যকুটির। তিনি পল্লির নিস্তরঙ্গ জীবন ও নদীচরের সাধারণ মানুষের নিরাভরণ জীবনাচরণের মধ্যে কবিতার রসদ সংগ্রহ করে, চিরায়ত বাংলাকাব্যের ধারায় সুনির্দিষ্ট করেছেন আপন স্থান। স্বীয় প্রতিভার বলেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বন্দে আলী মিয়া।

বাংলা সাহিত্যে বন্দে আলী মিয়া একজন কবি হিসাবে সমাধিক পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও, তাঁর বিচিত্র সাহিত্যকর্মের মাঝে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে ‘গান’। তাঁর লেখা গানের কথা আমাদের অনেকের কাছেই রয়ে গেছে অজানা। বন্দে আলী মিয়ার গান তথা ‘বন্দে গীতি’ আজ অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। তবে বাংলা সঙ্গীতে বন্দে আলী মিয়ার বেশ অবদান আছে। কবিতা ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তিনি যেমন যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও হয়েছেন সফল। তাঁর সঙ্গীত সম্পর্কে গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন —

‘কলগীতি’ ও ‘সুরলীলা’ রচনা দু’খানি গানের বই। নানা বিষয়ে কবি বন্দে আলী মিয়া গান লিখেছেন। এ বইয়ে পল্লীগীতি আছে, দেশপ্রেমমূলক গান আছে, হাসির গান আছে, আধ্যাত্মিক ও মরমী গানও আছে। তাঁর গানের যে ভাষা সে ভাষা লিরিকধর্মী।”[১]

‘কলগীতি’ এবং ‘সুরলীলা’ ছাড়াও ‘গীতি চকোর’ নামে আরও একটি গানের বইয়ের নাম জানা যায়। তবে তাঁর ‘কলগীতি’ ব্যতীত অন্য দুটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বন্দে আলী মিয়ার ‘কলগীতি’ নামক গীতি সংকলনটি বিভিন্ন প্রকার গানের সংগ্রহ। এটি মোট ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত — আধুনিক গান, পল্লীগীতি, দেশপ্রেমমূলক গান, হাসির গান, হাম্দ ও নাত্ এবং আধ্যাত্মিক গান।





বন্দে আলী মিয়া তাঁর আধুনিক গানগুলিতে রোমান্টিকতা, প্রেমিকসত্তা, বিরহ-বেদনাকে অনুপম তুলিতে অঙ্কন করেছেন। তাঁর আধুনিক গানের সংখ্যা ৫০টি, এটিতে বিচিত্র রাগ ও তালের ব্যবহার করেছেন গীতিকার। ‘পূর্ণিমা চাঁদ’ সম প্রেমিকাকে ঘিরে কবির সকল আহ্লাদ, প্রেমিকার ‘প্রেম পরসাদ’ তাঁর একান্ত কাম্য। কিন্তু নিষ্ঠুর প্রেয়সী তার প্রেমকে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছে, তাই কবির অন্তিম আকুতি —

“চেয়েছিনু মালাখানি
দিলে মোরে আঁখি জল
মাধবী নিশীথে আজি
তাই মেঘ ছলছল।”[২]

প্রেমিকার প্রেমে বিভোর কবি হৃদয় রোমান্টিকতার পাখনায় ভর করে উড়ে যেতে চেয়েছেন নীল নভে, চাঁদ সম প্রেয়সীকে সে চোখে চোখে রেখেছেন। প্রিয়াকে ফুল ভেবে বুকে আগলে রেখে যেতে চেয়েছেন অভিসারে —

“ঘরেতে আজ রইবো নাকো
যাবো তমাল বনে
দীঘির জলে ঘুমাইরে চাঁদ
দেখবো দুইজনে।”[৩]

তবে শুধু প্রেম নয় বন্দে আলী মিয়ার আধুনিক গানে আছে বিরহ-বেদনার সুর। যে ভুবন ভরা ফাগুনের আগমন, দখিনা বাতাস, অশোক-চাঁপার হিল্লোল কবির জীবনকে পুলকিত করেছিল, তা যেন ক্ষণিকের বিরহে তছনছ হয়ে গেছে। তাই কবির বেদনাহত হৃদয়ের উচ্চারণ —

“ভালোবেসে ছিনু তাই
দিলে এত জ্বালা —
ফুল নিয়ে রেখে গেলে
কন্টক মালা।”[৪]

‘পল্লীগীতি’-তে আছে পল্লিবাংলার নিরাভরণ রূপের প্রতিচ্ছবি। আসলে বন্দে আলী মিয়া ছিলেন আদ্যন্ত পল্লিকবি। গ্রামকে তিনি ‘মায়ের সমান’ বলে অভিহিত করেছেন, ভালোবেসেছেন গ্রাম্য নিতান্ত সাধারণ মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনকে। ‘পল্লীগীতি’-তে পল্লিবালা, পল্লিবধূদের জীবনাচরণ, আচার-ব্যবহার ফুটে উঠেছে। পল্লিবালা ও বধূদের জীবনের অনেকটা সময় কাটে পুকুরে কিংবা নদীতে, ‘পল্লীগীতি’র গানে গীতিকার বন্দে আলী মিয়া সেই হৃদয়গ্রাহী চিত্রের সুনিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। কবির পরাণ বন্ধু, মানস কন্যা পল্লিবালা

একলা কলসী কাঁখে জল আনতে যায়, গেঁয়ো কলমিলতা ফুলের বাঁধনে তার দুই পা জড়িয়ে ধরে, আকুলিত বাতাস তাকে গান শোনায়। গেঁয়ো বাঁশির সুরে কবির মানসকন্যার উদাসী মন হারিয়ে যায়, স্বপ্নে বিভোর কন্যা নদীতে গাগরী ফেলে রেখে খালি হাতে ফিরে আসে। গ্রাম্যজীবনের এই নিরাভরণ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে বন্দে আলী মিয়ার পল্লীগীতিতে:

"জল আনিতে গিয়ে কন্যা মন হারিয়ে আসে —
তার সে মনের স্বপন জাগে।
সাঁঝের আকাশে;
গাঁয়ের বাটে বাজারে বাঁশী
সেই না সুরে মন উদাসী
জলকে আসে খালি হাতে
গাগরী ফেলিয়া।।"[৫]

কবির মানস প্রেয়সী সোনারবরণ কন্যা, মেঘের বরণ কন্যারা থাকে পদ্মাপারে ময়নামতীর চরে। সোনার বরণ কন্যার রূপ উছলে ঝরে পড়ে মাটিতে, পুবালী হাওয়ায় ওড়ে তার হীরে মোতির শাড়ী। এই সোনার বরণ কন্যার জন্য কবিমন উতলা, তার ভালোবাসা কবির একান্ত কাম্য। আবার কবি ভালোবেসেছেন মেঘের বরণ মেয়েকে, সারাজীবন তার জন্য তিনি অপেক্ষারত। মেঘবরণ কন্যা এলে কবি তাকে শামুকমালা পরিয়ে বরণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ প্রেম স্থায়ী হয়নি, কবি-হৃদয়ের চিরন্তন ভালোবাসা পর্যবসিত হয়েছে বেদনায় —

"আজ আমি যে বিজন মাঠে
বাঁশী বাজাই একা
কবে তুমি আসবে কন্যা
মিলবে তোমার দেখা।
বাতাস কাঁদে নিরবধি
কেঁদে চলে পদ্মানদী
তোমার লেগে জলের রেখা
আঁকি বালুর'পরে।"[৬]

বন্দে আলী মিয়া দেশপ্রেমমূলক গান রচনায় কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও এ গানগুলি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে গীতিকার একদিকে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র তুলে ধরেছেন অন্যদিকে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য পতিত জমি আবাদ করতে কৃষক সমাজকে আহ্বান করেছেন। বন্দে আলী মিয়ার





উচ্চারণ :

"ফসল ফলাও সবে
ফসল ফলাও
দুই মুঠা খেয়ে যদি
বাঁচিবারে চাও।
রেখো না পতিত জমি — কথাটি শোনো
আনারস ওল আর যা হয় বোনো।"[৭]

আপন দেশের প্রতি ভালোবাসায় কবির গান :

"রূপ কাহিনীর দেশ আমাদের
ফসলভরা মাঠ
পণ্য বোঝাই পালের নায়ে
ভরা নদীর ঘাট।
ছায়া শীতল গাঁয়ের মাঝে
কৃষাণ বধূর কাঁকন বাজে
সন্ধ্যা সকাল দোয়েল ঘুঘুর
কূজন মুখর বাট।।"[৮]

জননী জন্মভূমি বন্দে আলী মিয়ার কাছে অতীব প্রিয়, আর দেশমাতার স্বাধীনতা তাঁর কাছে সোনার ফসল। তাই যুবসমাজকে তিনি আহ্বান করেছেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করেছেন তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে —

"শোনোরে যোয়ান —— দেশের লাগিয়া
আসিয়াছে আহ্বান,
চারিদিকে আজ ঘিরেছে শত্রু
বিপন্ন ধন প্রাণ।
দেশের যতেক বোন আর ভাই
সাড়া দাও সবে — সময় যে নাই —
লও হাতিয়ার — চলো আগাইয়া
রাখো গো দেশের মান।।"[৯]

এছাড়াও বন্দে আলী মিয়ার দেশাত্মবোধক গানে মুসলিম জাতির বীরত্বের উপর তিনি গর্ববোধ করেছেন। বার বার মুসলিম জাতিকে নির্ভিকবীর জাতি আখ্যা দিয়েছেন —

"মোরা মুসলিম — মোরা বীর জাতি

মোরা চির নির্ভয়"[১০]

হাসির গান বাংলা সঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বন্দে আলী মিয়া হাসির গান রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই গানে তিনি লোক সঙ্গীতের আদলে সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। বিশেষ করে সমাজ সংসারের ব্যক্তিনির্বেশেষে মজা-মশকরা জাতীয় সম্পর্কের টানাপোড়েনকে গীতিকার বন্দে আলী মিয়া সুনিপুণ হস্তে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর হাসির গানে দাদি-নাতি, দেওর-ভাবি, শালী-বোনাই — এই সম্পর্কগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

বন্দে আলী মিয়ার একটি হাসির গান হল —

"বৌয়ের চেয়ে শালী মিঠে — ভাতের চেয়ে ফ্যান

কও তোমরা পাঁচজনেতে এমন হলো ক্যান !

... ... ...

ঘর ছাড়বো দুয়ার ছাড়বো ছাড়বো ঘরের নারী

শালী লয়া দেশ ছাড়িয়া হবো দেশান্তরী —"[১১]

তাঁর হাসির গান একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল; এখনো শ্রমজীবী মানুষের মুখে তাঁর গান শোনা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। নজরুল গবেষক আসাদুল হক এ বিষয়ে লিখেছেন —

"পাবনা শহরের শিল্পী মাস্টার নান্নু বন্দে আলী মিয়ার একটি গান গেয়ে চল্লিশের দশকের শুরুতে প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছিলেন। গানের প্রথম চরণ নিম্নরূপ :'

ও সোনার ভাবীরে —

আমি করি কি উপায় !

তোর সাথে মোর ভাব রাখা দায়।।"[১২]

'হাম্‌দ ও নাত্' অংশের গানগুলিতে বন্দে আলী মিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা ও রসুল (সাঃ) এর প্রশংসা তথা গুণগান করেছেন। সারা জাহানের তামাম দুনিয়াবাসী (মুসলিম সম্প্রদায়) দয়ালু খোদাকে সেজদা জানিয়ে গুণগান বন্দনা করে এবং শেষ-নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে ভালোবাসে। কবি বন্দে আলী মিয়াও তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে সেজদায় রত হয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন —

"মাবুদ মোরে ক্ষমা করি পারে দিয়ো নিয়া

পুলসুরাতের নীচে আছে দোজখ হাবিয়া,

রহমানুর রহিম প্রিয়



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

আমার সেজদা নিয়ো নিয়ো

মনে মুখে জপি যেন তব সুধা নাম"[১৩]

'হাম্‌দ ও নাত্' অংশে বন্দে আলী মিয়া হাম্‌দ, নাত্, মারফতি, কাওয়ালী, ঈদের গান ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের ইসলামিক গানের অবতারণ করেছেন। এছাড়াও 'কলগীতি' সংকলনের সর্বশেষ পর্যায় হল 'আধ্যাত্মিক' গান। এটি মূলত মারফতি সঙ্গীতের অংশ বিশেষ। বন্দে আলী মিয়ার আধ্যাত্মিক গানের মধ্যে দিয়ে আত্মতত্ত্বের উপলব্ধির দ্বারা খোদার আনন্দময় সত্তার অনুভূতির সর্বাত্মক প্রকাশ ঘটেছে। তাই মহান আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করে কবির অন্তরের কলুষতা দূর হয়ে গেছে। প্রভুর প্রেমে সমর্পিত কবি-হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গানের মধ্যে—

"অগতির তুমি গতি

নিখিল অখিল পতি

তুমি হে করুণা করো

রাখো এ দীন-প্রাণ।"[১৪]

বলাবাহুল্য বন্দে আলী মিয়ার সঙ্গীত বেশ শিল্পগুণ সম্পন্ন। তৎকালীন সময়ে 'বন্দেগীতি' বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, বর্তমানেও বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর গান শোনা যায়। অনেক খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী বন্দে আলী মিয়ার রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — শেফালী সেনগুপ্ত, জয়ন্তী বসু, গিরীন চক্রবর্তী, মলিনা বসু, হেনা দাস প্রমুখ। এমনকি অমর কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন এবং সোহবাব হোসনেও তাঁর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর বহুগান কলকাতার 'টুইন', 'মেগাফোন', 'হিন্দুস্থান রেকর্ড', 'সেনোলা', 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস' — ইত্যাদি কোম্পানীতে রেকর্ড করা হয়েছিল। বন্দে আলী মিয়ার গানের প্রসঙ্গে এস.এম. আব্দুল লতিফ লিখেছেন —

"সঙ্গীত জগতেও বন্দে আলী মিয়ার অনেক অবদান রয়েছে। 'সুরলীলা' এবং 'কলগীতি' তাঁর সঙ্গীত পুস্তক। তাঁর রচিত গানগুলো এক কালে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি নানাশ্রেণির সঙ্গীত রচনা করেছেন। যেমন হামদ ও নাত, অধ্যাত্মিক সঙ্গীত, পল্লীগীতি, হাসির গান, পালাগান ইত্যাদি।"[১৫]

অর্থাৎ কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার-শিশুসাহিত্যিক বন্দে আলী মিয়ার সৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যের মতো বাংলা সাহিত্যে গীতিকার বন্দে আলী মিয়াও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, একথা অনস্বীকার্য।

**তথ্যসূত্র :**

১। গোলাম সাকলায়েন। বন্দে আলী মিয়া (জীবনী গ্রন্থমালা)। ঢাকা, বাংলাদেশ : বাংলা একাডেমী। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮। পৃ. ৯

২। আলাউদ্দীন আল আজাদ (সম্পা.)। বন্দে আলী মিয়া রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। ঢাকা, বাংলাদেশ : বাংলা একাডেমী ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৯৭। কলগীতি। পৃ. ২৭৯

৩। তদেব। পৃ. ২৮৩

৪। তদেব। পৃ. ২৮৭

৫। তদেব। পৃ.- ৩০৬-৩০৭

৬। তদেব। পৃ. ৩০৭

৭। তদেব। পৃ.-৩২৩

৮। তদেব। পৃ.- ৩২২

৯। তদেব। পৃ. ৩২৫

১০। তদেব। পৃ.- ৩২৫

১১। তদেব। পৃ. ৩৩০

১২। মোহাম্মদ আবদুল হাই (সম্পা.)। কবি বন্দে আলী মিয়া স্মরণিকা। কবি বন্দে আলী মিয়া'র পঞ্চদশ মৃত্যুবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান। ঢাকা, বাংলাদেশ : কবি বন্দে আলী মিয়া স্মরণ পরিষদ। আসাদুল হক। গ্রামোফোন রেকর্ডে বন্দে আলী মিয়া। প্রকাশ সাল : জুন ১৯৯৪

১৩। প্রাগুক্ত। কলগীতি। পৃ.- ৩১০

১৪। তদেব। পৃ.- ৩৩৫

১৫। ড. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। কবি বন্দে আলী মিয়ার জীবন ও সাহিত্য। ঢাকা, বাংলাদেশ : মম প্রকাশ। প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১৮। পৃ.- ৩৪



## পুরাণ-প্রতিমাকে সমকালীন তাৎপর্যে অবতারণা : প্রসঙ্গ গণেশ বসুর কবিতা

**নিখিলচন্দ্র মাহাতো**

পুরাণ নিয়ে মানুষের আগ্রহের অন্ত নেই। দেশে দেশে কালে কালে নানান দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণ নিয়ে চর্চা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যই পুরাণ-আশ্রিত। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ মুখ্য চরিত্র কৃষ্ণ। কাহিনিতে অবশ্য পুরাণের চেয়ে লোকমুখে প্রচলিত কৃষ্ণ-কথার প্রাধান্য রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রের সঙ্গে অনান্য ও আঞ্চলিক দেবদেবীর মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট স্থান, কাল, পাত্রের পারিপার্শিক পরিস্থিতি, বিশ্বাস, দর্শন তথা যুগ-রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরাণ-প্রতিমার নবরূপায়ণ ঘটানোর রীতি শুরু হয়ে গিয়েছিল মধ্যযুগেই। এজন্যই কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ হয়ে উঠেছিল অনেকাংশে বাঙালির রামায়ণ। পুরাণের দেবাদিদেব মহাদেবকে ভারতচন্দ্র নামিয়ে এনেছিলেন ধূলিধূসরিত মাটির পৃথিবীতে। পুরাণ-প্রতিমাকে সমকালীন প্রেক্ষাপটের উপযোগী করে অবতারণা করার এই প্রথা আধুনিক যুগেও বিদ্যমান। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাম-কাহিনির বিন্যাস ঘটিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের প্রেক্ষিতে বলিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধে ভাস্বর করে "জনা", "কৈকেয়ী", "তারা", "শকুন্তলা" প্রমুখকে "বীরাঙ্গনা" করে তুলেছেন। বাঙালির মননে কর্ণের মাহাত্ম্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কর্ণ কুন্তী সংবাদ"-এর একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

এবার একটু ভিন্ন ধরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। কবি কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতার কয়েকটি পংক্তি—

১) "মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।"
২) "আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর।"
৩) "আমি ব্যোমকেশ, ধরি" বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।"
৪) "আমি ছিন্নমস্তা চন্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী।"
৪) "আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন।"
৪) "আমি পিনাক-পাণির ডমরু-ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ-প্রচন্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!"[১]

দেখা যাচ্ছে কবি আত্মশক্তির স্বরূপ উন্মোচন করতে পৌরাণিক নানা চরিত্রকে ব্যবহার করছেন। কিন্তু সেইসব চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাহিনিটিকে বিস্তারিতভাবে আনছেন না,

কাহিনিটি থাকছে ব্যঞ্জনায়। চরিত্র-নামটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মানসপটে ভেসে উঠছে চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঘটনাটি। উক্ত চরিত্র এবং পৌরাণিক ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত না থাকলে কবিতাটির সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা পাঠক ধরতে পারেন না। আধুনিক সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতায় মিথ ব্যবহারের এই রীতিটিই অধিক প্রচলিত।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতাতেও মিথ এসেছে। এ প্রসঙ্গে যাঁর নাম উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তিনি হলেন কবি বিষ্ণু দে। প্রায় সমস্ত কবিই কবিতায় নানাভাবে মিথকে ব্যবহার করেছেন কিন্তু বিষ্ণু দে-র মতো এতো ব্যাপকভাবে কেউ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণেই রয়েছে পুরাণের দু'টি চরিত্র - "উর্বশী ও আর্টেমিস" (১৯৩২)। শুধু প্রথম কাব্য নয় বরং তাঁর সমগ্র কাব্য-পরিক্রমা জুড়েই রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথের ছড়াছড়ি। আমাদের আলোচ্য কবি গণেশ বসু, বিষ্ণু দে-র কবিতার মিথ নিয়ে একটি প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও এই অগ্রজ কবির সঙ্গে গণেশ বসুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁদের মধ্যে নিয়মিত চিঠি লেখালেখিও ছিল। গণেশ বসুর কবিতা পাঠ করে নিজের মতামত জ্ঞাপন করতেন তিনি। এরূপ হৃদ্যতার কারণেই বোধহয় গণেশ বসু অগ্রজ কবির কাব্যরচনার এই বিশেষ রীতিটির (মিথকে আধুনিক তাৎপর্যে ব্যবহার) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে মার্কসবাদী আদর্শে দীক্ষিত এই কবি বলেন— "কার্ল মার্কস তাঁর লেখাতে প্রচুর পরিমাণে মিথ ব্যবহার করতেন। তাঁর সমকালীন কবিদের কবিতার লাইনও ব্যবহার করতেন। শুধু সমকালীন নয়, নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে গ্যেটে, শেক্সপিয়ার, হাইনে সহ একাধিক কবি সাহিত্যিকের লাইন ব্যবহার করেছেন। হয়তো সেই মার্কসের প্রভাব আমার মধ্যে পড়েছে। বিষ্ণু দে'র এই প্রবণতা ছিল। জীবনানন্দ দাশের শেষের দিকের অনেক কবিতায় মিথ পাবে। পরবর্তীকালের কবি তরুণ সান্যালের, অলোকরঞ্জনের কবিতাতেও মিথ এসেছে। তবে আমি মার্কসের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছি বলে মনে করি।"[২]

গণেশ বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "বনানীকে কবিতাগুচ্ছ"(১৯৬৪)। মিথের ব্যবহার দেখা যায় কবির এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই -

"যেদিন হারিয়ে গেছে, খুঁজি বৃথা দুর্বাশার এ ক্রুদ্ধ শহরে
প্রেমের আকাশ কিংবা ধুলোয় লুটোক যতো স্মৃতির কঙ্কণ
বনানী, এখনো তুমি চেতনাচেতন।"[৩]

ঋষি দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন শকুন্তলাকে। ফলে দুষ্মন্ত বিস্মৃত হয় শকুন্তলাকে। সেখানে রাজার সঙ্গে ঋষিকন্যার প্রেমে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি আর্থসামাজিক বৈষম্য, কিন্তু বাধ সেধেছিল ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ। অন্যদিকে অভিজাত পরিবারের বনানীর সঙ্গে "অনভিজাত", "উঞ্ছজীবী" কবির প্রেমকে সমূলে বিনষ্ট করে বনানীর ক্রুদ্ধ





অভিভাবকের রক্তচক্ষু। কবি অনুভব করেন চারিদিকে ঈর্ষা, হিংসা, ক্ষোভের প্রতিবেশে প্রেম, ভালোবাসার অবকাশ নেই। এই উপলব্ধি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যর্থতা থেকে নয়, বরং অবক্ষয়িত যুগপ্রতিবেশের সামগ্রিক পর্যালোচনায়। স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার মতো সুকুমারবৃত্তিগুলি শুকিয়ে গিয়ে মানুষে মানুষে স্বাভাবিক হৃদ্যতাটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় কবি বলতে বাধ্য হন— "খুঁজি বৃথা দুর্বাসার এ ক্রুদ্ধ শহরে প্রেমের আকাশ"।

মিথ ব্যবহার করে সমকালীন যুগপরিবেশটিকে অল্প কথায় সুগভীর ব্যঞ্জনা-সহযোগে স্পষ্ট করা যায় ঠিকই কিন্তু এর একটা নেতিবাচক দিকও রয়েছে। যদি কোনো মিথ পাঠকের কাছে অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত থাকে তাহলে সেই কবিতার রসাস্বাদনে খানিকটা বিঘ্ন ঘটতে পারে। গণেশ বসুর ব্যবহৃত অধিকাংশ মিথ অতিপরিচিত হলেও কিছু মিথ আছে যা খুব পরিচিত নয়। যেমন "অর্ফিয়ুস"। গ্রিকপুরাণের এই চরিত্রটি নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতাতেও এসেছে —'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী'। বিদগ্ধ পাঠকের কাছে "অর্ফিয়ুস" অবশ্যই পরিচিত, কিন্তু একদম সাধারণ পাঠকের কাছে ততটা পরিচিত নয়। অর্ফিয়ুস একসময় গ্রীসের প্রধান গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কথিত আছে, তাঁর সঙ্গীতের সুরে মানুষ তো বটেই বন্যপশুরাও সম্মোহিত হয়ে যেত। "বনানীকে কবিতাগুচ্ছ"-এর একটি কবিতায় কবি বলেন -

"অর্ফিয়ুস নই আমি, খরনাদ, মন উচাটন।"[৪]

অর্থাৎ অর্ফিয়ুসের মতো বীণার ঝঙ্কারে তিনি মোহিত করেন না, বরং খরনাদে তিক্ত সত্যকে প্রকাশ করে থাকেন। অবশ্য কবি "অর্ফিয়ুস নই আমি" বললেও একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অর্ফিয়ুসের মিল রয়েছে। তা হল উভয়ের প্রেমেরই বিয়োগান্ত পরিণতি। ব্যক্তিগত জীবনে কবি বনানীকে পাননি। অন্যদিকে অর্ফিয়ুসের স্ত্রী ইউরিডিসি বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই সাপের কামড়ে মারা যায়। অর্ফিয়ুস স্ত্রীকে ফিরে পেতে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেন, এমনকি বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নরকেও যান। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না। অর্ফিয়ুসের সম্পর্কে যদি কোনো পাঠক বিশেষ কিছু না জানেন তবুও কবিতাটি তাঁর কাছে একভাবে ধরা দেবে ঠিকই, কিন্তু কোন ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করতে কবি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পুরাণপ্রতিমাগুলির মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষে অর্ফিয়ুসকে বেছে নিলেন তা অজ্ঞাতই রয়ে যাবে।

"বনানীকে কবিতাগুচ্ছ" রচনার পর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-বিরহের গণ্ডির বাইরে কবি যখন দৃষ্টি ফেরালেন, সমকালীন যাপনযন্ত্রণা তীব্রভাবে অনুভূত হল। খাদ্যসংকটে উত্তাল জনতাকে নিরস্ত করতে শাসক বলপ্রয়োগ করলে কবির অন্তর্নিহিত প্রতিবাদী সত্তা দুরন্ত "সমুদ্রমহিষ"—এর মতোই ফুঁসে ওঠে। কিন্তু জোটবদ্ধতার অভাবে দুর্দান্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মহাভারতের অভিমন্যুর মতোই একাকী লড়াই করতে হয়। ফলে নিষ্ফল ক্রোধ একসময় পর্যবসিত হয় হতাশায়। কবি বলে ওঠেন—

"আমরা সবাই একালে অভিমন্যু, তাই
দীনতা ব্যর্থতা ঘৃণা অবিশ্বাস ঘোরে নিরন্তর।"[৫]

এই অভিমন্যুই আবার ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয় নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা "রক্তের ভিতরে স্বপ্ন" কবিতায়—

"... মাঝে মাঝে দিন-দুপুরেই
মধ্যরাত নেমে পড়ে, নিদ্রাহারা নগরীর নানা গান, থানা-গারদের
অন্ধকার জ্বলে ওঠে, গুলি ও বোমার শব্দে কেঁপে ওঠে কংক্রিটের স্তূপ
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় শঙ্কা, ভোজালি ঝিকিয়ে ওঠে, খাকি
পোশাকে জল্লাদ নাচে, রক্ত চায় রঘুপতি রাষ্ট্রীয় জল্লাদ।
রক্তের ভিতরে স্বপ্ন, হাজার হাজার স্বপ্ন অভিমন্যু আমার অনুজ!"[৬]

ষাটের দশকের শেষার্ধে যে তরুণ দল নতুনভাবে সমাজগঠনের লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল কবি তাঁদের "অভিমন্যু" বলেছেন। মহাভারতের অভিমন্যু ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছিল সেখান থেকে বেরোনোর পথ না জেনেই। নকশাল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া যুবারাও ছিলেন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য। দূরদৃষ্টি ও নিখুঁত পরিকল্পনার পরিবর্তে একবুক স্বপ্ন, অপরিমিত আবেগ ও ধমনীতে উষ্ণ রক্ত ছিল তাঁদের সম্বল। অভিমন্যু সপ্তরথীর দ্বারা অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। কবি দেখেন একালের অভিমন্যুদেরও কখনো ফেক এনকাউন্টার (Fake Encounter), কখনো গুমখুন আর কখনোবা অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করছে "রাষ্ট্রীয় জল্লাদ" বাহিনী অর্থাৎ পুলিশ। "তবুও অভিমন্যুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রক্ত দোলে"।

নকশাল আন্দোলনের সময় প্রশাসনের কদর্য হত্যালীলার স্বরূপ উন্মোচন করতে "অভিমন্যু" ছাড়াও আরেকটি চরিত্রকে বার বার নিয়ে এসেছেন কবি। সে হল রামায়ণের জটায়ু —

"এবড়ো খেবড়ো পথ চারিদিকে হাজার বাঁকে
কাঁপে রাইফেল মর্টার তোলে এবার কারা?
ভাঙা পাঁজরেই পাল্টা আঘাত হানবে যারা
ধুঁকতে ধুঁকতে, মাটিতে পাহাড়ে স্বপ্ন হাঁকে
এ-ঝোড়ো সময় দুঃখেও জ্বলে বীর মজুর
দাপায় কাঁপায় পাহাড়ি হাওয়া
কে ছেঁড়ে জটায়ু তোমার ডানা?"[৭]





রামায়ণে বৃদ্ধ জটায়ু প্রবল পরাক্রমশালী রাবনের সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় অন্যায়কে মেনে নিতে না পেরে। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে। শুধু তাই নয়, অসহায়, ছিন্ন-ডানা, মৃত্যুপথযাত্রী জটায়ু রামকে দিয়ে যায় সীতার হদিশ। নকশাল আন্দোলনে যুক্ত তরুণরাও সমাজ বদলের প্রতিজ্ঞায় জীবন উৎসর্গ করে। নিজেরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে যায়। তাদের ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে যাতে পরবর্তী আন্দোলন পরিচালিত হয়।

মিথের ব্যবহার কীভাবে কবিতাকে একটি ভিন্ন মাত্রা দান করে তা বোঝা যাবে আরো কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করলে। কবি একটি কবিতায় বলছেন —

"অহল্যা মাটি ভাঙবে কি তোর ক্রান্তিকালে ঘুম।"[৮]

কবি আসলে সমকালীন সমাজব্যবস্থার বদল চেয়েছেন। যে সমাজব্যবস্থায় একশ্রেণির মানুষ চিরকাল শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত হয়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও যাদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম চাহিদাগুলি পূরণ হয় না। এদের শ্রমের মুনাফা ভোগ করে উচ্চবিত্ত মালিকশ্রেণি। থাবা উঁচিয়ে সমাজের মাথায় বসে তারা সমাজকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে — "মাটির চূড়ায় কারা বসে আছে দীর্ঘকাল ত্রিশিরা থাবায়"। কবি সেই অনড়, বন্ধ্যা, পাষাণ অহল্যার ন্যায় সমাজব্যবস্থার বদল চান। রামায়ণে অহল্যা দীর্ঘকাল পাষাণ হয়ে পড়ে থাকার পর চেতনা ফিরে পায় রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে। তেমনি বর্তমান সমাজ জাগবে মাও সে তুঙ, হো-চি-মিন প্রমুখের মতো কোনো জনকল্যাণকামী অবিসংবাদী নেতার উজ্জীবন মন্ত্রে। কবিতাটিতে কবি কিন্তু এত কথা বলেননি। অহল্যার মিথ ব্যবহার করে পাঠকের মনে এই সুদীর্ঘ ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন।

একই মিথকে বিভিন্ন কবিতায় আলাদা প্রসঙ্গে ও ভিন্ন ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করতেও কবি সিদ্ধহস্ত। তাই অহল্যার মিথ এরপরেও ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গে ঘুরেফিরে এসেছে একাধিক কবিতায় - 'অহল্যা অনড় স্মৃতি বিস্ফোরণ / সূর্যের দাপটে।'[৯] কবি-প্রেমিকা বনানীর সঙ্গে বিচ্ছেদের দীর্ঘকাল পরেও কবি তাঁকে ভুলতে পারছেন না। অনড় পাষাণ অহল্যা যেভাবে দীর্ঘকাল এক জায়গায় পড়েছিল একইভাবে বনানীর স্মৃতিও কবির হৃদয়ে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো জাজ্বল্যমান। আবার অন্য কবিতায় যখন বলেন— 'এখনো দু'চোখে তবু অভিশাপ অহল্যা জীবন'[১০] তখন অহল্যার মিথের তাৎপর্য সম্পূর্ণ বদলে যায়। কবি ছিলেন ছিন্নমূল একজন মানুষ। দেশভাগের অভিশাপ বহন করে মাত্র আট বছর বয়সে ভিটেমাটি ছেড়ে পিতামাতার হাত ধরে ওপার বাংলা থেকে এসে উঠেছিলেন এপার বাংলায়। নির্দিষ্ট বাসস্থানের অভাবে স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াতে হয়েছে এখানে-সেখানে। খুদের জাউ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছে অনেকসময়। অল্প বয়সেই নেমে পড়তে

হয়েছে কাজে। সামাজিক কৌলীন্যের অভাবে প্রেম বিনষ্ট হয়েছে অঙ্কুরেই। খাদ্য আন্দোলনের মতো ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, দেখেছেন পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের পরিবর্তে আন্দোলন দমন করতে প্রশাসনের নির্লজ্জ ও নির্মম প্রয়াস। জীবনের মৌলিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান যাতে হয়, সাধারণ মানুষের জীবনে যাতে কিছুটা সুদিন আসে সেই সংকল্পে দীক্ষা নিয়েছেন মার্কসীয় ভাবাদর্শে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়, দেখেন দেশনেতাদের ভণ্ডামি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য নৈতিকতার বিসর্জন। এই সমস্ত কিছু দেখেই পাষাণ অহল্যার সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পান। অভিশাপগ্রস্ত অহল্যার নিষ্ফল যাপনের সঙ্গে কবির হতভাগ্য, দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যেন একাত্ম হয়ে যায়—'এখনো দু'চোখে তবু অভিশাপ অহল্যা জীবন' কিংবা 'নিরন্ন স্বদেশে স্বপ্নে ফুঁসে ওঠে নোনা জলে এখনো অহল্যা।'[১১]

অভিমন্যু, জটায়ু, অহল্যার মতোই কবির আরেকটি পছন্দের পৌরাণিক চরিত্র হলো - ভীষ্ম। একাধিক কবিতায় এই চরিত্রটি এসেছে, এমনকি "ভীষ্ম" নামে একটি স্বতন্ত্র কবিতাও রয়েছে। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মিথ সমকালীন যাপনযন্ত্রণায় রক্তাক্ত, ক্লান্ত মানুষের অব্যক্ত আর্তনাদকে মূর্ত করে তুলেছে -

> "দুরন্ত ত্রিশূলে যেন আমাদের অস্তিত্ব এখন...
> নিরন্ন পাঁজরে ভীষ্ম কেঁদে ওঠে ভয়ংকর এ শরশয্যায়।"[১২]

দু'মুঠো অন্নের দাবি নিয়ে যে মানুষদের পথে নামতে হয় পুলিশের লাঠি, গুলিকে উপেক্ষা করে তাদের জীবন শরশয্যার মতোই কষ্টদায়ক।

আধুনিক কবিতা হল সাহিত্যের এমন একটি শাখা যেখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কবিকে তাঁর হৃদয়ে পুঞ্জীভূত সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে হয়। ফলে কবি নানারকম কৌশল অবলম্বন করেন। নিজের বক্তব্যটি পাঠকের মনে গেঁথে দিতে যেমন ছন্দ, শব্দালঙ্কারের আশ্রয় নেন পাশাপাশি স্বল্প কথায় সুগভীর তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করেন অর্থালঙ্কার। এই অলঙ্কারের হাত ধরেই কবিতায় আসে মিথ। মিথ কবিতার ব্যঞ্জনাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। পুরাণ-প্রতিমার সঙ্গে সম্পৃক্ত কাহিনিটি সমকালীন তাৎপর্য্যে অন্বিত হয়ে বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে। পুরাণের নবতর ব্যাখ্যায় সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। বিশ শতকের ষাটের দশকের কবি গণেশ বসুর কাব্যে মিথের ব্যবহার প্রচুর। খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি সমকালীন যাপনযন্ত্রণাকে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন মিথ বা পুরাণ-প্রতিমার সাহায্যে।





**তথ্যসূত্র :**


১) কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, পঞ্চসপ্ততিতম সংস্করণ - আষাঢ়, ১৪১৯ / June, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১-৬

২) ড. জয়গোপাল মণ্ডল (সম্পাদক), সাহিত্য অঙ্গন (পত্রিকা), ISSN - 23944889– VOL - VI– ISSUE - XII– July-Dec. ২০২০, পৃষ্ঠা - ২৫৭-২৫৮

৩) গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা - ১১

৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭

৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮

৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২

৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৪

৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬২

৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৬

১০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬১

১১) তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৮

১২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৫

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

# পঞ্চাশ দশকের বাংলা কবিতায় ছিন্নমূল মানুষের ইতিকথা

গাফফার আনসারী

যে কোনও আন্দোলনের সহায়ক বা পরিপূরক শক্তি হল শিল্প বা সাহিত্য। আন্দোলনকে ক্রমশ ছড়িয়ে দিতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই শিল্প বা সাহিত্য সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত আবেগ, উত্তেজনা বা উদ্দীপনা দিয়ে থাকে। যে কোনও শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশ-কাল-সমাজের একটি গভীর আন্তঃ-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। আর তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্রষ্ঠাও কালপ্রবিষ্ট হয়ে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মগ্ন থাকেন। ফলে সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই দেশ কাল সমাজ উঠে আসে। দেখা গেছে, দেশ-কাল-সমাজের পক্ষে যা দুঃসময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা সুসময়। বলা যায় দুঃসময়ে সাহিত্য সবচেয়ে বেশি সম্মৃদ্ধ হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে, শ্রেণীস্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়া শিল্প বা সাহিত্যের কোনও দায় নেই। যার ফলে বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলন সাহিত্যের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক এক অর্থে গণ-আন্দোলনের দশক। এই দশকেই দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, এই দশকেই মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫৩ সালে বিদেশি ট্রাম কোম্পানির ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে সম্মানজনক বেতনের দাবিতে শিক্ষক আন্দোলন, তাছাড়া ঔপনিবেশিক শাসন আমলে কিম্বা সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়েও শিক্ষাগত বা সামাজিক দাবিদাওয়া নিয়ে ছাত্র আন্দোলন। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বামপন্থী প্রভাবে সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দাবিতে কিম্বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে সংঘটিত এই ছাত্র আন্দোলন ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৫৮ সালে কলেজে বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থী ছাত্রদের টানা এগারো দিনের ধর্মঘটে কংগ্রেস সরকার ঘোষিত নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ইতিহাসে এই ছাত্র আন্দোলন একটি বিশেষ মাত্রা বহন করে। সর্বোপরি ১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন।

পঞ্চাশের সমস্ত আন্দোলনের পূর্বে গোটা চল্লিশের দশক জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, ১৯৪৬ এ তেভাগা আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর ১৯৪৭ -এর দেশভাগের যন্ত্রণা একটি বৃহৎ গণ-আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেছিল। বিশেষ করে দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা ও তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ পরবর্তী দশকেও আছড়ে পড়েছিল। কারণ স্বাধীন ভারতে (বাংলায়) কংগ্রেস সরকার কৃষকদের তেভাগা দাবির প্রতি বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধ থাকে নি। যে কারণে ভাগচাষী তাদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পুষ্ট বুর্জোয়া জমিদার বা জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের এই সংগ্রাম। "এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়" - এমন এক রাজনৈতিক



উপলব্ধিতে কিম্বা কংগ্রেসের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্নে তেভাগা আন্দোলন মশগুল ছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বকালে যে আদর্শবাদের স্বপ্নে মানুষ বিভোর হয়েছিল তার রেশ কেটে গেল সাতচল্লিশের পরেই। দেশভাগের সীমানা নির্ধারণ করায় সিরিল র‍্যাডক্লিফের কলমের আঁচড় ছিল না কেবলমাত্র, তা একই ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেকার বেঁচে থাকার বিশ্বাস-ভরসা প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার প্রতি বিচ্ছেদের আঁচড়ও বটে। একই ভাষা-সংস্কৃতির মানুষের দ্বিখণ্ডিত ইতিহাসের সাক্ষী এই কাঁটাতার।

দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের স্থানান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্তি দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কী সাধারণ মানুষ পেয়েছিল? এই প্রশ্ন আজও উঁকি দেয় মানুষের মনে। দেশস্বাধীন এক অর্থে দেশভাগ। ফলত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পেল না কেউই। এই দুইয়ের মধ্যেকার বিস্তর ব্যবধান ক্রমশ চোখ খুলে দিল সাধারণ মানুষেরও। আদর্শবাদের ভিত্তির ওপর শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হলো না কারোরই। মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা আরও প্রগাঢ় হয়েছে পাঁচের দশকে এসে। ষাট, সত্তরের পরেও এর প্রবাহ অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তীকালে দেশভাগের যন্ত্রণা, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন মানুষকে নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন করেছিল। আর এই অর্থনৈতিক সংকট মানুষের মূল্যবোধকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। মানুষ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সম্বিত খুঁজে ফেরে। সময় যত এগোতে থাকে মানুষের হতাশা পুঞ্জীভূত হতে থাকে, সেই হতাশায় ক্রমশ ক্ষোভ থেকে আন্দোলনের রূপ নিতে থাকে। বাস্তু হারানোর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে এপার বাংলার মানুষ ওপারে, আর ওপারের মানুষ এপারে আসতে শুরু করে। উদ্বাস্তু স্রোত নতুন নতুন কলোনির জন্ম দিতে থাকে। জনসংখ্যার বিপুল বিস্ফোরণ ঘটায় খাদ্যাভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে চালের কালোবাজারি রুখতে পারে নি তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। তাছাড়া দৈনন্দিন অপরিহার্য পণ্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি দেখেও নীরব দর্শকমাত্র এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া আর উপায় ছিল না জনগণের। সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতাকে "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়" বলে দেগে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ছাত্র আন্দোলনের সূচিমুখ ছিল এই ভাবাদর্শ। আসলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের প্রতিটি আঘাতই মানুষের মনে ক্ষোভের জন্ম দেয়, এবং তা আন্দোলনের মুখ সৃষ্টি করে।

দেশভাগই আসলে উদ্বাস্তু সমস্যার মূল কারণ। একদিকে অত্যধিক মানুষের সমাগম অন্যদিকে সরকারি পুনর্বাসনের সঠিক পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো না থাকার কারণে সরকার কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। সাধারণ মানুষের থাকা খাওয়ায় একটা বিরাট সমস্যা তৈরি হয়। মানুষের মৌলিক চাহিদাটুকুও তখন পূরণ করতে পারেনি রাষ্ট্র। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়

পুনর্বাসন বিভাগের সহযোগিতা বা নীতি নির্ধারণ যেমন আবশ্যক ছিল তেমনই তৎপর হওয়া উচিত ছিল রাজ্যের। উদ্বাস্তু প্রশ্নে কেন্দ্র বা রাজ্য এমনই ভাবলেশহীন ছিল যেন কারও কোনো দায় নেই, দায়বদ্ধতাও নেই। যার ফলে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জনমানসে প্রবল বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। বাস্তুহারাদের এ বিক্ষোভ ক্রমশ গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়।

ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর পঞ্চাশের মার্চে হাওড়ায় ব্যাপক আকারে আরেকবার দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল ফলে বিপুল সংখ্যক বাঙালি মুসলিম পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৫২ সালে পাসপোর্ট প্রক্রিয়া চালু না হওয়া পর্যন্ত উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারেননি দুই ভূখণ্ডই। রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির শিকার হয়ে সেদিন ভিটেহারা মানুষের ঢল নেমেছিল রাস্তায় রাস্তায়, স্টেশনে প্লাটফর্মে। কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "এস দেখে যাও" কবিতায় এমনই একটি চিত্র তুলে রেখেছেন-

'এস দেখে যাও কুটি কুটি সংসার
স্টেশনের প্লাটফর্মে ছড়ানো বে-আব্রু সংসারে
স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে
ভেসে এসে আজ ঠেকেছে কোথায় ও-যে
ছেঁড়া কানিটুকু কোমর জড়ানো আদুরি,
ঘরের বউ—
আমার বাংলা।'

ন্যূনতম সম্ভ্রম রক্ষার আড়ালটুকুও অনেকে পাইনি সেদিন। জীবন এমনই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে যেন নিজেকে আর বয়ে নেওয়া যায় না কোথাও। তলিয়ে গিয়ে কে কোথায় ভেসে উঠছে কেউই তা জানে না। ঘরের বউয়ের কোমরে জড়ানো কানিটুকুও ছিঁড়ে গেছে এমন আকাল। যার সঙ্গে জন্মান্তরের সম্পর্ক তারই (ঘরের বউ) মধ্যে যাপিত বাংলাকে খুঁজে নেওয়ার একটু দারুণ সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন কবি।

প্রতিটি মানুষের জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকে তার চারপাশের জগৎ, তার হয়ে ওঠার পরিবেশ। পরিযায়ী জীবন কেই বা চাই! মানুষ আপাতত শান্তিকল্যাণে বেঁচেবর্তে থাকতে চান। কিন্তু তাকে যদি কালের অভিঘাতে উদ্বাস্তু হতে হয় তবে তার যন্ত্রণা কী মর্মান্তিক হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন। কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর "উদ্বাস্তু" কবিতায় সেরকমই একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। বলা ভালো একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। ভিটেমাটির প্রতি নাড়ির টান অত সহজে ছিঁড়ে যায় না। কবিতায় দেখি, শেকড়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে ভূষণ পাল তার গোটা পরিবারকে স্থানান্তরিত করবার জন্য ভোররাতে তড়িঘড়ি শুরু করে দিয়েছেন। ভোররাতের স্বপ্নভরা ঘুমটুকুরও সময় নেই আর। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে পিছুটান ফেলে এবার বেরিয়ে পড়ার পালা। হিজল গাছে বসে থাকা পাখি, হিজল গাছের ফুল,



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

পুকুর পাড়ের শান বাঁধানো ঘাটের শ্যাওলা, লক্ষীবিলাসি ধান- সমস্তকিছুই করুণ নয়নে ভূষণ পালকে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় যাবে?"। এমনকি পালতোলা ডিঙি, ময়ূরপঙ্খী পর্যন্ত বলছে, 'আমাদের ফেলে কোথায় যাবে?/আমরা কি তোমার গত জন্মের বন্ধু?/ এ জন্মের কেউ নই ?'। এই জলা জংলার দেশ ছেড়ে পালাতে পারলে যেন বেঁচে যায় এমনই উত্তর দিয়ে স্ত্রী সুবালাকে তাড়াতাড়ি বেরোবার জন্য ধমক দেন তিনি। হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন—

'ওরাও উদ্বাস্তু
কেউ উৎখাত ভিটেমাটি থেকে
কেউ উৎখাত আদর্শ থেকে।' (উদ্বাস্তু)

এই একই ভাবনা মিশে আছে তাঁর "পূর্ব-পশ্চিম" কবিতায়। এক সুর এক টান একই আকুলের আকুতি নিয়ে আমাদের খাঁচার ভিতর একই অচিন পাখির আনাগোনার সন্ধান দিয়েছেন তিনি। দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও আমরা যে এক বৃন্তের দুই ফুল তা আরেকবার তিনি মনে করিয়ে দিলেন—

'পরস্পর আমরা পর নই
আমরা পড়শি -আর পড়শিই তো আরশি
তুমি সুলতানা আমি অপূর্ব
আমি মহবুব তুমি শ্যামলী।' ("পূর্ব-পশ্চিম")

পারস্পরিক ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ভেতর কবি শেকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ করেছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা এক অবিসংবাদিত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

প্রতিটি আন্দোলন, প্রতিটি বিপ্লবের মূলে রয়েছে জনগণের দীর্ঘকালীন তীব্র অসন্তোষ। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল কারণ তার মূলে ছিল বিগত কয়েক বছরের বিক্ষোভ, আন্দোলন ও জনরোষ। একদিকে কংগ্রেস বিরোধিতার তীব্রতা বাড়তে থাকে অন্যদিকে সমাজের আমূল সংস্কারের বার্তা নিয়ে বামপন্থীরা এগিয়ে আসেন। সাম্যবাদের ভাবনা মানুষকে একত্রিত করে। বিশেষ করে খাদ্যের দাবিতে বামপন্থীদের বিক্ষিপ্ত আন্দোলন কয়েক বছর ধরেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। কার্যত গণ-আন্দোলন শুরু হয় তাদের হাত ধরেই। ১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রফুল্লচন্দ্র সেন হেরে যাওয়ার পর ১৯৫৭-তে বামপন্থী দল বেশ কয়েকটি আসন (৫৭ থেকে বেড়ে ৮০টি হয়) পায়। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত শক্ত হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র তৎকালীন সরকার বিরোধী মানসিকতা তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে বামপন্থী আন্দোলনগুলি ক্রমশ গণ-আন্দোলনের ব্যাপকতায় পৌঁছায়নি, বরং সাধারণ মানুষের মনে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে কোনো সময়ই রুখে দাঁড়ানোর মেজাজ তৈরি করেছিল।

স্বাধীনতার পরপরই দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ

করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। এর বাস্তব রূপায়ণ দেওয়ার জন্য ১৯৪৮ থেকেই কংগ্রেস সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। ভাষার ওপর ভিত্তি করে রাজ্য পুনর্গঠনের নীতির বিরুদ্ধে তৎকালীন বিহারের অন্তর্ভুক্ত মানভূমের বাংলাভাষী মানুষের আন্দোলন আসলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। সাতচল্লিশের সীমানা নির্ধারণের সময় মানভূম জেলা বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত অংশ ছিল। বিহার সরকার তাদের ওপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে সমস্যার সূত্রপাত ঘটে সেখানেই। সমস্ত স্কুল প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষার পরিবর্তে হিন্দি শেখানোর নির্দেশ জারি হয়। কিন্তু মানভূমের বাংলাভাষী মানুষ তার প্রাণের মাতৃভাষার জন্য আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম মাতৃভাষার জন্য আন্দোলনের এ এক নতুন ইতিহাস। বিশেষ করে যাঁদের নেতৃত্বে জনগণ মানভূমের পাকবিড়রা থেকে পদব্রজে কলকাতা গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা হলেন—অতুলচন্দ্র ঘোষ, লাবন্যপ্রভা দেবী অরুণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। মানভূমের নিজস্ব সম্পদ টুসু গানের মধ্য দিয়েও বিহার সরকারের অবিবেচনার প্রতি সেদিন বিদ্রোহের ধ্বনি ঘোষিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভজহরি মাহাতোর সেই বিখ্যাত টুসু গান—'শুন বিহারী ভাই/ তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখায়।' অবশেষে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর মাত্র ১৬ টি থানা নিয়ে পুরুলিয়া জেলার জন্ম হয় এবং নতুন এই জেলাটিকে পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।।

ফি-বছর বর্ষাকালে এখনও চাষীদের জীবনে খানিক আকাল লেগেই থাকে। বিশেষ করে তখন চরম আকাল হত। ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলনে মোট উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ পাবে চাষী, আরেকভাগ জমির মালিক এই ন্যায্য দাবির সমর্থনে লাখো মানুষের আন্দোলন ফল্গুস্রোতে বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত ছিল। ১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলন এর চূড়ান্ত প্রকাশ। শ্রেণিশত্রুদের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিকের মতো সাধারণ মানুষের সে এক সশস্ত্র সংগ্রামের অন্য ইতিহাস। যাক সে কথা। স্বাধীনতার পরপরই পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনে বজ্রনির্ঘোষ অভিশাপ বয়ে এনেছিল। অন্যদিকে অভাবের সময় কালোবাজারীও কম ছিল না। সরকারি কোনো খাদ্য নীতি না থাকায় সমস্যা হয়েছিল জটিলতর। ফলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিয়ে ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতার রাজপথ দেখেছিল বুভুক্ষু মানুষের মিছিলের মুখ।

সাহিত্যে বা ইতিহাসে যে দুয়েকটি দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর প্রতিফলন সচেতন পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়নি সেগুলো হল— (১) ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ, (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) যা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে খ্যাত (২) ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) যা "পঞ্চাশের মন্বন্তর" বলে খ্যাত। ১৯৪৩ -এর দুর্ভিক্ষে ক্ষুধা পীড়িত বুভুক্ষু মানুষের দল একটু অন্ন চেয়ে শহরমুখী হয়েছিল সেই দৃশ্যেরই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটলো ১৯৫৯ -এ আবার। একটু ফ্যান চেয়ে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

নগরের পথে পথে, উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে মানুষ সেদিন জড়ো হয়েছিল। তবুও সভ্যতার ধ্যান ভাঙেনি। তখন ধ্যান ভাঙলে হয়তো স্বাধীনতার পর এমন দুর্দিন দেখতে হত না কাউকেই। কংগ্রেস সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে এই সংকট হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হতে বহু মানুষ কলকাতার রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছিল। বুভুক্ষু মানুষের এই মিছিল কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রাজভবনের দিকে যাওয়ার সময় সরকারি নির্দেশে অতর্কিতে লাঠি চার্জ শুরু হয়, ছুঁড়ে দেওয়া হয় কাঁদানে গ্যাস। অন্তত চুরাশিজন (ছাত্র যুব সহ) মারা যান, আর কতজন আহত ছিলেন তার সঠিক হিসেব নেই। বিক্ষোভকারী জনতাকে আটকাতে পুলিশের লাঠিচার্জে শাসক দলের হাতে অনেকে প্রাণ হারান। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ আজও তাই এই ঐতিহাসিক দিনটির পরের দিন ১লা সেপ্টেম্বর শ্রদ্ধার সঙ্গে শহীদ দিবস পালন করে আসছে। ১৯৫৯ সালের ৩০ আগস্টের ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বামপন্থীদের ভাবনাজাত ১৮৫৮ সালে গঠিত "পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি"। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং এই কমিটির সদস্য ছিলেন হেমন্তকুমার বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক), মাখন পাল (RSP), বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় (RCPI), বরদা মুকুটমণি (বলশেভিক পার্টি)প্রমুখ কয়েকজন।

খাদ্য আন্দোলন কথা বলতে গেলেই অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ইতিহাস। সাম্যবাদী সমাজের ভাবনায় কয়েকজন কবি তিরিশের দশক থেকেই হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। যে কলমের আঁচড়ে ছিল অস্ত্রের শাণ। অনেক কবিই সরাসরি মার্কসীয় ভাবনায় জারিত হয়ে সাহিত্যচর্চায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। যেমন কবি দীনেশ দাশ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ইতিকথা থেকে শুরু করে একাধিক কবির কবিতায় এই খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। কবি দীনেশ দাশের "ডাস্টবিন" কবিতায় খাদ্যাভাবের এমন একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠি আমরা—

'মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকালে অন্ন চাটি একসাথে
আজকে মহাদুর্দিনে
আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।'

ডাস্টবিনে খাদ্য খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করেননি তিনি। মেহনতি মানুষের ফসল কাটার অত্যন্ত সাধারণ একটি অস্ত্র কাস্তে যা কি না কবির ভাবনায় শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। কবি দীনেশ দাশ এমন এক বৈপ্লবিক চিন্তার পথিকৃৎ। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত "কাস্তে" কবিতাতে যখন এরকম একটা লাইন চোখে পড়ে 'চাঁদের শতক আজ নহে তো / এ-যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে' তখন কবিতাটি গোটা শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয়

কবিতা হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সংগ্রামী মানুষের কাস্তে হাতুড়ি শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির আবহমান কালের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

সমর সেনের 'তিন পুরুষ'(১৯৪৪) কাব্যের 'শহরে' কবিতাতে এরকম চিত্র দেখতে পাওয়া যায় —

'শহরের প্রান্তে
জমাট অন্ধকারে কর্দমাক্ত স্তব্ধতায়
দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল চলে আপন পথে'

তাঁর 'ক্রান্তি' কবিতাতেও দুর্ভিক্ষের করালবদন তিনি উন্মোচন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান', অমিয় চক্রবর্তীর 'অন্ন দাও', বিষ্ণু দে'র 'এক পৌষের শীত', অরুণ মিত্রের 'মরযাত্রা' সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন', 'ফসলের ডাক' প্রভৃতি কবিতা। 'ক্রান্তি' কবিতায় কবি সমর সেন ক্ষুধিত কিষাণের হাতে বিপ্লবের রাখি পরিয়ে দিয়ে কালের বিষাণ বাজিয়েছেন। তাঁর কাব্যে চরাচর ছেয়ে আছে অন্ধকার ও স্তব্ধতা, আছে ধূসরতা আর ক্লান্তির ছাপ। এ সমস্ত কিছু থেকেই তিনি আপ্রাণ মুক্তি চেয়েছেন।

অর্থনীতির হাতে বাঁধা রাষ্ট্রের ইতিহাস জানতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে খুব বেশি কাঠ খড় পোড়াতে হয় নি। ১৯৪২ এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পর সংগ্রামী মানুষের স্বার্থে তিনি দিন বদলের স্বপ্ন দেখতেন। সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সত্ত্বেও রাজনীতি তাঁর কবিসত্তাকে গ্রাস করতে পারে নি। 'শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না' (মে দিনের কবিতা/ পদাতিক) তাই তাঁর কাব্যে প্রথম থেকেই শোনা গেছে। মৃত্যুর ভয়ে তিনি ভীত নন। জনজাগরণের মন্ত্র নিয়ে পথে নেমেছিলেন এবং তিনি হয়ে উঠেছিলেন মিছিলের মুখ। দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে পৃথিবীজুড়ে দুর্নিবার শান্তি আনার জন্য কবি প্রাণপণ নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। অবশেষে একসময় এই কবিই লিখলেন তার কালজয়ী কবিতাটি—

"আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা"

( যত দূরেই যায়)

অর্থাৎ কবির স্মৃতিপটে আজও জ্বলজ্বল করছে তাঁদের নিকোনো উঠোন। এই শেকড়-সন্ধানী যন্ত্রণা তিনিও ভুলতে পারেন নি কখনও।

স্বাধীনতার পরের দু দশকেও দুর্ভিক্ষের রেশ কাটেনি। বরং উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে খাদ্যের সমস্যা ক্রমশ বেড়েছিল। সেই সঙ্গে খরা ও বন্যা সাধারণ জীবনকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল। সরকারেরও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সাতচল্লিশের পর থেকেই চাল ও গমের



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

মূল্যবৃদ্ধি ঘটতেই থাকে। ১৯৫৮-১৯৫৯ এর দিকে মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ক্রয়ের নাগালের বাইরে চলে যায়। খাদ্যের অভাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেরোসিন তেল বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। অদ্ভুত এক আঁধার নেমে আসে সাধারণ মানুষের জীবনে। জেলায় জেলায় শুরু হয় বিক্ষোভ-মিছিল। ক্রমশ যা তীব্র আন্দোলনের রূপ নেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারি সম্পত্তির ভাঙচুর শুরু করে। সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্য অনেকেই গ্রেপ্তার হয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৫৯ এর ৩০ আগস্টের রায়টার্স অভিযান। পুলিশের গুলি ও লাঠি চার্জে প্রাণ দিয়েও সরকারি সহযোগিতার আশ্বাস পর্যন্ত পায় নি বরং মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে উল্টে শুনতে হয়েছে যে জনগণ রায়টার্স অধিকার করার জন্য আক্রমণ করেছিল। অন্যদিকে ১৯৫৯ সালের বন্যার কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত দীনেশ দাশের "বন্যা: ১৩৬৬" কবিতাটি স্মর্তব্য। অতঃপর খাদ্য সংকট চলতেই থাকে। "অন্নদেবতা" কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্নের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন—'অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা/ অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।' এমনকি পান্তা আমানির জন্যও মানুষের চিন্তা আদি-অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে। ১৯৫৯ এর অন্নাভাবের স্রোত ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত চলেছিল। কয়েক বছর ধরে খাদ্যের জন্য মানুষের হাহাকার আকাশে বাতাসে রণিত হয়েছে। ১৯৬২ সালের তৃতীয় নির্বাচনেও কংগ্রেস সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসে। ওই বছরেরই ১ জুলাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় মারা যান। তাঁর অবর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীত্বের ভার গ্রহণ করেন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। উদ্বৃত্ত জেলাগুলো থেকে ঘাটতি জেলায় চাল গম সরবরাহের ব্যবস্থা সরকারি তৎপরতার অভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় খাদ্য সমস্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। সপ্তাহে রেশনে বরাদ্দ মাথাপিছু আধ কেজি চাল আর এক কেজি গমের সরবরাহ পর্যন্ত সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে মৌন-মিছিল ছাত্র-ধর্মঘট এবং গণ-আন্দোলন শুরু হয় ব্যাপক ভাবে। জনতার ওপর সরকারী দমন-পীড়ন ক্রমশ কঠোর হয়ে ওঠে। যে কারণে খাদ্যের দাবিতে কৃষ্ণনগরের ছাত্র ধর্মঘটে শামিল মিছিলে মাত্র চোদ্দ বছরের একটি ছাত্র আনন্দ হাইত পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ষাটের দশকেও খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেনি সরকার। অন্যদিকে তখন খাদ্যের দাবির অন্তরালে জমি-মালিকানার পালাবদলের অন্য এক আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে প্রান্তিক জেলাতেও। সে এক রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস, এক অন্য ইতিহাস।

**তথ্যসূত্র :**

১) অনিল আচার্য, সম্পা: সত্তর দশক, তৃতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২
২) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিক্ষুব্ধ বাঙলা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনীতি, (১৯৪৭-২০০৭), র‍্যাডিক্যাল কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪

# শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত কবিতায় জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যময় ভাবরূপ অন্বেষণ

সুবর্ণা সেন

আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের অন্যতম পুরোধাপুরুষ ছিলেন কবি ও সাহিত্য সমালোচক শঙ্খ ঘোষ। মূলত রবীন্দ্র গবেষণার ছত্রছায়ায় তিনি জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। কবিতার জগতে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কাব্য মানসিকতার অনুসরণে তথা ভাবরূপ পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নির্ধারণ করে বাংলা সাহিত্যের গতিপথকে একটি সুস্পষ্ট দিকে চালিত করেন। অবিভক্ত ভারতের বর্তমানে বাংলাদেশের চাঁদপুরে তিনি ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি তাঁর রচনায় সমসাময়িক নানা রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা তথা জীবন সম্পৃক্ত দৃষ্টিভঙ্গির উদারতায় অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখনীর স্বতন্ত্রতায় তিনি বার বার উচ্চস্বরে নাগরিক আইনের নানা অসংগতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর বিরচিত ‘দিনগুলি রাতগুলি’, ‘বাবরের প্রার্থনা’, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’, ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’, ‘বাউল’, ‘কবর’, ‘নিগ্রো বন্ধুকে চিঠি’, ‘বাবুমশাই’, ‘ধ্বংশ করো ধ্বজা’, ‘অর্কেস্ট্রা’, ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’-এর মতো কবিতা ও একাধিক গদ্যগ্রন্থ যেমন‘কালের মাত্রা ও বরীন্দ্র নাটক’, ‘ছন্দের বারান্দা’, ‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ’, ‘এ আমির আবরণ’, ‘জার্নাল’ প্রভৃতি রচনায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। শিশু-কিশোরদের জন্য নির্মিত ‘সকাল বেলার আলো’, ‘আমন ধানের ছড়া’, ‘ছোট্ট একটা স্কুল’, ‘অল্পবয়স-কল্পবয়স’ প্রভৃতি সহ বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার ভিত্তিক রচনার মধ্যে আছে ‘অন্ধের স্পর্শের মতো’, ‘এক বক্তার বৈঠক : শম্ভু মিত্র’, ‘কথার পিঠে কথা’ প্রভৃতি। সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার অব্যক্ত আর্তিকে অনুভব করে যে সংবেদনশীল ভাবে ও ভাষায় তিনি তা নির্মাণ করে যে পারদর্শীতা দেখিয়েছেন তা শুধুমাত্র তাঁর কবি মনের গভীর অতলান্তের হদিশ দিয়েছে তাই নয়; সেই সঙ্গে উন্মুক্ত করেছে ঘনসন্নিবদ্ধ জীবন ইতিবৃত্তকে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে কবির প্রতি অসীম মমত্বে ও শ্রদ্ধায় তাঁর নির্বাচিত কিছু কবিতায় জীবন সংরূপকে অন্বেষণের দিকে এগিয়ে যাবো।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হয়ে ভয়াবহ দাঙ্গার পটভূমিতে কবির কাব্য রচনার জয়যাত্রার সূত্রপাত। এমনকি পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বদেশী পুরাণ ও লৌকিক জীবনের দিকে তাঁর দৃষ্টির সুগভীর ছায়াপাত ঘটিয়েছেন। এই অশান্ত রাজনৈতিক উন্মত্ত প্রেক্ষাপট ও মন্বন্তর পরবর্তী জীবনে সাধারণ মানুষের যে সামান্য অন্নকণার জন্য হাহাকার; সেই জীবন যন্ত্রণার বাণী কবি ‘দিনগুলি রাতগুলি’ কাব্যগ্রন্থের ‘যমুনাবতী’ কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত করেছেন। অন্নাভাবে শিশু





থেকে পরিণত বয়সী কারোর মুখে আজ ভাত নেই। বন্দী জীবনের দুঃসহ আত্ম যন্ত্রণার ভয়াবহ বাণীর আকাঙ্ক্ষা এক বালিকার কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে সেখানে উঠে এসেছে ঠিক এভাবেই

“নিভন্ত এই চুল্লিতে মা/ একটু আগুন দে/ আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি/ বাঁচার আনন্দে!

নোটন নোটন পায়রা গুলি/ খাঁচাতে বন্দী/ দু-এক মুঠো ভাত পেলে তা/ ওড়াতে মন দি’।

হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়।”[১]

সন্তানের সামান্য প্রার্থনা পূরণের যন্ত্রণায় মাতৃহৃদয় আজ ভীষণ ভাবে যন্ত্রণার্ত। দাঙ্গা বিধ্বস্ত চারিদিকে একদিকে সন্তানের ক্ষুধার অন্ন সংস্থান অন্য দিকে পিতামাতার নিষেধ অমান্য করে ক্ষুধার্ত মেয়ের পথে বেরিয়ে পড়ার জীবন্ত দৃশ্যপটে যে প্রতিবাদের অগ্নিশিখাকে কবি প্রজ্জ্বলিত করেছেন, তার মর্মান্তিক পরিণতিতে যমুনাবতীর নির্মম শোষণের আর্তনাদ পাঠককে গভীর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমকালীন দাঙ্গার পাশাপাশি মন্বন্তরের আগমনে যে প্রাণের বিপর্যয়, তার এক বিভৎস চিত্র যমুনাবতীর অগ্নিশয্যায় নির্মিত বাসর দৃশ্যপটে পাঠক সমাজকে আকুলিত করেছে। তার মৃত্যু সত্যই জীবন বাস্তবতার এক অনন্য চিত্র আলোচ্য কবিতায় একে দিয়েছে—

“যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে/ যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে বিষের টোপর নিয়ে।/ মুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে দিয়েছে পথ, গিয়ে।/ নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে!”[২]

কবি এখানে রূপকথার অপূর্ব চিত্রকল্প নির্মাণ করে দেখিয়েছেন যেভাবে যমুনাবতী সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার আশায় কাজীতলা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়, যার বাস্তবের যমুনাবতীর সঙ্গে কোন মিল নেই। বাস্তবের অভাগী যমুনাবতী দাম্পত্য জীবনে অসুখী। ছড়ায় যেমন পায়রার উড়ন্ত রূপ, ভাসমান রুই কাতলার খেলা, কলমের খোঁচায় দাদার মৃদু অনুযোগ সহ এসব কিছুর চিত্রকল্পে কবি অসহায় মানুষের মৃতপ্রায় জীবনকে ইঙ্গিতায়িত করেছে। রুই কাতলার সত্তায় তাই একপ্রকার অধিকার সুলভ মনোবৃত্তি আর সমাজের ভণ্ড মানুষের ষড়যন্ত্রী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। এভাবেই কবি বহু কবিতায় সমাজ সচেতনতা, স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের এক বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ ও প্রকৃতির অসীম কৃপাদৃষ্টিকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। এভাবেই মানব জীবনের অস্তমিত আশা, অব্যক্ত বিক্ষোভের চাপাসুরের অনুরণন তাঁর কবিতা থেকে সর্বদাই প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। এমনই এক অস্থির সময়ের পটচিত্রে প্রকৃতির বুকে নেমে আসা ভয়াবহ খরার আগুনে চর্তুদিকের বিধ্বংশী রূপের চিত্র তাঁর ‘খরা’ কবিতাটির ভাববস্তু নির্মাণে উঠে এসেছে।

“সব নদী নালা পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে/ জল ভরতে এসেছিল যারা/ তারা/ পাতাহারা গাছ।

——————————

এইখানে শেষ নয়, এই সবে শুরু।”[৩]

এমনই এক জীবন্ত বাস্তবতার অনন্য নিদর্শন হ’ল জ্যৈষ্ঠ ৬০’ কবিতাটি। যেখানে মহামারীর বিপর্যস্ত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির রূপচিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে

“অগ্নিজোড়া তেপান্তরে ধূ-ধূ বালুর মাঠ/ সেইখানে সে একলা হাঁটে, সেইখানে সে কাঁদে!

গ্রীষ্ম এল শূন্য কাঁখে পোড়া এ তল্লাট/ কপাল খুঁড়ে মরল, ও মেঘ বর্ষা দে বর্ষা দে

বর্ষা মিলন না :/ চক্রবালে চক্রবালে তৃষ্ণা দিল পা।”[৪]

প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে কবি কখনো দেখেছেন শুশুনিয়া প্রান্তরের রুক্ষতা, এমনকি কাঞ্চনজঙ্ঘা যার অনুভূতিতে হয়েছে জীবন্ত। তাই তাঁর রচনায় জীবন বাস্তবতার ভয়াবহ চিত্রের পাশাপাশি এসেছে নর-নারীর হৃদয় সঞ্জাত নানা অনুভূতির চিত্রপট। কখনো এই প্রণয় পরিণত হয়েছে বাৎসল্য স্নেহে। পিতার সঙ্গে কন্যার সম্পর্কের একাত্মতা, কন্যার বিবাহোত্তর জীবনে সুখের প্রার্থনা, পণপ্রথার প্রসঙ্গ, কন্যার সামাজিক পদমর্যাদা প্রাপ্তির আশঙ্কা ‘সূর্য্যমুখী’ কবিতায় অনবদ্য সংযমে ব্যক্ত হয়েছে

“ইচ্ছে হলো ব্যাকুল, তবু খুলল না সে ঘর/ অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল স্বর

‘এ যে বিষম! এ যে কঠিন!’/ কী যে ছোট্ট বাড়ি

সকালও তার মুখ দেখে না, বিকেল করে আড়ি।”[৫]

কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্যে আরো একটি অন্যতম দিক হল পৌরাণিক কাহিনীর নবতম মূল্যায়ন। যার পরিচয় ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’ কাব্যের ‘আরুণি উদ্দালক’, ‘জাবাল সত্যকাম’ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। পৌরাণিক পরিমণ্ডলে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে তিনি দেশব্যাপী এক চরম অস্থির আবেষ্টনীকে স্পস্ট ভাবে পাঠকের সম্মুখে এনেছেন। চারিদিকে শ্রেণিসংগ্রাম, শোষণ, নিপিড়ন সহ যুব সমাজের নানা পরিবর্তনকামী আন্দোলনের প্রতিচ্ছবিকে এই সকল কবিতার মধ্যে পুরাণের অনন্য সংমিশ্রণে কবি যেন এক রূপক ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন।

তিনি লক্ষ্য করেছেন পরিকল্পনাহীন আন্দোলন দূরদর্শিতার অভাবে বিপথগামী হয়েছে। তাই প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য নিয়মে একজন আরুণির মতো শিষ্যর পরিবর্তে শত শত আরুণির জন্ম হয়েছে বারম্বার। এমনকি কবিতার বহু ছত্রে উঠে এসেছে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশনেতাদের ক্ষমতার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ও আপন স্বার্থসিদ্ধির মোহান্ধ রূপ। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, খরায়, বন্যায় মানুষের বিপন্ন বিষ্ময়কর আর্তচিৎকার কবিকে ভাবিয়ে তাঁর লেখনীর গুণে বাস্তবতার আস্বাদন করিয়েছে। তিনি মূলত পৌরাণিক অনুষঙ্গকে রাস্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিরূপ হিসেবে তুলে ধরতে সচেস্ট ছিলেন। প্রতিবাদী চেতনাকে সংঘবদ্ধ করে তিনি অত্যাচারীতের মুখোশ টেনে খুলেছেন। এ প্রসঙ্গে ‘ছান্দোগ্য উপনিষদ’-এর (৪/৪)-এর সত্যকামের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন ‘জাবাল সত্যকাম’



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

কবিতাটি। পিতৃ পরিচয়হীন এক বালক সে। আপন প্রতিভার তেজে সে অনুমান করেছিল যে, নিজস্ব গুণে সে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, কিন্তু গুরুগৃহে তার সেই প্রত্যাশা বহু প্রশ্নের বর্ষণে কণ্টকিত হয়, গুরুর প্রশ্নবাণে সে তীব্র আত্মদহনের স্বীকার হয়। যুগ যুগ ধরে পিতৃপরিচয়, নাম, গোত্র একটি মানুষের প্রতিভা নিয়ন্ত্রণের মানদণ্ড রূপে নির্ধারিত হয়েছে। সত্যকামের মতো এক পৌরাণিক চরিত্রের মাধ্যমে কবি শঙ্খ ঘোষ এই সমাজের বুকে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইকে নানা যুক্তি, তর্কে, বিনয়ে, সম্ভ্রমে, প্রার্থনায় এক বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছেন। পুরাণ ও সমকালীন সমাজ সচেতনতা ও জীবনবোধ যেখানে একই মানদণ্ডে বিচার্য হয়েছে। সত্যকাম আপন হৃদয়ের উৎকণ্ঠায় বলেছেন

“মাথায় রেখেছ হাত স্নেহভরে, বলো।/কী তোমার গোত্র পরিচয়?

পরিচয়? কেন পরিচয় চাও প্রভু?

ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ঋদ্ধ পরিচয়?

——————————————

বুকে জ্বলে আগুনকুসুম

আমি যে আমিই এই পরিচয়ে ভরে না হৃদয়?”[৬]

শঙ্খ ঘোষের বহু চর্চিত ঐতিহাসিক চেতনা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন শীর্ষক কবিতা গুলির মধ্যে অন্যতম হল ‘বাবরের প্রার্থনা’, ‘বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ড’, ‘ঢাকা ১৯৭৫’ প্রভৃতি। ‘বাবরের প্রার্থনা’ কাব্যে পিতা বাবরের হৃদয় উৎসারিত শেষ জীবনের দুঃসহ মর্মযাতনা, মৃত্যু চেতনাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এমন মর্মন্তুদ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যা আবুল ফজল বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে শঙ্খ ঘোষের রচিত কবিতাকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে। কবিতায় কবি স্বয়ং নিজেই বাবরের সত্তায় নিজেকে নিমজ্জিত করে পিতৃহৃদয়ের উদারতাকে বাঙ্ময় করেছেন।

“এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম/ আজ বসন্তের শূন্য হাত

ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন/ কোথায় কুড়ে খায় গোপন ক্ষয়!

চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব/ বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!”[৭]

অসুস্থ পুত্রের জন্য দেবতার সন্নিকটে তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা, নিজেকে উৎসর্গ করে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি জীবন প্রীতির গভীর অধ্যয়নকে প্রতিবিম্বিত করেছেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে ছেয়ে যাওয়া পুত্রের সর্বাঙ্গ, সর্ব শরীরে ক্ষয়রোগের ছাপ, ধমনীতে প্রবাহিত বিষাক্ত রক্তপ্রবাহ, যেখানে চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল নিদান শেষ হয়ে গেছে, মানুষের সকল ক্ষমতার পরিসমাপ্তিতে তাই বাবরের মতো অধিপতি সম্রাট আজ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করে পুত্রের জীবন ভিক্ষা কামনা করেছেন। তিনিই তার একমাত্র আশা-ভরসার অভয় স্থল। তাই কাতর মিনতিতে বাবর বলেছেন

“জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে/ ধূসর শূন্যের আজান গান ;

পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

.........................................................................

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার/ জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে ?

ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"[৮]

তাই পরিসমাপ্তিতে কবি একথাই বলতে চেয়েছেন যে, সম্পদের প্রাচুর্য, ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে তিনি পরিতৃপ্ত নন, তিনি শুধুমাত্র পুত্রের জন্য সুদৃঢ় অনাগত ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করে মানবিকতা ও পিতৃত্বের অনুপম স্বাক্ষর রেখে যেতে চান। এখানে বাবরের প্রার্থনার মধ্যে তিনি ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রতিরূপকে দেখিয়ে সমাজ সভ্যতার ক্ষয়রোগ পরিসমাপ্তির শেষে সুস্থ জীবনের আর্তিকে পরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

জীবন সম্পৃক্ত ভাবধারায় কবির 'বাবুমশাই'-এর মতো বহু কবিতায় সমসাময়িক সমাজের এক চরম বাস্তবতা, যুবসমাজের স্বপ্নভঙ্গ, নাগরিক সভ্যতার বিভৎস হিংস্রতা, উত্তরকালে আগত প্রজন্মের বেঁচে থাকার জন্য কাতর প্রার্থনা, সুবিধাবাদী মানুষের অভিসন্ধি, শাসন শোষণ বঞ্চনার আগ্রাসনী মনোভাব চরম আবেগদরদী ভাষায় আলোকিত হয়েছে।

"সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা !/ বেঁচে ছিলাম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা

আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে/ নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে যাবে খোল-নলিচা"[৯]

উদ্ধৃত পংক্তি সমূহে দেখা যায় নতুন সমাজ গঠনের মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে শোষক বাবুরা শুধুই তাদের অধস্তন কর্মীকে পদানত করে মুনাফা লাভের মানসিকতার বশবর্তী হয়ে নিরন্তর শোষণ ক্রিয়াকে অব্যাহত রেখেছে। এভাবেই অবক্ষয়িত নগর কলকাতার বিচিত্র চালচিত্রে গম্ভীর মন্দ্রিত বার্তাকে তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন।

"মিত্র বাবুমশয় বিষয়-আশয় বাড়িয়ে যান তাই,/ মাঝেমধ্যে ভাবেন তাদের নুন আনতে পান্তাই

নিত্য ফুরোয় যাদের/ নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ-আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু

চিরটা কাল রাখবে তাদের পায়ের তলার কুকুর

সেটা হয় না বাবা।"[১০]

তাই বলা যায় কবি শঙ্খ ঘোষের লেখায় ভোগবাদী সমাজের বিভ্রম, শঠতা, মিথ্যাচারকে বিভিন্ন বিপর্যয়ের জীবন্ত দলিলকে, তাঁর বহুখ্যাত কবিতার বিষয় রূপে স্থান দিয়েছেন। এই সংরূপ সংযোজনে তিনি কখনো নির্বাচন করেছেন পুরাণকে, কখনোবা ইতিহাস ঐতিহ্যকে, কখনোবা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দোলাচলতাকে, কখনোবা রোমান্টিক পরিমণ্ডলকে। তাই পঞ্চাশের দশকের অন্যান্য কবি যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বদের পাশে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কবি শঙ্খ ঘোষের নাম বিশেষ স্বাতন্ত্রের সাক্ষ্য বহন করে। বিশেষ করে তাঁর



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

সৃষ্টিতে কথ্যভাষার এমন মননশীল ব্যবহার বাংলা কাব্য সাহিত্যে পৃথক এক মার্গ নির্মাণ করে সাধারণ পাঠক দর্শককের কবিতা প্রীতির পথকে সুগম করেছে।

অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা বিশেষ গবেষণার দাবি রাখে। দেশ কাল সমাজ সাহিত্য মানবিকতার দিক থেকে জীবন ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে তাঁর কবিতায় তিনি সর্বদাই এক অনন্য স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। তাঁর জীবনমুখী সৃষ্টি গুলিতে মানব জীবনের অন্দর-বাহিরের ইতিহাস এতটা ঘন সন্নিবদ্ধভাবে পাঠকের কাছে উঠে এসেছে। তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে শঙ্খ ঘোষের মতো কবিব্যক্তিত্ব তাঁর স্বতন্ত্র জীবনবীক্ষা, পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের নিবিড় অতলান্তে ক্রন্দনরত জীবাত্মার নিঃশব্দ আর্তচিৎকার, রাস্ট্রশক্তির মেকী প্রতিশ্রুতিতে অসহায় মানুষের অনন্ত প্রতীক্ষা, বেঁচে থাকার সংগ্রাম, ভালোবাসা, মোহ, মায়া, ক্রোধ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা এসবই তাঁর কাব্যজীবনকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে; তেমনি বাংলা কাব্যসাহিত্য তাঁর মতো প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে যে ব্যপক সমৃদ্ধ হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী একথা সর্বসমক্ষে বললে অত্যুক্তি হয় না। এভাবেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে কবির সৃষ্টিশীল বহুমুখী প্রতিভার ক্ষণিক ঝলকে প্রবন্ধের ইতিরেখা ঘোষিত হয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**


১। 'শঙ্খঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা' : শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭০, পরিবর্ধিত দে'জ প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৮৫, জুলাই ১৯৭৮, পরিবর্ধিত দে'জ দ্বাদশ সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৫, মে ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

২। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫।

৪। 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা' (১৯০১-২০০৮) : ড. অশোক কুমার মিত্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : কলকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারি ২০০২, মাঘ ১৪০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪০।

৫। 'শঙ্খঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা' : শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭০, পরিবর্ধিত দে'জ প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৮৫, জুলাই ১৯৭৮, পরিবর্ধিত দে'জ দ্বাদশ সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৫, মে ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫-৯৬।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১-৮২।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২।

# শিকড়ের সন্ধানে : নির্মল হালদারের 'গরাম থান'

প্রণবকুমার মাহাতো

'কবিতা সংগ্রহ-২'-এর ভূমিকায় কবি নির্মল হালদার লিখেছেন—

"কবিতা লিখি।
অথবা নিজেকে লিখি। এ বাদে আমার কোনও কাজ নেই......
কবিতাও ছুঁতে পারি না, তবু কবিতার দিকে চেয়ে থাকি।
মানুষের দিকে চেয়ে থাকি.......
কাঁসাই-কুমারী-হনুমাতা নদীও আমাকে ঋণী করে। ছো-ঝুমুর-টুসু-ভাদু-করমে
আমায় ঋদ্ধ করে।
আমার কবিতা। আমার অন্ন-প্রাণ-জল।"[১]

এমন সহজ সত্য কথাটি এরকম সহজ সরল অনাড়ম্বরভাবে বোধহয় কবিতা অন্তপ্রাণ কবি নির্মল হালদারের পক্ষেই বলা সম্ভব। কবিতার জন্য জীবন-উৎসর্গ -করা কবি নির্মল সত্তরের দশকের কবি। তিনি চার দশক ধরে ত্রিশটিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। অত্যন্ত প্রতিভাধর ও শক্তিশালী কবি হওয়াসত্ত্বেও এখনও বাংলা সাহিত্য জগতে অনেক কম আলোচনা বা চর্চা হয়েছে তাঁর কবিতা নিয়ে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় কবি নির্মল হালদারের 'গরাম থান'(২০০৬) কাব্যগ্রন্থ এক অভিনব ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নির্মল হালদারের এই কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে নিজ জন্মভূমির অকৃত্রিম অমার্জিত অমলিন স্মৃতিচিহ্ন। জন্মভূমি পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক নৈসর্গিক চিত্র, আশৈশব চেনা মানুষজন এবং তাদের প্রাত্যহিকতা, অভাব-অনাহার-যাপিত জীবনের বহু রৈখিক দিক তাঁর কাব্যশরীরে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। সেই সব মানুষের যাপনে কবিও যেন নিজেকে একাত্ম করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই চেনা মানুষজনের সঙ্গে এক অকৃত্রিম মমতা ও আত্মীয়তার বন্ধন শুধু নয়, এখানকার প্রকৃতি, এখানের গ্রাম, লোকায়ত জীবন, পরব- পালা- পার্বণ-এগুলিও যেন অসীম সহানুভূতি দিয়ে সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। সর্বোপরি, কবি নিজেকে যেন এক বৃহৎ পরিবারের অংশবিশেষ বলে মনে করেন। তাই তো কবির এই বৃহৎ পরিবারে দরজা কখনও বন্ধ থাকে না — অবাধ প্রবেশ সেখানে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এর থেকেও বোধহয় আরও বেশি কিছু। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অর্থে সমগ্র মানবজাতিকে একটি পরিবার হিসেবে বোঝানো হয়েছে। কবি শুধুমাত্র মানবজাতিকেই নয় পশু-পাখি, আলো-বাতাস সহ সমগ্র প্রকৃতিকেও নিজের পরিবারের অঙ্গীভূত করেছেন। তাই, কবি নির্মল হালদার বলতে পারেন—



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

"আমরা কপাট বন্ধ নাই করি
কে কখন আসবে কে কখন যাবে
বাঁধা ধরা নাই"

দেখতেও পাই, টঙ থেকে বেরিয়ে পায়রা উড়ল
ছাগলছানাটা লাফাতে লাফাতে বাইরে
ঢুকেও পড়ল চড়ুই-শালিক

আলো-বাতাসের নীরব প্রবেশও আছে,"[২]

কবি প্রথম কবিতাতেই মানুষ-পশু-পাখি-আলো-বাতাসকে নিজ পরিবারের অঙ্গীভূত করে এমন এক জগৎ সৃষ্টি করেছেন যা অভিনব, অভূতপূর্ব এবং অনন্য। কবি নির্মল হালদার উন্মুক্ত উদাত্ত প্রান্তরে অগণিত প্রাণের মিলনে বৃহৎসংসারের কথা ভেবেছেন। কবির অতীত জীবন, সেই হারিয়ে যাওয়া পুরনো স্মৃতিচিহ্ন, সেই যৌথ পরিবার আবার ফিরে পেতে চান কবি। আর এরই মধ্য দিয়ে কবি যেন আত্ম-অন্বেষণে মগ্ন হয়েছেন। সেই মগ্নতার মধ্য দিয়ে, সেই অন্বেষণের মধ্য দিয়ে নিজ জন্মভূমি তথা নিজ দেশের শিকড়ের অনুসন্ধান করেছেন। এই আত্ম-অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে জন্মভূমি পুরুলিয়ার মাটি - মানুষ - পশু-পাখি এবং দেশের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ, প্রগাঢ় ভালবাসা ও মমতা অভিব্যক্ত হয়েছে। কোনো ভণিতা নেই, কোনো আড়াল নেই সহজ কথাটি সরল সোজাভাবে উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেননি কবি। তাই কবির দীপ্ত উচ্চারণ—

"শিকড় না চিনলে
মাটি না চিনলে
ভালবাসাও চেনা যায় না"[৩]

কবি নির্মল হালদার ভালবাসাকে চিনতে মাটিকে চিনতে শিকড়কে চিনতে বেরিয়ে পড়েন শরবেড়িয়া-রিগুড়ি-মৌতড়-লিপানিয়া-কেলাহি-ঝাঁপড়া-সেরখাড়ি প্রভৃতি অগণিত গ্রামে গ্রামে। মাঠে-পাহাড়ে-ধানের ক্ষেতে-হাড়াই নদীর কলকল শব্দের মধ্যে, চড়ুই-শালিকের কূজনে—তিনি দেশকে মাটিকে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

সাধারণ খেটে খাওয়া, অভাবী মানুষগুলি তাঁর কবিতায় তাই অনায়াসে স্থান পেয়েছে। চৈতু মাহাতো, গাছনি মুর্মু, বলরাম, নুনারাম, নন্দর বাপ, অনিলের মা, হারুর মা, লতিকা, নুনা, রাসবিহারী, কিরাত, সরমা, মকর, কুসুম প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে মাটির যোগ প্রাণের স্পর্শ, আত্মীয়তার দৃঢ়বন্ধন অনুভব করেছেন কবি। তাই, এদের জীবনযাপনের

মধ্যে যেন নিজেকেই খুঁজে পেয়েছেন কবি- খুঁজে পেয়েছেন ভালবাসার নানা রঙ—

"ও ঘাটে কে এল রে নতুন মনে হচ্ছে
এ ঘাটে পুরুষ ও ঘাটে মহিলা। নতুন আর কেউ না
নতুন শাড়িতে এসেছে গঁরাই ঘরের বউ

হাড়াই নদীও কলকল করে। সে-ও বুঝি চাইছে
নতুন রঙের নতুন ভালবাসা। একটা বকও উড়তে উড়তে
নদীর মাঝ-পাথরে এসে বসল
সেও বুঝি চাইছে, পালকে রঙ লাগাতে"[৪]

ভালবাসার রঙে রাঙিয়ে নিতে চায় শ্বেতশুভ্র বক-আবার সেই আনন্দে কলকল করে ওঠে হাড়াই নদীও।

কৃষিনির্ভর দেশের মানুষগুলি ধান, গম, সরষে প্রভৃতি চাষ করে নিজেদের দুঃখ-দারিদ্র্য-অন্ধকার সরিয়ে নতুন আনন্দে-আশায়-ভালবাসায় বাঁচার স্বপ্ন দেখে। জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলির একদিন অবসান ঘটবে এই প্রত্যয় নিয়ে বেঁচে থাকে। তাই, বলে-—

"মাগো মা সরষে বুনেছি
ভাই গো ভাই সরষে বুনেছি
ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিব
ভালবাসায় ভরিয়ে দিব

কলসি কলসি তেল
মাগো, পিঠা ছাঁকবি
লুচি ছাঁকবি

ভাই রে, সরষে ফুলে আঁধার ঘুচাব"[৫]

কৃষিই এদের প্রধান জীবিকা। আর কৃষি এখানে সম্পূর্ণ বৃষ্টিনির্ভর। তাই, তাদের জীবন জীবিকা একান্তই অনিশ্চিত - কারণ বৃষ্টির নিশ্চয়তা নেই রুখা-শুখা মানভূমে। এখানে বৃষ্টি পড়লেই শ্রাবণ মাস, তখন শুধু ধান রোয়ার সময় -আর কোনোদিকে মন নেই।

"লাল-নীল-হলুদ শাড়ি ধান রুইছে
কাল রাত্তিরে ঘন হয়েছিল শ্রাবণ



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

শ্রাবণ তো সাইকেল দেখে না
মানুষও দেখে না
শ্রাবণের শুধু মাটি শুধু বীজ

বীজের ভিতরে আলোর রোশনাই"[৬]

ধান রোয়ার কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেই করম পরব নিয়ে আসে মনে আনন্দ, প্রাণে শান্তি। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও সন্ধ্যাবেলায় করমগানে,করমনাচে মেতে ওঠে মানভূমের মানুষ। কবিও যেন দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই আদিবাসী-মূলবাসী অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষগুলির সঙ্গে মেতে ওঠেন, নেচে ওঠেন, একাত্ম হয়ে ওঠেন। তাই, তাদের পালা-পরব-ব্রত-উৎসব-দুঃখ -দারিদ্র্যে নিজেও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। কবির কবিতা যেন সেই মানুষগুলির চলমান জীবনের জীবন্ত ভাষ্য হয়ে ওঠে। ভয়াবহ দারিদ্র্যসত্ত্বেও লোকায়ত পরব-পালা, লোকবিশ্বাসকে আপন সন্তানস্নেহে সযত্নে লালন করে মানভূমের মানুষ। আজন্ম-লালিত সংস্কৃতির ছায়ার আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে চায় তারা। কবি যেন তাদেরই প্রতিনিধি স্বরূপ। কবি বলেন—

"আমাদের করম এল রে

বীজ বুনেছি সারাদিন
সন্ধ্যাবেলায় গান
বীজ বুনব চিরদিন
সন্ধ্যাবেলায় গান
বীজ আমাদের ছায়া দেয় সন্তানের মতো
বীজ আমাদের শতশত"[৭]

মানুষের গেরস্থালিতে অনাহার আছে, অভাব আছে, দারিদ্র্য আছে কিন্তু অন্যদিকে নেমন্তন্ন আছে, আদর-যত্নও আছে -আছে নাচে-গানে জীবনকে উপভোগ করাও আছে।কবির বিনীত অনুরোধ—

"পরবের দিন
পিঠা না-খেলে মাংস খেয়ে যাও
ভেড়ামাংস মন্দ লাগবে না।
এসেছ যখন এই লাও পিঁড়ি, এক ঘটি জল
রাত হলে লাচনি নাচ,

লিপানিয়াতে আসর বসবে
ছো-নাচের-
যা দেখবে দেখো, যা খাবে খাও
মহুলাও এনে দিব..."[৮]

কবি নির্মল হালদারের কবিতায় এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষগুলির জীবনগাথা অত্যন্ত বাস্তবোচিতভাবে অঙ্কিত হয়েছে। রুখা-শুখা মানভূমের অভাবী মানুষগুলির কাছে "ভাত আর ভালবাসা দুই যে সমান" একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারেন কবি। দারিদ্র্যকে আড়াল করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই কবির।বাস্তবকে বাস্তবোচিত করেই এঁকেছেন তিনি। বাস্তব আমাদের কঠিন ও ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কবি বলেছেন—

"কালি থাকবে না তবে কীসের হাঁড়ি..।"...
মাসি আবারও বলে, এই যে লো তুই দু'ছেলের মা
তোর বুক দেখলেই মালুম হয়,
হাঁড়িকেও জানান দিতে হয়, সে ভাত ফোটায়"[৯]

কবি ভাব কল্পনার যবনিকা দিয়ে বাস্তবকে সুন্দর করতে চাননি বলেই- বাস্তবকে কবিতায় সরাসরি উপস্থাপি করেছেন।

এই অঞ্চলে বছরে শুধুমাত্র একবারই ধানচাষ হয়। তাই, সারাবছর অধীর আগ্রহে মঙ্গল, চৈতু মাহাতো, বলরাম, নুনারামরা অপেক্ষা করে ধানচাষের জন্য। আশায় বুক বাঁধে, স্বপ্ন দেখে অভাব ঘুচাবার, সারাবছরের ভাতের সংস্থানের। তাই ধানগাছগুলি যেন আর শুধু ধানগাছ মাত্র হয়ে থাকে না হয়ে ওঠে মা ও কন্যার প্রতিভূ। কবি যথার্থই লিখেছেন—

"মা বল কন্যা বল
ওই আমাদের ধান,
ওই আমাদের ধন, বছরে একবার
একবারই আসে
ধানের ভিতরে কী যে থাকে কী যে মায়া
দেখলেই মন জুড়ায়"[১০]

ধান চাই, ফসল চাই সারা বছরের খাবার চাই। কারণ পেটের চেয়ে শত্রু নেই। আধুনিক সভ্যতার অনেক আবিষ্কার কৃষিকে আরও যন্ত্রনির্ভর করেছে, সহজ করেছে। ট্রাক্টর এসেছে, ধান কাটা, ধানঝাড়া মেশিন এসেছে, কীটনাশক ছড়ানোর মেশিন এসেছে কিন্তু এসব এখনও চৈতু মাহাতো, গাছনি মুর্মুদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছায় নি। কারণ সে সামর্থ





তাদের নেই। তাই মরচে পড়া লাঙ্গলই এখনো তাদের একমাত্র ভরসা। শ্রাবণের ঝলমলে আকাশ দেখে তাদের ভয় হয় অনাবৃষ্টির- ঠিকাদারের কাছে আবার নিরুপায় হয়ে যেতে হবে কাজ চাইতে—

"লাঙলে মরচে পড়লেও ট্রাকটর আসে না
চৈতু মাহাতোর ঘরে
গাছনি মুর্মুকে যেতে হয় ঠিকাদারের কাছে:
কাজ নাই দিবে বাবু, দু'দুটা বিটি
বড় পেট...

পেটের মতো শত্রু নাই আমিও জানি বলে
পয়লা শ্রাবণের আকাশকে দেখলাম ঝলমল করছে
ভয় করছে আমার"[১১]

বসন্তের আগমনে প্রকৃতি নানারঙে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির অনুপম সজ্জা দেখে নবপল্লবের সৌন্দর্য ও ফুলের সুগন্ধে মেতে উঠে রোমান্টিক কবিরা। পাতার পর পাতা কবিতা লেখেন মধুমাস নিয়ে। তখন কবি নির্মল হালদারের কলমে ধরা দেয় রুখা-শুখা মানভূমের 'বাঁধ-কুয়া' শুকিয়ে যাওয়া গ্রীষ্মের ভয়াবহ ছবি। সেই ভয়াবহ জল-সঙ্কটের দিনে 'চোখের জলও' শেষ হয়ে যায়। কবির ভাষায়-

"চোতমাস থেকেই আমাদের জলের অভাব
বাঁধ-কুয়া শুকায় গেছে
গরুকেও জল দেখাতে জল নাই
এই রুখা-শুখা দিনে চোখের জলও শেষ হয়ে যায়"[১২]

আবার 'জষ্টি মাস' কবিতায় প্রখর গ্রীষ্মের ভয়াবহরূপ আরও নিদারুণভাবে ফুটে উঠেছে—

"মাটি গেছে তেতে
এখন গাঁইতি চালালে, অভিশাপ-
মা বলে কি রাগ করতে নাই।
মজুরির দরকার নাই বাপু, জষ্টি মাস
জলেরও জল-তিষ্টা পায়"[১৩]

'ঋণ' কবিতায় কবি সংসারী মানুষের চাল-নুনের অভাবে করম পরবে যোগ না দেওয়ার অসহায়তার চিত্র তুলে ধরেছেন। কারণ "ভাদর-আদর দিন / নুনে-চালে বাড়ে

ঋণ"। 'লাইট' কবিতায় কবি বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে লম্ফ-হ্যারিকেনই যে এখানকার মানুষের পক্ষে ভাল সে চিত্র তুলে ধরেছেন। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিম আলোকোজ্জ্বল জীবনের থেকে চাঁদের আলোর উপরই ভরসা রেখেছেন কবি। কারণ, চাঁদ হল চিরন্তন। প্রকৃতির বনে-বাদাড়ে জোনাকিও আলো দেয়। কিন্তু শহরে জোনাকি জ্বলে না। তাই কবি প্রস্তাব দেন—

"শহরে তো জোনাক জ্বলে না,
একটা কি নিয়ে যাবেন"[১৫]

"বরণ" কবিতায় ধান-দুব্বা বা ফুল দিয়ে নয় কবি তাঁর সঙ্গীকে বরণ করেন বুকে জড়িয়ে ধরে। কারণ সে ছাড়া আর কিছুই নেই কবির—"না ধান-দুব্বা, না ফুল না কিছু খাবার - শুধু ভালবাসা দিয়ে অভাবের শোক ভুলতে চেয়েছেন কবি।

ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশ - উন্নতি হচ্ছে ক্রমশ। ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে শহর, বাড়ছে কংক্রিটের জঙ্গল, তৈরি হচ্ছে ফ্লাই ওভার, শপিং মল— বাড়ছে মিডিয়ার দাপাদাপি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের মূলগত উন্নতি কতটুকু? উপরে আলোচ্য কবিতাগুলিতে কবি যেন সেই ভুলে যাওয়া প্রশ্নগুলির সামনে আমাদের উপস্থিত করেছেন - কৃষির মূল ভিত্তি ছেড়ে আমরা যেন কৃত্রিম আধুনিকতায় অভ্যস্ত হয়ে মাটি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি। কবি অনাময় কালিন্দীর ভাষায় —

"আমরা প্রশ্ন করতেও ভুলে যাচ্ছি — প্রগতি কতটুকু ? প্রযুক্তি কার জন্য? কতটুকু শহর আর গ্রাম কতটুকু? কতটুকু ফ্লাইওভার আর কতটুকু কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা? ... 'গরাম থান' আমাদের সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।"[১৫]

এ রকম অভাব-অনটনের মর্মান্তিক ছবি পাই "ভাব" কবিতায়। অন্ধকার দূর করার জন্য আলো নেই। কারণ হ্যারিকেন জ্বালাবার জন্য কেরোসিন প্রয়োজন- কেরোসিন কেনার সামর্থ্য নেই চৈতু মাহাত-র। চোখের জলেও তো প্রদীপ জ্বলে না। তাই ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচালেও নিরুপায় চৈতু। এক অসহায় পিতার নিদারুণ ছবি তুলে ধরেছেন কবি—

"ও বাবা.... বাবা আঁধার লাগছে
ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচালেও
চৈতু মাহাত আলো জ্বালতে পারে না

অভাবের সঙ্গে ভাব হয় সারা সংসারের"[১৬]

চৈতু কোনো বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয় - আমাদের দেশে এমন চরিত্র অগণিত। পঞ্চায়েতের কাছে 'বিষ্টি-ঋণ' নিতে যায় কবি। 'ঝরার বদলে খরার শ্রাবণ' হলে কবির বৃষ্টি-ঋণ চাওয়া





অমূলক নয় — বরং প্রকৃতির এবং মানুষের বঞ্চনা ও খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে এ যেন নীরব প্রতিবাদ। 'নুন' কবিতায় নুনারামের ভাতের সঙ্গে জোটে না একটু নুন। সজনে শাক যে সেদ্ধ করে খাবে তারও উপায় নেই - কারণ সজনে শাক সেদ্ধ করতেও নুন লাগে ঘাম দিয়ে শাক সেদ্ধ করা যায় না। তাই, নুনারামের অমোঘ প্রশ্ন তথাকথিত সভ্য ও আধুনিক ভারতের উন্নত মানুষগুলির প্রতি—

"ভাতের সঙ্গে নুনও থাকে না
ঘাম দিয়ে কি আর ভাত খাব
সজনে শাকেও নুন লাগে
ঘাম দিয়ে কি আর শাক সিজাব"[১৭]

অভাবের তাড়নায় ইস্কুলে যাওয়া হয় না- স্কুলে গেলে মজুরির টাকা কে দেবে? নদীতে বাঁধ দিয়েও কেলাহি-ঝাঁপড়ার মানুষের কোনো লাভ হয় না। কপাল পোড়ে অনেকের— চাষের জমি জলডুবি হয়ে যায়। নিজের মাথায় ছাতা নেই বলে ছাতা পরবে যেতে চান না কবি রাজার হাসি দেখতে।

ছাতা পরব, করম পরব পেরিয়ে আসে বাঁদনা পরব। বাঁদনা কথাটি বন্দনা বা বন্ধন থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। গো-বন্দনা করা হয় বলে বাঁদনা নাম। অন্য মতে, গরু ও বলদ বা ষাঁড়কে দড়ি দিয়ে বেঁধে বিয়ে দেওয়া হয় বলে এর নাম বাঁধনা। নাম যাই হোক না কেন, এই পরবে গরু-মোষের শিঙে তেল মাখানো হয় এবং তাদের পুজো করা হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যার আগে থেকে দু'এক দিন পর পর্যন্ত। কারণ হিসেবে বলা হয় শিঙে তেল দিলে গবাদি পশুর শীত লাগবে না বা শিঙ আরও শক্ত এবং মজবুত হবে যাতে মাটি খুঁড়তে পারবে। এছাড়াও ভিন্নমত হল, গবাদি পশুর সমৃদ্ধি কামনা করা। ধানচাষ, সরষে চাষ ছাড়া গবাদিপশু পালন এই অঞ্চলের মানুষের একটি প্রধান জীবিকা। তাই "ভরন্ত গোয়াল, হামলে ওঠা বাছুর।" এর স্বপ্ন যাতে সার্থকতা লাভ করে তার জন্য এই বাঁদনা পরব।

এখনও গ্রামে গ্রামে ফেরিওয়ালার আলতা-সিঁদুর প্রভৃতি নিয়ে ফেরি করে বেড়ানোর চিত্র বিরল নয়। ফেরিওয়ালার সঙ্গে দরকষাকষিও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়- অভ্যাসবশতঃ সিঁদুর-আলতা নিয়েও দরকষাকষি করে ফেলে। মনে করিয়ে দেয় ফেরিওয়ালা—

"মা ঠাকরুন / আলতা- সিঁদুরের দর করতে নাই"

এ প্রসঙ্গে সমালোচক অচিন্ত্য মাজী মহাশয়ের উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য—

"আলতা-সিঁদুর আসলে বিবাহিত মহিলাদের শুধু প্রসাধনী দ্রব্যই নয়, তা নারীত্বেরই এক অঙ্গ। মাতৃত্ব বা নারীত্বকে নিয়ে যেমন দরদাম করা যায় না, তেমনি আলতা-সিঁদুরকেও

সেই পর্যায়ে ভাবা হয়...কিন্তু অভাবে ও অনটনে তার কথা খেয়াল থাকে না গ্রাম্য নারীর।"[১৮]

"গরাম খান" কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের চিত্র সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। সুখে-দুঃখে-অভাবে-অনটনে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালবাসার স্বরূপ সহজেই ধরা পড়ে সেখানে। কবির ভাষায়—

"ধান রুইতে রুইতে কথা হয়
বীজের বুনন চলে
আনন্দ-বেদনারও বুনন চলে
যা আমরা ধানের শিষে দেখলে দেখতে পারি"[১৯]

সামাজিক সুন্দর সহাবস্থানের কয়েকটি চিত্রের মধ্যে অন্যতম হল পাশের বাড়ির 'মন্ডলদের বউ' এসে একমাসের শিশুকে অত্যন্ত আদরে স্তন্যপান করায়। কারণ শিশুটির মায়ের দুধে শিশুটির পেট ভরে না। স্তন্যপানই শুধু নয় কপালে ভালবাসার চুম্বনও দিয়ে যায় মন্ডল বউ। এই ছবি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। গৃহে কল্যাণের জন্য সাত সকালে মাডুলি দেওয়ার রীতি এখনো এই অঞ্চলে প্রচলিত। তাই, যেদিন গোবর পাওয়া যায় না বা জলে-কাদায় গোবর মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় সেদিন পাশের বাড়ির সাঁওতালদের ঘর থেকে গোবর এনে মাডুলি দিতে সঙ্কোচবোধ করে না কেউ। অন্যদিকে মোদক ঘরে কাজ করতে যাওয়া মাহাত বউ এবং মালকিন মোদক বউ কাজের ফাঁকে সুখ-দুঃখের গল্প করতে করতে নিজেদের অজান্তেই সখী হয়ে ওঠে। ব্রত-পার্বণে একে অপরের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। কবি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই সব মানুষগুলিকে বিনি সুতো মালায় গ্রথিত করেছেন।

কবি মা লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করেন চৈতু, নুনারামদের ভাল ফসলের হওয়ার জন্য। কারণ—

"চৈতু মাহাতর গম হলে
আমিও দু'টা রুটি পাই
অড়হর হলে ডাল পাই এক বাটি"[২০]

'পাহারা' কবিতায় মাতৃভূমির এই লোকায়ত মানুষগুলির গ্রাম দেবতার প্রতি এখনও একনিষ্ঠ ও অটুট বিশ্বাসের কথা বলেছেন। তাই, এই বিশ্বাস থেকে সকলেই গ্রাম দেবতার কাছে মানত করে, সেই বিশ্বাস নিয়েই প্রতিদিন রাত্রে ঘুমোতে যায়—

"মানতের ঘোড়াগুলি
প্রতিদিন রাত্রে জ্যান্ত হয়ে ওঠে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ঘুরে বেড়ায় সারা গাঁ
কার ঘরে অসুখ কার ঘরে নুন-তেল নাই দেখে বেড়ায়
সুখও দ্যাখে"[২১]

মানতের ঘোড়াগুলিই সুখ দুঃখে তাদের একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়।

গ্রামজীবনের সার্থক চিত্র উপস্থাপিত করেছেন কবি নাম কবিতায়। গরাম থান বলতে গ্রামের লৌকিক দেবতার স্থান। গ্রামকে শান্ত, সুন্দর, সমৃদ্ধ রাখেন এই দেবতা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেন তিনি।এই গ্রাম দেবতার পুজোতে অর্ঘ্যের বাহুল্য নেই। নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য অতি তুচ্ছ মাটির ঘোড়া, মাটির হাতি বা মুর্গি বলি দেওয়া হয়। পয়লা মাঘ বা আষাঢ় মাসে এই পূজো হয়। মূর্তি নয় পুজো করা হয় গাছকে। আর গাছের যোগ তো শিকড়ের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে। "গরাম থান" কাব্যগ্রন্থ আমাদের মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কটি স্মরণ করিয়ে দেয় - আমাদের মাটির কাছাকাছি নিয়ে যায়। মাটির সঙ্গে আমাদের ভুলে যাওয়া নাড়ীর টান মনে করিয়ে দেয়। কবি নির্মল হালদার চিরকালীন ভারতবর্ষের স্বরূপটি এই কাব্যে উন্মোচিত করতে পেরেছেন সুনিপুণভাবে।

"গরাম থান" সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বিভাস রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন—

"গরাম থান বাংলা কবিতায় একটি পথপ্রদর্শক প্রচেষ্টা হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেই।"[২২]

নির্মল হালদারের 'গরাম থান' মাটির কবিতা, মাটির কাছাকাছি মানুষের কবিতা, মানুষকে মাটির সঙ্গে সংযোগের কবিতা, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনের কবিতা, প্রকৃতির সমস্ত প্রাণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার কবিতা, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কবিতা, লোকসংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবনের কবিতা, সুখ-দুঃখ,আনন্দ-বেদনাময় শাশ্বত জীবনের কবিতা।

**তথ্যসূত্র :**


১। নির্মল হালদার কবিতা সংগ্রহ ২, ছোঁয়া, শেওড়াফুলি, হুগলী, সুনীতা বিশ্বাস ( প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ২০১৬, ভূমিকা
২। তদেব, পৃ. ১৪৯
৩। তদেব, পৃ. ১৫৪
৪। তদেব, পৃ. ১৪৯
৫। তদেব, পৃ. ১৫০
৬। তদেব, পৃ. ১৫০
৭। তদেব, পৃ. ১৫১

৮। তদেব, পৃ. ১৫১
৯। তদেব, পৃ. ১৫৩
১০। তদেব, পৃ. ১৫৩
১১। তদেব, পৃ. ১৫৪
১২। তদেব, পৃ. ১৫৬
১৩। তদেব, পৃ. ১৫৬
১৪। তদেব, পৃ. ১৫৭
১৫। টাঁড়ের বাবুই, কবি নির্মল হালদারের ৬০ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন, অপূর্ব সাহা সম্পাদিত,থির বিজুরি, ৮৯৫/এ/১ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, সুস্মিতা সাহা (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ-আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৫৯-৬০
১৬। নির্মল হালদার কবিতা সংগ্রহ ২, ছোঁয়া, শেওড়াফুলি, হুগলী, সুনীতা বিস্বাস (প্রকাশক), প্রথম প্রকাশ — বইমেলা ২০১৬, পৃ. ১৫৮
১৭। তদেব, পৃ. ১৫৮
১৮। তবু কিছু মায়া রহিয়া গেল, সম্পাদক — পৃথ্বী বসু ও রূপময় ভট্টাচার্য, দশমিক, ৯/২ রতন নিয়োগী লেন, কলকাতা ৭০০০০৪ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল- আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৬৪
১৯। তথ্যসূত্র ১ তদেব পৃ. ১৭১
২০। তদেব, পৃ. ১৭৫
২১। তদেব, পৃ. ১৭৮
২২। তথ্যসূত্র-১৫ তদেব, পৃ. ২৭



## বাংলা কাব্যে 'কর্ণ' চরিত্র : বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ

**স্বপ্ননীল সরকার**

দেরিদার 'Of Grammatology' গ্রন্থের অনুবাদে গায়ত্রী চক্রবর্তী লিখেছেন 'The text has no stable identity– stable origin–Each act of reading the text is a preface to the next.'[১] পূর্ব-সৃজনের সুনির্দিষ্ট অর্থানুগত্য বা মেটাফিজিক্যল ভাবনার শাসন ও পরিচিত বাইনারি অপজিশনের (ভালো/মন্দ, সুখ/দুঃখ, আলো/অন্ধকার ইত্যাদি) কেন্দ্রিয়-প্রবণতা (বাককেন্দ্রিকতা/'Logocentrism') ভেঙে বহুমাত্রিক চিন্তার পরিসর তৈরি করে বিনির্মাণ। পাঠ-নিহিত প্রচলিত অর্থের সাম্রাজ্যবাদী প্রাকারকে ধূলিসাৎ করে প্রতিপদে ঋণাত্মক প্রশ্নচিহ্নের সামনে, ধাঁধার সামনে ('অ্যাপোরিয়া'/'puzzlement') দাঁড় করালেই আদি-পাঠে যুক্ত হবে ভিন্ন-অভিমুখী গতিশীল মাত্রা। সাহিত্যে 'পুনর্নির্মাণ' ও 'বিনির্মাণে'র একটি মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। যদি পূর্ব-সৃজনের নিহিত অর্থকে আবিষ্কার করে পাঠক-স্রষ্টা তাঁর রচনায় নানা সম্ভাবনার আলোকে ঐ সুপ্ত অর্থের বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটান, তাই বিনির্মাণ। যদি অনুসৃজনে কেবল উপস্থাপনরীতিগত পরিবর্তন ঘটে, উৎস-টেক্সট-এর স্ট্রাচার অপরিবর্তিত থাকে, পূর্ব-পাঠের কেন্দ্রীয় অর্থের মুক্তি না ঘটে, তাকে পুনর্নির্মাণ বলা হবে। বিনির্মাণে পূর্ব-সৃজনের সামগ্রিক কাঠামোটিই ভেঙে নতুন করে গড়ে ওঠে। বাংলা কবিতায় মহাভারতের 'কর্ণ' চরিত্রটির নানা 'পুনর্নির্মাণ'-'বিনির্মাণ' ঘটেছে।

নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের দশম-সর্গে ('ব্যাধ'[২]) কর্ণ দুর্বাসার হাতের পুতুল; তাঁকে যুদ্ধ-সমাচার পৌঁছে দেন, মিষ্টবাক্যে তোষণ করেন, গুরুর নির্দেশে কখনও যুদ্ধে বিরত থাকেন, কখনও আদর্শকেও জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যাধবৃত্তির মতো অক্ষত্রিয়-পন্থায় যুদ্ধ করেন। কর্ণের শান্তিকামী বিবাদপরাঙ্মুখতায় দুর্বাসা কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়েছেন 'শিখাইনু কুমারীকে মন্ত্র অভিচার।/আকর্ষিল মন্ত্রবলে। কুমারী সবিতার/জনম হইল তোর...কুন্তীর নন্দন তুই, মন্ত্র-পুত্র মম।' এমনকি দুর্বাসাই তাঁকে লালন করেছেন, পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষায় পাঠিয়েছেন। এই জন্মবৃত্তান্ত-সহ পিতৃত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করে পিতাসম গুরুর আজ্ঞায় আস্ফালন করে উঠলেন কর্ণ 'আমি পিতার আজ্ঞায় কাটিব না কেন হেন রাক্ষসী মাতার/পুত্রদের শির তবে? যে পিতা আমারে/পালিল বর্জিত সদ্যঃ প্রসূত কুমার,/দিল জ্ঞান, অস্ত্র শিক্ষা, যাহার কৃপায়..."। আড়াল থেকে দুর্বাসা-পত্নী কারু সব শুনে বুঝতে পারলেন, 'কর্ণ দুর্বাসার পুত্র/স্বপ্ন নহে তবে' কর্ণকে দুর্বাসার পুত্র হিসেবে এক অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। মূল বা কাশীদাসী মহাভারতে না থাকলেও এই সম্ভাবনাটুকুকে অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালে মল্লিকা সেনগুপ্তের 'কুন্তী রিভিজিটেড'

কবিতায় দুর্বাসার সঙ্গে কুন্তীর শারীরিক মিলনের ইঙ্গিতটি রয়েছে “কন্যা যত যত্ন করেন, তত ঋষির ফ্রি সেক্সের চাহিদা বেড়ে ওঠে,/তোমার উত্তাপের ছোঁয়া উজ্জীবন আমার/আমাকে দাও ঘনিষ্ঠতা, ক্ষুধার্তকে তৃপ্ত কর নারী।/ঋষির দাবি মেনে নিলেন লাজুকলতা পৃথা অতিথি বৎসলা”[৩]। অনুপম মুখোপাধ্যায়ের মতে ‘দুর্বাসার পুত্র হিসেবে কর্ণকে মেনে নিতে খুবই ইচ্ছে হয়।’[৪] নবীনচন্দ্র পূর্ব-সৃজনের ‘সূর্যপুত্র’-এর প্রচলিত স্ট্রাকচারটিকে ভেঙে দুর্বাসা-পুত্র হিসেবে কর্ণের বিনির্মাণ করলেন।

সংস্কৃত মহাভারতে কুন্তীর প্রতি কর্ণের প্রথম সংলাপ থেকেই ক্ষাত্রবীর্য্য সুলভ প্রত্যাখ্যান ‘ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যের আদর করি না এবং আপনার আদেশ পালন করাও যে আমার ধর্মরে কারণ হইবে, তাহা স্বীকার করি না।’[৫] কাশীদাসী কর্ণ অনেকটা নরম‘পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।/নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননী।।’[৬] কিন্তু কোথাও মাতৃসুধাপানের দুর্নিবার তৃষ্ণা নেই। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ মাতৃস্নেহলাভে কাতর। শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর ব্যাখ্যায়—

“মাতৃগর্ভ থেকে বিচ্ছিন্নতা ও মাতৃস্তন্য থেকে বিচ্ছিন্নতা সদ্যজাত কর্ণের সেই দুটি অভিজ্ঞতাই একসঙ্গে ঘটেছিল। জন্মসূত্রে সবাই মাতৃগর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও মাতৃস্তন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় কিছুকাল পরে। কিন্তু কর্ণের দুটি অভিজ্ঞাই ঘটেছিল জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে। সেই সঙ্গে ঘটেছিল বিচ্ছিন্ন তার তৃতীয় একটি অভিজ্ঞতা অতৃপ্ত মাতৃস্নেহপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।”[৭]

তিনটি বিচ্ছিন্নতাবোধের অভিঘাতে কর্ণ ক্ষাত্রধর্মও মাতৃস্নেহের কাছে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত “যাব মাতঃ, চলে যাব, কিছু শুধাব না/না করি সংশয় কিছু না করি ভাবনা।/দেবী, তুমি মোর মাতা! তোমার আহ্বানে/অন্তরাত্মা জাগিয়াছেনাহি বাজে কানে/যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খমিথ্যা মনে হয়/রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।/কোথা যাব, লয়ে চলো।”[৮] এখানেই রবীন্দ্র-কল্পনায় ‘কর্ণ’ চরিত্রের বিনির্মাণ।

যতীন্দ্রমোহনের ‘কর্ণ’ রবীন্দ্রনাথ-অনুসারী মাতৃস্নেহবুভুক্ষু। ভাসের ‘কর্ণভারম-নাটকে কর্ণ বলছেন“ভোঃ কষ্টম/পূর্বং কুন্ত্যাং সমুৎপন্নো রাধেয় ইতি বিশ্রুতঃ।/যুধিষ্ঠিরাদয়স্তে মে বর্ষীয়াংসস্তু পাণ্ডবাঃ।।/আয়ং স কালঃ ক্রমলব্ধশোভনা/গুণপ্রকর্ষো দিবসোহয়ামগতঃ।/নিরর্থ মন্ত্রং চ ময়া হি শিক্ষিতং/পুনশ্চ মাতুর্বচনেন বারিতঃ।।”[৯] যুদ্ধক্ষেত্রে মাতৃ-আকুলতা অক্ষত্রিয়সুলভ; তাই বেদব্যাস-কাশীরামের মহাভারতে নেই। মাতৃব্যাকুলতায় ভাসের কর্ণকেও অতিক্রম করে যতীন্দ্রমোহনের কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রেও Visual Hallucinations হচ্ছে “ওকি! কার ছায়া উঠিল ফুটিয়া সমুখে মুকুর’পরে?/কর্ণ-জননী কুন্তী যে দেখিনয়নে অশ্রু ঝরে!/পশ্চাতে ফিরি হেরিলা চকিতে,/কেহ তো কোথাও নাহি চারিভিতে!/একি মোহময় মহা বিস্ময়! শিহরিলা ক্ষণতরে;/মুকুরের মাঝে মিলাইল ছায়া আপন মুখের’পরে!”[১০] মনস্তত্ত্ব-অনুসারে,

“A visual hallucinations may be defined as a visual sensory perception without external stimulations[১১], or–‘more operationally–a behavior syndrome in which a patient claims to see something or behaves as if he or she sees something than an observer cannot see.”[১২]





বাস্তবে যুদ্ধক্ষেত্রে কুন্তীর উপস্থিতি অসম্ভব। কর্ণ মনোদর্পণে কুন্তীকে দেখছেন। Hallucination-এর একটি কারণ ‘During the course of intense emotional experience such as grief reactions.’[১৩] মাতৃসুধাপানের ক্ষীণ- সম্ভাবনাটুকুও প্রত্যাখ্যান করে কর্ণের মনে কর্তব্য-আদর্শের সঙ্গে মাতৃআজ্ঞার সংঘাত থেকেই হ্যালুসিনেশন। এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার নব-সম্ভাবনায় ‘কর্ণ’ চরিত্রটি বিনির্মিত।

বিষ্ণু দে’র ‘উত্তরা-সংবাদ’[১৪] কবিতায় সামাজিক পরিবর্তনের মার্কসবাদী কবি কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্মদের মতো মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের ভর্ৎসনা করেছেন—‘বৃথা পিতামহ শরশয্যায় তুহিনে ভাসে/এ আনুগত্য সাজে না কর্ণে, সাজে না দ্রোণে...’। এখানে কর্ণ চরিত্রের বিনির্মাণ হলেও কর্ণকে একক পরিসরে পৃথক করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়নি।

‘Sperm’(শুক্রাণু) শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ‘Sperma’ [বীজ/Seed] ও ‘Speiro’ [বপন/to sow] থেকে[১৫]। পুরাণাদিতে মাটি ‘নারী’ ও বীজ ‘শুক্রাণু’ হিসেবে বর্ণিত। বীজ মাটিতে রোপনের ফলেই গাছের জন্ম। Cirlot ‘A Dictionary of Symbols’ গ্রন্থে ‘Seed’ প্রসঙ্গে বলছেন, “Symbols of latent–is the justification for the hope. These potentialities also symbolize the mystic Centrethe non–apparent point which is the irradiating origin of every branch and shoot of the great Tree of World”[১৬] প্রাণপ্রাচুর্য ও সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে ‘বীজ’। কাশীদাসী মহাভারতে ‘কর্ণরন্ধ্র পথে’ কর্ণের আবির্ভাব[১৭] দেখালেও বেদব্যাসের মহাভারতে সূর্য-কুন্তীর মিলন সুস্পষ্ট ‘সংবভূব রমণপ্রবৃত্ত’[১৮]; এইভাবেই কুন্তীর গর্ভে সূর্য্যবীজের প্রবেশ। তাঁদের পুত্রই ‘তত্র বীরসমভাবৎ সর্বশাস্ত্রবিদ্যিং বরঃ’, ‘সর্বগুণোপেতমবকীর্ণং’ [১৯] ত্যাগী, বীর, আদর্শে অটল, নির্ভীক। ‘সূর্যবীজ’[২০] কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশ্বাস সূর্যবীজ কর্ণের মতো কিছু কিছু মানুষ আজও জন্ম নেন পৃথিবীতে, যাঁরা জীবনের মূল্যে ‘বীরের সদগতি’কে বাঁচিয়ে রাখার আমৃত্যু সংগ্রামী। এঁরা সব সূর্যের সন্তান “যুগে যুগে তুমি পাঠাও তোমার দূত.../যে সূর্য-বীজ তুমি রোপন কর.../মানবতার গভীর উৎস-মূলে/অক্ষয় তার প্রেরণা।”[২১] এই কবিতায় বিনির্মিত কর্ণ পৃথিবীর মাটিতে জন্ম নেওয়া যুগে-যুগান্তরে সমাগত মহত্মাদের প্রতিভূ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘রাধেয়’ কবিতায় কর্ণের জন্য দুঃখ-প্রকাশন করেছেন ‘আহা রে! তুই সমস্ত রাত/ঘুমোতে পারিস না!’[২২]। জীবনভর অন্ধকারেও কর্ণ লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকেননি। কবি সাধারণ মানুষের পলায়নী মনোবৃত্তি, পি-পু-ফি-শু-র বিরুদ্ধে সদা-জাগ্রত আদর্শ চরিত্র কর্ণকে স্মরণ করেন বিনির্মাণের আলোয়। Cirlot-এর মতে, সূর্য ‘the active principal and the source of life and energy.’[২৩]

বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সূর্যতেজ শ্রমশক্তির প্রতীক। ‘মহাভারত : ধর্মযুদ্ধ’[২৪] কবিতায় যেদিন কর্ণ নিয়তির কাছে প্রণত হল, সেদিনের ‘সূর্যাস্ত’ আসলে অদৃষ্টের হাতে শ্রমশক্তির পরাজয়; কর্মে নয়; দৈবের কাছে ভারতবাসীর আত্মসমর্পণ। এখানেও ‘কর্ণ’ চরিত্রটি বিনির্মিত। ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’-এর বিনির্মাণ ‘ব্রাত্য’[২৫] কবিতায় কর্ণ অনার্য-অস্মার্ত-প্রান্তিক ‘আলোছায়ার অপরাহ্নে আর্যাবর্ত নীল/ছাড়িয়ে এসে আরো গভীর রঙের মোহনায়/সিন্ধু কিংবা সবিতাকে প্রণাম জানায়। আমার/মনে হচ্ছে সবিতাকেই; যার লাবণ্য চায়/সকল মানুষ, সকল নদী এবং জন্মভূমি...’। সূর্যের আলো আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে সমভাবেই বর্ষিত হয়; সূর্য জাতি-বিভাজন মানে না। ‘মোহনা’ স্মার্ত-অস্মার্তের মিলনস্থল, যেখানে ‘সকল মানুষ’, ‘সকল নদী’ মিলেমিশে একাকার, বিভেদের মাঝে মহামিলন। কুন্তীর আহ্বান কর্ণের কাছে শিকড়ের অন্তর্গত বিদ্বেষ-বিভাজনহীন ঐক্যের ডাক শুনে অভিভূত কর্ণ মুহূর্তের জন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন মহামিলনের; কিন্তু ভারতবর্ষের কঠিন বাস্তবতা তাঁকে বলল—‘তুমি ব্রাত্য, রাধা তোমার মা/রাত্রি এসেছে, নিজের ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো’। সমন্বয়ের স্বপ্নভঙ্গ। বিভাজনের রাজনীতির সুযোগ নিয়ে চলেছে ব্রাহ্মণ্যবাদ; কর্ণদের আজীবন ‘ব্রাত্য হয়ে’ থাকতে হয়েছে ‘অন্ধকারে ভুবন ভরে যাচ্ছে, মন্ত্র পড়ছে কুরু-পাণ্ডবের পুরোহিতরা’। কর্ণ এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ-কর্তৃক নিহত ব্রাত্যজন ‘সাবঅলট্রার্ন’ ক্রিটিসিজমে ‘কর্ণে’র বিনির্মাণ।

কর্ণ যেদিন অঙ্গপতি হলেন, সেদিন থেকে ক্ষমতাশীর্ষে তাঁর অবস্থান। ট্র্যাজিক মৃত্যু, আত্মত্যাগ তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। ‘কর্ণ’ কবিতায় তরুণ সান্যালের প্রশ্নযখন কর্ণ ক্ষমতা-খ্যাতি-ঐশ্বর্য-শক্তির চূড়ান্ত বিন্দুতে ‘নক্ষত্র’-এর মতো অবস্থান করছেন, তখনও কি তাঁর মনে পড়ে ফেলে আসা প্রান্তিক জীবনস্মৃতি? “নক্ষত্রের দেশকালে পৌঁছেছিলে ঠিকঠাক যেদিন/নীচে ধুলো জবরজঙ বা সবুজ গ্রহটির মুখও/ভুলেছিলে?...”[২৬] কবি কর্ণের ত্যাগ-আদর্শের মধ্যে বিখ্যাত হওয়ার বাসনাকে খুঁজেছেন; যে-বাসনা কর্ণকে বংশপরিচয়ের গ্লানি থেকে উত্তোরণের পথ দেখাবে—‘উদ্দেশ্য তারও পিতা পিতামহদের মাংসহাড় ছেঁচে/বংশপদবীর পিছে উদ্বৃত্ত উপাধি।।”(তদেব)

শঙ্খ ঘোষের ‘কর্ণের স্বপ্ন’[২৭] কবিতায় কৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণীতে কর্ণের প্রত্যুত্তরে তিনি স্বপ্নে আসন্ন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির আভাস পেয়েছেন। চরক ‘চরকসংহিতা’য় স্বপ্নকে সাতভাগে ভাগ করেন দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক, দোষজ। (‘দৃষ্টং শ্রুতানুভূতঞ্চ প্রার্থিত কল্পিতং তথা।/ ভাবিকং দোষজঞ্চৈব স্বপ্নং সপ্তবিধং বিদুঃ।।’)[২৮]। ‘কল্পিত’ স্বপ্ন অবাস্তব, আজগুবি; ‘ভাবিক’ স্বপ্ন ভবিষ্যৎ-আভাসক। কাশীদাসী কর্ণের স্বপ্ন ‘ভাবিক’ হলেও উদ্ভট অলীকতা না থাকায় একে ‘কল্পিত’ স্বপ্ন বলা যাবে না। ব্যাসদেব ও শঙ্খ ঘোষের কর্ণের স্বপ্ন একইসঙ্গে ‘ভাবিক’ ও ‘কল্পিত’। ফ্রয়েডের পরিভাষানুযায়ী শঙ্খ ঘোষের কর্ণের স্বপ্নের Manifest Content অনেকটাই বিমূর্ত, সেখানে যুধিষ্ঠিরাদি চরিত্রের উল্লেখ নেই। ব্যাসদেবের কর্ণের স্বপ্নে Manifest Content সম্পূর্ণত মূর্ত, সেখানে যুধিষ্ঠির-সহ ভাইদের কার্যকলাপ





পরিলক্ষিত। ব্যাসের কর্ণের Latent Content-এ কেবল পাণ্ডবদের বিজয়োল্লাস, ভোগ-উচ্ছ্বসই প্রতিফলিত; শঙ্খ ঘোষের কর্ণের স্বপ্নের Latent Content-এ সময়জোড়া অন্ধকারে বিলাসোন্মত্ত পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত ধ্বংসচিত্র অঙ্কিত; এখানে পরিবেশ-ভাবনা (‘ইকোক্রিটিসিজম)-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে; যা কাশীদাসী কর্ণের স্বপ্নে নেই। শঙ্খ ঘোষ কর্ণের ‘ভাবিক’-‘প্রার্থিত’ স্বপ্নে Latent Content-এ প্রতীকের দৃষ্টান্ত এনে একইসঙ্গে প্রাচ্যের প্রাচীনতম শরীরবিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটালেন পৌরাণিক চরিত্রটিকে সামনে রেখে; এখানেও ‘কর্ণ’ চরিত্রের বিনির্মাণ। কর্ণের আকাশছোঁয়া আমিত্ব সংকীর্ণ ‘ছোট আমি’ নয়, জীবনের গভীরতম ব্যথায় বৃহত্তম ত্যাগে ‘বড় আমি’র পরিচায়ক— “কর্ণ বললেন, আরও ‘হোক তা-ই। কিন্তু ঐ ডাকে/তবুও কখনও আমি ছেড়ে যেতে পারি কি আমাকে?” এখানে কর্ণের পুনর্নির্মাণ ঘটালেন কবি।

অমিতাভ দাশগুপ্তের ‘কর্ণ’ কবিতায় বিনির্মিত কর্ণ আজীবনের ত্যাগ-সহিষ্ণুতা-কষ্ট দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে মহাকালের ঠিকানায় শেষ আবেদনপত্রটি জমা দেন ‘হওয়ার হাতে কালের হাতে ভাসে পরিণাম/সঁপেছি সব তোমাকে, তুমি মিলিয়ে যেতে যেতে/ও নদী, ভরাসমুদ্রকে আমার কথা বোলো’[২৯]। এখানে ‘হাওয়া’ ভাগ্য, ‘নদী’ জীবন, ‘সমুদ্র’ মহাকালের স্রোত।

সব্যসাচী দেবের ‘কর্ণ’[৩০] কবিতায় বস্ত্রহরণকালে কর্ণ মুহূর্তের জন্য প্রতিবাদ করতে গিয়েও বিরত হন; কর্ণের এই প্রতিবাদী-প্রতিক্রিয়া মহাভারত-সমর্থিত নয়; ‘পূরণকারক সত্যে’ রচিত। কাশীদাসী কর্ণ বলেছিলেন ‘আসিবে বেশ্যা লাজ তার কিসে/এমত বিচার মম মনেতে আইসে’[৩১] কিন্তু বস্ত্রহরণ-প্রস্তাব দেননি; বস্ত্রহরণকালেও নীরব; উল্লাস বা প্রতিবাদ করেননি। ব্যাসের কর্ণ দুঃশাসনকে বস্ত্রহরণ-প্রস্তাব দিয়েছেন— ‘দুঃশাসন।...পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাংসি দ্রৌপদ্যাশ্চাপ্যুপাহব’[৩২]। কর্ণ বলেছেন—‘মেদিনী নয়, রথচক্র গ্রাস করেছে আমারই মনের দ্বিধা-বিনির্মাণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ‘দ্বিধা’ অজস্র সম্ভাবনাকে ছুঁয়ে যায়; মাতৃস্নেহবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্নতার দ্বিধা, অঙ্গপতি-সূতপুত্রের দ্বিধা, অস্তিত্বহীনতা ও নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় দ্বিধা, নৈতিকতার দ্বিধা, বিক্রমের সঙ্গে ভাগ্যের দ্বিধা আরও কত কী!

কৃষ্ণা বসু ‘কর্ণ’ কবিতায় কর্ণকে ভাসিয়ে দেওয়া, রাধা-অধিকরথ-কর্তৃক প্রতিপালন, অস্ত্রশিক্ষা, শাপপ্রাপ্তি, কবচ-কুণ্ডল দান, ভীষ্ম-সহিত বিবাদ, রথচক্র গ্রাস, অর্জুন-কর্তৃক হত্যা ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলিকে চয়ন করে শেষে কর্ণের প্রতি করেছেন সহানুভূতিশীল উচ্চারণ করেছেন—‘পৃথার প্রথম পুত্র মার খাও জীবনের হাতে...’[৩৩]। এখানে চরিত্রটি কবির উপস্থাপন-শৈলীতে পুনর্নির্মিত হয়েছে।

ব্রত চক্রবর্তীর ‘কর্ণ’[৩৪] কবিতায় কবির বা পাঠকের সত্তা কর্ণের সঙ্গে একাকার। বিনির্মিত কর্ণ হয়ে ওঠেন ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের প্রতিভূ।

পিনাকী ঠাকুর ‘মহাভারত কিংবা একটা টেস্টম্যাচ’[৩৫] কবিতায় কর্ণকে ব্যাসদেবের

কাব্যে উপেক্ষিত করে রেখে খেলার পুতুলের মতো অদৃষ্টের সুতোয় ঝুলিয়ে দেওয়ার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কবি।

কাশীদাসী আবেগী কর্ণ কুন্তীকে প্রত্যাখ্যান করলেও মুখে মধুর বচন "রাধারনন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।/তবু পুত্র আমি, এবে বলিব কেমনে।।...../না ভাবিহ দুঃখ মাতা, যাহ নিজ স্থানে।/এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে।।"[৩৬] ব্যাসের অনমনীয় কর্ণ বলেন 'আপনার এই সকল বাক্য আমার হিতকারী হইলেও এখন আমি এগুলি রক্ষা করিতে পারিব না।'[৩৭] জয়দেব বসুর 'রাধেয়-অধিরথসূত' গদ্যকবিতায় কর্ণ 'চাচাছোলা' ভাষায় জানিয়ে দেন—'যান সাধ্বী, ফিরে যান, শেষকথা শুনে যান শুধু সারা দুনিয়ার অন্ত্যজদের, সারা দুনিয়ার বেজন্মাদের কসম আপনি আমার মা না।'[৩৮] গদ্যরীতিতে কবিতাটির গড়নটাও অভিনব, কারণ কর্ণ-জীবন কাব্যিক-সুরললিত নয়, গদ্যের কঠোর-হাতুড়ির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। ভাষারীতিতে কর্ণের চরিত্র পুনর্নির্মিত।

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গমঞ্চ' কবিতায় কর্ণের জীবন যেন ট্র্যাজিডি-নাটক, শেষদৃশ্য "কিন্তু মোক্ষম সময়ে সংসারে বসে গেছে আমার রথের চাকা।/তির ছুঁড়ে স্পট লাইটে ঝলমল করছে পাণ্ডবেরা।/তবু প্রাণপণে শেষ ডায়লগটা বলতে হবে আমাকে/বলতে হবে, শোনো, আমি কর্ণ, আমি সূর্যের বাচ্চা/আমার এই ভেসে যাওয়া জীবন, এই আমার আলো।"[৩৯]। এখানে চরিত্র ও ব্যক্তিগত জীবনসত্তা একাকার; কবি-কর্ণ একাত্ম; 'কর্ণ' চরিত্রের বিনির্মাণ।

**দেবেশ ঠাকুরের 'কর্ণ :** পাঞ্চালীকে' কবিতায় এক নিভৃত রাতে দ্রৌপদী এসেছেন পঞ্চস্বামীর প্রাণ ভিক্ষার জন্য কর্ণের কাছে। কর্ণ বললেন "পাঞ্চালী,..তোমাকে উপহার দেব আমার বজ্রাহত জীবন...আমার অপূর্ণতার জন্য একবিন্দু চোখের জল ফেলো/সেই হবে আমার মরণের পরমোজ্জ্বল সার্থকতা।"[৪০]। এই সাক্ষাৎ অপৌরাণিক; পাঞ্চালীর কথা রাখতে কর্ণের মৃত্যুবরণ। পূর্ণতার দিকে কর্ণের আজীবনের যাত্রা সার্থকতা পাবে কর্ণের মৃত্যুতে, আকাঙ্ক্ষিত নারীর একফোঁটা চোখের জলে! এই সম্ভাব্যতায় চরিত্রের নবনির্মাণ প্রতিষ্ঠিত হল।

অংশুমান করের 'কর্ণ' কবিতায় কর্ণ মহাভারতীয় চরিত্র নয়, পাড়ার রোয়াকে আড্ডা দেওয়া 'রাস্তার ছেলে' অথবা রিক্সাচালকের সন্তান। কর্ণকে জাতিগত প্রান্তিকতায় নয়, দরিদ্র পথযুবক হিসেবে বিনির্মাণ করলেন কবি "একা কর্ণ অভিমানী সাইকেল প্যাডেল ঘোরায়/ওরা সব বড়লোক, ওরা সব ফরাসি আতর/সে এক সামান্য ছেলে, বাবা তার রিক্সার চালক"[৪১]।

তন্ময় চক্রবর্তীর 'আদিরস' কাব্যে এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রসঙ্গ। কবি তুলে ধরেছেন কর্ণের অন্তিম ট্র্যাজিডিটুকু "জন্মরহস্যে রাধাগর্ভজাত অধিরথ সূতপুত্র কবচকুণ্ডল দাতা/ইন্দ্রের কারসাজি। সূর্য্যদেব শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারলেন না।"[৪২] এই মূলানুগ কবিতায় উপস্থাপনরীতিগত বৈচিত্র্যেই কর্ণের পুনর্নির্মাণ।





নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণ' কবিতাটি মহাভারতের বিনির্মাণ। কবিতায় কর্ণ অন্তিমকালে কোনো অনুরোধ-অনুনয় করেননি; নির্ভয়ে অকপটে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিয়েছেন— 'মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বলো/আমাদেরও একই শোনিত,/শ্রদ্ধানদীর উপর ভেসে যায়নি কি চিরকাল?'[৪৩] ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেবল স্মার্তদের প্রতি শ্রদ্ধা বর্ষিত হয়। কর্ণ আর্য-সংস্কৃতির হাতে নিহত হলেও প্রান্তিক-অবহেলিতদের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর প্রশ্ন ব্রাহ্মণ-রচিত শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে ব্রাত্যদের প্রতি শ্রদ্ধার অনুল্লেখের কারণ কী?

ফাল্গুনী ঘোষের আটটি সর্গে বিভক্ত 'কর্ণ প্রসঙ্গ' মহাকবিতা-গ্রন্থের কথামুখ অংশে কবি লিখেছেন, 'কর্ণ প্রতিবাদের দুর্মর প্রতীক...সে ধারণ করে মানুষের বহুমাত্রিক চেতনা ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের রামধনুকে...'[৪৪]। এই কর্ণের মুখে শ্রেণি-সংগ্রামের আহ্বান— 'নিযুত কর্ণের দল জাগো জাগো প্রত্যেক চরাচরে', যা বিনির্মাণের সার্থক দৃষ্টান্ত। এছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যে, মণীন্দ্র রায়ের দীর্ঘ-কবিতায়; দেবব্রত দত্ত, অবশেষে দাস, আর্যতীর্থ, মিতা বিশ্বাস প্রমুখ আধুনিক কবিদের 'কর্ণ' চরিত্রটি নানাভাবে পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়েছে।

**তথ্যসূত্র :**


১. 1. Derrida– Jacques– 'The End of the Book and the Beginning of Writing'– Of Grammatology– Motilal Banarasidass Publishers Private Limited– Delhi– 2002– P. Xii

২. নবীনচন্দ্র সেন, 'কুরুক্ষেত্র' : দশম সর্গ (ব্যাধ), রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৬, পৃ ১৮২

৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত, "কুন্তী রিভিজিটেড", 'অগ্রন্থিত', কবিতা সমগ্র, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৫৫৯-৫৬০

৪. অনুপম মুখোপাধ্যায়, 'অঙ্গ আর সূর্য', কর্ণ, দাঁড়াবার জায়গা প্রকাশনা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ২১-২২

৫. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, 'উদযোগপর্ব', মহাভারতম (১৬ খণ্ড), বিশ্ববাণী, কলকাতা, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২০৫

৬. কাশীরাম দাস, 'উদ্যোগপর্ব', মহাভারত, দে'জ, কলকাতা, দশম রাজসংস্করণ, নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ৬৫০

৭. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্র উপন্যাস ও নাটকের স্বতন্ত্র বিচার, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০২২, পৃ. ১৩০

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈশাখ ১৩৮৯, সঞ্চয়িতা, 'কাহিনী', "কর্ণকুন্তীসংবাদ", বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, দশম সংস্করণ, পৃ. ৩৯৫

৯. জ্যোতিভূষণ চাকী, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর, ধর্মপাল, গৌরী (সম্পাদিত),

সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার (ভাস, কালিদাস) (১২ খণ্ড),নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ১৪

১০. গোরা সিংহরায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ১১৭

১১. Lessel S– Higher disorder of visual function- Positive Phenomena– Chap 2– In Glaser JS– Smith JL Œ Ed's–Neuro-ophthalmology– Vol 8. St Louis– CV Mosby– 1978– pp 27-44

১২. Sadman G– A comparative Study of Pseudohallucinations– imagery and true Hallucinations. Br. J. Psychiatry– 1966– P. 112-9–17

১৩. Jeffrey L. Cummings– Brucce L. Miller– "Visual Hallucinations- Clinical Occurrence and Use in Different Diagnosis"– 'Clinical Medicine'– West J– 1987 Jan– P. 146- 46–51

১৪. বিষ্ণু দে, জানুয়ারি, "উত্তরা-সংবাদ", 'সন্দীপের চর', কবিতাসমগ্র, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ১৯৭

১৫. Donald– James– W. & R. Chambers - London and Edinburgh– Chambers's Etymological Dictionary of the English Language– 1874– P. 484

১৬. Cirlot J. E.– A Dictionary of Symbols'– London– Rutledge– Second edition– 1971– P. 282

১৭. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদিত), 'আদিপর্ব', কাশীদাসী মহাভারত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০২০, পৃ. ৮৯

১৮. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, 'আদিপর্ব', মহাভারতম(৩ খণ্ড), দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২০৭

১৯. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, 'শান্তিপর্ব', মহাভারতম(৩২ খণ্ড), বিশ্ববাণী, কলকাতা, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ, মহালয়া ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮

২০. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'সাগর থেকে ফেরা', কবিতা সমগ্র, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৫২-১৫৩

২১. তদেব, পৃ. ১৫২-১৫৩

২২. সব্যসাচী দেব, (সম্পাদিত), বীরেন্দ্র সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, অনুষ্টুপ সংস্করণ, জুলাই ২০১১, পৃ. ৮৮

২৩. Cirlot J. E.– A Dictionary of Symbols'– London– Rutledge– Second edition– 1971– P. 320

২৪. সব্যসাচী দেব, (সম্পাদিত), বীরেন্দ্র সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), অনুষ্টুপ, কলকাতা, অনুষ্টুপ সংস্করণ, জুলাই ২০১১, পৃ. ৮৯



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

২৫. সব্যসাচী দেব, (সম্পাদিত), বীরেন্দ্র সমগ্র (১ম খণ্ড), অনুষ্টুপ, কলকাতা, অনুষ্টুপ তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১৭৫-১৭৬

২৬. তরুণ সান্যাল, 'নিতান্ত পুঁতির টায়রা', কবিতা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ২৩৪

২৭. শঙ্খ ঘোষ, 'মাটি খোঁড়া পুরনো করোটি', কবিতা সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২১, পৃ. ১৩১

২৮. শর্মা সতীশচন্দ্র (সম্পাদিত), 'পঞ্চম অধ্যায়: ইন্দ্রিয়-স্থানম, চরক সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গ্রন্থাগার, পৃ. ১৯

২৯. অমিতাভ দাশগুপ্ত, 'বারুদবালিকা', শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭, পৃ. ৮৮

৩০. সব্যসাচী দেব, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৪৮-৪৯

৩১. দাস, কাশীরাম, 'সভাপর্ব', মহাভারত, দে'জ, কলকাতা, দশম রাজ সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ৩০৯

৩২. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, 'সভাপর্ব', মহাভারতম (৫ খণ্ড), বিশ্ববাণী, কলকাতা, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৪৯

৩৩. কৃষ্ণা বসু, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১০৯-১১০

৩৪. ব্রত চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০২২, পৃ. ১৩৬

৩৫. পিনাকী ঠাকুর, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, কলকাতা, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৮৪

৩৬. কাশীরাম দাস, 'উদ্যোগপর্ব', মহাভারত, দে'জ, কলকাতা, দশম রাজ সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ৬৪৯-৬৫০

৩৭. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, 'উদযোগপর্ব', মহাভারতম(১৬ খণ্ড), বিশ্ববাণী, কলকাতা, দ্বিতীয় (বিশ্ববাণী) সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ.১২০৮

৩৮. জয়দেব বসু, কবিতা সংগ্রহ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, পরিবর্তিত পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ, মে ২০১৭, পৃ. ২১

৩৯. শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০২০, ভারতকথা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৯

৪০. দেবেশ ঠাকুর, কবিতা সমগ্র, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০১৮, পৃ. ২৭-৩০

৪১. শ্যামলকান্তি দাশ ও বিমল গুহ, (সম্পাদিত), হাজার কবির হাজার কবিতা, সাহিত্যম কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১১, পৃ. ১০৬৮

৪২. তন্ময় চক্রবর্তী, আদিরস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৫০, পৃ. ৪৭

৪৩. নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, আকাশ ছেয়ে গন্ধরাজ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০২১, পৃ. ১১

৪৪. তরুণ মুখোপাধ্যায়, বাংলা কবিতা অনেক আকাশ,প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫৭৭

# লোককবি ভবতোষ শতপথীর জীবন-দর্শন ও কাব্য-যাপন

ড. মহঃ খুর্শিদ আলম

কবি ভবতোষ শতপথীর কবিতার অন্তপুরে ডুবতে ভাসতে হলে তার জীবনের ধূপ ছায়ার আঁচ নিতেই হয়। আমরা চলতে চলতে সে সব কথা ব্যক্ত করব। ক্লান্ত মানুষের মতো দরিদ্রতা তার আষ্টেপৃষ্ঠে, সংসার জীবনে অশান্তি, স্ত্রী বিয়োগ, ভবঘুরে কবিকে বিচলিত করেছিল বৈকি। কবিও ত মানুষ। তবে হার না মানা মানুষ। আবার কিছু কিছু হারা-হারানোর যন্ত্রণাকেই সম্বল করে লেখনি হয়েছে ক্ষুরধার। কখনো কখনো আন্দোলনে হয়েছেন সামিল মূলত ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে। কিন্তু সর্বত্রই আলোর অন্বেষণ, জীবনের খোঁজ। উন্নত মানসিকতা আর সহজ সরল জীবনযাপন ছিল। ছিল স্বাভীমান, দুঃখের মধ্যেও কাব্যসাধনা চলেছে নিরন্তর। মানুষ ভালোবেসে কবির পাশে এসেছে, সাহায্য করেছে। কবির তবে চলেছে দিনাতিপাত।

ভবতোষ শতপথীর জন্ম এক উচ্চবংশীয় অবস্থাপন্ন পরিবারে কিন্তু শৈশব কাটে বাকি সব দরিদ্র শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের সাথে। ফলত তাদের সংস্কৃতি, কষ্ট, জীবনচর্চা কবিকে ছোট থেকেই প্রভাবিত করে। অবহেলিত মানুষের প্রতি কবির টান, দরদ ছিলই। ফলত বাবার অবর্তমানে নিজের সম্পত্তির ঠিকঠাক দেখভাল এই ভবঘুরে দরদী মানুষটা করতে পারেননি। বরং মানুষ ঠকিয়েছে। হিসেবি মানুষ না হওয়ায় হাত ফসকে গেছে নিজের অর্থনীতি। জমিদার বাড়ির সন্তান এক সময় নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

কবির শৈশব ছিল কবির মূলধন। সাঁওতাল, মাহাতো, ভূমিজ ছেলেমেয়েদের সাথে ব্রাহ্মণ ছেলেটির পড়াশুনা, খেলাধুলা। পাঠশালার মাস্টারমশাই ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ টুডু। সাঁওতাল। আবার শুধু পাঠে আটকে থাকতেন না, পাঠশালা পালিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, পাখি শিকার করতেন। জঙ্গল যেন তাকে টানত। আর সাঁঝ আসরে মাদলের বাজনা, ধামসার গম্ভীর ধ্বনি বিচলিত করত। বাড়ির আঁটোসাটো ভাব তাকে অস্থির করত। তবুও দিনের আলোয় টুসু, ভাদু, করম, জাওয়া, মকরমেলা, মুরগি লড়াই-এ সামিল থাকতেন। আর এই সব দেখতে দেখতে অভাবী মানুষগুলোকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা। এদের দুঃখে দুঃখী হওয়া। যেন এদেরই প্রতিনিধি হয়ে উঠা।

প্রসঙ্গক্রমে বলা ভালো যে, কবি ছিলেন পরিবারের এক ব্যতিক্রম সন্তান। কেননা ট্র্যাডিশন ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের হেয় করা, শোষণ-শাসন করা। এক কথায় মানবপ্রেমী তেমন কেউ ছিলেন না। সেখানে কবির নিত্যসঙ্গী বন্ধু তপন মুখার্জির কথা হল যেন- দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ ছিল ভবতোষ। অরণ্যপ্রীতি ছিল তার শৈশব কাল থেকেই। শাল, কেঁদ গাছ কবির প্রিয় গাছ ছিল। এক সময় এই ভবঘুরেকে পরিবার জোর করেই বিয়ে দেয় তখন কবির বয়স কুড়ি। শ্বশুরবাড়িটি জমিদার। দুদিকেই আভিজাত্য, বিষয়ী



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

মানুষের মাঝে কবি মন যেন পালাতে চায়, হাঁপায়। স্ত্রী গায়ত্রীদেবী ঠিক পছন্দ করেন না তার ভবঘুরে জীবন, কাব্যচর্চা, জীবনচর্চা। দাম্পত্য জীবন হয় অশান্তির। আবার এই সময় কবি নিজেও বিলাসিতায় ডুবে যান। দামি গাড়ি চড়ে যত্রতত্র বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ানো। লোধাশুলি, কাকড়াঝোর, ঝাড়গ্রাম কারণে অকারণে কেবল ঘুরে বেড়ানো। বিবাহের পরেও সেই বাউন্ডুলে জীবন। ঘরে বাঁধতে পারেনি স্ত্রী। আয় নেই বরং বেহিসাবি জীবন।

সংসার সামলাতে না পেরে দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে স্ত্রী। তিন সন্তানের শেষ সন্তান জন্মাবার পর ভীষণ অসুস্থ হন গায়ত্রীদেবী আর সংসার থেকে বিদায় নেন। কবির সামান্য বন্ধনও যেন ছিন্ন হল। দেখভালের অভাবে জমি বেদখল হতে থাকে। বাবাও অসুস্থ। জমি জলের দরে বিক্রি হতে থাকে। আবার কিছু জমি দানও করে দেন। বেদখল জমি উদ্ধারের চেষ্টাও করেন না। জমির প্রতি কোন টান, মোহ, দায় দেখা যায় না-'বেশ করেছি সব বেচেছি বাঁচার তাগিদে

শেষ সম্বল ভালোবাসা বেচবো নগদে'।

তবে কাব্যচর্চা চলছে। বসুন্ধরা, দৈনিক সমাচার, আনন্দমেলা, স্বাধীনতা, কৃত্তিবাস, নন্দন নানান পত্র-পত্রিকায় কবি তখন পরিচিত। বামপন্থার প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল। আর শ্রেণি শোষণের চিত্র তো তিনি বাল্যকাল থেকেই দেখছেন। নিজেও দারিদ্র্যের আঁচে সিদ্ধ হয়েছেন। চরম অবস্থার সময় বাবাকে হারিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের মামা তাদের নিয়ে যান। কবি তার মায়ের সাথে একা পড়ে থাকেন। এই সময় 'নন্দন' তাঁকে জনগণের কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 'পইন্যা' বলে একটি কাগজ বের করেন কিন্তু তা তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি। তবে কবির অভাবের পাশে মানুষের সাহচর্য ছিল। কবিকে মানুষ ভালোবেসেছে খুব। আর সীমাহীন দারিদ্রতার সঙ্গে লড়েই কাব্যচর্চার অঙ্গনে সারাজীবন টিকে ছিলেন।

ভবতোষ শতপথীর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে- কাস্তে, অরণ্যের কাব্য, শিরি চুনারাম মাঁহত, ঢেমনা মঙ্গল, টুসু সঙ্গীত, জনঅরণ্যে হেঁটে যায় একা —ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'অরণ্যের কাব্য' কবিকে সুবিখ্যাত করে। এছাড়া কিছু কবিতা ঝুমুরে রূপ লাভ করে। বিজয় মাহাত সুরারোপিত করে গেয়েছেন যা ঝুমুর প্রভাবিত সমস্ত দক্ষিণ পশিচম বঙ্গকে প্রভাবিত করেছে। ফলত ভবতোষ শতপথী কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের হৃদয় অন্তপুরে স্থান করে নেন। বহুল জনপ্রিয় ঝুমুরের মধ্যে—

আকাল বছর আল্যঅ ঝড়  
উড়াঞ লিলঅ চালের খড়  
খুদ-কুঁড়হা ঢুক্যেঁঞ গেল ঢড়অরে  
রং-  মাঁস পিঠা হবেক মকরে।১

ঝুমুর সম্রাট বিজয় মাহাত'র সশ্রদ্ধ স্মরণ উক্তি- "লোককবি ভবতোষের সর্বপ্রথম রচিত ঝুমুর 'আকাল বছর আল্যঅ ঝড়' ইংরাজি ১৮৮৫ সালের প্রথম দিকে আমার

জন্যই লেখা হয়। অ্যালবামে রেকর্ডিং হয় ১৯৮৬ সালের আগস্টে। এই ধরনের বহু ঝুমুর কবি আমাকে দিয়ে আমাকে তো সৌভাগ্যবান করেছেনই—ঝুমুর জগৎকে করেছেন সমৃদ্ধ। অপরাপর ঝুমুর গীতিকবিদের থেকে তাঁর সত্তাকে তিনি আলাদা করেছেন অতুলনীয় মানবতাবোধ দিয়ে। মেহেনতি আমজনতাকে নিয়ে কবির অপূর্ব মননশীলতা ও চিন্তাধারা এমনভাবেই উন্মুক্ত যে তাঁর রচনায় আমার গাওয়া ঝুমুরগুলি মানুষের মুখে মুখে গীত হয়ে চির নতুনত্বে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।"[২] এই গানের পর শ্রোতার মনে বিজয় মাহাত যেমন স্থান করে নেন। ভবতোষ শতপথীও কবি ও গীতিকার রূপে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যান। আকাল বছর আল্যঅ ঝড় —এর পরই লেখা-

জলভরা মেঘ আহা কাজল পরা রানি
হামার ঘরে বাদল বাইরে বাদল ভাতের টানাটানি
যে রে মন কাঁদ অকারণে
যে রে মন ভাব অকারণে
সে ত ভাবের পরশমণি যে রে।[৩]

এতো মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে একেবারে কাব্যে উপস্থাপন। সাধারন মানুষও যেন নিজেকে খুঁজে পান গানে কবিতায়। আর ভবতোষ তাই পেরেছিলেন।

বাংলা কবিতায় বহু চর্চিত কবিদের ভীড়ে ভবতোষ শতপথীর 'অরণ্যের কাব্য' অনন্য অনুভবে জাগা এক কাব্য। কলকাতা কেন্দ্রিক কাব্য ইতিহাসের বাইরে গেলে কবিতার বিচিত্র আন্দোলনে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সামাজিক অভিঘাতে, দার্শনিক ভাবনায় সমৃদ্ধ ও অভিনবত্বে এই কাব্য পাঠককে সমৃদ্ধ করে। পীড়িত মানুষের কথা তাদের যাপন যন্ত্রণা, গ্রাম জীবনের পরশ এই কাব্য। কবির জীবনবোধ ও দক্ষতা কি সহজভাবে ধরা দেয় পাঠকের কাছে—

হে প্রিয় অরণ্যময়ী! মৃণ্ময়ী প্রতিমা জন্মভুমি
অশ্রু রক্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়া, আর কি দেব প্রনামি?
দু'চোখে বিবর্ণ দৃশ্য! শস্য হীন ধূসর প্রান্তর
বৃষ্টি হীন সৃষ্টি হীন আসে ভয়ংকর মন্বন্তর।[৪]

আসলে অরণ্যচারী কবি অরণ্য, প্রকৃতি ও জঙ্গলমহলের মানুষের সাথে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সংগ্রাম-ভালোবাসা সবখানে নিজেকে ছড়িয়ে মেলে ধরেছেন। প্রকৃতি আর মানুষ এই দুটোই কবির মননে একাকার হয়ে উঠেছে। ক্রোধ হয়েছে কিন্তু তা বেদনাতে প্রকাশ করেছেন, আবার সে বেদনাও বিনম্র বেদনা। নিঃশব্দে নীলকণ্ঠ হওয়ার মতো। ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা নয় আত্মমুখীনতা, প্রয়োজনে সংযমতা কবির কলমকে ঋদ্ধ করেছে, বেদনাময় ঝঙ্কার, সহজ সত্যে—



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ডুব দিয়েছি কালীদহে- বিষের সরোবরে
জল-তরঙ্গ বাজে আমার অশান্ত শরীরে।
রূপ গেল, যৌবন গেল, জীবন তো গেল না
বুকের পাঁজর জড়িয়ে ধরে, স্বৈরিণী যন্ত্রণা।

অনন্য কবি ব্যক্তিত্ব ভবতোষবাবু। উনার জীবন দুঃখ- কষ্ট- বেদনায় রাঙা। কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা, সংযমতা ছিল যা তাঁর লেখাতেই উঠে আসে- 'ভীষণ দাম্ভিক আমি, দয়া নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম'। বড় স্বাভিমানী মানুষ ছিলেন। জীবনীকার ফটিকচাঁদ ঘোষ বলেন জীবনের মাঝখানে একটু বিচলিত হয়েছিলেন কবি। দারিদ্র তো কবির পিছু ছাড়েনি। তাঁর মতে জীবন নাকি দুঃখের পদাবলী। আর এই দুঃখের মন্থন কবির কবিতায় ধ্বনিত হয়,

ঠিক থকলে ঠিকেই তালে
মাদ্ইলটা বাজাবঅ
ধমকালে ভাই আড়ে থাড়ে
ধমসা গুঁড়ে দিবঅ
---------------------------
বাপের বেটা বঠি হামরা
বাপের বেটা বঠি
মাথা উঁচাঞ বাঁচ্যে থাইকবঅ
যদ্দিন বাঁচ্যে আছি।[৫]

শুধু দুঃখের, তাপের, শোকের কবিতায় কবির কলমে উঠে আসে তা নয়, প্রেম-ভালোবাসার শব্দ দিয়ে দু'টি হৃদয়ে কাব্য কথাকেই ব্যক্ত করেছেন। মেলাতে মানুষ যেমন হৃদয় খুলে যায়, দ্বেষ- হিংসা ভুলে থাকে, প্রীতি সম্প্রীতিতে মেতে উঠে। লাইনগুলি মানুষ গেয়ে উঠে-

সখি গো-
প্রাণের মানুষ মনের মানুষ
খুঁইজতে মেলায় যাবঅ
দেখা পালেই বনমালা গলায় পিঁধাঞ দিবঅ
--------------------------------------
পাথর-বসা কানের দুল
ফুলান শাড়ি খঁপায় ফুল
চাঁই পক-পক লাগরদোলায় ঘুইরবঅ ঘুরাবঅ

এই মেলায় ঘুরা, মন জুড়ার সহজ সুন্দর উপস্থাপনা। দুটি হৃদয়ের সহজ বার্তা।

সখি-লো চল বসাব এক ঘর। এখানে অভাবের কথা কই, দারিদ্র এখনে পরাজিত, হৃদয় ও হৃদয়ের বার্তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। রোমান্টিকতার অনন্য আবেদন। চিরন্তন মন ও মননের ভালোবাসার আকৃতি।

আবার এই ভালোবাসার কি সুন্দর বক্তব্য অন্যত্র পাই এই কবিরই কলমে। বরং বলা ভালো সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলী যে মার্গের কাব্য-কবিতা, ভবতোষবাবুর কবিতা তার থেকে কম কিসে ভারে, ধারে ও গভীরতায় তা বিচার্য। সহজ ভাবেই স্বীকার্য যে বৈষ্ণব পদাবলীর একজন স্নাতক ছাত্রের কাছে এই কবিতা ঝুমুরের সুরে যখন বিজয় মাহাতর কণ্ঠে গাওয়া হয় তখন তার মনে প্রশ্নের দাবী উঠে এ গান তথা কবিতাটি সাহিত্যের ইতিহাসে সিলেবাসে কেন নয়? বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিরহ সাহিত্যানুরাগীদের কাছে অজানা নয় তারই পাশে রেখে এই কবিতাকে কাঁটা ছেঁড়া করে দেখা যায় নাকি!

ই কালের শ্যাম মাটি কাটে
দুখনি রাধি কামিন খাটে
গবর কুড়ায়-
গবর কুড়ায় ট্যাড়ের রাই রূপসী-
অহো রে- পেটের জ্বালায় পড়ায় বাঁশের বাঁশী
কদম গাছ নাই কদম বনে-
কালা কিষ্টয় কুথি বুনে
ভালবাসা হঞেঁ গেছে বাসি
অহোরে- পেটের জ্বালায় পড়ায় বাঁশের বাঁশী।

কবিতাটিতে একেবারে সমসাময়িক চিত্র। এখানে কল্পিত রাধা কৃষ্ণের দেখা নয়। বাস্তবের মাটির নর-নারী, প্রেমিক-প্রেমিকা। কঠিন বাস্তবের মাটি। বাস্তবতার মধ্যে প্রেমের স্থিতি, রূপ-অরূপ কথা। এখানের প্রেমিকা রাধি কুড়ে ঘরের মেয়ে অভাবে রাঙা, ভালোবাসা বুকে নিয়ে গবর কুড়ায় মাঠে মাঠে আর প্রেমিক পুরুষ মাটি কাটে, লাঙ্গল চালায়, বুকের গভীরে প্রেমের ঝর্ণাধারা প্রবহমান। এ প্রেমওতো চিরন্তন। সত্য, সুন্দর। কিন্তু এর কোন সৌধ নেই তাজমহল। এ প্রবাহিত নদী ধারার মতো। কোনও বাঁধ নেই, আল নেই। এরা কেউ নবাব নয়, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কবির দেখা বাস্তবের মাটির উপর তলার হেঁটে চলা চষা মাটির ফসল সাধারণ অতিসাধারণ মানুষ মাত্র। বুকে অনন্ত প্রেম বহন করে। এদের ঘরে অভাব, বাইরে অভাব ভাতের টানাটানি। এরা দিনমজুর, কুলি কামিন চাষা। প্রতিদিন আবাদ করে ফলায় সোনা। মাটি আর মাটি গন্ধমাখা জীবন। কবি এই মাটি মাখা কুলি কামিনগুলির মাঝেই রাধা কৃষ্ণকে খুঁজে পান। শ্রীধামে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। যে মেয়েটা কামিন খাটে, তলা উপড়ায়, তলা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ফেলে, ধান রুয়ে সেই তো রাধি। মাটির রাধি। একালের রাধি। এ রাধা যেন চিরকালের। অবিনশ্বর স্রোতধারার রাধা। আর শ্যাম সে তো বাস্তবের রাখাল, মুনিশ খাটে, লাঙ্গল চালায়, বীজ বোনে, শস্য ফলায়, ধরিত্রীকে শ্যামল রাখে। এরা চিরকাল ধরে থাকে হাল। এরাই তো ভালোবাসার গায় গান। শত অভাবেও, শত কষ্টেও, অভাব যখন অবর্ণনীয় হয়ে উঠে, অসহ্য হয়ে উঠে তখন প্রাণের বাঁশিটাকেও পোড়া পেটের দায়ে পুড়াতে হয়। নিষ্ঠুর ক্ষুধার কাছে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসে উঠে। তবু ভালোবাসে পোড়া মুখ। কেননা ভালোবাসা 'বেজাঞ দিনের বাসি'। ভালোবাসা চিরন্তন।

এখানে কবি ভবতোষবাবু যে ভালোবাসার অন্বেষণ করেছেন তা কোন রাজকীয় ঐশ্বর্যের ভালোবাসা না, কোন পুরাণ আশ্রিত না, প্রতিনিয়ত ধরিত্রীকে কর্ষণ করে ফসল ফলায়, মাটির সাথে মাটি হয় সেই সব মাটির মানুষদের হৃদয়ের কথা, কষ্টের কথা, ভালোবাসার কথা, রাগের- অনুরাগের কথা, পোড়া পেট আর পোড়া পেটের জ্বালায় ভালোবাসার ঝলসে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। এখানে কোনও নগরের কথা, ভীড় মানুষের কথা না একেবারে গ্রামীণ লোকের কথাগুলো ব্যক্ত হয়েছে কবির কলমে। লোকের মাঝে লোক হয়ে লোকেদের দুঃখ-কষ্ট, প্রেম বিরহ যাপনের চিরন্তনত্বকেই কি সুন্দর ব্যক্ত করেছেন কবিতায় কবিতায়।

কবি যে বেশ কয়েকটি কাব্য লিখেছেন তা কোলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যস্পর্শ কতখানি বলা মুশকিল। তবে তাঁর শোষিত পীড়িত মানুষের জীবন বেদনা সংগ্রাম, ভালোবাসা, স্বপ্নের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন যা চিরন্তন, সত্য সুন্দর-কষ্ট সুন্দর। অরণ্যকথা, অরণ্যচারীদের কথা ব্যথা উপেক্ষা সবই। শুধু সীমা দিয়ে দেখলে জঙ্গলমহল কিন্তু মানবের চিরন্তন হাসি-অশ্রু, স্বপ্ন-বেদনা দেখলে কবি শুধুই লোককবি নন সমগ্র বিশ্বের কবি। বিশ্ববাসীর কবি।

**তথ্যসূত্র :**

১। ভবতোষ রচনা সমগ্র পৃ. — ৩৯৩
২। ভবতোষ রচনা সমগ্র পৃ. — ২৯
৩। ভবতোষ রচনা সমগ্র পৃ. — ৩১
৪। ভবতোষ রচনা সমগ্র পৃ. — ৪০
৫। ভবতোষ রচনা সমগ্র পৃ. — ৩৯৬

**সাক্ষাৎকার**- বীণা মাহাত (ঝুমুরশিল্পী বিজয় মাহাত'র স্ত্রী)
পম্পা মাহাত (ঝুমুরশিল্পী বিজয় মাহাত'র বড় মেয়ে)

**তথ্যসূত্র**- ভবতোষ রচনা সমগ্রঃ ফটিক চাঁদ ঘোষ (সম্পাদক)
বর্ণমালা ৯/৪ বি প্যারী মোহন সুর লেন, কলকাতা- ৬

# শংকর : জনপ্রিয় অথচ অনালোচিত ঔপন্যাসিক

**উজ্জ্বল মণ্ডল**

বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তার আলোচনা হবে আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬ -১৯৩৮) প্রসঙ্গ আসবে না তা কি হয়! একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের অদ্ভুত লাগলেও এটা বাস্তব যে, প্রাতিষ্ঠানিক পাঠক্রমের বাইরেও বাঙালি পরিবারে সাহিত্যপাঠের রেওয়াজ অন্তত বিশ-শতকের শেষ দশক অবধি চালু ছিল। সেখানে শরৎচন্দ্রের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। বিভিন্ন আচারানুষ্ঠানে, বিশেষত বিবাহের প্রীতি উপহার হিসেবে তাঁর বইয়ের চাহিদাও ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে সমালোচকদের অনেকেই মনে করেন পারিবারিক, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের 'জোলো (?) আবেগ' শরত-রচনার প্রধান হাতিয়ার ছিল। তাতে শিল্পী শরৎচন্দ্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়না। কেননা সাহিত্য কখনোই আবেগ-অনুভূতিকে অস্বীকার করেনি। বরং একটু বেশিই গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করেছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এধরনের লিখন-বৈশিষ্ট্য দোষ নয়, গুণ হিসেবে বিবেচ্য। সমকালীন বাঙালি জীবনের সমগ্রতাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ধরতে পেরেছিলেন তিনি।

পাঠকপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্রের পরে যাঁর নাম সামনে আসে তিনি শংকর। যাঁর জন্ম শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বছরপাঁচেক আগে ১৯৩৩ সালে। কাকতালীয় হলেও দুজনের সঙ্গেই হাওড়ার যোগসূত্র রয়েছে। তবে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপট নির্বাচনে দু'জনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। শরৎচন্দ্র গ্রামজীবনকে তাঁর লক্ষ্যসীমার মধ্যে রেখেছেন। অন্যদিকে শংকর একেবারেই গ্রামজীবনের কিনারায় যাননি। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনই তাঁর লেখার উপকরণ। নগর বলতে তিলোত্তমা মহানগর-কলকাতার কথাই বলছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিতর্কিত দেশভাগ শংকরের শৈশবের ঘটনা। অনেকেই সেসব নিয়ে লিখেছেন। শংকরের উপন্যাসের বিষয় একেবারেই অত্যাধুনিক শহুরে জীবন। এতটাই অত্যাধুনিক যে, একবিংশ শতকে আজকের দিনে দাঁড়িয়েও সেগুলি প্রাসঙ্গিক। সাধারণ পাঠক তাঁর উপন্যাসগুলি পড়লেই আমার বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবেন। কীভাবে কলকাতা শহরটি বিদেশীদের ছোঁয়াচ এড়িয়ে একটা নির্ভেজাল দেশি শহরে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে; তার সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনি, কীভাবে সাহেবী কোম্পানীগুলো এদেশের সর্বোৎকৃষ্ট বেসরকারী কর্পোরেটে রূপান্তরিত হচ্ছে ইত্যাদি। 'একজন আদ্যন্ত বাঙালি লেখকের হয়ে ওঠার গল্প' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন,

"বাঙালি, শিক্ষিত, পেশাজীবী, নাগরিক সমাজের মানসিকতা, তথা মননভঙ্গিকে তিনি,হাতের তালুর চেয়ে ভালো বোঝেন কেবল নয়, বিভিন্ন প্রজন্মের পাঠককে অবধি তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।"[১]





সামাজিক বিবর্তন সকলের চোখের সামনেই মন্থরভাবে ঘটে। কিন্তু আমরা অনেকেই খেয়াল করতে পারিনা। শংকরের দেখবার চোখ হয়তো কিছুটা আলাদা। নইলে ওইসময়ে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে এগুলি আসতো কি? প্রশ্নটি আমাদের ভাবায়। শরৎচন্দ্র যেখানে আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে শংকর বাস্তবের ছবিটুকু উপস্থাপিত করেছেন সচেতন শিল্পীর নির্লিপ্ততায়। কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। সজীব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই তাই। স্রষ্টা সৃষ্টি করেন; সমালোচক সমালোচনা করেন, উপসংহার লেখেন। ভাষার ব্যবহারে শরৎচন্দ্র চরিত্রের সংলাপে 'চলিত-বাংলা' গ্রহণ করলেও সর্বজ্ঞকথকের ভাষাকে 'সাধু-বাংলা'ই রেখেছেন। শংকর আদ্যন্ত 'চলিত-বাংলা'তেই লিখেছেন। যাইহোক, এঁদের পূর্বে বাংলা উপন্যাস জনপ্রিয় ছিল না এমনটা নয়। আসল কথা হল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে উপন্যাসের বাণিজ্যিক সফলতা সেভাবে ছিল না। তারমানে এই নয় যে, ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা মাথায় রেখেই শরৎচন্দ্র বা শংকর লিখতে বসতেন। 'সাহিত্য' ও 'বিপণন' শব্দদুটি পাশাপাশি যেমন বেমানান, তেমনি অস্বস্তিকর। আমাদের বর্তমান সময় বিজ্ঞাপনের সময়, আত্মপ্রচারের সময়। শুনেছি বিদেশে কবি-সাহিত্যিকরা এব্যাপারে যথেষ্ঠ সচেতন। নিজেদের সৃষ্টিকে সকলের সামনে নিয়ে আসার জন্য যতটা প্রচার করবার ততটকু তাঁরা নিঃসঙ্কোচে করে থাকেন বিভিন্নমাধ্যমে। ঠিক যেভাবে আজকের দিনে একটা সিনেমা রিলিজ করে, সেভাবেই গল্প উপন্যাসের বই প্রকাশিত হয়। বাঙালি লেখকেরা নিজেদের বইয়ের প্রচার করতে লজ্জা পান। কেউ কেউ আবার বঙ্কিমী পন্থায় আত্মজ্ঞাপন করে কিছুকাল লেখাটি নিজের কাছে ফেলে রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু সংস্করণ, পরিমার্জনের কথা ভেবেও দেখেননা। সম্প্রতি এই সঙ্কোচ কিছুটা কাটিয়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে পত্র-পত্রিকা, সামজিক মাধ্যম আসার ফলে। ঔপন্যাসিক শংকরের জীবন-জীবিকা প্রথম থেকেই বৈচিত্রময়। কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো টাইপিস্ট, কখনো টিউশান মাস্টার, কখনো অস্থায়ী শিক্ষক, একটা সময় রেলওয়েতেও চাকরি করেন। শেষাবধি যুক্ত হন কর্পোরেট অফিসের জগতে। একদিকে কর্পোরেট চাকরি, অন্যদিকে শিক্ষকতা। অনুসন্ধিৎসু একজন ঔপন্যাসিকের জীবনে এরকমটা সাধারণত দেখা যায় না। জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিই তাঁর লেখনীর একমাত্র মূলধন। 'জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা' দিয়ে তিনি আজও একের পর এক সাহিত্যসৃষ্টি করে চলেছেন। শংকরকে জানেনা এমন পাঠক বোধকরি গত চার-পাঁচ দশকে একজনও নেই। যেকোনো সংস্কৃতিবান মানুষের বাড়িতে গেলে শংকরের একটি বই নজরে আসবে না এটা প্রায় ভাবাই যায়না। এতটাই তিনি জনপ্রিয়। বইগুলির মুদ্রণ সংখ্যা ও সংস্করণ থেকেও সেটা কিছুটা অনুমান করা যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে প্রায় দু'শো বছর হতে চললো। বাংলায় সংরূপটি (Genre) কীভাবে এলো সেই বিতর্কে কাজ নেই। সমস্ত মতামতকে অতিক্রমকে করে আমাদের সব্বাইকে মেনে নিতে হয় যে, উপন্যাস এবং ছোটগল্পের ধারা বাংলায় এসেছে

পাশ্চাত্য থেকে। মূলত ইংরেজি, ফরাসি ও রুশ-সাহিত্য থেকে। কেবলমাত্র বাইরের গঠনের (structure) ক্ষেত্রেই নয়, অন্তঃগঠনেও (inner-meaning) পাশ্চাত্য আদল গ্রহণ করেছে আমাদের কথাসাহিত্য। আখ্যানের বিষয়বস্তু ভিন্ন হতে পারে, গল্প বলার কৌশল আলাদা হতে পারে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এঁদের হাত ধরে বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা একভাবে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের হদিশ পাচ্ছি। ছোটগল্পের উদ্ভব আরও কিছুকাল পরে। রবীন্দ্রনাথের হাতে যেটি চরম সার্থকতা লাভ করেছে। এরপর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় হাজার নক্ষত্র ভীড় করে এসেছে। তাঁদের নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রায় আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের কথাসাহিত্যিকদের নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনার পরিসর তৈরি হলেও বিশদে আলোচনা হচ্ছে না। তাঁদের লেখার সামগ্রিক পর্যালোচনা করে সমালোচনামূলক গ্রন্থের সংখ্যাও খুববেশি চোখে পড়েনা। সদ্যপ্রয়াত ও অধুনাজীবিত যাঁদের লেখা আমাদের মনে সজীব হয়ে আছে বা যাঁদের লেখা পড়বার জন্য আমরা আজও প্রথমশ্রেণির সাহিত্য-পত্রিকাগুলির দিকে হাপুস-নয়নে চেয়ে থাকি; বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের জায়গা কোথায়? উপন্যাসের ধারায় ভবিষ্যতে কি তাঁরা জায়গা করে নিতে পারবেন? আদেও তাঁরা কথাসাহিত্যে ধারাবাহিক আলোচনার যোগ্য? এখানে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বর্তমান দৈন্যতাকে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু পাশাপাশি এটাও অনস্বীকার্য যে, আমরা আজকাল লেখনীর দিকটি ভুলে লেখকের বাজারদর, জনপ্রিয়তা এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই। বাংলা কথাসাহিত্যে শংকর এমনই একজন ব্যক্তিত্ব। শংকরের গদ্যশৈলী নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। আমি নিজেও তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠক। আমার মনে হয় তাঁর জনপ্রিয়তার অনেক কারণগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই তাঁর গদ্য-শৈলি। চলিত-শব্দ প্রয়োগ, ভাষাভঙ্গিমায় অনাড়ম্বর, সহজ-সরল থেকেও যে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব তা তিনি কয়েকদশক ধরে প্রমাণ করেছেন। সমালোচকের ভাষায়,

"যেন নদীর স্রোতে ভেসে-চলা হালকা পানসি। বিভিন্ন রস ও মজার চোরাস্রোতের টান। এই টান তো বড় একটা পাইনা বাংলা সাহিত্যে।"[২]

সম্প্রতি 'শংকর ও বাংলা সাহিত্য' নামক একটি প্রবন্ধ আমার নজরে আসে। প্রাবন্ধিক সেখানে শংকরের সমগ্রিক রচনার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে,

"বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠ পাঠকেরা এতে মোটেই অতৃপ্ত নন এবং নিঃসংশয়িতভাবেই শংকর সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যকে; আমার বিশ্বাস, আরো করবেন।"[৩]

কিন্তু কীভাবে তা প্রাবন্ধিক বিস্তারিত আলোচনা করেননি। আমরা যারা কথাসাহিত্যের পাঠক তাদের ভাবতে হয় বিষয়টি। আমি মূলত শংকরের উপন্যাসের কথা বলছি। কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর অন্যান্য রচনাগুলোকেও দেখতে বলবো কারণ লেখকের ব্যক্তিজীবন,



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

তাঁর লেখনবৈশিষ্ট্য, ঠিক কী ধরনের লেখা তিনি পাঠকদের উপহার দিতে চাইছেন এগুলো থেকে সেটা অনেকটা নিশ্চয় করা যেতে পারে। তাছাড়া স্মৃতিসম্ভার, ভ্রমণকাহিনি ও সাক্ষাৎকার থেকে দরকারি কিছু তথ্য পাওয়া গেলে ক্ষতি কী?

আপাতভাবে মনে হয় শংকরের উপন্যাস তথ্যবহুল। 'Docu-Drama' নামে পাশ্চাত্য নাটকের একটি সাহিত্য-স্বীকৃত বিভাগ রয়েছে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো স্বীকৃত ও enre নেই। 'Docu-fiction' বলে একটি ঘরানা রয়েছে। কিন্তু সেটি আসলে Film Genre, চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ রীতি। যার উদ্ভব ঘটেছিল আমেরিকায় (USA) Robert Flaherty -এর হাতে ১৯২৬ সাল নাগাদ। একটি চলচ্চিত্রে তিনি দেখিয়েছিলেন পলিনেশিয়ান উপজাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা। শংকরের উপন্যাসগুলি এমনই তথ্য ভারাক্রান্ত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি সম্পর্কে একথা বলার যৌক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয়না। একথা সত্য যে, বিচিত্র রকমের জীবনাভিজ্ঞতা এবং 'দেশ'-এর মতন অভিজাত, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সূত্রে তিনি কমসময়ে সাহিত্যরসিকের নজর কেড়েছেন। প্রথম দুটি রচনা 'কত অজানারে' ও 'চৌরঙ্গী'তে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন। লেখক শংকরের জীবন সংগ্রাম কারও অজানা নেই। স্মৃতিচারণার তিনি লিখেছেন,

"আমার যখন চোদ্দ বছর বয়স, যখন হাওড়ার বাড়িতে বাবা হঠাৎ আমাদের অনাথ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন... মাকে প্রণাম করে আমি হাওড়া থেকে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম জীবিকার সন্ধানে।"[৪]

এসময়ে একটি বিশেষ গুণ তিনি আয়ত্ব করেন। তা হল, সাধারণ মানুষের প্রতি অসীম সমবেদনা। সাফল্যের শিখরে উঠেও তিনি ফেলে আসা জীবনযুদ্ধের কথা বিস্মৃত হননি। তাই তথ্যের ভার পেরিয়ে মানবিক অনুভূতির গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। ছোট-বড় নানা অবস্থা ও অবস্থানে তিনি ছিলেন, নানান-ধরনের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। সেইসব অভিজ্ঞতার রসরূপ তাঁর কথাসাহিত্য। একটি উপন্যাস লেখার গল্প প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "উপন্যাসের সমস্ত উপাদান বিভিন্ন মহল থেকে তিলে তিলে সংগ্রহ করে অবশেষে জন-অরণ্য লিখতে বসেছিলাম। সমকালের এই অপ্রিয় কাহিনী সকলের ভালো লাগবে কিনা সে-বিষয়ে মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য একটাই ছিল। আমাদের এই যুগে বাংলার কর্মহীন অসহায় যুবক-যুবতিদের ওপর যে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা চলছে উপন্যাসের মাধ্যমে তার একটা নির্ভরযোগ্য চিত্র ভবিষ্যতের বাঙালিদের জন্যে রেখে যাওয়া; আর সেই সঙ্গে এদেশের ছেলেদের এবং তাদের বাবা-মায়েদের মনে করিয়ে দেওয়া যে বেকার সমস্যা সমাধানের জরুরী চেষ্টা না হলে আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়বে।"[৫]

বাস্তবের তথ্য সাহিত্যের উপাদান হতে পারেনা একথা কেউ বলবেননা। তথ্য ও

সত্যের অন্তরঙ্গ সমাবেশ থাকলেই তা সাহিত্যপদবাচ্য হবে, যদি তা তথ্য-ভারাক্রান্ত না হয়। সাহিত্যের বাজারে তথ্যগুলি প্রকাশ করবার দক্ষতা থাকবে সাহিত্যিকের। সাহিত্যে কীভাবে তিনি তথ্যসমূহ উপস্থাপন করছেন তার নির্ভর করে লেখাটির সাহিত্যমূল্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য।... নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।"[৬]

বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া উপন্যাস লেখা যায়না অথবা কল্পকাহিনি ছাড়া উপন্যাস হয়না এমনটা তো নয়। এই দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই সাহিত্যমোদীর দৃষ্টি নয়। 'চৌরঙ্গী'র পর প্রকাশিত 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি'তে শংকর দেখালেন উপন্যাস মানে শুধুই কল্পকাহিনি নয়, বিজ্ঞানমনস্কতা থেকেও উপন্যাস লেখা যায়। তার জন্য প্রয়োজন হয় বৈদগ্ধ্য। বাংলা সাহিত্যে এমন উদাহরণ বিশেষ ছিল না। আমরা শংকরের উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র ও প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক দিকগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখলে বুঝতে পারবো, বাংলা কথাসাহিত্যকে তিনি কতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন!

সাহিত্যের অনেক পুরস্কারই তিনি অর্জন করেছেন। প্রথমে 'কত অজানারে'র জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহ দাস পুরস্কার পান। এছাড়া পেয়েছেন শরৎ, বঙ্কিম ও আনন্দ পুরস্কার। পেয়েছেন জগত্তারিণী গোল্ড-মেডেল। উত্তরবঙ্গ ও রবীন্দ্রভারতী তাঁকে দিয়েছে ডি. লিট. সম্মান। ২০১৯সালে একবছরের জন্য কলকাতার শেরিফ পদে মনোনীত হন। সম্প্রতি 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' তাঁকে সম্মানিত করেছে। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি যোগ্য সম্মান পাননি। পাওয়া উচিত ছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ একঝাঁক লেখকের সমসাময়িক হয়েও তিনি সাহিত্যিক মহলে অনেকটাই ব্রাত্য থেকে গেলেন। ২০২০তে 'একা একা একাশি'র জন্য তাঁকে 'সাহিত্য একাদেমি' দেওয়া হল। অথচ অনেক আগেই তিনখণ্ডে প্রকাশিত (যথাক্রমে ১৯৯৪, ২০০২, ২০০৭ খ্রিঃ) 'চরণ ছুঁয়ে যাই' গ্রন্থে এসব তিনি লিখে ফেলেছিলেন। 'একা একা একাশি'তে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন মাত্র। স্বীকৃতি পেতে এত দেরি হওয়ার পেছনে একভাবে তাঁর গগনচুম্বী জনপ্রিয়তাই হয়তো দায়ী। একালের একজন প্রথিতযশা লেখক এবিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "বেস্টসেলার" শব্দটি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবহে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এই নিন্দার কারণ, ঈর্ষা। অসূয়া। এবং গায়ের জ্বালা প্রসূত বিদ্বেষ। এই ঈর্ষা ও বিদ্বেষের শিকার শংকর। অধিকাংশ বাঙালি সাহিত্যিক শংকরকে সহ্য করতে পারেন না। এঁদের অনেকেই ভাবেন এবং সুযোগ পেলে বলেন, উনি কোনো সাহিত্যিকই নন।"[৭]

আমার মতে মন্তব্যটি সর্বৈব সত্য নয়। কেউ কেউ অপছন্দ করেন একথা ঠিক। কিন্তু



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

তাঁর অস্বীকৃতির পেছনে একমাত্র সেইসমস্ত মানুষের হাত রয়েছে এমনটা নয়। আসলে শংকরের মূল্যায়নের সময় সেটা ছিল না, তাই হয়নি। তবে সময় আসন্ন। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত হলেও তাঁকে নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনার সময় হয়েছে তা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে ইদানিং। সত্যজিৎ রায় হয়তো সেটা বুঝেছিলেন অনেক আগে। তাই শংকরের দু'টি কাহিনি নিয়ে রাতারাতি সিনেমা বানানোর কথা ভেবেছিলেন অস্কার জয়ী প্রথম বাঙালিপুরুষ। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "শংকর বাংলা সাহিত্যের উত্তমকুমার।"[৮] জনপ্রিয়তার দিক থেকে সাদৃশ্য বিচার করলে মন্তব্যটি যথার্থ মনে হলেও একপেশে। আসলে উত্তমকুমারের অভিনয়ের মধ্যে আপামর বাঙালি যেমন করে নিজেকে খুঁজে পায়, তেমনি শংকরের কল্পিত চরিত্রগুলির মধ্যেও বাঙালি নিজেকে খুঁজে পায়। কিন্তু উত্তমকুমারের সমকালে বা পরবর্তীকালে তিনি চর্চিত হননি বা আলোচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন না; একথা মেনে নেওয়া যায়না। বরং তাঁকে ঘিরে অনধিকার চর্চাই বেশি হয়েছিল। সেদিক থেকে শংকরের কপাল মন্দ। ভালো-মন্দ কোনোরকম আলোচনাই তাঁকে নিয়ে হয়নি। যখন প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন কেউ উৎসাহ দিয়েছেন, কেউ নিরুৎসাহ করেছেন। আজকাল বাজারে বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষ কোনো একজন সাহিত্যিক অথবা নির্দিষ্ট কালপর্বকে ধরে স্বতন্ত্রভাবে দুয়েকটি প্রবন্ধ রচনার তাগিদও অনুভব করছেন কেউ কেউ। তবে সমমানের, সমবিষয়ের, সমসময়ের হলেও শংকরের উপন্যাসকে কেউই আলোচনায় আনছেন না। একটা ছোট প্রবন্ধও লেখা হচ্ছে না তাঁর লেখাপত্র নিয়ে। আশাকরি অবিলম্বে এই দুর্দিনের অবসান ঘটবে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে।

**তথ্যসূত্র :**


১. পার্থ মুখোপাধ্যায়/ কৃত্তিবাস পত্রিকার 'বেস্টসেলার' বিশেষ সংখ্যা/ ১লা ডিসেম্বর ২০২২, বর্ষ ৮ সংখ্যা ১/ পৃষ্ঠা ২৭
২. রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়/ কৃত্তিবাস পত্রিকার 'বেস্টসেলার' বিশেষ সংখ্যা/ ১লা ডিসেম্বর ২০২২, বর্ষ ৮ সংখ্যা ১/ পৃষ্ঠা ১৫
৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায়/ সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য/ দে'জ পাবলিশিং/ প্রথম প্রকাশ ২০১৩/ পৃষ্ঠা ৩২৫
৪. শংকর/ চরণ ছুঁয়ে যাই/ দে'জ পাবলিশিং/ প্রথম প্রকাশ ১৯৬০/ পৃষ্ঠা ১০
৫. শংকর/ জন-অরণ্য/ দে'জ পাবলিশিং/ প্রথম প্রকাশ ১৯৭১/ পৃষ্ঠা ১২৩
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ জীবনস্মৃতি/ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/ প্রথম প্রকাশ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ১৯১২/ পৃষ্ঠা ৫
৭. রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়/ কৃত্তিবাস পত্রিকার 'বেস্টসেলার' বিশেষ সংখ্যা/ ১লা ডিসেম্বর ২০২২, বর্ষ ৮ সংখ্যা ১/ পৃষ্ঠা ১৫
৮. তদেব/ পৃষ্ঠা ১৬

# নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় জীবন : রবীন্দ্রনাথের গোরা

**কনিকা সরকার**

সংকটময়, নিম্নবর্গ, বাটালি, ধনুষ্টঙ্কার, অপাঙক্তেয়, ড্যামশুয়ার।

সমকালীন বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিসর স্মরণে রাখলে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দীপ্ত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আমাদের আলোড়িত করে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নিম্নবর্গের ভূমিকা সেভাবে না থাকলেও তাঁর চিন্তার মধ্যে উদার মানবিকতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে একাধিক স্থানে। 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র গোরার সংস্কারবোধ এক সংকটময় আবদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ে একদিকে ছিল মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান সমাজে সনাতন হিন্দুধর্ম ও নবজাত ব্রাহ্মধর্মের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং অপরদিকে ছিল উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। তার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল 'গোরা' উপন্যাসের আখ্যান পটভূমিতে তারই এক জীবন্ত চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে।

উপন্যাসের আনন্দময়ীর চরিত্রটি জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। কোনরকম সংস্কার বা শুচিতা রক্ষার বিষয়ে তাকে গ্রাস করতে পারে নি। সেই কারণে গোরার প্রতি তাঁর সদর্পে উচ্চারণ হয়, "...কিন্তু তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা জানিস? ছোটো ছেলেকে বুকে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেছি সেদিন থেকে একথা নিশ্চয় জেনেছি যে আমি যদি খ্রীষ্টান বলে ছোটো জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক্, আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।"[১]

নিম্নবর্ণের মানুষগুলি উচ্চবর্ণের মানুষদের দেবতার মতো সম্মান জানাত ও শ্রদ্ধা করত। গোরা উচ্চবর্ণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের মানুষের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিল। নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে ছুতোরের ছেলে নন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক সব থেকে ভালো ছিল। নন্দ নিম্নবর্ণের হয়েও উচ্চবর্ণের ছেলেমেয়েদের থেকে বিভিন্নরকম খেলাধুলা যেমন ক্রিকেট, লক্ষ্যভেদ শিকার-এ ছিল অদ্বিতীয়। নন্দ সবকিছুতে সেরা হওয়া সত্ত্বেও উচ্চবর্গের ছেলারা তাকে দলপতি বলে মেনে নিতে রাজি নয়। কারণ নন্দ ছিল নিম্নবর্গের ছুতোরের সন্তান। যদিও গোরার প্রচেষ্টাতেই নন্দ দলপতি হয়। গোরা অনুভব করল, "দেশের উচ্চ ও মধ্যবর্গের লোকেরা স্বদেশেরই নিম্নবর্গীয় দরিদ্রকে নিজের বলে মনে করে না। ধর্ম এক হলেও জাতি, বর্ণ ও বৃত্তের পার্থক্যহেতু দেশের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে মিলনের সেতু





নেই।"[২] অর্থাৎ নিম্ন সম্প্রদায়ের পারদর্শিতাকে কখনোই উচ্চ সম্প্রদায় সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে নি।

নিম্নবর্গের সামাজিক উত্তরণ ঘটলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধ কুসংস্কার সেই উত্তরণের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। নন্দের মৃত্যু গোরার কাছে নিদারুণরূপে অসঙ্গত ও অসম্ভব বলে মনে হয়েছে —"তাহার ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছিল। নন্দর বাপ ডাক্তার আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু নন্দর মা জোর করিয়া বলিল, তাহার ছেলেকে ভুতে পাইয়াছে। ভুতের ওঝা কাল সমস্ত রাত তাহার গায়ে ছ্যাঁকা দিয়াছে, তাহাকে মারিয়াছে এবং মন্ত্র পড়িয়াছে। ব্যামোর আরম্ভে গোরাকে খবর দিবার জন্য নন্দ একবার অনুরোধ করিয়াছিল — কিন্তু পাছে গোরা আসিয়া ডাক্তারি মতে চিকিৎসা করিবার জন্য জেদ করে এই ভয়ে নন্দর মা কিছুতেই গোরাকে খবর পাঠাতে দেয় নাই।"[৩] নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অশিক্ষার কারণে যে সংস্কার বর্তমান ছিল তা সমাজের গভীর থেকে গভীরতম স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যার ফলস্বরূপ সামান্য কারণেই নন্দকে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হয়।

গোরার মত উদার মানসিকতা নিয়ে যদি সমাজের শিক্ষিতশ্রেণি পিছিয়েপড়া শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারত তাহলেই হয়ত এই মানুষগুলোর একটু হলেও উন্নতি সাধিত হত। যারা শিক্ষিত তারা যদি অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের মানুষের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে তাহলে কখনোই না সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। যে কারণে গোরা বারবার বলেছে — "নীচের লোকদের নিষ্কৃতি না দিলে কখনোই তোমাদের যথার্থ নিষ্কৃতি নেই। নৌকার খোলে যদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকার মাসত্তুল কখনোই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারবে না, তা তিনি যতোই উচ্চে থাকুন-না কেন।"[৪] এই উক্তিটি তৎকালীন সময়ে সমাজের উন্নতির জন্য যতটা প্রযোজ্য যছিল আজকের সমাজেও নিম্নবর্ণের প্রতি শিক্ষিত সমাজের যে দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সে প্রসঙ্গে ততটাই অপরিহার্য।

জমিদারী দেখাশোনার কারণে রবীন্দ্রনাথকে অনেক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি দেখেছেন, উচ্চবর্ণের বড়লোকেরা কীভাবে নির্বিচারে নিম্নবর্গের মানুষের উপর অত্যাচার চালায়। উচ্চবর্গের মানুষগুলি নিজেদের কৃত অন্যায় কর্মের দায় নিম্নবর্গের উপর অনায়াসেই চাপিয়ে দেয়। আর নিম্নবর্গের মানুষগুলি সেই অন্যায়কেই ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে তার প্রতিকারের দায় ভগবানের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাই। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে অন্যায় সহ্য করতে করতে এরা ন্যায়ের জন্য লড়াই করার ভাষাই হারিয়ে ফেলে। নিম্নবর্গীয়দের সেই করুণ চিত্রই সামান্য পরিসরে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে — "একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় একঝাক ফল সবজি আণ্ডা রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্য সামগ্রী লইয়া

কোনো ইংরেজ প্রভুর পানশালার অভিমুখে চলিতেছিল। চেন-পড়া বাবুটি তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনোমতে তাহার প্রাণ বাঁচিল কিন্তু ঝাঁকাসমেত জিনিসগুলো রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে 'ড্যামশুয়ার' বলিয়া গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া চাবুক কসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দিখা দিল। বৃদ্ধ 'আল্লা' বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিসগুলা নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। গোরা ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিসগুলা নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল। মুসলমান মুটে ভদ্রলোক পথিকের এই ব্যবহারে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিল আপনি কেন কষ্ট করছেন বাবু, এ আর কোনো কাজে লাগবে না।"[৫] গোরা এই অত্যাচারিত মানুষগুলোকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস জোগাতে চায়। অন্যায় সহ্য করা যে কখনোই ধর্ম হতে পারে না, অন্যায়কে মুখ বুঝে সহ্য করলে স্বয়ং আল্লাও যে অত্যাচারীকে ক্ষমা করে না তা বোঝানোর চেষ্টা করে — "যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী, কেননা সে জগতে অন্যায়ের সৃষ্টি করে, আমার কথা বুঝলে না, তবু মনে রেখো, ভালোমানুষি ধর্ম নয়; তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে। তোমাদের মহম্মদ সে কথা বুঝতেন, তাই তিনি ভালো মানুষ সেজে ধর্মপ্রচার করেন নি।"[৬]

গ্রামে বসবাসকালে গোরাকে নানারকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গ্রামের সমাজে গোরা দেখেছে — "গ্রামের মধ্যেই যারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন এবং উচ্চবর্গের মানুষ তারা দরিদ্র সাধারণকে এতটুকু সাহায্য করে না। প্রতিপদে তাদের ত্রুটি ধরে ও শাস্তির বিধান দেয়।"[৭] গ্রামের একটি পাড়ায় আগুন লাগার ঘটনায় গোরা দেখেছে কোন মানুষের মধ্যে আগুন নিভিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই। সকলেই কেবল গোলমাল কান্নাকাটি করতেই ব্যস্ত, সমস্ত কাজেই যেন উদাসীন। আবার গ্রামের নিকট কোন জলাশয় না থাকার কারণে গ্রামের মেয়েদের প্রতিদিন বহুদূর থেকে জল এনে তাদের নিত্য প্রয়োজনকে মেটাতে হত। কিন্তু এই কষ্ট লাঘব করার কোন সদিচ্ছা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। সমস্ত কর্মে গ্রামের মানুষকে একরকম ভীতি ও নিস্পৃহ থাকতে দেখে গোরা ক্ষুব্ধ হলেও কিন্তু উপলব্ধি করতে পেরেছে জীবনের এক নতুন সত্যকে, "ছোটলোকেরা তো এরকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে, এই-সকল কষ্টকে তাহারা কষ্টই মনে করে না। ছোটলোকদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে, তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে। এই অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র সকলেরই





কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না।"[৮] অর্থাৎ আধিপত্য বিস্তারকারী শাসকশ্রেণি চিরকাল চেয়েছে স্বাক্ষরহীন শোষিত মানুষগুলি তাদের পায়ের তলায় থাকুক তাদের মধ্যে যেন কোনদিনই প্রতিবাদের ভাষা না জন্মাতে পারে। তাদের শ্বাসকে রোধ করে উচ্চবর্গের শোষিতশ্রেণি যেন আজীবন নিপীড়িত অত্যাচারিত মানুষগুলোর মাথার উপর শাসনের ছড়ি ঘোরাতে পারে।

নদীর চরের মুসলমান পাড়ায় গোরা এসে শুনেছে সাধারণ প্রজাদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা। চরে নীলের জমি নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে নীলকুঠির বিরোধ। অন্য প্রজারা ইংরেজদের বশ্যতা মেনে নিলেও চোরঘোষপুরের প্রজারা ইংরেজদের শাসন মেনে নেয়নি, তারা প্রতিবাদ করেছে যেকারণে সাধারণ প্রজাদের উপর চলেছিল পুলিশি অত্যাচার — "ইহার পর হইতে পুলিশের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মতো লাগিয়াছে — প্রজাদের কাহারো ঘরে কিছু রাখিলো না ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকেনা। ফরুসর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন, এমনকি, তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালক পুত্র তমিজ, নাপিতের স্ত্রীকে গ্রাম সম্পর্কে মাশি বলিয়া ডাকিত; সে খাইতে পায়না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে।"[৯]

ক্রোশ দেড়েক হাত দূরে ছিল নীলকুঠির কাছারি। নাপিতের প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাজিমের শ্যালক এসেছিল তার বোনের সঙ্গে দেখা করতে, পুলিশ বিনা কারণে তাকে অপমান ও অত্যাচার করে। পাড়ার বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ মাত্রই গ্রেফতার নয় পলাতক। আর এই পলাতকের সন্ধানেই চলতে থাকে পুলিশের জুলুম। শূদ্রবর্ণ বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রী মুসলমানের ছেলেকে প্রতিপালস করে। ম্লেচ্ছ নাপিতের ঘরে গোরা ও তার সঙ্গী জল গ্রহণের আশা ত্যাগ করে নীলকুঠির তহসিলদার ব্রাহ্মণ মাধব চাটুজ্জের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে চায়। নাপিত জানায় মাধব চাটুজ্জে অত্যাচারী শাসকের আরেকরূপ, তাকে 'যমদূত' বললেই হয়, তার মত নির্দয় অথচ কৌশলী লোক দেখা যায় না বললেই চলে। এই গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আজ ইংরেজ কর্তৃক শোষিত। বৃদ্ধ নাপিতই এই পাড়ার একমাত্র পুরুষ যে চলে গেলে গ্রামের মেয়েরা ভয়ে মারা যাবে। ঐমত পরিস্থিতিতে নাপিতই ছিল গ্রামের মানুষের একমাত্র রক্ষাকর্তা। অথচ নাপিত ম্লেচ্ছ হওয়াই তার গৃহেই নাকি জলস্পর্শ করা যাবে না। অপরদিকে মাধব চাটুজ্জে, যে ইংরেজদের তোষামোদ করে চলে তার মতো দুর্বৃত্ত অন্যায়কারীর ঘরে অন্ন খেলে জাত রক্ষা পাবে এই চিন্তা গোরাকে অসহ্য করে তুলেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত ভারত আত্মার প্রতিভূ গোরা আচার-বিচার

ভালো-মন্দের কথা না ভেবে মধ্যাহ্নের খররোদ্র জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্যে দিয়ে একাকী ফিরে চলেছে নাপিতের ঘরে —"ক্ষুধায়তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল, কিন্তু দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্জের অন্ন খাইয়া তবে জাত বাঁচাইতে হইবে একথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ভাবিল, পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা একি ভয়ঙ্কর অধর্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে।"[১০] আমরা দেখব গোরাকে এই নিপীড়িত মানুষগুলোর হয়ে ন্যায়ের কথা বলতে গেলে রাজরোষে পড়ে কারাবাস করতে হয়। প্রজাদের জন্য কোন উকিলের সাহায্য না পাওয়ায় গোরা নিজেও উকিলের সাহায্য নিতে আপত্তি জানায়। প্রজাদের প্রতি হওয়া অন্যায়কে সে নিজের প্রতি হওয়া অন্যায় মনে করে মাথা পেতে নেয়। কোনো অপরাধের বিচার না করে যদি গ্রামের নিরপরাধ মানুষগুলোকে শাস্তি পেতে হয় তাহলে গোরাও সেই শাস্তি নির্দ্বিধায় মাথা পেতে নেবে। এভাবেই গোরা সাধারণ মানুষের ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করে গেছে।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় গোরা আইরিশম্যান এই আসল পরিচয় উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সে মা আনন্দময়ীর কাছে ছুটে এসে বলেছে — "তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই — শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"[১১] আনন্দময়ী এখানে ভারতবর্ষের প্রতীক। শেষে গোরার উক্তি — "মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।"[১২] গোরার মধ্যে যে সংস্কার ছিল চরঘোষপুরের প্রজাদের না দেখলে হয়তো তার সেই আত্মোপলব্ধি ঘটতো না বা আসল ভারতবর্ষকেই গোরার চেনা হত না। আসলে "গোরা জাতপাতের সংস্কার ধ্বংস করে, অনৈক্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে, সামাজিক অনাচার নির্মূল করে গড়ে তুলতে চেয়েছে ভেদ-বৈষম্যহীন এক আদর্শময় জীবন।"[১৩] সমস্ত রকম সামাজিক অনাচার, অবক্ষয় ও জাত-পাতের ঊর্ধে গোরা আজ মহামিলনের মন্ত্রে উজ্জীবিত। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিম্নবর্গের মানুষ গুলোর যে অবস্থান দুঃখ ও যন্ত্রণাকে দেখিয়েছেন তা আজও অতি বাস্তব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

**তথ্যসূত্র :**

১। 'রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'গোরা', শুভম্, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা, ২৫
২। সুমিতা চক্রবর্তী, 'উপন্যাসের বর্ণমালা', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা, ২৫
৩। 'রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'গোরা', শুভম্, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা, ৭১
৪। তদেব, পৃষ্ঠা,৭২
৫। তদেব, পৃষ্ঠা, ৭৩
৬। তদেব, পৃষ্ঠা, ৭৪
৭। সুমিতা চক্রবর্তী, 'উপন্যাসের বর্ণমালা', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা, ২৯
৮। 'রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'গোরা', শুভম্, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা, ১২১
৯। তদেব, পৃষ্ঠা, ১২২
১০। তদেব, পৃষ্ঠা, ১২৪
১১। তদেব, পৃষ্ঠা,৩৩০
১২। তদেব, পৃষ্ঠা,৩৩০
১৩। ডঃ সুবোধ দেবসেন, 'বাংলা কথা সাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা, ১১১

# সমরেশ বসুর ‘প্রজাপতি’ ও অস্তিত্ব ভাবনা

পান্নালাল কর্মকার

সমরেশ বসুর ‘প্রজাপতি’(১৯৬৭) উপন্যাসে যে অস্তিত্ব ভাবনার প্রয়োগ ঘটেছে, তার মূল আধার হল পাশ্চাত্য আধুনিক মানব দর্শন — অস্তিত্ববাদ বা Existentialism-আর এই ইউরোপীয় আধুনিকতম দর্শন মূলত মানুষের অস্তিত্ব বা existence কেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়; তার সারবত্তা বা essence কে নয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণের মধ্যে — কিয়েরর্কেগার্ড, কার্ল ইয়ার্সপার্স, মার্সেল, হাইডেগার, ফ্রেডারিখ নীটশে, জ্যাঁ পল সার্তে, ক্যামু প্রমুখ। আবার ক্যামুর লেখায় মানব অস্তিত্বের অদ্ভুতবাদ বা absurdity প্রাধান্য পেয়েছে। এই দর্শন প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে বিশ্বসাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যেও উঠে এল এমন এক সময়, যখন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় সমাপ্ত ও তার আঁচে পাকীয়ে ওঠা দাঙ্গা, মহামারী, কালোবাজারী, বেকারত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মৃত্যুচিন্তা, শূন্যতাবোধ মিলেমিশে তৈরি হওয়া এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণার ফলশ্রুতি হিসাবে। তখন দার্শনিক তথা মানুষ আর কেবল মাত্র এক অদৃশ্য পরম সত্ত্বা তথা ঈশ্বরের উপরে ভরসা করে নিজেদের নিরাপদ মনে করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। এই জগতের থেকে, জীবনের থেকে মানুষের নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে প্রতীত হতে লাগল। তাই মানুষের স্বাধীন অস্তিত্বকেই(being) সবার উপরে রাখল এই মতবাদ। সার্তে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ Being and Nothingness’ (১৯৪৩) এ বলেছেন- ‘existence precedes essence’ (১) অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব তাঁর সারবত্তার চেয়ে অগ্রগামী। এই দর্শনের প্রথম প্রবক্তা ও প্রকাশক হিসাবে ডেনমার্কের দার্শনিক সোরেন কিয়েরর্কেগার্ড কেই ধরা হয়। তবে দার্শনিক-সাহিত্যিক জ্যাঁ পল সার্তেই সর্বাধিক পরিচিত নাম। সার্তে ছিলেন মার্টিন হাইডেগার এর অনুগামী। হাইডেগার মূলত ছিলেন জার্মান দার্শনিক এডমণ্ড হুর্সাল এর সমর্থক। ‘Being and Time’ (১৯২৭) গ্রন্থে হাইডেগার নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেন।

মানুষের ব্যক্তিত্ব, তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি, অনুভূতি, আবেগ সহ অন্যান্য প্রক্ষোভ গুলিকেই গুরুত্ব দিলো এই দর্শন। এক্ষেত্রে লেখক তথা দার্শনিকের নিজের জীবন সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গীও প্রভাবক এর ভূমিকা গ্রহন করল। তাই সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিক ও উপন্যাসিক সমরেস বসুও মানব অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে সাহিত্যে অস্বীকার করতে পারেন নি। যুদ্ধ বিধ্বস্থ, দাঙ্গা কবলিত, অনাহার ক্লিষ্ট, উদ্ভ্রান্ত, দিকভ্রস্ট, বেকার, মৃত্যুভয় জর্জরিত, মানসিক যন্ত্রনায় ক্ষতবিক্ষত জনমানস স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর রচনায় তথা উপন্যাস গুলিকে আবৃত করে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে অস্থির সমাজের সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও জড়িয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র গুলিতে মানব অস্তিত্বের সঙ্কটই প্রকট হয়ে উঠেছে। সেকারনেই তাঁর রচনা গুলিতে — শ্রমিক, মস্তান, গুন্ডা, বেশ্যা, রাজনীতি,





মিলেমিশে গিয়েছে। ফলে এই মিশ্রণ থেকে বেরিয়ে এসেছে অস্তিত্ব চেতনার রঙ। তাই বলতেই পারি — তিনি মানুষের জীবনটাকেই সবার উপরে রেখেছেন, জীবন ধারনের উপায়কে নয়। তাই একথা ঠিক যে — ‘সমরেশ এসে মিথ্যা শালীনতার আবরণ ঘুচিয়ে দিলেন। যৌনতার ট্যাবু ভেঙ্গে দিলেন’।(২)

‘প্রজাপতি’ উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রের রূপচিত্র হলেও এখানে একসাথে রাজনীতির সর্বস্বহীনতা, আদর্শহীনতা, গুণ্ডামি, মস্তানির বাড়বাড়ন্ত, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নীতি হীনতা সবকিছুই একপাত্রে প্রদান করেছেন। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমরেশ বসু সুকৌশলে এবং সচেতন ভাবেই পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ করেছেন। তাই এখানে পাশ্চাত্য দার্শনিক তথা সাহিত্যিক জ্যাঁ পলসার্তের ‘ Existence Precedes Essence’, ‘ Bad-Faith ’ এর উপকরণ যেমন ফুতে উঠেছে তেমনি হাইডের্গা-এর — মৃত্যু চেতনা, তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও উদবিগ্নতা বা ‘Anguish’ এর মতো অস্তিত্ববাদী উপকরণ নায়ক সুখেন এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন, ফলে উপন্যাসটিকে কখনই কেবল মাত্র অশ্লীল রচনা হিসাবে অবমুল্যায়িত করার কোনও অবকাশই থাকেনা।

‘প্রজাপতি’ উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে যে পাশ্চাত্ব অস্তিত্ববাদের উপকরণ লেখকের সচেতনতায় প্রয়োগীকৃত হয়েছে তা এখন কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা দেখানোর চেষ্টা করব,

ক) সুখেন নিজেকেই বলে- আমার নাম সুখেন — সুখেন গুন্ডা (নিজের সম্পর্কে নায়ক সুখেন) অথবা বলে- আমাকে তো বুঝতেই পারেনা (তার সাকরেতদের প্রসঙ্গে)- এখানে প্রথম উক্তিটিতে স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে নায়ক সুখেন নিজের পরিচয় বা ‘Essence’ নিয়ে নিজেই কততা অস্বস্তি বোধ নিয়ে বেঁচে আছে। আসলে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে না পারা সুখেন বরাবরই রাজনীতির মধ্যেকার আদর্শহীনতাকে পুরপুরিই অপছন্দ করেছে। অন্যদিকে তার প্রতিষ্ঠিত দাদাদের মতো জীবিকা অর্জন করাও তার সাধ্যের বাইরে। আবার ঘটনাচক্রে কলেজের বছর গুলিতে সাতজনের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার সুবাদে এলাকায় গুন্ডা বলেই সুখেনের খুব কুখ্যেতিও হয়েছে। তাকে এই জীবন বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে- এই ভাবনাই তাকে এক তীব্র মানসিক যন্ত্রনার মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করেছে যাকে পাশ্চাত্ব দার্শনিকেরা ‘Anguish’ বলেছেন। আবার পরের উক্তিতে এই মানসিক যন্ত্রনার থেকেই সৃষ্টি হওয়া এক দ্বন্দ্বের রূপ নিয়েছে; অস্তিত্ব (Existence) ও পরিচয়ের (Essence) দ্বন্দ্ব। তাই এখানে সার্তে বর্ণিত ‘অস্তিত্ব পরিচয়ের অগ্রবর্তি’ এই মতবাদের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।

খ) শিখাও কেন অরকম হবে? আমার তো মনে হয় সে বেশ্যা দের থেকেও মারাত্মক। (শিখা সম্পর্কে সুখেনএর ধারণা) -এখানে নায়িকা শিখা সম্পর্কে, শিখার মন ও ভালবাসা সম্পর্কে, সুখেনের প্রতি শিখার তান সম্পর্কে সুখেন সবসময় একটা অবিশ্বাসের

মধ্যেই বেঁচে আছে। আবার দেখি শিখার চরিত্র কেমন তাও সে জানে কিন্তু তবুও শিখাকে ছাড়া তার পক্ষে অসম্ভব। এখানে সমরেশ বসু প্রত্যক্ষ ভাবেই দার্শনিক ক্যামু কথিত 'ভান' বা 'Bad Faith' এর উপকরণটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। অবশ্য এই ভান এখানে শুধু একপক্ষেরই নয়, সুখেনের দিক থেকেও; সুখেন নিজেও জানে যে সেও শিখা ছাড়াও অনেক মেয়ের সান্নিধ্যে এসেছে, শারীরিক সম্পর্ক করেছে।

গ) এই যে আমি, এই আমি যেন মোটেই সেই আমি নই (নিজের সম্পর্কে সুখেন)।

এখানে ক্যামুর 'দি আউট সাইডার' এর absurdism এর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। সুখেন এর 'এই আমি' আর 'সেই আমি' এই দুই সত্ত্বার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব পরিস্কার ভাবেই ফুটে উঠেছে। এই দুটি সত্ত্বা সম্পূর্ণ পৃথক। "এই আমি" হল সুখেন গুন্ডা। আর 'সেই আমি' হল পূর্বের সেই কম কথা বলা, লাজুকে, কলেজে অনশন করে খ্যাত হয়ে ওঠা সুখেন; যার কাছে প্রেমিকা শিখা যেন জ্যোৎস্নার সরূপ ছিল। আসলে অস্তিত্ববাদ অনুযায়ী 'সেই আমি'ই আসল সুখেন; কিন্তু 'এই আমি' সুখেন এর 'বহিরাগত সত্ত্বা' বা 'Outsider' হয়ে উঠেছে- 'man is the only creature who refuses to be what he is'(৩) - তাই লেখক যে সচেতন ভাবেই পাশ্চাত্ব অস্তিত্ববাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তা অস্বীকারের উপায় নেই।

ঘ) উপন্যাসটির প্রায় পুরো অংশেই সুখেনের এক তীব্র মানসিক যন্ত্রনার দহন অনুভব করতে পারি। এই তীব্র যন্ত্রনাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়েও লেখক পাশ্চাত্ব অস্তিত্ববাদের এক বিশেষ উপকরণ 'Anguish' এরই অনুরণন ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সাবলীলতারও পরিচয় রেখেছেন। যেমন— সেই একরকম ভয় পাওয়া, আর বুক গুরগুরিয়ে ওঠা, বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এক ধরনের যন্ত্রনা (নিজের কম বয়েসের একাকীত্বের অনুভুতি সম্পর্কে সুখেন)।

-এখানে সুখেনের অনুভূতি কম বয়েসের। কিন্তু প্রায় সারা জীবনই এই অনুভূতি তাকে গভীরভাবে নিমজ্জিত করে রেখেছে। এক লক্ষ্যহীন ভয়, উদ্দেশ্যহীন বেদনার বশবর্তী হয়ে সুখেন যেন নিঃশ্বাস ছাড়তেও ভুলে যায়। আসলে এই যন্ত্রনার অনুভূতি কেবল সুখেনের নয়; আমরা কেউই এই অনুভুতির থেকে রেহাই পেতে পারিনা, জীবনের কোনও না কোনও সময় এই অনুভূতি এসে আমাদের অস্তিত্বের চেতনা কে নাড়িয়েই দেয়। এই চেতনাকে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্যি কার নেই; লেখকও পারেন নি। তাই সুখেনের আজ জীবনের এক অবকাশে এই চেতনা তাকে গ্রাস করেছে। একদিকে কম বয়েসের নিষ্পাপ উপলব্ধি। অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারা, অনিশ্চিত জীবন যাপন, উদ্দেশ্যহীনতা, সর্বোপরি সমাজে থেকে নিজেকে অসামাজিক—গুন্ডা হয়ে উঠতে দেখার অস্বস্তি - সব





মিলিয়ে তার মনের যন্ত্রনা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আবার এই ভয় অজানা ভবিষ্যতই নয়; শিখার প্রতি প্রেম ও ঘৃনার সহাবস্থানকেও কার্য-কারন শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। সব মিলিয়ে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মানব অস্তিত্ব চেতনার দর্পন।

ঙ) অস্তিত্ববাদে এই যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে একদিকে যেমন কর্মের ও দায়িত্বগ্রহণ ও পালনের কথা বলা হয়েছে; ঠিক তেমনি এই দায়িত্ব আবার অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লব চেতনার জন্ম দিতে পারে। দার্শনিক ক্যামুর গ্রন্থ 'Rebellion'এ সেটাই বলেছেন- 'The Rebellion arises from the spectacle of the irrational coupled with an unjust and incomprehensible condition'(৪) 'প্রজাপতি' উপন্যাসেও লেখক সুখেনের মধ্যে এই বিপ্লব চেতনার উত্থানকে রূপ দিতে চেয়েছেন- যেন ওটা কাটিয়ে ওঠার জন্যই আমার একটা যুদ্ধের প্রয়োজন। - তবে এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে একান্তই সুখেনের মনের গহীনে।

চ) অস্তিত্বচেতনা আর মৃত্যুচেতনা সর্বদাই সমান্তরাল ভাবে ক্রিয়াশীল হয়। তাই পাশ্চাত্ব অস্তিত্ববাদি দার্শনিক মহল কোনভাবেই এই মৃত্যুভয় বা মৃত্যুচেতনাকে এড়িয়ে চলতে পারেননি। হাইডেগার, কীয়ের্কেগার্ড এর মতো সার্তেও মৃত্যুচিন্তা থেকে উদ্ভূত ভয় থেকে মনকে মুক্ত করার উপায় হিসাবে কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করা ও দায়িত্ব গ্রহণ করাকেই দেখিয়েছেন। সার্তরে -"এই পৃথিবীতে এসেই যখন পড়েছি" (৫) - এর মতোই সমরেশ বসু এখানে সুখেন এর মৃত্যু চেতনা কেই দেখিয়েছেন। তাই একটু আগে, সুখেন নিজেও জানেনা, শিখাকে সে কি করতে যাচ্ছিল, হয়তো মেরেই ফেলতে চেয়েছিল; অথচ শেষ পর্যন্ত সে তা করতেও পারেনা। আর এ সব কিছু ঘটলেই, সুখেনের সেই কথাতা মনে হতে থাকে - কেন আমি এসেছিলাম এই পৃথিবীতে! আমিও তেমনি জানিনা। সে ভেবে পায়না যে, কেবলমাত্র তাকেই কেন এই যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তখনই সে নিজেকে এই জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করে, যা অস্তিত্ববাদে 'alienation' বলে পরিচিত।

এখানে কোন প্রকার মতান্তর ছাড়াই বলা যাবে যে সমরেশ বসু পাশ্চাত্ব অস্তিত্ববাদকে প্রত্যক্ষ এবং সাবলীল ভাবে, সূক্ষ্ম- বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন। আসলে শিখার সাথে প্রায় জোরপূর্বক আলিঙ্গন করতে গিয়েও সুখেনের আর সুখের অনুভূতি থাকেনা। বরং দ্রুতই তা অস্বস্তি আর মৃত্যুচেতনায় পর্যবসিত হয়ে যায়। আর তাই এই পৃথিবীতে সুখেন তার বেঁচে থাকার কারণ খোঁজার চেষ্টা করেও ব্যার্থ হয়। সেকারণেই উপন্যাসটি প্রকৃত অর্থেই অস্তিত্ববাদী হয়ে উঠেছে। সুখেনের অস্তিত্ব চিন্তার কাছে — যৌনতা, গুণ্ডামি, প্রতিষ্ঠা- সব কিছুর ভাবনাই অর্থহীন হয়ে উঠেছে। এখানে সার্তের — 'there is no such thing as human nature'(৬) এরই অনুরণন আছে। আবার সুখেন আত্মহত্যাও করতে পারেনা, সে বলেছে - কারণ আমি ইচ্ছা করে মরতেও

পারছিলাম না। তাই তাকে এই যন্ত্রনা আমৃত্যু বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। যাকে হাইডেগার 'আমৃত্যু- জ্বরা' বা 'Sickness upto Death' বলেছেন। তাই তার কর্ম- গুণ্ডামি তার অস্তিত্ব রক্ষার শেষ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা হাইডেগার এর 'death is a self-possibility of existence (৭) এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ছ) এরপর আসব সুখেনের সেই পরীক্ষার সময় তেবিলে ছুরি রেখে নকল করা, পরীক্ষা বাতিল, তারপর সেই স্যারের প্যান্টের বতাম খুলে খিল্লি করার জন্য বাবার কাছে মার ও ঘাড় ধাক্কা খেয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়া। ওয়াগেন ভাঙ্গা রামকৃষ্ণের সাথে দিন কাটানো, মদ খাওয়া। এইখানে লেখক সমকালীন যুবসমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়কেই ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এতে করে উপন্যাসটি absurdity G existentialism এর উপযুক্ত প্রেক্ষাপট পেয়ে গেছে। আর সেই কারনেই প্রথম বার মদ খাওয়ার সময় সুখেনের একবারের জন্যও মনে হয়নি— যে সে 'কোন বিরাট পাপ কাজ করছে', বরং তাঁর সেই রাত উপভোগ্যই মনে হয়েছিল। এরপর একদিন হঠাত বাড়ি ফিরে মদ্যপ অবস্থায় তাঁর বাবার সাথে কথা হয়। আর এখানে লেখক সরাসরই ও স্পষ্ট ভাবেই অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন—'কিছুই ঠিক বুঝছি না, কিছুই ভাল লাগছে না, কেন আমি আছি; কেনই বা জন্মেছিলাম'।— ফলে ক্যামুর মত এখানে সমরেশের হাতেও সুখেন গুন্ডা সমাজের কাছে একজন— 'দি আউটসাইডার' হয়ে হাজির হয়েছে।

আবার একই সঙ্গে সমরেশ বসু এখানে সার্তরে 'persuit of being' বা অস্তিত্বের ছুটে চলা-কেই ফুটিয়ে তুলেছেন পরের অংশে। সুখেন তাঁর বাবাকে প্রশ্ন করেছে — কেন তার বাবা সুখেন কে জন্ম দিয়ে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল? তার বাবা কী আসলেই এই সুখেন কে আনতে চেয়েছিল, নাকি অন্য সুখেন কে- এই প্রশ্ন সুখেন কে এক অতল আঁধারে নিমজ্জিত করে ফেলে। আর এখানেই লেখক দেখিয়েছেন — সুখেনের মনের মধ্যেও প্রকট হয়েছে এক তীব্র মানসিক যন্ত্রনা, যাকে অস্তিত্ববাদে anguish বলা হয়েছে। আর এই যন্ত্রনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই কিছু হয়ে ওঠা (being) র জন্য সুখেনের সমগ্র অস্তিত্বও যেন ছুটে চলেছে। আসলে এই ছুটে চলা অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতা পাওয়ার লক্ষে। "the values that shape a person's behaviour results from the choices they have made'(৮) এই পূর্ণতা আবার ভাববাদীদের মতে পরম সত্ত্বার কাছে আত্ম সমর্পণ আর অস্তিত্ববাদীদের মতে নিজের সামর্থ প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। সুখেনও দ্বিতীয়টিতেই বিশ্বাসী।

জ) শিখার জন্য একদিকে সুখেনের মনে বড় কষ্ট, অপরদিকে অসহ্য ঘৃণা আর রাগ একসাথে ক্রিয়াশীল থাকে। আবার সে শিখাকে ছেড়েও যেতে পারেনা। তাই এই আবেগের বৈপরীত্য সুখেনের কাছে absurd বা অদ্ভুত ঠেকে। এখানে এর কারণ হিসাবে অস্তিত্ববাদের আর একটি উপকরণ bad faith এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেল। কারণ সুখেনের মনে





শিখার প্রতি টান বা আকর্ষণ থাকলেও সুখেন জানে শিখার চরিত্র ভাল নয়। শিখা তার সাথে ছলনাও করে। ফলে এটাই পরিস্কার হয় যে, একদিকে যেমন শিখা সুখেন এর সাথে মিলিত হয় নিজের স্বার্থ ও দাদাদের তথা পরিবারের স্বার্থে ; অপর পক্ষে সুখেনও শিখার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। আর এর ফলেই প্রকটিত হয় bad faith বা ভাণ।

তাই বলতে দ্বিধা নেই কোনও কোনও পাঠক- সমালোচক এই উপন্যাসটিকে প্রথমেই অশ্লীল ও 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' বলে অবমূল্যায়ন করে দিতে চেয়েছেন, যা সঠিক হয়নি। তাই বলব যে — সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'র আসল রঙ উপলব্ধি করতে হলে কেবল শারীরিক ভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হলেই হবে না মানসিক ভাবেও এতটাই বড় হতে হয় - যেখানে পৌঁছে কামনা-লালসা নয় বরং তারও উপরে অবস্থানরত অস্তিত্ব চেতনা নিজেকেই গিলে খেতে চায়। তাই একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'প্রজাপতি' উপন্যাসটিই সমরেশ বসুর লেখনীর জাত চিনিয়ে দেয়। তিনি কামনা বাসনা, অশ্লীলতা, যৌনতা, অসামাজিকতা- এই সব কিছুকে অতিক্রম করে উপন্যাসটিকে মানব-অস্তিত্ব চেতনার চূড়ায় উত্তীর্ন করে দিয়েছেন। এই চেতনা কেবল সুখেন গুণ্ডারই নয় আমাদের সকলের। তাই অশ্লিলতার দোষে দুষ্ট করে উপন্যাসটিকে অবমূল্যায়িত করা উচিত হবেনা। এখানে 'প্রজাপতি' অস্তিত্ব-চেতনার রঙে রঙিন, আর সেই রঙ হল- ধূসর।

**তথ্যসূত্র :**


(১) 'Being and Nothingness' — by Jean Paul Sartre (page-98-99)

(২) 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা'- সত্যেন্দ্রনাথ রায় ( দে'জ পাবলিশিং ,ভারত)(page-262)

(৩) The Outsider-by Albert Camus

(৪) 'The Rebel–by Albert Camus (page-15-16)

(৫) 'অস্তিত্ববাদ ও মানবীয় আবেগ' — জাঁ পল সার্তে।

(৬) 'Being and Nothingness' — by Jean Paul Sartre (page-480)

(৭) 'Being and Time' — by Martin Heidegger.

(৮) 'Being and Nothingness' — by Jean Paul Sartre (page-479)

# আলকাপের ধূসর গোধূলি : মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাস

প্রকাশচন্দ্র মন্ডল

আলোচ্য বিষয়ের প্রারম্ভেই যে কথাটি আমাদের স্মরণ রাখতে হয়, একটা বিশেষ সময় খন্ডের ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যাওয়া বাংলার বিলুপ্ত লোকনাট্য আঙ্গিকের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বাস্তব রূপায়ণ হল এই 'আলকাপ'। যদিও বলে রাখা আবশ্যক এই আলকাপ এক অতি বিতর্কিত শিল্প মাধ্যম। সত্যি কথা বলতে কি নগরের উচ্চকোটিতে তার স্থান নেই বা সেই অর্থে তথাকথিত সমাজের উচ্চ বর্গেও এই শিল্প মাধ্যমটি বরাবর অবহেলিত থেকেছে। কিন্তু একথাও আমাদের স্বীকার করতে হয় লোক্য ঐতিহ্যের একটি অন্যতম অত্যন্ত জনপ্রিয় ও মূল্যবান ধারা হলো এই 'আলকাপ'। আসলে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ধ্রুপদী লোকনাট্যরীতির উপর ভিত্তি করেই এই আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি তৈরি করেছেন। তবে ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে জানিয়ে রাখা ভালো ,এই আলকাপের বিষয় নিয়ে এর আগেও একটি উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার "বৈতালিক উপন্যাসে"।

আসলে আলকাপ অভিকরণমূল লোকসংস্কৃতির একটি অতি মূল্যবান উপাদান বিশেষ। যেহেতু যে কোন বিষয়কে যখন বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহকারে উপস্থাপনা করা হয় তখন তা অভিকরণ, এই বিশেষ অর্থে আমাদের আলোচ্য আলকাপ হয়ে ওঠে এক প্রকার অভিকরণ তত্ত্বিশেষ। এক্ষেত্রে আমরা যদি একটু মননিবেশ সহকারে ব্যাপারটা দেখে থাকি তাহলে দেখতে পাবো যে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ এই সত্যটি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন; যে যতগুলি লোকসংস্কৃতির উপাদান আছে সেগুলির প্রত্যেকটির উপস্থাপনার ক্ষেত্রেই বিশেষ এক ধরনের অভিনয় প্রবণতার রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। ফলত সাম্প্রতিককালে অভিকরণ তত্ত্বের যুক্তি নির্ভরতা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত এবং গবেষণাধর্মী। এবং লোকো সংস্কৃতির বর্তমান নবসংস্করণ কে এই অধিকরণ তত্ত্ব স্বীকার করে নেয়। এই প্রেক্ষাপটে আলকাপেরও রূপান্তর ঘটেছে স্বয়ং লেখকের কথায় যাকে তিনি 'পঞ্চরস' 'নামের যাত্রাধর্মী লোকনাট্যের কথা বলে উল্লেখ করেছেন বাস্তবে সেটিই কিন্তু 'আলকাপ'।

ফলত, আমাদের স্বীকার করতে বাঁধা নেই যে আলকাপ অভিকরণ মূলক লোকোসংস্কৃতির একটি অতীব মূল্যবান উপাদান বিশেষ। আলকাপ ও একটি দলীয় ও মিশ্র প্রকৃতির সংগীত প্রদর্শন। এখানে নাচ, গান, কথা, ছড়া, অভিনয় ইত্যাদির সংমিশ্রণে জমজমাট আসরের রূপ ধারণ করে। আসলে এখানে এই সমূহ উপাদান অভিনয়ের মাধ্যমেই দর্শকের সামনে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

এবার দেখে নেওয়া যেতে পারে বাংলা লোকনাট্য রীতি অন্যতম বিশেষ ধারা 'আলকাপের' স্বরূপকে। আলকাপের কায়া নির্মাণের দিক থেকে যে দুটি বিষয় স্পষ্টতো বোঝা যায় সেটা হল একটি তার অভিকরণের দিক। মূলত যার সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে





সংলাপ, নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্র। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে মঞ্চ সজ্জাও এর মধ্যেই পড়ে যায়। পাশাপাশি আর একটি বিশেষ দিক হল এর মৌখিক রীতি। অর্থাৎ যাকে আমরা বলতে পারি ওরাল টেক্সট। এর মধ্য সম্পৃক্ত হয়ে আছে ছড়া এবং গানের মত বিষয় সমূহ। অর্থাৎ তাহলে বিষয়টা যা দাঁড়ালো সেটা হল আলকাপের যে বিশেষ গঠন সেখানে একদিকে আছে অভিনয়ের মতো দিকগুলো, অন্যদিকে শিল্পীদের মুখে মুখে সংগীত বা ছড়ার মত বিষয় সমূহ। তাহলে শেষতক বিষয়টি যা দাঁড়ালো সেটা হল আলকাপের অভিকরনে তত্ত্বগতভাবে তিনটি বিষয় সমূহের মিলিত রূপ। যেখানে আছে ছড়া বা গান। তৎসঙ্গে আছে নৃত্যও অভিনয়ের মতো বিষয় সমূহ।

আমরা আগেই বলেছি আলকাপ এক অতি বিতর্কিত শিল্প মাধ্যম। ফলত এই, আলকাপ, শব্দের পারিভাষিক অর্থ নিয়েও নানান মত প্রচলিত আছে। 'মায়ামৃদঙ্গে'র স্রষ্টা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমাদের জানিয়েছেন -'আল' শব্দটি আহ্লাদের অপভ্রংশ। আহ্লাদগ্ন আল্লাদগ্নআল। এটি পুরনো বাংলা শব্দ।—আমি অনেক খুঁজে।[১] শব্দের মুদ্রিত রূপ দেখতে পেয়েছিলাম। এতে বোঝা যায় একদা শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।'[১] লেখক এখানেই না থেমে আমাদের আরো জানিয়ে দেন-' তবে এটাই অদ্ভুত ব্যাপার, অনেক সময় আমরা জানি না যে আমরা কি জানি। শব্দটির মুদ্রিত রূপ দেখা মাত্র আমার মনে পড়ছিল, গ্রামাঞ্চলে বাল্য ও কৈশোরে লোকের মুখে শুনেছি, "ওর বড্ড আল হয়েছে", খুব আল করে বেড়াচ্ছ দেখছি!" ইত্যাদি। আধুনা অসংখ্য প্রাচীন বাংলা শব্দ লুপ্ত। শুধু বেঁচে আছে, কাপ, অর্থাৎ নাটিকার সঙ্গে জোড় বেঁধে। আলকাপ, কথাটির প্রকৃত অর্থ: আমোদেপ্রমোদ মূলক নাটিকা। তবে কথাটির অর্থ ব্যঞ্জনা (Conotation) বিস্তারে এই অর্থ ও ব্যক্ত: রঙ্গরসাত্মক নাটিকা বা রঙ্গবাঙ্গাত্মক নাটিকা'।[২]

উপন্যাসিক আমাদের আরো জানিয়েছেন, আলকাপের 'আল, শব্দের আদিতে আছে 'হুল'। প্রকৃতপক্ষে যা হুলের মত বিদ্ধ করে। আসলে লাট্টু বা লাটিমের যে তলদেশ যার উপরে দাঁড়িয়ে লাট্টু ঘোরে তারও এক নাম 'আল'। এবং 'কাপ' শব্দের অর্থ কাব্য বা নাটক। এখানে অবশ্য বলে রাখা ভালো এখানে "কাপ" শব্দটি ব্যঙ্গাত্মক বা মশকরা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চায় এই 'আলকাপ' নামক লোকনাট্যের গুরুত্ব কে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে এই আলকাপ কিন্তু সারা বাংলাতে প্রচলিত নেই। এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবেই মনে পড়বে ডঃ শক্তিনাথ ঝা তাঁর অন্যতম এক গবেষণা গ্রন্থ 'আলকাপ"এ জানিয়েছেন।

'গঙ্গার দু-পারের জঙ্গিপুর, সাগরদিঘি, মানিকচক, কালিয়াচক এক বিশিষ্ট অঞ্চল। অন্যদিকে রাজশাহী, মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থিত চরদিয়ার স্থলভূমি আরেক পটভূমি। উক্ত এলাকায় হিন্দির নানা উপভাষী জনতা বঙ্গের নাগরিক। সাঁওতাল পরগনা, মালদহ,

বীরভূম, মুর্শিদাবাদের সংযোগস্থলের জনবিন্যাস এবং ভাষাগত মিশ্রণ আবিষ্কার করা যায় আলকাপে।'[৩]

অর্থাৎ আলকাপের বিচরণ স্থল দিনাজপুর, মালদহ্মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী। এর বাইরেও অবশ্য কুষ্টিয়া, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুরে লক্ষ্য করা যায়।

আলোচিত "মায়ামৃদঙ্গ" উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে আলকাপ কে কেন্দ্র করেই কাহিনীর শুরু, বিস্তারও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বভাবতই উপন্যাসের প্রেক্ষিতে আলকাপের পর্যালোচনার আগে, একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে আলকাপের সাংগঠনিক রূপটি কেমন ছিল। এখানে পর্যায়ক্রমে দেখা মেলে—

১। বন্দনা।

২। ছোকরা।

৩। কেপে এবং ছোকরার দ্বৈত সংগীত, রঙ্গ রসিকতা।

৪। ওস্তাদ।

৫। কাপ অর্থাৎ কৌতুক।

৬। ছোকরাদের গানের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি।

আসলে আলকাপ এমন এক লোকনাটক যার কোন সুনির্দিষ্ট লিখিত রূপ নেই বললেই চলে। এখানে আসরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখে মুখেই অনেকটা কবিয়ালের ঢঙে বিভিন্ন ছড়া, রঙ্গ-রসিকতা করে দর্শকের মনোরঞ্জন করা হয়ে থাকে।

আলকাপ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এর আগে একটি মাত্র উপন্যাস লিখিত হয়েছে, সেটি হলো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈতালিক'। কথাটি স্বয়ং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমাদের জানিয়েছেন। তবে সেখানে আলকাপের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুটন হয়নি। "মায়ামৃদঙ্গ" লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের শিল্পী জীবনের ডকুমেন্টারি কাহিনী। লেখক তাঁর প্রথম যৌবনের ছয়- সাতটি বছর এই আলকাপ দলের সঙ্গে কাটিয়েছেন। অর্থাৎ লেখকের প্রত্যক্ষ জীবনজাত ও অভিজ্ঞতা নির্ভর যন্ত্রণার কাহিনী এই "মায়া-মৃদঙ্গ"। লেখকের কথায়—

'আলকাপের শেষ নায়ক বলতে শুধু আমি এখনো বেঁচে আছি।

বেঁচে আছি শুধু বিরল মায়ার স্মৃতিটুকু নিয়ে।'[৪]

সিরাজ সৃষ্ট 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে পঞ্চাশের দশকের মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপের এক বাস্তব নিষ্ঠ দলিল। ওস্তাদ ঝাঁকসু উপন্যাসের নায়ক। বিপরীতে আছে আধুনিক আলকাপ দলের নব উদীয়মান মাস্টার সনাতন। আলকাপের দলে আছে ছোকরা সুবর্ণ, হারমোনিয়াম বাদক কাদের আলি, কাপে ঘনশ্যাম বাগদী, নন্দ, গুনিন কালাচাঁদ বুড়ো ,বাহক নফর আলী এবং ম্যানেজার আমির আলি। মূলত এরাই আলকান্দ দলের কুশিলব। সুবর্ণ এই দলের প্রধান সম্পদ। তার মোহিনী মায়ার আলোক ছটায় দলটি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আছে। সুবর্ণ বহি রঙ্গে চলনে-বলনে-কথনে নারী, কিন্তু ভেতরে পুরুষ।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

এখানে সে সৃষ্টি করেছে মায়া বিভ্রম।

যার মোহিনীমায়ার আলোতে স্বয়ং কাবু হয়েছে ওস্তাদ ঝাঁকসু। আলকাপ দলের প্রত্যেকটি চরিত্র সেই 'সুবর্ণ' নামক আলেয়ার পেছনে ছুটে চলেছে। তাকে কেন্দ্র করেই পরস্পরের মধ্যে মান অভিমান সংঘটিত হয়েছে।

সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে লক্ষ্য করা যাই জীবনের নানা দিক। যা প্রস্ফুটিত হয়েছে বিভিন্ন সংগীতের মধ্যে দিয়ে। এখানে ২৪ টি গান এবং পাঁচটি ছড়ার মধ্যে দিয়ে লেখক লোকায়ত জীবনধারাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এক অসাধারণ চালচিত্রে। আলোচ্য গানগুলি শুধুমাত্র আলকাপের বিষয়গত দিক নয়, ফুটিয়ে তুলেছে শিল্পী তথা ব্যক্তি জীবন তথা সমাজ জীবনের নানান দিক। প্রথমে আমরা পাব—

'সই আমার গঙ্গাজল হে

সই আমার গঙ্গার জল।

জন্ম জন্ম ডুবলাম যত পেলাম না তো বুকের তল।।'[৫]

আলোচ্য সংগীতের মধ্যে দিয়ে লেখক এখানে ওস্তাদ ঝাকশার জীবনের গভীর মর্মব্যথা কে ব্যক্ত করেছেন। আসলে এখানে গঙ্গা একদিকে গঙ্গা নদীর অতলতার কথা বলেছেন, অপরদিকে তার স্ত্রী গঙ্গামনির কথাও প্রস্ফুটিত হয়েছে। যাকে ওস্তাদ চিনতে পারেননি। ঝাঁকসুর জীবনে যে বয়ে এনেছিল শান্তির বার্তা, সেই শান্তির গাওয়া সংগীতটি—

'আমার এ প্রথমো গান

তোমারে শোনাবো বলে

জেগে আছি সারারাতি।'[৬]

ওস্তাদ ঝাঁকসুর অতীত সুখের স্মৃতি কে বহন করে। যার মোহিনী মায়ায় সে হয়েছিল উন্মাদ। আবার যখন আমরা শুনি—

'বলব কি আর দুখের কথা, মাতা

বাবা মঝেছে নানা রঙ্গে

ও পাড়ার এক ছুড়ির সঙ্গে

কইছে কথা মাতা'।[৭]

এখানে কোন এক দুষ্টু ছেলে সে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তার বিয়ে হচ্ছে না বাবা মায়ের মতের কারনে। তাই নিয়ে এখানে এক রঙ্গ রস সৃষ্টি করা হয়েছে, যা লোকজীবন যাত। সমকালীন দেশবিভাজন তার রক্তাক্ত ইতিহাসকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে সপ্তম সংখ্যক গানটি। আমরা শুনতে পাই।—

"হায়রে হায় কেমনে বাঁচবো জান।

হলো হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান।।

ভাই রাখে না ভাই এর মান

কেমনে বাঁচাবো জান"।[৮]

এর মধ্য দিয়ে অভিশপ্ত দেশ বিভাজনের সঙ্গে ভাইয়ের যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে সেই দেশভাগের কলঙ্কিত অধ্যায় কে স্মরণ করা হচ্ছে।এভাবেই আলোচ্য উপন্যাসে লোকসংগীত এর প্রসঙ্গ আমরা পেয়ে যাচ্ছি আলোচ্য সংগীত গুলির মধ্যে দিয়ে।

উপন্যাস মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পাঁচটি ছড়া। যা বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে যাওয়া রচিত হয়েছে। ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের বিভিন্ন প্রথা, সংস্কার, বিভিন্ন রীতি-নীতি, এবং ব্যঙ্গ বিদ্রুপের রঙ্গ রস সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন আমরা দেখি—

"নদীর স্রোতের মতো কালের গতিতে আমার
হেলায় বেলা বয়ে যায় গো"।[৯]

এখানে ওস্তাদ ঝাঁকসার জীবনের মর্মব্যথা প্রস্ফুটিত হয়েছে। ফজলের ন্ট্রে আমরা শুনতে পাই—

"বাহবা মজা দেখছি দাদা ধন্য কলি কাল"।[১০]

উল্লেখিত ছড়াটিতে মোল্লা-পুরুত ধর্মের ভেকধারীদের সবংশে মস্তক মুণ্ডন করে সাধনোচিত ধামে পাঠানো হয়েছে। এরপরে আমরা একটি ছড়া পেয়েছি কালাচাঁদ বাউরির কণ্ঠে—

"(তবে) মাথাছাড়া কত ছেলে জন্মেছে সংসারে গো
মাতা ছাড়া কত ছেলে জন্মেছে সংসারে"।[১১]

অপর একটি ছড়ার সন্ধান আমরা পেয়েছি মনকির ওস্তাদের কণ্ঠে। সেখানে আমরা শুনতে পাই—

"মন কি মিলে রে,
মনের মানুষ না, হইলে মনের কথা না কইলে"।।[১২]

আসলে এখানে সেই অতৃপ্ত ভালবাসার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। আলকাঁপের রাত্রির গভীর মায়া লোকে যা গভীর বিভ্রম তৈরি করে। আলকাপের পঞ্চম ছড়াটি গীত হয়েছে নতুন ওস্তাদ সোনার কণ্ঠে। যার বিষয়বস্তু অনেকটা ঠেস। তৎকালীন সময়ে আলকাপের শিল্পীরা সমসাময়িক সমাজ, শিল্প, সাহিত্য নিয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিল তারই পরিচয়বাহী একটি সংগীত হলো—

"আমরা যত মাঠের কবি, কবি তুমি রাজসভায়
ধন্য ধন্য বিশ্বকবি বিশ্বেরো মাঝারে"।।[১৩]

এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং আলকাপ শিল্পীরা রবীন্দ্র নাথ সম্পর্কে জানতেন সেটা এখানে বোঝা যায়। আলকাপ কোন ধর্মীয় সংগীতের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ ছিল না তা প্রস্ফুটি হয়ে উঠেছে সনাতন মাস্টারের একটি গানের মধ্যে দিয়ে—





"হেথা বাদশা ফকির সবাই সমান
হিন্দুরা শ্মশান বলে, মুসলমানে গোরস্থান।
আবার এইখানেতে যিনি খোদা
সেই খানেতে এই ভগবান।"[১৪]

আলকাপের সংগঠনের একটি অন্যতম বিষয় হলো ছড়া। ছড়াগুলি কাপ পরিবেশন এর সময় হঠাৎ করেই মুখে মুখে শিল্পীদের মুখে সৃষ্টি হতো। এর বিষয়ে হলো বিভিন্ন মানবজীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়। এরমধ্যে যেমন আচার, রীতি-নীতি বা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কখন কখনো প্রকাশ পেতো। আলোচ্য "মায়ামৃদঙ্গ" উপন্যাসে এইরকম পাঁচটি ছড়ার সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। ওস্তাদ ঝাকসার মুখে। আমরা শুনতে পাই—

"নদীর স্রোতের মত কালের গতিতে আমার
হেলায় বেলা বয়ে যায় গো।"[১৫]

এখানে ঝাঁকশার ব্যক্তি যন্ত্রণার কথা প্রকাশ পেয়েছে। তার নিজের স্ত্রীর অবহেলা যেন এই গানটির উৎস মুখ খুলে দিয়েছে। জমে আছে এক বুক চাপা যন্ত্রণা। আবার যখন আমরা শুনতে পাই—

"বাহবা মজা দেখছি দাদা ধন্য কলি কাল।"[১৬]

এটি গেয়েছে ফজল। এর ছড়াটির মূল উদ্দেশ্য হলো মোল্লা, পুরুত নামক ধর্মের ভেকধারীদের মুখোশ খুলে দেওয়া। সোনা ওস্তাদের কণ্ঠে আরেকটি ছড়া আমরা শুনতে পাই—

"গুণের কামধেনু! (আহা) গুণের কামধেনু
তোর বলি হারি যাই,
পটকা বাট দুধ মেলে না ঠ্যাং তুলে লাফাই।"[১৭]

এমনি তরো আলকাপের একটি বিশেষ অংশ ছড়া আমরা পেয়ে থাকি। যার মধ্যে দিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এই ছড়া হলো মৌখিক ঐতিহ্যের যে বিবিধ সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে এটি অতি প্রাচীনতম। ফালত এর গুরুত্ব অপরিসীম লোকসাহিত্যে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে আমরা একইসঙ্গে আরো লক্ষ্য করবো বিভিন্ন লোকায়ত বিশ্বাস সংস্কার এবং তারই সঙ্গে তন্ত্র-মন্ত্রবিদ্যার হাত ধরাধরি করে চলা। আলকাপ দলের সঙ্গে থাকতো একজন বিশেষ গুনিন। যার কাজ হল তার দলের বাদ্যযন্ত্র এবং শিল্পীদের বিভিন্ন কালা জাদু থেকে রক্ষা করা। ঠিক সেইরূপ 'মায়ামৃদঙ্গে' ও একজন গুনিন আছে সে হলো কালাচাঁদ বাউরী ওরফে 'কালা গুনিন'। পালার শুরুতে সে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে দলের প্রত্যেক শিল্পীকে তৎসহ বাদ্যযন্ত্র গুলোর দেহবন্ধন করে দেয়।' আসর শুরু হবার আগে কালাচাঁদ খুড়ো কিছুক্ষণের জন্য অন্য মূর্তি হয়ে ওঠে। তখন সে কালা গুনিন। যেন সাপের চোখে রক্ত ছটা, রুক্ষ চুল আলু থালু, কপালে সিঁদুরের ছোপ-সে কারো সঙ্গে কথা বলে না।[১৮]

স্বীকার করতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তার 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে এই অবলুপ্ত ধ্রুপদী নাট্য রীতি, তথা 'আলকাপ' কে আমাদের পাঠক সমাজের কাছে নতুন করে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন প্রায় অবলুপ্ত সেই শিল্প ও শিল্পীদেরকে যাঁদের আমরা প্রায় ভুলে গেছি। স্বয়ং লেখকের কথায়—

"আলকাপ-এর গায়ে ধুসর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে" নয়, "আলকাপ নামক লোকো নাট্য রীতি তখন প্রকৃতপক্ষে মৃত।"[১৯]

এই মৃত প্রায় শিল্পটিকে, তার বিভিন্ন সংগঠনটিকে উপন্যাসের কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করে উপহার দিয়েছেন আমাদের এই 'মায়ামৃদঙ্গ'। যা এক উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা আশা রাখি।

**তথ্যসূত্র :**

১. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মায়ামৃদঙ্গদে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ১০১৬, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ৭-৮
২. ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ-৭-৮
৩. শক্তিনাথ ঝা, আলকাপ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ডিদেচেম্বে ২০১০,পৃ-৪
৪. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মায়ামৃদঙ্গদে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ১০১৬, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ৭-৮
৫. ঐ, পৃ-১২
৬. ঐ,পৃ-১৪
৭. ঐ,পৃ-৩০
৮. ঐ,পৃ-৪৪
৯. ঐ,পৃ-১৮
১০. ঐ,পৃ-৫২
১১. ঐ,পৃ-৫৭
১২. ঐ,পৃ-৮৮
১৩. ঐ,পৃ-৯১
১৪. ঐ,পৃ-৮৪
১৫. ঐ,পৃ-১৮
১৬. ঐ,পৃ-৫২
১৭. ঐ,পৃ-১১৪
১৮. ঐ,পৃ-১২৩
১৯. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মায়ামৃদঙ্গদে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ১০১৬, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ-৭



# 'এখনই'র টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত যুবসমাজ : রমাপদ চৌধুরীর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'

**শুভঙ্কর ভট্টাচার্য**

পরিমিত শিল্পবোধ বিবেকবোধ মানবিকতা ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী কথাকার হলেন রমাপদ চৌধুরী। সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই স্বপ্রতিভায় উজ্জ্বল অন্যান্য খ্যাতনামা কথাকারদের থেকে তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পেরেছেন। যার অন্যতম কারণ তাঁর বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা। এই জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি সাহিত্য জীবনের প্রথম প্রহরে তাঁর পরিচিত রেলশহর, চাঁদমারির ময়দান, তিমুর সাইকেল নিয়ে ছুটে বেড়ানো থেকে কখনো সুন্দরবনের 'দ্বীপের নাম টিয়ারং', 'অরণ্য আদিম', 'বনপলাশীর পদাবলী'র সেই গ্রাম কখনো আবার ইতিহাসের বিষ্ণুপুর ঘরানার 'লালবাই' এর দরবারের ছবি এঁকেছেন; যা শুধু প্রান্তিক জীবনের ছবি না হয়ে জনপদাবলী হয়ে উঠেছে। আবার পরবর্তীকালে তাঁর রচনাই নাগরিক মধ্যবিত্তের তীক্ষ্ণ ক্রিটিক হয়ে উঠেছে। তবে সাহিত্য জীবনের এই পালা বদলে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে আত্মমগ্নতা, নির্মেদ বাস্তবতা, সংযত তীক্ষ্ণ শিল্পদৃষ্টি ও নিরপেক্ষ শিল্পীর দায়বদ্ধতা মিলেমিশে গেছে। আর এই পালাবদলের সূচনা যাটের দশকের শেষ ভাগ। যখন রাজনৈতিক সামাজিকভাবে ভারতবর্ষের বুকে হয়ে চলেছে এক তীব্র আলোড়ন আর এই আলোড়নে সর্বাধিক জর্জরিত যে যুব সমাজ স্বাধীনতা উত্তরকালে তখন যাদের বয়স কুড়ি একুশ তাদের দিকে লেখক মনোনিবেশ করেছেন। যার সূত্র ধরে লেখক পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর সারস্বত সাধনার তৃতীয় পর্বে। যেখানে মধ্যবিত্তের অন্দরমহল তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে ১৯৬৫ এর পরবর্তীকালে যুবসমাজের এই অন্তরদহনের চিত্র পৃথকভাবে উঠে এসে তাঁর সাহিত্য জীবনের আরেকটি (দ্বিতীয়) পর্ব যেমন সূচনা করেছে। পাঠক হিসেবে এই যুব সমাজের মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কেননা যৌবনকাল প্রতিটি মানুষের জীবনে নিয়ে আসে এক স্বপ্নের বাতাবরণ; সবকিছু করে ওঠার মানসিকতা। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি যদি সেক্ষেত্রে নিয়ে আসে এক বিপুল বাধা, যা থেকে বেরোনোর পথ জানা নেই, বেরোতে গেলে সামনে আসে শুধুই ধোঁয়াশা ভরা পথ আর সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে অজানা ভবিষ্যতের কাছে নিজেকে ন্যস্ত করার ট্রাজেডি! তাহলে সেই বিমূঢ় বিভ্রান্ত যুব সমাজের প্রতি পাঠকের মনোযোগ স্বাভাবিক, যা তাকে কতগুলো মৌলিক প্রশ্নের সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দেয়। আর পাঠক যদি নিজেই কুড়ি একুশের এই যুব সমাজের প্রতিনিধি হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তির ছবি হয়ে ওঠে আর বাস্তব। সেরকমই এক পাঠক হিসেবে রমাপদ চৌধুরীর দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্য ক্ষেত্রে,

চারপাশ আর নিজের সঙ্গে নিয়ত ক্ষতবিক্ষত তথা সার্বিক টানাপরেনে বিভ্রান্ত যুব সমাজ "যে যেখানে দাঁড়িয়ে" তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

পূর্বে উল্লেখিত যে রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যজীবনে বিশ শতকের ছয়ের দশক একটি নতুন মোড় নিয়ে এসেছিল। যে সময়টিকে তিনি নিজে বলতে চেয়েছেন সামাজিক বিস্ফোরণের যুগ। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দিক থেকেও ছয়ের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিকভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে ছয়ের দশক একটি স্বপ্নভঙ্গের দশক। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরেও (যখন রমাপদ "এখনই" লিখেছেন) সামাজিক বৈষম্য ও দেশভাগের ফলশ্রুতিস্বরূপ সর্বত্র এক ব্যাপক নৈরাশ্য পরিব্যপ্ত। এই দশকের সূচনা চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষে যার অনিবার্য পরিণতি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন আর ওই দশকের শেষাশেষিই পরিবর্তিত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্র। একদিকে চলছে খাদ্য আন্দোলন অন্যদিকে ১৯৬৭ তে পরাজিত কংগ্রেসের স্থানে জায়গা নিল যুক্তফ্রন্ট সরকার। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই সরকার ভেঙে দেওয়া হলো ফলে প্রতিবাদে জ্বলে উঠলো সারা শহর। আর আরম্ভ হল কংগ্রেস ও পুলিশ বাহিনীর তাণ্ডব। আর এরই সমান্তরালের ১৯৬৭ এর মে মাসে নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে শুরু হলো নকশাল আন্দোলন। যা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে জোরদার ব্যাপকতা লাভ করল। আর এসব কিছুর সঙ্গেই আসন্ন হয়ে এলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং এইরকম বিপর্যস্ত সময় দাঁড়িয়ে একজন সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনৈতিক আলোড়ন উপেক্ষা করা মোটেই সহজ কথা নয়। কিন্তু কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী এই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানকারীদের নিয়ে নয়, আন্দোলনের ফলে বিপর্যস্ত সময়ের যুবপ্রতিনিধিদের নিয়ে (আন্দোলনের ফলে সর্বাধিক বিভ্রান্ত যারা) তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন। অর্থাৎ আন্দোলনের ফলে বাহ্যিক আলোড়ন অপেক্ষা মানসিক আলোড়নকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তাঁর 'এখনই' (১৯৬৮), 'পিকনিক' (১৯৭০) ও 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' (১৯৭৩) উপন্যাসেও তাই তিনি সেই যুব সম্প্রদায়ের কথাই বলেছেন যারা প্রত্যক্ষ আন্দোলন বা বিপ্লব থেকে অনেক দূরে যারা মূলত নিজেদের স্বপ্ন আর হতাশা নিয়ে আত্মমগ্ন, স্বাধীনতার মুহূর্তে যাদের জন্ম সেই একুশ বছরের তরুণ প্রজন্ম যাদের কাছে স্বাধীনতা সম্পর্কে সকল মোহ আশা তখনই হয়ে পড়েছে ধুলিস্যাৎ। লেখক তাই নিজেই জানিয়েছেন,

'রাজনীতির ক্ষেত্রেও একটা বিস্ফোরণ যে ঘটতে চলেছে তা এই সময়েই অস্পষ্ট ভাবে চিহ্ন রাখতে শুরু করেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী তখনও এইসবের বাইরে...। আমি এদেরই বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম কারণ এরাই সমাজে একটা অন্য ধরনের বিস্ফোরণ এনেছিল। বিচারটা ভালো-মন্দের নয়, বিচার যা ঘটে ছিল তার। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে অগ্নুৎপাত ঘটেছিল এরও কয়েক বছর পরে তা একসময় থিতিয়েও গেল, তার প্রকৃত প্রভাব কতখানি তা দেখার জন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমার



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

চোখে অনেক বেশি তাৎপর্যময় মনে হয়েছিল যুবক সমাজের চেহারাটাই। বিশেষ কোনো উচ্চাশা নিয়ে তো লিখিনি, তরুণ তরুণীদের নত মুখ জড়তা থেকে উজ্জ্বল স্বাভাবিকতায় পৌঁছে যাওয়া দিনগুলির একটা রেকর্ড রাখতে চেয়েছিলাম হয়তো। এরও প্রায় সিকি শতাব্দীর আগে আমিও তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, ছাত্রীরা সংখ্যায় কম ছিল না, তবু আড়ষ্টতা ছিল উভয় পক্ষেই, আলাপ মানেই প্রেমালাপ কিনা সন্দেহ... অথচ আটষট্টির এই ছেলেরা আর এই মেয়েরা মনে হল একেবারে অচেনা। বাঙালির গৃহ শাসিত সংকোচভীরু জীবনে এরা যেন একটা নতুন হাওয়া নিয়ে এলো, যার প্রভাব মনে হলো সমাজের সর্বস্তরেই থেকে যাবে। এও এক ধরনের বিপ্লব, রাজনৈতিক চশমা চোখে দিয়ে যাকে তুচ্ছ করা যায়, কিন্তু উপেক্ষা করার উপায় নেই।'[১]

'এখনই'র এই প্রসঙ্গকথা থেকে মনে হতে পারে, একুশ বছরের নবীন প্রজন্মের কথা লেখক যেহেতু স্পষ্টতই বলেছেন সেহেতু লেখক নিজের সময়ের নবীন প্রজন্মের সঙ্গে ছয় এর দশকের নবীন প্রজন্মের প্রতি তুলনাই হয়তো উপন্যাসগুলিতে করতে চেয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসগুলির নিবিড় পাঠে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে উপন্যাস তিনটি শুধুমাত্র এই প্রতি তুলনায় আবদ্ধ না থেকে একটি নির্ভুল "কালচিহ্ন" হয়ে দেখা দিয়েছে। যা কখনো যুব সমাজের সঙ্গে পূর্বপ্রজন্মের বিচ্ছিন্নতা, কখনো নিজ প্রজন্মের সঙ্গেই ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্নতার ছবি তুলে ধরে একটি সার্বিক বিভ্রান্তির ছবিই আমাদের সামনে তুলে ধরে। এখন আমরা ধাপে ধাপে এই তিনটি উপন্যাসে 'এখনই'র টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত যুব সমাজ "যে যেখানে দাঁড়িয়ে" তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

অনুসন্ধানের প্রথম পর্বেই বলে রাখি বারংবার উল্লেখিত "এখনই" র টানাপোড়েন কী এবং কেন সেটাই আমরা আগে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। তারপর তা কিভাবে যুবসমাজকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে সেটির বিষয়ে অনুপ্রবেশ করব।

**'এখনই' উপন্যাসে যুবসমাজ :**

বারংবার উল্লেখিত এখনই অর্থাৎ এই মুহূর্তে সবকিছু পাওয়ার বাসনা যা তথাকথিত অনভিজ্ঞ ক্ষণিক আনন্দে আত্মহারা নবীন প্রজন্মের মধ্যেই বেশি ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়। এখনই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অরুণের মধ্যেও এই টানাপোড়েন ক্রিয়াশীল হতে দেখি। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখিত, যে সময়ে দাঁড়িয়ে অনাগত ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত যুব সমাজের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অবলম্বন চাকুরীও দুর্মূল্য সেখানে মুহূর্তে সবকিছু পেয়ে যাওয়ার মানসিকতায় আঘাত লাগতে বাধ্য। আর এই মানসিকতার আঘাতে যুব সমাজের সঙ্গে তাদের সবচেয়ে পরিচিত বাবা-মা তথা পূর্ব প্রজন্মেরই ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। আসলে অরুণরা বাঁচতে চায় আরেকটু ভালো ভাবে, সাজিয়ে গুছিয়ে শখ শৌখিনতা করে। কিন্তু এই শৌখিনতার জন্য তো আগে তা টিকিয়ে রাখার অবলম্বন থাকা চাই! যেহেতু অরুণদের সে অবলম্বনে নেই তাই তাদের এই কাঙ্ক্ষিত আয়াশের ব্যবস্থা মা-বাবা মেনে নিতে পারে

না। তারা বারবার চাকরির কথা মনে করিয়ে দেয় অরুণকে। আর যেহেতু চাকরিই দুর্মূল্য তাই অরুণ অসহায় হয়ে ভাবে ‘মা একদিন বলেছিল, নবীন বাবুর ছেলেটা রত্ন। যেমন ভদ্র, তেমন ভালো চাকরিও করছে।’[১] যা ভেবে অরুণের ইচ্ছে হয় নিজেকে হামালদিস্তা দিয়ে থেঁতলে দিতে। ছোটবেলা থেকে এই তাচ্ছিল্যই মা-বাবার সঙ্গে মানসিকতার দূরত্ব রচনা করে। ব্যবধান এতটাই যে অরুণ ভাবে, ‘মা যখন আমাকে অরুণ বলে ডাকে, স্নেহ না ঘৃণা বুঝতেই পারি না।’[১] প্রজন্মগত এই ব্যবধানের চিত্র উপন্যাসের আরেক চরিত্র টিকলুর মুখেও শোনা যায়। একই সমস্যা থেকে টিকলু ভাবে, ‘বাড়িটা লজ্জা নয়? চারপাশে ঝকঝকে নতুন বাড়ি, ওদেরটা প্যালেস্তারা খসা, ইটের রং কালো। বাবাকে দেখলে তো লোকে মেশিনম্যান বলে ভুল করে। ক ভাই, ক বোন জিজ্ঞেস করলে আঙুল গুনতে হয়, একটা না বাদ পড়ে যায়। মা একটা কালো সজারু, চব্বিশ ঘন্টা কাঁটা ফুলিয়ে আছে।’[১] তাই একদিকে মূল্যবোধের বিরোধ অন্য দিকে যে চাকরির খোঁটা পূর্ব প্রজন্ম দিয়ে চলে তার নিশ্চয়তা তারা দিতে না পারায় এক সার্বিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে যায় দুই প্রজন্মে। যুব সম্প্রদায়কে প্রবীণ প্রজন্ম যেমন অভিযোগ অনুযোগ করে চলে তেমন অরুণদের মনেও প্রবীণ প্রজন্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধা বা সমীহের অভাব ঘটে যায়। ফলে দুই প্রজন্মেরই ‘এখন’ই সব পাওয়ার খেলায় ঘটে চলে এক পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা।

প্রজন্মগত ব্যবধানের পাশাপাশি সম্বলহীন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আর্থিক নিরাপত্তাজনিত কারণে নিজ প্রজন্মের মধ্যেই বিচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয়। যে যুবসমাজ পাড়ার রকে বা কফি হাউজে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দেয় তারা একে অপরকেই ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। যেহেতু ব্যক্তিবিশেষে ঘিরে থাকে নিরাপত্তার অভাব, সেহেতু এখনই সবকিছু পাওয়ার খেলায় নিজেকে নিয়েই মত্ত যে সে কি করে অপরের ভিতরের দুঃখ যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে পারবে? এই কারণেই টিকলুর লাখ টাকার গল্প অরুনের ভালো লাগেনা। দূরত্ব এতটাই রচিত হয় যে টিকলুর পরীক্ষার রেজাল্টে বা সুজিত চাকরি পেলে অরুণ খুশি হতে পারে না। একদিকে বন্ধুবান্ধব অন্যদিকে প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কের মধ্যেও বেড়ে চলে পারস্পরিক দূরত্ব। এখানেও ঘুরে ফিরে সেই নিরাপত্তার প্রশ্নই উঠে আসে। যেখানে প্রতিমুহূর্তে মনের মধ্যে জেগে থাকে হারানোর ভয়। যেহেতু অরুণ, বিরাম বা টিকলুরা কখনো বাড়ির মধ্যে নির্বাসিত কখনো বন্ধুদের থেকেও অনেক দূরে সরে যায় সেহেতু তাৎক্ষণিকতার বশে স্রেফ একটা আশ্রয় পেতেই তারা যেন প্রেমকে আঁকড়ে ধরতে চায়। ‘আমাদের সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই, কোন পারম্পর্য নেই। চোখের সামনে কিছু পড়ে থাকলে তখনই কুড়িয়ে নিতে হবে। তা না হলে এই তাড়াহুড়োর মধ্যে এই ভিড়ের মধ্যে সব হারিয়ে যাবে।’১ রুনু সম্পর্কে অরুণদের এই ভাবনা তাদের সম্পর্কের তাৎক্ষণিকতাকে প্রমাণ করে। সেজন্যই হয়তো দৈহিক সংসর্গ লাভের পর তাদের এই সম্পর্ক অবিশ্বাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। আবার এই তাৎক্ষণিকতা থেকেই



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

অভিভাবকদের অমতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিয়ে করা বিরাম ও নন্দিনীর পারস্পরিক বোঝাপড়া নষ্ট হয়ে যায় জীবন সংগ্রামের বাস্তবতায়, বেকার জীবনে রুজি রোজগারের চেষ্টায়। অন্যদিকে একই তাৎক্ষণিকতায় আবদ্ধ হয়ে উর্মীও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের কাছে নিজেকে ধরা দেয়। কিন্তু তাৎক্ষণিকতা তো কোন কিছুরই ভিত্তি হতে পারে না। ফলে অরুণ মাঝে মাঝে ভাবে ‘ধুত্তর, ওসব প্রেম-টেম করে লাভ নেই, বেফিকির ঝামেলা বাড়ানো।’[১] তাই শেষ পর্যন্ত অরুণ, উর্মি বা বিরামদের সম্পর্ক জোড়া লাগলেও, তা তালি দেওয়াই রয়ে যায়, পরিপূর্ণ হতে পারে না।

একদিকে প্রজন্মগত ব্যবধান অন্যদিকে নিজ প্রজন্মের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতা যেমন তরুণ প্রজন্মকে অতিষ্ঠ করে তোলে, তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের নিজেদের নিঃসঙ্গতা। তাই শেষ পর্যন্ত সবকিছু মেনে নিয়েই তাদের বাঁচতে হয়। প্রেম, পলিটিক্স, আড্ডা সবকিছুই শেষ পর্যন্ত সময় কাটানোর উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং শেষে হয়তো অরুণ, টিকলু বা উর্মীরা আবার সবকিছু ফিরে পায়, কিন্তু তা কি সত্যিই ফিরে পাওয়া? নাকি কেবল সময়কে ভরিয়ে রাখার তাগিদে শুধুই মেনে নেওয়া? যেহেতু মেনে নেওয়া তাই ‘এখনই’র টানাপোড়েনে নিঃসঙ্গতা যে আবার ফিরে আসবেনা কে বলতে পারে!

**‘পিকনিক’ উপন্যাসে নবীন প্রজন্ম :-**

“এখনই”র কিছুকাল পরেই রমাপদ চৌধুরী পিকনিক(১৯৭০) উপন্যাস লেখেন। এখানেও যুব সমাজের মনস্তত্ত্বকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হিসাবে মেয়েরা (“এখনই”তে সাধারণভাবে ছেলেরাই ছিল প্রধান চরিত্র) যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমন উপন্যাস দুটির মধ্যে যে কালগত ব্যবধান সেই অনুযায়ী সমাজে মেয়েদের অবস্থানের পরিবর্তনও উঠে এসেছে। এতদিন মেয়েরা যেহেতু ছিল ঘরে বন্দি স্বভাবতই পুরুষ বা নারী উভয়ই উভয়ের সান্নিধ্যে আসতে না পারায়, একজন সমবয়সী বা কাছাকাছি বয়সের নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেম বা বিবাহের সম্পর্ক বাদ দিয়েও যে অন্য কোন সম্পর্ক তথা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকতে পারে তা নারী পুরুষের ক্ষেত্রে তো বটেই, তাদের পরিবারের পক্ষেও মানা সম্ভব ছিল না। যার ফলে ঘরবন্দী নারী বাইরে আসায় তাকে পুরুষ কী চোখে দেখতে শুরু করল তার প্রমাণ রমাপদ চৌধুরীর অনেক উপন্যাসেই দেখা যায়। বয়সের স্বাভাবিকতা মেনে নিলেও দীর্ঘ একসময়ের পর কাছাকাছি আসা(সান্নিধ্য অর্থাৎ কলেজের ক্লাস ধরা যেতে পারে) একটি নারীকে দেখে একটি পুরুষ হয়ে উঠল অস্থির। যার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি শোনা যায়, ববির মুখে-‘আমাদের তখন আরেকটা মন ছিল,বয়সের মন। আমরা সবাই এক একটা শরীরকে ভালবাসতে চাইতাম। একটি শরীরকে ভালবাসতে পেতাম না বলে আমরা সকলের শরীরকে ভালবাসতাম।’ (একুশ, রমাপদ চৌধুরী) “এখনই” উপন্যাসের টিকলুর মধ্যেও যা দেখা যায়। এই অস্থিরতা কেটেছে ধীরে ধীরে। একজন নারী যে পুরুষের শুধু বন্ধু হতে পারে তার প্রমাণ সময়ের অগ্রগতিতেই

স্পষ্ট হয়েছে। “এখনই” থেকে “পিকনিক”এ এসে লেখক সমাজ পরিবর্তনের এই দিকটি যুক্ত করেছেন।

উপন্যাসে এই পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে যুবসমাজের অন্তর্দহনের চিত্র উঠে এসেছে। তবে তা উপস্থাপিত হয়েছে ভিন্নভাবে। যে প্রজন্মগত ব্যবধানের কথা আলোচনা করা হয়েছে, এই ব্যবধানই উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্রের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের অনেকটাই কারণ হয়ে উঠেছে। যেহেতু পরিবার তখন ছেলেমেয়েদের মেলামেশা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি ফলে এই দূরত্ব প্রতিনিয়তই বাড়তে লক্ষ্য করা যায়। যার জন্য পরিবারের এই ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পেতেই তারা মিথ্যা বলেও পিকনিকের জন্য বেরিয়ে পড়ে। ইতুর কাছে, ‘পিকনিকটা পিকনিক নয়, ছোট্ট একটা বিদ্রোহ। বাড়ির বিরুদ্ধে, পাড়াপড়শির বিরুদ্ধে।’[২] আবার রাখী, তার পিসি সম্পর্কে ভাবে-‘কি, না কলেজের ছেলেদের সঙ্গে মেশে। কে মেশেনা। পিসি সেই নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতেই পড়ে আছে।’[২] আর একই কারণে নন্দিতা ভাবে-‘দাদা তো নয় যেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।’[২] সুতরাং প্রজন্মগত ব্যবধানই তাদের বাধ্য করে পরিবারের বিরুদ্ধে যেতে। যার জন্য মিথ্যা বলে তারা বেরিয়ে পড়ে পুরোপুরিভাবে না জানা (নন্দিতার কাছে অজানাও বটে) তিন যুবকের সঙ্গে। আগত কোন ক্ষতির সম্ভাবনা মাথায় না এনেই তাৎক্ষণিক এই সিদ্ধান্তই পরবর্তীকালে তাদের নিষ্ক্রিয় ও সিদ্ধান্তহীন করে তোলে। ফলে খন্ড কিছুকে পাওয়ার জন্য “এখনই”র টানাপোড়েন ও পরিবারের সঙ্গে ব্যবধানে বিপর্যস্ত বিচ্ছিন্ন যুবসমাজের চিত্র এই উপন্যাসেও উঠে এসেছে।

প্রজন্মগত ব্যবধানের পাশাপাশি এই উপন্যাসেও যুবসমাজ কিভাবে নিজেদের প্রজন্মের সঙ্গে ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেটিও উঠে এসেছে। নিজ প্রজন্মের সঙ্গে ব্যবধান, “এখনই” উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসের কারণ হয়ে উঠেনি। এখানে সমস্যাটা কিছুটা অন্য। প্রথমে লেখক নবীন প্রজন্মের খন্ড কিছুকে আঁকড়ে ধরার কিছু ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। দেখা যায়, পিকনিকে এসে তিনজন যুবক যুবতীর কাছাকাছি চলে আসাটা নিতান্তই তাৎক্ষণিক। কেননা রোজগার একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পেয়ে একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে প্রত্যেকেরই খুব ভালো লাগে। স্বভাবত মুখচোরা মেয়ে নন্দিতারও খানিকটা স্মার্ট হয়ে উঠতে ইচ্ছা করে। সোমনাথের সে কাছাকাছিও চলে আসে। কিন্তু নন্দিতা ভালো করেই জানে, ‘আজকের এই সময়টুকুই সত্যি, আজকের এই মুহূর্তের ভালোলাগা...ছেলেদের ও চেনে। ওদের যে যাবার জায়গা অনেক। প্রেম ওদের কাছে একটা স্টেশন। এই সোমনাথই, কলকাতায় ফিরেই সব ভুলে যাবে।’[২] তাই সোমনাথের ওকে ভালো লেগেছে বুঝতে পেরেও নন্দিতা উৎসাহ পায় না। সে কিছু আশা করে না। সেই সময়টাকেই (খণ্ড সময়কে) উপভোগ করে। আবার অতীশ আর ইতু প্রেমের অভিনয় করতে করতেই একসময় পরস্পরের কাছাকাছি এসে যায়। নৌকায় ঘুরতে ঘুরতে অতীশ এক সময় বলেই ফেলে তার ইতুকে ভালোবাসার কথা। (এই সিদ্ধান্তও





তাৎক্ষণিকতার উপর দাঁড়িয়ে) কিন্তু ইতুর কাছে কেবল বর্তমান মুহূর্তটাই সত্য আর তাই হয়তো শরীরী ঘনিষ্ঠতাতেও তার আপত্তি নেই। অতীশের কথায় সে বলে ওঠে-‘সব মুহূর্তগুলো মিলিয়ে তবে তো চিরকাল। আমি সবগুলো কুড়িয়ে রাখতে ভালোবাসি।’[২] অন্যদিকে সারা দিনের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন দীপককে সান্তনা দিতেই যেন রাখি ব্রিজের ছায়া মাখা বালির পাড়ে ঘনিষ্ট হয়। সুতারাং পিকনিকটা যেমন স্থায়ী নয় তেমন তা কেবল উপভোগ করতেই এই তিনটি সম্পর্ক তৈরি হয়। খন্ড কিছুকে পাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ায় তিনটি সম্পর্কই প্রথম থেকেই আলগা আর এর মধ্যেই আসন্ন ক্ষয়ের বীজ লুকিয়ে থাকে। তাই প্রয়োজনের তাগিদ মিটতেই এই ক্ষয় দেখা যায়। যে জন্য পিকনিক থেকে ফেরার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব ঠিক থাকলেও-’গাড়ির চাবি ঘোরালে যখন হঠাৎ কি কারণে স্টার্ট নেয় না তখন সব ওলটপালট হয়ে যায়। মুহূর্তে উভে যায় প্রেম ভালোবাসা, অহংকার ও সাফল্যের হাসি।’[২] খন্ডকে পাওয়ার জন্য তৈরি হওয়া সম্পর্ক গুলোও ওলটপালট হয়ে যায়। তখন পূর্ণতাকে (সেই মুহূর্তে পূর্ণতা তাদের কাছে তাদের বাড়ি ) তারা মুহূর্তে পেতে চায়। মুহূর্তের এই টানাপোড়নেই ছয়টি প্রাণী কখন যেন দুটি দল হয়ে যায়। বাড়ি ফেরার কোন উপায় তারা না করতে পেরে সার্কিট হাউসে পৌঁছেও একই ধরনের আচরণ করে। সুতরাং সেই মুহূর্তে কি ঘটে চলেছে তাতে তারা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে সেটাকেই তারা সত্যি মনে করে। কোন প্রতিশ্রুতিতে তারা বাধা পড়ে না। “এখনই”র এই টানাপোড়েনে তারা বিচ্ছিন্নই রয়ে যায়। ফেরার পথে ইতু হঠাৎ আবিষ্কার করে তারা সবাই কেমন আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। তাড়াহুড়োতে কখন অতীশ ও সোমনাথ দীপকের পাশে গিয়ে বসেছে। পিছনে ইতু, রাখি, নন্দিতা।

সুতরাং দুটি উপন্যাসেই লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে তরুণ প্রজন্ম খন্ড কিছুকে পাওয়ার জন্য নেশায় মত্ত হয়ে তাকেই পূর্ণ বলে মনে করে। আর যার ফলেই তৈরি হয় বিচ্ছিন্নতা। যে বিচ্ছিন্নতা পরিবার, বন্ধু শেষে নিজের মধ্যেই স্থান লাভ করে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাই তো জীবন নয়,তা থেকে বেরিয়ে আসাই জীবন পথে চলা। তবে তা থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল যে নবীন প্রজন্মের আয়ত্ত নয়! ফলে ভবিষ্যতের আশায় থেকে বর্তমানকে তাদের মেনে নিতে হয়। এই মেনে নেওয়াই রমাপদ চৌধুরীর মতে আজকের যুগের আসল ট্রাজেডি হলেও, নবীন প্রজন্মকে কিছু একটা হওয়ার আশা নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। যে জন্য তার উপন্যাসে নবীন প্রজন্ম শেষ পর্যন্ত ভাবে যে-‘আমাদের কোথাও যাওয়ার নেই।...আমাদের কোথাও পৌঁছতে হবে না। না, প্রেমও না। আমাদের শেষ অব্দি সেই ফিরে যেতে হয়-স্মৃতির মধ্যে-ছোট ছোট কয়েকটি স্মৃতির মধ্যে। আমাদের কোথাও যাওয়া হয় না।’[২]

**‘যে যেখানে দাঁড়িয়ে’ উপন্যাসে তরুণ প্রজন্ম :-**

এই পর্বে রমাপদ চৌধুরী আরেকটি উপন্যাস “যে যেখানে দাঁড়িয়ে”। পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসের মতো এখানে প্রজন্ম গত ব্যবধানের ফলে পারস্পরিক টানাপোড়নের ছবি উঠে আসেনি। বরং এই উপন্যাসে নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে দুটি সম্পর্কের পারস্পরিক বিভ্রান্তির ছবি আমরা দেখতে পাই। রমাপদর গল্প উপন্যাসে প্রেম প্রসঙ্গটি হয় নস্টালজিয়া আক্রান্ত নয়তো বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থা তথা মধ্যবিত্ত নীতিবোধের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, যা এই উপন্যাসেও দেখা যায়। উপন্যাসের পটভূমি রমাপদর অতি প্রিয় ছোটনাগপুর খনি অঞ্চল। দীর্ঘকুড়ি বছর পর যেখানে এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা অনুপমা আর অঞ্জলির দেখা হয়ে যায়। তারপর নিজেদের অজান্তেই তারা পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে পড়ে। আসলে অনুপম আর অঞ্জলি দুজনেই সেই জীবনকে ফিরে পেতে চায় যে জীবন তারা কখনো পায়নি। -‘প্রেম,ব্যর্থ প্রেমে যা আরও গভীর হয়ে ওঠে সেই প্রেমও যেমন সত্য, তেমনি তা ভেঙ্গে যায় বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে। বাস্তবও সমান সত্য। নিরাপত্তা না থাকলে প্রেম নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না।’[৩] -যা তাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তাই যৌবনে এই না পাওয়া প্রেমই তারা পেতে আকুল হয়ে ওঠে। আর রমাপদর গল্প উপন্যাসে যেহেতু পুরুষ শরীরি ভাবে পেতে চায় একটি নারীকে,তাই তাদের মধ্যে দৈহিক সংসর্গও ঘটে যায়। কিন্তু পিকনিকের মত এখানেও শরীর প্রাপ্তির পর মুহূর্ত থেকেই আরম্ভ হয় ক্ষয়। যেহেতু অনুপম শরীরকে স্বীকৃতি হিসেবে মনে করে,তাই শরীরকে সে পেতে চায় “এখনই” অর্থাৎ মুহূর্তে। কিন্তু তাৎক্ষণিকতা তো সম্পর্কের ভিত্তি হয়না কখনো। তাই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তই তাদের মধ্যে দূরত্ব রচনা করে। হঠাৎ করে অঞ্জলি স্বামী চাকরি হারালে অঞ্জলীর উপলব্ধি হয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গ, যা তার মনে মধ্যবিত্ত নীতিবোধের জন্ম দিতে সাহায্য করে। আর এই মধ্যবিত্ত নীতিবোধের জন্যই উপন্যাসের আরেকটি প্রেমের সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। উপন্যাসে অঞ্জলি অনুপমের সম্পর্কে বিপ্রতীপে দেখানো হয়েছে বাপ্পা-ঝুমঝুমের সম্পর্ক। যেখানে ঝুমঝুমের চরিত্রের সহজ আন্তরিকতা একদিকে যেমন তাকে সকলের প্রিয় করে তুলেছে তেমনি কাছাকাছি বয়সি হওয়ার ফলে বাপ্পার সঙ্গে অচিরেই তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। টেবিল টেনিস খেলা শেখা, ক্যামেরা নিয়ে এলোমেলো ছবি তোলা প্রভৃতির সূত্র ধরে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। আর এভাবেই পূর্ববর্তী উপন্যাস দুটির সঙ্গে সংগতি রেখে কথক আরেকবার ছুয়ে গেছেন বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বদলে যাওয়া সম্পর্কের প্রসঙ্গটিকে। অঞ্জলি আর অনুপম যেখানে কোনদিন পরস্পর একটা কথাও বলেনি, ঝুমঝুম সেখানে খুব সহজেই অভিভাবকদের সামনে দিয়ে বাপ্পাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়,বাপ্পার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। শরীর নিয়ে অহেতুক সংকোচ না থাকায় শরীরি সান্নিধ্যও কোনোভাবে তাদের মধ্যে ভালোবাসার অন্তরায় হয় না। কিন্তু এই প্রজন্মের ভালোবাসাকেও কোন না কোনভাবে বাস্তবকে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

মানতেই হয়। তাই রণেনের অসুস্থতা একদিকে যেমন তাদের পরস্পরের কাছাকাছি এনে দেয় তেমনি অঞ্জলির বদলে যাওয়া মানসিকতা তাদের সম্পর্ককে পুরোপুরি গড়ে ওঠার আগেই ভেঙে দেয়। যে মানসিকতা বদলানোর পিছনে দায়ী অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। তাই যে নিরাপত্তার অভাবে যৌবনে অঞ্জলি অনুপমের সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, একই কারণে তা বাপ্পা ঝুমঝুমের সম্পর্কেও বাধা সৃষ্টি করে। তবে এই নিরাপত্তার উপলব্ধি তথা মধ্যবিত্ত নীতিবোধ হয়তো গড়ে উঠত না, যদি না তাৎক্ষণিকতায় আবদ্ধ হয়ে অঞ্জলি অনুপম পরস্পর মিলিত হতো। অর্থাৎ এই উপন্যাসেও সম্পর্কের বিভ্রান্তির পিছনে তাৎক্ষণিকতা তথা ”এখনই”র টানাপোড়েনই দায়ী।

আলোচিত তিনটি উপন্যাসেই এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে তাৎক্ষণিকতায় আবদ্ধ হয়ে কিভাবে যুবসমাজ সার্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন তথা বিভ্রান্ত। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই বিভ্রান্তি তথা বিচ্ছিন্নতাই কি রমাপদ চৌধুরীর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের শেষ কথা। অর্থাৎ নংর্থকতা নিয়েই কি তার এই পর্বের উপন্যাসের পরিসমাপ্তি? উত্তরে লেখকের অন্য প্রসঙ্গে বলা একটি কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। যেখানে লেখক বলেছেন-‘আসলে আত্মদর্শন একজন মানুষকে তার ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা বা অসহায়তা থেকে বেরিয়ে আসতে পথ দেখায়। তবে মানুষের ভালো করার কোন শর্ত নিয়ে আমরা সাহিত্য করি না। শিল্পকর্মটাই প্রধান। সাহিত্য আসলে লেখকের আত্ম দর্শন ও সমাজ দর্শন। উৎকর্ষতায় প্রথম ও শেষ বিচার তার লেখা শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা। কারণ সমাজ বদলায় সাহিত্য চিরস্থায়ী।’[৪] এখানেও এ কথাটি খাটে যে নবীন প্রজন্মের ভালো করা জন্য তো আর তিনি তাঁর উপন্যাস গুলি লেখেননি। সত্য, সেটি যদি নংর্থককও হয় তা প্রকাশ করাতেই আসল সাহিত্য। সেই নংর্থকতার পাঠ নিয়ে তা থেকে উত্তোরণে সদর্থকতার পথে উত্তীর্ণ হওয়ার দায় পাঠক তথা নবীন প্রজন্মেরই। সুতরাং নংর্থকতাগুলি কে চিহ্নিত করে লেখক এই উপন্যাসগুলিতে দেশ কাল সম্পর্কিত যে মৌলিক প্রশ্নগুলি করেছেন তার জবাব দেওয়ার দায়বদ্ধতা লেখকের নয়, পাঠকের। এই প্রশ্নটি বাদ দিয়ে আরেকটি প্রশ্ন যা তার এই পর্বের উপন্যাস গুলি সম্পর্কে উঠতে দেখা যায় তা হল- এই উপন্যাস গুলিতে আসলে কি প্রেম নাকি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে? উত্তরে বলা যায় যে প্রেম রমাপদর কাছে সব অর্থেই একটি রোমান্টিক অনুভূতি। তা সব সময় একান্ত পবিত্র, ব্যক্তিগত। তাই যথার্থ ভালোবাসার কাহিনীই তিনি বুনন করতে চেয়েছেন। দেখা যায় যে, শারীরিক নৈকট্য অনেক সময় মানসিক ব্যবধান কে সুদূর করে তোলে। আবার কেউ কেউ এক অব্যক্ত প্রেমের স্মৃতি বুকে নিয়েই কাটিয়ে দেয় বছরের পর বছর। প্রেমের রোমান্টিক ভাবনায় বিশ্বাসী বলেই হয়তো রমাপদর রচনায় প্রেম কে বারবার পরীক্ষা দিতে হয়। বাস্তবের

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে হয়। এইজন্যই কখনো নবীন প্রজন্মের বিচ্ছিন্নতা, ‘এখনই’র টানাপোড়েন,কখনো সংকটকালে প্রেম রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে নতুনতর তাৎপর্যে ধরা দিয়ে উপন্যাস গুলিকে চির সাহিত্যের মর্যাদা দান করেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. রমাপদ চৌধুরী,“এখনই” উপন্যাস,“উপন্যাস সমগ্র”-৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮,পৃষ্ঠা:৪৬৯,৩৬,৯,৭৪,৩৪,৪২
২. রমাপদ চৌধুরী,“পিকনিক” উপন্যাস,“উপন্যাস সমগ্র”-২, আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা, ১৯৭০,পৃষ্ঠা:২৪৯,২৫৪,২৪৭,২৭০,২৮২,৪৬১,৩১৬
৩. রমাপদ চৌধুরী,“যে যেখানে দাঁড়িয়ে” উপন্যাস,“উপন্যাস সমগ্র”-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৯৭৩,পৃষ্ঠা:৪৩৭
৪. রমাপদ চৌধুরী,“গদ্য সমগ্র”, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৩৫



# মৃত্যুর রূপ ও স্বরূপ এবং বিমল করের উপন্যাস

**শুভাশিস দাস**

মৃত্যুর রূপ ও স্বরূপ এবং বিমল করের উপন্যাস জীবন একটা জ্যামিতিক বৃত্তের মত। সেই বৃত্ত চক্রাকারে শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে জীবাত্মা তার পরিক্রমণ শেষ করে আবার শূন্যে মেশে। এই মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা বহুকাল ধরে চলে আসছে। মেলেনি উত্তর। মৃত্যু কী, কী বা তার রূপ আর স্বরূপ- এই উত্তর জানার চেষ্টা করছি। বেদ-পুরাণ-উপনিষদের একটির পর একটি গ্রন্থ পড়তে পড়তে খুঁজে পাই মৃত্যু সম্পর্কিত অজস্র আলোচনা।

আর্য সভ্যতার পূর্বে অনার্য জাতির প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাই। যেমন—E.B.Tayler এর ‘Primitive Culture’, J. ও. Frazer এর ‘The belief immortality and the worship of the Dead’ প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি—মৃত্যু সম্পর্কে প্রাক-বৈদিক যুগের ভারতীয় ধারণার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের ধারণা হুবহু একই রকম ছিল।

বৈদিক যুগেও মৃত্যু সম্পর্কিত নানা তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। মৃত্যু কেবল একটি দেহের নাশ। এই ধারণা থেকেই সে সময় মৃত দেহকে দাহ করা হত। এমনকি অস্থি সঞ্চয় করে তাকে সমাধিস্থ করা হত। তারা মনে করতো আত্মা জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করার মত জীর্ণ শরীরকে পরিত্যাগ করে মাত্র। এই ধারণা আজও চলে আসছে। অর্থাৎ মৃত্যু সীমাহীন জীবন-চক্রের শুধু একটা বিশেষ স্তর যার কোনো শেষ নেই।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে মৃত্যুকে দেবতা রূপে দেখানো হয়েছে। এখানে মৃত্যু লোকের রাজা যমের কথা বলা আছে। এছাড়া পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই দুটি সূক্তে মৃত্যুর কথা ও মৃতদেহ সৎকারের নানা উপায়ের কথা বলা আছে। তবে আত্মা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণার কথা আমরা চতুর্দশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ সূক্তের মাধ্যমে জানতে পারি। এই সকল সূক্তগুলিতে আত্মা সম্পর্কে একটি কথা স্পষ্ট উঠে আসে—আত্মা অজেয়, অমর। শুধুমাত্র কর্মফলের উপর নির্ভর করে পরলোক, ভূলোক, এমন কি পুনর্জন্ম লাভ হয়ে থাকে তার। সর্বত্র তার যাতায়াত। ঋষিকবিরা বৈদিক যুগে প্রচার করেছেন আত্মার অবিনশ্বরতার তথ্য।

ঋগ্বেদের সময় থেকেই মৃতদেহ দাহ করার কথা জেনেছি। শরীর দহনের পর আত্মার উদ্বায়ী হওয়ার কথা মেলে। মনে হয় দহনের পর আত্মা শোধনের মধ্যে দিয়ে পরলোকে যায়। গ্রন্থের ১৮শ কাণ্ডের ৩য় অনুবাদের ৭ম সূক্তে বলা আছে—

হে জাতবেদা অগ্নি, এ মৃত্যুকে দগ্ধ করতে আরম্ভ কর, তোমার জ্বালাযুক্ত রসহরণশীল

দহন সামর্থ্যহোক। এ মৃতের শরীর সম্যক ভস্মীভূত কর, তারপর এ পুরুষকে সুকৃত লোকে অর্থাৎ পুণ্যবানদের নিবাসস্থল স্বর্গলোকে স্থাপন কর। (১)

এই মৃত্যুর পর মৃতদেহ কে সৎকার করার বিষয়টি বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা বিভিন্ন ভাবে করে আসছে পঞ্চভূতে লীন করে দেওয়ার জন্য। তাঁদের ধারণা কর্ম অনুযায়ী আত্মা জীবনচক্রের স্তরকে পরিক্রমণ করে চলে শুধু। তার যাত্রা নিরন্তর। আর এই স্তর পরিক্রমণের পরিণামই আমার মনে হয় মৃত্যু।

আবার বেদের উত্তরকালে উপনিষদেও পেয়েছি মৃত্যু সম্পর্কিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। কঠোপনিষদে সকল জীবিতের প্রতিনিধি হয়ে নচিকেতা মৃত্যু সম্পর্কে যমকে নানা প্রশ্ন করেছেন। মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের মনের নানা সংশয়ের সন্ধান মেলে তাঁর কথায়। মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের কথা তিনি জানতে চেয়েছেন যমরাজের কাছে। যমের মতে আত্মাতত্ত্ব সূক্ষ্ম এবং দুজ্ঞেয়। আমাদের দেহে স্বামী রূপে তার অবস্থান। সে দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে তার কিছু অবশিষ্ট থাকে না, এই অবস্থাকেই আমারা মৃত্যু বলি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ গ্রন্থে মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে - সৃষ্টির পূর্বেই মৃত্যুর সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং বেদ ও উপনিষদের সর্বত্র একটা কথা স্পষ্ট ঋষি-কবিদের কাছে মৃত্যু শেষ সত্য নয়, আত্মার অবস্থান্তর মাত্র। আমরাই কেবল তাকে বিচ্ছিন্ন রূপে দেখি। তাঁরা মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন বলেই তাঁদের কাছে পুনর্জন্মের তত্ত্বটি আরো দৃঢ় হয়েছে বলে মনে হয়।

আবার 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন জন্ম-মৃত্যু,সৃষ্টি-ধ্বংস তাঁরই লীলা মাত্র। আর মৃত্যু যেন তাঁরই লীলার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পুনরায় নতুন রূপে আসার বড় মাধ্যম। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরে , আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নাবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যান্যানি সংযতি নবানি দেহী। (২)

খ্রিস্টধর্ম মতেও মৃত্যু প্রায় অনুরূপ। Samuele Bacchiocchi তাঁর গ্রন্থে মৃত্যু সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন— মৃত্যু যেন দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ। দেহের মৃত্যুর সময় আত্মা বেঁচে থাকে। এই বিশ্বাসকে বিভিন্ন উপায় প্রকাশ করা যায়। যা থেকে মৃতদের জন্য প্রার্থনা, পবিত্রতা এমনকি পরকালে চিরশান্তি ইত্যাদি মতবাদের জন্ম নেয়। তাঁর গ্রন্থে আছে---

In the history of Christianity, death has been defined generally as the survival of the immortal soul from the mortal body. This





belief in the survival of the soul at the death of the body has been expressed in various ways and given rise to such corollary doctrines as prayer for the dead, indulgences, purgatory, intercession of the saints, the eternal formant of hell, etc. (৩)

অর্থাৎ মৃত্যু হল আমাদের নশ্বর দেহের সঙ্গে অবিনশ্বর আত্মার কেবল বিচ্ছেদ। সাহিত্যিক বিমল করের উপন্যাসে এই মৃত্যুর পথান্বেষণ করতে গিয়ে তাঁর লেখার ভিতর থেকে যে মৃত্যু চেতনার পরিচয় পেয়েছি, আমার মনে হয় পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা উপন্যাস বা গল্প নিয়ে লিখেছেন তাঁরা এর দ্বারা অনেকখানি আলোকিত বা প্রভাবিত হয়েছেন।

তাঁর রচিত তিন পর্বে সম্পূর্ণ বিশাল উপন্যাস 'দেওয়াল'-এর প্রথম পর্ব হল "ছোট ঘর"। এই উপন্যাসের চিত্রপট ১৯৪১-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস। উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়েছে চন্দ্রকান্তের মৃত্যু। অগাধ পান্ডিত্য ও সততার প্রতীক চন্দ্রকান্ত জীবনের শেষ দিনগুলি গ্রামের ছাত্র পড়িয়ে, পুথি পড়ে দিন যাপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রী রত্নময়ী ভাই মোহিতের জোরাজুরিতে অবশেষে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে কলকাতায় আসতে হয়েছে। প্রথম দিকে অবস্থা পরিবর্তন হতে শুরু করলেও দু'দিনের সুখ, তারপর টাইফয়েডের ধাক্কায় ২২ দিন লড়াই করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কলকাতা শহরের জন কোলাহলের মধ্যে ছেড়ে বিদায় নিলেন। তাঁর মৃত্যু উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের অভিমুখ বদলে দিয়েছে। এরপরই এসেছে আসল লড়াই চালিয়ে টিকে থাকার অদম্য চেষ্টা ও বাস্তবতার চিত্র। কন্যা সুধা যেন পুত্রের ভূমিকা নেয়। এক গ্রাম্য স্কুল মাস্টারের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বাস্তবতার সম্মুখে পড়ে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে (ছোটমন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) চন্দ্রকান্তের মৃত্যু যে পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করেছে তার দৃষ্টান্ত পাই উপন্যাসে।

বাবা মারা গেলেন। সব শান্ত সুন্দর দিনও শেষ হল। তারপরই যে এ বাড়িতে মায়েতে মেয়েতে, ভাইবোনে ঝগড়াঝাটি লাঠালাঠি বেঁধে গেছে তা নয়। অনেক দিন পর্যন্ত আগের জের বয়ে আসছিল। তাই মনে হত। কিন্তু আসলে তা নয়, একটু একটু করে বদলাচ্ছিল। যেন আগের স্রোতের সেই জল ঘাট থেকে ঘাটে যেত রঙ বদলে ঘোলা হয়ে আসছিল।

উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব "খোলা জানলা" (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)তে পাই মৃত্যুর ঘটনা। সেখানে অবনী নামক একটি ছেলের পরিচয় পাই যে সৎ এবং পরিশ্রমী। গিরিজাপতিদের প্রেসে কাজ করে সে। তার পারিবারিক ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়- একটা মৃত্যু কীভাবে সবকিছুকে উলট পালট করে দেয়। একটা সাজানো বাগানকে একলহমায় জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। গিরিজাপতির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে দুঃখের কথা প্রসঙ্গে অবনীর স্বীকারোক্তি—

"আমার বাবা থিয়েটারে বাঁশি বাজাতেন। কি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ার পর

আত্মহত্যা করেছিলেন। আমার মাকে দেখেছি নানারকম অসুখে ভুগত, শেষে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল। মাঝেমাঝেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরত, এঁটো কাঁটা কুড়িয়ে খেত, যার সামনে হাত পেতে ভিক্ষে চাইত।"

তাহলে একটা মৃত্যু শুধু একটা সংসারকে বিধ্বস্ত করে না, পরিবারের সকল মানুষের অন্তরকেও পরিবর্তিত করে। অবনীর বাবার অকাল প্রয়াণ তাঁর মাকে শুধু নিঃসঙ্গী করেই ক্ষান্ত থাকেনি তাকে পাগল বানিয়ে পথের ভিখারি করেছে।

তাঁর 'খড়কুটো' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে দেখি সুখতারার মৃত্যু তাঁর মেয়ে ভ্রমরের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। সারাটা সময় রোগে ভুগে ভুগে সারা হওয়া মহিলা হঠাৎ একদিন পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেওয়ায় ভ্রমরের জীবনকেও মৃত্যুমুখী করেছে। মার মৃত্যুর পর পিতা আনন্দমোহন বিয়ে করে এনেছিল কৃষ্ণা নাম্নী কন্যাসন্তান সহ হিমানীকে। কিন্তু সৎ মা কোনোদিনই ভ্রমরকে মূল্য দেয়নি। তাই ভ্রমরও নিয়তির শিকার অবহেলার শিকার। তার অসুখের কথা শোনার কেউ নেই। তাই অমলকে সে মৃত্যুর যন্ত্রণা প্রসঙ্গে বারবার দৃষ্টান্ত দিয়েছে যীশুর প্রসঙ্গ—

'যীশু নিজের জন্য কিছু চাননি, সকলকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তবু কষ্ট দিয়ে মানুষ তাঁকে মেরেছিল।'

লেখকের অপর উপন্যাসে 'পূর্ণ অপূর্ণ' (১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) সম্পর্কে সাহিত্যিক বিমল কর নিজেই আত্মজবানীতে বলেছেন যে, দীর্ঘকাল ধরে 'মৃত্যু এবং জীবনের স্থায়িত্বের তুচ্ছতা' তাকে পীড়িত করে তুলত। (৪) উপন্যাসের নায়ক সুরেশ্বর কর্মময় জীবনকে খুব পছন্দ করে। অর্থাৎ কর্মের মধ্যেই সে যেন খুঁজে পায় পরম তৃপ্তি। তাতে তাকে অনেকে স্বার্থপর বলে মনে করে। তবে সকলের অপবাদে সুরেশ্বরের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। নিজেকে সে বেশি ভালোবাসে বলেই সর্বদা কর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে আত্মসুখের লক্ষ্যে। হৈমন্তীও পর্যন্ত তাকে স্বার্থপর বলতে ছাড়েনি। অকস্মাৎ নির্মলার মৃত্যু সুরেশ্বরকে সমূলে বদলে দিয়েছে। একদিকে প্রতিদিনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেলেও অপরদিকে নতুন এক ভাবনায় নিজেকে ব্রতী করেছে সে। অন্ধ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, আর্ত মানুষদের দুচোখে স্বপ্নপূরণের কর্ম সাধন করে, নির্বাপিত প্রদীপের শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করার প্রয়াস-ই যেন সুরেশ্বরের পরিবর্তন মহারাজ রূপে। হৈমন্তী জীবনের মূল্য হিসেবে সুরেশকে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিতে চাইলেও সুরেশের দৃষ্টি মহাশূন্যে। সে বুঝতে শিখেছে—

"এই মুহূর্তের সুখ পরমুহূর্তে বিষাদ হয়ে যেতে পারে। শৃঙ্খলাহীন, যুক্তিহীন, স্বৈরাচারী নির্মম কি যেন এক আছে। তার কাছে জীবনের সমস্ত কিছুই যেন অকস্মিক, অর্থহীন।

অপরদিকে উপন্যাসে হীরালালের মৃত্যু তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মৃত্যু অবনীকে ভয়ার্ত করে তুলেছে। অবনীর মনে হয়েছে হীরালালের মৃত্যু যেন দৈব্যনির্ভর, দুর্ভাগ্যজনক।"

তাঁর 'যদুবংশ' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের একটি চরণ বারবার স্মৃতিপটে ভেসে আসে—



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

"চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বসে
কেবলই পড়িতে আছে;"

(জীবনানন্দ 'অমিষাশী তরবার") (৫)

মহাভারতের শেষ পর্যায়ের বেশ কিছু ঘটনা এই উপন্যাসের উপস্থাপিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে যদুবংশের ধ্বংস যেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, উপন্যাসে তেমনি আমরা পাই গণনাথকে। একদিকে তাঁর চরিত্রহীনতার কলঙ্ক, অপরদিকে মিথ্যে প্রদীপ চুরির অপবাদ দুই-এর সমন্বয়ে গণনাথ আফিং খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁছে নিয়েছে। গণনাথের মৃত্যু সূর্য সহ সকলের অন্তরকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। ড. অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে এই উপন্যাসের প্রসঙ্গে বলেছেন—

"গণনাথ আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করল- হার মেনে নিল "not with a bang but whimper"। "বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল?" তাই কি গণনাথের আত্মহত্যা। ... কিন্তু আসলে মনে হয়, নিজের উপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই গণনাথের এই আত্মহত্যা।"(৬)

তাঁর 'দ্বীপ' (১৯৭৭) নামক হ্রস্বায়তন উপন্যাসটিতে বসুধা চরিত্রটি উপন্যাসের অভিমুখ বদলে সহায়ক। তাঁর মৃত্যু জীবনের অন্তিম পরিণতি সূচিত করে। উপন্যাসের পরিণতি মর্মান্তিক ও ভয়ার্ত। পিতা-মাতার মৃত্যু বসুধাকে শুধু নিঃসঙ্গই করেনি, পড়াশোনা-র সমাপ্তি, হাড়ভাঙা খাটুনির চাকুরি-ও রোগাক্রান্ত করে তুলেছে তাকে। এর ফলে জীবন থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পিছুপা হয়নি সে। অপর দিকে দেখি নীপার জীবনেও ঘটে গেল বিরাট পরিবর্তন। মথুরা থেকে মায়ের নামে একটি পার্সেল এসেছিল। তা অজান্তে কৌতূহল বশতঃ খুলতেই নীপা তাতে কিছু ব্যবহার সামগ্রী ও একটি ডায়েরী দেখে। গোপনে তা পাঠ করে সে জানতে পারে তাঁর পিতা আর বেঁচে নেই। আর যাকে সে মা বলে জেনে এসেছে সে নীপার বাবার বউদি। তৎক্ষণাৎ নীপার জীবন বদলে যায়। নিজের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞায় নিজেকে শেষ করে দিতে চায় সে। আবার বছর তিরিশের অলকার পরিণতিও ব্যঞ্জনাময়। যে জীবন ছিল তার সর্বদা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় অকালে স্বামী অসুখে মারা যাওয়ায় অলকা পুরোপুরি পাগলের মত হয়ে উঠলো।

অপর 'হৃদয়তল' (১৩৮১ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে হার না মানা এক মেয়ে লতিকার কাহিনি। পরিবারের প্রিয় জনের মৃত্যুও তাকে পরাজিত করতে পারেনি। তাঁর জীবন ছিল কঠোর সংগ্রামের। এক সময় মা-বাবা-ভাই-বোন উভয়ের মিলিত সুখের সংসার ছিল তাঁদের। কিন্তু পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংসারে বা তার জীবনে নেমে এল কালো মেঘের প্রলেপ। একলহমায় সব চুরমার হয়ে গেল। এরপর থেকে তার লড়াই শুরু নিজের সঙ্গে এবং অভাবের সঙ্গে। একদিকে ভাই-এর খুন, অপরদিকে বাবা উন্মাদ হয়ে

কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু—লতিকাকে সুখের সংসার থেকে নামিয়ে আনল রাস্তায়। শুধু টাইপ আর টিউশন করে রুগ্ন মাকে নিয়ে পেট চালাতে তাকে যে পরিশ্রম করতে দেখি তাতে এটুকু পরিষ্কার লতিকার মত মেয়েরা হার মানতে শেখে না।

আরেক উপন্যাস 'বেদনা পর্ব' (১৩৮১ বঙ্গাব্দ)-তে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত একটি মানুষের হঠাৎ মৃত্যু আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেছে কাহিনিকে তথা কাহিনির গতিময়তাকে। শচীনবাবুর মৃত্যু উপন্যাসে বাঁক বদলে সক্ষম। বসুধার জন্মদিনের দিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বসুধার বাবার বন্ধু সাধন কাকার মেয়ে রানু তাঁর শচীন মামার হাত দিয়ে একটি প্যাকেট ও একটি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল বসুধার জন্য। পথে হার্টঅ্যাটাক হওয়ায় তিনি তার কৃতকর্ম সম্পন্ন করতে না পারলেও প্যাকেটের ওপরে বসুধার নাম লেখা থাকায় ভদ্রলোকের আকস্মিক মৃত্যুতে বসুধা জড়িয়ে পরেছে। বিমল করের উপন্যাসে মৃত্যু যেন এক নতুন মঞ্চ হয়ে নায়ক-নায়িকার গতিপ্রকৃতি তথা ঘটনার অভিমুখ পরিবর্তিত করেছে নতুন আঙ্গিকে। এখানেই বিমল করের স্বাতন্ত্র্য।

জীবন মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন ধারা এই বিশ্বের এক অনন্ত প্রবাহ। তাই মৃত্যুকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিক বিমল করও মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারেননি অথবা অস্বীকার করার প্রচেষ্টাও দেখা যায় না তাঁর উপন্যাসে। পাশাপাশি সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা তাঁদের উপন্যাসে এই মৃত্যুবোধকে আরও ব্যঞ্জনাময় করেছেন আপন কলমের পরিসরে।

**তথ্যসূত্র :**

১. প্রশান্ত প্রামাণিক, মৃত্যু : দর্শন ও বিজ্ঞান, জ্ঞান-বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, কলকাতা ২০০০, পৃ-২২

২. স্বামী জগদানন্দ (সম্পাদিত), শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৫০, পৃ-৪৭

৩. Samuele Bacchiocchi – 'Immorality or Resurrection' : A Biblical Study on Human Nature And Destiny–Chapter– IV –THE BIBLICAL VIEW OF DEATH – Biblical Perspectives , 4990 Appian Way Berrien Springs Michigan – 49103,2001. P-123

৪। বিমল কর, উড়ো খই-২য় পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ-১৩৯-১৪০

৫। সুব্রত ঘোষ, 'বিমলকরের উপন্যাসে-প্রসঙ্গ অসুখের উপমা' গ্রন্থ থেকে তথ্যটি গৃহীত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৬, পৃ-৮৬

৬। ড. অশ্রুকুমার সিকদার, 'চারিদিকে নবীন যদুর বংশ' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে 'নবীন যদুর বংশ' গ্রন্থে, সব্রত ঘোষের 'বিমলকরের উপন্যাসে-প্রসঙ্গ অসুখের উপমা' গ্রন্থ থেকে তথ্যটি গৃহীত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৬, পৃ-৯৪



# কবিতা সিংহের 'নায়িকা-প্রতিনায়িকা' এবং অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কাস্তে' উপন্যাসে নারী স্বাতন্ত্র্যের ভিন্ন স্বর

**মিঠু রায়**

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর কোন স্বাধীনতা ছিল না। উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে নারী চেতনার উন্মেষ ঘটে, যার প্রভাব পড়ে বাংলা সাহিত্যেও। মধুসূদনের সাহিত্যে নারী অনেকটাই আত্মস্বতন্ত্রময়ী। রবীন্দ্রনাথের নারীরাও প্রচলিত ভাব ভাবনার বিরোধিতা করেছেন, আপন ভাগ্য জয় করার আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুলের হাতে নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। আবার উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই বঙ্কিম সাহিত্যে সহানুভূতির সঙ্গে অবস্থান করেছেন নারীর পাশে। তবে অধিকাংশক্ষেত্রেই পুরুষ সাহিত্যিকরা নিজের কল্পনা বা ধারণা থেকে নারীর কথা লিখেছেন। পুরুষের দৃষ্টিতেই নারীর অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে। নারীর বঞ্চনার কথা, তাদের মনের কথা তুলে ধরতে নারীরা কলম ধরেছেন আর একটু পরে। প্রথম দিকে তারা পুরুষের দেখিয়ে দেওয়া পথে হেঁটেছেন। পরে পরে মেয়েরাই অবশ্য খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের অধিকার প্রকাশ করার প্রকৃত পথ। কীভাবে মেয়েদের জীবন চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী ছিল রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' পাঠ করলেই বোঝা যায়।

উনিশ শতকে নারী পুরুষের নির্ধারিত পথে হাঁটলেও বিশ শতকে সে পুরুষের অধিকৃত চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের পথ খুঁজে নিতে চেয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য অবশ্য নারী লেখিকারা সেদিন পুরুষ লেখকদের মত প্রচার লাভ করেনি বা তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তবে নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ক্রমে বাংলা সাহিত্যে একটা বড় স্থান দখল করেছেন নারী লেখিকারা। প্রথম দিকে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে নারীর কথা তুলে ধরেছেন, শিক্ষিতা নারীর মনোবিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তীকালে ইন্দিরা দেবী, নিরুপমা দেবী, গিরীবালা দেবী, শান্তি দেবী, মিতা দেবীর লেখায় নারীর কথা উঠে এসেছে। অর্থাৎ একজন নারীর দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে নারীর কথা। বিশ শতকে সময়ের সাথে সাথে নারীর চেতনার জাগরণ ঘটেছে। ফলে যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর অস্তিত্বকে স্বীকার না করে অবদমন করে রেখেছিল, সেই নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বুকে নিজের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরেছেন। যার পথপ্রদর্শক ছিলেন বেগম রোকেয়া। যিনি পিতৃতন্ত্রের তৈরি নারীর সতীলক্ষ্মীর আদি রূপকে অস্বীকার করে এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন। সেই দেখানো পথ ধরেই পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও সমানতালে লেখনি ধারণ করেছেন। বিশ শতক থেকে আজও মেয়েরা লিখে চলেছেন। বিশ শতকে লেখার জগতে এসেছেন কবিতা সিংহ ও অনিতা অগ্নিহোত্রীর মতো শক্তিধর লেখিকারা। তাঁদের রচনায় নিজস্ব ভাবনায় নারী

পরিসর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সকলের লেখায় নারীর প্রতিবাদী সত্তা হয়তো ফুটে ওঠেনি, তা সময়ের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেই, কিন্তু পিতৃতন্ত্রের প্রতাপের যুক্তির ফাঁক গুলি তাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

কবিতা সিংহের 'নায়িকা-প্রতিনায়িকা' উপন্যাসে দেখতে পাই বিশাল এক অভিজাত বাড়ির বারান্দায় বসে দুজন প্রবীনা ফেলে আসা যৌবনের এক স্মৃতি রোমন্থন মূলক গল্প বলছেন প্রথমা। অসিতকে কেন্দ্র করে নায়িকা শমিতা এবং প্রতিনায়িকা লাবণ্যের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক দিক ফুটে ওঠে। "কৈশোরে মানুষ সবচেয়ে নিষ্ঠুর"[১]। তাই ওই কৈশোর বয়সে লাবণ্যের চরম দারিদ্র্য নিয়ে হোস্টেলের সবাই তামাশা করত। কিন্তু কলেজে ভর্তির পর থেকেই তার জীবনে পরিবর্তন আসে। সে এখন দূর সম্পর্কের এক অসুস্থ ধনী বৌদির বাড়িতে আশ্রিতা। সেখানে বা পরের বাড়িতে বা শ্বশুরবাড়িতে কিভাবে ক্ষমতা কায়েম করতে হয়, নিজের জমি তৈরি করতে হয়, বিয়ের আগেই সে বিষয়ে লাবণ্যের হাতে খড়ি হয়ে গেল।

অসিত-শমিতার প্রেমকথা প্রথমে কেউ জানতো না। স্বাভাবিকভাবেই অসিত- লাবণ্যকে সন্দেহের বসে বৌদি অসিতের কান্ড-কারখানায় অসহায় জন্তুর মতো গর্জন করতে থাকে। কিন্তু বৌদির বিশ্বাস-"লাবণ্য সে জাতের মেয়েই নয়। লাবণ্য নম্র সেবিকা মাত্র। আর নম্র বিনয়ী সেবিকা ধরনের মেয়েদের তো পুরুষের আলুনি লাগে। তাই না, বলুন? যে মেয়ে আঁচলে ঘূর্ণি তুলতে পারেনা, ভ্রু বিভ্রমে রাগ দেখাতে পারেনা, জানে না কি করে দেহ আর মন আধো ঢেকে আধো খুলে পুরুষদের ভোলাতে হয় সে মেয়ের পিছনে অসিত ছুটবে কেন? এ কথা ভাবতে বৌদির সত্যিই অবাক লাগে"[২]।

অসিত-শমিতার বিয়ের পর তৃতীয় পক্ষ লাবণ্যের আগমনে সংসারে চরম অশান্তি ঘনিয়ে আসে, শুরু হয় অবিশ্বাসের পালা। অন্যদিকে লাবণ্য তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করলে শেষে শমিতা বলেই ফেলে -"লাবণ্য, লাবণ্য- ও লাবণ্যই আমার সব শান্তি চিবিয়ে খাচ্ছে। এতই যদি পিরিত, তবে বিয়ে করলে না কেন? ও লাবণ্যকে"[৩]। আসলে অসিত-শমিতার প্রেমের অভ্যন্তরে অসিত- লাবণ্যের চোরাস্রোত বয়ে গেছে। বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনা, কাজের মধ্যে দিয়ে, ভালোলাগা ভালোবাসায় পরিণত হয়ে গেছে কেউ কোনদিন হয়তো বুঝতে পারেনি। কোন কিছুর অভাব না হলে যেমন তার মূল্য বোঝা যায় না, ঠিক তেমনি লাবণ্যের অনুপস্থিতি অসিতকে দিশেহারা দিকভ্রান্ত পথিক করে তুলেছে। অন্যদিকে লাবণ্যর কথা না বলে বা প্রেমকে স্বীকার না করে মর্মে মর্মে গোপন হৃদয় যন্ত্রণায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে, কোনো ভাবেই ধরা দিতে চায়নি।

একরাত্রে ক্লান্ত শরীরে উষ্ণ অভিনন্দন হল অসিতের ছোঁয়া। লাবণ্য শমিতার সান্নিধ্যের সাতটা দিন অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করল। তারপর যখন জানল লাবণ্য স্কুলে না গিয়ে অসিতের সঙ্গে কোনো পার্কে কাটিয়েছে, তখন শমিতা ব্যাগ গুছিয়ে তার মা-বাবার কাছে





চলে গেল। আসলে নারীদের কথা স্বয়ং ব্রহ্মাও বোঝেননি। কলকাতায় যখন অসিতকে আটকানো গেল না তখন লাবণ্য গ্রামের স্কুলে পালালো। সেখানেও হাজির অসিত। লাবণ্য দুই হাত জোড় করে অনুরোধ জানিয়েছে, কিন্তু কাজ হয়নি। চিঠির পর চিঠি। লাবণ্যের শেষ চিঠিতে লেখা ছিল 'অসিত তখন বোম্বে অসিত তোমার জন্য আমি চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকবো"[৪]। শেষে সমস্ত কিছুর অবসান ঘটিয়ে লাবণ্য-অসিত বিয়ে করে।

অসুস্থতার জন্য শমিতা চেঞ্জে যায় পুরী। এখান থেকেই তার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ফ্রক ছেড়ে একদিন বাসন্তী রঙের শাড়িতে অপরূপা হয়ে উঠলো। সেই দিনই শমিতা অসিতের কথা বলল-দারুন ভদ্র, দারুন সুন্দর আরো অনেক বিশ্লেষণ তার পাশে জুড়ে দিল। পাঁচ জন শুভাকাঙ্ক্ষী যুবকের মধ্যে দূর সম্পর্কে লতায় পাতায় মেশানো আত্মীয় অসিতকেই সে ভালবেসেছিল। এতে বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকাদের মত সাহায্য করেছিল প্রকৃতি। সমুদ্র যেন বন্ধুর মতো তাদের নির্মল নিষ্পাপ দুটি মনকে এক সূত্রে বেঁধে দিল। তিন মাস উন্মুক্ত জীবনের পর বন্দী শমিতা হাঁপিয়ে ওঠে। ভাবপ্রবণ শমিতার তাই দুঃখ যেমন ,আনন্দ তেমনি। সারাদিন শুধু অসিতের জন্য চিন্তা করা, স্মৃতিচারণা, চিঠিতে গুনগুন,সঞ্চয়িতার পাতায় মনের দর্পণই তার কাজ।

এরপর লাবণ্যের আগমন প্রথম দেখায় তাকে ভালো লাগে। একদিকে শমিতার বন্দী জীবন অন্যদিকে লাবণ্যের সঙ্গে অসিতের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ গাঢ় হল। এই ঘনিষ্ঠতা কারো নজর এড়ায়নি। তাই মাসি, দিদিরা শমিতাকে রশিয়ে রশিয়ে শোনায় অসিত লাবণ্যের দহরম মহরম। সে জানে লাবণ্য তাদের জন্য লুকিয়ে চিঠি দেয়, তাদের দেখার ব্যবস্থা করে দেয় তার প্রতি সে কৃতজ্ঞ। লাবণ্য এত ভালো যে তা কিছু বলা যায় না। কিন্তু শমিতা বুঝতে পারে অসিত লাবণ্যের মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। তার উপর লাবণ্যের সব খবরই পেত কিন্তু অত্যন্ত বিকৃতভাবে একেক জন একেক রকম ভাবে বলতো। আর তখন থেকে শমিতা অন্তরদগ্ধ হতে শুরু করল। এর জন্য সবচেয়ে দায়ী ছিল অসিতের দিদি। সে চুপি চুপি লাবণ্যের নিন্দায় মুখর হত আর তা দ্বিগুণ, তিনগুণ হয়ে শমিতার কাছে আসতো। যার জন্য বাবা, দিদিমাকে ছেড়েছিল সেই অসিতই তাকে ছেড়ে দিল। এক সময় অসিত বাচ্চাদের মত ভাব জমাত, ঘুরে বেড়াতো। আসলে অসিতের শরীর তার সঙ্গে থাকতো, মন নয়। সরাসরি অসিত কিসে সুখী হবে তা জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর দিতে পারেনি। দাম্পত্য জীবন সুখী করার জন্য শমিতা যতবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে ততবারই তাকে অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সন্তান ধারণের অনভিজ্ঞতা, মানসিক যন্ত্রণা, সব হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার বেদনা তাকে কলহপরায়ণ নারীতে রূপান্তরিত করেছিল। সে যখন দাম্পত্য জীবনযুদ্ধে পরাজিত তখন শমিতা বলেছিল-"দ্যাখ আমাদের মধ্যেকার একটা মরা ভালোবাসার মান রাখার জন্য আমার বর শহীদ বনে

যাচ্ছে।আমি ওকে শহীদ হতে দেব না। ও যে কতখানি রক্তমাংসের মানুষ, কতখানি সাধারণ মানুষ সেই কথাটাই সকলের সামনে তুলে ধরবো।”[৫] শেষে শমিতা একা একাই তার মেয়েকে বড় করেছে। আবার মেয়েকে পিতৃস্নেহ থেকেও বঞ্চিত করেনি। অসিত তার মেয়েকে যেমন চিঠি লেখে ঠিক সেই রকম শমিতার কাছেও ছুটে যায়। তারা ডিভোর্সের কথা ভুলে গিয়ে এখন ভালো বন্ধুর মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘কাস্তে’ উপন্যাসে নারী ভিন্ন ভিন্ন স্বর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভ্যতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী আজও পুরুষের দৃষ্টিতে ভোগ্য  বস্তু। নারী আজও বঞ্চিত, শোষিত, লাঞ্ছিত, ধর্ষিত। আবার নারী সমাজের ধারক ও বাহক, সমাজের ভবিষ্যতের উন্নতির মূল বীজ। সেই রকমই একটি জ্বলন্ত ও জীবন্ত নারী চরিত্র তেরনা। তেরনার মালিক অর্থাৎ স্বামী দাতু একজন ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। আত্মরক্ষার জন্য তেরনা প্রচন্ড গরমে হাঁপিয়ে উঠলেও পুরু হাতার জামা, পাজামা খোলে না। ছেলেমেয়েদের কাছে রাখে, শুধু যেকোনো সময় কাজে যাওয়ার জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্য। আখ কাটাই এর কাজে আসা মেয়েদের সম্মান থাকে না। যেকোনো সময় যে কোন মুহূর্তে তারা ধর্ষিত হতে পারে মানুষরূপী পশুদের কাছে। কুকুর বিড়ালের মতো পশু আঢাকা খাবার খোঁজে, কিন্তু পশুরুপী মানুষ খোঁজে নারীর নরম মাংস। একদিন রাত্রে নতুন বউ তেরনা আলগা পোশাকে ঘুমিয়ে পড়লে সে দেখে-“শরীরের উপরে আস্ত একটা মানুষ। মদের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। ধড়ফড়িয়ে উঠল তেরনা। না, না, এ তার বর নয় এ হলো মুকাদম”[৬]। মুকাদম চিনিকলের দালাল দু এক টানেই ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলেছিল। হাউমাউ করে কাঁদতে গেলে তেরনার কপালে জোটে মার। তাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চাপা কান্না তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছিল। মানুষরুপী কুকুরদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর কৌশল সে রপ্ত করে ফেলে। তেরনাকে ক্লিনিকে গিয়ে বাচ্চাদানি ফেলিয়ে আসতে হয়েছে, তাই প্রত্যেক মাসের ‘বীড়’ সমস্যা না থাকায় সে আগের চেয়ে অনেক সাহসী। অকালের দিনে পশুদের যেমন খিদে বাড়ে তেমনি নারী খাদকদের আনাগোনা বাড়ে রাতের অন্ধকারে। আসলে তেরনার মনে স্বাধীনচেতা মনোভাব যেমন ফুটে ওঠে ঠিক সেই রকম মেয়েদের যে একটু নির্জনতা প্রয়োজন, আড়াল প্রয়োজন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কি তা বোঝে?

দয়া জোশী গ্রামের মেয়েদের কাছে রোল মডেল। কিন্তু যাদের জন্য এই ব্যবস্থা তারাই যদি একদিন না থাকে, সেই স্কুলটাই যদি না থাকে, চমকে উঠে দয়া। দয়া আরো চমকে উঠে যখন সে জশোবন্তের কাছে শুনে অসাধু ডাক্তার ভ্রুণ নির্ধারণ করে কন্যা ভ্রূণ হত্যা করে, যার ফলে কমে যাচ্ছে নারীর সংখ্যা অথচ কারও কোন হেলদেল নেই, নেই শাস্তির বিধান। দয়া জানতে পারে মেয়েদের ক্লিনিকে গিয়ে জরায়ু খসিয়ে আসতে হয়, পেটে বাচ্চা এলে, মেয়ে সন্তান হলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তাকে হত্যা করা হয়। শুধু



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

তাই নয় মেয়েদের নিয়ে সরকারের রাজনীতি করা নিয়ে দয়া ক্ষুব্ধ। একটা রাজনৈতিক দলের স্লোগান -‘‘মেয়েদের যদি জন্মাতে না দাও, রুটি খাবে কার হাতের?”[৭] এখানে দয়ার চরম রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। “শালারা তোমাদের রুটি খাওয়াবো বলে জন্মেছি আমরা। তোদের পেটে রুটি পড়বে বলে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চাস বেজন্মা হতভাগার দল।”[৮] আসলে এখানে একদিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একাধিপত্য, অন্যদিকে মেয়েদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির রাজনীতি। ভোটের আগে দলগুলির প্রতিশ্রুতি উন্নয়নের জোয়ার। অথচ ভোট পেরোলেই আসল রূপ বেরিয়ে আসে, কেউ কোন খবরই রাখে না পরবর্তী জীবন যাপন নিয়ে।

আবার মেয়ে ঋতুমতি হলেই সে আর নিরাপদ নয়। মেয়েদের বাবারা যেন পাত্রস্থ করতে পারলেই দায় মুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই দয়া জোশিকে ভয় পায় সকলে। অন্যদিকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে জানতে পেরেছে তাদের কোন হাত নেই, যা করে তার মা-বাবা। দয়া দেখল সম্পন্ন বাড়ির বাল্যবিবাহে কার্ড ছাপানো হয়। যেখানে বড় বড় ভিআইপি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এম এল এ, এমপিদের নাম তা দেখে দয়া তার কৌশল পাল্টালো এবং প্রচার করল বাল্যবিবাহ বেআইনি, এই বিবাহ অনুষ্ঠানে যে উপস্থিত থাকবে তাদের যেন ভোট দেওয়া না হয় এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার করা হলো, দয়ার চেষ্টায় অনেকটা কাজ হল।

মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে দয়া জোশী খুবই চিন্তিত। একে দুর্গম পথ তার উপর সরকারি বাস হাইওয়ে থেকে ভিতরে ঢুকে না। ফলে মেয়েরা ক্লাস এইট পাশ করে ঘরে বসে আছে, ভুলে যাচ্ছে পড়াশোনা। অন্য দিকে স্কুলে পড়াশোনা হয় না। রাজনীতির এতটাই প্রভাব যে একজন শিক্ষক অন্যজনকে বসিয়ে নিজের কাজে যায়, পরীক্ষায় চলে গণ টুকাটুকি, এতে সবাই খুশি। কিন্তু দয়া খুশি হতে পারেনা। দয়ার কাজকর্মে শিক্ষক-শিক্ষিকা, হাসপাতাল,ডাক্তার, নার্স, রেডিওলজিস্ট, জেলা প্রশাসন, কোর্ট, পুলিশ সবাই বিরক্ত। কিন্তু দয়া জোশী কাউকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে চলে বিরামহীন ভাবে। ডাক্তার মঞ্জু পাটিল, স্বামী ডক্টর বৃন্দাবন পাটিল এর শহরের সবচেয়ে বড় কন্যা ভ্রূণ হত্যার কারখানা। যাতে কোন প্রমাণ না থাকে তার কি নিপুন আয়োজন? ওই মাংস পিণ্ডগুলো খাবার জন্য বড় বড় চারটি কুকুর রাখা আছে। একদিন ডক্টর পাটিলের ক্লিনিকে গর্ভপাতের সময় দুজন বধূ মারা গেলে শুরু হয় গণআন্দোলন। দয়াকে সাহস যোগায় যশোবন্ত আর দীপক, শুরু হয় এক বৃহত্তর গণআন্দোলন। দীপক ও যশোবন্ত সমস্ত স্তরের মানুষকে জোগাড় করে ফোনে ফোনে। বেলা বারোটার সময় হাসপাতাল অবরোধ তার এক বিশাল আয়োজ। কৌশল্যা, মিনু, ইন্দু মতি অন্যদিকে মেয়েরা, সাংবাদিকরা বিভিন্ন দিক দিয়ে আসবে। অরণ্যা তরুণ আইনজীবীদের, অভিজিৎ অধ্যাপক বন্ধুদের নিয়ে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন যার নেত্রী দয়া জোশী পাশে মেয়ে অরণ্যা। তাদের পণ যতক্ষণ না মঞ্জু পাটিল গ্রেপ্তার

হচ্ছেন তারা কেউ উঠবে না। দয়া যেন দেবী দুর্গার মত সংহারক মূর্তি যেখানে কোন আবরণ নেই, উন্মুক্ত কালী মূর্তি। কেউ উঠবে না এখান থেকে এ যেন দয়ার হুংকার যা ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শেষে ডাক্তার দম্পতি মঞ্জু ও বৃন্দাবন পাটিল গ্রেপ্তার হলে নতুন ভাবে আইনজীবীর গাউন পরে দয়া ঝালিয়ে নেয় আইনের ধারাগুলি। শেষে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট ডাক্তার দম্পতির জামিন নাকচ করে দেয়, দয়ার চোখে খুশির ঝলক।

উমেশের মৃত্যুর পর বৈশালী ও রঞ্জন কাছাকাছি আসে। এই সময় রঞ্জন তার সামনে বসিয়ে তার সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে চায়। বৈশালী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ব্যাংকের সমস্ত ঘটনা তাকে জানায়। যা আগে কেউ কোনদিন জানতে চাইনি। একজেদি প্রতিবাদী রঞ্জন পি.এইচ. ডি. স্কলার সে বৈশালী ও তার মত বিধবাদের নিয়ে থানায় কেস করে। অন্যদিকে বৈশালী ও রঞ্জন একে অপরের কাছে আসতে থাকে। বৈশালীর জীবনের সাথে, হৃদয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে রঞ্জনের হৃদয়। তাই একদিন তারা উপস্থিত হয় উল্কা হ্রদের কাছে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা রোমান্টিক পরিবেশে। তারা একে অপরের খুব কাছে আসে কোমল অন্ধকারে হঠাৎ বৈশালীকে কাছে টেনে তার ব্যথিত ঠোঁট দুটিকে স্পর্শ করতে চাই রঞ্জন। কিন্তু বৈশালীর মুখের বেদনার হাসি তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। রঞ্জন তাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু ফিরিয়ে দেয় সেই প্রস্তাব। একদিকে তার স্মৃতিতে যেমন আছে উমেশ, তেমনি কঠোর বাস্তবতা তাকে শিখিয়েছে কীভাবে একা একা বাঁচতে হয়?

দীর্ঘ ১৮০ কিঃমিঃ পথ পায়ে হেঁটে রুকমা বাঈ মুম্বাই এর আজাদ ময়দানে এসে পৌঁছেছে। কি বিশাল তার আয়োজন, কত মানুষের সমাগম। রুকমা বাঈয়ের নিজের নামে জমি হবে এটুকু ছাড়া সে হয়তো কৃষক সভার আর দাবি-দাওয়া জানেনা। কিন্তু “রুকমা বাঈ এর রক্ত শুকানো ফাটা পায়ের ছবি উঠেছে অনেকগুলো। আরো অনেক পুরুষের আছে,যাদের পা রক্তাক্ত পথ হেঁটে। রুকমা বাঈয়ের জরা সংকুল মুখ আর ফাটা পায়ের ছবি প্রথম পাতায় দেখে সকাল হলো মুম্বাই মহানগরের”।[৯] এই পা এর ছবি বেরোনো ইংরেজি কাগজটা আজও বিবর্ণ হয়ে রুকমা বাঈ এর মাটির ঘরের চালার বাতায় গোজা আছে। কারণ বাসে গাড়িতে করে ঘরে ফিরে ৮ থেকে ১০ দিনের জ্বরে রুকমা বাঈ মারা গেছে। সে দীর্ঘ যাত্রার ধকল সইতে পারেনি। মায়ের কথা কাউকে বলতে না পারার যন্ত্রণা কুঁড়েঘরে অসহায় চোখের জলে ঝরে পড়ে। কি লাভ হলো রাখুর বা রুকমার? নাকি এই ত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অবসম্ভাবী ছিল। আসলে সন্তানের মঙ্গলের জন্য বা ভবিষ্যৎ আশায় হাজার হাজার রুকমা মার অসহায় আত্মবলিদান।

নারীবাদী লেখিকা কবিতা সিংহ ও অনিতা অগ্নিহোত্রীর কলমে ফুটে উঠেছে উদারপন্থী নারীবাদ। উভয়ের লেখাতেই নারী এক স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। বুদ্ধিমতী নারী নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে গিয়ে, হৃদয়ের কথা বলতে গিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে





সমাজের দলিত শ্রেণীর বা দরিদ্র মেয়েরা কিভাবে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় তা বিভিন্ন উপন্যাসে দুই লেখিকার কলমে ভাষা পেয়েছে। পাঁচের দশকের গুরুত্বপূর্ণ লেখিকা কবিতা সিংহের দৃষ্টিতে নারী চিরদিনই বঞ্চিত। তাই তাঁর নারী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কবিতা সিংহের কলমে দেখা যায় মেয়েদের যোগ্য স্বীকৃতির প্রত্যাশা। সংকীর্ণ নারী পরিসর থেকে বেরিয়ে তিনি নারী সত্তাকে প্রকাশ করেছেন বীরের মতো। যার প্রমাণ হিসেবে ‘‘নায়িকা- প্রতিনায়িকা’’ উপন্যাসের নায়িকা শমিতার কথা বলা যায়। যে নারী সমাজের প্রথার সঙ্গে আপোষ করে না।

কবিতা সিংহ ও অনিতা অগ্নিহোত্রী নতুন নতুন আঙ্গিকে বিশ্বাসী হওয়ায় এক ধাঁচে কেউই লেখেননি। বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের সামঞ্জস্য রেখেই তাদের লেখায় স্থান পেয়েছে বাস্তব ঘটনা। কবিতা সিংহের উপন্যাসে দেখা যায় পোড় খাওয়া মানুষের বেঁচে ওঠার কাহিনি। কবিতা সিংহ শুধু সম্পর্ক ভাঙার কথা বলে না, দেখিয়ে দেন ভাঙনের শিকড় গুলোকে। ‘নায়িকা- প্রতিনায়িকা’ উপন্যাসে লাবণ্য -অসিত -শমিতার ত্রিকোণ প্রেমের মূল সমস্যাগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন তিনি। অন্যদিকে অনিতা অগ্নিহোত্রীর নারীবাদী চিন্তাধারায় বিকশিত তাঁর নারীচরিত্রগুলি। বিচিত্র পটভূমিকায় নতুন নতুন গল্প নিয়ে তিনি হাজির হয়েছেন। তাঁর নারী চরিত্রের মধ্যে বড় প্রাপ্তি দয়া জোশী। মেয়েদের শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, কন্যা ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দয়া জোশীর। আন্দোলনরত উকিল দয়ার সাহস, সকলকে আপন করার ক্ষমতা, কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব, সাংগঠনিক দক্ষতা, তার বিষণ্ণতা, একাকীত্ব, সন্তানের জন্য উদ্বেগ- নারী নেতৃত্বের এই ঘনিষ্ঠ চিত্রনটির বড় অভাব ছিল বাংলা সাহিত্যে। সবদিক থেকেই এই দুই লেখিকা বাংলা সাহিত্যে নারী স্বাতন্ত্র্যের সুরটিকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তুলেছেন।

**তথ্যসূত্র :**


১) কবিতা সিংহ, নায়িকা-প্রতিনায়িকা, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৩৬৮ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২
২) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮
৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬
৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬
৫) তদেব, দৃশ্য সংখ্যা ১০৪
৬) অনিতা অগ্নিহোত্রী, কাস্তে, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭
৭) তদেব, পৃষ্ঠা ৬২
৮) তদেব, পৃষ্ঠা ৬২
৯) তদেব, পৃষ্ঠা ১৮৭, ১৮৮

## তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যবহ্নি'ও বুদ্ধদেব গুহ-র 'লবঙ্গীর জঙ্গলে' উপন্যাসে অরণ্য চেতনার বৈচিত্র্যময় রূপ

শুভেন্দু রায়

মানব সভ্যতা, মানবমন তার রূপ পরিবর্তন ও পরিমার্জন সমস্ত কিছুই অনেক সময় অরণ্যের সাথে সম্পর্কিত। সৃষ্টি কখনো স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারে না। মানব সভ্যতার সঙ্গে অরণ্যের একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে অরণ্যের স্বরূপ বর্ণনায় বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এসেছে নানা অভিনবত্ব শহর জীবনের সাথে সমান্তরাল ভাবে অরণ্য জীবনও তার রূপ পাল্টেছে। বিশ শতকের মধ্যভাগ, দেশ তখন নানা রকমের দুরারোগ্যে ছিন্নভিন্ন। খরা, বন্যা, দেশভাগ মন্বন্তর, এই সকল সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক বিপর্যয় একের পর এক দেশের বুকে হানা দিয়ে চলেছে। এ পরিবর্তন কমবেশি সমসাময়িক সকল লেখকদের রচনাতেই ধরা পড়েছে।

যুগের দাবিকে মাণ্যতা দেওয়া হলেও কিছু রচনা সৃষ্টির গুণে চিরকালের পাঠকের সমাদর পেয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অরণ্যবহ্নি"(১৯৬৬)ও বুদ্ধদেব গুহ-র "লবঙ্গীর জঙ্গলে,(১৯৭৭) উপন্যাসে শুধুমাত্র অরণ্য বা অরণ্য সম্পৃক্ত জীবন বর্ণনা নয়,যুগের দাবিকে মেনে সেখানে রয়েছে পরিবেশ সচেতনতার পাঠও। এইভাবে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, সমাজ সচেতনতা এই দুটি উপন্যাসকে অরণ্যকেন্দ্রিক উপন্যাসে এক বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের মৈত্রীপূর্ণ সহাবস্থানের কথা ও প্রয়োজনীয়তা বৈদিক সাহিত্যে উজ্জ্বল। অরণ্য ঘেরা পরিবেশে মুনি ঋষিদের সাহিত্যচর্চা, যেখানে মানুষের সাথে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। তাই কালভেদে, ক্ষেত্রবিশেষে সাহিত্যিকরা তাদের সৃষ্টিতে অরণ্য সম্পদ সংরক্ষণের কথা বলে গেছেন।

প্রাচীন সাহিত্যে সেভাবে অরণ্য সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে বিশদে আলোচনা নেই। কারণ সে সময় অরণ্য সম্পদ তুলনামূলকভাবে অনেকটাই নিরাপদ ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক পুঁজিবাদীদের অত্যাচারে পৃথিবী আজ ধ্বংসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে আধুনিক সাহিত্যে এ বিষয়ে বেশি করে আলোকপাত করতে দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। এখানে রূপকের আদলে বৌদ্ধ সহজিয়া গুঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বৃক্ষরূপ শরীরে পাঁচটি ডাল বা পাঁচটি ইন্দ্রিয় এই চঞ্চলতার কারণ, মানব শরীর ও গাছপালাকে সেখানে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ খুব অল্পই অরণ্যের দেখা মেলে। 'তাম্বুলখণ্ডে' দেখি একদিন বনপথে রাধা বড়াই পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে। অবশেষে কৃষ্ণ পথের নির্দেশ দেওয়াতে বনের মধ্যে রাধাকে খুঁজে পায়। এরপরই আসে অনুবাদ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য। বিদ্যাপতির বিভিন্ন পদে প্রকৃতির বিবিধ রূপ বর্ণিত হয়েছে।মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বিত্তবান হয় অরণ্য সংহার ও পুঁজির বৃদ্ধি ঘটিয়ে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য সেই কথাই বলে।অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের পর বাংলা সাহিত্যে 'ময়মনসিং গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় অরণ্যের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ঘনবন অতিক্রম করে নদেরচাঁদ যায় তার প্রেয়সী মহুয়ার সাথে দেখা করতে। এক সময় ঘটনাচক্রে মহুয়া নদের চাঁদকে বাড়ি যেতে বললে সে বলে এই গহীন বনে তুমি বনের ফুলের মত আর আমি ভ্রমরের মতো।

আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যে যে দুজন কবি সাহিত্যিকের নাম না করলে সাহিত্যে প্রকৃতি ও অরণ্য পরিবেশ আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায় তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সৌন্দর্যের সংগীত শুনিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ মানুষ ও মৃত্যুকে একসূত্রে গেঁথে ছিলেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে আধুনিক সাহিত্যে অরণ্য প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "দুর্গেশনন্দিনী" (১৯৬৫)ও "কপালকুণ্ডলা"(১৯৬৬) উপন্যাসে অরণ্যের কথা পাওয়া যায়। বিশেষ করে "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে অরণ্যকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি। প্রকৃতির কোলে যখন নবকুমার দেখে—

"সেই গম্ভীরনাদী পারীধী তীরে সৈকত ভূমি অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া রমনী মূর্তি। চিকুরজাল সন্ধ্যা আলোকে না দেখলে তার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না"[১]

এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নবকুমারকে আশ্চর্য করেছিল।

'আনন্দমঠ'(১৮৮২) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই দেশসেবক সন্ন্যাসীরা তাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সার্বিক প্রস্ততির ক্ষেত্র হিসেবে অরণ্যকে ব্যবহার করেছিল। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন মহেন্দ্র-কল্যাণীর পুনর্মিলনের ক্ষেত্রও হয়ে ওঠে অরণ্যই। এইভাবে নানা অনুষঙ্গে "আনন্দমঠ" উপন্যাসে অরণ্যকে খুঁজে পাওয়া। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'( ১৮৮৩)-এর অরণ্যচিত্র বাঙালির হৃদয় পটে চিরকাল আঁকা থাকবে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অন্যতম জায়গা করে নিয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের এক নতুন ধারার সৃষ্টি করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসটি শুধুমাত্র একটি উপন্যাস নয়, এ যেন এক প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এক নতুন সাহিত্যধারার দ্বারম্মোচন ঘটল। তিনি ধরা দিলেন এক নতুন ধারার রূপকার হিসেবে। তাঁর হাত ধরেই বাংলা উপন্যাসে অরণ্য সাহিত্যের যাত্রার শুভ সূচনা ঘটল।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর রচনার মূল আধার ছিল মাটি ও মানুষ। তাঁর জন্ম বীরভূম জেলার লাভপুরে। সে কারণেই তাঁর সমস্ত গল্প উপন্যাসে মানুষ ও গ্রাম বাংলার প্রকৃতির সহাবস্থান লক্ষ করি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকল উপন্যাসের মূল আধার জনজীবনের বিচিত্র ও বহুমুখী ধারার সঠিক

চিত্রায়ন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অরণ্যবহ্নি'(১৯৬৬) উপন্যাসটি এমনই একটি উপন্যাস যেখানে অরণ্যপরিবেশ, আদিবাসী মানুষের জীবনযুদ্ধ ও অরণ্য জীবনের এক বৈচিত্র্যময় রূপ ফুটে ওঠে। উপন্যাসটিতে মূলত সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

'প্রস্তাবনা' ও 'কথারম্ভ' এই দুই অধ্যায়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের বৃত্তান্ত লেখক গানের আকারে সাজিয়েছেন। 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসের দুটো দিক রয়েছে যেগুলো এই আলোচনার স্তম্ভ। এক, সাঁওতাল জনজাতির নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য 'হুল' সংঘটিত করা অর্থাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করা। এবং অপরদিকে রয়েছে অরণ্য প্রকৃতিকে জড়িয়ে সমস্ত অরণ্যজীবন কীভাবে আবর্তিত হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

"১১২ বছর আগের কথা", "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি", বাংলা', 'ভাগলপুর' এই সমস্ত শব্দ বন্ধ গুলি প্রস্তাবনার প্রথমে আমরা পাই যা কিনা আমাদের এক ঐতিহাসিক ঘটনার মানস যাত্রায় নিয়ে যায়। এছাড়াও বারে বারে লেখক নিজেই কাল ভ্রমণ করেছেন।

লেখক এক জায়গায় বলছেন। —

'শুনতে শুনতে ইতিহাসের পাতা মনে পড়ে গেল। আমি চোখ বুঝলাম। সে এক সন্ধিক্ষণ। আমার মনশ্চক্ষের সামনে যেন একটা যবনিকা উঠেছিল।'[২]

পুরো উপন্যাস জুড়ে আদিবাসীদের বিবিধ সংস্কৃতি রীতিনীতি সমস্ত কিছুই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। আমরা যদি আমাদের চার-পাশটা দৃষ্টি রাখি দেখবো আদিবাসী ঘরের চারদিকে বিবিধ সুন্দর আল্পনা এঁকে তারা তাদের ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিধু ও কানুর বীরত্বের পরিচয় পাই নয়ন পালের দুটি ছড়ায়—

১,'সাঁওতালেরা পাশে হায় (যেন)অজগর গরজায়
সিধু কানু দুই ভাই হুংকার করিয়া কয় বাত।'[৩]

২,'সিধুর গর্জন শুনে চমকিল জনে জনে।
হাসিয়া নাফর তনে -স্মর কালকেতু ব্যাধ করিল গর্জন।'[৪]

পট আঁকিয়ে নফর পালের বিশ্বাস ছিল সিধু সেই কবিকঙ্কণের চন্ডীমঙ্গলের কালকেতু ব্যাধ।

আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা এই উপন্যাসটির মধ্যে পাই যেখানে দেখি বাবাঠাকুর বলেছিলেন —

—'ওরে যে তোদের মরংবোঙ্গা সেই আমার নেংটা বেটি! কালি মা! হাঁ রে।'[৫]

লেখক এখানে মনুষ্যধর্মের সারমর্মটি তুলে ধরেছেন।

সমগ্র উপন্যাসের বয়ানে আদিবাসীদের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও দেশীয় জমিদার, জোতদারের অত্যাচার খুব সরল ভাষায় লেখক বর্ণনা করেছেন। সাঁওতালি





ভাষায় কথোপকথন রচনা রীতিকে অভিনবত্ব দান করেছে। সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলে আমরা মানি। এই উপন্যাসকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপনকারী আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল বলে অত্যুক্তি হবে না।

জহর শরণায় সবথেকে বড় শাল গাছের মাথায় বজ্রপাত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সম্প্রদায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।—

'পাপ পাপ অক্কাই অক্কাই পাপে ভরে গেল সব।'[৬]

তাদের অশিক্ষা ,তাদের এই কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ই তাদের বিদ্রোহের অসফলতার মূল কারণ। উপন্যাসের বয়ানে এক জায়গায় লেখক বলছেন—

'সাঁওতালরা হারলে অন্ধবিশ্বাসে আর কৌশলের অভাবে"[৭]

এইভাবে সুকৌশলী ইংরেজরা সাঁওতালদের অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাসকে হাতিয়ার করে তাদের নিরস্ত্র ও বিদ্রোহকে সমাপ্ত করতে পেরেছিল।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস, অরণ্য অন্বিত আদিবাসী জনমানস-এর জীবনযাত্রার বর্ণনার সাথে সাথে উপন্যাসের প্রস্তাবনা অংশে লেখক এর প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতার কথা পাওয়া যায়—

"তারপরই আবার পড়বে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ শাল জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে কাঁঠাল গাছ দেখতে পাবেন। শেষে পলাশ গাছে পলাশ ফুলও পাবেন। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে স্থান কাল ভুলে যাবেন না।"[৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসের ভাষায়, রচনারীতিতে অরণ্য,অরণ্যের ভাষা, তাকে ঘিরে আদিবাসী জনজীবনের ধারা এ সমস্ত কিছুই অরণ্য সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

বাংলা অরণ্য কেন্দ্রীক সাহিত্যের এক অনন্য শিল্পী হলেন বুদ্ধদেব গুহ। অরণ্য সাহিত্য সম্ভারে সংখ্যার বিচারে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে জ্বলজ্বল করছে। গড়পড়তা আর পাঁচটা সাহিত্যিকের থেকে একটু আলাদা মানসিকতার ছিলেন তিনি।প্রেমকে পাথেয় করে জিতে নিয়েছিলেন সমস্ত পাঠক হৃদয়। উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে যেন নিজের জীবনেরই খসড়া আলোচনা করেছেন। তাঁর অরণ্যের চেতনার জন্য ব্যক্তিগত জীবন অনেকটাই সাহায্য করেছে। "জঙ্গলসম্ভা১" সংকলনের' উৎসর্গ পত্রে বলেছেন—'আমার বাবাকে যাঁর হাত ধরে প্রথমে বনে পাহাড়ে গিয়েছিলাম এবং 'আমাকে সর্বক্ষণ অনুপ্রেরণা যোগায়।'[৯]

তাঁর শিকারি সত্তাকে ছাপিয়ে গেছে প্রেমিক সত্তা। সেই প্রেম একই সঙ্গে নারী ও প্রকৃতির প্রতি ধাবিত।

প্রকৃতিকে আদিম নারী সত্তা ভেবে শুধু প্রকৃতি বন্দনা নয় সেই নারীকে শারীরিকভাবে পাবার আকুলতা বুদ্ধদেবের উপন্যাসের একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। তাই উপন্যাসে আরণ্যক

সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে গেছে তীব্র যৌন চেতনা, তা একান্তভাবে বুদ্ধদেব গুহ'র ই।—

‘হঠাৎ তাকিয়ে দেখি একটা আমলকি গাছের নিচে এক জোড়া রাজ ঘুঘু ফলসারঙা। —সমস্ত ইন্দ্রিয়দিয়ে আমি শুষে নিলাম, নিতে থাকলাম।’[১০]

বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা উপন্যাসে অরণ্যচেতনা যে পালাবদলের সূচনা হয়েছিল বা বিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বুদ্ধদেব গুহ তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন। তাঁর ‘লবঙ্গীর জঙ্গলে’(১৯৭৭) উপন্যাসটিকে ‘পারীধি’-র ই সম্প্রসারণ বা দ্বিতীয় খন্ড বলা হয়। এটি বুদ্ধদেব গুহ-র ‘জঙ্গলসম্ভার’ প্রথম খন্ডের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় উপন্যাস। এখানে পটভূমি উড়িষ্যার জঙ্গল। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে নগর জীবন ও অরণ্য জীবনের যে প্রভেদ তা চমৎকারভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের আদর্শ, তার চিন্তাধারা সমস্তটাই তিনি উপন্যাসের মধ্যে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসে শহর জীবনের কৃত্রিমতা সেখানকার মানুষের হিংস্রতা, স্বার্থপরতাকে তীব্রভাবে ধিক্কার জানিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত চরিত্রটির মধ্যে সবকিছু খুঁজে পাই আমরা। একজন আদর্শ চরিত্র হিসেবে ফুটে উঠেছে এই চন্দ্রকান্ত। সমগ্র লঘুতা, ভীরুতাকে ত্যাগ করে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে তার চরিত্রটি। যে কিনা শহর ত্যাগ করে আরণ্যকের জীবন বেছে নেয়। অরণ্যের কোলে বেড়ে ওঠা কম্ফু, নারান আরো অনেকের মত উৎপীড়িত নিপীড়িত শোষিত মানুষদের জন্য, তাদের মন থেকে ভয়কে চিরতরেবিতাড়িত করার জন্য যে নিজের জীবন নির্দ্বিধায় ত্যাগ করতে পারে। তাই সরকারি আইন ভেঙ্গে ওই মানুষগুলোর জন্য বুনো সাম্বর মারে, যাদের জঙ্গলের গরীব মানুষ গুলো অনেক দিন পর একটু পেট পুরে মাংস খেতে পারে।

আর এই চরিত্রকে কাহিনীকার এমনই ভাবে স্বচ্ছ ও মহান করে তুলেছেন যে সে বলতে পারে—

‘দেখো !আমার হাতে ময়লা নেই কোন, লুকোবার নেই কিছু মাত্র। আমি পরিষ্কার।’[১১]

চন্দ্রকান্তের এমন ঐশ্বর্য আমাদের এক পরম প্রাপ্তি। যে কিনা শিক্ষার আসল মর্মকে উপলব্ধি করিয়ে দেয় আমাদের।

—‘শিক্ষা মানে কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপমারা কাগজ শুধু।’[১২]

চন্দ্রকান্ত আর পাঁচটা ছা-পোষা বাঙালির মতো নয়, যারা শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে। এইসব স্বার্থপর মানুষদের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে চন্দ্রকান্তের মত মরে যাওয়া ঢের ঐশ্বর্যময় বলে মনে করেন লেখক। তাই এই নিম্ন উল্লিখিত সংলাপের অবতারণা—

‘এমন নিষ্ঠুরতা এবং এমন দয়াও দেখলাম না কারো মধ্যে। এমন শিক্ষা ও অশিক্ষাও। চন্দ্রকান্ত আমার জীবনে এক অভিজ্ঞতা। চন্দ্রকান্তের মতো একটি চরিত্র খুঁজে পেয়েছি।। এ জীবনে এইতো যথেষ্ট।’[১৩]

চন্দ্রকান্ত ছাড়াও আরেকজনকে আমরা উপন্যাসে পাই যার মাধ্যমে লেখক বাস্তব



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

সমাজের কিছু কঠিন সত্য কে তুলে ধরেছেন। সে হলো কম্ফু। সে বলছে—

‘আমাকে লোভ দেখিও না। লোভ জাগলে আর আমার ওষুধ ধরবে না।’[১৪]

বুদ্ধদেব গুহ বারবার সমস্ত উপন্যাস জুড়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে গেছেন যে, নগর সভ্যতা ও নগর জীবনের চেয়ে, শতগুনে সৎ ও মহৎ হলো অরণ্য জীবন ও অরণ্য সভ্যতা। যেখানে শহুরে ডাক্তাররা অর্থলোলুপতায় ভরপুর। এক নার্সিংহোমের থেকে আরেক নার্সিংহোম ছোটেন অর্থের জন্যে, সেখানে এই অরণ্যে লালিত বৈদ্য কমফু চিকিৎসাকে সেবা বলে মনে করে। কমফু সেখানে প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিদ্যা কে মহিয়ান করে তুলেছে। এইভাবে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহর “লবঙ্গীর জঙ্গলে” অরণ্যকেন্দ্রিক এই উপন্যাসটিতে আমরা অরণ্য ব্যতীত সেখানকার জীবনযাপন নগর সভ্যতার সাথে তুল্য মূল্য বিচার করে পরিণতিতে অরণ্য সভ্যতাকে লেখক জিতিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে যে অরণ্য সাহিত্যের অধিরাজ বলা যায় তার প্রমাণ তাঁর অনুভূতির প্রকাশভঙ্গি।—

‘কি দারুণ শান্ত স্তব্ধ অথচ কি প্রাণবন্ত এই আদিগন্ত নিসর্গ ছবি?.........,কোন নেশা কোন নারীর নৈকট্য পৃথিবীর কোন প্রার্থীব বস্তুই আমার কাছে প্রকৃতির কাছে থাকার চেয়ে বড় বলে মনে হয় না। কোনদিনও।’[১৫]

সেই আদি প্রস্তর যুগ থেকে যখন মানুষ অরণ্যের কোলে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছিল তখন থেকে আজ একবিংশ শতকে পা দিয়ে মানব জাতি উন্নতির যত বিবিধ স্তর পার করে এসেছে তা যেন ক্রমেই তাকে আবার অরণ্যে ফিরে যাবার বার্তা দিচ্ছে। জীবন মৃত্যু যেভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে ঠিক তেমনি অরণ্য জীবনে আবার মানুষকে ফিরে যেতে এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা একটি লাইন মনে পড়ে,—

“আমারে ফিরায়ে লহ ওই বসুন্ধরে”[১৬]

অরণ্য মানে শুধু বন- জঙ্গল নয় বা অরণ্য সাহিত্য মানে শুধুই গাছপালা জঙ্গলের বর্ণনা নয়।

অরণ্য সাহিত্য অরণ্যকে ঘিরে আবর্তিত, সেখানকার সকল প্রাণীকুলের অস্তিত্বের কথা বলে, সেখানে বসবাসকারী মানুষের কথা বলে, সেখানে বসবাসকারী পশু পাখি, জন্তু- জানোয়ার কথা বলে। আবার তাদের জীবন জীবিকা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এর কথাও বলে।

দেশে বিদেশে যুগে যুগে সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে নানা সাহিত্য তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। যার নবতম সংযোজন ইকোক্রিটিসিজ বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব। সভ্যতা আজ বিনষ্টের মুখে দাঁড়িয়ে। দূষণের দ্বারা, পুঁজিবাদী মানসিকতার চরম আঘাতে সৃষ্টি ধ্বংসের দিকে পা বাড়িয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আবির্ভূত হয়েছে এই ইকোক্রিটিসিজ। এই পরিবেশ সচেতনতা আজকের নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্যে এর নিদর্শন লক্ষ্য

করা যায়। এই ভাবে যুগে যুগে সাহিত্যে পরিবেশ সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকরা কলম ধরেছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে বাংলা অরণ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যে তথা উপন্যাসে অরণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিরাট বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের “অরণ্যবহ্নি” ও বুদ্ধদেব গুহ-র “লবঙ্গীর জঙ্গলে” উপন্যাস তার পরিচয় বহন করে।

**তথ্যসূত্র :**

১) “কপালকুণ্ডলা”, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম খন্ড, রত্নাবলী প্রকাশনী, ৫৯ এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮।
২) তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টাদশ খন্ড, অষ্টম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২৪,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩পৃষ্ঠা সংখ্যা .৩১৪
৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৪
৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৩
৫) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৬
৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৪
৭) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৬
৮) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৫
৯) জঙ্গল সম্ভার১, বুদ্ধদেব গুহ, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,কলকাতা ৭০০০৭৩,উৎসর্গ পত্র।
১০) লবঙ্গীর জঙ্গলে,বুদ্ধদেব গুহ, ত্রয়োদশ সংস্করণ,তেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ ,পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০ ,৯১।
১১) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৪
১২) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৫
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭
১৬) আত্মপরিচয় রবীন্দ্ররচনাবলী ১১ খন্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৯ পৃষ্ঠা ১৩১।



## বিমল মিত্রের ‘ভগবান কাঁদছে’ উপন্যাসে শিক্ষা, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের বিবর্তন

**প্রশান্ত কুম্ভকার**

স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর এই দুই কালের শিক্ষা, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের স্বরূপ নিয়ে যে সমস্ত বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে বিমল মিত্রের ‘ভগবান কাঁদছে’ একটি অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাসটির মধ্যে স্বাধীনতাকে কেন্দ্রস্থলে রেখে দুই কালের মানুষের জীবনদর্শন সম্পর্কে লেখক আলোকপাত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক দেবব্রত সরকারের ছাত্রজীবনের কথা দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ শাসিত অখণ্ড বাংলার দৌলতপুর গ্রামের এক মেধাবী ছাত্র দেবব্রত। ছাত্র জীবনেই তিনি দেশসেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন, পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হন, দেশের জন্য জেল খাটেন, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। তারপর ছাত্রদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে স্কুল থেকে অপসারিত হন। এই কালপ্রবাহে নিজের চিন্তা, চেতনা দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন যে স্বাধীনতার পূর্বে মানুষ যেমন ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও মানুষ তেমনই আছে। বরং স্বাধীন ভারতে মানুষ নিজেদের দেশের মানুষ দ্বারাই দ্বিগুণ অত্যাচারিত হচ্ছে। তাহলে মানুষরূপী যে সমস্ত ভগবানেরা দেশের জন্য প্রাণ দিলেন, তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগের সার্থকতা কোথায়? তাঁদের কান্না কি দেশের মানুষ শুনতে পাবে না। শুনতে পাবেন না দেশের নিয়ন্ত্রক যাঁরা। মাস্টার দা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ভগৎ সিং আজও কাঁদেন। কিন্তু তাঁদের কান্না আমরা স্বার্থলোভী মানুষেরা শুনতে পাই না। শুনতে পান দেবব্রতর মতো মুষ্টিমেয় মানুষেরা।

‘আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে’ দেবব্রতর মতো মানুষদের জন্ম হয়নি। দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য আজীবন কর্ম করে যাওয়াই দেবব্রতর জীবনের ব্রত। আমাদের জগতে নিরানব্বই ভাগ মানুষেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে একটি ভালো চাকরি করে শহরে বড়ো বাড়ি বানানোর। তার বেশি তারা আর কিছু চায় না, আর চায় না বলেই পায়ও না। চাকরি করে একটা বড়ো বাড়ির মালিক যদি বা কোনোরকমে হয়ও তো সেখানেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এই নিয়ে একটা ছোট্ট জগত তৈরী করে ফেলে এবং ওর মধ্যেই ঘুরপাক খায়। তাই ইংরেজরা কীভাবে বাণিজ্য করতে এসে দেশটাকে ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করে বসলো তা বেশিরভাগ মানুষই বলতে পারবে না। লেখক বলেছেন—‘ এই জন্য বলতে পারবে না যে সবাই-ই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজের টাকা উপার্জনের ধান্দায়, ব্যস্ত নিজের টাকা সুরক্ষিত রাখবার প্রচেষ্টায়,

ব্যস্ত নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থার দুশ্চিন্তায়। আর যারা দেশ সেবার কাজে ব্যস্ত তাদের যতোটা না দেশের স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যস্ততা, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ততা নিজের সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায়'।[২] এই পদ্ধতিকে লেখক বলেছেন রাজনীতি। এই রাজনীতিরও আবার দুই কালের স্বরূপ আলাদা। আগে রাজনীতি ছিল দেশ-সেবা, আর এখন স্বার্থসেবা। আগে রাজনীতি করলে বাবা-মায়েরা বলতেন ছেলে গোল্লায় গেছে। এখন গর্ব করে বলেন তাঁর ছেলে পার্টি করে — পার্টির হোল-টাইম ওয়ার্কার।

এর ব্যতিক্রমী যারা তাঁরা অমর হয়ে আছেন। না, তাই বলে দেবব্রতর অমর হওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। তাঁর ইচ্ছা শুধু নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করা। আর দেশ-সেবা করতে গেলে প্রচুর পড়াশুনোর পাশাপাশি আদর্শ চরিত্র গঠন করতে হবে। তাই ছেলেবেলাতেই দেবব্রত সুলতান আহমেদ সাহেবের 'চরিত্র গঠন শিবিরে' ভর্তি হন। এই শিবিরে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের নিয়ে আহমেদ সাহেব চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেন। শিবিরের নিয়ম-কানুনও বেশ আকর্ষণীয়। প্রতিদিন একটা ডাইরী ছেলেদের মেনটেইন করতেই হবে। প্রতিদিন কী কী কাজ করা হল তার হিসাব ডাইরীতে লিখে রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন — আজ কতগুলো সত্যকথা বলেছি, কতগুলো মিথ্যে কথা বলেছি, আজ স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থের বাইরে কী কী বই পড়েছি, আজ বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছি, স্কুলে মাস্টার মশাইয়ের প্রশ্নের কিরকম উত্তর দিয়েছি ইত্যাদি।[২] কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণার গুরুত্বও দিতেন আহমেদ স্যার। তাঁর বিশ্বাস চরিত্র ছাড়া জীবনের কোনো অর্থ নেই। এই বিশ্বাসের জ্যোতিতে আলোকিত হয়েছে দেবব্রতর জীবন। তাঁর নিজের বলতে যা ছিল, তা হল তাঁর চরিত্র — নিষ্কাম, নিরহঙ্কার, নির্লোভ এবং নির্ভীক। এই জন্যই বিপ্লবী বিনয় বোস দেশ-সেবার কাজে দেবব্রতকে নির্বাচন করেন। বিনয় বোসও মনে করেন দেশকে স্বাধীন করতে গেলে নিজের চরিত্রটাকে গড়তে হবে। আর চরিত্র কিন্তু নিজেকেই গড়তে হবে। আসলে দেবব্রত ছিলেন ঘর থেকেও ঘরহারা, দলে থেকেও দলহারা — ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক। তাই বিনয় তাঁকে উপযুক্ত দেশসেবক মনে করেছেন।

এদিকে সুলতান আহমেদ সাহেব মারা যাওয়ায় 'চরিত্র গঠন শিবির' প্রায় উঠেই গেছে। তবুও আহমেদ সাহেবের অসমাপ্ত কাজটা দেবব্রত কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বইপোকা ও প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্র দেবব্রত না পড়লো ডাক্তারি, না পড়লো ব্যারিস্টারি। পাড়াগাঁর এক স্কুলে পড়িয়ে যেটুকু সময় বাঁচে ছেলে-মেয়েদের বিনা পয়সায় পড়ান। এই নিয়ে তাঁর বাবা মুকুন্দবাবুর দুঃখের শেষ নেই। তাঁর ছেলে দেবু ঘরমুখো আর হল না। কোথায় কার অভাব, কে টাকা-পয়সার অভাবে সংসার চালাতে পারছে না, কার অসুখ-বিসুখ হয়েছে,





কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, টাকার অভাবে কার চিকিৎসা হচ্ছে না, কোন পাড়ায় খাবারের জল পাওয়া যাচ্ছে না সেদিকেই তাঁর মন সবসময় পড়ে থাকে। একদিন তো মুকুন্দবাবু রেগে জিজ্ঞাসাই করে বসলেন যে সারাদিনপরের জন্য দেবু কোথায় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়? দেবব্রত বলেছিলেন 'আমি বাইরের লোকেদের, দেশের লোকেদের, সমাজের লোকেদের পর মনে করি নে'।[৩] মুকুন্দবাবু বুঝতে না পারলে তিনি আরও সহজ-সরল ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ যদি সবল না হয় তাহলে শরীরকে সুস্থ থাকা বলা চলে না। দুটো হাত দুর্বল থাকলো আর দুটো পা সবল হলেই কি শরীরকে ভালো থাকা বলে। তেমনি আমরা ভদ্রলোকের পাড়ার মানুষেরা বড়োলোক রইলাম আর মুসলমান বা মুচি পাড়ার লোকেরা খেতে-পরতে পেলো না, সেটা দেশের পক্ষে সুস্থতার লক্ষণ নয়। দেশের সকল মানুষের, সব জাতের, সব সম্প্রদায়ের অবস্থা ভালো হলেতবেই সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গল। এই হল দেবব্রতর শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস। এই কারণেই উপন্যাসিক বিমল মিত্র এই উপন্যাসে বেশ কয়েকবার একটি বাক্য ধ্রুবপদের মতো ব্যবহার করেছেন — "সব নদীই গঙ্গা নয়, সব পাহাড়ই হিমালয় নয়, সব মৃগই কস্তুরী মৃগ নয়, সব মানুষই দেবব্রত নয়।"

দেবব্রত নিজের সিদ্ধান্ত ও কর্তব্যে অটল। সারা জীবনে কেউ তাঁকে কর্তব্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। তাঁর নিজের বাবা-মা'ই তাঁকে তাঁর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেন নি। মুচিপাড়ায় কলেরা হলে দেবব্রত সারা রাত জেগে তাদের সেবা করে গেছেন। মা খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে বলেন—'ওরা মরছে রোগে ভুগে আর আমি তাদের ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে খাবো ? তাদের জীবনটা বড়ো হলো না আমার খাওয়াটা বড়ো ? জীবনে ভোগের থেকে ত্যাগের মহিমাই বড়ো। একলার উন্নতির চেয়ে তাঁর কাছে সকলের উন্নতিই কাম্য। পাড়ার একজনের বাড়িতে আগুন লাগলে সকলের বাড়িতে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং পাড়ার সকলে মিলে সেই একজনের বাড়ির আগুন নেভানোর দায়িত্ব নিতে হবে। তাঁর বিশ্বাস যা সমষ্টির কল্যাণ করে, তাই-ই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। স্বদেশী অর্থাৎ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া থেকে তাঁর বাবা-মা অনেক বার নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি ছাড়েন নি। একদিন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং জেলখানায় পুরে দেয়। জেলে বসে তিনি শুধু ভাবেন যে, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারলেন না। দেশ ও দেশের মানুষদের জন্য তাঁর ত্যাগ, চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জেল খেটেছেন পরবর্তীকালে তাঁরাই কেউ মিনিস্টার হয়েছেন, কেউ চিপ মিনিস্টার হয়েছেন। যাঁরা তা হতে পারেন নি, তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের পেনসন্ পাচ্ছেন। কিন্তু দেবব্রত অন্য জাতের মানুষ। ছাত্রজীবনে বিপ্লবী বিনয় বোস তাঁকে দেশ-সেবার

জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, তা তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি। তাঁর উপলব্ধি স্বার্থ ছাড়া মানুষ কিছু বোঝে না। এই যে ব্রিটিশদের তাড়ানো, এও সেই একই কারণে। তাদের কোনও রকমে তাড়িয়ে দিতে পারলে আমরা সবাই তাদের খালি সিংহাসনগুলোতে বসতে পারবো।[৪] আমরা কেউই দেশকে ভালোবাসি না, নিজেদেরই ভালোবাসি। এটা রোধ করার একমাত্র উপায় চরিত্রগঠন।

এরপর দেশ ভাগ হয়ে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেবব্রত অনেক সন্ধান করে জানতে পারলেন তাঁর বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। তাঁর স্ত্রী মিনতি জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁরই ছাত্র সাহাবুদ্দীনকে বিয়ে করে পাকিস্থান চলে গেছে। সেখানে সাহাবুউদ্দীন মিনিস্টার হয়েছে। দেবব্রত এখন বড়ো একা। দেশের সমস্ত লোক যেন দেশটাকে নিজের নিজের সম্পত্তি মনে করেছে। কেন সবাই এরকম হয়ে গেল? যারা দেশের কর্ণধার হয়ে গেল তারা কি কোনও দিন সাধারন মানুষের কথা ভেবেছে। নেতাজী থাকলে কি এরকম হতে দিতেন? এমন করে দেশটা টুকরো টুকরো হতো? এই সব ভাবনাগুলো তাঁর মাথা কুরে কুরে খায়। দেবব্রত বলেন — 'এই যে হিন্দুরা মুসলমানদের খুন করে ফেলছে, মুসলমানরা হিন্দুদের খুন করে ফেলছে। কেউ অফিসে কাজ করছে না, এই যে পাকিস্থান হিন্দুস্থান হলো, তবু তো খুনোখুনি বন্ধ হলো না, সবাই অফিসে গিয়ে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, আর যারা সারাজীবন মন-প্রাণ দিয়ে দেশ সেবা করলে, তাদের ঠেলে দিয়ে সুবিধেবাদীরা সামনে এগিয়ে সব বড়ো-বড়ো পোস্টগুলোতে জাঁকিয়ে বসলো, কে মন্ত্রী হবে তাই নিয়ে ঝগড়া মারামারি করতে শুরু করে দিলে, এরকম ব্রিটিশ আমলে ছিল না। তখন অন্ততঃ গুণের কদর ছিল, পরিশ্রমের দাম ছিল, নিষ্ঠার পুরস্কার ছিল।[৫] এখন মানুষের মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। স্বাধীন দেশের লোকেরাই স্বাধীন দেশের সম্পত্তি চুরি করছে। তারা বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে ভাড়া ফাঁকি দিচ্ছে, আয়কর ফাঁকি দিয়ে স্বাধীন দেশের সম্পত্তি লুটপাট করছে। এখন তো ইংরেজ নেই তবু অত্যাচার লক্ষগুণ বেড়েছে। এরজন্য আমরা এখন কার বিরুদ্ধে লড়বো? আর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক? আসছি সে কথায়।

সব হারানোর পর কাকা গোলোকেন্দু বাবুর অনুরোধে দেবব্রত একটি সরকারি স্কুলের হেডমাস্টারের পদে যোগদান করেন। সাধাসিধে পোশাক, সামান্য নিরামিষ খাওয়া দাওয়া। তাঁর ধারণা আমাদের দেশ এতো গরীব যে, এদেশে বাবুয়ানি করা পাপ। যে-দেশে শতকরা ষাট ভাগ লোক গরীব, সে-দেশে এতো বিলাসিতা কি ভালো? স্কুলে কাজের জন্য মাইনে নিতে আপত্তি না থাকলেও বাড়িতে ছাত্রদের কাছ থেকে কাকার মতোই কোন টাকা নিতেন না। সব ছাত্র-ছাত্রী দেবব্রতর পড়ানোয় মুগ্ধ হয়ে যেত। পাঠ্য বইয়ের অতিরিক্ত কিছু পড়ানো, কিছু ভাবানোই ছিল দেবব্রতর পড়ানোর বৈশিষ্ট্য। স্কুলের বেশিরভাগ



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ছাত্র-ছাত্রী দেবব্রতর কাছে বিনা টাকায় পড়তো। তাই দেখে একদিন স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক সুশীলবাবু তাঁকে আড়ালে ডেকে বলেন, তা ছাত্রদের বাড়িতে পড়ান ভালোই করেন, কিন্তু 'আমাদের এত লোকসান করেন কেন?' একথা শুনে দেবব্রত আকাশ থেকে পড়েন। সুশীলবাবু বলেন —'আপনার জন্য কোচিং ক্লাসে আমাদেরছাত্র হচ্ছে না। আপনি বিনা-পয়সায় পড়ালে কে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে আমাদের কোচিং ক্লাসে পড়বে বলুন?'[৬]

দেবব্রত যেমন আদর্শ ছাত্র ছিলেন, তেমনি আদর্শ শিক্ষকও ছিলেন। তিনি জীবনে কোনো দিন পান, বিড়ি, সিগারেট মুখে দেন নি। তিনি নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের হেডমাস্টার। একদিন দেখলেন তাঁরই স্কুলের তিনজন ছাত্র টিফিনের সময় মদের দোকানে গিয়ে মদের সঙ্গে টিফিন করছে। মদের দোকানের মালিকের কাছে তিনি জানতে পারেন এই তিনজন রোজই সেখানে গিয়ে মদ খায়। সেজন্য এই তিন ছাত্রকে তিনি স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন। সেই তিনজন ছাত্রের গার্জেনরা এসে উল্টে তাঁকেই শাসিয়ে বলেছেন, স্কুলের ম্যানেজিং কমেটিকে বলে তাঁর চাকরি খাবেন। পরের দিন স্কুলে জরুরী মিটিং ডাকা হলো। দেশের গণ্যমান্য মানুষেরা সেই স্কুলের সদস্য। ঐ তিনজন ছাত্রের গার্জেনও প্রতাপশালী ব্যক্তি। একজন কোটিপতি বিজ্‌নেসম্যান। আর একজন দেশের শিক্ষামন্ত্রীর আপন ভাই। আর তৃতীয় জন হলেন ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের হোম-সেক্রেটারির জ্যাঠামশাইয়ের নাতি। তিনজনেই সকলের শ্রদ্ধাভাজন মানুষ। স্বভাবতই যে দোকানে ঐ তিন ছাত্র মদ খেত সেই দোকানদার ননীলাল সাহা অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেও ছাত্রদের চিনতে পারল না। ব্যস বিচার শেষ হয়ে গেল। হেডমাস্টার নিজের চোখে ছাত্রদের মদ খেতে দেখেছেন এটা প্রমাণ করতে পারলেন না। সেক্রেটারি তাঁকে বললেন —'জানেন ওই তিনজন ছাত্রের অভিভাবকরা খুব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক'। কিন্তু দেবব্রত তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে একপাও সরে আসেন নি। ফলে তাঁর চরিত্র নিয়েও কথা উঠল এবং মিটিংয়ে এটাই সাব্যস্ত হল যে, দেবব্রত সরকারকেই স্কুল থেকে রাস্টিকেট করা উচিত।

স্কুলের নাম 'নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল'। এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন দেবব্রতর কাকা গোলকেন্দু সরকার। তাঁর মৃত্যুর পর দেবব্রতকে স্কুল-কমিটির নির্দেশে হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত করা হয়। দেবব্রতর আমলেই এই স্কুল থেকে প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে একটি স্থান ছাত্র-ছাত্রীরা দখল করতই। এই স্কুল থেকে অনেক ছাত্র সর্বভারতীয় পরীক্ষায় পাশ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলে এই স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি হয়েছিল দেবব্রতর সময়েই। কিন্তু দেবব্রত এই স্কুলে আসার পর থেকেই চরিত্র গঠনকে কেন্দ্র করে একে একে বিরোধ বাধল সকলের সঙ্গে। প্রথমতঃ সহকর্মী শিক্ষকদের সঙ্গে বিরোধ বাধল, তারপর স্কুল কমিটির সঙ্গে বিরোধ বাধল।

শিক্ষকদের কোচিং-স্কুল নিয়ে বিরোধ বাধল, 'টিউটোরিয়াল হোম' খোলা নিয়ে বিরোধ বাধল। দেবব্রতবাবুকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আগে স্কুল কমিটি তাঁর অবদানের কথা একবারও মনে করতে পারল না। পরের মিটিংয়ে স্কুলের যিনি সিনিয়র টিচার সেই সুশীলবাবু, যিনি 'টিউটোরিয়াল হোম' করে বড়োলোক হয়েছিলেন, তাঁকেই হেডমাস্টার করা হল। 'নববিধান চরিত্র গঠন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে'র হেডমাস্টার পদটির জন্য তাঁর চেয়ে বেশি সৎ আর বেশি শিক্ষিত লোক খুঁজে পাওয়া গেল না।

**তথ্যসূত্র :**

১। বিমল মিত্র : ভগবান কাঁদছে, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ : ৫০।
২। তদেব : পৃ : ১৭
৩। তদেব : পৃ : ৭৭
৪। তদেব : পৃ : ১২৩
৫। তদেব : পৃ : ১৪২
৬। তদেব : পৃ : ১৫২



## নবাঙ্কুর : লেখিকার আত্ম-অন্বেষণের শিল্পরূপ

**ড. মানস আচার্য**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে একদিকে যেমন দেখা যাচ্ছিল দেশভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ মহামারী এবং তার হাত ধরেই এল যত সামাজিক বিকৃতি। প্রেমহীন পৃথিবী-হিংসা-দ্বেষ-সন্দেহ আর ভয় লক্ষ্য করে একদল কবি ও লেখকদের মতো জীবনানন্দ লিখলেন "সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ।"[১] অন্যদিকে সমাজ পরিবর্তনের জন্য একদল মুক্তিকামী মানুষের মনে এক দায়বদ্ধতা থেকে শুরু হয়েছিল সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। জীবনে যাপনে এই দর্শন নিয়ে সাহিত্যাকাশে উপস্থিত হলেন লেখিকা সুলেখা সান্যাল।

১৯৬২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মাত্র ৩৫ বছর বয়সে সুলেখা সান্যালের ট্র্যাজেডিময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। দুরারোগ্য লুকোমিয়া রোগের কারণে। মৃত্যুর করাল ছায়া তাকে জীবন সম্পর্কে কখনো বিরূপ করে তোলেননি। ১৯৫৭ সালে ধরা পড়লেও ১৯৫৫ থেকে তিনি এই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য এই সময় পর্যন্ত তার যেমন কোন উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়নি। তিনি জীবনের এই শেষ সাত-আটটি বছর যেন শেষ জীবনী শক্তিটুকু নিগড়ে দিয়ে, সমস্ত রকম সামাজিক যোগাযোগ পরিত্যাগ করে নিজেকে উৎসর্গ করলেন সাহিত্য সাধনায়। তখন থেকেই তিনি নিজেকে সকল পরিচিত মহল থেকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি মেয়েদের জন্য লিখে যেতে চান। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী ও তাঁর পারিবারিক-সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, বিষন্নতা। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি আপনজনদের বিশ্বাসহীনতায় হতাশ ও ক্লান্ত। কিন্তু কাউকে দোষারোপ না করে লেখিকা এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমাজে নারীদের সংকট ও সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে প্রধানত ফুটে উঠেছে লেখিকার আত্ম-অন্বেষণের শিল্পরূপ। লেখিকা এই স্বল্প পরিসরের জীবনে রচনা করেছিলেন দুটি উপন্যাস 'নবাঙ্কুর' এবং 'দেওয়াল পদ্ম' এবং প্রায় ৩১ টি ছোটগল্প। যা থেকে নির্বাচিত আটটি গল্প নিয়ে সংকলিত হয়েছিল 'সিঁদুর মেঘ'।

'নবাঙ্কুর' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয়া 'মধ্যবিত্ত' পত্রিকায় ১৩৬২ সালে। নবাঙ্কুর উপন্যাসটির লেখিকার আত্মজৈবনিক উপন্যাস। তৎকালীন সামাজিক কাঠামোয় নারীর স্থান কোথায় এই প্রশ্ন লেখিকাকে তাড়া করে ফিরেছিল। তিনি জানতে চেয়েছিলেন নারী-পুরুষের সমান অধিকার নেই কেন? একদিকে নারীর অধিকার স্থাপনের জন্য লড়াই, অন্যদিকে মানুষের শ্রেয়বোধের উত্তরণের জন্য তিনি আশাবাদী। তাঁর আত্মপ্রত্যয় আপসহীন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে লড়াই যেন সঞ্চারিত হয়ে যায় এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছবির মধ্যে। তিনি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। তার চারিত্রিক দৃঢ়তাই ছবি

চরিত্রে ধরা পড়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের কোড়কাদি গ্রামে ১৯২৮ সালের ১৫ ই জুন জন্মগ্রহণ করেন সুলেখা সান্যাল। তাঁদের পূর্বপুরুষের কয়েকটি নীলকুঠি ছিল কিন্তু কালের বিবর্তনে সেসব ইতিহাস। তাঁরা নামে জমিদার বংশের সন্তান হলেও সে ঐশ্বর্য আর ছিল না। এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান হিসেবে তাঁদের এক পরিবর্তমান জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছিল। বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা অবন্তী কুমার সান্যাল তাঁর ভাই। চট্টগ্রামে মাসির বাড়িতে তাঁর শৈশব কাটে। সাত বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন তিনি।

১৯৪২ সালে চট্টগ্রামে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে তিনি নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। ১৯৪৪ সালে জমিদার বাড়ির প্রথা ভেঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রাইভেটে। ১৯৪৬ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে থেকে আই. এ পাস করে কলকাতায় এসে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন বি. এ পড়ার জন্য। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন ও গ্রেপ্তার বরণ করেন। সেই কারণে সেবারেও তার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তবে পরে জেলে বসেই তিনি বি. এ পাস করেন। সেখানেই তিনি তাঁর পছন্দের আর এক সহযোদ্ধা রাজনৈতিক নেতা চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসকে বিবাহ করেন। তাঁদের মৃত সন্তান জন্ম নেয়, বৈবাহিকজীবনও সুখের হয়নি। ১৯৫৫ সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এরপর তিনি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন। এই সময় তিনি মানসিক দিক দিয়ে লেখক ও সম্পাদক নন্দী ভৌমিকের কাছাকাছি এসে পড়েন।

'নবাঙ্কুর' লেখিকার সর্বশেষ্ঠ কীর্তি। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ছবি। তার শৈশব থেকে আরম্ভ করে যৌবনে পদার্পন পর্যন্ত প্রায় সাত-আট বছর থেকে শুরু করে পনেরো-যোল বছরের জীবন কথা উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। বলাই বাহুল্য লেখিকা তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো দিয়েই ছবির জীবনভাস্য রচনা করেছেন। উপন্যাসে লেখিকার জীবনের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে রয়েছে ছোট্ট ছবির পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা। দ্বিতীয় স্তরে তাকে দেখা যায় লেখিকার মতই পিসিমার বাড়িতে গিয়ে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে। তৃতীয় স্তরে দেখা যায় বিশ্বযুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তার গ্রামে প্রত্যাবর্তন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।

প্রথম স্তরে ছবি ছোট্ট বালিকা। এই অংশে তার চোখে দেখা সমাজের ছবি গুলোকে অনুভবের আলোকে আমরা দেখতে পাই। গল্পের এই অংশে ছবি প্রায় দর্শক। ছবি তার পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই জীবনকে চিনে নেয়। সে তার সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সেগুলোর ভালো-মন্দ সত্যা-সত্য বিচার করে। সে যুক্তি দিয়ে বিচার কারে, মুখের কথায় নয়। সে শুনেছে তাদের অতীতে বয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের ইতিহাস। তাদের পূর্বপুরুষের নাকি উনিশিটা নীলকুঠি ছিল। হরিদাদু, দাদু, বলরাম দাদু আর পাশের ভাঙা দালান কোঠা বাড়ি যার ইট বেরিয়ে আছে সেই ঘরের দু-দাদুরা নাকি একই পরিবারভুক্ত ছিল। এখন



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

আর সে একান্নবর্তী পরিবার নেই। সবাই আলাদা আলাদা থাকে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক। এক দাদু নাকি কলকাতায় গিয়ে নিলকুঠিগুলো বিক্রি করে সেই যে চলে যায় আর গ্রামে ফেরেনি। বলরাম ছোট ভাইয়ের বিপ্লবী সন্তান অধীর কাকাকে অনায়াসে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। আবার দুশ্চরিত্র ছেলের উপর হামলার প্রতিশোধ নিতে পাশের গ্রাম কুসুমপুরে লাঠিয়ালদের সাহায্যের আগুন ধরিয়ে দেয়। ছবির মন এইসব অন্যায়কে মেনে নিতে পারেননি ছবির দাদু দক্ষিণারঞ্জন জমিদারি চলে গেলেও আর তার প্রতাপ প্রতিপত্তি ভুলতে পারেনি। মাছ না দিলে শশীকে অন্যায় ভাবে জুতো পেটা করে, ছবি দেখে অনিল কাকা বউকে ধরে মারে। এ ব্যাপারে মহিলামহলের একটা প্রচ্ছন্ন মদত ও সমর্থন আছে। যা তার ঠাকুমার উক্তিতে স্পষ্ট ফুটে উঠে, 'পুরুষ মানুষেরা ওরকম একটু হয়েই থাকে'[২]।

ছবির মা মমতা কলকাতার মেয়ে। সে পড়াশুনা থেকে শুরু করে গান বাজনা সবই জানতো। কিন্তু পারিবারিক নিয়মানুসারে বিয়ের পর সে সব সখ আহ্লাদের বিসর্জন দিয়েছে। এখানে নারীর জীবন কেবল এক তারেতেই বাঁধা খাওয়ার পরে রাঁধা, আর রাঁধার পরে খাওয়া। মমতা সব কিছু মেনে নিয়ে এবাড়িতে ঢুকলেও ঠাকুমার অকথা কুকথা তাকে শুনতে হত। কারণ সে শহরের "মেমবিবি" এবং "কালো"। সে দেখেছে কালো মুখ্যু বিন্তি পিসিকে। বিয়ের বাজারে গুণ নয় সৌন্দর্য্য আর অর্থকেই বড়ো করে দেখা হয়। তাই বিন্তি পিসির বর জোটে তিন ছেলের বাপ। ঠাকুমার প্রতিবাদ কাজে আসে না। বড় পিসি হাসি খুশি আবার কাঁদতেও জানে। চোখের জল মুছতে মুছতে সবার অলক্ষ্যে সে ছবির মাকে জানায় "শুধু শাড়ি গয়নায় যদি মেয়ে মানুষের সাধ মিটতো বৌদি, জান এই দশবছর ও আমার পাশে শুয়ে ভেবেছে সেই মেয়েটাকে"।৩ বড় পিসি কাউকে দোষ দেয় না। তার নিজের ভাগ্যকেই দোষ দেয়। আসলে মেয়েরা সমাজ সংস্কারের নিগড়ে পড়ে এমনটা ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের যে চাহিদা আছে, অধিকার আছে তা যেন তারা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু ছবি ছোট্ট মেয়ে হলেও ভাগ্য বা নিয়তিকে সে মেনে নেয়নি। সে বয়সেই তার অনেক আচরণেই তার প্রতিবাদটি ফুটিয়ে তুলেছে। পল্টু আর প্রদীপ দু'বার মুড়কি আর একটু ক্ষীর চাইলে পূর্ণশশী সস্নেহে তা দিলেও ছবিকে দিতে চায়নি। কারণ ছেলে ও মেয়ে তার কাছে সমান নয়। ছবি তার তীব্র প্রতিবাদ করে। মেয়ের এই প্রতিবাদে মায়ের পূর্ণ সমর্থন থাকলেও এই বিপ্রতীপ প্রতিবেশে মেয়ের জন্য তাকে কথা শুনতে হয়। কারণ মায়ের উচিত মেয়েকে শিখিয়ে দেওয়া সবকিছুতে তার সমান অধিকার নেই, কারণ সে মেয়ে। ছবি কেবল সমাজে হেরে যাওয়া নারীদেরই দেখেনি, কিছু কিছু বিদ্রোহীনী নারী তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এইভাবে উপন্যাসের প্রথম স্তরে ছবির ক্রমবিকাশের স্তরটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় স্তরে ছবিকে শহরে চলে আসতে দেখি তার বড় পিসি সুকুমারীর কাছে।

সুকুমারী নিঃসন্তান। সে ছবিকে কাছে রাখতে চায়। অন্যদিকে মা মমতা মেয়েকে পড়াতে চায়। যা গ্রামে থাকলে অসম্ভব। এই দুয়ের মধ্যে পড়ে ছবি কাঁদে, অভিমান করে, কান্না গোপন করে। এখানে তার নতুন নতুন সাথী মেলে। এক লহমায় স্কুলের বন্ধু ও পাড়ার সাথী, সামাজিক পরিবেশ সব পালটে যায়। উপরন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয় এক যুদ্ধকল্পিত রাজনৈতিক আবহাওয়া। শহরে যাবার পথে স্টিমার ঘাটে প্রথমে পরিচয় হয় মিনু, অসীম ও তাদের মায়ের সঙ্গে। পরে জানতে পারে এই মিনুই তাদের সহপাঠী। মিনুর বাবা নেই, মা হাসপাতালে কাজ করে। মেয়ে মানুষ হাসপাতালে কাজ করে- এই বিষয়টি ছবির কাছে অভিনব মনে হয়। সে ধীরে ধীরে এই পরিবারের জীবন জটিলতার চিত্র প্রত্যক্ষ করে। মিনুর মা ভারতী খ্রিস্টান। তাই ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে ভাবতে পারে না। অন্য দিকে মিনু ও অসীম ভারতবর্ষকে নিজের মনে করে এখানেই থেকে যেতে চায়। ছবি দেখে কিভাবে অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। বিশেষত মেয়েরাই তার শিকার হয়। পিসিমার পাশের বাড়ির দুটি মেয়ে পিলু আর নীলুর বাবা মারা গেছে, ভাই রোগগ্রস্ত। ঔষুধ কেনার পয়সা তাদের নেই। ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়ে বাঁচানোর চেষ্টা, যার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। তার মা ছবির উপর রাগ করে। কারণ তার মনে হয়েছে ছবি না থাকলে হয়তো পিলু তার বড় পিসির ঘরে স্থান পেত। দুটো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতো। নীলু বড় হয়ে ফ্রক ছেড়ে শারী পরে। হরনাথের মেসের সুকুমার তাকে শাড়ী দেয় পাউডার দেয়। নীলু জানে সে অসভ্য তবুও তার কাছে যায়। ছবি মানা করলেও তার কাছে গিয়ে থাকতে পারে না। কারণ সে বিয়ের আশ্বাস পেয়েছে। ছবি জানতে পারে মেয়েদের একমাত্র গতি বিয়ে। কিন্তু নীলুর পরিণতি ছবিকে নাড়া দেয়। কথা দিয়ে সুকুমার কথা রাখেনি, এক বিশ্বাস ভঙ্গের ভয়ঙ্কর চিত্র তার চোখে ধরা পড়ে। এক মিলিটারী কন্ট্রাক্টর তাকে কিনে নিয়ে যায় ব্যবসা করবে বলে। ছবি অনেক রকম ব্যবসার কথা শুনলেও মেয়ে মানুষ নিয়ে ব্যবসা, ছবি এক নতুন অভিজ্ঞতায় ভয়ে হতাশায় বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ে।

এই পর্বে আমরা আর এক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। যার নাম পরিবানু। যে এই বয়সেই জীবনের বাস্তবটাকে সামনে থেকে দেখেছেন। সেও স্কুলে পড়ে। স্কুলের ফিজ জমা করতে না পারায় তার নাম কাটা যায়। বড়দিদিমণির বাড়িতে ঘুটে দেওয়ার পরিবর্তে সে পড়ার সুযোগ পায়। ক্লাসে সে প্রথম হলেও তার নাম প্রথমে রাখা হয় না। সে জাতিতে পাঠান বলে কারও বাড়িতে চাকরি করতে পারে না। তবু অসুস্থ মানুষকে সাহায্য করবে বলে সে বেগমের অঙ্গমার্জনার কাজ নেয়।

মায়ের মৃত্যুর পর সে তার ভালোবাসার পাত্র দিননাথের সঙ্গে অন্যত্র চলে যায়। নীলুর করুণ পরিণতির সঙ্গে পরিবানুর জেদ ছবিকে জীবন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। স্কুলে সে দু'রকম দিদিমণির সাক্ষাৎ পায়। প্রথম শ্রেণির মধ্যে পড়ে হেডমিস্ট্রস আমলা দিদিমণি,





যিনি সরকারী কলেজের সাহেব মেজিস্টেট প্রমুখও সরকারী কর্মীদের ছেলেমেয়েদের তোয়াজ করে। পরীক্ষায় তারা প্রথম না হলেও তাদেরকেই তিনি প্রথম করেন। তিনি যে ইংরেজদের সমর্থন করেন। দ্বিতীয় পক্ষে পড়ে সুধাদি। যিনি সকলকেই সমান চোখে দেখেন। বিশেষ করে ছবি তার গ্রাম্য সরলতার জন্য তার কাছে প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনকে সুধাদি সমর্থন করেন। স্বদেশীদের ধরে ধরে আন্দামানে নির্বাসন দিয়ে তাদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন করা হয় তার প্রতিবাদে যে হরতাল হয় তাকে তিনি সমর্থন করেন। ফলে তার চাকুরী যায়। কিন্তু ছবির আগ্রহে সুধাদি তার প্রাইভেট টিউটার রূপে দু'বছর থেকে যান। তিনি ছবিকে দেশ বিদেশের গল্প শোনান। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র সাম্যবাদের গল্প শোনান। এ ভাবে ছবির শৈশবে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার যে বীজ অধীরকাকা বপন করেছিলেন মায়ের প্রশ্রয়ে সুধাদির সংস্পর্শে তা পুস্পে পল্লবে প্রস্ফুটিত হইয়ে ওঠে।

তৃতীয় পর্বে আমরা দেখি লেখিকার মতোই জাপানি বোমার আতঙ্কের মধ্য দিয়েই স্কুলের পড়া অসমাপ্ত রেখে ছবি শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। তার ফেলে যাওয়া গ্রাম এখন অনেক বদলে গেছে। পাঠশালায় সেই কালিমাস্টার আর নেই। বন্ধুরা সকলেই সমাজের নিয়ম মেনে সকলেই বিবাহিত। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ কারও দেহে অপুষ্টির চিহ্ন ফুটে উঠেছে, কেউ বা তিন ছেলে মেয়ের মা, কেউ বা অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। অধীরকাকা তাকে জানিয়ে ছিল — "লেখাপড়া কর জানতে শেখ, নিজেকে গুটিয়ে রাখিস নে। তোর বাবা তোকে বেঁধে রাখতে চাইবেন, দাদু হুঙ্কার ছড়বেন, মা ঠাকুমার চোখের জল ভাসিয়ে দেবে কিন্তু ভয় পাসনে, ছবি। ভয় পেলে তো চলবে না, ভাবছিস লেখাপড়া শিখলেই বুঝি মুক্তি! চাকরি করলেই বুঝি সম্মান! কিন্তু এদেশে তার কোনটাই নেই। তবু ছবি, তোকে আমি ভয় দেখাবো না। ক্রমশ আসল গলদটা যেদিন ধরতে পারবি সেদিন পৃথিবীতে ভয় পাবার আর কিছু থাকবে না। অনেক দুর্দিন পার হতে হবে, হয়তো প্রাণটাও দিতে হবে সে মুক্তি আনবার জন্য, কিন্তু খুব আনন্দ তাতে। সেই মুক্তির আনন্দে হাসতে হাসতে প্রাণ দিচ্ছে আজ অনেক দেশের মেয়েরা"[৪]

ছবি তার ছোট বেলার বন্ধুদের দেখে মেয়ে মানুষের অনিবার্য পরিণতির চিত্র অনুভব করে। এখানেও ছবির প্রতিবাদ ও লড়াই বজায় থাকে। কাকার কথা স্মরণ করে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেই সে পড়াশুনা চালিয়ে যায়, তাকে বড়ো হতেই হবে। এই পর্বে অধীর কাকার আর তার এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখন সে জেল ফেরত যক্ষ্মা রোগী অধীর কাকার কাছে আদর্শের পাঠ, দেশ সেবার পাঠ নেয়। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তমালের সঙ্গে যে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তমালের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ভালোভাবে পাশ করে। ইতিমধ্যে অধীর কাকার মৃত্যু হয়। ছবির প্রতিবাদ কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে নয়, অন্যায়

সামাজিক প্রথা ও অনুশাসনের কাছে। ছোটবেলায় সে ঠাকুমার আচরণে প্রতিবাদ জানালেও তার দুঃখ সে বোঝে। ঠাকুমাও তাকে আপন করে নেয় বাবা কুলদা এই অবাধ্য মেয়েকে ভর্ৎসনা করে কিন্তু ছবি যখন উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতার পথে পা বাড়ায় — তখন তার হাতে একগোছা নোট তুলে দেয়। ঠাকুরদার অনুশাসন সে মানেনি, কিন্তু তার মৃত্যুতে সে কান্না ধরে রাখতে পারেনি। ছবি কারো প্রতি বিরাগ মনে পুষে রাখেনি। বারে বারেই তার আপাত কঠিন রূপের মধ্যকার কোমল মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। যার লড়াই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে। তাকে তো মানবিক গুণ সম্পন্ন না হলে চলে না। ট্রেনে চেপে কলকাতায় যাবার সময় ছবির অনুভব-"চলাটাই আসল চলতে হবে। ততক্ষণে নতুন আর এক প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছে তার মন আর সমস্ত চেতনা"৫ আর এক আরম্ভের সূচনা দেখিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়। আসলে বেঁচে থাকা মানে থেমে থাকা নয় এগিয়ে চলা, লেখিওকার এই আত্ম-অন্বেষণই উপন্যাসে শিলরূপ লাভ করেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বেলা অবেলা কালবেলা, '১৯৪৬-৪৭', ভারবি, পৃ. ১১৭
২। সুলেখা সান্যাল, 'নবাঙ্কুর', মনীষা গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা-২৯
৩। ওই, পৃষ্ঠা- ৬৮
৪। ওই, পৃষ্ঠা- ১৮৬
৫। ওই, পৃষ্ঠা-২৭২



## 'দশমী দিবসে' : বিসর্জনের কথা ও কাহিনি

**শ্রাবন্তী মজুমদার**

"এই উপন্যাসের কথা ভেবেছিলাম বহুবছর বাদে ২০০০ সালে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখে, যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের কপোতাক্ষকূলে বসে বিদায়ঘাটের কথা শুনে। কবি মধুসূদন, মা জাহ্নবীকে নিয়ে যে বিদায়ঘাটের যে কাহিনি শুনেছিলাম আমি, সেই বিদায়ঘাটই আমাকে প্ররোচিত করে এই উপন্যাস লিখনে।"১

'দশমী দিবসে' (২০১৪) উপন্যাসের 'আরম্ভ' অংশে এরকমটাই জানিয়েছেন অমর মিত্র। অমর মিত্রের জন্ম (১৯৫১) দেশভাগের পর। তখন তিনি নেহাতই শিশু। পূর্ববঙ্গের সাতক্ষীরা উপজেলার ধূলিহর গ্রামের সাতপুরুষের ভিটেবাড়ির কথা অমর মিত্রের স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে। তিনি শৈশবেই এপারে চলে আসেন। যেহেতু সাতক্ষীরা ধূলিহর সীমান্তের খুব কাছে, হয়ত সেই কারণেই ওই অঞ্চলের বহু মানুষের মতো লেখকের পরিবারও পার্টিশনের সময় সহজেই বসিরহাটে এসে উঠতে পেরেছিল। মা রাধারানির কাছে তন্ময় হয়ে অমর মিত্র শুনতেন তাঁর বাপের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা কপোতাক্ষ নদের কথা। মায়ের স্মৃতি রোমন্থনের নীরব অশ্রুবিন্দুর মধ্যেই অমর মিত্র খুঁজে পেয়েছিলেন অদেখা দেশভাগের মর্মন্তুদ জ্বালা। অমর মিত্রের ঠাকুরদা অন্নদাচরণ বিশ্বাস করতেন, পার্টিশন নামের অদ্ভুত সিস্টেম টিকে থাকতে পারে না। তাই ওপার ছেড়ে এপারে, সীমান্তবর্তী বসিরহাট মহকুমার দণ্ডীরহাটে বাড়ি কিনেছিলেন। অন্নদাচরণের মনে ক্ষীণ আশা ছিল যদি সীমান্তরেখা মুছে যায় তবে বেতনা নদী পেরিয়ে সপরিবারে পুনরায় কপোতাক্ষ পাড়ের ধূলিহরে ফিরতে পারবেন। অমর মিত্রকেও তাই জন্মের পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই জন্মভূমি ছেড়ে দণ্ডীরহাটে চলে আসতে হয়। বাবার কর্মস্থলের সুবিধার্থে বেলগাছিয়ায় বাসাবাড়ি নেন। এবং সেই বাড়িটিই হয়ে ওঠে বহু উদবাস্তু মানুষের ক্ষণিকের প্রতীক্ষালয়। আত্মীয়, প্রতিবেশি যারাই এসেছে এপারে তারা ওই বাড়িটিতে থেকে যে যার মতো আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করেছে। এভাবেই ছেলেবেলায় বেলগাছিয়ার বাড়িতে ওপার থেকে যখন যারাই এসেছে, তাদের মুখে মুখে ফেলে আসা দেশ-গ্রামের কথা তিনি শুনেছেন। পারিবারিক কথোপকথন ও হৃদ্যতায় সীমান্তরেখা নতুন কোনো মানে নিয়ে আসেনি। জানা যায় অমর মিত্রের কোনো এক বউদির বৃদ্ধা দিদিমা বীরাঙ্গনা দাসী প্রায়শই আসতেন বেলগাছিয়ায়। তিনি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুঃসম্পর্কের নাতনি এবং মানকুমারী বসুর ভাইঝি। এই বৃদ্ধার মুখেই তিনি প্রথম শুনেছিলেন মাইকেল মধুসূদনের প্রশস্তি, কপোতাক্ষ কবিতা— 'সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে/সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।'২ শৈশবেই সেই অল্প বয়স থেকেই বিভাজন জনিত রাষ্ট্রনৈতিক দূরত্ব ছাড়াও দেশভাগ তাঁর কাছে অন্য এক অর্থ নিয়ে এসেছিল। বাস্তব জীবনের এই বীরাঙ্গনা দাসী-ই ভাঙনের বিদায় ব্যথা ধারণ

করে লেখকের নির্মাণে চারণ কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পাশাপাশি এই উপন্যাসে দেশভাগ জনিত আত্মগতসংকট, জাতিগত সংকট কীভাবে মানব সত্তায় আঘাত হেনেছিল বা কী গভীর ক্ষতই না তৈরি করেছিল সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য এই উপন্যাস। মাইকেল মধুসূদনের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের সমান্তরালে দেশভাগ এবং ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণাকে মিলিয়ে অমর মিত্র বস্তুত রচনা করলেন বেদনাঘন এক করুণ আলেখ্য।

৬২ টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বীরাঙ্গনা দাসী। জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের হলেও দেশভাগের কারনে এপারে চলে আসেন। কখনো বসিরহাটে নিজের বাড়িতে কখনো বেলগাছিয়ায় দুঃসম্পর্কের আত্মীয় অভিরামের বাড়িতে আবার কখনো দিল্লিতে মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটান। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর এই ভ্রমণ কেবল মাত্র অসহায়তা বা দারিদ্র্য জনিত নয়, বরং এর মধ্যে দিয়ে চারণ কবির মতো মধুসূদনের কীর্তিগাথাকে ছড়িয়ে দেবার এক প্রয়াস সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকে যায়। নানান চরিত্রের বিন্যাসে মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত, তাঁর মায়ের হাহাকার, দেশত্যাগের কারণে সাধারণ অগণিত মানুষের উদ্বাস্তু যন্ত্রণা উপজীব্য বিষয় হলেও এর অতলে বয়ে যায় রামায়ণের মিথিক্যাল ধারা। সর্বোপরি পার্টিশন পরবর্তী এপার-ওপার বাংলার কথা, সমকালীন ভারতবর্ষের কথাও জায়গা করে নেয় এই আখ্যানে, যা উত্তর প্রজন্মের কাছে শিকড় সন্ধানের বার্তা তুলে দেয়। পার্টিশন পূর্ব বীরাঙ্গনা দাসীর এই মর্মগাথা ধারণ করে উত্তর প্রজন্মের হাবলু ওরফে অমিতাভ।

অমর মিত্র মূলত তাঁর আখ্যানভাগ সাজিয়েছেন একটি বিভাজন রেখা এবং তার দুটি পারের দোটানা দিয়ে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সময় সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৭ সাল এবং ভারত-পাকিস্তান নামক দুটি দেশ মূল উপজীব্য বিষয় তা বিস্তৃত হতে হতে এসে পৌঁছেছে একবিংশ শতকের কাছাকাছি। আখ্যানভাগ জুড়ে ক্রিয়াশীল থেকেছে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পরিবার। দেশভাগের পনেরটি বছর পেরিয়ে আসার পরেও যারা হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব বা দাঙ্গার আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দেশভাগ জনিত কারণে হাবলু সহ বহু পরিবার উঠে এসছিল পশ্চিমবঙ্গে, বীরাঙ্গনাকে সেই পথ অবলম্বন করতে হয়। তবে বীরাঙ্গনা তার স্মৃতি, মধুকবির ঐশ্বর্যের মাধ্যমে এপার ওপারের দুঃখবোধকে ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ  হাবলু তার সবটুকু শক্তি-আবেগ গিয়ে বলে বেড়িয়েছে সে দেশভাগ মানে না। কিন্তু এর বাইরে যে সত্যি তা অস্বীকার করার কোনো জায়গা সমাজ বা সাহিত্য কোথাওই নেই। বীরাঙ্গনা তার জন্মভূমি ছেড়েছিলেন একটি ঐতিহাসিক ছলনার ফলে, এবং তিনি যে বঙ্গকবির জয়গান গেয়ে যান সেই কবি তাঁর স্বদেশ ছেড়েছিলেন আশার ছলনায় ভুলে। আত্মাভিমানে ভুলে মধুসূদন দেশ ছেড়েছিলেন। সেই বেদনা ছিল অনুরাগ মিশ্রিত। অর্থাৎ এই স্থানান্তর



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

আসলেই মানব মনের গভীরে যে ক্ষত চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল তা মোছার সাধ্য না ইতিহাসের না আবেগের। হাবলু পার্টিশন পরবর্তী উত্তর প্রজন্মের সন্তান হয়ে যেন সব কিছুকে বস্তুগত দিকের বাইরে থেকেই অবলোকন করতে চায়। তাই সে জোর গলায় বলতে পেরেছে 'দেশ তো একটা ম্যাপ। তার ভিতরে দাগ কেটে আলাদা করে দিতেই এপারে একুশ ওপারে পঞ্চাশ।[৩]

বীরাঙ্গনা বসিরহাট থেকে বনগাঁ যাতায়াত করেছেন, সেই যাত্রাপথ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সীমান্তের রেল স্টেশন থেকে শুরু করে যে কোনো শূন্য স্থানই মূলত রিফ্যুজি কলোনির নামান্তর। বনগাঁ স্টেশনে বৃদ্ধা বীরাঙ্গনা দেখেন—স্টেশন চত্বর রিফ্যুজিতে ভর্তি। রীতিমতো সংসার পেতে বসেছে হোগলা দর্মা দিয়ে ঘর তুলে। বড় শিরীষ গাছের নীচেও বসে আছে দিশাহীন মানুষ মানুষী।[৪] নিজের স্বল্পতম বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন, পার্টিশনের আগে যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল যে বনগাঁ, বিভাজনের পরেও তিনদিন বনগাঁ ছিল যশোরে কিন্তু আঠেরোই ডিসেম্বর কেনো সেখানে ভারতের পতাকা উত্তলিত হয়। বস্তুত এই কুড়িয়ে পাওয়া তিন দিনের বেদনা অমর মিত্রকে পীড়িত করেছে, আর তা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন বীরাঙ্গনা চরিত্রটির মধ্যে। তবে চরিত্রটির গতিবিধিতে সঙ্গত দিয়েছে উত্তর প্রজন্মের হাবলু ওরফে অমিতাভ রায়। বীরাঙ্গনা দাসীর উত্তরপ্রজন্ম হাবলু তার কুড়ি বছরের জীবনাভিজ্ঞতা দিয়ে চূড়ান্ত ভাবে দেশভাগকে অস্বীকার করেছে। যখন দেশভাগ হয় তখন হাবলুর বয়স দশ বছর। দেশভাগের দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর এই উপন্যাস তার বয়ান বিস্তৃতি করেছে। সে মনে মনে এমন একটি ট্রেন কল্পনা করেছে যা বরিশাল-ফরিদপুর-এলাহাবাদ-বম্বে-অমৃতসর পরিভ্রমণ করে যাবে বিনা পাসপোর্টে। হাবলু ভাঙনের মাঝখানে দাঁড়িয়েও ভাবতে পেরেছে—

এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব বদলে গেছে। খারাপ মানুষগুলো ভয়াল হয়ে গেছে। মানুষ ভুলে গেছে ধর্মাধর্ম। সমস্ত সীমান্তের রেখা মুছে গেছে। দেখবে দেশভাগ বাতিল, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ভুলে গেছে সবাই। মানুষ পেয়েছে পাখির স্বাধীনতা।[৫]

সময়ের ব্যবধানে হাবলু টের পেয়েছিল যে বদল ঘটে গেছে তা আর পূর্বের পরিস্থিতিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। সে বেলগাছিয়া-বনগাঁর উঞ্ছবৃত্তির জীবনকে ধুলিস্মাৎ করে দিতে চেয়েও পারেনি। সাতক্ষীরায় মা বাবাকে ফেলে দিদি ও বোনকে নিয়ে এপারে কাকা-মাসিদের বাড়িতে যে ভাসমান জীবন কাটিয়েছিল তার তার কাঙ্ক্ষিত ছিল না। সে পুনরায় ফিরে গিয়েছিল জন্মভূমিতে। সেই প্রত্যাবর্তনই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল দেশভাগ কী ভয়ানক হতে পারে। হাবলু তার শৈশবের গ্রামে গিয়ে টের পেয়েছিল চেনা মুসলমান বান্ধবজনেরা সবাই আর শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। বাংলা ভাষার জায়গায় উর্দুকে ধারণ করে তারা আসলে হিন্দুদের টুঁটি চেপে ধরতে চেয়েছে।

হাবলু টের পেয়েছিল ক'বছরেই সব বদলে গেছে। সে তো মাত্র ছ'মাস ছিল বনগাঁ বসিরহাটে। জেঠা আর পিসির বাড়ি। তার ভয় করছিল। চেনা লোক সব, কিন্তু তাদের চোখ বদলে গেছে। তাদের মুখের চেহারা বদলে গেছে। কে যেন বলে উঠেছিল। শালারে ধোলাই দে, ডাক দেখি হাজি সায়েবরে। হাজি সায়েব গিয়েছিল এপার থেকে। এপার থেকে মানে বিহার থেকে। তার জবানই আলাদা। চোস্ত উর্দু না হিন্দিতে কী বলেছিল হাবলু তা বুঝতে পারেনি।[৬]

ইছামতী সংলগ্ন ঘোজাডাঙা বর্ডার পেরিয়ে তেঁতুলিয়া-হাবরা-যশোর ধরে হাবলু এপার-ওপার করে। হাবলু জানে বনগাঁ আগে ছিল যশোর জেলার মধ্যে, কিন্তু ১৯৪৭-এর আঠেরো তারিখের পর বনগাঁ উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত গেছে। যশোর কীভাবে অন্য দেশ হয়ে যেতে পারে সে সমীকরণ হাবলুর মতো অনেকের কাছেই অধরা থেকে যায়। তার অবাধ যাতায়াত বাধা প্রাপ্ত হয় বলেই বাধ্য হয়ে হাবলু তার মানস ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে বর্ডার পার হয়ে তার জন্মগ্রাম আশাশুনিতে পৌঁছে যায়। সে তার বন্ধু অজেত আলীর সঙ্গে মধুর বাক্যালাপ করে, অজেতের বোন মরিয়মকে নিয়ে চন্দ্রালোকিত স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে চায়। সে তার দেশের বাড়িতে ফেলে আসা বন্ধুর বোন মরিয়মের স্মৃতি খুঁজে পায় টিয়ার মধ্যে। টিয়াও দুর্বিপাকে পড়ে এসে উঠেছে হাবলুর মাসির কাছে। অথচ কুড়ি বছরের শৌর্য দিয়েই সে টিয়ার মুখের আদলে খুঁজে পায় মাউন্টব্যাটেন, পদ্মজা নাইডুকে, কখনো বা মাইকেল মধুসূদনের পিতামহ মানিকরামের প্রেয়সী ময়রমকে।

হাবলু দিল্লি যেতে চায়, সে চায় জওহরলাল নেহেরু, আয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করে আর্জি জানাবে দেশভাগ তুলে নিতে, সে দিল্লি-পাঞ্জাব হয়ে লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি ঘুরে ঘুরে দেশভাগ তুলে দেওয়ার কাত অনুরোধ জানাবে। তাকে দিল্লি নিয়ে যাবেন বীরাঙ্গনা দাসী। তবে তার আগে হাবলু পূর্ববঙ্গে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে চায়, সে দেখে আসতে চায় মাইকেল মধুসূদনের বাড়ি। স্বাধীনতা মানে যেমন বুক খালি হয়ে যাওয়া তেমনি মধুসূদনহীন সাগরদাঁড়িও শূন্য রূপে প্রতিভাত হয়। তারই মধ্যে দিয়েই কিন্তু হাবলু তার জন্মভূমি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে শেষবারের মতো। হাবলু রওনা হলো পরদিন সকালে। মাকে প্রণাম করল, বাবাকে। শিউলি গাছে গিয়ে মাথা ছোঁয়াল বলল, আবার যেন ফিরে আসি। শিউলি গাছ তার মাথায় ফুল ঝরিয়ে দিল। হাবলু তাদের হাতনেড়ে মাথা ঠেকাল, আবার যেন সবাই ফিরে আসে। উঠোনের ধুলো মাথায় দিল।[৭]

মাইকেল মধুসূদনের জীবনের সমান্তরাল উদবাস্তু জীবনকে উপস্থাপন করেছেন, যার ফলে বৃহত্তর সমাজ ও রাজনীতির সার্বিক ধারণার পাশাপাশি ব্যক্তি মানুষের জীবনও সেখানে অনুরণিত হতে পেরেছে। বীরাঙ্গনা দাসী যখন হেরিকেনের মৃদু আলোয় হাবলুর সামনে মেঘনাদবধ কাব্য মেলে ধরেন তখন একটি মহাকাব্যিক দুঃখ, একটি জাতির





ইতিহাসক উন্মোচনের পাশাপাশি কবি এবং পাঠকের দুঃখবোধে মিলে যায়। দেশ ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, সাগরদাঁড়ি ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, রাজা রাবণের যন্ত্রণা এবং ছিন্নমূল হাবলু বা বীরাঙ্গনার যন্ত্রণা মিলে সার্বিক ভাবে যেন এক বিদায় ঘাট নির্মাণ করে। যে ঘাটের প্রতি পিছুটান কখনো যায় না। বীরাঙ্গনা থেকে শুরু করে হাবলু এরা প্রত্যেকেই তাদের বিভাজন জনিত বেদনা নিয়ে আত্মমগ্ন থেকেছে কেবল তা-ই নয় বরং তা সঞ্চারিত হয়েছে পরস্পরের মধ্যে। তাই দিল্লিতে মেয়ের বাড়ি যাবার অজুহাতে বীরাঙ্গনা চেয়েছেন রাজধানীর জটিল আবর্তে হাবলুকে মিশিয়ে দিতে।

'দশমী দিবসে' উপন্যাসের আখ্যান জুড়ে রয়েছে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু তার পরবর্তী প্রবাহটি হাবলু ওরফে অমিতাভ পুত্র অনলাভকে দেশকাল-জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে উপস্থাপন করেছেন। অনলাভর মুসলিম স্ত্রী তিয়াসা, বম্বের ব্যস্ততম জীবন এবং মুম্বাই বিস্ফোরণ খুব অল্প পরিসরে এলেও তা কাহিনিকে নতুন এক ডাইমেনসন দেয়। যেখান থেকে ক্রমশ দেশ কনসেপ্টটাই বিলিন হয়ে যেতে থাকে। একাকী বৃদ্ধ হাবলু তখন অমিতাভ নামেই স্থিত হয়। তখন সে মানসভ্রমণে আর শুধু আশাশুনি পৌঁছে যায় না, সে তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজির সঙ্গে এক অলীক কথোপকথনে রত হয়। সে বিদীর্ণ হতে হতে যে প্রশ্নগুলো দেশনেতাদের করে তা গভীর অভিসন্ধির ইঙ্গিত দেয়। হৃদয়ে বীরাঙ্গনার আর্তি নিয়ে যখন দেশনেতাদের স্মরণ করে তখন পুনরায় আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়—

হাবলু, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা অমিতাভ রায় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই সেই ভারত ভাগ্য বিধাতা। কিন্তু কোন তোমার এই খণ্ডিত ইন্ডিয়ার কে কেমন আছে তা জানো হে প্রণম্য রাজপুরুষ? বিনবিন করতে লাগল হাবলু। তার ভিতরে ভর করেছে সাগরদাঁড়ি থেকে আসা বীরাঙ্গনা দেব্যা। তার ভিতরে ভর করেছে আপার ইন্ডিয় এক্সপ্রেস ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরার গিজগিজে মানুষ, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিদায়ঘাট পার হয়ে এসে শিয়ালদা স্টেশনে লুটিয়ে থাকা সমস্ত সংসার হাবলু—বিনবিন করছে, সব গেছে আমাদের, শোনো পন্ডিতজি, দেশবাসী এখন সন্তানহারা রাবন রাজা।[৮]

বছর বছরের ব্যবধানের পর সে বুঝতে পারে ফেলে আসা দেশ আসলে একটি হাতছানি, যা কখনো শেষ হয় না। বাংলাদেশে মা-বাবার মৃত্যু, খানা সেনাদের দ্বারা পঁয়ত্রিশ বছরের বোন বুলুর গণধর্ষণ এবং মৃত্যু, পুড়ে যাওয়া ভিটেমাটির খেদ নিয়েই গড়ে উঠেছে হাবলুর জীবন। যশোর জেলারা কিশোর হাবলু মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে ভারত পরিভ্রমণ করার অভিপ্রায়ে দিল্লিবাসী হয়েছে। সেখান থেকে মধ্যপ্রদেশ, দণ্ডক অরণ্য, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতকে চিনতে চেয়েছে। পূর্বপাকিস্তানের যুদ্ধের ফলে নতুন জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের অন্বেষণে অমিতাভকে তাই আবার ফিরে যেতে হয়েছে

বনগাঁ-বসিরহাট-হাবড়া-মছলন্দপুরের রিলিফ ক্যাম্পে। আর যে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে চিরঘুমে ঢলে পড়েন বীরাঙ্গনা দাসী, সেই ট্রেনে করেই হাবলু খণ্ডিত ভারতবর্ষ ফুঁড়ে ছুটে যায় অন্য এক ভারতবর্ষের দিকে, হিন্দুস্তান-পাকিস্তান এক করার আশায়, বুক খালি করে দেওয়া স্বাধীনতার হতাশায় তার এই যাত্রাপথ যেন ছুটেই চলে।

অমর মিত্র মূলত দেশভাগকে মাথায় রেখেই দিল্লির উপর বারবার আলোকপাত করতে চেয়েছেন। যে শহরে বসে হিন্দু মুসলমানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়, সেই শহরে কপোতাক্ষপাড়ের বীরাঙ্গনা দাসীর নিত্য যাতায়াত যে সেতুবন্ধন করে দেয় তার দায়ভার ও- কী এসে পড়ে না হাবলুর কাঁধে! হাবলু তার অর্জিত আদর্শ দিয়ে দেশকে বুঝতে চায়, যেভাবে বীরাঙ্গনা দাসী রাবণের দুঃখবোধকে তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন সেটাই তাকে আত্মানুসন্ধানে ব্রতী করে। পুত্রহারা রাবণের যন্ত্রণার সঙ্গে দেশহীন মানুষের যন্ত্রণা এখানেই মিলে যায়। ফলে কেবলমাত্র একটি আখ্যান হয়েই দশমী দিবসে সীমায়িত থাকে না বরং 'রামায়ণ', 'মেঘনাদবধ' কাব্য থেকে আহরিত সূত্রগুলির সমন্বয়ে এই উপন্যাসও বিস্তৃত দেশ-কালের উপাখ্যান হয়ে ওঠে। অখণ্ড বাংলাদেশ, খণ্ডিত বাংলাদেশ, দত্ত কুলোদ্ভব মাইকেল মধুসূদনের জীবনী প্রভৃতি মিলিয়ে অমর মিত্র স্মৃতি এবং শোকের যুগপতে সাহিত্য সমালোচনার রীতির প্রবহমান ধারাটিকে নতুন ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেন।

ছিন্নমূল মানুষজন এবং বঙ্গবিভাজন কিছুই দেখতে হয়নি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কিন্তু স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা তিনি অনুভব করেছেন। অমর মিত্রও দেশভাগ দেখেননি, তবে ভাঙনকাল তাঁকেও দগ্ধ করেছে। স্মৃতাড়িত হয়ে তিনি স্বদেশ অনুসন্ধান করেছেন। মাইকেল মধুসূদনের কপোতাক্ষ প্রসস্তি বা মেঘনাদ বধ কাব্যের সন্তানহারা রাবণ রাজার রোদনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন দেশভাগের যন্ত্রণাকে 'কেমনে ফিরিব, —হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে শূন্য লঙ্কাধামে আর।' দেশভাগের ফলে বীরাঙ্গনা দাসীও ওপার বাংলার থেকে এপারে এসেও থিতু হতে পারেননি। বীরাঙ্গনার দেশ গেছে, বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নিয়ে আসতে পারেননি। শুধু সঙ্গে করে এনেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের কীর্তি গাথা। শুধু তাই-ই নয়, দেশভাগ-দাঙ্গা-বিচ্ছিন্নতা সব কিছু নিয়ে বীরাঙ্গনা দাসী নিজেই যেন হয়ে ওঠেন এক বহমান কপোতাক্ষ। সাদা থান-সেমিজ পরিহিতা এই বৃদ্ধা বগলে একটি পুটুলি নিয়ে বনগাঁ-বসিরহাট-বেলগাছিয়া-শিয়ালদা হয়ে যে ভ্রমণযাত্রা আরম্ভ করেন তা যেন আসলেই তাকে গোটা ভারত ছুঁয়ে ছুঁয়ে রাজধানি শহর দিল্লির দরবারে পৌঁছে দেয়। গান্ধীজি, জওহরলাল নেহেরুর ভারতবর্ষের দ্বারা বীরাঙ্গনা দাসীর গন্তব্যপথ নির্মীত হয়। কবিকীর্তি বহন করে বেঁচে থাকা এই নারী, ধারণ করে থাকেন আবহমান বেদনা। আজীবন মধুকবির ছন্দিত কবিসত্তাকে হৃদয়ে বয়ে বেড়ানো এই নারীর ভ্রমণ যেন মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যায় না। তার প্রতিনিধি—উত্তর প্রজন্মের হাবলু



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ওরফে অমিতাভকেও তার হৃদয়ের দোসর করে তোলে। এই অনির্দেশ্য যাত্রাপথকে সময়ের বাঁকে ছেড়ে দেন অমর মিত্র, মাইকেল মধুসূদনের জীবনের শূন্যতা এবং হাবলুর দেশহীন যন্ত্রণা দিয়েই লেখক রাজঘাট, বিদায়ঘাটকে একাকার করে দেন। যার ফলে এই আখ্যান হয়ে ওঠে নতুন এক ভারতেতিহাসের দলিল। দেশ জুড়ে যে বিদায়ঘাট রচিত হয় তার সামনে নতজানু হয়ে ভিড় করে মানচিত্র বঞ্চিত অগণিত শরণার্থীর দল, যারা সময় থেকে সময়ান্তরে যাত্রা করে আত্মানুসন্ধানের অভিপ্রায়ে।

**তথ্যসূত্র :**

১। অমর মিত্র, 'দশমী দিবসে', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, আরম্ভের আগে অংশ।
২। মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৬৬
৩। অমর মিত্র, 'দশমী দিবসে', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১০
৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৭
৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮
৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮
৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১২
৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৮

# অবহেলিতের শিল্পসাধনা : সৈকত রক্ষিতের ‘মদনভেরি’ উপন্যাস

**জয়ন্তকুমার মণ্ডল**

সৈকত রক্ষিতের (জন্ম ১৯৫৪) লেখালেখির শুরু ছাত্রাবস্থা থেকেই। পুরুলিয়া পলিটেকনিক কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার সময় থেকেই গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছেন বাংলাসাহিত্য। বহুপঠনের অভ্যেস এই সময় থেকেই গড়ে ওঠে তাঁর। যদিও এই পড়াশোনার ফলেই তিনি কিছুটা বিষণ্ণও হয়ে পড়েন। কারণ নিজের জেলার অফুরন্ত সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারের প্রতি ছিল তাঁর অপার ভালোবাসা; অথচ আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারায় পুরুলিয়ার ছবি একেবারেই অনুপস্থিত। সেই থেকে নিজের জেলাকে সাহিত্যের অঙ্গনে তুলে আনার আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেছেন তিনি। তবে শুধু পুরুলিয়াই নয় সেইসঙ্গে প্রায় একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বৃহত্তর মানভূমও তাঁর লেখার পটভূমি ও বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। এপ্রসঙ্গে ‘স্তিমিত রণতূর্য’ (২০১৪) উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

পুরুলিয়ার গ্রামীণ অন্ত্যজ মানুষের দারিদ্র্যের অনুমান শহরে বসে মেট্রোপলিটন মন নিয়ে কিছুতেই করা সম্ভব নয়। আজকের দিনেও দুবেলা খাবারের জন্য তাদের যে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় তা প্রায় কল্পনা-অসাধ্য। সেই পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন বৃত্তি সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বৃত্তি জাতিগত; আর বিভিন্ন জাতির বিচিত্র সব জীবিকা। ‘আকরিক’ (১৯৮৪), ‘হাড়িক’ (১৯৯০), ‘বৃংহণ’ (২০০০), ‘সিরকাবাদ’ (২০০১)-সহ তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই এক একটি সম্প্রদায়ের জীবিকা, জীবন-যুদ্ধে তাঁদের টিকে থাকার নিরন্তর লড়াই প্রতিফলিত হয়েছে। ‘মদনভেরি’ (২০০৮) উপন্যাসেও আছে নিতান্তই অবহেলিত ও অনাদৃত এক আদিবাসী সম্প্রদায় —ঘাসিদের জীবন-জীবিকার ছবি। লেখক সৈকত রক্ষিতের বিশেষত্ব এই যে পুরুলিয়ার প্রতিটি নিরন্ন মানুষের জন্য তিনি সমানুভূতি অনুভব করেন। যে সমানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় ‘মদনভেরি’ উপন্যাসের ‘লেখকের কথা’ অংশে; যেখানে তিনি বলেছেন

> “মনে হতেই পারে, লেখক হিসেবে আমি খুশি হব এই উপন্যাসটি পাঠকের ভালো লাগলে। কিন্তু ভালো লাগার চেয়েও বড়ো কথা আমি চাইব পাঠকের মন কৌতুহলী হোক, একান্তে কাঁদুক, জগৎজুড়ে হাহাকারে থাকা প্রাণগুলির জন্য তার সমানুভব জাগুক।”[১]





উপন্যাসটির কাহিনির পটভূমি পুরুলিয়া জেলার জয়পুর-কোটশিলা সংলগ্ন চাপাইটাঁড় নামক এক গ্রামকে কেন্দ্র করে। এরই কাছাকাছি একটি গ্রাম খটঙ্গা, যা বিখ্যাত পুরুলিয়া অস্ত্রবর্ষণ কাণ্ডের জন্য। উপন্যাসের মধ্যে সেই ঘটনার উল্লেখও পাওয়া যায়—

“উড়াকল রে! কী ফেললি খটংগায়
দুনিয়াভর খোবোর হৈল চল খটংগায়”[২]

মদনভেরি এক লোকবাদ্যযন্ত্র। ঘাসিরা এই বাদ্য জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যু অনুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহস্থের বাড়িতে বাজিয়ে থাকে। তবে জন্ম বা বিয়ের অনুষ্ঠানে এদের ডাক এখন আর পড়ে না বললেই চলে। মানুষের মৃত্যু হলে যে পারলৌকিক অনুষ্ঠান (ঘাটকর্ম) হয় এখন শুধু সেদিনই ঘাসিদের ডাক পড়ে। তারা মদনভেরি বাজিয়ে স্বর্গের দেবতাদের মৃত মানুষের সেখানে যাত্রার কথা ঘোষণা করে। বিনিময়ে তাঁরা সামান্য কিছু পয়সা, কিছু খাবার, ও কখনও সখনও কিছু বসনও (‘লুগা’) পেয়ে থাকে। এই জীবিকাকে কেন্দ্র করে ঘাসিদের জীবনচিত্র অসাধারণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসের মূল চরিত্র চাপাইটাঁড় গ্রামের চোড়কু ঘাসি। চোড়কুর সূত্রেই ঘাসিদের সামগ্রিক জীবনচর্যা উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। তথাকথিত সভ্যজগতের কোনো উপকরণই আজও চাপাইটাঁড়ে এসে পৌঁছায়নি। প্রশাসন চাপাইটাঁড়ের মানুষগুলিকে শুধু ভোটের সংখ্যা ছাড়া আর কিছু বলে এপর্যন্ত মনে করেনি। বঞ্চিত হওয়াই যেন এদের ভবিতব্য। আর বঞ্চিত হতে হতে বঞ্চনার বোধটাই তাদের যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই গ্রামের কয়েক হাত দূরেই ইলেকট্রিক খাম্বা থাকলেও আলো দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেনি—

> “ওই খাম্বা থেকে তার টেনে কে ঘাসিদের ঘর আলো করবে তা তারা জানে না। জানার তেমন কৌতুহলও নেই। কেন-না, তাদের এই অন্ধকার তো আজকের অন্ধকার নয়। তা বহু বহু প্রাচীন। এই সুপ্রাচীন অন্ধকার আজ তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তারা জেনেই গেছে, এই অন্ধকার তাদের নিয়তি। তাদের অদৃষ্ট। আর হয়তো সে-কারণেই এই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যেতে না পারার জন্য তাদের ক্ষোভ নেই, অভিমানও নেই।”[৩]

সবদিক থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের জীবনকথাই ‘মদনভেরি’ উপন্যাস। চোড়কু মদনভেরির একজন উচ্চস্তরের শিল্পী। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই বিদ্যায় সে পারদর্শিতা লাভ করেছে। কিন্তু এই শিল্প তাকে সংসার প্রতিপালনে বিশেষ সুরাহা আজ পর্যন্ত করতে পারেনি। ফলে অনেকেই এই মদনভেরি বাজানোর জীবিকা ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে শ্রমিক-মজুরের কাজ করতে। কিন্তু চোড়কু তা পারেনি; মদনভেরির

প্রতি আছে তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। যতই অন্যেরা 'মদনভেরি না ফদনভেরি' বলে উপহাস করুক না কেন? চোড়কু মদনভেরির একজন ওস্তাদ বাজিয়েই শুধু নয়, একজন উঁচ্চমানের ঝুমুর শিল্পীও। তার ঝুমুর গানের কথাগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে এসেছে।

তিন সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে চোড়কুর অভাবের সংসার। সবার মুখে দুবেলা খাবার জোটানোই চোড়কুর তথা সারা গ্রামের ঘাসিদের প্রধান সমস্যা। একদিকে প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই অন্যদিকে ঝুমুরগান ও ছৌনাচের প্রতি অমোঘ টান। তাদের পাশাপাশি অনেক গ্রামেই মাঝেমাঝেই ঝুমুরগান ও ছৌনাচের আসর বসে। দূর-দূরান্তের থেকে মানুষ এসে ভিড় জমায় এই আসরে। চাপাইটাঁড়ে এরকম আসর কোনো দিনই বসেনি। তাদেরও অনেকদিনের ইচ্ছা গ্রামে একটা আসর বসানোর। এই ইচ্ছাকে সত্যি করার জন্য গ্রামের সকলে মিলে উঠে-পড়ে লাগে ঝুমুর আসর বসানোর জন্য। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঝুমুরের দল ঠিক করা, মানুষজনকে ঝুমুরগান শুনতে আসার আমন্ত্রণ জানানো এসব কাজে লেগে যায় তারা। কিন্তু এসব কাজ সংগঠনের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। ফলে কোন দিক থেকে বাধা আসবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। বরং অন্যরা ঘাসিদের এই আয়োজনকে অহংকার বলেই মনে করেছে। আসর যখন জমে উঠেছে তখনই নির্বোধ উল্টুরামের মতো নেতার সৌজন্যে আসর ভেঙে যায়। উল্টুরামের ছায়াসঙ্গী লুকিয়ে মাইকের তার ছিঁড়ে দেয়, আর উল্টুরামের মুখে শুনতে পাওয়া যায়—

"শালাদের এতবড় বিদ্যাপ! যা ত, মাইকের তারটাকে ঝাঁইকে দে। আসরের গুষ্টির তিন খেদছি।"[৪]

এতো আবেগ নিয়ে তারা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, লোকজনে সরগরম হয়ে উঠেছিল—সেই আসর যেন মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানে পরিণত হয়ে যায়। চাপাইটাঁড়ের প্রতিটি মানুষ হতাশায় ডুবে যায়। কিন্তু তারা এতই সহজ-সরল যে ধরতেই পারে না কে এই দুষ্কর্মটি করে থাকতে পারে। চোড়কুরও এই আসরে ঝুমুরগান পরিবেশনের কথা ছিল। শিল্পী অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল তার শিল্প প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত হতাশা ছাড়া আর কিছুই তার অবশিষ্ট থাকেনি—

"অন্ধকার আমতলে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠল চোড়কু। যেন এই অসহায় নীরব রাত্রিতে ঘাসিদের ঘরেই বেজে উঠল মদনভেরি। মৃত্যুর বার্তা।"[৫]

চোড়কুর ঝুমুরগান এখানকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। শুধু মানুষের মুখেই নয়, অন্য ঝুমুর শিল্পীরাও তার গান আসরে গেয়ে থাকে। এরকমই একটি গান



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

"কন্ধারের লদী রে বঁধু, কন্ধারকে গেলি
সাঁঝে ফুটল ঝিঙাফুল বিহানে হারালি
বঁধু, তুই কন্ধারকে গেলি
বরষে বরষে মাটি ফাটে
শুকায় গায়ের চাম
পানি বিনা ফাটে ছাতি না চলে ক্ষেতিকাম
গোরুহাল নিয়ে হামি কি ফেরেই না পড়িলি
বঁধু, তুই কন্ধারকে গেলি।। সাঁঝে ফুটল ঝিঙাফুল"[৬]

পুরুলিয়ার ভৌগোলিক পরিবেশ এই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরুলিয়ার মানুষের দারিদ্র্য যেন রৌদ্রের তেজের মতোই থাকে মধ্যগগনে। তাই তখন 'পানি বিনা ফাটে ছাতি', 'ক্ষেতিকামে'র কোনো কাজও এসময় থাকে না এদের। এমনকি যাদের গোরুর হাল থাকে তাদের সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাই হয় কঠিন। আবার অন্য একটি গানে আছে জীবনেরই আরেকটি রূপের ছবি—

"বনের ফুল ঢাকা থাকে যত লতেঝড়ে
যৌবন ফুল দেহে ফুটে মনে মহক উড়ে
হামাকে সেই মহকে মাতাল করে
ঘুরালি তুই ডুংরি ধারে
এখন চৈখে চৈখে ভাললে পরে খোবোর যাছে বিনা তারে
তুঁই ভালোবাসার খাম্বা গাইড়ে দিলি লো অন্তরে
মন কুলুকুলু করে হামার কুলুকুলু করে।[৭]

উপন্যাসটির দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তাকে কেন্দ্র করে ঘাসিদের জীবনচর্যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। আর দ্বিতীয় পর্বে আছে প্রকৃতির রুক্ষ্মতার আরেক পরিচয়। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়ে গেছে অথচ বৃষ্টির কোনো লক্ষণই নেই। সমগ্র চরাচরে যেন আগুনের লীলাখেলা চলছে। জয়পুর ফরেস্ট মোড়ের তেলেভাজা দোকানের বুধনকাকা চাপাইটাঁড়ের ভভ ঘাসিকে বলেছে 'ইবারের খরায় লোকগুলাই শুঁকায় পোকোড়ি হঁয়ে যাবেক'। দ্বিতীয় পর্বে ঘাসিদের জীবনযন্ত্রণা চিত্রণেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের প্রথম পর্বে কাহিনিকে ঝুমুর-আসর আয়োজনের মাধ্যমে ছড়িয়েছেন, এবং সেই ছড়ানো কাহিনিকে দ্বিতীয় পর্বে গুটোতে শুরু করেছেন। এই পর্বেই চোড়কুর বড় মেয়ে ডোড়োতির বিয়ে হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঘাসিদের বিয়ের রীতিনীতি, তাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েকে বিদায় দেওয়াকালীন মা-বাবার

অন্তর্বেদনা অসাধারণ মুন্সিয়ানায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেও সেই মেয়েকেই যখন শ্বশুরঘরে নিতান্ত অবহেলা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয় তখন মা-বাবার হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ হয় সেই দুঃখকথাই চোড়কুর গলা দিয়ে ঝুমুরগান হয়ে বের হয়—

"আমার কাঁদিতে জীবন গেল সুখ হৈল নাই মনে
বাপে হামার বিহা দিল লদীপারের বনে
ভাইদাদা কেউ আসে নাই বাপের ঘরেও যাওয়া নাই
ও খুড়ি, টুকু বলে দিবে বাপকে হামার
বলবে আমার মাঈকে
বিটি তোমার সুখেই আছে চাষের ধান খায় কে
বোড়ো সুখে আছি মাঈ বোড়ো সুখে আছি গো
একদিনকার হোলৈদ বাঁটা তিনদিনকার বাসি লো..."[৮]

এই জীবনকথা যে কবির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তিনি যে যথার্থ জীবন-শিল্পী সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

মদনভেরি বাজানোর এই জাত-বৃত্তি যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে তার পূর্বাভাসও উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে। বলিরাম ও কয়েকজন মিলে মদনভেরি বাজানো ছেড়ে শুরু করতে চলেছে ব্যান্ডপার্টি (ওদের ভাষায় ব্যাঙপার্টি)। নিজেরা কিছু টাকা দিয়ে পুরুলিয়া থেকে ব্যাণ্ডপার্টির জন্য প্রয়োজনীয় বাদ্যসামগ্রী কিনে এনেছে। বাজানো শেখার জন্য গুরু ভদর কালিন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছে। তার কাছ থেকে কর্নেট, ফুলেট বাজানো শিখে নেয় তারা। কিন্তু এই নতুন পথে যাত্রা তাদের খুব সহজ হয় না। পাশের গ্রামের কালিন্দীরা এসে ঘাসিদেরকে শাসানি দেয়, বলে তাদের জাত-বৃত্তিতে ভাগ বসানো চলবে না। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এই দ্বিতীয় পর্বেই চোড়কু শুধুমাত্র কিছু খাবারের খোঁজে অনেক দূরের সিংঘাঘরা গ্রামের গধন কুলহুর বাড়িতে যাচ্ছে। গধন কুলহু অবস্থাপন্ন লোক, সে নাকি তার মেয়ের বিয়েতে মদনভেরি বাজাতে চায়। তাই মদনভেরি বাজানোর আশায় চোড়কু সপরিবারে চলেছে। সপরিবারে যাওয়ার কারণ তাতে সবার মুখেই কিছু খাবার জুটতে পারে। ইতিমধ্যে ছেলে মদ্দৈনা তো মদনভেরি বাজানোতে পারদর্শী হয়ে উঠছে। আর চোড়কু দিন দিন অনাহারে অসময়েই বুড়িয়ে যাচ্ছে। গায়ের জোরও তার কমে আসছে। আজকে এই পথ যেতেই তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অসহায় স্ত্রী ও শিশুসন্তানগুলির মুখে কিছু তুলে দেওয়ার আশায় তবুও সে হেঁটে চলেছে। গ্রামের অন্যরাও অন্যত্র চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

করছে। দুর্বিষহ খরা শুধু প্রকৃতিতে নয় তাদের জীবনেও নেমে এসেছে। জাতবৃত্তি বা ভিটেমাটির মায়া আজ তাই তাদের কাছে গৌণ হয়ে উঠেছে।

"চাপাইটাঁড়ের যে কুঁড়ে ঘরটি ছেড়ে সে আজ দুমুঠো আহার্যের প্রত্যাশায় সপরিবার দীর্ঘ অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে, সেই কুঁড়েঘরটিতে তার না ফিরে গেলেই-বা ক্ষতি কী? সেখানে তার হারাবার কিছু নেই, ফিরে পাবারও কিছু নেই। বস্তুত, সেখানে তার কোনো ঘরই নেই। রয়েছে শুধু ঘরের কল্পনা।"[৯]

আসলে ঘর বলতে যা বোঝায় তা এদের কোনোদিন কোথাও ছিলই না। নিরন্ন, অবহেলিত মানুষগুলি সবদিন দুটো খাবারের প্রত্যাশায় এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে কাঁধে মদনভেরি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই অন্নসন্ধানে যাত্রাকে সুন্দর প্রতীকী বর্ণনা দিয়ে প্রকাশ করেছেন লেখক। চোড়কুর পায়ের তলায় বালি, সে বালি পায়ে শক্ত করে ধরতে চাইছে কিন্তু তা সরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ যতই ঘর বাঁধার চেষ্টা করুক না কেন কোথাও ঘরের নিশ্চিন্তি বা শান্তি সে পাচ্ছে না। আর মদ্দৈনা তাকে আশা দেখাচ্ছে ঘরের স্বপ্ন, ভরা পেটের স্বপ্ন—

"আয় চাঁড়ে, আয়! আর লয় য্যা বেশি ধূর! হুই—"[১০]

ভরপেটের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলে চোড়কু, সমবারী ও ছোটো মেয়ে কালিন্দী।

"বালির ভেতরে ডুবে যাওয়া পা-টি তুলে, চোড়কু আবার তাকে সামনে বাড়িয়ে দেয়। তার পেছু ধরে আসে সমবারী, কালিন্দী।
ওরা এগিয়ে চলে। অনন্ত অভিযাত্রায়।"[১১]

পুরুষাণুক্রমে এই অন্বেষণ যে চলতেই থাকে তা চোড়কু থেকে মদ্দৈনায় অভিভাবকত্ব বদলে নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেভাবে একদিন তার পিতার থেকে চোড়কুর হাতে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছিল, ঠিক সেভাবেই আজও উত্তরাধিকার নির্মিত হচ্ছে।

শুধু মানুষের দুঃখময় জীবনের কথা বললেই তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। ধীরে ধীরে গল্পটিকে গড়ে তুলতে হয়। এবং সেই কাহিনির মধ্যে থাকা চায় পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন। চোড়কুকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটিতে সেই জীবনদর্শনের পরিচয় মেলে। চোড়কু শুধু মদনভেরির বা ঝুমুরগানের একজন উৎকৃষ্ট শিল্পীই নয়, সে একজন প্রকৃত দার্শনিকও। সেজন্যেই তো ঘাসিদের জীবনকথা তার মুখ দিয়ে অনায়াসে কাব্যরূপ লাভ করেছে। তাকে চেষ্টা করে ঝুমুরগান রচনা করতে হয় না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা কাব্যরূপ লাভ করে। অন্য ঘাসিদের যখন মদনভেরির প্রতি টান ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, তারা অন্য জীবিকায় নিয়োজিত হচ্ছে; চোড়কু কিন্তু তখনও নিজের জাতবৃত্তিতে নিষ্ঠাবান থেকেছে।

এ নিষ্ঠা শুধু যে জাত-বৃত্তি বলেই তা কিন্তু নয়, নিষ্ঠা মদনভেরির প্রতিও। প্রায় লুপ্ত হতে চলা একটি বাদ্যযন্ত্রের যথার্থ শিল্পী চোড়কু। কিন্তু এই শিল্পচর্চার কোনো মর্যাদা, সভ্যসমাজে কোনো স্বীকৃতি তার অদৃষ্টে নেই। অবহেলিত ও অবদলিত সমাজের নিভৃত শিল্প-সাধক হয়েই থেকে যেতে হয় তাকে, এবং অবহেলা ও বঞ্চনার উত্তরাধিকার দিয়ে যাবে পুত্র মদ্দেনাকেও। লোকশিল্পের এই করুণ পরিণতিও 'মদনভেরি' উপন্যাসে চোড়কু চরিত্রের পরিণতির মাধ্যমে দেখিয়েছেন সৈকত রক্ষিত। চোড়কুর মতো অনেক লোকশিল্পীই সমাজের অন্তরালে নিতান্ত অবহেলায় ধীরে ধীরে মৃত্যুলোকের দিকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছেন। তাদের শিল্পচর্চার খবরও রাখেনি আমাদের তথাকথিত সভ্যসমাজ। এই অবহেলিত শিল্পপ্রাণা মানুষগুলিকেই শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন সৈকত রক্ষিত 'মদনভেরি' উপন্যাসের মধ্যে।

**তথ্যসূত্র :**

১। 'লেখকের কথা', মদনভেরি, প্রথম সংস্করণ, ২০২০, বিগ বুক্স, কলকাতা ৭৩।
২। মদনভেরি, প্রথম সংস্করণ, ২০২০, বিগ বুক্স, কলকাতা। পৃ. ১০৩।
৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।
৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।
৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।
৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩।
৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।
৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।
১০। তদেব।
১১। তদেব।



# 'সীতায়ন' উপন্যাসে নারী : পরিসর ও চরিত্র পর্যালোচনা

**ত্রিসপ্ত প্রদীপ**

পুরুষতান্ত্রিক পরিসরে নারীর স্বাধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন' এক ক্রান্তিকারী উপন্যাস। ১৯৯৬ সালে রচিত এই উপন্যাসের মোট পরিচ্ছদ সংখ্যা ১৩। বাল্মীকি রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড' অবলম্বনে রচিত 'সীতায়ন' উপন্যাসে সীতার দুঃখপীড়িত জীবনকথা পরিবেশন করা হয়েছে। তারই পাশাপাশি লেখক সেই যন্ত্রণার প্রতিষেধক রূপে নারীর স্বয়ংপ্রভ হয়ে ওঠার বিষয়টি আলোকপাত করেছেন। মল্লিকা এই উপন্যাস উৎসর্গ করেছেন 'এই সময়ের সীতাদের'। "মল্লিকার 'সীতায়ন' নিছক রামায়ণের পুনর্কথন বা বিনির্মাণ না, এ নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি নারীবাদের রাজনীতিতে সরাসরি প্রকাশ্যে আসছেন এবং সমগ্র নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। উদ্দেশ্য তাঁর মহৎ।"[১]

মল্লিকা এই উপন্যাসের নক্সাটি নির্মাণ করেছেন, সরলমতি সীতার নিষ্ঠুর পরিণতির ভেতর দিয়ে। সীতার চোখ দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের নগ্ন রূপটি (The naked form of state and monarchy)। বাল্মীকিকে নিজের জীবনকথা শোনাতে গিয়ে সীতা কার্যত রামের দোষ-ত্রুটিগুলোকেই সামনে তুলে ধরেছেন। এখানে রামচন্দ্রের ভয়ঙ্কর রুদ্ররূপের উৎকট প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। শুধুমাত্র তার এই একটি দোষের কারণে বলি হয়েছে নিরীহ নরনারী, অনার্য ও অরণ্যচারী পশু-পক্ষী। জনগণের কাছে নিজের আস্থা ফেরাতে সীতা হয়েছেন রামচন্দ্রের soft target।

এই উপন্যাসের গহীনতলে প্রবেশ করে আমরা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেছি নারীর এই নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে, দীর্ণ হয়ে যাওয়া চিন্তাস্রোত ও জীর্ণ হয়ে যাওয়া জীবনপঞ্জিকে। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য সেই সমস্ত আর্ত, অত্যাচারিত নারী চরিত্রের পরিসর অবলোকন করা যারা উত্তর-আধুনিকতার দাবি মেনে আধুনিক হয়েছে, অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়েছে এবং প্রয়োজনে পুরুষের বীভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। সীতায়নে নারীদের চিন্তার এমন উন্মুক্ত প্রকাশ তাদেরকে নবজাগরণীয় নারীতে রূপান্তরিত করেছে। তারা যেন প্রতিপদে তির্যক প্রশ্ন তুলে গেছে পুরুষতন্ত্র (Masculinity), ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র (Brahmanism), আর্যতন্ত্রের (Aryanism) প্রতি। এই উপন্যাসে আর্যকুলের প্রতিনিধিরূপে লক্ষ্য করা যায় রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, বাল্মীকি, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, জাবালি, গৌতম, নারদ প্রমুখদের, তেমনই অনার্য আদিবাসীদের প্রতিনিধি হয়েছেন শম্বুক, মিত্রা, সতর্ক, শল্য, লোমশ, সরমা, বৃন্দা, বারুণী প্রমুখ। বিবিধ চরিত্রের মধ্য থেকে আমরা বেছে নিয়েছি এমন এমন তিন নারী চরিত্রকে যারা স্বাভিমান ও স্বমহিমায় সাতিশয় মহনীয়। তারা হলেন মিত্রা, কৌশল্যা ও সীতা।

**মিত্রা :**

শম্বুকের সহযোগী ও প্রেমিকা মিত্রা এই উপন্যাসের অনার্য নায়িকা। উপন্যাসের ষষ্ঠ পর্বে মিত্রাকে বারুণির মুখে লঙ্কার ইতিহাস শুনতে দেখা যায়। অনার্যদের গৌরবগাথা শুনে মিত্রার অন্তর উদ্দীপনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দুর্গম প্রকৃতি অঞ্চলকে অনার্যরা এতদিন তাদের জন্মভূমি বলে জেনে এসেছে। সেখানে বহিরাগত আর্যদের উৎপাত যে তারা কিছুতেই মেনে নেবে না, তাই স্বাভাবিক। মিত্রা সেই সাহসী নারী যে আন্দোলনের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে অনার্যবাহিনীকে সমর্থন জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, দলনেতা শম্বুকের কাছে সে জানতে চেয়েছে, তাঁর তৈরি রণকৌশলে মেয়েদের কোনও স্থান আছে কি না ! মিত্রার এই কৌতূহল দেখে শম্বুক আশান্বিত হয়। এমন অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে মিত্রার প্রার্থনা যেন মনের আরাম। মিত্রাকে দলের অন্দরে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে শম্বুক জানায়, "তুমি হবে সমস্ত রণকৌশলের কেন্দ্র, প্রতিটি ব্যক্তি তাদের কাজের সংবাদ বা প্রাপ্ত তথ্য তোমাকে এসে জানাবে। আমি বা অন্য যুবকেরা যে কোনও সময়ে যে কোনও সংগ্রামে বা দুর্বিপাকে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারি, আমরা থাকব প্রত্যক্ষ আক্রমণে। কিন্তু বাসস্থানে ফেরার সময় জানব তোমার কাছেই আসছি, তুমি সেই স্থির বিন্দু।"[২] মিত্রা যে যথাযথ ভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে লোমশের সঙ্গে আবেগহীন গম্ভীর ব্যবহারেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

রণকৌশল নির্ধারণে মিত্রা আদর্শের চেয়ে বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। শম্বুক যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে সততাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয়, এমনকি আর্যদের মতো শঠবুদ্ধির প্রয়োগ করতেও সে অনাগ্রহী, মিত্রা সেখানে মনে করেছে অন্যায় যুদ্ধে শঠতাই শ্রেয়। সেও এক কৌশল যা অমোঘ আয়ুধের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। তার মনে হয়েছে, যুদ্ধে জয়লাভ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনাকক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র নয়।

শম্বুকের বীরত্ব ও দুঃসাহস মিত্রাকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মিত্রা যেন বীরত্বের উপাসিকা। তাই বীরের বাহুমূলে নিজেকে সমর্পণ করে সে আশ্রয় ও শান্তি চেয়েছিল। পর্বতের কোলে, অরণ্যে, গুহায়, বৃক্ষতলে কিম্বা ঝর্নায় ইচ্ছেমতো সে শম্বুকের শরীর সান্নিধ্যে নিজেকে সে পরিপ্লুত করেছে। পত্নী মারা গেলে সতর্ক যখন জোরপূর্বক মিত্রার শরীর ও মনের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে তখন যেন মিত্রার ভয়ংকর দুঃখের দিন ছিল। শম্বুক সেই দুঃখশিখায় আশার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। শম্বুকের প্রেমের আগুনে পুড়ে মিত্রা যেন শুদ্ধ হয়ে উঠেছে। দুই প্রেমী যেন মন ও শরীরী সাধনায় পৃথিবীর বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মিত্রা এই উপন্যাসে শম্বুকের সহযোগী, সহযোদ্ধা ও প্রেমিকা রূপে নিজের ভূমিকাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। মিত্রার মধ্যে নেতৃত্বদানের সহজাত গুণ যেমন আমরা দেখতে পাই তেমনই যৌনতা নিয়ে কোনওরকম ছুৎমার্গ তার মনে ছিল না।





প্রেমের আগুনে ইচ্ছেমতো নিজের শরীরকে উদযাপন করেছে। সীতার মতোই সতীত্বের ধারণাকে প্রত্যাঘাত করে মিত্রা যেন আর এক 'অন্য সীতা' হয়ে উঠেছে।

**কৌশল্যা :**

পুরুষতন্ত্রের প্রতিকল্পে দাঁড়িয়ে এই উপন্যাসের সীতা যেমন প্রতিবাদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে তেমনই রাজমাতা কৌশল্যা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন রাজা ও রাজতন্ত্রের প্রতি। পুরুষের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তগুলি কিভাবে একটি প্রীতিময় পরিবেশকে কলুষিত করেছে তা দেখে রানী কৌশল্যা ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠেন। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে কৌশল্যার ঐশ্বর্যময় উপস্থিতি। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে ফিরে তিনি জানতে পারেন জানকী সীতা রামের নির্দেশে আরও একবার বনবাসী হয়েছেন। রামের এই বর্বরোচিত সিদ্ধান্তের কথা শুনে কৌশল্যার সমস্ত ধৈর্য ভেঙে খান খান হয়ে যায়। নিজের স্নেহময় পুত্রকে রুদ্রদৃষ্টিতে আক্রমণ করে কৌশল্যা বলেন, "তোমার মস্তকের সুস্থতা আছে তো, আমি কি ধর্মনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, স্থিতধী রামচন্দ্রের মুখ থেকে এই ভয়ানক বাক্য শুনবার জন্য এতদিন জীবনধারণ করেছিলাম।"[৩] কৌশল্যা আরও জানায় এরকম মূঢ়তা সে না কোনও রাজার মধ্যে দেখেছে, না কোনওকালে শুনেছে। রামের নির্মম আচরণে স্বভাবতই সে অসহিষ্ণু ও উগ্রমূর্তি হয়ে ওঠে।

কৌশল্যার এমন বহ্নিময় প্রকাশে রামচন্দ্র যেন দিশেহারা হয়ে যায়। রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে রাজপুরুষরা নারীকে যখন যেমন ইচ্ছে পীড়ন করেছে। রাম একমাত্র নয়, তাঁর পিতা দশরথও কৌশল্যাকে রাজমহিষী বানিয়ে আরও তিনশ পঞ্চাশ জন নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। যেন ছাইচাপা আগুন কৌশল্যার অন্তরকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। রামের প্রতি সামান্য করুণাও আর বেঁচে নেই তাঁর মনে। কৌশল্যা ভাবেন রাজপ্রাসাদে অজস্র সম্পদ, অঢেল খাদ্য পানীয় এবং অসংখ্য দাসদাসীতে পরিবৃত্ত হয়ে রামচন্দ্র কি করে বুঝবেন গর্ভভারানত নারীমনের বিক্রিয়া। রামের সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে এতটাই নৃশংস ও অনায্য মনে হল যে যন্ত্রণায় ক্ষোভে কৌশল্যা অস্থির হয়ে পড়লেন।

এই অংশে কৌশল্যার রুদ্রদৃষ্টি প্রকৃতই পুরুষের অনাচার ও উপেক্ষার বিরুদ্ধে বাঙ্ময় প্রতিভাস। রামচরিত্র সেখানে ম্লান ও অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে। পুত্রদরদী মা নয়, সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে সোচ্চার হওয়া এই রমণী উপন্যাসে নারী জাগরণের ভাবনাটিকে আরও সুচারু রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। রামের চোখে আঙুল দিয়ে বারম্বার সে রামের ভুল-ত্রুটিগুলোর উপর আলো ফেলেছে। রামের নির্বুদ্ধিতা যে রঘুবংশের পক্ষেও মর্যাদা হানিকর তা ধরিয়ে দিয়ে কৌশল্যা নিজেকে রাষ্ট্রেরও ত্রাতারূপে উপস্থিত করেছেন। স্বভাবতই বিমূঢ় রামচন্দ্র "এই সকল গূঢ় রাষ্ট্রতত্ত্ব নারীর আয়ত্তাধীন নয়। এই তত্ত্ব আপনার বোধগম্যও হবে না।"[৪] বলে কৌশল্যাকে এড়িয়ে যান। পুরুষ অবজ্ঞার প্রতিপীঠে কৌশল্যা চরিত্রটি যেন এক সুদৃঢ় প্রত্যাঘাত।

**সীতা :**

‘সীতায়ন’ উপন্যাসে সীতা চরিত্রের সর্বাত্মক বিকাশ সম্পন্ন হয়েছে। বাল্মীকি বিরচিত “রামায়ণ” মহাকাব্যের সর্বংসহা সীতা এখানে নারীপক্ষের প্রতিনিধি। অনার্য, অন্ত্যজ, অপাঙক্তেয় নারীর উপর রাষ্ট্রের যে অত্যাচার সীতা সেই রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের উপর বহ্নিমুখ হয়েছেন। রামের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও রামের তীব্র সমালোচক সে। এই সীতা তথাকথিত ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক ভয়ডরহীন মানবী। পুরুষতন্ত্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন তাঁর প্রতিকার ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে তেমনই রাজতন্ত্রকেও রক্তচক্ষু দেখিয়ে উপেক্ষা করার শক্তি ও স্পর্ধা তাঁর তৈরি হয়েছিল। সীতা তাই পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত বর্ণের সমস্ত জাতির শোষিত, বঞ্চিত, পীড়িত মানুষের প্রতিনিধি।

অনার্যদের প্রতি যে অন্যায় আর্যরা করে চলেছিল নিয়মিত, সীতা সেই হিংস্র অত্যাচারগুলোকে পাশ থেকে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় অনার্যরা এই বনভূমির সম্পদ, প্রকৃতির সন্তান (Blessings of Nature)। অকারণ যুদ্ধ, হানাহানি, রক্তপাত বা বিমূঢ় রৌদ্ররূপের প্রকাশ আর্য্যের বৈশিষ্ট্য, অনার্য্যের নয়। সারল্য, বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি সীতা অনার্যদের মধ্যেও এমন সারল্য ও সৌন্দর্যপ্রীতির প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। সীতাকে বনবাসে নিয়ে আসার পথে লক্ষ্মণ যখন সীতার সামনে অনার্যদের ‘কালো মর্কটাকৃতি প্রাণী’ বলেছেন এবং অনার্য উপজাতি অধ্যুষিত অরণ্যে সীতার জীবন কতটা নিরাপদ হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, সীতা সংশোধনী জবাব দিয়েছেন, “অনার্যদের আমি বিপজ্জনক মনে করি না, বিপজ্জনক তোমাদের আর্যসভ্যতার আত্মগর্বী রীতিনীতি। কৌশল্যানন্দন যদি আমাদের যৌথ বনবাস জীবনে বারংবার অনার্যদের পীড়ন না করতেন, যদি তুমি শূর্পণখার নাসিকা কর্তন না করতে, যদি তিনি সহস্র রাক্ষস বধ না করতেন, যদি অন্ধ আর্যগর্বে আদিভূমির বাসিন্দাদের হিংসা না করতেন, রাবণ প্রতিশোধ নিতে আসত না। আমার এই সর্বনাশের পূর্বপ্রস্তুতির প্রতিটি ধাপ কৌশল্যানন্দনের স্বহস্তে নির্মিত। আমি অতি নিকট থেকে অনার্যদের দেখেছি বলেই জানি তারাও তোমার আমার মতো স্বাভাবিক মানুষ।”[৫]

হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় আচার মেনে সীতা ছিলেন স্বামীর প্রতি অনুগতা। রামের প্রতি ছিল তার একনিষ্ঠ পতিপ্রেম। তথাপি রামের কাছে বারম্বার অপমানিতা হতে হতে স্বাধীনচেতা সীতার মনেও ফুল্কির মতো উঁকি দিয়েছে পর-পুরুষের অগাধ বিক্রম। স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে পরাক্রমশালী রাবণের কথা। এই বীরপুরুষ বাহুলগ্না হবার জন্য কত না সেধেছে তাকে। রাবণের হাজার মিনতিতেও সীতা কর্ণপাত করেনি। আর মহাধিপতি রাবণ, নারীভোগ যার কাছে ছিল নস্যির মতো ব্যাপার, সহস্র মেয়েকে যে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে, হয়তো চাইলেই সে সীতাকে নিজের ভোগ্যা করে তুলতে পারত, এই নারীর উজ্জ্বল প্রতাপের সামনে সে স্থির দাঁড়িয়ে গেছে। কথিত আছে হিমালয়ের বনাঞ্চলে





বেদবতী নামে বৃহস্পতির এক অতি রূপবতী পৌত্রীকে রাবণ জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। ব্যথিতা, বেদনাহতা বেদবতী সে অপমান সহ্য করতে না পেরে জ্বলন্ত চিতায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়। এই বেদবতীই নাকি সীতা নামে অযোনিজা কন্যা রূপে জন্ম নিয়েছিল রাবণবধ করার জন্য।

হাজার ত্রুটির মধ্যেও রামের লোকপ্রিয়তা সীতাকে আশ্চর্য করেছিল। রামের প্রতি তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তথাপি মুক্তমনা সীতা রামের দোষত্রুটির কথা উচ্চারণ করে রামকে একহাত নিতে ছাড়েনি। সীতার মনে হয়েছে রাঘব জনসমক্ষে সহানুভূতিপরায়ণ ও সুমিষ্টভাষী হলেও অকারণ হিংস্রতা তাঁর গোপন দোষ। সীতা লক্ষ্য করেছেন, মিথ্যাকথন বা পরস্ত্রীগমনের মতো কামজ বাসনা রামচন্দ্রের না থাকলেও রৌদ্রতাদোষের কারণে রাম এমন অমানবিক, স্বার্থসর্বস্ব ও ব্রাহ্মণদরদী হয়ে উঠেছেন। এই অসততা ও অসংযমের কারণেই রাম অনার্যদের প্রতি এমন হিংস্র হয়ে উঠেছেন। স্বামী হলেও নারী এবং অনার্যদের প্রতি রামের অনাচার ও অত্যাচারকে সীতা বর্বরোচিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পতির কর্তব্য পালন তো দূর অস্ত, পিতা হিসেবেও রামচন্দ্র তাঁর দায়ভার এড়িয়ে গেছেন বলে সীতা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। তাঁর মতো মিষ্টভাষী নারী রামচন্দ্র নামক মহাবৃক্ষের যুগযুগ ধরে গড়ে ওঠা মিথকে ভাঙবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন।

আমরা দেখি সীতাকে যখন পুনরায় সতীত্বের শপথ নেবার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সীতা গর্জে ওঠে রামরাজ্য ও তাঁর রাজ আদর্শের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিল। তারপর উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে “কার কাছে শপথ করব...। সেই ভর্তার কাছে যিনি গর্ভবতী স্ত্রীকে গোপনে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই প্রেমাস্পদের কাছে যিনি নিজমুখে নির্বাসন সংবাদ জানানোর সাহস পাননি, লক্ষ্মণের স্কন্ধে সেই দায় চাপিয়ে স্বয়ং কাপুরুষের মতো অন্তরালবর্তী ছিলেন! সেই স্বামীর কাছে যিনি সন্তানেরা নিরাপদে জন্ম নিল কি না সেই সংবাদমাত্রও নেননি! সেই রাজার কাছে যিনি স্ত্রী ও পুত্রদের ব্রাহ্মণের আশ্রমে ভিক্ষাজীবী করে ফেলে রাখেন। নির্বাসন তো আমাকে দিয়েছিলেন, বিনা অপরাধে, পুত্রগণ কোন দোষে দণ্ডপ্রাপ্ত হল। পৃথিবীব্যাপী যে নৃপতির ন্যায়বোধের প্রচার, তাঁর কাছে এক নারী যদি এই অভিযোগের বিচার চায়, রাম কি সেই বিচারকের আসনের যোগ্য হবেন !” [৬] সামান্য এক নারীর এমন তীক্ষ্ণ বাক্য ও তির্যক কৌতুক দেখে সভাস্থল স্তব্ধ হয়ে যায়। তাকে বারম্বার নিগ্রহের প্রতিকার স্বরূপ সে রাষ্ট্র ও রামচন্দ্রকে তীব্র প্রত্যাঘাত (Counter attack) করে।

সীতার এই বহ্নিরূপ যেন নবজাগরণের চেতনায় পরিপূর্ণ এক নারীর আত্মসত্তার প্রকাশ। স্বয়ং বাল্মীকি মুনি সীতার আচরণে বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন, “স্ত্রীগণের নিকট স্বামীর সংসর্গই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, স্বামীর সেবা ও প্রশস্তিই স্বাভাবিক ধর্ম, রামচন্দ্রের কার্যাবলির এই কঠোর সমালোচনা আমি তোমার ন্যায় রমণীর নিকট আশা করিনি।

আমার কথায় দুঃখিত হয়ো না, স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতিই আমি তোমার নিকট প্রত্যাশা করেছিলাম, তার অন্যথা দেখে আমার কৌতূহল হচ্ছে। নারীগণের মধ্যে এইরূপ জটিল চিন্তার প্রকাশ আমি আগে দেখিনি।"[৭] বনবাস জীবন, নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা বোধ, বন্দিনী থাকা এবং নিত্যদিন পীড়িত অপমানিত হওয়া সীতার ভেতর যেন প্রশ্নের অন্য এক পৃথিবী তৈরি হয়েছিল। সীতা সেই পৃথিবীর পুত্রী হয়ে পুরুষতন্ত্রের দেওয়ালে প্রকাণ্ড আঘাত হেনেছেন। এই উপন্যাসের সীতা যেন দীর্ঘদিনের নিয়ম ও কর্তৃত্ব, বৈভব ও বিত্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক তীক্ষ্ণ অগ্নিশলাকা। পুরুষের কালানুক্রমিক আধিপত্যের ধারা (Customs of dominance) সীতার দুর্নিবার উচ্ছ্বাসের কাছে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

মল্লিকার 'সীতায়ন' উপন্যাসে পুরাণপ্রতিমার নবনির্মাণ ঘটেছে। লেখিকা এখানে পিতৃতন্ত্র, রাজধর্ম ও রাষ্ট্রতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, বর্ণ রাজনীতি, জাতপাত, নারীবাদ, উপনিবেশবাদ, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের লড়াই ও উত্তর আধুনিক চিন্তা-চেতনার উপর যে ডিসকোর্স নির্মাণ করেছেন তাতে কালের ইতিহাসে এই সৃষ্টি নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাস রামকথার পুনর্কথন বা বিনির্মাণ শুধু নয়, "মল্লিকা 'সীতায়ন'-এ আমাদের মনের কলোনিয়াল উত্তরাধিকারীকে decolonising করতে চেয়েছেন। কলোনিয়াল মূল্যবোধ ব্যবস্থা ভেঙে নিজেদের সংস্কৃতির বিকল্প মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই কাজটি করার সাথে সাথে মল্লিকা নিজের আইডেনটিটি ও সমাজ প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যের কথা ভুলে যান নি। সেক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি সীতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন।"[৮]

'সীতায়ন' উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শুধু সীতা নন, রাজমাতা কৌশল্যা, অনার্য রাজকুমারী শূর্পণখা, অনার্য নেত্রী মিত্রা প্রত্যেকেই যেন পৌরুষ ষড়যন্ত্রের পুতুল। পুরুষ তার বাহুবল ও বিক্রম দিয়ে নারী নির্যাতন সম্পূর্ণ করেছে কখনও শারীরিকভাবে কখনও মানসিকভাবে।

রামচন্দ্র শুধু নন, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এমনকি আর্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বাহক বাল্মীকি, অগস্ত্য, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, নারদ, জাবালি প্রমুখ নারীকে শুধুই খেলার পুতুল মনে করেছেন। সীতার অগ্নিময় উচ্চারণ শুনে অগস্ত্য তাঁকে কূটতার্কিক বলেছেন। বাল্মীকিও জানকীর এমন বহ্নিরূপ দেখে হতবাক হয়েছেন। ঋষিদের আচরণ, কৌশল ও মন্ত্রণা দেখেও বোঝা যায় এই কঠিন শাস্ত্রীয় নাগপাশে নারীর কোনও জায়গা নেই। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিপালক। তাই পুরুষের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন সীতা ও সমস্ত বামাকুল। সীতা বাল্মীকিকে প্রশ্ন করেছেন, "যে মানদণ্ডে নারীর শুচিতা বিচার করছেন আপনারা, পুরুষের ক্ষেত্রে সেই মানদণ্ড নয় কেন? পুরুষ নারীর প্রভু তাই ! কেনই বা সকল অধর্মাচারী, পরস্ত্রীকাতর, হিংস্রমানস, যুদ্ধপরায়ণ পুরুষেরা নারীর প্রভু





হবে !"[৯] পুরুষতন্ত্রের এই নোংরা ষড়যন্ত্রের প্রতিপীঠে দাঁড়িয়ে 'সীতায়ন' নারীবাদ ও নারী-জাগৃতির নতুন কাঠামো নির্মাণ করেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. বিপ্লব মাজী, মল্লিকার 'সীতায়ন' : একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ, মল্লিকা সেনগুপ্ত : ব্যক্তি জীবনে সৃষ্টির ভুবনে, বিশেষ সংখ্যা, তবু একলব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, সম্পাদক- দীপঙ্কর মল্লিক, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশ- জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১২, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩১৩

২. মল্লিকা সেনগুপ্ত, সীতায়ন, প্রথম সংস্করণ- নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৬৮

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৭

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬, ৩৭

৮. বিপ্লব মাজী, মল্লিকার 'সীতায়ন' : একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ, মল্লিকা সেনগুপ্ত : ব্যক্তি জীবনে সৃষ্টির ভুবনে, বিশেষ সংখ্যা, তবু একলব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, সম্পাদক- দীপঙ্কর মল্লিক, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশ- জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১২, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩১৮

৯. মল্লিকা সেনগুপ্ত, সীতায়ন, প্রথম সংস্করণ- নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩৮

## নলিনী বেরার ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ : অন্ত্যজ মানুষের অকৃত্রিম জীবনগাঁথা


**লুৎফান নেছা**


সমগ্র বিশ্বে এখন অবদমিতবর্গ চর্চা বা সাবলটার্ন স্টাডিজ - এর বেশ হিড়িক পড়ে গেছে।[১] কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল সুদূর দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত চর্যাপদে উঠে আসা অন্ত্যজ মানুষের জীবন কথা সেই প্রান্তিকতাকেই চিহ্নিত করে। চর্যাপদের পাত্রপাত্রীগণ ছিল অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেনিভুক্ত ডোমনী, শুন্ডিনী, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি। চর্যা চর্যাগণ ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক। তাঁদের সূক্ষ্ম সাধন তত্ত্বের আড়ালে প্রকাশ পেয়েছে ডোম, চণ্ডাল, ব্যাধ ও জেলের জীবন যাত্রার বর্ণনা। বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ মানুষের স্বর যারা তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (‘পদ্মানদীর মাঝি’), সতিনাথ ভাদুড়ি (‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’), অদ্বৈত মল্লবর্মন (‘তিতাস একটি নদীর নাম’), দেবেশ রায় (‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’) এবং আরও অনেকে।[২] সমাজের অবহেলিত ও অচর্চিত মানুষের জীবন বৃত্তান্ত তাঁরা তুলে ধরেছেন নিজেদের লেখনীতে। আর দেখা গেছে লেখক যখন নিজে প্রান্তিক সমাজ থেকে উঠে এসেছেন তখন তা হয়ে উঠেছে প্রান্তজনের সমমর্মিতার যাপিত দলিল।

এমনি একজন বলিষ্ঠ লেখক নলিনী বেরা, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরের এক অন্ত্যজ পরিবারে। গ্রামটি অবস্থিত অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার লোধা-ভুঁইয়া, টুডু, হাঁসদা, দঁড়পাট, কামহার, সাঁওতাল অধ্যুশিত অঞ্চলে। আর এই অনার্য প্রধান গ্রামের মানুষগুলি মূলত প্রান্তিক শ্রেণির। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সুবর্ণরেখা নদীর সোনার জলে অবগাহন করেই জীবন কাটে এই প্রোটো-অস্ট্রালয়েড মানুষগুলির। নলিনী বেরাও সেই প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোত্রভুক্ত। কুম্ভকার (কুমহার) সম্প্রদায়ভুক্ত[৩] এই বালককে শুধুমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার সঙ্গে লড়তে হয়নি, তাঁর জীবন সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ভাষাগত প্রান্তিকতা নিয়েই। মানচিত্রের নতুন রেখায় এই অঞ্চল ওড়িশাতে ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়েও আসে। তাই বাংলা ওড়িয়া মিশ্রিত ‘হাটুয়া’ ভাষার পাশাপাশি লেখক নলিনী বেরাকে শৈশব থেকেই পাঠ্যভাষা থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলা চলিত ভাষা রপ্ত করতে হল। জীবনের প্রয়োজনে নলিনী বেরা মার্জিত উন্নত ক্রিয়াশীল বাংলা ভাষা শিখলেও তিনি ভুলতে চাননি তাঁর গেঁয়ো-গন্ধ ভরা ‘হাটুয়া’ ভাষা। সেই ভাষাকেই নলিনী বেরা সাহিত্যে টেনে আনলেন অদ্ভুত দক্ষতায়। প্রান্তিক জনপদভুক্ত হওয়ায় নলিনী বেরা বার বার সামাজিক ক্ষেত্রে অবহেলার শিকার হয়েছেন কিন্তু তাঁর আত্মসম্মানে প্রথম আঘাত লাগে সেদিন যেদিন তাঁর এক তথাকথিত উচ্চবর্গের বাড়িতে খাওয়ার পর প্রাণপ্রিয় বন্ধুর মা এঁটো থালা ধুয়ে দিতে বলেন। এই ঘটনা কিশোর নলিনীর জীবনে আত্মবিক্ষণের পথ





খুলে দেয়। ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোয় লেখক নলিনী বেরা তথাকথিত নিম্নবর্গের সঙ্গে নিজের সহাবস্থান নির্ণয় করেন। নলিনী বেরার অনুভূতিকে উপস্থাপন করার জন্যে বলা যায়—“মানুষ পরিব্রাজক। জীবনের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে কোথা থেকে কোথায় সে পৌঁছে যায় নিজে জানে না। উৎস থেকে মোহনায় এসে সমুখে শান্তি পারাবার দেখে তার মনে পড়ে শেকড়ের কথা। শেকড়ের খোঁজে সে ফিরতে চায় স্মৃতি-বিস্মৃতির পথ বেয়ে তার প্রত্ন-ইতিহাসে। যে ইতিহাস চর্চা থেকে উঠে আসে প্রান্তিক জনপদের কাহিনি। সাম্প্রতিককালে যা সাবলটার্ন ইতিহাস। আর এ-ভাবেই সমুদ্রগামী মোহনার মানুষ ফেরে তার শেকড়ে।”[৪] লেখক ও সেই শিকড় ছিন্ন করতে চাননি। বরং মাটির ভিতরে প্রোথিত সে শিকড়কে আরও শক্ত করে গড়ে তোলার কাজে লেগে পড়েছেন। ‘ভাসান’, ‘শবরপুরাণ’, ‘অপৌরুষেয়’, ‘ঈশ্বর কবে আসবে’, ‘মাটির মৃদঙ্গ’, ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ এর মত উপন্যাস তাঁর স্বভূমি ও স্বজনদের যাপিত জীবন চরিত।[৫]

আলোচ্য ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ লেখকের চেনা পরিবেশ ও পরিচিত জনপদের কাহিনী। কাহিনী এগিয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা নদীর বালুচর ধরে বসবাসকারী জনপদের জীবন যাত্রাকে ঘিরে। কিন্তু নলিনী বেরার ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ শ্রেণিগত ভাবে একটি উপন্যাস হলেও আদপে এটি একটি ইতিহাস। অসাধারণ দক্ষতায় লেখক নলিনী বেরা ইতিহাস, মিথ ও পুরাণের আশ্রয়ে তথ্যনির্ভর একটি শক্তিশালী গ্রন্থে পরিণত করেছেন। আটাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই উপন্যাসের কথক একজন কিশোর। কাহিনী শুরু হয়েছে খুব সাধারণ প্রসঙ্গ টেনে। কিন্তু গল্প একটু এগোতেই পাঠককে হোঁচট খেতে হয় ভাষা ও প্রসঙ্গের বেড়াজালে। উপন্যাসের শরীর জুড়ে গেঁথে আছে লোকভাষা, লোকগান, লোকউৎসব, লোকখাদ্য, লোকবাদ্য, লোককাহিনী যা প্রান্তিক মানুষের অকৃত্রিম জীবন যাপনের আলেখ্য হয়ে উঠেছে। লোকজন চায় কিশোর ললিন তার মেজকাকার মতো নামজাদা কোবরেজ হোক। মেজকাকা তাকে সাপের বিষঝাড়ার দু-চারটে মন্ত্র মুখস্থ করান এবং কিছু ওষধি গাছও চেনান, কিন্তু সাপের ভয়ে কিশোর ছেলেটি হাল ছেড়ে দেয়। তল্লাটের সবচেয়ে নামকরা নাচুয়া অনন্ত দত্ত, যার হাতের ছোঁয়ায় সত্যরঞ্জন (টুম্পা) বনে গেল নামকরা নাচুয়া, লাইবুকু (নবীন) হয়ে গেল তল্লাটের সেরা গায়িকা। ভরা আসরে তামাম দর্শক তাদের অভিনয় ও গান শুনে হাততালি দিয়ে বলেন, “এ-ন-কো-র!” অর্থাৎ দৃশ্যটা আবার হোক। সেই অনন্ত দত্ত চেয়েছিলেন তালিম দিয়ে কিশোর নলিনকে যাত্রাদলে চড়িয়া-চড়িয়ানি সাজাবেন, কিন্তু তাও হয়ে ওঠেনা মায়ের আপত্তিতে। এরপরেই আসে গাধার পিঠে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে শিকুলি-বাঁধা মেনিবাঁদরকে টানতে টানতে বাজিগরদের গ্রামে আসার কথা। উপরের ঘটনাগুলি থেকে লেখকের গ্রাম সম্পর্কে ধারনা একটু আধটু স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ্রামের উত্তরে সুবর্ণরেখা নদী। যে নদীতে হংসী নাউড়ীয়া নৌকাটিকে ফুল- চন্দন- তেল- সিঁদুর দিয়ে ঘটা করে সাজিয়ে নৌকাবিলাসে বেরিয়ে পড়ে। হংসী নাউড়ীয়ার নৌকার সঙ্গে সেজে ওঠে গ্রামের কীর্তনীয়ার দল - তাদের কপালে তিলক, গলায় কাঠমালা, গায়ে লাউফুলের মতো সাদা গেঞ্জি, গলায় গামছা, পরনে ধুতি। কিশোর নলিনও হংসী নাউড়ীয়ার নৌকাবিলাসের সঙ্গী হয়। ‘স্কুলে পড়া বিদ্যা’ আর ‘মাছের কাঁটার মতো হাতের লেখা’-র গুনে সে বড়ো সহায় হয়ে ওঠে এই প্রান্তিক মানুষজনের। এই উপন্যাসে উঠে আসে ‘বালিজাত’ উৎসবের কথা।[৬] বছরের শেষে নদীতীরে বাংলা-বিহার-ওড়িশার মানুষেরা এই উৎসব পালন করেন। মহাভারতের কালে অজ্ঞাতবাস পর্বে এখানে বারিতর্পণ করেছিলেন যুধিষ্ঠির। এই উৎসব তারই স্মৃতি। উৎসবগুলি একেবারে আঞ্চলিক সীমারেখায় আবদ্ধ, নিজস্ব ভাবনা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই সমস্ত লোকউৎসব। কিশোর নলিন তার দেখা চারপাশের উপাদান সংগ্রহ করে তা টুকরো টুকরো কাহিনী আকারে আমাদের শুনিয়েছে। তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সংবেদনশীল মন পাঠককে মুগ্ধ করে। ঘটনাক্রম এগিয়ে যেতে থাকে আর আমরা জানতে পারি এই অন্ত্যজ মানুষগুলির আহার ভোজনের অবিশ্বাস্য চিত্র। বালির খলায় শালুইপোকা ভেজে চালভাজার সঙ্গে তারা খায়।[৭] ‘শালুই পোকা’ ঠিক কেমন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কিশোর নলিন বলেছে - ডানাওয়ালা পেটমোটা বড়ো বড়ো সব লাল পিঁপড়া। এছাড়া মকাইয়ের মত বাঁশকরোল সেদ্ধ করে মাংসের সঙ্গে খাওয়ার রীতিও বলা হয়েছে। আসলে এই সমস্ত মানুষ যারা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন, যাদের জীবনযাত্রা প্রকৃতির অপাত্য সম্ভার থেকেই সংগৃহীত হয়, তারা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে নিজেদের বৈভবহীন জীবনযাত্রায়। কিন্তু কখনো কখনো সেই সুবর্ণরেখা নদীর গতির ধারায় চলতে থাকা এই প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবন থমকে দাঁড়ায়, কেঁপে ওঠে অজানা আশঙ্কায়। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় কোবরেজের টোটকা, গুনিন ও ভাসের হাত গণনার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা। তাই কিশোর নলিনের মেজকাকা অরুণের গাঁয়ে কালপেঁচা বসার দরুন ভাস গণনা করে বলেন ‘পুস্করা’ দোষ ঘটেছে, অর্থাৎ গৃহস্বামীর সমূহ বিপদ।[৮] আর সেই বিপদ রক্ষার প্রতিবিধান হবে স্বস্ত্যায়ন ও যাগযজ্ঞ করলে। খরচের হিসেব করে কোবরেজ মেজকাকা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। গ্রামের অজ্ঞ মানুষজন কোবরেজের বাড়ি এড়িয়ে চলে। শেষমেশ যজ্ঞ সম্পন্ন হল, বাড়ির লোক ভরসা পেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পূর্বেই কিশোর নলিনের ন-কাকির পুত্র গাঙানের মৃত্যু সেই অন্ধ অবিশ্বাসের প্রহেলিকাকে আরও প্রগাঢ় করলো।

সুবর্ণরেখা ও ক্ষীণতোয়া ডুলুঙ নদীকে ঘিরে যে বিস্তীর্ণ জনপদ তাদের হাটুয়া ভাষা উপন্যাসে উঠে এসেছে অকৃত্রিম ভাবে। সুবর্ণরেখা নদীর উৎস সন্ধানে কিশোর নলিনের মন উৎসাহী। সে জানতে চায় সুবর্ণরেখা নামের তাৎপর্য। গ্রামের গরিব ধীবর ঝাড়েস্বর





পানি ললিনকে ব্যাখ্যা করে নদীর নামকরণের লৌকিক রহস্য।[৯] “সোউ যে বেহারাঘর দেখুট ললিন, বেহারাবুড়ার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা তার ঠাকুর্দা পুত্র কামনায় নদীজলে সোনার থালা ভাসাই থিলা বলি না নদীর নাম হেলা সুবর্ণরেখা।”[১০] জীবনের অনবদ্য সব ঘটনার সাক্ষী গ্রামের গরিব প্রৌঢ় মানুষগুলি। ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী না হলেও লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী তারা বংশ পরম্পরায় শুনে এসেছে। ধান পাহারাদার বুড়ো শোনায় প্রাচীন অলৌকিক সব গল্প।[১১] যা কিশোর নলিনের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। বর্ষার দিনে অন্ধকারে ও ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকের মাঝে ঠাকুমার কাছে কথক ‘কইনি’ শোনে। গ্রামের সহজ সরল অভাবী মানুষগুলি বিশ্বাস করে “বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর”। তাই ভুজু ডিবরা আর কাঁদরির বাপ বালকা সাঁওতালের ভুত পোষা কারবার তারা বিশ্বাস করে। তার কাছে আছে হরেক রকম ভুত - ঝাঁপড়ি, কালামুহী, গোমুহা, চিরকিন। কিশোর নলিনও তাই অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে ঝর্ণার মুখের দিকে, তার বিশ্বাস সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে নাকে নোলক পরা সাপ।

কিশোর নলিনীর স্কুল যাত্রার মধ্যে দিয়ে কাহিনী আরও বিস্তার লাভ করে। এই পর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলকে ঘিরে ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন টুকরো টুকরো গল্প কথক আমাদের সামনে মেলে ধরেছে। যে বিস্তৃত প্রান্তিক জনপদের কথা তিনি বলেছেন তারা বঞ্চিত শোষিত অবহেলিত। ভারতবর্ষের শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গীয় মানুষের অবস্থান সম্পর্কে তিনি সচেতন, তাই হস্টেলের বাসিন্দাদের বিবরন দিতে গিয়ে পারিবারিক পদবির যে লম্বা তালিকা তিনি নিরূপণ করেছেন তা থেকেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ভারতবর্ষের নিপীড়িত অবহেলিত কোনো অনার্য প্রান্তিক জনপথকে নিয়েই তিনি তাঁর অনবদ্য শিল্পকর্ম বুনেছেন : টুডু, হেমব্রম, হাঁসদা, মুর্মু, সোরেন, সিং, বাউড়ি, বিশুই, মুন্ডা, ভুঁইয়া, মাঝি, পানি, বেহেরা, বেরা, রানা, হাটুই, পৈড়্যা, দঁড়পাট, পালুই, পাতর, বাপড়ী, জানা, মাইতি অনিঃশেষ এ তালিকা নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে বার বার উপন্যাসের পাতায় পাতায় উঠে এসেছে। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যের সংকীর্ণ ইতিহাসকে নলিনী বেরা অকপট ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। অনেকটা গল্প কথার ধরনে, যদিও খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক যেখানে কথকের বড়দার বিয়েবাড়ির বিবরণের মাঝে হঠাৎ ছোটবেলার এক স্মৃতি উঠে আসে। চারটি বেড়ালের বাচ্চার নাম রাখা হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র। ছোট্ট অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা পাঠককে বুঝিয়ে দেয় বর্ণাশ্রম প্রথার শূন্যগর্ভতার কথা। ইতিহাসের স্যার অতুলের কথায় জানা যায় শ্রীচৈতন্য এ পথ ধরে নীলাচলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন হরিনামে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হতে পারে। সে সঙ্গে কয়েকজন গোস্বামী ও ব্রাহ্মণ এসে হাজির হন। তারা রাতারাতি প্রচুর ভূসম্পত্তির বিনিময়ে সামন্ত রাজাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় বানিয়ে দেয়। সেই ধারা নলিনের সময়েও থামেনি। দেখা গেছে হস্টেলের রাঁধুনি টুনিঠাকুর

পাঁচ টাকার বিনিময়ে রাখীপূর্ণিমার দিন টুডু, হেমব্রম, হাঁসদা, মুন্ডা, ভুঁইয়াদের পৈতা বিক্রি করেন। এছাড়া যজমানের ঘরে পুরুতগিরি তো আছেই। এমন একটি বর্ণময় দাপুটে মানুষ যখন হস্টেলের চালের বস্তা চুরি করে ধরা পড়ে নলিনের হাতে মুহূর্তে যেন পটপরিবর্তন হয়। তার কাতর অনুরোধ আর্তনাদের মতো শোনায় — "তুই তো জানু ললিন মোর কেতে অভাব রে, ঘরে মোর একগন্ডা বালবাচ্চা।"[১২] নলিনের পাঁচ টাকা ধার টুনিঠাকুর মুকুব করে দেয় এই ঘটনা চাপা দেওয়ার ভেট স্বরূপ। তার উপর প্রতিবছর বিনা পয়সায় পৈতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যায়। কিশোর নলিনের অনুভূতি এখানে উল্লেখযোগ্য হয়ে পড়ে — "মুহূর্তে কে যেন আমার কানের কাছে কালের মন্দিরাধ্বনি বাজিয়ে দিল! কংসাবতি শিলাবতি ময়ূরাক্ষী দ্বারকেশ্বর টটককুমারী রাঢ়ু-ককর ডুলুঙ সুবর্ণরেখা নদীবিধৌত ঝারিখন্ডের জইড় বড় বহড়া শাল পিয়াশাল ধ আসন কুচলা কইম করম শিমুল মহুল জঙ্গলাকীর্ণ জঙ্গলমহালের আসনবনি কুড়চিবনি জামবনি শালবনি কেঁদবনী বনকাটি মুঢ়াকাটি আমডিহা নিমডিহা বাঘমারি ভালুকঘরা ল্যাকড়াগুড়ি বাঘুয়াশোল বাছুরখোয়াড় গ্রাম অধ্যুষিত কোন এক গ্রামে ভূমিজ মুন্ডা কুম্ভার মাল সাঁওতাল হাঁড়ি বাউড়ি জনগোষ্ঠীর কোনো এক গোষ্ঠীতে আমার জন্ম, আমি জাতিতে বোধকরি আদিবাসী শূদ্রই হব। কিন্তু উৎকল-ব্রাহ্মণ টুনিঠাকুর আজ আমার কানে ফুঁ দিয়ে যেন বলেছেন, 'তুই আদিবাসী শূদ্র নোস ললিন, তুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ'।"[১৩] এই ঘটনা প্রমাণ করে পেটে ভাত না জুটলে ধর্ম হয়না, একথা মানুষ যুগে যুগে অনুধাবন করলেও ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরতে পারেনা।

উপন্যাসটি পাঠে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণের বহতা ধারার মধ্যে লেখকের নিখুঁতভাবে ব্যাবহৃত নানান উদ্ধৃতি, যা এতটা প্রাসঙ্গিক ও পরিচিত যা সহজ ভাবেই বাঙালি পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে, জড়িয়ে নিতে সাহায্য করে ঘটনা ধারার মধ্যে।১৪ লেখক ধীরে ধীরে আঞ্চলিক লৌকিক ধারার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন কখনো বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বা রাজশেখর বসুকে, আর অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাছাড়া পুরানো যুগান্তকারী বাংলা গানের সুর সোনার কণার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন "জীবনটা ভাই রেলের গাড়ী আমরা সবাই যাত্রী" কিম্বা "পথের ক্লান্তিভুলে বল মা কবে শীতল হব - কতদূর আর কতদূর" বা "সাত ভাই চম্পা গো রাজার কুমার"। আর এর সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে চলে কিছুটা মাটির গন্ধে ঘেরা ছড়া, গীত বা গাঁথা যেমন - "জলে জলে যাইয়ো টুসু জলে তোমার কে আছে..." অথবা "বারিপদা শহরে গাড়ি চলে রগড়ে - দাদাগো দিদিগো চল যাবো টাটা নগরে"। আর বৈশাখী পালের চর নিয়ে লেখা দোহাটি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে পুরো বই-এ। গ্রাম্য কবি সন্তোষ দাসের লেখা পালা গানের পঙক্তিটি উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জুড়ে গিয়েছে - "বিধি যাহা লিখিয়াছে কপালে। বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে।" গানটির মর্মার্থ বুঝতে কিশোর নলিনের





অনেক সময় লেগেছে। জেগে ওঠা বৈশাখী চরের দখলদারি ও ভাগবাটোয়ারা, খণ্ড যুদ্ধ ও শৈলবালার স্বামী নগেন মহাপাত্রের উন্মাদগ্রস্থতা পাঠককে থমকে দেয়।

"সুবর্ণরেখা নদী বিহারের ধলভূম বা ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে সিংভুমের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গোপীবল্লভপুরের পশ্চিমপ্রান্তে ঝাড়গ্রাম মহাকুমায় প্রবেশ করেছে"।[১৫] আর এই সুবর্ণরেখার সোনার জলে লেখক খুঁজে পেয়েছেন লুকিয়ে রাখা মণিমাণিক্য। আর তারই সোনাখচিত আভা কুঁদে কুঁদে অক্ষরে সাজিয়ে তুলে তিনি বুনেছেন এ উপন্যাস। পাঠককে মুগ্ধ করেছে তাঁর ভাষা ভাবনা বিবরণ ও বিস্তৃতি। লেখকের রসবোধ পাঠককে আনন্দ দেয়। মহাভারতের প্রসঙ্গ উপন্যাসে এমন ভাবে উঠে এসেছে যা পাঠককে মুগ্ধ করে। লেখকের ভাষার উপর সহজাত ও সাবলিল দক্ষতা প্রমাণ করে তাঁর শৈল্পিক সত্তার চমৎকারিতা। ভূমিজ বা আদিবাসীর জনজাতির ভাষা যেমন তিনি অবলীলায় ব্যাবহার করেছেন তেমনি শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ও তৎসম শব্দকে বসিয়েছেন সম্পূর্ণ সচেতন ভঙ্গিতে আপন অভিরুচি অনুসারে।

আলোচনা শেষে বলতেই হয় 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' কে সঠিকভাবে আস্বাদন করতে হলে বইয়ের শেষাংশে অর্থতালিকাটির অবদান অনস্বীকার্য। তথাকথিত আঞ্চলিক অপরিচিত শব্দাবলীর প্রচলিত বাংলা অর্থ এখানে অধ্যায়ানুযায়ি সজ্জিত আছে। আর না থাকলে আমরা কি করে জানতাম 'পদ্মল ঘা' মানে কর্কট রোগ বা ক্যান্সার, 'জনমাক্ষি' মানে জনমানুষ, 'ডহর' মানে রাস্তা, 'ট্যাঁসা' অর্থাৎ নীলকণ্ঠ পাখি, 'কুহরাচ্ছে' মানে ডাকছে। 'বাহাঘর' মানে বিয়েবাড়ি, 'বাবুঘর' মানে জমিদারবাড়ি, 'কাটবিলেই' অর্থ কাঠবিড়ালী যদিও আন্দাজ করে নিতে পারি তবে 'কচিকুসুম' মানে ফুলের কুড়ি কিম্বা 'মেঘপাতাল' বোঝায় আকাশকে বলে না দিলে কি করে বুঝব।[১৬]

নলিনী বেরা আশৈশব খুব কাছ থেকেই তাঁর আপন ভূখণ্ডটিকে দেখেছেন। স্নেহ-মমতা ভরা চোখে উপলব্ধি করেছেন এই প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবনচরিত। বা বলা যেতে পারে যাপন করেছেন। আর তাই 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' হয়ে উঠেছে সোনার পঙক্তিতে মোড়া প্রান্তিক জনপদের জীবন্ত দলিল।

**তথ্যসূত্র :**

১। সসীম কুমার বাড়ৈ : 'নলিনী বেরার আখ্যান : প্রান্তিক জীবনের যাপিত চরিত', পেজ ফোর, ২২-১-২০২১
২। শান্তনু চক্রবর্তী : 'পুস্তক-সমালোচনা - "সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা", পরবাস ৭৬, ৩০-৯-২০১৯
৩। সসীম কুমার বাড়ৈ : 'নলিনী বেরার আখ্যান : প্রান্তিক জীবনের যাপিত চরিত', পেজ ফোর, ২২-১-২০২১
৪। নলিনী বেরা : 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৯

৫। রামকুমার মুখোপাধ্যায় : 'স্বভূমি স্বজনদের জীবনচরিত', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮-৪-২০১৯

৬। নলিনী বেরা : 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ: ২৯

৭। তদেব পৃ: ৫০

৮। তদেব পৃ: ৬৭

৯। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'হন্যে হয়ে ভাষা খোঁজে দলিত', আজকাল পত্রিকা, ২৩-১১-২০২০

১০। নলিনী বেরা : 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ: ২৯

১১। তদেব পৃ: ১৯৪

১২। তদেব পৃ: ১৩২

১৩। তদেব পৃ: ১৩২

১৪। সসীম কুমার বাড়ৈ : 'নলিনী বেরার আখ্যান : প্রান্তিক জীবনের যাপিত চরিত', পেজ ফোর, ২২-১-২০২১

১৫। নলিনী বেরা : 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ: ১৯৩

১৬। শান্তনু চক্রবর্তী : 'পুস্তক-সমালোচনা - "সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা", পরবাস ৭৬, ৩০-৯-২০১৯




## নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দেবে অধিকার: বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী

ড. শাশ্বতী সিন্‌হাবাবু

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট নারীরা অধিকাংশ গৃহ নারী। বাস্তবিক গৃহধর্মে এদের সবাকার অবস্থান একপ্রকারের নয় কারণ পারিবারিক গ্রন্থি হয় এদের ভিন্ন স্থানে রেখেছে, নয় মধ্য পথে ভিন্নতর অবস্থানে নিয়ে গেছে। পতি পরিত্যক্তা রমনীর প্রাচুর্য্য বঙ্কিম সাহিত্যে হয়তো একটু বেশিই। পদ্মাবতী (মতিবিবি), ভ্রমর, প্রফুল্ল, শ্রী এরা কেউই কিন্তু ব্যক্তিত্বের দিকে এতটুকু কম যায় না, তবুও পুরুষের স্বেচ্ছাধিকারে অথবা গৃহকর্তার ফরমানে কিংবা ভাগ্যের নিদারুণ কষাঘাতে এরা গৃহসুখ থেকে প্রথমা বিধি অথবা মধ্যপথে বঞ্চিতা। এদের মধ্যে কেউ স্বামী সঙ্গ পেলেও সাংসারিক প্রতিষ্ঠা পায়নি। শ্রী তো সীতারামের রক্ষিতার মতোই বাগান বাড়িতে তাকে সঙ্গসুখ দিয়েছে। প্রফুল্লকে সাংসারিক দাসীত্বের আসনটি পাওয়ার জন্য দেবী চৌধুরানীর বর্ম পরে অনেক ভেল্কি দেখাতে হয়েছে। পদ্মাবতীকে নবকুমারের স্ত্রীর আসনটি পুনরায় ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালাতে হয়েছে। আর ভ্রমর পতিব্রত্যের তপশ্চর্যায় যৌবন বিলিয়ে দিয়ে অনুতপ্ত স্বামীর পায়ে মাথা রেখেই হিন্দুনারীর কাঙ্ক্ষিত মরণ লাভ করেছে। এছাড়াও বঙ্কিমী নারীদের মধ্যে ব্যক্তিতে উজ্জ্বল দুই নায়িকা আছে। যারা গৃহত্যাগ বা কুল ত্যাগ করেছে সাময়িক খেয়ালবশে বা দীর্ঘস্থায়ী ইচ্ছাক্রমে শৈবলিনী ও সূর্য্যমুখী; যদিও তাদের মধ্যে মনোধর্মে দুস্তর ফারাক আছে। কার্যতঃ দু'জনে স্বেচ্ছা সিদ্ধান্তে ঘর ছেড়েছে আর যা কিনা পুরুষতান্ত্রিক দাম্পত্যে ঘোরতর অপরাধ। এদের মধ্যে তফাৎ মাত্রায় ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। সূর্যমুখী স্বামীর গুণবত্তার প্রতি আস্থা রেখেই অভিমানে ঘর ছেড়েছে, আবারো পুনরাগত হয়েছে। কিন্তু শৈবলিনীর আচরণে স্বামীত্ব ও গৃহধর্মের প্রতি ঘোর অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে, তার পরবর্তী স্বীকারোক্তিতে এবং প্রতিক্রিয়া গড়িয়েছে জন সমক্ষে আত্ম ঘোষণায়। মীরকাশিমের কাছে শৈবলিনী এই পরিচয় প্রদান করেছে "প্রতাপ আমার স্বামী"[১]। সংঘটনের মৌল প্রকৃতি একই টাইপ হলেও অপরাধবৃত্তির গভীরতাহেতু উভয় নায়িকার পরিণতিতে ভিন্নতা এসেছে।

শৈবলিনীর চিত্তচাঞ্চল্য, দুর্বিনয়, প্রগলভতা ও স্পষ্টবাদিতা নতুন কালধর্মের অনুশাসনে বাঁধা হওয়ার খাতিরে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ সমাজে সে পাপীয়সী রূপে গণ্য হলেও পরবর্তী কালের বিচারে তা চমকপ্রদ আধুনিকতারই ধ্বজাধারিনী। শৈবলিনীর কিশোরীবেলার আচরণে যে চিত্তচাঞ্চল্য ও পার্থিব জীবন লালসার এক স্বতন্ত্র চরিত্রগঠণ পাওয়া যায়, তা

আটপোরে মাপের নয়। সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রেমের মূল্যে নদীতে ডুব দিলেও শৈবলিনী তীরে ফিরছে এবং প্রতাপ পরবর্তীকালেও প্রেমের পূজায় আত্মবলি দিয়েছে। তার প্রকৃতিধর্মের এই ঋজুতা ও নিষ্ঠা শৈবলিনীতে নেই। তাই শৈবলিনীর দ্বন্দ্ব ও আলোড়ন অপেক্ষাকৃত বেশি। উপন্যাস পাঠকের কাছেও এই বাস্তব সজীবতার মূল্য অনেক।

শৈবলিনীর চরিত্রে প্রথম প্রকাশিত প্রেমের মহিমা অপেক্ষা বলা যায় তার আচরণে সাবেকী দাম্পত্যবিধির স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ ও ব্যক্তিদ্রোহের ভাব অনেক স্পষ্ট। দাম্পত্য শুধুই নিত্যকৃত ও কর্তব্য পালন নয়, নারী-পুরুষের সংসর্গে অনেক গ্রহণ বর্জনের এক নিয়ত সামঞ্জস্যের ধারা সুতরাং নারীর কর্তব্যই শুধুমাত্র গৃহধর্মে সংরক্ষিত হওয়া ঠিক নয়—নব্যকালের এই ধারণারও স্পষ্ট পরিবর্তনের সূচনাবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে শৈবলিনী। তাই ভিন্ন আচরণের প্রাথমিক বিচারে তাকে সমাজদ্রোহী মনে হতেই পারে, তবে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনীতির খাতিরে স্বাধীন নারীত্বের নিপীড়নের জন্য যত দায়ী হোন না কেন, সজ্ঞান শিল্প চেতনায় প্রগলভা শৈবলিনীর মুখ দিয়ে নতুনকালের কথাগুলি উচ্চারণ করিয়ে নিয়েছেন।

বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর জীবনপণ করা ভূমিকার সামনে দাঁড়িয়েও সেকালে সংস্কারবদ্ধ নারী পুনর্বিবাহের সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে তার থান কাপড়টি ফেরৎ চেয়েছে। সেই দ্বন্দ্ববিচলিত নারী আন্দোলনকালে গঙ্গাবক্ষে বিবাহিত শৈবলিনী স্বীকারোক্তি করেছে সুন্দরীর কাছে যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে তার স্থায়ী সুখ নাই—'ফিরিয়া যাও। আমি যাইবো না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি"।[২] বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পের দায়ে ও জীবনের খাতিরে শৈবলিনীকে এতো দুঃসাহস দিতে পেরেছেন। অনেক দায়ে পড়ে বঙ্কিম সাংসারিক অসঙ্গতির ব্যাপারটি পরিস্ফুট করতে পারেননি। কিন্তু অপহরণ পর্বের তিনটি ক্ষেত্রে শৈবলিনীর মুখ দিয়ে গৃহপরিত্যাগের প্রকৃত কারণ উল্লেখ করেছেন। আর তাতেই শৈবলিনীর জাত চিনিয়ে দেয়। এই কারণগুলি ধরে শৈবলিনীর নিজেরই কুলত্যাগ করার কথা কিন্তু তাকে আড়াল করার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র অপহরণ ঘটিয়েছেন। পরে তা পাঠক অবগত হয়েছে। প্রথমতঃ চন্দ্রশেখরের স্বামীত্ব সম্বন্ধে তার আস্থার ভাব কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়তঃ প্রতাপের প্রণয় তাড়না তাকে সুস্থভাবে কুলধর্ম রক্ষা করতে দেয়নি। তৃতীয়তঃ মূলত এ নিত্যদাহের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জনাই ফষ্টরের প্রেরিত আগাম চিঠির ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্তই ঘর ছেড়েছে, যদি প্রতাপের সাথে দেখা হয় সেই আশায়। আমরা দেখেছি প্রতাপের সঙ্গে প্রথম দেখার মুহূর্তে প্রগলভা শৈবলিনী অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তীব্র প্রণয়বাসনা প্রকাশে কুণ্ঠিত নয় এবং পরবর্তীকালেও প্রতাপোদ্ধারের খাতিরে নবাব মীরকাশিমের কাছে ভয়ানক মিথ্যা ভাষণ করেছে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

উপরিউক্ত ঘটনা ও কার্যকারণ মেলালে মনে হবে শৈবলিনীর চিত্তচাঞ্চল্যই তার স্বভাবধর্ম, হঠকারিতাই হলো তার আচরণ প্রবণতা। সাধারণত কোন বুদ্ধিমতী নারীই কোনো স্তরেই লোকদৃষ্টিতে যা অপহরণই তাকে স্বেচ্ছাকুলত্যাগ বলে দায় নিজের ঘাড়ে নিতে চায় না। তাই মনে হয়, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর দাম্পত্যের গভীরতম ফাটল দেখিয়ে শৈবলিনীর অনিচ্ছুক দাম্পত্যের যন্ত্রণাকর দিনগুলিকে সংকোচিত করেছেন। গার্হস্থ্যধর্মের গভীরে কতখানি বেদনাময় জ্বালা থাকলে একটি নারী দুর্বিনয়ের খড়গকে টেনে আনতে পারে তা গভীরভাবে অনুভব করলেই ঘটনাসাক্ষ্যের অভাববোধ আর তাড়িত করে না।

বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে যতই পাপীয়সী বলুন না কেন তার চুম্বকশক্তি অমোঘ। পুঁথিপূজক চন্দ্রশেখরও তার প্রভাব কাটাতে বা এড়াতে পারেননি। ব্যক্তিধর্মের দিক দিয়ে যা হঠকারিতা, পাঠকের কাছে তা বিদ্রোহিনী সত্তা রূপে প্রতিভাত হয়। সমগ্র 'চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে শৈবলিনী এমন এক উচ্চ সীমায় দাঁড়িয়েছে যে, স্বভাবধর্মের বিপরীতে পূর্ববিন্দুতে আনতে গেলে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তার প্রত্যাঘাতের বেগ পাঠককে এসে লাগবেই। তাই শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ঘটনাগুলিতে পাঠককে দারুণ পীড়া দিয়েছে আর এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার যন্ত্রণাময় পরাজয়।

প্রতাপের স্মৃতি নির্মূলের জন্য শৈবলিনীর আধ্যাত্মিক চিকিৎসা এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের জন্য আধ্যাত্মিকতায় মানসসুদ্ধি ঘটানো হয়েছে। বিশেষত বিবেচক স্বামীর সামঞ্জস্য ধর্ম উপেক্ষা করা যায় না। আবার পথভ্রষ্টা শৈবলিনী প্রতাপের দিক থেকে তীব্র রূঢ় প্রত্যাখান পেয়ে যখন দিশেহারা, বিপর্যস্তা তখন ঐ নিরালম্ব নারীরও আশ্রয়ের জন্য দেব অনুরাগ অবধারিত হয়ে উঠেছে। বিশেষত প্রায়শ্চিত্ত পর্বের অংশে চিত্ত সংযমের জন্য ভারতীয় আধ্যাত্মবিধির অনুগমন হয়েছে। পাপ-পুণ্যের পৌরাণিক উপলব্ধি নরক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আত্মানুশোচনায় পবিত্রতর হয়ে ওঠার পরীক্ষা পদ্ধতি এই অংশের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি।

সমাজ সমালোচনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আগাম এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রমাগত মানস নিপীড়নে ও জাগ্রত নরক দর্শনে প্রাণবন্ত শৈবলিনী বিভ্রান্ত, প্রায় উন্মাদ, তখন চন্দ্রশেখরের কাতরোক্তি 'গুরুদেব! এ কী করিলে? এ কী করিলে'[৩]? শৈবলিনীর প্রতি শিল্পীর দরদ ও সহানুভূতির সন্ধান দেয়। এই মানসিক চিকিৎসার ফলশ্রুতি সম্বন্ধেও যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের সন্দেহ ছিল তার প্রমাণ আছে উপন্যাসে। শৈবলিনীর মানসশোধন যথার্থ হয়েছে, সবাই যখন আশ্বস্ত যে তার মন থেকে প্রতাপ ভূত নেমেছে; তাদের ধারণা

যে ভ্রম মাত্র তা শৈবলিনীর স্বীকারোক্তিতেই ধরা পড়ে। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর যখন বেদগ্রাম গামী তখনই পথিমধ্যে প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আর শৈবলিনী তৎক্ষনাৎ প্রতাপকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে তার উপলব্ধির কথা জানিয়েছে- 'তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই'[৪]। শৈবলিনী আপন চিত্তের সত্য অনুভূতি প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। আধুনিক পাঠক চিকিৎসাবিধির ফলহীনতায় তুষ্ট হবেন দু'দিক থেকে- ১. শৈবলিনীর আচরণ ধর্মের চুম্বকশক্তি এখনো অনাহত আছে দেখে। ২. স্বয়ংশিল্পীর শেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে এর মূল্য অপরিসীম। কারণ তা শিল্পীর যথার্থ মর্মস্বরূপটি বুঝতে সাহায্য করে। তাছাড়া নীতিশিক্ষকের তকমা ঝেড়ে ফেলে শিল্পির যথার্থ দায়েও লেখককে এ সমাধানে আসতে হয়েছে Art for art Sake। শৈবলিনী নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়ে শুধুই জড় স্ত্রীতে পরিণত হোক, আর চন্দ্রশেখর তাকেই গাটছড়ায় বেঁধে সুখী গৃহস্থের মতো সরল দাম্পত্য অতিবাহিত করুক সেটা শিল্পীর ন্যায় পাঠকেরও কখনোও কাম্য নয়।

প্রায়শ্চিত্ত বিধিকে কোথাও আরোপিত না করে শৈবলিনীর মানসদ্বন্দ্বের সাথে মিলিয়ে ব্যক্তি উৎপীড়ন খানিকটা লঘু করতে চেয়েছেন লেখক। আত্মপ্রয়াসী শৈবলিনী পাপবোধের তাড়না থেকেই তার যান্ত্রিক প্রত্যাবর্তনে চন্দ্রশেখরের ফাঁকিতে পড়ার ধারণা হয়তো বা পাঠকের মনে দংশন করতো না। জীবনধারা তো বাধাধরা সূত্রে দাঁড়িয়ে পড়ার ব্যাপার নয়। সজীব প্রাণস্পন্দনের যোগ্য বাসভূমি যদি সে না পায়, তবে সবই ব্যর্থ সবই বৃথা হয়ে যায়। এতো কাণ্ডের পর শুধুই স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে ব্যক্তিসত্তাকে উভয়ত হারিয়ে ফেলার মধ্যে আত্মজীর্ণ, আত্মোবিলোপের ব্যাখ্যা কি আধুনিক পাঠককে গভীরভাবে স্পর্শ করে না ? ভাবসূত্র ও চরিত্র বিচারের পর একথা মনে হবেই মূলত শ্রেণিকরণই উপন্যাসের শেষ কথা নয়। লেখকের জীবনানুসন্ধানের ধারাক্রম ছড়িয়ে থাকে সব সৃষ্টির গর্ভেই এবং তার মধ্যে একটা স্পষ্ট বিকাশধারাও থাকে। তাই শৈবলিনী অনেক কাটা-ছেঁড়ার পরেও জীবনের দাবিকে অস্বীকার করতে নিমরাজী।

**তথ্যসূত্র :**


১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), চন্দ্রশেখর, শুভম, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কল-৭৩ ১ম. প্রকাশ জানু. ২০০৯ পৃষ্ঠা- ৪১৮

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), চন্দ্রশেখর, শুভম, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কল-৭৩ ১ম. প্রকাশ জানু. ২০০৯ পৃষ্ঠা-৩৯৫




ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII


৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), চন্দ্রশেখর, শুভম, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কল-৭৩ ১ম. প্রকাশ জানু. ২০০৯ পৃষ্ঠা-৪৪০

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), চন্দ্রশেখর, শুভম, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কল-৭৩ ১ম. প্রকাশ জানু. ২০০৯ পৃষ্ঠা-৪৬৭


**সহায়ক গ্রন্থ :**


১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), শুভম, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩ ১ম. প্রকাশ ১লা জানু. ২০০৯

২. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, নবম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২

৩. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, একাদশ সং-১৯৯১

৪. ক্ষেত্রগুপ্ত - বাংলা উপন্যাসের ধারা, গ্রন্থ নিলয়, তৃতীয় সং- নভেম্বর, ২০০২

৫. ড. দেবেশ কুমার আচার্য-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭

৬. দেবীপদ ভট্টাচার্য-উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সং জানুয়ারি ২০১৮

## ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস : আদিবাসী জীবনবোধের অনন্য প্রকাশ

ড. অনুপ কুমার মাজি

ভগীরথ মিশ্রের কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে গ্রামজীবন। জন্মসূত্রে গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষজনের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে বেড়ে ওঠার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁর গল্প উপন্যাসকে দিয়েছে অন্যমাত্রা। বিশেষ করে প্রান্তবাসী আদিবাসী ও দলিত সমাজের অভ্যন্তরে নিরন্তর সংঘটিত শোষণ ও বঞ্চনার নতুন নতুন কাহিনি সংযোজিত হয়েছে তাঁর গল্প উপন্যাসে। গ্রামজীবনের প্রতি দায়বদ্ধ লেখককে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তাই বলতে শোনা যায়,-গ্রামজীবন সম্পর্কিত অন্তত একটা গল্প না লিখলে লেখকের 'কলমশুদ্ধি' ঘটে না। লেখকের নিজের কথায় —"ছেলেবেলা থেকে গ্রাম তার তাবৎ অনুষঙ্গসহ আমার রক্তে মিশে গিয়েছিল। গ্রামজীবনকে চিনেছিলাম হাতের তেলোর মতো। তাই যখন গল্প-উপন্যাস লেখায় হাত দিলাম, কলমের ডগায় এসে হাজির হতে লাগলো, কাতারে কাতারে, গ্রামজীবনের অসংখ্য ছবি, কথা, মানুষ, চরিত্র...।"[১] আর আশ্চর্যের বিষয় এই ছবির চরিত্রগুলোর কোনটা কাল্পনিক নয়।

১৯৪৭ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম হয় ভগীরথ মিশ্রের। বন জঙ্গলে ঘেরা নিজের গ্রাম, চার পাশের পাহাড়, জঙ্গল ও নদীর ধারে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসী গ্রামগুলিতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন তিনি। মিশুকে প্রকৃতির হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকজনের সঙ্গে তার গড়ে উঠেছিল এক গভীর সম্পর্ক। পারিপার্শ্বিক এই লোকজনের বেশিরভাগ লোধা, শবর, খেড়িয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী। স্বাধীন ভারতে বাস করেও পরাধীনতা যাদের প্রতি পদে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকারের বঞ্চনার কথা বাদ দিলেও স্থায়ী বাসস্থান ও জীবিকার ক্ষেত্রটিতেও তথাকথিত সভ্য সমাজের দ্বারা নিত্যদিন শোষিত ও নিষ্পেষিত হতে হচ্ছে যাদেরকে। এই বন্য মানুষগুলোর প্রতি লেখক যে কতটা অনুভূতিসম্পন্ন সেটা লক্ষ্য করা যায় তার উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে। নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায় 'তস্কর' (১৯৯২) ও 'আড়কাঠি' (১৯৯৩) লোধা-শবরদের জীবনআশ্রিত এই দু'টি উপন্যাস লেখকেরও জীবনবোধের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।

লোধা-শবরদের নিয়ে লেখা ভগীরথ মিশ্রের প্রথম উপন্যাস হল 'তস্কর' (১৯৯২)। উপন্যাসে বর্ণিত এই সকল লোধা-শবরেরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা। আর এই অঞ্চলটা ঔপন্যাসিকের আজন্ম চেনা। লেখক দেখেছেন এই অরণ্যচারী মানুষগুলো আদিকাল থেকে জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। বেঁচে থাকার তাগিদে জঙ্গলের অপর্যাপ্ত ফলমূল, কিছু সময় ছোটখাট শিকার আর জঙ্গলের সামান্য কাঠ-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে নামমাত্র দামে বিক্রি করে অতি কষ্টে সংসার চালায়। অবশ্য



এখানেও রয়েছে তাদের অধিকারের প্রশ্ন। বিশেষ একটি ঘটনাকে সামনে রেখে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭২ সালে Indian Forest Act পাশ করে অরণ্যচারী এই সকল জাতিগোষ্ঠীর 'অরণ্যের অধিকার' কেড়ে নেয়। শুধু তাই নয় আইনগত ভাবেও লোধা-শবরদের 'অপরাধপ্রবণ জাতি' হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়। Criminal Tribe আখ্যায়িত হওয়ায় সমাজের মূলস্রোত থেকে ক্রমশ এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সভ্য সমাজের শোষণ শুরু হয় এখান থেকেই।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গোক্ষুর ভক্তা এরকমই একটি শোষিত ও লাঞ্ছিত চরিত্র। শুরুতে যাকে আমরা বাণেশ্বর ঘোষের কাছে চুরির মাল সরবরাহ করতে দেখি। উপন্যাসের নামকরণের সঙ্গে কাহিনির আগাগোড়া সাযুজ্য বজায় রেখে চোর-চুরি-চৌর্যবৃত্তি প্রসঙ্গকে সমস্ত উপন্যাসে ধারণ করেছেন। লেখক এ অঞ্চলের লোধা-শবরদের জীবনের সমস্যা ও সংকটকে সামনে রেখে একটি জাতির উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত পাঠককে নিয়ে গেছেন। প্রত্যেকেই জানে জন্ম থেকে কেউ চোর হয় না। তবু লোধা-শবররা 'জন্মদাগী'। 'জন্মদাগী হওয়ার কারণে সমাজে লোধা-শবরদের জায়গা হয় না। লোকালয় থেকে অনেক দূরে বাস করলেও এই কালো দাগ তাদের মোছে না, ফিকে হয় না। বরং 'চোর' অপবাদটি এদের নামের সঙ্গে এমন ভাবে সেঁটে গেছে যে গৃহস্থেরা এদের দিনমজুর হিসেবে নিয়োগ করতেও ভয় পায়। সভ্য সমাজের দ্বারা ক্রমাগত লাঞ্ছনার শিকার হতে হতে আর্থসামাজিক দিক থেকে এরা একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়। তার ওপর প্রকৃতি প্রতিকূল হলে তো কথাই নেই, তখন বেঁচে থাকাটাই দায় হয়ে ওঠে। এরূপ সংকটে তারা জড়িয়ে পড়ে বাণেশ্বর ঘোষের মতো ব্যক্তিদের ফাঁদ পাতা জালে। দু-দশ টাকা দাদনের বিনিময়ে সুকৌশলে এদের চৌর্যবৃত্তিতে লাগিয়ে দিয়ে বাণেশ্বর ঘোষের মতো ব্যক্তিরা ফুলে ফেঁপে ওঠে আর বংশানুক্রমে এরা সকলের কাছে 'চোর' হিসেবে কুখ্যাত হয়। সকলে চুরিটাই দেখে কিন্তু চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনের কারণ কেউ খতিয়ে দেখতে চায়না। উপন্যাসে প্রথম যে রাতে গোক্ষুর ভক্তাকে চুরি করতে দেখা যায় সেদিনও তার চুরি করার কোনো ইচ্ছে ছিলনা। কিন্তু যাদের ঘরে দুবেলা খাওয়া জোটে না, দু'দিন ধরে প্রসবযন্ত্রণায় কাতরানো স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার টাকা থাকে না তাদের ইচ্ছের মূল্য কী ? বাণেশ্বরের মতো সুযোগসন্ধানী লোকেরা এই দিনটির জন্যেই অপেক্ষা করে থাকে। পরিবারের এই সংকট মোচনের উপায় খুঁজতে গিয়ে গোক্ষুরের মনে পড়ে যায় বাণেশ্বরের উসকানিমূলক কথাগুলি---

"ওগোখরা, দ্যাখনা একটিবার, বউরূপার কাঞ্চন-বুড়ির বাখুলটা।......আরে দু'এক ঘন্টার ব্যাপার তো। কিন্তু যা পাবি, তোর বউয়ের দশ বারের প্রসব খচ্চা উঠিয়াবে।"[২]

এ ধরনের প্রস্তাব গোক্ষুরের কাছে পূর্বে একাধিকবার এলেও সে রাজী হয়নি। কিন্তু গোক্ষুরের জীবন এখন মহাসংকটে। আজ সে ভালো-মন্দ, অগ্র-পশ্চাৎ কিছু ভাবতে

পারে না। গোক্ষুর শেষ পর্যন্ত পরিবারের দুর্দশার জন্য বাণেশ্বরের দেওয়া প্রলোভনে পা দেয়। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চুরি করলেও চুরির সমস্ত মাল বাণেশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে সাড়ে সাত আট ভর সোনার বিনিময়ে গোক্ষুর নিজের হাতে পায় মাত্র ষাট টাকা। গোক্ষুর ভালোমতোই জানে, এই সামান্য টাকায় তার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো যাবে না। তবুও বাড়ির দিকে রওনা হয়। তবে বাড়ি ফিরে দেখতে পায় তার স্ত্রী ও সন্তান দুজনেই মৃত। অন্ধকার রাস্তায় হেঁটে আলোর দিশার খোঁজ করতে গিয়ে জীবনে সে ব্যর্থ হয়। নিকটজনদের হারিয়ে জীবনে বেঁচে থাকাটাই যেখানে গোক্ষুরের কাছে অর্থহীন, সেখানে চুরি সে আর করবে না পণ করে। কিন্তু এই 'পণ' সে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। কারণ বাণেশ্বর ঘোষদের মতো মধ্যস্বত্বভোগী লোকেরা গোক্ষুরকে ছাড়তে রাজি হয় না। এর কারণটিও স্পষ্ট, শুধু গোক্ষুর নয়, গোক্ষুরের পিতা ক্ষীরোদ ভক্তাও আজীবন বাণেশ্বরের জন্য চুরি করেছে। যাদের দৌলতে তার আজ এতো বাড়-বাড়ন্ত তাদেরকে কি সহজে ছাড়া যায়? পোষা লাঠিয়াল ছাড়াও থানা, পুলিশ সব বাণেশ্বরের মতো সুবিধাভোগীদের কেনা। ফলে গোক্ষুর ভক্তাদের মতো অসহায় লোধাদের এই 'না'বাচক শব্দ ধোপে টেকে না। যাবজ্জীবন কারাবাসের হুমকিতে ভয় পেয়ে গোক্ষুর আবারও চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। যুগ যুগ ধরে এভাবেই ক্ষীরোদ ভক্তা, তার ছেলে গোক্ষুর ভক্তাসহ হাজার হাজার লোধা-শবরদের শোষিত হতে হয় কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের কাছে।

উপন্যাস কাহিনির দীর্ঘ অংশ জুড়ে লোধা-শবরদের জাতিগত সমস্যা ও আর্থ-সামাজিক সংকটের বাস্তব রূপটির সঙ্গে পাঠকদের শুধুমাত্র পরিচয় করিয়ে ঔপন্যাসিক ক্ষান্ত থাকেননি। বরং এই সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের দিশা খুঁজেছেন উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র **B.Sc** পাঠরত মধু মল্লিকের চোখ দিয়ে। শিক্ষা জীবনে শত বাধার সম্মুখীন হওয়া মধু মল্লিক হল একমাত্র শিক্ষিত লোধা যুবক যে **B.Sc** পড়ছে। লোধাজাতির আর্থিক দূরবস্থার কারণ তো রয়েছেই এর সঙ্গে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজ। স্কুলের অবুঝ কিছু সহপাঠীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে স্কুলের হেড-মাস্টারও। জাতপাত, উঁচু-নীচু ইত্যাদির অজুহাতে তাকে হোস্টেলের রুমে রাতে ঘুমোতে দিত না। কাঁথা বালিশ নিয়ে স্কুলের ক্লাসরুমে ঘুমোতে গেলেও সমস্যা পিছু ছাড়ত না। সহপাঠীরা তার বালিশ দিয়ে ফুটবল খেলেছে। হোস্টেলের অন্যান্য ছেলেদের মতো একসঙ্গে বসে বারান্দায় খেতে দিতনা। তাকে একা গাছের নীচে বসে খেতে হয়েছে। হোস্টেলে তার জন্যে যে পরিমান চাল বরাদ্দ থাকত সেটুকুও তাকে ভিক্ষে করেই জোগাড় করতে হয়েছে। এক এক সময় মনের জোর সে হারিয়ে ফেলে। তখন মনে হয় —"কাজ নেই পড়াশুনো করে। ফিরে যাই, নিজের গাঁয়ে। গরু চরাই, কিংবা মাটি কাটি। বাপ-জেঠার কাছে চুরি বিদ্যার পাঠ নিই।"[৩]

তবে এত কিছু লাঞ্ছনার মাঝে নিতাই মাস্টারের মতো কিছু হৃদয়বান মানুষেরও দেখা পেয়েছে যাদের প্রবল আশ্বাস ও নিঃস্বার্থ সাহায্যে মধু আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বাপ-ঠাকুরদার 'চৌর্যবৃত্তি' থেকে নিজেকে সে মুক্ত করেছে। শিক্ষা ছাড়া জাতির উত্তরণ কোন ভাবে সম্ভব নয়। তবে, নামমাত্র সরকারি সাহায্য আর পড়ার জন্যে কয়েকটা স্কুল তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। লেখক বিশ্বাস করেন প্রতিটা লোধা-শবরদের জীবনে নিতাই মাস্টার, স্কুল ইন্সপেক্টর এবং ডি. আই সাহেবের মত উদার মনের মানুষের সাহায্যও আজ ভীষণ প্রয়োজন।

ভগীরথ মিশ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'আড়কাঠি' (১৯৯৩) বাঁকুড়া জেলার প্রান্তিকায়িত অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন আশ্রিত কাহিনি। এই উপন্যাসে তিনি গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবরদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট-উত্তরণের গল্প শুনিয়েছেন। 'গজাশিমুল' নামক এই অখ্যাত গ্রামটি তথাকথিত সভ্য জনসমাজ থেকে বহুক্রোশ দূরে, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে পৌঁছনোও দূর্গম। "বাঁকুড়ার রাণীবাঁধ দিয়ে ঢুকলে বন-জঙ্গল, পাহাড়-টিলা উঁচু-নিচু দুর্গম পথ পেরিয়ে, মহাদেবসিনান ও খাতমের জঙ্গল বাঁয়ে রেখে মিঠা আমের জঙ্গল ছাড়িয়ে ভুলাগোড়িয়া আর কুচিবুড়ির জঙ্গল এরপর ছ্যাঁদাপাথরের জঙ্গল। ছ্যাঁদাপাথর থেকে শুড়ি পথে বাঘমুড়ি, মহিষমুড়া পেরিয়ে বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের সেই সীমান্তবর্তী এলাকার গজাশিমুল গ্রামে পৌঁছনো যায়। এই গ্রামের প্রাচীন উপজাতি হলো বসু-শবরজাতি।" উপন্যাসে বসু-শবরেরা নিজেদের জীবিকা সম্পর্কে বলেছে—

"জঙ্গলের মানুষ মোরা। চাষ-বাস নাই জানি মোরা বাপের জন্মে। জঙ্গলই মোদ্যার বাপ-মা। সখা-স্যাঙাত। দিনভর জঙ্গলে শিকার মারি। গুঁড়চ্যা-সাটনা ধরি। মৌচাক ভাঙি। ফল পাকড় পাড়ি। কন্দ-মূলখুঁড়ি। উই সব মোদ্যের আহার। জংগলে অগাধ শালগাছ। শালকাঠের 'ঈশ' বানাই, গরুর গাড়ির ধুরি, খাটিয়ার পায়া, এইসব বিকিকিনি করি লোকালয়ে।"[৪]

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে বেশ নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব এই জীবন। কিন্তু যে লোকালয়ে বিক্রি করার কথা বসু-শবররা জানিয়েছে, সেই সব স্থান জঙ্গল থেকে অনেক দূর। ভারী জিনিসপত্র মাথায় করে দু- দশ দিন একটানা হাঁটে। ক্ষিদে পেলে গাছের ফল খায়। তেষ্টা পেলে ঝর্ণার জল খায়। গাছের মাথায় চড়ে রাত্রিতে ঘুমোয়। শুধু 'পেটের ক্ষিদা জ্বলে, নিভে, ফের জ্বলে।'[৫] এত কষ্টের পরেও সভ্য সমাজ এর যথোচিত দাম দেয় না। প্রত্যেকে অভাবের সুযোগ খোঁজে। কারণ এরা জানে অভাবের তাড়নায় এগুলো তাদের বিক্রি করতেই হবে। নামমাত্র দাম পেলেও। শোষণের এও একটা দিক।

গজাশিমুল গ্রামের বসু-শবরদের প্রত্যেকে সভ্য সমাজের এই শোষণ মেনে নিয়েছে। আর না মেনে উপায়ই বা কী, উপার্জনের বিকল্প রাস্তা কোথায়? অল্পে সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস যেন করে নিয়েছে বসু-শবরেরা। কিন্তু অরণ্য প্রকৃতি যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তাদের দুঃখ দুর্দশার শেষ থাকে না। আর এই দুঃসময়ে তাদের পরিত্রাতার ছদ্মবেশ ধরে

হাজির হয় আড়কাঠিদের দল। উপন্যাসে এমনই একজন আড়কাঠি হচ্ছে রঙলাল। আড়কাঠি অর্থাৎ দাস-ব্যবসায়ী। 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউন্ডেশন' এর পূর্বাঞ্চল শাখার ডিরেক্টর ক্যাথি বার্ডের ভাষায় 'স্লেভহান্টার'। রঙলাল গজাশিমুলের নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সবকিছু অগোছালো করে দেয়। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন—

"রঙলাল গাঁয়ে ঢোকা মাত্রই কিছু তরতাজা জোয়ান মেয়ে-মদ্দ রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে গাঁ থেকে। রঙলাল হলো তাজা মালের ব্যাপারী। মাল যাচাই করতে সে পাকা জহুরী।"[৬] পুরুষদের বেলায় পঁয়ত্রিশ আর মেয়েদের পঁচিশ ছাড়ালেই সে আসামে তাদের পাচার করে দেয়, চা বাগানে কাজের আশ্বাস দিয়ে। চা বাগানে কাজের ফলে অফুরন্ত সুখের কথা নির্বিকারে শুনিয়ে যায় এই বোকা মানুষগুলোকে। হতদরিদ্র এই মানুষগুলি তার কথায় সুখের আশায় বুক বাঁধে। দাদনের বিনিময়ে রঙলালের লাল খাতায় টিপ দেবার ধুম পড়ে যায়। অসহায় উপজাতিদের অভাবের সুযোগ নিয়ে দাদন বিলি করে অত্যন্ত সুকৌশলে লাল খাতার বত্রিশটি পাতায় বেঁধে ফেলে পুরো গ্রামটিকে।

বিহারের আরা জেলা থেকে আগত রঙলাল গজাশিমূলে ঢুকে গজাশিমূলের মানুষদের হাত করতে বিলাতি মদ ও পয়সা বিলায়। বিলিতি মদের নেশায় তারা রঙলালের কাছে শোনে রঙিন দেশের কাহিনি। রঙলালের ভাষায়—

"সে হল চা-বাগিচার দেশ। সেখানে কুম্পানীর মকানআছে। হাট-বাজার আছে। বিমার-বুখারে ডগদর। হাপ্তায় হাপ্তায় কুম্পানীর রেশন। চাল-গম-আটা-ময়দা-কেরোচিন। সেখানে অঢেল সুখ। বৈভব। সেখানে একবার গেলে, আর ফিরে আসতে দিল চায় না।"[৭]

রঙলালের সুকৌশলে বুনা রঙিন জালে ধীরে ধীরে গজাশিমুলের বসু-শবরদের মন ধরা পড়তে থাকে। বসু-শবরদের বিশ্বাস অর্জন করতে চেয়ে মাঝে মাঝে এসে আসামে কাজ করতে যাওয়া মানুষগুলির সুখের কথা শোনায় তাদের পরিবারকে। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে তার প্রিয়জনের সুখের খবর শোনার জন্য। পরিবারের জন্য পাঠানো টাকা, নতুন জামাকাপড়, তাদের লেখা চিঠি, অস্পষ্ট ছবি দেখিয়ে মন জয় করে এই মানুষগুলির। এভাবেই অচিন দেশের সুখের খবর শুনিয়ে রঙলাল কয়েক দফায় শতাধিক লোক নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

গজাশিমুলবাসীর অচেনা সুখের চমকটা ভাঙে অনেক পরে, যখন আর কিছুই করার থাকে না। প্রফেসর রাজীবের সঙ্গে সুচাঁদ যায় আসামে। নিজেদের প্রিয় মানুষগুলির সুখকর অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখতে। ফিরে এসে সুচাঁদ দশরথ ভক্তাকে জানায় সে সমস্ত কথা:

"সুচাঁদ শান্ত গলায় বর্ণনা করে যায় তার আসাম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। বর্ণনা করে ঝড়েশ্বর কোটালের বড় মেয়ে সাবিত্রীর করুণ জীবনের কাহিনি। কিটো মল্লিক, শীধর মল্লিক, কানাই দিগরের আত্মহত্যার গল্প। নিশি আর চাঁপি ভক্তার শরীরগুলো কেমন করে সন্ধেটি হলেই শেয়াল-শকুনের খাদ্য হয়ে ওঠে, সেটা বলতে গিয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে





থাকে সে। আরো বহু মেয়ের হাল হদিশ বলতে পারে না সুচাঁদ। রূপমতী, তারা, যশোদা, খাঁদি, টিয়া, পলাসী, এমনিতরো বহু কিশোরী যুবতী — যারা গত দশ বছরধরে রঙলালের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে কাছাড়ের পথে — তারা যে কোথায় কেমন আছে, জানে না কেউ।"[৮]

গজাশিমুলবাসী হতদরিদ্র বসু-শবরদের জীবনকাহিনির ইতি টেনে উপন্যাস এখানেও শেষ হতে পারত। তবে এরপরই ঔপন্যাসিক তার কাহিনিতে রেখেছেন আসল চমক। উপন্যাসে আমরা আর একজন 'আড়কাঠি'র পরিচয় পেলাম যিনি বাঁকুড়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রাজীব চৌধুরী। প্রত্যন্ত এই গ্রামের প্রাচীন উপজাতির সন্ধান রাজীব পায় তার কলেজের ছাত্র সুনীলের কাছে। সুনীল চিরুড়ি স্কুলে সুচাঁদ ভক্তার সঙ্গে পড়ার সূত্রে এই উপজাতির সম্বন্ধে কিছু ধারণা পায়। লোকসংস্কৃতি প্রিয় এই সুনীলই আগ্রহ ভরে তার মাস্টারমশাইকে গজাশিমূলের সন্ধান দেয়। রাজীবও প্রথম দিকে এই উপজাতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়। রঙলালের মুখোশ খুলে দিয়ে গ্রামের সহজ সরল আদিবাসীদের দূরদেশে চালান হওয়া যেমন আটকায় তেমনই তাদের লোকজীবন, লোকনৃত্যকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ' প্রতিষ্ঠা করে।

রাজীবের এহেন কর্মকাণ্ডে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। কারণ সভ্য সমাজের কোন লোক যে তাদের কথা ভাবতে পারে এটা তাদের বিশ্বাস হয় না। এই সন্দেহ উপন্যাসের বর্ণনাতেও ধরা পড়েছে —

"গজাশিমূলের মানুষ অবাক হয়ে শুধিয়েছিল, 'তো, ইয়াতে তুমার লাভটা কি মাস্টার? তুমি ক্যানে কালিজ কামাই করে পইড়ো রয়েছো মোদ্যের মাঝে?"[৯]

এর উত্তরে রাজীব সহাস্যে জানিয়েছিল—

"গাছে মিষ্টি আমটি পেকেছে, লোকচক্ষুর আড়ালে। আমি চাই, মিষ্টি আমটি দুনিয়ার তাবত মানুষ খাক। আমার প্রথম লাভ বলতে এটাই। আমার দ্বিতীয় লাভ হল, আমি চাই-রঙলাল ক্রমশ রোগা হয়ে যাক। সে আমার পৌরুষে আঘাত দিয়েছে। আর তৃতীয় এবং শেষ কারণ হল, রাজীব মিষ্টি হেসে বলে, আমি চাই, তোমাদের মত সরল, অকপট দুঃখী মানুষগুলো একটুখানি সুখের স্বাদ পাক।"[১০]

মিষ্টভাষী রাজীবের কথায় সবাই আশ্বস্ত হলে গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাঁকুড়া শহরের বুকে হওয়া লোকসংস্কৃতি মেলায় বসু-শবরদের লোকনৃত্য পরিবেশন করে রাজীব শুধু সভ্য সমাজের বাহবা কুড়ায় না, গজাশিমুল গ্রামবাসীর চোখেও ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। এরপর ইস্ট-ওয়েস্ট ফোর ফাউন্ডেশনের পূর্ব-ভারতীয় শাখার ডিরেক্টর তথা 'দ্য ফোক' পত্রিকার সর্বভারতীয় করেসপন্ডেন্ট আমেরিকার তরুণী ক্যাথি বার্ডের সহায়তায় বসু-শবরদের ফোক কালচারও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি লাভ করে। গজাশিমুলবাসীর দরিদ্র বসু-শববরাও দুটো পয়সার মুখ দেখে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক

সেমিনারে বক্তৃতা দানের সুযোগ কিংবা বসু-শবরদের বিষয়ে বই লিখে অর্থোপার্জনের সুযোগ ঘটেছে রাজীবের ভাগ্যেও।

রাজীবের আসল রূপটা ধরা পড়ে অনেক পরে। সুচাঁদের বন্ধু সুনীলের কাছে এই মাস্টারমশাই অচেনা। মাস্টারমশাইকে গজাশিমুল গ্রামে নিয়ে আসার জন্য সুনীল আজ আক্ষেপ করে। রাণিবাঁধ বাজারে কাঞ্চার সঙ্গে কথাবার্তায় সে জানায়—

“রাজীব স্যারকে তোদের গাঁয়ে লিয়ে গিয়ে বড়ই ভুল করেছি আমি। এখন বড় আফসোস হচ্ছে মনে।”[১১] সহজ সরল মনের সুচাঁদের পক্ষেও রাজীবের স্বরূপ বুঝতে পারা সম্ভবপর হয় না। অন্ধভাবে রাজীবকে বিশ্বাস করে আপন সংস্কৃতির প্রত্যেকটি নিদর্শন সঁপে দেয় রাজীবের হাতে। আর রাজীবও সেগুলি যথাযথ স্থানে ব্যবহার করে ইচ্ছে মতো অর্থ এবং খ্যাতি আদায় করে নেয়। যার সামান্য অংশই পায় শবরেরা। এতে অবশ্য শবরদের কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু এমনিভাবেই একদিন টাকার কাছে তাদের একান্ত নিজস্ব গুহ্য সম্পদ ‘জলকেলি নাচ’ও বিকিয়ে যায়। বসু-শবরদের কৌলিক ‘জলকেলি’ নাচের স্বরূপ ধরা পড়ে দশরথ ভক্তার কথায় :

“আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবারে গভীর রাতে বহু উপচারে ব্রজরাজের পুজো হয়। পুজোর শেষে সব পুরুষ ওখান থেকে চলে আসে। নদীর পাড়ে থাকে শুধু যুবতী মেয়েরা। তারা নাচতে শুরু করে ব্রজরাজের সম্মুখে। নাচতে নাচতে এক-একটি বস্তু ত্যাগ করে। এক সময় পুরোপুরি বস্ত্রহীন হয়ে যায় তারা। ঐ সময় গান ও নাচের অনেক মুদ্রা দেখা যায়। সারারাত্রি ধরেই সেই নাচ-গান হয়।”[১২]

গজাশিমুল গ্রামের হতদরিদ্র এই উপজাতির দরিদ্রতার সুযোগ রাজীবও নেয়। সুযোগ নিয়ে তাদের কৌলিক এবং পবিত্র নাচ, যে নাচ এককালে একান্তই মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অর্থ লোলুপ রাজীব চৌধুরী তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সেটাকে মুক্তমঞ্চে হাজির করে।আর এই নৃত্য প্রদর্শনের বিনিময়ে উদ্যক্তাদের কাছে মোটা টাকা দাবি করে। গ্রিনরুম থেকে বের হওয়ার পথে মি. বাজোরিয়ার সঙ্গে রাজীবের দরদাম করার কিছু সংলাপ সুচাঁদ শুনে ফেলে। রাজীবের ভাষায়—

“এ দলে জনা বারো মেয়ে আছে। সবগুলোই এক একটি জুয়েল। তার মধ্যে একটা ডবকা ছুঁড়ি আছে, দেখেছেন তো? ওকে দেখলে অপনার বড়বাজারের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে মশাই। ওর এক-একখানা বুকই আঠারো হাজারে বিকোবে।”... আপনারা বরং ঐ ‘রেড-ফক্স’এ গিয়ে, ঐসব ঝোলা বেগুন-পোড়াই দেখুনগে। ‘জলকেলি-নাচ’ দেখে আর লাভ নেই। ‘জলকেলি-নাচ’ দেখতে হলে পঁচিশের কম হবে না। দলের আট। আমার সতের।”[১৩]

সুচাঁদ আগেই রাজীবের কু-মতলবের কথা সুনীলের মুখে শুনেছিল কিন্তু এতদিন বিশ্বাস করেনি। নারীদেহের সওদাকারী এই রাজীব চৌধুরীকে সুচাঁদ আজ চিনতে পারল। এতদিন যে রাজীব চৌধুরীকে সুচাঁদ মাথায় করে রেখেছিল আজ তার প্রকৃত স্বরূপ চিনতে





পেরে ক্ষোভে, ঘৃণায় ফেটে পড়ে। সুচাঁদ ঠিক করে আর নয়, নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে নিজেদেরই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। রাজীবকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়—

“ইবার থিক্যে আপনার পথ, আমাদ্যার পথ ভিনো হইয়ে গেল্যাক মাস্টারদা। লিজেদ্যার ভাবনা ইবার থিকে লিজেরাই ভাবব। ডুবি ডুবব, ভাসি ভাসব।”[১৪]

ঔপনিবেশিক সময় থেকে লোকসংস্কৃতিচর্চা আমাদের দেশে শুরু হলেও উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে এর চরিত্র কিছুটা বদলে যায়। দলিত আদিবাসীদের জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ বা ‘সাব-অলটার্ন’ চর্চার সুবাদে কিছু শৌখিন লোকসংস্কৃতিবিদের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল। তাদের হাতেই সংস্কৃতির পণ্যায়নের সূচনা। সরল আদিবাসীদের স্বনির্ভর করতে তাদের একমাত্র সম্বল কৌম-সংস্কৃতি উন্মুক্ত বাজারে বিক্রি হতে শুরু করল। বসু-শবরদের কৌলিক নৃত্য ‘জলকেলি’ শুধুমাত্র রমণীদের অংশগ্রহণে যে নৃত্য স্বর্গীয় মান্যতা পায়, গোপনে সযত্নে রক্ষিত সেই পবিত্র বস্তুকে সর্বসমক্ষে বিক্রি করা হল। উপন্যাসের ঘটনার মধ্যে দিয়ে লেখক দেখালেন বসু-শবররা অর্থনৈতিক কারণে যে শুধু চা-বাগানের আড়কাঠির দ্বারা প্রতারিত হয়েছে তা নয়, আর্থিক অসচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত লোকসংস্কৃতি প্রেমী তথা লোকসংস্কৃতি ব্যবসায়ীরা কীভাবে তাদের সংস্কৃতি, তাদের অস্তিত্বকে বাজারের পণ্য করে নিজেদের মুনাফা তুলেছে।কীভাবে এক সময়ের ভালো মানুষ রঙলালের ভালোমানুষীর মুখোশটা খুলে রাজীব সেই ভালোমানুষীর মুখোশটা পরে নেয়। তাই মুখ বদলালেও মুখোশধারী আড়কাঠির স্বভাবে বদল হয় না।

**তথ্যসূত্র :**


১। তাপস ভৌমিক (সম্পা.), কোরক, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৮০
২। ভগীরথ মিশ্র, তস্কর, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯২, কলকাতা, পৃ. ৩০
৩। তদেব, পৃ. ৮২
৪। ভগীরথ মিশ্র, আড়কাঠি, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ২২
৫। তদেব, পৃ. ২২
৬। তদেব, পৃ. ১৭-১৮
৭। তদেব, পৃ. ৩০
৮। তদেব, পৃ. ৭০
৯। তদেব, পৃ. ৫৫
১০। তদেব, পৃ. ৫৫
১১। তদেব, পৃ. ১৪৯
১২। তদেব, পৃ. ১০৯
১৩। তদেব, পৃ. ১৫৮
১৪। তদেব, পৃ. ১৫৯

## স্বাধীনতা-উত্তর সময়কালের প্রেক্ষিতে সুমথনাথ ঘোষের ‘পরপূর্বা’ উপন্যাসে বিষয় ও বৈচিত্র্য

**পিন্টু দাস মোদক**

বিশ্ব-সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যের সবথেকে আধুনিক শিল্প শাখা কথাসাহিত্য। সুমথনাথ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮৪) হলেন বিশ শতকের চল্লিশের দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। সেই সময় সুবোধ ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রতিভা বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ কথাসাহিত্যিক যে সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই সাহিত্যিকদের বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিক প্রকরণের সাথে কথাসাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। তবে সুমথনাথ ঘোষের রচনায় নারী স্বাতন্ত্র্যবোধ এক অনন্য মাত্রা সংযোজন করেছে।

অতীত ইতিহাসের পাতা সন্ধান করলে দেখা যায়, ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের একবছর পরেই বিশেষত ১৯৪৩ সালে বাংলার বুকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আভির্ভাব ঘটে, শুরু হয় খাদ্য সংকট, মানব সভ্যতা অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত হয়। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে এই সংকটময় পরিস্থিতিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে।স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কালে বাঙালি জীবনের অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,ধর্মের বিভাজনে দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ নামক পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব, মানব জীবনের অন্তর্লীন দাম্পত্য কলহ সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষের কথাসাহিত্যে প্রতিনিয়ত উল্লেখিত হয়েছে।

যার প্রতিফলন “বাঁকাস্রোত” (১৯৪৪), “মহানদী”(১৯৫০),“পরপূর্বা”(১৯৫৫), “রোশনাই” (১৯৫৫), “উত্তরবাহিনী”(১৯৮৩) প্রভৃতি উপন্যাস। তাঁর ‘পরপূর্বা’ উপন্যাসটি ভিন্নবাদের। একজন নারীর জীবন যন্ত্রণা,সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার কাহিনি এই উপন্যাসের মূল বিষয়। স্বাধীনতা পরবর্তী এই উপন্যাস তৎকালীন সমাজ জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বিশেষ করে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অভিঘাতের ফল স্বরূপ মানবজীবন জিজ্ঞাসা বড় হয়ে ওঠে। এই সময় পর্বের মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-হতাশা, মধ্যবিত্ত নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সমস্ত বিষয়ই সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষের উপন্যাসগুলিতে সুন্দর ও সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। “পরপূর্বা” উপন্যাস তার ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে “পরপূর্বা” রচিত হলেও নারী চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে উপন্যাসটি অনন্য। শুধুমাত্র নারী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেই তিনি যে স্বতন্ত্রতা দেখিয়েছেন একথা বললে ভুল হয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যে কতখানি অসহায় তা উপন্যাসের প্রতি ছত্রেই উপলব্ধি করা যায়। তৎসঙ্গে সন্তানের প্রতি মায়ের



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

মমত্ববোধ, সন্তানকে কাছে না পাওয়ার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, সে বিষয়টিও লেখক পাঠকের সামনে চিত্রিত করেছেন।

নিম্ন-মধ্যবিত্তের পরিবারের মেয়ে সুমিতা ঢাকার একটি স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ার সময় হঠাৎ করে ব্রজেশ চক্রবর্তীর নজরে আসে। তারপর থেকেই অযাচিত উপকার করতে শুরু করে সুমিতা ও তার পরিবারের প্রতি। নিজে উদ্যোগী হয়ে সুমিতার জন্য বইপত্র কিনে দেয়, স্কুলের মাইনেও দিয়ে দেয় এমনকি তাকে পড়া বলে দেবে এই অছিলায় গৃহশিক্ষকের ভূমিকা নেয়। কিন্তু উদ্দেশ্য তার ছিল ভিন্ন, সুমিতার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং সুমিতার মতো যুবতী মেয়েকে বিবাহ করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। ব্রজেশ নিজেকে ধনীর সন্তান বলেই পরিচয় দিয়েছিল সুমিতার মা-বাবার কাছে। পরিবারের লোকজন এমন সুপাত্রকে হাতছাড়া করতে চায়নি, অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও সুমিতাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। বিবাহের কয়েকমাস পরেই সুমিতার মোহভঙ্গ ঘটে কারণ সুমিতা ব্রজেশের হাত ধরে কলকাতায় এলে তারা বালিগঞ্জে এক অন্ধকারময় গলির ভেতর ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করে।সুমিতাকে সে জানায় তাদের ব্যবসায় দারুণ লোকসান হয়েছে বলেই এই দুরাবস্থায় তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। কোনক্রমে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি পেলেও, বেতন ছিলো মাত্র পঞ্চাশ টাকা। শুরু হয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াই, এরই মধ্যে সুমিতার প্রথম সন্তান সুকুমারের জন্ম হয় কিন্তু দুবেলা দু-মুঠো অন্ন পেট ভরে খেতে না পেয়ে সুমিতার শরীর ভাঙতে থাকে, এমত অবস্থায় সুমিতাকে কয়েকমাসের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয় শরীর সুস্থ করার জন্য। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর কদর শুধুমাত্র তার রূপ-সৌন্দর্যে এবং সন্তান উৎপাদনের জন্যই। কারণ পরিবারের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরোয় হলেও ব্রজেশের কাছে সুমিতা কামনার শিকার। সুমিতার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান এলেও ভূমিষ্ঠ হও য়ার সাথে সাথেই সেই সন্তানের মৃত্যু হয়। এর কারণ অনাহার, অপুষ্টি। সত্যিই সভ্যতার অনাদিকাল থেকে নারী যে সমাজে কখনো স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেনি। সুমথনাথ ঘোষ “পরপূর্বা” উপন্যাস রচনার মধ্যদিয়ে নারীর অসহায়তার কথা পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

কলকাতায় যেদিন দাঙ্গা শুরু হল ঠিক তার কয়েকদিনের মধ্যেই একদল গুন্ডা ব্রজেশের বাড়িতে চড়াও হয়ে জানায় তারা কোনো পুরুষের ক্ষতি করবেনা। শুধুমাত্র রূপসৌন্দর্য - যৌবনে ভরা সুমিতাকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে সুমিতার বাবা ও ভাই ব্রজেশের বাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে সেদিন উপস্থিত ছিল, সাথে ছিল সুমিতার শ্বশুর, দেওর, পিসতুতো-মামাতো দেওর, ভাসুর এবং তার প্রিয় পুরুষ ব্রজেশ কিন্তু তারা নির্বাক থেকে গুন্ডাদের হাতে তাকে তুলে দেয়। একমাত্র রক্ত-মাংসে গড়া সুমিতার চার বছরের সন্তান সুকুমার প্রতিবাদী হয়ে উঠলেও তা বিফলে যায়। সুমিতার জীবনে এই ঘটনা কালো অধ্যায়। একজন নারীর সম্ভ্রম, সম্মান রক্ষা করার মতো ক্ষমতা বা সাহস কোনো

পুরুষেরই হলোনা! নিজস্বার্থ ও জীবনকে বাঁচানোর জন্য তারা বিসর্জন দিলো ঘরের বধুকে। গুন্ডাবাহিনী সুমিতার রূপে মুগ্ধ হয়ে আগে কে তাকে ভোগ করবে সে বিষয় নিয়েই নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করলে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সুমিতা চিৎকার শুরু করে। সেই সময় গিয়াসউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে নোয়াখালিতে নিয়ে গিয়ে নিজস্ব বাগান বাড়িতে আটকে রাখে। নারীর যৌবন, সৌন্দর্য পুরুষের শিরা- উপশিরায় কামনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে। লালসার শিকার হয় সেই নারী। গিয়াসউদ্দিন, তাকে বলপূর্বক বিয়ে করতে চেয়েছে, এতে সুমিতা রাজি না হওয়ায় পাশবিক হয়ে উঠে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে চেয়েছে। পাশবিক শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে সুমিতা জ্ঞান হারিয়েছে,আবার জ্ঞান ফেরার পর গিয়াসউদ্দিনকে কাপুরুষ, পাষন্ড, জানোয়ার আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে,জানিয়েছে প্রয়োজন হলে সে আত্মহত্যা করবে, কিন্তু কখনো নিজের সংস্কার, নিজের ধর্মকে বিসর্জন দেবেনা।

সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষ "পরপূর্বা"(১৯৫৫) উপন্যাসে সমাজের নগ্ন- কঙ্কালসার মানব সভ্যতার কথাই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। গুন্ডা বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেলেও সুমিতা গিয়াসউদ্দিনের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। গিয়াসউদ্দিনকে একপ্রকার বিবাহ করতে সে বাধ্য হয়েছে। ব্রজেশ তাকে চিঠিতে জানায়—'আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।তোমার জাত গিয়েছে,তুমি মুসলমানের ঘর করছো।কাজেই আমাদের বাড়িতে ঠাঁই পাবার আশা তোমার মন থেকে চিরকালের মত মুছে ফেলো।'[১] এই চিঠি পড়ার পর সুমিতার সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে ওঠে। পুনরায় সেই চিঠি পাঠায় ব্রজেশকে, জানায়- তাকে ঘরে স্থান না দিয়ে যদি ঝি- চাকরের মতো এতটুকু আশ্রয় দেয় তাহলে সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। এতে ব্রজেশ বিরক্তি প্রকাশ করে জানায়-'আমাদের ভিটেতে পর্যন্ত উঠবার তোমার আর কোন অধিকার নেই।'[২] কুলীন ব্রাহ্মণের দোহায় দিয়ে সুমিতাকে পরিত্যাগ করে। সে সংস্কারবদ্ধ, মিষ্টভাষী সুমিতার জীবনে শুরু হয় চড়াই-উতরাই। সে অনেক ঘটনার পর গিয়াসউদ্দিনের কাছে ধরা দিতে বাধ্য হয়। গিয়াসউদ্দিন তার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, নাম দেয় আমিনা। আজ সে ঢাকা, লাহৌরের চামড়া ব্যবসায়ীর স্ত্রী। আমিনা বর্তমানে নবাবজান ও আনারকলির আম্মিজান। কিন্তু আজকের আমিনা অতীত জীবনের স্মৃতিকে কখনোই ভুলতে পারেনি। বিশেষত প্রথম সন্তান সুকুমার তার হৃদয়ের প্রতিনিয়ত অবস্থান করেছে। সুকুমারের স্মৃতি বারেবারে তার মনকে অস্থির করে তোলে। দীর্ঘ কয়েকবছর পর কর্মসূত্রে কলকাতায় আসার সুযোগ হলে সুকুমারকে দেখার সুযোগ হাত ছাড়া করতে চায়নি। ছুটে গিয়েছে বালিগঞ্জের সেই অন্ধকার গলিতে, যেখানে একসময় ব্রজেশের হাত ধরে সংসার শুরু করেছিলো। কিন্তু সেখানে দেখা না পেয়ে অসহায়ের মতো ছুটে গিয়েছে ব্রজেশের অফিসে। কাতর অনুরোধ জানিয়েছে সুকুমারকে একবার দেখানোর জন্য। কিন্তু ব্রজেশ অপমান করে জানিয়েছে সুকুমারের সাথে একজন বিধর্মীর সম্পর্ক





থাকতে পারেনা, সন্তানের সাথে মায়ের সাক্ষাৎ ঘটতে দেয়নি। এর ফলে সুমিতা ভাবতে থাকে এমন কঠিন হৃদয়, নিম্ন- মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে দুর্বলতা প্রকাশ না করলেই হয়তো ভালো হতো! সুমিতা অতীতের স্মৃতি মনে পড়লে ভাবতে থাকে যে পুরুষ স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করতে পারেনা সে হয় নির্বীর্য বা নপুংসক। আবার পরক্ষণেই স্মৃতির পাতায় অনুশোচনা করে বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে নিজের মনেই বলতে থাকে-'কেন হৃদয়ের দুর্বলতা প্রকাশ করে এমন কাঙ্গালপনা করতে গেল? এর চেয়ে তার মুখের ওপর লাথি মেরে যদি চলে আসতে পারতো,তাহলে বোধ হয় উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হতো!'[৩]

আসলে সুমিতার এই তীব্র প্রতিবাদ দেশের সমস্ত পুরুষদের বিরুদ্ধে যারা নারীকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র মনে করে। সেই কারণেই হয়তো এই ধরনের পুরুষেরা নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য নারীকে পরপুরুষের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা বোধ করেনা।সে কারণে পুরুষ সমাজের প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে সুমিতাকে বলতে শুনি-পুরুষ নারীর সম্ভ্রমে সচেষ্ট হলে বোধহয় এত প্রাণ যেতনা,এভাবে নারীর ইজ্জত নষ্ট হতোনা। হৃদয়ের ছাইচাপা আগুন জ্বলে উঠেছে তার কণ্ঠে, সে বলে উঠেছে-'ইচ্ছে করে আজ আমার পায়ের নাগরাজোড়াটা দিয়ে একটা মালা গেঁথে উপহার দিয়ে যাই এ দেশের পুরষদের- তাদের অপহৃতা স্ত্রী ও মা ভগ্নীদের দেওয়া জয়মালা বলে।'[৪]

সুমিতা নিজের মনকে শান্ত করে সুকুমারের কথা ভেবে, উদ্ভ্রান্তের মতো দিকবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে সন্তানের সাক্ষাৎ পেতে চায় কারণ মাতৃহৃদয় যে সন্তানকে একলা ফেলে কখনো থাকতে পারেনা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুমিতা ধর্মের বেড়াজালের দুর্বিপাকে পড়ে সন্তানের ভালোবাসা থেকে হয়েছে বঞ্চিত। সুমিতার মনে পড়ে যায় বাল্যবন্ধু অঞ্জলির কথা।বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে বালিগঞ্জেই, ব্রজেশের বাড়ি তার থেকে খুব বেশি দূরত্বের নয়, অঞ্জলির সাথে সাক্ষাতের পর সুকুমারের প্রসঙ্গ এলে, সুমিতার অনুরোধে অঞ্জলি সুকুমারের সাথে দেখা করতে সাহায্য করে। গুন্ডাবাহিনীর হাতে সুমিতা যখন অপহৃতা হয় তখন সুকুমারের বয়স ছিলো চারবছর, তারপর কেটে গেছে আরও আট বছর, দীর্ঘ সময় পর সন্তানের সাথে মায়ের প্রথম সাক্ষাৎ। স্বাভাবিক ভাবেই সুকুমার মাকে চিনতে পারেনি। আসলে সুকুমার বুঝে ওঠার সময়কাল থেকেই দেখেছে তার সৎ মাকে, যার ভালোবাসা সে কখনো পায়নি, নাবালক সুকুমারকে দিয়েই ফাইফরমাশ খাটিয়ে নিত সৎ মা, এমনকি সেই মায়ের কন্যাকে নিয়ে পার্কে ঘুরে বেড়ানো এবং আনন্দ প্রদানই ছিল সুকুমারের মূল কাজ। অথচ শিশু সুকুমার মাতৃস্নেহ, মাতৃত্বের স্বাদ কেমন তা বুঝে উঠতেই পারেনি তাই হঠাৎ করে একজন সুন্দরী মহিলা তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, কাঁদছে! এ বিষয় প্রত্যক্ষ করে সুকুমার হতবাক হয়ে যায়। হঠাৎ করে ব্রজেশের আগমনে মাতৃ-সন্তানের মিলনে ইতি পড়ে। ব্রজেশ সুকুমারকে মারতে মারতে সেখান থেকে নিয়ে গেলে, সুমিতা

আরও বেশি অস্থির হয়ে ওঠে। সুকুমারের করুণ পরিনতি তার বিবেককে দ্বন্ধ করে। সুমিতা অঞ্জলির কাছে করুণ আর্তি জানায় সুকুমারের শরীর ও লেখাপড়ার ব্যাপারে গোপনে যেন একটু খেয়াল রাখে, যদিও সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করবে সুমিতা নিজেই।

অন্যদিকে সুকুমার ভাবতে থাকে ওই সুন্দরী মহিলা কে?যে তাকে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছিলো! তার মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে এমন ভাবে তাকে তো কেও কখনো কাছে টেনে নেয়নি,তাহলে সে কি তার হারিয়ে যাওয়া মা! এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য সই-মা অঞ্জলির দ্বারস্থ হয়,কিন্তু অঞ্জলি বন্ধুত্বের বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য প্রাথমিক ভাবে জানতে না দিলেও পরবর্তী সময়কালে সুকুমারের জেদের কাছে মায়ের পরিচয় দেয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ব্রজেশ এবং তার দ্বিতীয়া স্ত্রী সুকুমারের প্রতি অত্যাচার শুরু করলে সেই খবর জানতে পেরে অঞ্জলি চিঠি লিখে সমস্ত ঘটনা জানায়। সুমিতাও মনের মধ্যে ফন্দী এঁটে অঞ্জলিকে চিঠি লিখে জানায়-দিল্লি অবধি সুকুমারকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সে তাকে বোর্ডিং স্কুলে রেখে পড়াশোনা করাবে। মায়ের এই আশা পূর্ণ হয়েছে একথা ঠিক কিন্তু সুমিতার-আমিনা চরিত্রে রূপান্তরিত হওয়ার যে অধ্যায় সেখানে তার বর্তমান স্বামী গিয়াসউদ্দিন এবং দুই সন্তান রয়েছে। অতীতের স্মৃতি কিন্তু সুমিতা ভুলতে পারেনি,সেই কারণে বারেবারে ক্ষত- বিক্ষত হয়েছে। সুমিতা- আমিনা দুই সত্তার যেন মুখোমুখি সংঘাত ঘটেছে।শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত পত্নী ও স্নেহময়ী আম্মাজান আমিনা তার বিবেক বর্জিত অমানবিক প্রথম স্বামী ব্রজেশের মৃত্যুতে বৈধব্যের শূন্যতা অনুভব করেছে। সুকুমারকে উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মনেরই অজান্তে আরেক সন্তান নবাবজানের প্রতি সঠিক খেয়াল রাখা হয়নি, যে কারনে আমরা প্রত্যক্ষ করি ক্লাস ইলেভেন-এ পড়া ছেলেটা বন্ধুদের সাথে তাস খেলে, এমনকি বাঈজী বাড়িতে নাচ দেখতে গিয়ে আব্বাজানের চোখে পড়ে।আব্বাজানের রোষানলে পড়ে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। গিয়াসউদ্দিন এই সমস্ত ঘটনার জন্য আমিনাকেই দায়ী করে।সুমিতা রূপী আমিনা কোথাও যেন বিবেকের কাছে বারেবারে ক্ষত-বিক্ষত,পরাস্ত হতে থাকে। সে তাই শেষ পর্যন্ত হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আশায় সন্ন্যাসীনী হয়ে উঠেছে।

আসলে "পরপূর্বা" সুমথনাথ ঘোষের একটি শক্তিশালী ও ঘাত-প্রতিঘাতময় উপন্যাস। লেখক যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও নাটকীয় তীব্রতার সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনি বর্ননা করেছেন। কোথাও যেন ধর্মান্ধ, বিবেকহীন সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, কীভাবে আমরা সমাজ এবং ধর্মের জু জু দেখিয়ে মানবত্বাকে বিসর্জন দিয়ে থাকি। বিসর্জন দিই সেই নারী শক্তিকে যারা সমাজের মূল স্তম্ভ। যাদের হাত ধরে সমাজে ভূমিষ্ঠ হয় "পুরুষ" ও।





আর এই পুরুষেরাই নারীকে প্রতিনিয়ত সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মনে করে। সুমিতার মতো নারীরা সমাজে, পরিবারে, অবহেলিত, অত্যাচারিত, ক্ষত-বিক্ষত হয়েও তাদের অতীতের সংস্কারকে কখনো ভুলতে পারেনা। ভুলতে পারেনা বলেই ব্রজেশের মতো কাপুরুষের মৃত্যুতেও সুমিতা বৈধব্যের শূন্যতা উপলব্ধি করে। সুমথনাথ ঘোষের "পরপূর্বা" উপন্যাস পাঠ করলে সত্যই আমাদের মনোমুগ্ধ হতে হয়, মনে হয় আজও যেন সমান্তরাল ভাবে "পরপূর্বা" বিষয় ও বৈচিত্র্যের প্রবাহমানতাকে বহন করে চলেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১. সুমথনাথ ঘোষঃ সুমথনাথ ঘোষ রচনাবলী (প্রথম খন্ড);১৩৯৯; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স; পৃষ্ঠাঃ ২৩
২. তদেব; পৃষ্ঠাঃ২৩
৩. তদেব; পৃষ্ঠাঃ১৯
৪. তদেব; পৃষ্ঠাঃ১২

# স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে মানুষের জীবনের সংকট ও অস্তিবাদী দর্শন

**বিভাস বিশ্বাস**

উপন্যাস আসলে এমন এক আয়না, যে আয়নায় প্রতিফলিত হয় গতিশীল আধুনিক কাল যা পরিবর্তন করে মুখের ছবিগুলিকে। এই মুখের আদলে বদলে যায় মনের সূক্ষ্ম ভাবনাগুলিও। প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যেই মানুষগুলিকে আবিষ্কার করি নতুন করে, নতুন মাত্রায়। তাদের রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করি।উপন্যাসের সৃষ্টি কাল থেকেই একের পর এক আন্দোলন ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত করেছে উপন্যাসের গঠন ও উপন্যাসের বিচার পদ্ধতি। উপন্যাস ক্রমেই অগ্রসর হয়েছে এইসব আন্দোলন, মতবাদ ও দার্শনিক মতাদর্শ গুলিকে অবয়ব করেই। এমনই এক দর্শন—"আস্তিবাদী দর্শন"। অস্তিবাদী দর্শন সাম্প্রতিক কালের একটি প্রভাবশালী দর্শন।প্রথম মহাযুদ্ধ এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই এই দর্শনের বিকাশ ও প্রসার ঘটে।আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দর্শনের ভাবধারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আলোড়ন সৃষ্টির পিছনে যে নামটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ - পল সার্ত। যার লেখনীতে গোটা পৃথিবী আকৃষ্ট হয়, তার মূলে রয়েছে অস্তিবাদী দর্শন। যদি ও প্রথম মহাযুদ্ধের অর্ধ- শতাব্দী ও আগে ডেনমার্কের বিখ্যাত দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ এর হাত ধরেই এই দর্শনের জন্ম। সার্ত এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সাম্প্রতিক দর্শন ও সাহিত্য জগৎকে এমনভাবে আন্দোলিত করেছে যে অস্তিবাদী দর্শনের সাথে অনেকেই এই নামটি বুঝে থাকেন।এই অস্তিবাদী দর্শন প্রাচ্য ও ভারতীয় সাহিত্যে অনেক আগে থেকেই পরিলক্ষিত, তবু আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক সাহিত্যে, বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে এর ছাপ স্পষ্ট। স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলা উপন্যাসে জটিল জীবনবোধের অন্তরালে স্বপ্নকে ঘিরে বাঁচা, স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণা,একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, অবক্ষয়ী সমাজের উদভ্রান্ত যুব সমাজ - যারা ক্রমাগত অশ্লীলতার পাঁকে নিমর্জিত। এই টুকরো টুকরো কোলাজ উঠে এসেছে কথাকারদের লেখনী ধারায়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে মানুষের জীবন সংকট ও অস্তিবাদী দর্শন বৈচিত্র্যময় রূপ নিয়ে উপস্থাপিত।

ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের অবয়ব যেমন গভীর তেমনই বিশাল। সাহিত্যতত্ত্বে স্রষ্টাকে দ্বিতীয় বিধাতা বলা হয়েছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত শাস্ত্রে ভরত থেকে শুরু করে আধুনিক মনীষীগণ সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে বহু বিচিত্র ও মননশীল ভাবনা বিষয়কে আলোচনায় সমৃদ্ধ করে আসছেন। প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকগণ পাশচাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ পাঠক ও দর্শকদের যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার সমর্থন পাওয়া যায় একালের পশ্চিমের সমালোচনা তত্ত্বে। পাঠকের হৃদয় ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান করতে করতে ধন্যাত্মক জীবন - দর্শন আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ। এরই পাশাপাশি দার্শনিকগণ একের পর এক তত্ত্ব



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

আবিষ্কার করতে করতে আবিষ্কার করে ফেলছেন অস্তিবাদী দর্শন। এই অস্তিবাদী দর্শনের প্রভাব পড়েছে স্বাধীনতা - উত্তর বাংলা উপন্যাসে।

দর্শন বা দার্শনিক চিন্তা প্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম হল সাহিত্য। অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষভাবে জ্যাঁ- পল সার্ত রচিত "Being and Nothingness" গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শন বিশ্বের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে আকৃষ্ট করে। এই গ্রন্থে তিনি বিস্তারিত ভাবে সত্তার আলোচনা করেছেন।তবে একথা সত্য যে, অস্তিবাদী দার্শনিকের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে মানুষ। সেই কারণে অস্তিবাদ মনুষ্য - পরিস্থিতির দর্শন।অস্তিবাদ বিষয়ের দর্শন নয়, তা বিষয়ীর দর্শন। অস্তিবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন অস্তিত্বের সন্ধান বেঁচে থাকার বাস্তবতার মধ্যে পাওয়া যায়। অস্তিবাদী দার্শনিকেরা সেই কারণে এই মত প্রকাশ করেন "বেঁচে থাকা" আর অস্তিত্বশীল হওয়া এক জিনিস নয়।তবে এই অস্তিত্ব বলতে মানব অস্তিত্বকেই ইঙ্গিত করে। অস্তিবাদ অনুসারে অস্তিত্বের অর্থ স্বাধীনভাবে একপ্রকার বিশেষ ব্যক্তিমানুষে পরিণত হওয়া, যে মানুষ স্বচ্ছন্দে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষের মনে এমন এক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল, মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দীহান হয়ে উঠে। অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা নেতিবাচক অনুভূতি মানুষদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠে।সারাবিশ্বে যখন পুঁজিবাদের উত্থান, ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন, বিশ্বব্যাপী মন্দা, যুদ্ধের নারকীয় খেলা ইত্যাদি পটভূমিকায় যখন মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় শঙ্কা। এরূপ অবস্থায় বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষজন তাদের বেদনা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলেন,মানুষিক আশ্রয়ের সন্ধান করছিলেন দর্শনে। এই সময় কিয়ের্কেগার্দ এর রচনাবলী অনুদিত হচ্ছিল বিভিন্ন ভাষায়,আর এই সময় জ্যাঁ - পল সার্ত এর "Being and Nothingness" (১৯৪৩) প্রকাশিত হল। অস্তিত্ব বাদের সমর্থক এবং বিরোধীরা যে ভাবনায় অস্তিত্ববাদের মূল্যায়ন করেছেন এবং আজকের অস্তিত্ববাদ বলতে যেমন বোঝানো হয়, সেখানে এর সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া বেশ জটিল একটি ব্যাপার। তবে একটি সিদ্ধান্তে এসে বলা যায় অস্তিত্ববাদ হল এমন এক দার্শনিক আন্দোলন যা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে। যে আলোচনা সাধারণ অর্থে নয়, বিশেষ অর্থে। সার্ত-এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বর্তমানে দর্শন ও সাহিত্যকে এমন ভাবে আন্দোলিত করেছে যে, আধুনিক অস্তিত্ববাদ বলতে সার্ত-এর দর্শনকে সবাই বুঝে থাকেন। গতানুগতিকভাবে দার্শনিকদের চিন্তাধারা শুধুমাত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে দার্শনিক গ্রন্থেই এবং প্রচারিত করার চেষ্টাও করা হয়েছে সেই ভাবেই সেখানে সাহিত্যের ভূমিকা কে ব্রাত্য তো রেখেই। কিন্তু সাহিত্য অস্তিবাদী দর্শনের উপযুক্ত একটি মাধ্যম। অস্তিবাদী দার্শনিকরা এবং বহু সাহিত্যিক লেখনীর মাধ্যমে অস্তিবাদী দর্শনের মতবাদকে প্রচার করার চেষ্টা চালিয়েছেন। সার্ত ছাড়াও কাফকা, ক্যামু প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অস্তিবাদ বা অস্তিত্ববাদ এর বিভিন্ন সূত্র, এই দর্শনের স্বরূপ সুত্র ধরেই বিভিন্ন অস্তিবাদীর অভিমত কে প্রাধান্য দিয়েই প্রবেশ করব স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসের অস্তিবাদী প্রেরণা বিচারে। স্বাধীনতা উত্তর পাঁচ ও ছয়ের দশকের বিভিন্ন উপন্যাসের বিশ্লেষণে অস্তিবাদের মর্মকথা এবং দার্শনিক সূত্রগুলি ও প্রাসঙ্গিক ক্রমে আলোচনায় উঠে আসবে।স্বাধীনতা উত্তর দুই দশকের বাংলা উপন্যাসে আধুনিক লেখকদের অন্যতম ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।তাঁর রচনাতেও সে যুগের যন্ত্রণা ও সংকট এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে কোথাও কোথাও তাঁর চরিত্রগুলি যেন বিচ্ছিন্নতাবোধে জর্জরিত হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন কল্লোলীয়দের অন্যতম বন্ধু। সে সময় কল্লোলীয় দের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্প-সংস্কৃতির ছিল অন্যতম যোগাযোগ। সেই যোগাযোগের সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও অস্তিত্ববাদের প্রেরণা এসেছিল। মানুষের জীবন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রেম, যৌনতা - সবকিছু তখন আদর্শহীনতার ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিত। এই লাঞ্ছনা তৎকালীন লেখকদের মধ্যেও সৃষ্টি করেছিল হতাশা ও শূন্যতার বোধ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও সেই বোধ কার্যকরী হয়েছিল বিশেষ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জননী"(১৮৩৫),"দিবারাত্রির কাব্য" (১৯৩৫), "পুতুল নাচের ইতিকথা "(১৯৩৬), "চতুষ্কোণ"(১৯৪৮) ইত্যাদি উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে একটা বিপন্নতা কার্যকারী হয়েছে। মানিকের " পুতুল নাচের ইতিকথা" যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নন। ফলে অস্তিত্ববাদ ও মার্কসবাদের যে আপাত বিরোধ সেই বোধ মানিকের মধ্যে ছিল না। এই উপন্যাসের শশী চরিত্রের একাকীত্ব যেন জীবনানন্দের কথাতেই ব্যাখ্যা করা যায়। "জননী " উপন্যাসের শ্যামার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এক মানসিক বিচ্ছিন্নতাবোধের অনুভূতি। উপন্যাসের শ্যামার স্বামী শীতল যেন Agitated melancholia রোগের শিকার। চঞ্চল ও মিশ্রিত উদ্বেগ বা উত্তেজনা মিশ্রিত বিষণ্ণতা তাকে আঘাত করেছে। শ্যামার কাছ থেকে আশ্রয়চ্যুত হওয়ার ভীতি তাকে দুঃখ দিয়েছে। তাকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। মানুষ কিভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়, সমাজ ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব একটি মানুষকে কিভাবে বিপর্যস্ত করে, সেই সংকটের কথাতে সম্পূর্ণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চতুষ্কোণ" উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক হতাশা, বিপন্নতা, ও নিঃসঙ্গতার এক প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। সমাজে সে আদর্শের সন্ধান পায়নি, বিশ্বজুড়ে দেখেছে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন ও ধনতন্ত্রের উত্থান, ভারতবর্ষ তখনও নয়া বুর্জোয়াদের হাতে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত, এরূপ অবস্থায় রাজকুমারের বিবেক অশান্ত হয়ে ওঠে, অস্বস্তি অনুভব করে, পাইনা শান্তি ও স্বস্তি।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর রচনাতেও বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের সংকটের বহু চিত্র রয়েছে। বুদ্ধদেব বসু রচিত বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে এই সংকট বড় হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য এই তাঁর দুটি উপন্যাস হলো — "শোনপাংশু" এবং





"শেষ পাণ্ডুলিপি"। "শোনপাংশু" উপন্যাসে প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় ছিল এক আদর্শবান অধ্যাপক। শিক্ষকদের জীবনের নানা কাহিনী এখানে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষকদের জীবনের যান্ত্রিকতা, বিকৃতি ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যতিক্রমী চরিত্র রূপে এখানে উপস্থিত নব্যেন্দু গুপ্ত। আদর্শবান, সৎ, পরিশ্রমী, নব্যেন্দু কে মেলাতে পারেনি বিদ্যায়তনের অন্যান্য শিক্ষকরা। বরং তাকে এক ঘরে করা হয়েছে। নিজের আদর্শ নিয়ে নব্যেন্দু কে শেষ পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। তার একাকীত্বের যন্ত্রনাকে বুদ্ধদেব বসু সু-কৌশলে প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর "শেষ পাণ্ডুলিপি" উপন্যাসের নায়কের বিচ্ছিন্নতাবোধ ভাষা পেয়েছে। সার্ত এর " The Age of Reason" উপন্যাসের ম্যাথিউ এর মত বুদ্ধদেবের নায়ক বীরেশ্বর গুপ্ত ও জীবনের দিক থেকে নিজেকে ব্যর্থ মানুষ বলে মনে করেছে। নিজের স্বাধীনতা বোধকে সে বজায় রাখতে গিয়ে কারো সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারিনি। তার জীবনেও নির্মম আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম, তা একে একে নির্মিত হয়েছে। "শেষ পাণ্ডুলিপি" উপন্যাসের নায়ক তৎকালীন সমাজ, পৃথিবী, পরিবার ইত্যাদির মধ্যে অসহায়তা উপলব্ধি করে নিজেকে সার্ত কথিত প্রথম স্তরের সারিবদ্ধ মানুষের ই এমন একজন ভাবে। তার এই বিচ্ছিন্নতাবোধ যেন বুদ্ধদেব পরবর্তী সমরেশ বসুর "বিবর" উপন্যাসে নায়কের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার আশাবাদ ম্লান হতে হতে মানুষ নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যে কাটিয়েছে জীবন। এই সময়টিকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছিল সমরেশ বসুর "বিবর"। আর "বিবর" এর লেখকের সাথে-সাথে এই যুগ ও জীবন তুলে ধরলেন বিমল কর। তার "ফানুসের আয়ু" ( ১৯৫৮) উপন্যাসে রয়েছে চরিত্রের আত্মসংকট ও নিঃসঙ্গতা। "ফানুসের আয়ু" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তিতু (প্রথম পর্বে) বা তীর্থপতি (দ্বিতীয় পর্বে) আত্মার সংকট তাড়িত। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে বেশি করে এসেছে বিষাদময় বিচ্ছিন্নতা। পরিবারের মধ্যে থাকতে থাকতে সে বুঝেছে "দায়" এখানে বেশি। সেই দায় তার বন্ধন। এখানে পরিবারের অন্যান্যদের স্বার্থপরতা তীর্থপতির মধ্যে এনেছে একাকীত্ব। উপন্যাসের প্রথম পর্বের তিতু বুঝেছিল একাকীত্বের যন্ত্রণা। বাবা হেম ও দ্বিতীয় পক্ষ মিনু মাসির সম্পর্ক, তাকে বেশি করে একা করে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বেও তীর্থপতি পরিণত মনে উপলব্ধি করেছে যে, সকলেই আপন আপন স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে অন্যের অস্তিত্বকে বেপরোয়াভাবে অস্বীকার করে। বন্ধু, আত্মীয়, প্রেমিক কোন কিছুতেই তীর্থপতির আশ্রয় মনে হয়নি। এক ধরনের ভয়ংকর হতাশার জগতে সে অবতীর্ণ হয়। সেই উপলব্ধি থেকেই প্রেমকে সে ঘৃণা করে। আর এর মধ্যে দিয়ে সে যা উচ্চারণ করে সেই উচ্চারণে তো অস্তিবাদী লেখক জ্যাঁ-পল সার্ত এর বহু উপন্যাসের নায়কের নিঃসঙ্গতায় উচ্চারিত হয়।

দেশ-কাল পরিধি, প্রবাহমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে গ্রহণ করেছেন স্বাধীনতা উত্তর কালের ছয় দশকের কথা সাহিত্যিকেরা। উপন্যাস এভাবেই দশদিক আয়তবান

হয়। স্পষ্ট, বলিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা উত্তর এই পর্বের বৈশ্বিক আবহ স্বতন্ত্র। ছয়ের দশক সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত এবং আহত। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেছে বিশ্ব সময়ের বিষনীল ধোঁয়ায়। সহজ সরল মানুষজনের আত্মাকে খন্ড খন্ড করে মুছে ফেলার কৌশলে শাণিত থেকে শানিততর হয়েছে রাজনীতি ও সামাজিক আবহ। অগ্নিদাহ, প্রবল ঘূর্ণিঝড়, ফলে দেখা গেছে মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি মানুষের অস্তিত্বকে করেছে টালমাটাল। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ সর্বহারা। ফলে রোগ যন্ত্রণার ব্যর্থ অসহায়তা মানুষকে কুরে কুরে খেয়েছে, জীবনকে - আশ্রয়কে - মননকে।পাঁচের দশক থেকেই স্বাধীনতা উত্তর কাল স্বভাব ধর্মে স্বাতন্ত্র। এই সময় পর্বে কিছু ঘটনা ঘটে গেল যার প্রভাব থেকে বাদ গেল না এই সময় পর্বের ঔপন্যাসিকদের লেখনীও। চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষ, তীব্র খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলনের উদ্ভব ও তীব্র প্রসার, রাজনৈতিক আন্দোলনে হতাশ তরুণীদের রক্তক্ষয় আত্মত্যাগ, বেকারি, দারিদ্র এই দিকগুলি এই সময় পর্বে বা তার পরেও সময়কে ম্লান, ও ক্ষতবিক্ষত করেছে। এই অস্থির সময় পর্বে যারা শৈশব - বাল্য -কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছেন তাদের জীবন বোধ ভাবনায় একটা ভিন্নমাত্রা পাবে তা নিঃসংশায়িত।

সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনের যখন দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় তখন তার উপন্যাস গুলির মধ্যে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষদের জীবন বৃত্তান্ত উঠে এসেছে। ছয়ের দশকের পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক সংকট। নিজের ভাবনায় যে বাস্তব জীবন তা দলিল উঠে এসেছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব কিন্তু নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবিও বটে। এই সময় লেখক আঁতপুর - জগদ্দল এলাকায় বাস করতেন। সামান্য মজুরিতে বন্দুক কারখানায় কাজ করেছেন, বেঁচে থাকার জন্য তিনি ডিম মুরগি শাক-সবজি চটকলের কোয়ার্টারে ফেরি করতেন। সবকিছু মিলিয়ে "বিবর"(১৯৬৫), "প্রজাপতি" (১৯৬৭), "পাতক" (১৯৬৯) উপন্যাস গুলিতে ও মধ্যবিত্ত সমাজের ভঙ্গুর আবহ প্রতিফলিত। যার মধ্যে বিকারগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আত্ম প্রবঞ্চনা প্রতিফলিত। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামী বোধই যেন চরিত্র গুলোর মধ্যে উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়।মানুষের অস্থিরতা, অশান্তি ও বিভ্রান্তির ভাষা রূপ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "ঘুণপোকা"(১৯৬৭) উপন্যাসে লক্ষিত। একদিকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ, অন্যদিকে ফ্যাসিবাদের, সাম্রাজ্যবাদের জয়যাত্রা - এই দুই আদর্শের মধ্যে শ্যাম অভিশপ্ত মানুষদের একজন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে যুব সমাজের যন্ত্রনা, দুঃস্বপ্নের আকস্মিকতায় ভগ্নচূর্ণ। সার্ত কথিত "অস্তিবাদ" এর ছায়ায় এসে পড়েছে চরিত্রগুলোর উপর।সার্ত এর কথা মতো স্বাধীনতা চেতনার সত্তা। চেতনা শূন্যতার সৃষ্টি করতে পারে। এই শূন্যতা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "ঘুনপোকা"র নায়ক শ্যামের, সমরেশ বসুর "বিবর" উপন্যাসের নায়ক বিরেশের। "ঘুণপোকা" উপন্যাসের নায়ক শ্যাম অনেকটা ক্যামুর "দি মিথ অফ সিসিফাস" উপন্যাসের নায়কের মতই কেবল





জগতের উদ্ভটত্বা অনুভব করেনি। এটিকে অতিক্রম করে পার্থিব জীবনের অসঙ্গতিকে জয় করতে চেয়েছে। সিসিফাস আশাবাদী ছিলেন অনর্থক শ্রমের পরিবর্তে সে উপহার পেয়েছে মৃত্যুর জয়ের আনন্দে।

পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের সূচনায় যেসব বাঙালি কথাকার লেখনি ধারণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই সমকালের অবক্ষয়কে উপন্যাসের বিষয় করেছিলেন। এই কালেরই লাঞ্ছিত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর "আত্মপ্রকাশ"(১৯৬৬) উপন্যাস অবক্ষয়ের শৈল্পিক রূপে সমৃদ্ধ। এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক এবং কথকও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে। উপন্যাসটির নাম "আত্মপ্রকাশ "। এই আত্মপ্রকাশ আসলে আত্মানুসন্ধান, এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে। এই আত্মানুসন্ধানের সঙ্গে অস্তিত্ববাদ কথিত আত্ম - অতিক্রম ভাবনা সাদৃশ্য রয়েছে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা আত্ম অতিক্রম সম্বন্ধে বলেন - তার মূল বক্তব্যটি হল তারা বিশেষ বিশেষ মানুষের মূর্ত, অস্তিত্বের সন্ধান করেন। ব্যক্তি এখানে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। "আত্মপ্রকাশ" উপন্যাসে কথক ও তার বন্ধুরা কেউই প্রকৃতির সার ধর্মের অনুসরণে বিশ্বাসী নয়। বরং বলা যায় যে, তারা পরিবর্তনকামী। বিশেষভাবে থাকবার অথবা কিছু হবার ইচ্ছা বা বাসনা তাদের রয়েছে। এরা নিজের ভঙ্গিতে জীবন ধারণ করতে চাই। এভাবেই তারা আত্ম অতিক্রম চেয়েছে।

আলব্যের ক্যামু রচিত অ্যাবস্যার্ড উপন্যাসের নানা লক্ষণ রয়েছে বাংলা ভাষার অন্যতম লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "অরণ্যের দিনরাত্রি" উপন্যাসে।অ্যাবসার্ভিস্টরা সাহিত্যকে শুধুমাত্র কল্পনা জগতের ফসল ভাবেননি। তারা সমকালীন বাস্তব জীবনকে রূপায়িত করেছিলেন। সুনীলের "অরণ্যের দিনরাত্রি" উপন্যাসে রয়েছে জীবন সম্পর্কে গভীর বাস্তবতার বোধ, ভালোবাসা সম্পর্কে অভিনব ভাবনা, মানুষের নিঃসঙ্গতা বোধ ও বিপন্নতার কথা। স্মরণীয় যে, অবসার্ডটির সঙ্গে অস্তিত্ববাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চলন্ত ট্রেনে অন্ধ প্যাসেঞ্জার এর মত বাইরের দিকে চেয়ে থাকি। এই বাস্তবতার চেতনা সর্বস্ব উপন্যাস মতি নন্দীর "দ্বাদশ ব্যক্তি"। এই উপন্যাসে আধুনিক মানুষের জীবন সংকটের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। টাকার সর্বগ্রাসী প্রভাব, হৃদয়হীনতা, অমানবিকতা ও মূল্যবোধের দ্রুত অবনমন উপন্যাসটির তারক চরিত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তারকের বেড়ে ওঠা শহর কলকাতায়। ষাটের দশকের সেই কলকাতা প্রকৃতপক্ষেই তখন এক অশান্ত শহর। এই শহর আধুনিক ধনতান্ত্রিক শহর। ধনতান্ত্রিক শহরে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। সে বাজারের অংশ বাজারের স্বাধীনতা থাকে। সেও এক পণ্য। তাহলে তো সমাজ চেতনায় ছড়িয়ে যায় টেনশন। টেনশনের ছবি মতি নন্দীর "জীবন্ত", "সাদা খাম", "ছায়া" ইত্যাদি রচনার মত "দ্বাদশ ব্যক্তি" উপন্যাসেও স্পষ্ট।

'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে মানুষের জীবনের সংকট ও অস্তিবাদী দর্শন 'এই

আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে, বাংলা উপন্যাসের লেখক সমরেশ বসু, বিমল কর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী প্রমুখের উপন্যাসে অস্তিবাদী নায়কের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত তো দেখা যায়। এই ঔপন্যাসিকদের পূর্বে বা সমকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কথাকারদের হাতেও তার আভাস পরিলক্ষিত। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পশ্চিমে যে সামাজিক - রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক অসুস্থতায় মানুষ নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, অস্তিবাদী দর্শন ও সাহিত্যের মাধ্যমে সেই গভীরতর অসুস্থতা বাংলা তথা ভারতবর্ষে ছিল আরো তীব্র। আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো - আন্তর্জাতিক বৈশ্বিক সুর। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সারা বিশ্বে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা শুধু প্রতীচ্য নয়, বাংলা সাহিত্যেও তার প্রভাব দেখা দিয়েছিল।

**তথ্যসূত্র :**


১। মৃণালকান্তি ভদ্র, অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ ( অনুবাদ), জ্যা - পল সার্ত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫।
২। সঞ্জীব কুমার ঘোষ, (সম্পাদনা) অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে, ১৯৮৬।
৩। স্বপ্না সরকার, অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩।
৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তরে, পুস্তকবিপনী, ১৯৯৫।
৫। নীরু কুমার চাকমা, অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দর্শনে ও সাহিত্যে, অবসর, বাংলাদেশ, ২০২০।
৬। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০২২।
৭। সমরেশ বসু, বিবর, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৫।
৮। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।
৯। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরণ্যের দিনরাত্রি, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৭।
১০। শাফিক আফতাব, উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ, অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাদেশ, ২০২২




## সময়ের দাবি পূরণে নাটক, প্রসঙ্গ : নীলদর্পণ ও জমীদার দর্পণ


**মো. তানবীর হাসান**

**প্রভাষক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।**


উনিশ শতকে ইউরোপে যখন বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলো তখন ইংরেজ সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বাংলায় এসে এখানকার চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করে। এর ফলে চাষীদের জীবন নরক হয়ে ওঠে। অত্যাচারী নীলকর সাহেবরা দরিদ্র চাষীদের বাধ্য করলেন ধানের পরিবর্তে নীলচাষ করতে। ফলে চাষীদের ঘরে দেখা দেয় খাদ্যভাব এবং নীল উৎপাদন করলেও তারা তাদের ন্যায্য মূল্য যা পাবার কথা তা থেকেও বঞ্চিত হতে লাগলো। ফলে আর্থিক দিক থেকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীর জীবনে যে ভয়ঙ্কর দুদর্শা নেমে আসে এবং নীলকর সাহেবদের সীমাহীন শোষণ ও অত্যাচার যা নীলদর্পণ নাটকের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং তীব্র শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার দরিদ্র নীল চাষীরা ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যে নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন সেই বিদ্রোহের চিত্র এই নাটকে বিম্বিত। আর ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসক শ্রেণির প্রতিনিধি লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল জমিদারি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় চরিত্র জমিদার ও প্রজা। এ ব্যবস্থা জমিদার যেমন নিজেকে জমিদারীর মালিক মনে করতেন তেমনি নিজস্ব সম্পদ বলে মনে করতেন প্রজাদের। শুধু প্রজা নয় বরং নারীদেরকেও মনে করা হতো জমিদারের সম্পদ। জমিদার শ্রেণির শোষণ ও নির্যাতনের স্বরূপ উন্মোচনে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ এক সত্য ঘটনার ভিতিতে 'জমীদার দর্পণ' নাটক রচনা করেন। ১৮৫৮ সালে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এছাড়া ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তউল্লাহ। তার পুত্র দুদুমিয়া ও বাঁশের কেল্লার প্রতিষ্ঠাকারী মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের মত মুক্তিকামী ব্যক্তিরাও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় লাঠি ধরেছেন।

ওই সময় সাধারণ মানুষের জীবন যে কতটা ভয়ানক ছিল তা চিত্রিত মীর মশাররফ হোসেনের বিয়োগান্তক নাটক 'জমীদার দর্পণ' এবং দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ'-এ। পরবর্তীতে এই দুটো নাটক তৎকালীন জমিদারদের ব্যাপক বিরোধিতার সুম্মুখীন হয়েছে।

কার্যত 'নীল দর্পণ' এবং 'জমীদার দর্পণ' এই দুটি নাটকের নামকরণ, বিষয়বস্তু নির্বাচন, ঘটনা সংস্থান, চরিত্র চিত্রণ ও মৌল উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় নাটকের মৌল উদ্দেশ্য হলো সমাজ কাঠামোতে যে অত্যাচার ও শোষণ রয়েছে তার

বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে জমিদারদের শাসন, শোষণ, অত্যাচার, নারীলিপ্সা ইত্যাদি তুলে ধরে সমগ্র জাতিকে উদ্ধারের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় দুজন শিল্প স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র ও মীর মশাররফ হোসেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাট্যপ্রতিভার জানান দিতে সক্ষম হন 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) রচনার মাধ্যমে। এ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোকদের উপর উপনিবেশবাদী নীলকরদের অমানবিক অত্যাচার। ঔপনিবেশিককালের ভারত ও বাংলার কৃষক জনতার হৃদয়বিদীর্ণ হাহাকার এতে উচ্চবিত। ঔপনিবেশিক শাসন চলাকালীন ইংরেজদের চোখের সামনে রচনা করা এই নাটকটি ছিল দীনবন্ধু মিত্রের দুঃসাহসী সৃজনপ্রয়াস। এই নাটকের সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্য, নাট্যমঞ্চ, স্বদেশপ্রীতি ও নীল-আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলে এই নাটককে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

দীনবন্ধু মিত্রের নিকট পরবর্তী বাংলা নাটকে উল্লেখযোগ্য নাম মীর মশাররফ হোসেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণে'ও স্থান পেয়েছে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলার গণমানুষের বাস্তব জীবনচিত্র। 'জমীদার দর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে মনন, যুক্তি উপেক্ষা করা হয়েছে। এখানে নাটকটির বক্তব্যে প্রাধান্য পেয়েছে জমিদারদের মাধ্যমে প্রজাশোষণ, নিপীড়ন ও যৌনশোষণ। ফলে সক্রিয় রয়েছে উদ্দেশ্যমূলক প্রবণতা।

একটি নাটকের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় যখন নাট্যকার সময়ের দাবী পূরণে সমকালীন প্রেক্ষাপটের যে সমাজ-রাজনীতি, সময়, স্থান ও তার রাষ্ট্র ক্ষমতার বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে তুলে ধরেন।

'নীল-দর্পণ' নাটকটি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৬১ সালে এই নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ হলে সর্বব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং নীলকর ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। বাংলা নাটকের যে বিকাশপর্ব তাতে দীনবন্ধুর মতো সময়ের দাবী নিয়ে লেখা নাটক তখন অব্দি আর কেউ রচনা করতে সক্ষম হননি। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে সমালোচক আশুতোষ ভাট্টাচার্য বলেন:

"দীনবন্ধু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন, দূরদ্রষ্টা কিংবা অন্তর্দষ্টা ছিলেন না; কিন্তু নাট্যিক চরিত্রসৃষ্টিতে, প্রত্যক্ষদৃষ্টি অপেক্ষা দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি কম প্রয়োজনীয় নহে, সেইজন্য তাঁহার সফল্যকে আংশিক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, দীনবন্ধু যতটুকু প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, ততটুকু তাঁহার মত আর কোন নাট্যকারই করিতে পারেন নাই। এই পরিচয় তাঁহার শুধুই যে নিবিড় তাহা নহে, আন্তরিকও বটে। তাহারই ফলে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত নাট্যিক চরিত্রগুলি প্রাণরসে সজীব এই গুণ বাংলা সাহিত্যের আর





কোন নাট্যকারই দেখাইতে পারেন নাই, এখানেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব।" (ভট্টাচার্য, ১৯৬১, পৃ. ২৫৯)।[১১]

সমাজ সংলগ্ন ঘটনাকে যোগ্য চরিত্রায়নের দৃষ্টান্ত ও দীনবন্ধু তাঁর নাট্যকর্মে অত্যন্ত দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকার দীনবন্ধুর এই পারঙ্গমতাকে তুলে ধরতে নিয়ে সাহিত্য চিন্তক ও সমালোচক অজিত দত্ত মন্তব্য করেন:

"শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটকে ঘটনা যেরূপ কার্যকারণসঙ্গত, চরিত্রগুলিও তেমনি দোষেগুণে বাস্তবানুগ। অতএব, মানব চরিত্রে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে সার্থক নাট্যকার হওয়া যায় না। দীনবন্ধু মিত্রের এ গুণ পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর আঁকা নিমচাঁদ। নদেরচাঁদ, জগদম্বা প্রভৃতি চরিত্র যেরূপ সম্পূর্ণ অসংগতিশূন্য, বাংলা সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি-বিশেষত নাটকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।" (দত্ত, ১৯৬০, পৃ. ১০৭)।

'নীল দর্পণ' নাটকের কোনও জায়গায় স্রষ্টা হিসাবে দীনবন্ধু মিত্রের নামের উল্লেখ ছিলো না। লেখকের জায়গায় "কস্যচিৎ পথিকস্য" নামে ছদ্মনামের উল্লেখ ছিলো মাত্র। এই নাটকটি যে দীনবন্ধু মিত্র-ই লিখেছিলেন, এই ঐতিহাসিক তথ্য সর্বপ্রথম তুলে ধরেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৮ সালে 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হলে তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র এবং তাঁর লেখা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে গিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই জানা সম্ভব হয় যে, মূল নাটকটি লিখেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র।

আলোচ্য নাটকটি ছিলো দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম লেখা নাটক। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি নাটক তিনি রচনা করলেও সেগুলির প্রভাব, খ্যাতি বা ঐতিহাসিক দ্যুতি কোন দিক থেকেই 'নীল দর্পণ'কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

এই নাট্যদর্পণে উঠে এসেছে উনিশ শতকের কৃষকদের ওপর চেপে বসা নীলচাষের মর্মস্পর্শী বেদনার দুঃখগাথা। এই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের একটি শান্তিপ্রিয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। স্বরপুর নিবাসী গোলাক বসু একটি সুখ-সমৃদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবারের কর্তাব্যক্তি। সাবিত্রী তার স্ত্রী। তাদের দুই সন্তান নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। নবীনমাধবের চরিত্রে ঔপনিবেশিক বিত্তসচেতনতা ও ব্যবসাবুদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, আর অপরদিকে বিন্দুমাধবের চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষার আদলে গড়া স্বদেশবোধ। নবীনমাধবের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী বাংলার যৌথ পরিবারের সনাতন আদর্শমণ্ডিত আর বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলতা নব্যশিক্ষার স্পর্শে সঞ্জীবিত। এমন দুই বিপরীত মনোভঙ্গি সমন্বিত সুখী পরিবারের ওপরই নীলকর নির্যাতনের পটভূমি আরোপ করে দীনবন্ধু নির্মাণ করেছেন নাটকীয় সংঘাত। প্রতিবেশী রাইয়ত সাধুচরণ-রাইচরণের পরিবার এবং সাধুচরণের অন্তঃসত্ত্বা কন্যা ক্ষেত্রমণির করুণমৃত্যু, তোরাপ ও বেগুনবেড়ের

কুঠিতে বন্দী রাইয়তদের সংগ্রাম ও বসু পরিবারের একাধিক মৃত্যুর ট্র্যাজিক ঘটনাকে উপজীব্য করে নাট্যকার নীল নিপীড়ন বিরোধী কৃষক জীবনের একটি পূর্ণ নাট্যবঞ্জনা তৈরি করেন।

নীল-দর্পণ মানে নীলের আয়না। যে আয়নাতে নীল প্রতিবিম্বিত হয় তাই নীল-দর্পণ। যে দর্পণে বা আয়নায় নীলকর ও নীলচাষের সমস্ত ছবি অবিকল প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাই নীল-দর্পণ। এই নাটকে নীলকরদের অত্যাচার নানা শব্দ সংকেতে প্রকাশিত, সাবিত্রী বলছে নীল বানর, গোপীর জবানিতে পাই নীলযম, নবীনমাধব বলেছে নীলমঞ্জুক, তোরাপ সম্বোধন করেছে নীলসামদু এবং দ্বিতীয় রাইয়ত বলেছে নীলবাদর। যে নামেই সম্বোধন করা হোক না কেন সারকথা হলো নীলকর অত্যাচারী, সর্বগ্রামী। কৃষককুলের নিকট এদের পরিচয় উৎপীড়কের। নীলকরেরা নিজ কলঙ্ক মুছে নেবেন এই কামনায় দীনবন্ধু নীলকরদের হাতেই নীল-দর্পণ অর্পণ করেছিলেন।

নীলকরদের মাঝে যাতে শুভবোধ জাগ্রত হয়। নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ নয়, বরং প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করাই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই নাটকে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মুখ দিয়ে বার বার বলিয়েছেন গ্রাম ছেড়ে যদি প্রজারা চলে যায় তাহলে নীলচাষ করবে কারা। অতএব, ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই প্রজাপীড়ন বন্ধ করুক, এমনই বার্তা কৌশলে নাট্যকার দিয়েছেন।

উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে যখন ভারতবর্ষের এই জনপদে যে সমাজচিত্র আমাদের চোখে পড়ে তা সাহিত্যকর্মে তুলে এনে স্বাধিকার ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেক্টরের কাজ করার সুবাদে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে হতো আর সাধারণ মানুষের সাথে সহজে মিশে যাবার অসাধারণ গুণ থাকায় তাঁর নাট্যভুবনে আমরা সাক্ষাৎ পাই তোরাপের মতো গ্রাম্য প্রজা, ক্ষেত্রমণির মতো কৃষককন্যা, নসীরাম ও রতার মতো বালক, রাজীবের মতো গ্রাম্য বৃদ্ধ, শিক্ষিত অথচ সমকাল-সৃষ্ট মাতাল নিমচাদ, ঘটিরামের মতো ডেপুটি, অটলের মতো শাহরবাসী বাবু, আদুরীর মতো সরলা নারী এবং নীল কুটির আমীন দেওয়ানকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হলো গণ-আন্দোলন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলচাষের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার জন্য তাঁরই পরিচালিত হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রত্রিকায় নীলকরদের নির্মম নিপীড়নের কথা তুলে ধরে প্রতিকার আশা করেন সরকারের কাছে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট-এ প্রকাশিত ঘটনাবলি নীল দর্পণ রচনায় দীনবন্ধুকে প্রণোদনা যোগায়। প্রত্রিকাটি অর্চিবল্ড হিল নামে যে ইংরেজ হরমণি নামের এক কৃষক কন্যাকে পুকুর থেকে জল আনবার সময় তার লেঠেলেরা ধরে কুঠিতে নিয়ে আসে এবং মাঝরাত অব্দি তাকে আটকে রেখে রিরংসা চরিতার্থ করে— 'নীল-দর্পণ' নাটকে রোগ সাহেবকে আমরা অর্চিবল্ড এবং হরমণি হিসেবে ক্ষেত্রমণিকে ধরে নিতে পারি।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

অমর নগরের ম্যাজিস্ট্রেট মূলত হার্সেল সাহেব আর নবীনমাধব নদীয়া জেলার চৌগাছিয়া গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।

নীল-দর্পণের ভাষা উপস্থাপন ও ঘটনা বিচার করলে দেখা যায় আলালের ঘরের দুলাল-এ বর্ণিত নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের প্রতিচ্ছায়া এখানে রয়েছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'নীল-দর্পণ' সম্বন্ধে লিখেছেন: "প্রজাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয়ে যে আগুন তখন জ্বলিয়াছিল, তাহা তাঁহারও হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি "নীল দর্পণ" লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।" (শাস্ত্রী, ২০১৩, পৃ. ২৩১)

ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় উজ্জীবিত ইংরেজ নীলকর গোষ্ঠী অর্থের নেশায় বিষ ছোবলে নীল করে তুলেছিলো বাংলার কৃষক সমাজকে। নাটকের ঘটনা, চরিত্র সৃজন ও সংলাপের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সেইসব শাসন-ত্রাসন দিনের সমাজের চিত্র। দেশী-বিদেশী নীলকর ও কৃষক উৎপীড়কদের অত্যাচারের ধরণ কেমন ছিলো তা আরো অনুমান করা যায়: "রাইয়তের খেজুর বন কাটিয়া উপড়াইয়া তাহাতে নীলের ক্ষেত করা হইত, পলায়িত প্রজার ঘর ভাঙ্গিয়া ভিটার উপর নীলের চাষ করা হইত। এমনকি ঘর জ্বালাইয়া দিয়া উৎপাত করিয়া আবাধ্য রাইয়তকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। অনেক সময়ে কুঠির লোকের বিদ্রোহী প্রজার ঘটিবাটি গরু বাছুর ধরিয়া আনিত ...... কুঠিতে কুঠিতে কয়েদঘর ছিল। চুক্তিভঙ্গ করিলে রাইয়তদিগের কুঠিতে ধরিয়া লইয়া নানা নবোদ্ভাবিত কৌশলে পীড়ন করিবার পর কয়েদ করিয়া রাখা হইত। .... কয়েদ করা লোকদিগের যাহাতে সন্ধান না মিলে, তজ্জনৎ তাহাদিগকে নানা কুঠিতে ঘুরাইয়া লইত। এজন্য নীলকরেরা ভয় দেখাইত। কোনো কোনো হতভাগ্য আবদ্ধের যে একেবারে সন্ধান হইত না। ...মোল্লাহাটির "লালমোহন" (R.T. Larmoor) সাহেবদের আরও এক নতুন কীর্তি ছিল। তাহার কুঠিতে রাইয়তদিগকে প্রহার করিবার জন্য আরও যে এক প্রকার নতুন লগুড় তৈয়ার করা হইয়াছিল। তাহার নাম "রামকান্ত" বা শ্যামচাঁদ। এই শ্যামচাঁদের আঘাতে রাইয়েতেরা জরিপ হইতেন। নীল বুনিতে না চাহিলে ক্রোধান্ধ কুঠিয়ালেরা গুলি করিয়া খুন, করিত, গ্রামকে গ্রাম উজাড় উৎসন্ন করিয়া নিত। ... নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে এমনও দুর্বত্ত ছিল, যাহার জোর করিয়া কৃষক কন্যাদিগকে ধরিয়া লইয়া কুঠিতে আনিয়া অপমান করিত।" (মিত্র ১৯৬৫, পৃ. ৭৮৩-৭৮৪)

জীবনাভিজ্ঞ ও সমাজমনষ্ক দীনবন্ধু তাঁর জীবনদৃষ্টি দিয়ে সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তাঁর লেখনিতে ধরা দেয় ঔপনিবেশিক সমাজ বাস্তবতা। তৎকালীন যে সমাজকে দীনবন্ধু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেই সমাজ আরো প্রতিভাত হয়ে উঠে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ররূপময় বর্ণনায়: "দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর

দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কদম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে; কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা যাইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের একপাশে শয়ন করিবে উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে। যাইবার সময় হয় জমিদার নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমিদার জমিখানি বাড়িয়া লইবেন। তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস-সপরিবারে উপবাস।” (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৮৭, পৃ. ২৮৮)

‘নীল দর্পণ’ নাটকে কোনো মিথ বা কল্পকাহিনির অনুবাদ নেই, আবার শুধু মাত্র মনোরঞ্জনের নাট্যলীলাও এটি নয়। বরং স্বদেশের জীবন জীবিকা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও সমকালীন অভিঘাতকে ধারণ করা এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সমাজবাস্তবধর্মী প্রতিবাদী নাটক।

নবীনমাধব নীল-দর্পণ নাটকের প্রাণ। ঔপনিবেশিক বঞ্চনা ও সংগ্রামের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নবীনমাধব শুধুই যে ক্রিয়াশীল থেকেছে তা নয়, বরং নীলকরদের সীমাহীন নিষ্ঠুরতাকে মোকাবেলায় নবীনমাধব ছিল সক্রিয়। নীলকরদের তাচ্ছিল্য ও নির্যাতনের শিকার হবার পরেও শিক্ষিত নবীনমাধব স্বদেশবোধ, প্রতিবাদস্পৃহা ও মানবিক বিশিষ্টতাকে সঙ্গী করে পলায়ন নয় বরং শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। সাধুচরণ নবীনমাধবের সাহসিকতা সম্পর্কে বলেছে, “বড় বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিন সাহেব বল্লে, যদি তুমি আমিন খালাসির কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।” তাহাতে বড় বাবু কহিলেন, “আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘা ও নীল করিবনা, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।” (নীল-দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গভাঙ্ক)

এই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উঠে এসেছে উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কোনো ছাড় না দেওয়ার দুঃসাহসী আত্মপ্রত্যয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে গোলক বসুর অসহায়ত্ব প্রকাশ পায় একই সঙ্গে সমস্ত পীড়ন নীরবে মেনে নেওয়া দেখে নবীনমাধব বলে, “আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করি।”(নীল-দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গভাঙ্ক)



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

নবীনের এমন ইচ্ছে সাহস সঞ্চারিত করে স্বরপুরবাসী তথা কৃষককুলে। নবীনমাধব সম্পর্কে দীনবন্ধু গবেষক একেএম খায়রুল আলম মন্তব্য করেন : “এভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অনিবার্যতা এবং নবীনমাধব কর্তৃক নীলকর বিরোধী কিন্তু আইনসিদ্ধ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে গোলোক বসু ও সাধুচরণের বাস্তুভিটাসংলগ্নতার সঙ্গে নবীনমাধবের নীলকরবিরোধী সংকল্প, স্বদেশবোধ এবং জনজীবনসম্পৃক্তি একরে সংঘর্ষিত করে দীনবন্ধু মিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য আরোপ করেছেন।” (আলম, ১৯৯০, পৃ. ৬৯)

সাধুচরণ ও রাইচরণের পরিবারের ওপর অমানবিক অত্যাচারের প্রতিটি পর্বে নবীনমাধব ছিল সহযোদ্ধা। কৃষকের প্রতি তার সমব্যথী মানসিকতা তাকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ও আশা ভরসার কেন্দ্রবিদুতে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কৃষক সমাজে নবীনমাধব হয়ে উঠেছিল নীল বিদ্রোহ নির্যাতিত কৃষককুল, ক্ষেতমজুর ও রাইয়ত শ্রেণির শুদ্ধতম এক প্রতিনিধি। নীলকরদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিত্রাণ নয়, প্রতিরোধ গড়ার সংগ্রাম ছিলো তার মাঝে। গোলোক বসুর বিপক্ষে মিথ্যে সাক্ষ্য দেবার জন্য তোরাপকে বন্দী করা হলেও তোরাপ তার বিবেক বিসর্জন দেয়নি। কেননা নবীনমাধব ইতোমধ্যেই তাদের চিত্তজয় করেছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিপক্ষে সংগ্রাম করে। পারিবারিক বৃত্তের সঙ্গে নবীনমাধবের বহিসম্পৃক্ততা দৃশ্যমান করেছেন দীনবন্ধু বাল্যশিক্ষা বিস্তারে নবীনমাধবের আগ্রহ, অধ্যাপকবৃন্দের প্রশংসা এবং নবীনমাধব ও সৈরন্ধ্রীর দাম্পত্য সুসম্পর্কের ঘটনাবলির বর্ণনার মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শক্তি তৎকালীন সমাজকে কতটা গ্রাস করেছিল তা রোগ সাহেবের হাতে লাঞ্ছিত ক্ষেত্রমণিকে দেখলে অনুমান করা যায়। নিরীহ কামিনীকে ইচ্ছে হওয়া মাত্রই কুঠিতে হাজির করতো নীলকররা। গোলোক বসু যখন কারাগারে আত্মহত্যা করে তখন এই মর্মান্তিক আঘাত বুকে নিয়েও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে অবিচল ছিল নবীনমাধব। স্বদেশের মাথা উঁচু রাখার দাবি থেকেই লড়ে গেছে এই চরিত্র। পিতা গোলোক বসুর মৃত্যু নবীনের পরাজয় হিসেবে ধরা হলে তার বিপরীতে এ পরাজয়কে ঔপনিবেশিক নীলকরদের বিরুদ্ধে স্বদেশী সংগ্রামী কৃষক সমাজের ব্যর্থতা হিসেবে ধরা হয়।

সাধু কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর করুণ ঘটনা এবং সাবিত্রী ও সরলার মৃত্যু প্রকৃত বিচারে মৃত্যুজনিক দুঃখগাথা নয়, কৃষক সমাজের সামগ্রিক অসহায়ত্বের বহিপ্রকাশ। নবীনমাধবের মৃত্যু শেষ পর্যন্ত নীলকরের আঘাতেই হয়। “নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব” (নীল-দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গভাঙ্ক)।

নবীনমাধবের মৃত্যু শোক নয় বরং শোকের মধ্য দিয়েও অবিনাশী শক্তির যে উদ্বোধন ঘটে এ মৃত্যুশোক সেই অক্ষয় শক্তির আধার। নবীনমাধবের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দুশ

রাইয়ত "লাঠি হস্তে ধরিয়া মার মার এবং হা বড় বাবু!" বলে ক্রন্দনের কোরাস তোলে। সে ক্রন্দন কৃষক শ্রেণির সংহতি প্রকাশ শুধু নয়, বরং ভবিষ্যৎ সম্মিলিত যাত্রার পথনির্দেশ বিবেচনা করা যায়।

মাটি আঁকড়ে ধরে রাখার দৃঢ় সংকল্প ও চেতনাবোধ উঠে আসে গোলোক বসুর উক্তিতে, "বাপু দেশ ছেড়ে যাওয়া কি সুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্তারা যে জমিজমা করে গিয়েছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়, যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০-৭০ টাকা বিক্রী হয়। বল কি বাপু। আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেইবা সহজে পারে"? (নীল- দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গভাঙ্ক)।

গোলোক বসুর এই আত্মসমর্পণের চিত্রটি ঔপনিবেশিক আধিপত্য এবং অর্থলালসার সংঘাতে গ্রামবাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভেঙ্গে দেবার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সাহেবদের সাথে বিবাদ করে সম্ভব হবে না এই দর্শনকেই তিনি মেনে গেছেন সংশয়হীন দৃঢ়তা দেখিয়ে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতি তার অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। গোলোক বসুর জীবননাশ এর মাধ্যমে মূলত সর্বনাশা নীলকরদের আগ্রাসনের চিত্র প্রকাশ পায়।

এই নাটকে উঠে এসেছে ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে অর্থলোভী আগ্রাসনও। বিন্দুমাধবের মতো তরুণদের ইংরেজ সুলভ জীবন যাপনের দিকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা। গোলোক বসুর মামলায় বিন্দুমাধবকে শিক্ষিত লোকের অলংকার শাসিত কৃত্রিম উচ্চারণ করতে দেখা যায়—যেখানে পিতার জন্য সন্তানের বিপর্যস্ত সময়ের হাহাকার ফুটে উঠেনি। মাতা সাবিত্রী। স্ত্রী সরলতা ও পিতৃস্থানীয় অগ্রজ নবীনমাধবকে হারিয়ে যে বেদনাসিক্ত রোদন ও আত্মবিলাপে জর্জরিত হয়ে নাটকের ট্র্যাজেডিকে ধারণ করার কথা তাও পরিলক্ষিত হয়নি বিন্দুমাধব চরিত্রে। এই চরিত্রের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সমাজবাস্তবতার পাশচাত্যশিক্ষা সম্প্রীতির দিকটি নাট্যকার স্পষ্ট করেছেন।

তোরাপ দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। এই কৃষকের প্রাণশক্তির উচ্ছলতা, অবিচল কৃতজ্ঞতা, হিন্দু মণিবের প্রতি আনুগত্য বোধ, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এবং ধর্ম প্রাণতার পরিচয় চরিত্রটিকে অনন্য মহিমায় নিয়ে গেছে। শেষবার তাকে দেখা যায় উড সাহেবের লাঠির আঘাতে সংজ্ঞাহীন নবীনমাধবের গৃহাঙ্গনে। "শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্যন্ত বুনন" বন্ধের অনুরোধ করেও যখন নবীন অপমানিত হয়ে সাহেবের বক্ষস্থলে





পদাঘাত করলে উড সাহেবের লাঠির আঘাতে অচৈতন্য, তোরাপ তখন "একগুয়ে মহিষের মত" সমস্ত বাধা অতিক্রম করে নবীনকে কোলে নিয়ে বড় সাহেবের নাক কামড়ে পালিয়ে ছিল।

তোরাপের নাট্য সংলাপে গ্রামবাংলার অশিক্ষিত ধর্ম বিশ্বাসী, সরল কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এক বলিষ্ঠ ব্যক্তির দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। তোরাপের মাধ্যমে নাট্যকার পল্লী বাংলার বিশ্বস্ত মানুষদের জয়গান গেয়েছেন। বাংলার ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আদর্শ গৃহবধু রূপে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তিনটি নারী চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতার মাধ্যমে। ছোট সাহেবের নির্দেশে পদীময়বাণীর ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বিচলিত সাবিত্রীর মনে করে

"ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে হবে"।

কেননা সাবিত্রী মনে করে ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যতীত এ সংসারে বিপদমুক্তির কোনও পথ নেই। আবার ক্ষেত্রমণি অপহরণের সংবাদে কর্তব্যবোধের প্রেরণায় সাবিত্রী তার পুত্র নবীন মাধবকে বলেছেন, "যদি নীল বানরের হাত থেকে "পবিত্র মাণিক্য" অপবিত্র না হতেই আনতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করেছি জানব।"

সৈরিন্ধ্রীর মধ্যে শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সেবা, গভীর ভালবাসা, দেবর ও জা-র প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ তাঁর চরিত্রকে বিশিষ্ট করেছে। নবীনমাধব গোলোক বসুর মামলা পরিচালনার জন্য সে সময় অর্থ চিন্তায় বিব্রত, ঠিক তখন পতিব্রতা বধু সৈরিন্ধ্রী তাঁর সমস্ত অলঙ্কার স্বামীর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য, কর্তব্যজ্ঞান ও যথার্থ সাংসারিক জ্ঞানের পরিচালক।

সরলতা বসু পরিবারের ছোট বৌ। রক্ত কমলের মত তার রং, পদ্মফুলের মতো মুখ, সর্বদাই হাস্যবদন। পড়ালেখা জানা মেয়ে সরলতা প্রাণরসে উচ্ছ্বল। মুখে কথার খৈ ফোটে, হাসিতে বয় ঝর্ণা। নবীনের মৃত্যু ম্লানমুখী ও বিষণ্ন করে দেয় সরলতাকে। সরলতার মর্মান্তিক মৃত্যু পাঠক দর্শককে বেদনাতুর করে তোলে। "নীল-দর্পণ" নাটকে ক্ষেত্রমণি চরিত্রটির দ্বারা নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য মূলক নাটকের কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিয়েছেন। কৃষক ঘরের যুবতী বৌ ঝিদের প্রতি সাহেবদের লোভ ও আচরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্ষেত্রমণির চরিত্র পরিকল্পনা। ধর্মবোধ ও সতীত্ব চেতনাবোধে জাগ্রত নারী ক্ষেত্রমণি প্রাণপণ লড়েছে সতীত্বরক্ষার জন্য। ক্ষেত্রমণির জীবনদানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কৃষক জীবন ও পরিবারের ট্র্যাজেডি বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি নীল-দর্পণের মূল প্রতিপাদ্য নীলকরদের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন উন্মোচিত হয়েছে।

নিষ্ঠুর নীলকর রোগ সাহেব তার রিরংসা চরিতার্থ করার জন্য ক্ষেত্রমণিকে টার্গেট করে। ঘৃণ্যজীব রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির হাত ধরে টানতে শুরু করলে ধর্ম ও মানবীয়

সম্পর্কের দোহাই দেয়। কিন্তু ছেড়ে দেবার মতো প্রাণধর্ম রোগ সাহেবের নেই, ক্ষেত্রমণি তার শক্তির সীমাবদ্ধতা স্মরণ করে। তাকে মেরে ফেলার অনুরোধ করে তবুও তার সতীত্বনাশ না করতে বলে। নীলকর রোগ ক্ষেত্রমণির পেটে প্রবল মুষ্টি আঘাতে তাকে কাবু করতে চায়, কিন্তু রোগের আঘাতে ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত ঘটে; শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্রমণি প্রাণত্যাগ করে। ক্ষেত্রমণির এই মৃত্যু নীলকর অত্যাচার তথা ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে যে অত্যাচার চালানো হত তার ঘৃণ্যতম উদাহরণ। ইংরেজ নীলকরদের সামগ্রিক নিপীড়নের স্বরূপ উন্মোচনে এই মৃত্যু সমকালকে প্রতিভাত করে। নাটকে আদুরী চরিত্রটির ও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দাসী হলে বসুপরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। আদুরী বসুপরিবারের বিপর্যয়ে খুবই ব্যথিত হয়ে পড়ে। সাবিত্রীর উন্মাদ অবস্থায়, নবীনমাধবের মৃতদেহ দেখে একেবারে নির্বাক—শোকস্তব্ধ হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক যুগযন্ত্রণার শিকার বিপন্ন মানুষের দলে আদুরি নিজেকে জড়িয়ে নীলদর্পণের ট্র্যাজিক বাস্তবতাকে দেয় উচ্চতর মহিমা।

নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের ইতিহাসকে ধারণ করে দীনবন্ধু মিত্রের অনন্য সাহিত্যকীর্তি 'নীল-দর্পণ' নাটক। ঔপনিবেশিক বাংলার গণমানুষের শোষিত ও লাঞ্ছিত হবার ইতিহাসকে ধারণ করে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠির বাস্তব সমাজদর্পণ হয়ে উঠেছিল এ নাটক। এ সাহিত্যকর্মে দীনবন্ধু তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা থেকে ঔপনিবেশিক ভারত-বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও ব্রিটিশ শাসনের নিখুঁত চালচিত্র তুলে এনেছেন এবং সময়ের যে দাবী থাকে তা পূরণ করেছেন নিপুণভাবে। সমকালকে নাট্যরূপ দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন ষোল আনা।

**জমীদার দর্পণ :**

'নীল দর্পন' নাটকে প্রকাশের পর দর্পণ নামান্বিত অনেক নাটক লেখা এবং প্রকাশিতও হয়। অজ্ঞাতনামা জনৈক লিখিত 'দর্পণ' (১৮৭১), প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লী দর্পণ' (১৮৭৩), যোগেশ চন্দ্র ঘোষের 'কেরানী দর্পণ' (১৮৭৪), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫) এবং মীর মশাররফ রচিত তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে নিয়ে নাটক 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩)।

'জমীদার দর্পণ' নাটকটি জমিদার শ্রেণির শোষণ ও নির্যাতনের স্বরূপ উন্মোচনে নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ এক সত্য ঘটনার ভিত্তিতে মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেন। নাটকের সূত্রধরের বক্তব্যে এই সত্য ঘটনার ইঙ্গিত আমরা পাই। এই নাটকে ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কালের মানুষের মুখোশ উন্মোচন করাই ছিল নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। জমিদার শ্রেণির মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া লাম্পট্য, কৃষকদের নিপীড়িত হওয়ার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ফলে বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতি এবং



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

অত্যাচার অবিচার এর হাত থেকে পরিত্রাণে কৃষকদের ব্যর্থ হবার বাস্তবছবি এই নাটক।

দীনবন্ধুর নীল-দর্পণ লিখে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং এর প্রভাবে তৎকালীন সমাজে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল ঠিক তেমনি মীর মশাররফের 'জমীদার দর্পণে'র মাধ্যমে বৃটিশ সরকার সচেতনভাবে জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করে প্রজা পালনের জন্যে যে দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করেছিল তা যে জমিদারেরা সঠিক মত পালন না করে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অমানব হয়ে উঠেছিল তার নিখুঁত চিত্র দেখিয়েছেন।

নাট্যকার ছিলেন জমিদার বংশের সন্তান। জীবিকাসূত্রে ছিলেন জমিদারী এস্টেটের কর্মাধ্যক্ষ। তিনি বলছেন, "জমিদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমিদার, সুতরাং জমিদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করেনা" (উদ্বৃত মান্নান, ১৯৭৬ : ১৯১)। নাটকের প্রস্তাবনার অংশে সূত্রধারের বক্তব্যে তৎকালীন জমিদারের বাস্তবচিত্রটি ধরা পড়ে :

তোমার ধর্ম লুকালো ভারতে
জমীদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে !
রাজ প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্তী সম,
জমীদার রাজরূপে পালক প্রজার
সর্বত্র নর ধনপ্রাণমান রক্ষাকারী।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী। (জমীদার দর্পণ: প্রস্তাবনা)

উপনিবেশকালীন জমিদার শ্রেণির স্বরূপ বুঝতে পারা যায় জমীদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে'— সূত্রধারের এই উক্তির মধ্য দিয়ে। আবার "সর্ব নর ধনপ্রাণমান রক্ষাকারী" হবার কথা থাকলেও তা না হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারাই হয়ে উঠলো জানোয়ার। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলো, 'জমীদার দর্পণ' নাটকে নাটককার তৎকালীন সমাজের প্রতি সচেতন থেকে একটি বিষয় খুব দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। বিষয়টি হলো সে সময় পূর্ব বাংলায় অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু গোত্রীয় এবং বেশির ভাগ কৃষক ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। যার ফলে প্রায়ই জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রেণি সংগ্রাম একটি অস্বাভাবিক সাম্প্রদায়িক বিগ্রহে পরিণত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্ভাব্য বিগ্রহ যেন এ নাটকের মাধ্যমে ছড়িয়ে যেতে না পারে তার জন্যেই মীর মশাররফ হোসেন এই নাটকে জমিদার ও কৃষক উভয়কেই চিত্রিত করেছেন মুসলমান চরিত্র হিসেবে।

নাটকে বিধৃত বিষয় কাহিনী সে সময়কার সমাজের বাস্তবচিত্র এবং এই কাহিনী যে সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বলা হয়েছে: "যাঁহারা কলিকাতা অথবা তাহার সন্নিকটে বাস করেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন গল্পটি অতুক্তি দোষে দূষিত। কিন্তু

আমরা তাহা মনে করিনা, আমরা দূর মফস্বলে কোন কোন জমীদারের চরিত্র বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি, তাহাতে আমাদের কোন রূপেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না যে গল্পটাতে অতুক্তি দোষের গল্প আছে।

গ্রন্থকার দূর মফস্বলে বাস করিয়া থাকেন, অতএব মফস্বলের জমীদারেরা যে সকল কাণ্ড করেন, তাহা তাঁহার অবিদিত নয়, হয়ত এরূপ ঘটনা হইয়াছে। তাঁহার অন্যতম জাতি যে অত্যাচার করিয়াছেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, গল্পটির সামান্যভাবই তাঁর রূঢ় বর্ণনায় যথার্থ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদিগের স্পষ্টবোধ হইতেছে, গ্রন্থকারের যদি কিছু মিথ্যা যোগ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তিনি নানা প্রকার অলঙ্কার দিয়া গল্পটিকে সুশোভিত করিয়া তুলিতেন" (সোমপ্রকাশ, ১৮৯৩, পৃ. ৪২৩-৪২৪)।

নাট্যকার তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে স্বয়ং বলেছেন, "জমীদার দর্পণ হাতে লিখিয়া আমার বাড়ীতে কুমারখালীতে কয়েকবার অভিনয় করা হয়। শেষ অভিনয়-দিনে আনার মোল্লাকে (এই মোল্লার স্ত্রীই জমিদারের অত্যাচারের প্রাণ হারাইয়াছিল-পদটীকা) উপস্থিত করিয়া দর্শকগণকে দেখান ইয়াছিল। সত্য ঘটনা মূলক নাটক অভিনয় সময় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই জীবিত" (উদ্ধৃত, আহসান, ১৯৯৬: ১২৭)।

সাহিত্য মানবজীবনের দর্পণ যার সত্যতা আমরা খুঁজে পাই 'জমীদার দর্পণে'। সেখানে জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্য হয়ে উঠেছে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

নীল-দর্পণে নীলকর রোগ সাহেব আর জমীদার দর্পণে হায়ওয়ান আলীতে তফাত নেই। কাম বাস্তবায়নে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে কুঠিতে আনয়ন করে আর হায়ওয়ান আলী নূরুন্নেহারকে ধরে আনে। অন্তঃসত্ত্বা ছিল ক্ষেত্রমণি, নুরুন্নেহারও তাই। নীল-দর্পণে ছিলো পদীময়রাণী আর জমীদার দর্পণে কৃষ্ণমণি। ক্ষেত্রমণির পিতা কৃষক, নূরন্নেহারের স্বামীও কৃষক। ক্ষেত্রমণিও প্রাণ হারায়, নূরন্নেহারও খুন হয়। মৌলিক পার্থক্যের দিক থেকে আলোচনা করলে 'নীল-দর্পণ' নাটকে বিদেশী অত্যাচারী নীলকরদের সমালোচনা ও নিপীড়ন তুলে ধরা হয়েছে আর স্বদেশী পাপাচারী জমিদারের কু-শাসন ও নির্মম অত্যাচার স্থান পেয়েছে 'জমীদার দর্পণে'।

'জমীদার দর্পণ' নাটকের সক্রিয় চরিত্রগুলো হলো হায়ওয়ান আলী, নূরুন্নেহার ও আবু মোল্লা। প্রত্যেকটি চরিত্রই ছকে বাঁধা। জমিদার, ঋণী এবং প্রতিপত্তিশালী তার মূলত অসৎ ও পাষন্ড। অমানবিকতা, নির্দয়তা এবং অত্যাচারই তাদের অহংকার। যার থেকে রেহাই নেই দরিদ্র কৃষকদের, তারা নিপীড়িত ও নিগৃহীত। নাটকে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না, দেখা যায় না তাদের কোন প্রতিবাদ।

নাট্যকার হায়ওয়ান আলীর চরিত্রটিকে "জানোয়ার" হিসেবেই দেখিয়েছেন। হায়ওয়ান



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

আলী চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার তৎকালীন জমিদার শ্রেণির নারীলোলুপ মানসিকতা পরিষ্কার করেছেন।

হায়

প্র. মোসা

: টাকার লোভ দেখিয়েছি। কত গয়নার লোভ দেখিয়েছি কিছুতেই ভুলে না।

: ওর স্বামীওতো এমন সুশ্রী পুরুষ নয় যে তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায়

: না। তাই বা কি করে। আবু মোল্লা নব কার্তিক। বিধির নির্বন্ধু দেখ, "চাষার হাতে গোলাপ ফুল", এ কি প্রাণে সয়? "হায় বিধি"! পাকা আম দাঁড় কাকে খায় (জমীদার দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাস্ক)।

দরিদ্র চাষীর নিকট সুন্দরী যুবতী অর্থাৎ চাষার হাতে গোলাপ ফুল হায়ওয়ান আলীর কাছে অসহনীয়। নাটকে হায়ওয়াল আলী বলে, "নামাজের সময় হয়েছে, চল, নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আনুক" (জমীদার দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

ভন্ড হায়ওয়ান আলী আবু মোল্লাকে ধরে আনার মাধ্যমে নূরন্নেহারের শরীর প্রার্থনা করে অন্যদিকে নামাজও পড়ে। ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাসকে পুঁজি করে হায়ওয়ান তার পাপাচার পূর্ণ জীবনকে আড়াল করতে পারে না।

নাটকটিতে সিরাজ আলীর একটি উক্তি রয়েছে যার মাধ্যমে তৎকালীন জমিদার শ্রেণির বংশ পরম্পরাগত নৃশংসতার প্রমাণ উঠে এসেছে।

সিরাজ : "হায়। এখন কি হবে? উপায়? বাঁচবার উপায় কি? এখন কি আর সেদিন আছে? এই হাতে কতকাণ্ড করেছি; কতজনের অকর্ম করেছি, সাবেক কাল হোলে আর এত ভাবতে হতো না। পাজিরাও শোনেও নাই? আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন। আর আমরাও কত কি করেছি; এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবি নে (জমীদার দর্পণ : দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভান্ত)।

ঔপনিবেশিক কালের জমিদার শ্রেণির নিমর্মতার ছবি আঁকতে গিয়ে মীর মশাররফ আশু ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। নাটকের উপহার পত্রে তিনি লিখেছেন, "একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন" (জমীদার দর্পণ: উপহার পত্র)।

অর্থবিত্ত যে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে সে সমাজ অসুস্থ। ফলে সে সময়টি লেখকের পক্ষে প্রতিবাদ করার অনুকূলে না থাকায় তৎকালীন সমাজের চিত্রকেই তিনি তুলে ধরেছেন মাত্র—কোনো প্রতিরোধ এর গল্প এখানে নেই।

অর্থের কাছে নত হওয়া চার বার হজ করা জীতু মোল্লার আদালতে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়া, হরিদাস বৈরাগীর কৌপীন পরে হরিবোল জপতে জপতে হায়ওয়ান আলীর পক্ষে সাফাই গাওয়া, ডাক্তার কানিংহাম এবং বিচারক নিজেও যখন আবু মোল্লার বিপক্ষে অবস্থান নেয় এসব কিছুর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের যে বিচারব্যবস্থা অন্তঃসারশূন্য ও প্রহসন ছিলো তা মীর মশাররফ হোসেন স্পষ্ট করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।

নাটকে নরুন্নেহার জমিদার কর্তৃক মারা যায়, কিন্তু এর কোনো প্রতিকার প্রতিরোধ দেখতে পাওয়া যায় না। নূরুন্নেহারের মৃত্যু বাস্তব সত্য ঘটনারই ছবি হয়ে থেকে যায়। আবার যুক্তি বিচারে যদি আলোচনায় আসি তাহলে বলা হয়ে থাকে সমাজের বাস্তব ঘটনার উপস্থাপন তো শিল্প সাহিত্যের সর্ব দাবি পূরণ করতে অক্ষম। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'জমীদার দর্পণ' নাটকে যে সমাজবাস্তবতা তুলে ধরেছেন তা অসত্য নয়, অসম্পূর্ণ। উপনিবেশকালের ইংরেজসৃষ্ট জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণির বিজয়কে তিনি অতি সাবধানে দূরে ঠেলে রেখেছেন। নাট্যকার তাঁর নাটকে দেখাচ্ছেন কৃষক শ্রেণি তাদের দুঃখ মোচনের জন্য মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে আবেদন নিবেদন প্রকাশ করছে জীবনরক্ষার জন্য। কিন্তু প্রকৃত সমাজবাস্তবতা হলো কৃষক শ্রেণি জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজগঞ্জের ঐতিহাসিক কৃষকবিদ্রোহের সমকালে রচিত 'জমীদার দর্পণে' কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে, নূরুন্নেহারের মৃত্যু, আবু মোল্লার গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া, প্রজাদুঃখ যার বিপরীতে জমিদারী সুখবিলাস নয়, বরং জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তথা সমগ্র শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের আন্দোলন সংগ্রামের আশা করা এই নাটকে দোষের কিছু ছিল না; যা সাহিত্যিক বিচারে এই নাটকের দুর্বলতা। এ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরী মন্তব্য করেছেন:

জমীদার দর্পণ আগাগোড়া ধ্বণাত্বক ও ক্লেদাক্ত মানুষরূপী জীবজন্তর আচরণে পরিপূর্ণ। প্রথম অঙ্কে ধর্ষণের পরিকল্পনা, দ্বিতীয় অঙ্কে ধর্ষণের অনুষ্ঠান, তৃতীয় অঙ্কে অনুষ্ঠিত কর্মের পুনরালোচনা—এই হলো "জমীদার দর্পণে বিম্বিত জীবনের সরলতম সার। এর বিরুদ্ধে দুর্বল আবু মোল্লা ও দুর্বলতর নূরুন্নেহারের প্রতিবাদ এবং প্রস্তাবনা ও উপসংহারের নট-নটীর হিতোপদেশ সমাজ শক্তির প্রচ্ছন্ন আবাহনকে আদৌ ইঙ্গিতময় করে তুলতে পারেনি। এই দর্পণে এক বিশেষ প্রকৃতির বর্বরোচিত অত্যাচারের কদর্যতা হয়ত অবিকল প্রতিবর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার শিল্পসঙ্গত রূপান্তর সাধিত হয়নি"। (চৌধুরী, ১৯৭৪, পৃ. ৪৩)।

'জমীদার দর্পণ' নাটকটি সাহিত্য সংস্কৃতির কেন্দ্র শহর কলকাতায় সমকালে মঞ্চস্থ না হবার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে—একটি হলো নাটকটির দৈন্য-দুর্বলতা, দ্বিতীয়টি হলো





ইংরেজ রোষানল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। সাহসের অভাবহেতু যদি মীর মশাররফ হোসেন এ নাটকে কৃষক বিদ্রোহ এড়িয়ে যেয়ে থাকেন তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রও একই দুর্বলতা থেকে এ নাটকের প্রচার ও বিতরণ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম স্বয়ং লিখেছেন:

"এই দর্পণে জমিদারের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহা বিকৃত কি প্রকৃত সে বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহিনা। এ তাহার সময় নহে। বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এইপত্র প্রজার হিতৈষী এবং প্রজার হিত কামনা আমরা কখনো ত্যাগ করিবনা। কিন্তু আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য" (বঙ্গদর্শন, ১২৮০, ২৩৭ )।

এক্ষেত্রে বঙ্কিম ও মশাররফ হোসেন কৌশলগত নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে একই জায়গা থেকে তাঁরা দেশপ্রেমিক। কিন্তু রাজাভক্ত, এ বিষয়টা পরিস্কার। পরবর্তীতে মীর মশাররফ হোসেন নিজ উদ্যোগে তাঁর নিজ বাড়ি কুমারখালীতে 'জমীদার দর্পণ' নাটক মঞ্চস্থ করিয়েছেন যা থেকে তাঁর সাংস্কৃতিক চিন্তাচেতনা পরিষ্কার হয়। কলকাতার রাজনৈতিক আরও অন্যান্য নানা কারণে নাটকটি শুরুর দিকে মঞ্চায়ন না হলেও ১৯৭৩ সালে নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতায় এবং ১৯৮৩ সালে ঢাকায় নিয়মিত মঞ্চায়নের ঘটনা অবশ্যই জমীদার দর্পণের স্বকীয় শক্তি সম্পর্কে জানান দিতে সমর্থ হয়।

বাঙালির মনে ছাপ রেখে যাওয়া দার্শনিক নাট্যধারার যত দর্পণ-নাটক তার মধ্যে 'নীল-দর্পণ' ও 'জমীদার দর্পণ' অতুলনীয়। 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি সময়ের দাবী পূরণ করে এখনো অত্যন্ত শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে বাঙালীর নাট্যচর্চাতে। সমকালীন ঔপনিবেশিক সমাজচিত্রের ছবি এবং ইংরেজ শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জমিদারচক্রের যে অসহনীয় দুঃশাসন, অত্যাচার ও নিপীড়ন চলেছিলো তা প্রত্যক্ষ করার জন্য আজও আমাদের ফিরে তাকাতে হয় জমীদার দর্পণ নাটকের দিকে। 'জমীদার দর্পণ' নাটকটিতে অত্যাচারীর বিপক্ষে বিপ্লব বিদ্রোহ করতে দেখা না গেলেও অত্যাচারীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই ছিলো নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য এবং যা তৎকালীন সময়ে কোন ছোট যুদ্ধ নয়; বরং সে যুদ্ধে মীর মশাররফ হোসেন জয়লাভ করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্বরূপ করা যায়:

"বর্তমানের খেয়া পার হয়ে ভাবীকালের তীরে মীর সাহেব পৌঁছুতে সমর্থ হন, তাহলে রচনার বহুলতা দিয়ে পারবে না। মাত্র "জমীদার দর্পণ" ও "বিষাদ সিন্ধু"র জোরেই পারবেন। যার একটিতে জীবনের স্বীকৃতি রয়েছে অন্যটিতে রয়েছে লিপিকুশলতা। এই দুটি জড়িয়েই তিনি পূর্ণাঙ্গ এবং ঐ পরিচয়েই সে যুগের মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক" (খান, ১৩৭২, পৃ. ১৪)।

**তথ্যসূত্র :**


১। আলম, একে এম খায়রুল, ১৯৯০, দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। খান, আজহার উদ্দীন, ১৩৭২, বিলুপ্ত হৃদয়, কলিকাতা।

৩। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৮৭, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৭ম মুদ্রণ, কলিকাতা সাহিত্য সংসদ।

৪। চৌধুরী, ড. আবুল আহসান, ১৯৯৬, মীর মশাররফ হোসেন নাট্য সমগ্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫। চৌধুরী, মুনীর, ১৯৭৪, মীর-মানস, ৩য় মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

৬। দত্ত, অজিত, ১৯৬০, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, ১ম সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৬১, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা। কলিকাতা।

৮। মিত্র, সতীশচন্দ্র, ১৯৬৫, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

৯। মিত্র, দীনবন্ধু, “নীল দর্পণ ১৮৬০”।

১০। মান্নান, কাজী আবদুল, ১৯৭৬ (সম্পাদিত), মশাররফ রচনা-সম্ভাব, ১ম খণ্ড, ঢাকা।

১১। হোসেন, মীর মশাররফ, “জমীদার দর্পণ” ১৮৭৩।




# ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘আলমগীর’ ও নটরাজ শিশিরকুমার

**বিবেকানন্দ পাল**

কলেজে যিনি রসায়নের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মঞ্চে তিনিই নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। নাট্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তিনি মূলত কবি। কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তার রচিত কবিতা সাময়িক পত্রিকায় বেরোত। তার লেখা কয়েকখানি নাটক কেবলমাত্র নাটকই নয়, নাট্যকাব্য। আলিবাবা রঙ্গনাট্যের স্রষ্টা রূপে বিশেষ পরিচিতি থাকলেও তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত আলমগীর প্রমুখ জটিল চরিত্র গুলির উপর তিনি নতুন আলোকপাত করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যে নাটকে চিন্তার খোরাক নেই, সে নাটক রস সৃষ্টির অনুকূল নয়। সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও মনস্তত্ত্বমূলক নাটকের তিনিই পথিকৃৎ। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জীবন কাহিনকে সুস্থ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

নাটক লেখার সবচেয়ে বড় গুণ অলংকার শাস্ত্রে আছে ‘আত্মগোপন’। নাট্যকার নিজেকে সব সময় যদি প্রচ্ছন্ন রাখতে না পারেন তো সব মাটি হয়ে যায়। বড় বড় নাটক পড়ে কি কালিদাস কি শেক্সপিয়র তাদের কোন পরিচয় নাটকে মেলে না। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোহিনুর থিয়েটারের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার কথাতেই সম্ভবত ক্ষীরোদপ্রসাদ অধ্যাপনার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্টারের পাকা নাটককারের চাকরি গ্রহণ করেন। মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে তিনি বৈতনিক নাট্যকার রূপে যোগ দেন। তখনকার দিনে রঙ্গালয়ে কর্মরত কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ করে নাট্যকারের কপালে এমন উচ্চহারে বেতন মেলেনি। এমনও দেখা গেছে তার নাটক যুগপৎ দুটি রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের পর ক্ষীরোদপ্রসাদই একমাত্র নাট্যকার যার প্রতিভার আলোয় বাংলা রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও নাট্য প্রয়োগকর্তা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর এক আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছেন এবং কখনো কখনো শিশিরকুমার লিখিয়েছেন। এই দুই প্রতিভার ছোঁয়ায় কয়েকটি ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের কীর্তির বিজয়ী বৈজয়ন্তি হল ‘আলমগীর’। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অসাধারণ অভিনয় আজও বঙ্গবাসীর হৃদয় কন্দরে গেঁথে আছে। এর আগে ঔরঙ্গজেবের দ্বন্দ্বময় চরিত্র নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন ‘দুর্গাদাস’ এবং ‘সাজাহান’ নাটক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘রাজসিংহ’ উপন্যাস। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তার পূর্ববর্তী এই রচনা সম্বন্ধে অবগত হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। ইতিহাসের কঙ্কালে ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বদেশানুরাগকে সার্থকভাবে সংযোজিত করতে পেরেছিলেন একমাত্র আলমগীর নাটকে। আলমগীর শব্দের অর্থ বিশ্বজয়ী। ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেছিলেন আলমগীর (বিশ্বজয়ী) বাদশাহ (সম্রাট) গাজী (ধর্মযোদ্ধা) উপাধি নিয়ে। তিনি নিজেকে বলতেন জিন্দাপীর অর্থাৎ আওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নি

মুসলমান এবং শরীয়ত বিধান অনুসারে তিনি অতি সংযমী ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন বলে তাকে জিন্দাপীর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ জীবনের শেষ পর্বে এসে এই কালজয়ী ঐতিহাসিক নাটকটি রচনা করেন তিন মাসের প্রচেষ্টায় বাগবাজার দুর্গাচরণ স্ট্রিটে থাকাকালীন। নাটকটি প্রথম অবস্থায় থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেন তখন নাম ছিল 'ভীমসিংহ'। অমনোনীত হওয়ায় নাট্যকার সিদ্ধান্ত নেন এটি যাত্রা দলে বিক্রি করার। পরবর্তী সময়ে তিনি ভেবেছিলেন এই নাটকের নাম রাখবেন 'উদিপুরী' কারণ নাটকে ঔরঙ্গজেবের পাশে 'উদিপুরী' বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই নামকরণে বিশেষ আপত্তি ছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর। অবশেষে শিশির কুমার নাটকটির নাম রাখলেন 'আলমগীর', ক্ষীরোদপ্রসাদ তাতে সহমত দিলেন। কারণ বর্ষীয়ান এই নাট্যকার তরুণ শিশিরকুমারের সাথে অনেকবারই পরামর্শ করেছেন কেমনভাবে লেখা যায় ঔরঙ্গজেব চরিত্র। শিশিরকুমার কে বেশ সমীহ করতেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। নাটকটি উৎসর্গ করা হয় শ্রীমান মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীকে। প্রথম অভিনয়ের (১৯২১এর ১০ই ডিসেম্বর কর্নওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে) সপ্তাহখানেক আগে সারা কলকাতা শহর জুড়ে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত আলমগীরের চিত্র খচিত পোস্টার দেখা গেল। এত বড় পোস্টার এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। নতুন প্রতিভার খোঁজে প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ম্যাডান কোম্পানির পেশাদার অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। নাটক অভিনয়ের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল এই রূপ :

কর্নওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে
বেঙ্গলি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির নাট্য নিবেদন
পন্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ বিরচিত
নতুন ঐতিহাসিক নাটক
আলমগীর
নাম ভূমিকায় শ্রী শিশির কুমার ভাদুড়ি এম.এ.

বিজ্ঞাপনটি শিক্ষিত সমাজ নাট্যরসিক মহলে সেদিন আলোড়ন তুলেছিল। ম্যাডান কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রধান নাট্যকার রূপে স্বীকৃতি পেল। 'আলমগীর' নাটকটি শিশির কুমারের অভিনয় জীবনের কীর্তিস্তম্ভ হয়ে রইল। শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে, তিনটি বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে অন্যতম শিশির ভাদুড়ীর বাদশা আলমগীর রূপে আত্মপ্রকাশ। 'তিনটি বিস্ময়কর আবির্ভাব দেখেছি। একটি আকাশে, একটি জীবনে আর একটি স্টেজে। আলমগীর নাটকের ফার্স শো তে ঘটলো এক বিস্ময়কর ব্যাপার সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হলেন। ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারতবর্ষ আশায় ভারতবর্ষ নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। শহর কলকাতা রাজনৈতিকভাবে উত্তাল হল। গুরুর



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

সঙ্গেই গ্রেফতার হলেন শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু, বীরেন শাসমল, অম্বিকা প্রসাদ বাজপেয়ী, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা। সেদিন সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের দু'ধারে একটি গ্যাসবাতিও জ্বললো না। তবুও দর্শকরা আলমগীর দেখার জন্য ভিড় জমালো। শিশির কুমারের অভিনয় লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো। আলমগীর দেখতে এলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গগন ঠাকুর, সুগায়ক ও লেখক দিলীপ কুমার রায়, ভারতী গোষ্ঠীর লেখকরা এবং সবুজ পত্র পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। অভিনয়ের এই সুখ্যাতি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আলমগীর নাট্যাভিনয় ও শিশির কুমারের অভিনয় সম্বন্ধে স্বয়ং শম্ভু মিত্র মন্তব্য করেছিলেন, "ছাপার অক্ষরে যা একান্ত নির্জীব তা হঠাৎ রোদ্দুরের আলোর মতন ঝলমল করে ওঠে তার ভাষণে। নাটকটি যখন আমি প্রথম পড়ি এবং ভাদুড়ি মশাই কিভাবে সেটাকে মঞ্চোপযোগী করার জন্য কেটেছেন ও সাজিয়েছেন সেটা দেখি তখন যে কি পরিমাণে মুগ্ধ হয়েছিলাম তা বলা যায় না। এবং আমার বিশ্বাস আজও যদি কেউ দেখেন তো তিনিও মুগ্ধ হবেন।"

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য জীবনের প্রারম্ভে গিরিশচন্দ্র, সায়াহ্নে শিশির কুমার। শিশির কুমার তার অভিনয় ভঙ্গিমায় কাব্য ও অবচেতন মন কে যেভাবে মিশিয়ে দিতেন তা বাংলা মঞ্চে এর আগে কখনো দেখা যায়নি। বাংলা মঞ্চে নতুন সময়ের নতুন উচ্চারণ শিশিরের কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আলমগীর রূপী শিশির কুমার যখন মঞ্চে প্রবেশ করে পিছনে হাত দুটি রেখে ক্ষিপ্রপদে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদচারণা করতে করতে বলতেন, 'আমার রূপও নেই - যৌবনও নেই। কিন্তু আছে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন তক্তাউস, আর তার চারপাশ ঘেরে আসমুদ্র হিন্দুস্থান ! এ যার আছে, তার রূপও আছে, যৌবনও আছে।' তখন দিল্লির প্রাসাদের অভ্যন্তরে মহাকুট কৌশলী অথচ সহৃদয় সম্রাট আলমগীর যেন প্রত্যক্ষ দর্শকদের চোখের সামনে আবির্ভূত হতেন। শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে কুসুমকুমারী তার চিরাচরিত থিয়েটারী সুর ভুলে শিশিরকুমারের সুরে সুর মেশাতে পেরেছিলেন, অভিনয়ও হয়েছিল অসাধারণ। আলমগীর দৃশ্যশয্যা, বেশভূষা অপরূপ হয়েছিল। শিশিরকুমারের অভিনয় এমন জীবন্ত জাগ্রত যা দর্শক চিওকে সহজেই জয় করে নিয়েছিল। তিনি সহজেই অচল নাট্যাভিনয়কে চলমান ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রানিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন, "আলমগীর কুটকৌশলী আত্মগোপন-দক্ষ মোঘল সম্রাটের এক অপূর্ব প্রতিকৃতি। তাহার লৌহবর্মের পিছনে যে আবেগস্পন্দিত কোমল রক্তমাংসে গড়া হৃদয় নিঃসঙ্গতার ছদ্মবেশের মধ্যে সহানুভূতির কাঙাল প্রকৃতি লুকানো ছিল-তাহা কোন ঐতিহাসিক আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার ক্ষীণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু নটশ্রেষ্ঠ শিশির কুমারই ইহাকে পরিপূর্ণ সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিয়াছেন।"

নাটকে অন্যত্র যখন ঔরঙ্গজেব বলছেন, "ভালবাসি একমাত্র ধর্ম। ফকিরী নিতে গিয়ে

সেই ধর্মরই জন্য আমি বাদশাহী নিয়েছি। ধর্মর গায়ে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই অমন প্রজারঞ্জন পিতাকে সিংহাসনচ্যুত হতে হয়েছে।" শিশির কুমারের অভিনয়ে বাংলা মঞ্চ যেন এই প্রথম 'স্ট্রিম অফ কনসাসনেস' প্রত্যক্ষ করলো। প্রসঙ্গতঃ সাজাহান নাটকের ঔরঙ্গজেবের সেই ভয়ংকর সিনটা মনে পড়ে যায় যখন সবাইকে খুন করে ঔরঙ্গজেব সিংহাসন পেয়েছেন তখন একদিন মাঝরাতে ঔরঙ্গজেব একা ভাবছেন, 'যা করেছি ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হত। উ: কী অন্ধকার ! কে দায়ী ? আমি। এ বিচার ! ও কি শব্দ?' ধার্মিক আর অধ্যাত্মবাদ এক জিনিস নয়। ঔরঙ্গজেব ধার্মিক ছিলেন, অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না। তাই এত খুন খারাবি। মোঘল পিরিয়ডে ঔরঙ্গজেবের মত এত খুন খারাবি কেউ করেনি।

ঔরঙ্গজেব চরিত্রটা ধনুকের মতো যতই বাঁকবে ততই যেন তির ছোঁড়ার ক্ষমতা বাড়ে। তিনি যখনই কারো উপর বিনয়ী হয়েছেন তখনই তার ক্ষতি হয়েছে। তবে তিনি দূরদর্শী শাসক "দিল্লির ময়ূরাসন ঘেরে কতগুলো অস্থির চিত্ত সামন্তকে আমি আর বসতে দিতে চাই না। সমস্ত রাজপুত রাজাগুলোকে যদি সাধারণ প্রজার পর্যায়ে ফেলতে পারি তবেই আমার আলমগীর উপাধি সার্থক।" ক্ষীরোদনাট্যের চরিত্রের মধ্যে অন্যতম প্রাণবন্ত চরিত্র উদীপুরী। ঈর্ষা, কামনা, বাসনা, আত্মমর্যাদা, অহংকার, বুদ্ধি - সবকিছুর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে চরিত্রটিতে। উদীপুরী রূপী কুসুমকুমারীর সঙ্গে যেখানেই আলমগীর রূপী শিশিরকুমার একত্রিত হয়েছে নাটকের নাট্যশর্তের সমস্ত তার যেন একসুরে বেজে উঠেছে। চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে,

"উদি। আপনার সে বজ্রমুষ্টি থেকে অস্ত্র কে কেড়ে নেবে জাঁহাপনা ? ঘুমন্ত শয্যা থেকে উঠে সে সকল দেবদূতের তাড়নায় যখন আপনি বারানদা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়তে যান, তখন আপনাকে ধরে শয্যায় আবার কে শয়ান করাবে হতভাগ্য সম্রাট ?

ঔরঙ্গ। একি সত্য বলছ ?

উদি। আপনার অবহেলা লাঞ্ছনা সয়ে আর কোন রমণী বিনিদ্র হয়ে সারারাত আপনার শয্যা পার্শে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ঔরঙ্গ। একি সত্য-সত্য-সত্য বলছ প্রিয়তমে?"

আবার আলমগীরের পঞ্চম অঙ্কের একাদশ দৃশ্যে তৃষ্ণায় কাতর আলমগীর রূপী শিশিরকুমার যখন বলতেন "পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে ওই কামানের ধ্বনি মরে গেল। ওই শব্দের একটাও যদি একবিন্দু জল আমার জন্য বহন করে আনতে পারত ! দাঁড়াও মৃত্যু দূরে - আমি আলমগীর। পরাজিত অবস্থায় আলমগীর কখন মরতে পারে না। আমি দুনিয়া জয় করেছি।" ভারত বিজয়ী আলমগীরের এ হেন চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শিশিরকুমারের গলাটা শুকিয়ে আসতো। তার প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হতো। এই দৃশ্য দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, আলমগীর বারবার কেন ঘুমের মধ্যে আত্মহত্যা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

করতে যায়। মোরাদের কবন্ধ, সুজার রক্তাক্ত দেহ, দ্বারার ছিন্ন শির, অতীতের পাপ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ বলে তার ভেতরে এই নক্ষত্র মাখা পৃথিবী সম্পর্কে কি এক নিদারুণ প্রত্যাখ্যান আছে। আসলে সে এক চলমান জ্যান্ত ইতিহাস। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় শিল্পে এই দিকটি বার বার ধরা পড়েছে।

নাটকের শেষ দৃশ্য উদিপুরী চরিত্রে বিষাদ কুসুম অভিধা লাভ করা অভিনেত্রী নটিকুলমনি কুসুমকুমারীর অভিনয় প্রশংসনীয়। অষ্টম দৃশ্য যেখানে আলমগীর বলছেন , "ভুল, ভুল।এই ভুলের ভিতর দিয়ে এত বড় দীর্ঘ জীবনটাকে কেমন করে চালিয়ে এলুম দিলীর ? আশ্চর্য! মানুষ আপনাকে এমন করে ভুলে থাকতে পারে!" তখন এই অভিনয় দেখে মনে হয় শিশির কুমার যেন এক সত্যদ্রষ্টা কবি ও দার্শনিক।

নাটক হিসাবে আলমগীরের বিভিন্ন ত্রুটি থাকলেও এই একখানি নাটকের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অনেক সমালোচক বলে থাকেন 'বাংলায় নাটক কোথায় ? বাংলায় নাটক একখানিও লেখা হয়নি।' এইসব সমালোচকদের সমালোচনা উপেক্ষা করে বলা যায় বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে 'আলমগীর' নাটকের স্থান উল্লেখযোগ্য। শিশিরকুমার কেনই বা এ নাটক অভিনয় করলেন, এমনকি অভিনয় জীবনের ত্রিশ বছর পূর্তিতে এই নাটক পুনরাভিনয় করলেন সেটি একটি প্রধান প্রশ্ন। এই নাটকে অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখানো অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছিল তা সত্ত্বেও এ নাটক অবলম্বনে শিশিরকুমার নিজের অভিনয়ের জোরে নাটকটিকে সার্থক অভিনীত নাটক বলে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। আলমগীরের নাট্যাভিনয় হচ্ছে শিশির কুমারের ব্যক্তিগত প্রতিভার জ্বলন্ত নিদর্শন।

Life's but walking shadow– a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more.

নাট্যকারের জীবনও যেন একটা নাটক। ঔরঙ্গজেবের ট্রাজিক জীবন পরিণতির মধ্যে দিয়ে শিশির কুমারের অনবদ্য অভিনয়ে যা ধরা পড়েছে তা যেন নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবন সংকটের রূপ। নিরাপত্তাহীনতার জীবনে নাট্যকারদের কখনও মঞ্চের চাহিদা, কখনও মঞ্চ মালিকদের ব্যবসায়িক লাভ, কখনও বা চরিত্রাভিনেতার অনুরোধ মাথায় রেখে নাটক লিখতে হয়েছে। কতগুলো অবার্চিনের মতের তলায় নিজের কল্পনাকে বিধ্বস্ত করতে হয়েছে। নাটককে তিনি গভীর ভালোবাসার ডোরে বেঁধেছিলেন, জীবনে এবং জীবিকার বাহন করেছিলেন। তাই আমৃত্যু নাটক রচনায় ছিলেন নিরলস। বর্তমান সময়ে তার নাটক জনপ্রিয়তা হারালেও আলমগীরের স্রষ্টা রূপে ক্ষীরোদপ্রসাদের দান অনস্বীকার্য। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ জীবনের শেষ দিনগুলো বাঁকুড়ার বিকনা গ্রামে অতিবাহিত করেছিলেন। ১৯২৭ এর ৪ ঠা জুলাই বিকনা গ্রামে তার প্রয়ানের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্যাকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অন্তর্ধান ঘটে।

**তথ্যসূত্র :**

১। আলমগীর, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স
২। বাংলা নাটকের ইতিহাস, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, দেজ পাবলিশিং
৩। দূতক্রীড়ক, ব্রাত্য বসু, আজকাল
৪। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, প্রজ্ঞা বিকাশ
৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (নবম খন্ড), অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
৬। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মন্মথমোহন বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৭। শিশির সান্নিধ্যে, রবি মিত্র ও দেব কুমার বসু, করুণা প্রকাশনী
৮। শিশির কুমার ও বাংলা থিয়েটার, মনি বাগচী, জিজ্ঞাসা প্রকাশন
৯। নাট্যাচার্য শিশির কুমার, শঙ্কর ভট্টাচার্য, ডি এম লাইব্রেরী
১০। বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক, হেমেন্দ্রকুমার রায়, গল্প ভারতী
১১। ক্ষীরোদপ্রসাদ স্মৃতিকথা, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কালি কলম
১২। বাংলা থিয়েটার ইতিহাস, দর্শন চৌধুরী, পুস্তক বিপণি



## জতুগৃহ : বহু কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যিক রূপান্তর

**রচনা রায়**

।।১।।

মহাভারতের কোন একটি বিশেষ ঘটনা বা চরিত্রকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা এমন কোন অভিনব বিষয় নয়। সাহিত্যিকেরা আত্মবিশ্লেষণজাত প্রশ্ন সংকুল মন নিয়ে পুরনো ঘটনা বা চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণে উৎসাহী হয়েছেন বারংবার। বাংলা সাহিত্যে তার উদাহরণ রয়েছে ভুরি ভুরি। আসলে একই ঘটনা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে আভাসিত হয়। তাই সাহিত্যে তার বিপুল আয়োজন ও বিস্তার। বর্তমানে আলোচনার আমরা মহাভারতের আদি পর্বে জতুগৃহ দাহের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করব। মহাভারতের আদি পর্ব থেকে জানা যায় পঞ্চপান্ডবের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পুত্র দুর্যোধনের প্ররোচনায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপান্ডবকে বারণাবতে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে “শিবভবন” নামে গৃহকে জতুগৃহ হিসেবে নির্মাণ করে পুরোচনের সহায়তায় দুর্যোধন পান্ডবদের সপরিবারে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করেছিলেন। পরিকল্পনা ছিল জতু বা লাক্ষা নির্মিত গৃহে (জতুগৃহ) অবস্থানকালে কোন একদিন সুযোগ মতো অগ্নিসংযোগ করে মাতা কুন্তী সহ পঞ্চপান্ডবকে পুড়িয়ে হত্যা করা। চক্রান্ত হয়েছিল সুচারুভাবে। কিন্তু মন্ত্রী বিদুর, যিনি সম্পর্কে কুরু-পাণ্ডবের পিতৃব্য, সমস্ত পরিকল্পনার আঁচ করতে পেরে সেইমতো জ্যেষ্ঠ পান্ডব যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত সাংকেতিক ভাষায় পরামর্শসহ সাবধানী হতে বলেছিলেন। পরবর্তী সময় দেখা যায় জতুগৃহ অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল এবং সেখানে মাতা কুন্তী সহ পঞ্চপান্ডবের পরিবর্তে মাতা সহ পাঁচ নিষাদ পুড়ে মারা গিয়েছিল। জতুগৃহ দগ্ধ হবার পর সকল নগরবাসী ছয়টি দগ্ধ মৃতদেহ দেখে পান্ডবদের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তারা ধৃতরাষ্ট্র সহ দুর্যোধনের শাপ-শাপান্ত করতে থাকে। অন্যদিকে পান্ডবদের মৃত্যু হয়েছে নিশ্চিত জেনে, দুর্যোধন আনন্দিত হয় এবং ধৃতরাষ্ট্র শোকবিহ্বল চিত্তে যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেদিন পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হন নি। মাতা সহ পঞ্চ নিষাদকে খাদ্য-পানীয় দ্বারা বশীভূত করে নিজেরাই গৃহে অগ্নিসংযোগ করে পূর্বে খনন করে রাখা গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে নিরাপদে পালিয়ে গিয়েছিল গভীর অরণ্যে।

মহাভারত কালে কালে মানুষের মনে নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে চলেছে। কালের অগ্রগতির সাথে মহাভারতকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে তৎপর হয়েছেন মহাকবি ভাস থেকে একালের নাট্যকার ব্রাত্য বসু। বারণাবতের ঘটনা অবলম্বনে আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষণ বিন্দু তিনটি নাটক। প্রতিটি নাটকের শিরোনাম “জতুগৃহ”।

।। ২ ।।

১৯৭৫ সালে অমল রায় রচনা করেছেন ‘জতুগৃহ’ নাটক। নাট্যকার অমল রায় ‘জতুগৃহ’

নাটকে সমাজের  অসাম্য ও অস্পৃশ্য নীতিকে ধিক্কার দিয়েছেন। নাট্যকার দেখিয়েছেন দুই জ্ঞাতি ভ্রাতার সম্পত্তিবিষয়ক বিবাদে বলি হয়েছিল ছটি নিরাপরাধ প্রাণ, যারা সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণী হিসেবে পরিগণিত। নাটকে নাট্যকার বরংবার অবহেলিত, নিপীড়িত জনগণের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। মহাভারতের, কাহিনিকে প্রায় অবিকৃত রেখে মহাভারতের কাল থেকে আজও বয়ে আসা অস্পৃশ্যতার অমানবিকতার ছবি সংযুক্ত হয়েছে নাটকে। নাট্যকার বারণাবতে পান্ডবদের হত্যার চক্রান্তকে উপলক্ষ করে মূলত অসহায় দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরেছেন। "জতুগৃহ"  নাটকের সংলাপ পড়তে পড়তে মনে হয় এ কোনো প্রাচীন মহাকাব্য থেকে তুলে আনা কাল্পনিক গল্পগাথা নয়, এ আবহমানকাল ধরে চলে আসা ক্ষুধার্ত মানুষের বঞ্চনার ইতিকথা। রাজনীতির স্বার্থের কাছে নিরীহ প্রাণের কোনো  মূল্য নেই। মহাভারতের কাল থেকে সেই ধারা আজও প্রবহমান। আমাদের চেনা পরিসরেও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে অহরহ। এ নাটক  তাই কালিক সীমা অতিক্রম করে সমকালের অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণভাবে মহাভারতে পাণ্ডবগণ সত্যধর্মের রক্ষক চিহ্নিত। অথচ নাট্যকার অমল রায় "জতুগৃহ" নাটকে পান্ডবদের ন্যায়-নীতি তথা ধর্মপরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন! চিরাগত সংস্কারের বাইরে গিয়ে দরিদ্রের ওপর অভিজাত ও রাজপরিবারের অমানবিকতার ছবি তুলে ধরেছেন নাটকে।  নাটকের শুরুতেই দেখা যায় একদল ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্যান্বেষণে ব্যস্ত। নাটকে দেখা যায় মাতা কুন্তীর ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন একদল বুভুক্ষ হতদরিদ্র মানুষ খাদ্যের আশায় রাজপ্রাসাদের সামনে জড়ো হয়েছে। তাদের কোলাহলে রাজপুত্ররা অত্যন্ত বিরক্ত। প্রহরী এসে জানিয়েছে

'ব্রাহ্মণ ভোজনের সংবাদ শুনে ছুটে এসেছে। ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য পথের ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কুকুরের মতো তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকেরা!'[১]

এমন দৃশ্য ছিয়াত্তর বা ছেচল্লিশের মন্বন্তরের ক্ষুধিত মানুষের আচরণের কথা স্মরণ করায়। এখানে ক্ষুধার্ত মানুষেরা উচ্চবিত্তের কাছে কুকুর বা পশুর সমতুল্য। রাজপুত্র অর্জুন তাই তাদের মেরে তাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব দিলে রাজনীতি সচেতন বিদূর তৃতীয় পাণ্ডবকে সতর্ক করে দেন—

'তৃতীয় পাণ্ডব, মেরে তাড়াবে তাড়াও, তবে দেখো বেশি অত্যাচার করোনা যেন, হিতে বিপরীত হবে। শুধু তোমাদের এই গৃহটি নয়, যুধিষ্ঠির পুরো দেশটাই এখন জতুগৃহ, শুধু আগুন লাগার অপেক্ষায়। অর্জুন প্রয়োজনের বেশি অত্যাচার কোরোনা, বিদ্রোহের সম্ভাবনায় ঘৃতাহুতি দিয়ো না।'[২]

বিদূরের এই সংলাপে বোঝা যায় এ নাটক কোন সুদূর অতীতের গল্প নয়, এ যেন ছয়ের দশকের খাদ্য আন্দোলনের রাজনৈতিক অস্থিরতার আভাস। নাট্যকার সমাজের অসাম্য ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন রাজনীতি অভিজ্ঞ বিদূরের সংলাপে। মহাভারতের



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

একটি ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করে নাট্যকার ভীষণভাবে সমকালকে ছুঁয়ে গেছেন। ক্ষুধার্ত মানুষ যে কতখানি হিংস্র হতে পারে, বিদূর তা জানেন —

'ক্ষুধা কি ভয়াবহ আগুন জ্বালাতে পারে, ক্ষুধার্ত
মানুষ যে কি ভয়ংকর তা কল্পনারও অতীত.'[৩]

নাটকে দেখা যায় একদল ক্ষুধার্ত মানুষ খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সরাসরি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছে। খাদ্যের অন্বেষণে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তারা উন্মাদের মত খাদ্য অন্বেষণ করতে থাকে। কিন্তু কিছুই পায় না। নাট্যকার দীর্ঘ অংশজুড়ে এদের সংলাপে জঠরাগ্নির তীব্রতা প্রকাশ করেছেন। দেখিয়েছেন ক্ষুধার জ্বালায় উন্মাদ হয়েছে পাঁচ পুত্রের মাতা। এমনকি একজন আপন সন্তানকে নিজের হাতে গলা টিপে হত্যা করেছে। এদের আচরণ ও সংলাপে সমাজের দরিদ্র মানুষের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

নিরন্ন, নিম্নশ্রেণির জনতা উচ্চশ্রেণীর ধনবিলাসের সোপান। এদের শোষণ করেই ধনাঢ্য ব্যক্তির অহংকারের সুরম্য সাম্রাজ্য নির্মিত। মহাভারতে পঞ্চপান্ডবকে সুরক্ষিত করতে পাঁচ নিষাদকে তাদের মাতাসহ মরতে হয়েছিল। রাজপুত্ররা ঠান্ডা মাথায়, পরিকল্পনা করে তাদের হত্যা করেছিল। এই গণহত্যার কোন বিচার হয়নি। হত্যাকারীদের শাস্তিও হয়নি। বরং ভারতীয় সমাজে এরাই যুগ যুগ ধরে আদৃত ও বরণীয় হয়ে আছেন। নাটকের শেষে দেখা যায় অনাহারী মানুষগুলো বুঝতে পেরেছে তারা রাজপুরুষদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। বুঝেছে গভীর চক্রান্তের শিকার হয়েছে তারা। তখন পালানোর পথ বন্ধ। মৃত্যুর লেলিহান শিখা তাদের গ্রাস করতে উদ্যত। মাতাসহ পঞ্চ ভ্রাতা একসাথে মৃত্যু বরণ করেছে। এখানে তাদের গভীর উপলব্ধিতে কাহিনি কেবল মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা হয়ে যায় যুগ-যুগান্তরের নিপীড়িত মানুষের অনুভবের প্রকাশ—

"এমনি ভাবে, এমনি ভাবেই চিরটাকাল ওদের তৈরী জতুগৃহে অসহায় নিরুপায়ের মত আমরা পুড়ে মরছি, ওদেরেই ফাদে পা দিয়ে নিজেদের মরণকে ডেকে এনেছি, কিন্তু কত কাল আর কতকাল?'[৪]

এই প্রশ্ন পৌঁছে যায় সচেতন নাগরিকদের বোধ আর বিবেকের কাছে। সত্যিই তো এই অসাম্য, এই অন্যায় আর কতকাল সহ্য করবে হতভাগ্য দরিদ্র অনাহারী মানুষের দল! তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে নাটক সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ একটি সুপরিকল্পিত গণহত্যার বর্ণনায় নাটকটি পান্ডবদের কুশল কামনায় নয় বরং এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন ও সতর্ক করে গর্জে ওঠার আভাস দিয়ে কাহিনি সমাপ্ত হয়  যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে গণ-আন্দোলনের উচ্চকিত সুর।

।।৩।।

নাট্যকার শ্যামল সেনগুপ্ত মূল ঘটনার পরিবর্তন করে কিছু কাল্পনিক চরিত্রের সংযোজন

করে রচনা করেছেন 'জতুগৃহ' নাটক (১৯৮৩)। নাট্যকার এই কাহিনিতে মানুষের লোভানলের প্রকাশ দেখিয়েছেন। নাটকের প্রয়োজনে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেবের মতো পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে রয়েছে সত্যবাক, চন্দ্রমা ও প্রহরীর মত কাল্পনিক চরিত্র। নাটকের নায়ক সত্যবাক। সম্পর্কে সে পুরোচনের পুত্র ও চন্দ্রমার দয়িত। কাহিনি শুরু হয়েছে চন্দ্রমা ও সত্যবাকের রোমান্টিক প্রেমালাপের আবহে। তাদের কথোপকথনে জানা যায় যে সত্যবাক একজন শিল্পী, শিল্পী মনের মাধুর্য্য নিয়ে সে বারণাবতের জতুগৃহ নির্মাণ করেছে। এই সৌধ তার কাছে "প্রণয়ের বৈজয়ন্তী সম" ও "অমৃতাত্মা প্রেম" স্বরূপ। তার কাছে আপন প্রেম ও নির্মিত শিল্পসৌধ সমতুল্য। বস্তুত সত্যবাক জানে না এই গৃহ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সে কেবল শিল্পীর মুগ্ধতা ও সৃষ্টির আনন্দে "আপন মনের মাধুরী" দিয়ে গৃহখানি করে তুলেছে  শিল্প সৌন্দর্যের অনুপম পরাকাষ্ঠা। সত্যবাক সরল নিষ্পাপ। দুর্যোধন বা পিতার ষড়যন্ত্র তার অজ্ঞাত। জীবনের অন্ধকারময় দিকগুলির প্রতি সে উদাসীন। সে কেবলই সুন্দরের উপাসক। সত্য জানে সুন্দর সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী; যেমন ক্ষণস্থায়ী আকাশের রামধনু বা ঊষা কুসুম। বোঝা যায় সত্যবাক অমর্ত্যের মুগ্ধ অমৃত তাপস"। অথচ ঘটনাচক্রে পিতা পুরোচন দুর্যোধনের নির্দেশে মাতা সহ পঞ্চপান্ডবকে পুড়িয়ে মারার অভিপ্রায়ে জতুগৃহে অগ্নি সংযোগের দায়িত্ব নস্ত করে সত্যবাকের ওপর। "প্রবীণ বুদ্ধি" পুরোচন অভিজ্ঞতায় জেনেছেন দুর্যোধনের ইচ্ছায় একদা জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল আর তারই নির্দেশে গৃহকে ধ্বংস করতে হবে। আর তাতেই রাজানুগত্যের প্রতি তাদের আস্থা ও অবিচল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু একজন স্রষ্টার পক্ষে আপন সৃষ্টিকে নিজের হাতে ধ্বংস করার যন্ত্রণা কেবল জানে সত্যবাক। সে শিল্পী, নিজের শিল্পের রূপেই সে আত্মহারা হতে চায়, হতে চায় "দ্বিতীয় ঈশ্বর"। অতএব তার পক্ষে আপন সৃষ্টিকর্মের বিনাশ অসম্ভব। অন্যদিকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও বেদনাহত। দুর্যোধনের নীচ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনায় ও মানুষের অন্তহীন লোভের উৎসব দেখে তিনি মর্মাহত। যুধিষ্ঠির মনে করেন —

'........প্রীতি প্রেম যদি<br>
ধর্মকে না সুরঞ্জিত করে তবে তা আচার মাত্র।'[৫]

নবীন সত্যবাকের উপলব্ধি ধরা পড়ে যুধিষ্ঠিরের সংলাপেও। নাট্যকার এই দুই ধর্মাত্মার মধ্য দিয়ে জগত সংসারে চির প্রবাহমান প্রেম প্রীতি ভালবাসাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। যুধিষ্ঠির জানেন তার আশু কর্তব্য।  তবু তিনি ধর্মকে কল্যাণের সিংহাসন থেকে স্খলিত করতে নারাজ। সত্যবাক যখন যুধিষ্ঠিরের সমীপে আপন অন্তরের সংশয় ও অস্থিরতা ব্যক্ত করে তখন যুধিষ্ঠির তাকে শান্ত হতে উপদেশ দিয়ে রাজ্যের কল্যাণে রাজাদেশ পালনে উৎসাহ দেন।

মূল ঘটনা ধরার সঙ্গে নাটকের বিষয়বস্তুর পার্থক্য হতে থাকে। মূল কাহিনিতে ছিল সকল ভ্রাতা ও মাতা  সুরক্ষিত ভাবে সুরঙ্গে প্রবেশ করলে মধ্যম ভ্রাতা ভীম গৃহে অগ্নিসংযোগ





করেছিল কিন্তু এখানে নকুল ও যুধিষ্ঠিরের আলোচনায় জানা যায় দুর্যোধনের আদেশে নয়, আপন প্রাণ রক্ষার্থে যুধিষ্ঠির নিজহস্তে অগ্নি শলাকা নিক্ষেপ করবেন জতুগৃহে। যুধিষ্ঠির এই অধর্মাচরণের যুক্তি হিসেবে জানিয়েছেন সত্যবাককে পিতৃ হত্যার অপরাধ থেকে মুক্তি দিতে ধর্মরাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন অধর্মের রাজদণ্ড। যদিও নিজেদের সুরক্ষিত করতে  সুপ্তিমগ্ন পঞ্চ নিষাদ ও তাদের মাতাকে নিষ্কৃতি দিতে ধর্মরাজ প্রস্তুত নন। কারণ ওই ছয়টি দগ্ধ মৃতদেহ প্রমাণ করবে পঞ্চপান্ডব ও মাতা কুন্তী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির একে দৈব নির্দেশ বলে মনে করেছেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস —

'আত্মরক্ষার জন্য যাই করি<br>
পাপ নেই তাতে।'[৬]

সত্যবাক হতবাক হয় জতুগৃহের শীর্ষে জ্বলন্ত দীপ্ত লেলিহান শিখা দেখে। প্রহরীর মুখে পিতার করুণ মৃত্যু যন্ত্রণার বিবরণ শুনতে শুনতে রাজনীতির গভীর চক্রান্ত অনুধাবন করে সে বুঝতে পারে এ অগ্নি ধর্ম দ্বারা প্রজ্বলিত। মুহূর্তে সত্যবাক উপলব্ধি করে মানুষের লোভ হিংসা আর রিরংসার স্বরূপ। সুকোমল সত্যবাক পাষানবৎ হৃদয়ে মানুষের অনন্ত লোভের পরিনাম স্মরণ করে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধে  বিদায় নেয় নাগরিক জীবন থেকে। সমগ্র নাটকের মূল ব্যঞ্জনা পুঞ্জিভূত হয়েছে নাটকের শেষ সংলাপে। মানুষের লোভের জতুগৃহে মানুষ নিজেই দগ্ধ হয়। যেমন হয়েছিল পুরোচন। শুধু তাই নয় বিশ্বজুড়ে এই লোভের লেলিহান শিখায় দগ্ধ হয়ে চলেছে কত শত শত জতুগৃহ। হাহারবে সত্যবাক পিতার উদ্দেশ্যে শেষ উক্তি উচ্চারণ করে —

'..........হায় পিতা-<br>
আরও বড় জতুগৃহ আরও রচা হবে<br>
মানুষের অন্তহীন লোভের তৃষায়<br>
বিশ্বচরাচর জুড়ে নিরবধিকাল<br>
এবং মানুষ<br>
চিরদিন ধ্বংস হবে<br>
আপনারই হাতে গড়া<br>
অনির্বাণ বাসনার দীপ্ত জতুগৃহে।।'[৭]

।।৪।।

একালের জনপ্রিয় নাট্যকার ব্রাত্য বসুও মহাভারতের বারণাবতের ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেছেন 'জতুগৃহ'(২০১৭)। প্রতীক ও সংকেতের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তার কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মহাভারতীয় চরিত্রগুলির পাশে তিন বৃদ্ধের উপস্থিতি এই নাটককে অন্য মর্যাদায় আসীন করেছে। এখানে তারা বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাদের কোরাসে বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে জতুগৃহের অগ্নির সামগ্রিক জ্বালাময়ী রূপ। এ কথা সত্য যে,

জতুগৃহে যে অগ্নি সংযোগ হয়েছিল তা কেবল বারণাবতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, সেই আগুন এসে ধ্বংস করেছে স্বয়ং হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থকে। জতুগৃহের অগ্নি কেবলমাত্র শলাকার দ্বারা প্রজ্বলিত হয়নি, এই অগ্নি আসলে ঈর্ষার আগুনে জ্বলন্ত। ঈর্ষাও অগ্নির মতো। অন্তরের এই বহ্নি ধ্বংস করে গৃহ, নগর তথা গোটা সমাজকে। যেমন দুর্যোধনের ঈর্ষার আগুনে ধ্বংস হয়েছিল সমগ্র কুরু বংশ। জগতের কল্যাণে নাট্যকার তাই ইন্দ্রিয় জয়ের সহজ উপায় বাতলে দেন

'যদি যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাও নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে করো।

যদি সংগ্রাম করতে চাও নিজের ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে করো।

যদি জয়ী হতে চাও নিজের অহংকে পরাভূত করো।'[৮]

কারণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বলেন

'.........শত্রু, অগ্নি, সর্প, বজ্র ইত্যাদিকেও ততটা ভয় করা উচিত নয় যতটা ভয় করা উচিত নিজের ইন্দ্রিয়কে।'[৯]

ব্রাত্য বসু সাধারণত রাজনৈতিক নাটক রচনা করেন না বলে নিন্দুকেরা বলে থাকেন। কিন্তু "জতুগৃহ" নাটকের মধ্যে মহাভারতীয় আবহাওয়ায় ব্রাত্য বসু তুলে ধরেছেন সমকালীন রাজনৈতিক উত্তাপকে। দুর্যোধনের সংলাপে শোনা যায়, দুর্বিনীত শাসকের উদ্ধত বাণী

'অর্থ এবং রাজসম্মান চঞ্চলকেও শান্ত করে, গুণীকেও নির্গুণ করে, উচ্চমেধাকে নামিয়ে আনে নিম্নমেধায়। .জাতি বা মর্যাদার উচ্চ নীচ হতে পারে কিন্তু চক্রান্তের কোনও উচ্চ নীচ হয় না। চক্রান্ত চক্রান্তই। শত্রু শত্রুই। তার কোনও শ্রেণি হয় না, জাতি হয় না, বয়স হয় না। তাই যে-কোনও পদ্ধতিতে, যে-কোনও কৌশলে অরিকে বা বিদ্রোহীকে হয় পদানত নয় নীরব করিয়ে রাখানোটাই রাজধর্ম।'[১০]

ব্রাত্য বসুর কলমে মহাভারতের যুগ আর সমকাল একীভূত হয়ে গেছে। বর্তমান রাজনীতিকে ভীষণভাবে স্পর্শ করেছে নাটকের বক্তব্য। ভালোমানুষির মুখোশের আড়ালে রাষ্ট্রনেতাদের সর্বগ্রাসী মানসিকতা, হিংস্রতা, লোলুপতা, ক্ষমতা লাভের নগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে নাট্য সংলাপের ছত্র-ছত্রে। নাট্যনির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতে—

'কাহিনিটা মহাভারতের একটা পর্ব থেকে নেওয়া হলেও ব্রাত্যর এই নাটকটা এখনকার সময়টাকে ভীষণভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যাবে যে সমসাময়িক রাজনীতিটা নাটকের মধ্যে রয়েছে। প্রচুর পরোক্ষ উপমা, মেটাফোরের ব্যবহার রয়েছে। পুরোচন, বীভতুদের মতো চরিত্রগুলো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'[১১]

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়' এই 'উলুখাগড়া' হলো সাধারণ মানুষ। রাজ সিংহাসন প্রত্যাশী রাষ্ট্রনেতাদের লোভের আগুনে আত্মাহুতি দেয় সাধারণ জনগণ। মহাভারতে যেমন বারণাবতের জতুগৃহে পঞ্চপান্ডবের পরিবর্তে পুড়ে মরতে হয়েছিল পাঁচ পুত্রসহ এক নিষাধীর। নাটকে দেখা যায় নিষাদী মা ও



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

তার পাঁচ পুত্রকে বিনা দোষে পুড়িয়ে মারতে যুধিষ্ঠির দ্বিধান্বিত ও সংকুচিত। কিন্তু মাতা কুন্তী রাজনীতির সূক্ষ্ম গতি যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন যে জীবনে একদল মরে আর একদল বাঁচে। তারপর আবার অন্য দল আসে, মরে এবং বাঁচে। মাঝখানে থেকে যায় সাধারণ মানুষের লাশ। যুগের পর যুগ এইসব সাধারণ মানুষেরাই বিশ্বাস করে সবাইকে। তাই ঠকে। ওরা আস্থা রাখে। তাই মরে। মৃত্যুই ওদের অবধারিত পরিণতি। এদের খবর কেউ রাখে না। আত্মাহুতি দেবার জন্যই যেন এদের জন্ম। ব্রাত্য বসু বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশকে এভাবেই 'মেটাফোরে'র মাধ্যমে নাটকে তুলে ধরেছেন। এই নাটক সম্পর্কে নাট্যকারের নিজস্ব অভিমত

'এ নাটকে মহাভারত একটা প্রেক্ষাপট। আমাদের সকলের ভিতরেই একটা জতুগৃহ রয়েছে। যা আমাদের পোড়ায়, ধ্বংস করে। আবার এটাও সত্যি যে আমাদেরই নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য পরিখা খনন করতে হবে।'[১২]

আর অন্যদিকে পুরোচন মহাভারতে যৎকিঞ্চিৎ পরিসরে উপস্থিত। কিন্তু এই নাটকে চরিত্রটিকে গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন ব্রাত্যবাবু। কারণ যুগে যুগে পুরোচনের মত একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত চরের মাধ্যমেই রাষ্ট্রনেতারা আপন কার্য্য সম্পাদন করেন। নাটকের শেষ অংশটি অভিনব। পুরোচন ও তার সহযোগী বীভৎসু নিজেদের ঝলসানো রূপ দেখে নিজেরাই ভীত সন্ত্রস্ত। তবু এরই মধ্যে তাদের সংলাপে ফুটে উঠেছে মানুষের অহ ও ক্ষমতার লোভ। তবে শেষ পর্যন্ত নাটকটি গভীর মানবিক বোধের বার্তা দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। নাট্যকার বিশ্বাস করেছেন অগ্নির উদগ্র লেলিহান শিখা সমস্ত কিছু ভস্মীভূত করলেও শেষ পর্যন্ত প্রদীপের একটি স্নিগ্ধ শিখা প্রজ্জ্বলিত থাকবে, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবে। আর সেই "আগুনের পরশমনির ছোঁয়ায়" "নয়নের দৃষ্টি" থেকে সমস্ত কালো অপসারিত হয়ে জগৎ ও জীবন হয়ে উঠবে আলোকোজ্জ্বল।

।।৫।।

নাটক গুলির পর্যালোচনায় দেখা গেল যে তিনটি নাটক একই শিরোনামাঙ্কিত হলেও প্রতিটি নাটক মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক আবরণের নির্মোক খসিয়ে ফেলে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে একালের সমস্যা দীর্ণ জটিল সমাজ ও জীবনকে তুলে ধরেছে। মহাভারতীয় সৌরভ গায়ে মেখেও নাটকগুলি বড় বেশি একালের। নাট্যকার অমল রায় "জতুগৃহ" নাটকে দেখিয়েছেন শোষণ ক্লিষ্ট অনাহারী মানুষের যন্ত্রণা কাতরতা, অন্যদিকে নাট্যকার ব্রাত্য বসু দেখেছেন প্রতিহিংসার রাজনীতির প্রতিফলন। আর নাট্যকার শ্যামল সেনগুপ্ত "জতুগৃহ" নাটকে দেখিয়েছেন মানুষের লোভের জতুগৃহের স্বরূপ যেখানে মানুষ নিজের হাতে গড়া লোভের জতুগৃহে নিজেই দগ্ধ হয়। নাটক সময়ের সবচেয়ে জীবন্ত দলিল। সে সর্বদা সময়ের কথা বলে। উন্মোচন করে সমাজের মেকি অভিনয়। অশুভ শক্তির বিনাশে সে সদা তৎপর। মানবতা ও কল্যাণের জয়গান তার মূল উদ্দেশ্য। সমাজের অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে

তীব্র ধিক্কার জানাতে সে কখনোই কুন্ঠিত নয়। বাঙালি নাট্যকারেরা তাই মহাভারতীয় আবহে বর্তমান সমাজকে বারে বারে উন্মোচন করেছেন, "জতুগৃহ" নামের তিনখানা নাটক যার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ।

**তথ্যসূত্র :**


১. অমল রায়, জতুগৃহ, 'অভিনয়' পত্রিকা, সম্পাদক: দিলীপ বন্দোপাধ্যায়, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা - ৩, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ৭৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৪৬
২. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৪৬
৩. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৪৭
৪. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৯৭৩
৫. শ্যামল সেনগুপ্ত, "জতুগৃহ", বহুরূপী সংখ্যা, ৫৯/মে ১৯৮৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯০
৬. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯৫
৭. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯৯
৮. ব্রাত্য বসু, জতুগৃহ, ব্রাত্য বসু নাটক সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২২০
৯. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২১৮
১০. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২১৯
১১. sray ১৭০৭, নতুন বছরে নতুন "মহাভারত", Eisamay– Updated- 11 Dec 2014–11-44 am
১২. ঐ




## অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' : মধ্যবিত্তের সংকট ও উত্তরণ

**আনোয়ারে মুর্শিদ**

গিরিশযুগের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭—১৯১২)। তিনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত নাটক রচনা করলেও তাঁর নাট্যধারায় মধ্যযুগীয় প্রবণতা বেশি দেখা যায়।কিন্তু তাঁর 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না" প্রহসনে তিনি দেব-দেবীর পরিবর্তে মানুষের কথা বলেছেন। ১৮৯০খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রহসনটিতে এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বিভিন্ন সংকট, যেমন—অর্থনৈতিক, মনসিক, সামাজিক, সম্পর্কের সংকট ও সেই সংকটগুলি থেকে উত্তরণের ছবি দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

দেশের ও সমাজের ওঠা-পড়া, শাসক শ্রেণীর ভালো-মন্দ, জনগণের সুখ-দুঃখ এসব নিয়ে সাধারণত বেশি মাথা ঘামায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সমাজ গড়ে ওঠার পর থেকেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি চিরকালই ছিল আছে ও থাকবে। মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশের ধারায় ভারতে উনিশ শতকে ব্রিটিশ উপনিবেশের যুগে এক নতুন ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হয় - শিক্ষিত নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্ত। এর আবির্ভাবের পিছনে কারণ হিসাবে দেখা যায় এক নতুন আর্থ-সামাজিক ও নাগরিক পরিবেশে ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীজীবী নাগরিক জীবন ব্যবস্থার উদ্ভব। এই নাগরিক সমাজ সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার উদ্ভব হয় সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমের দেশগুলিতে। নাগরিক সমাজের উদ্ভব জানান দেয় এক সামাজিক পরিবর্তনের, সাধারণত ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে তার এক নতুন ধরনের সম্পর্কের। নাগরিক সমাজের আধুনিক ধারণার জন্য এক তাত্ত্বিক স্তরে নাগরিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন আছে, যে বিভাজন আগে ছিল না। কেননা আমরা জানতাম সমাজে মূলত তিনটি শ্রেণি —উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। কিন্তু আধুনিক সময়ে সেই সংখ্যাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচটি — উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। তাই আমাদের ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে এখন যাদের বোঝায় তাদের জীবিকার যোগাযোগ রয়েছে শহরের শিল্প জীবনের সঙ্গে, গ্রামের কৃষক জীবনের সঙ্গে নয়। ব্রিটিশ আমলে শিল্প বিপ্লবের সময় বেড়ে ওঠার নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পড়ে—সওদাগর, কলকারখানার দক্ষ মজুর, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, সরকারি অফিসের কেরানি, বিভিন্ন যানবাহনের মালিক, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ডাক্তার, মোক্তার, উকিল প্রমুখ।

"ভাগের মা গঙ্গা পায় না" অতুলকৃষ্ণ মিত্রের তৃতীয় প্রহসন। এটি প্রকাশিত হয় ১৫ জানুয়ারি ১৮৯০ সালে। তিনটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এই প্রহসনটিতে নাট্যকার মধ্যবিত্ত

বাঙালি পরিবারের ভেঙে পড়ার সূচনায় যে মর্মাহত ছিলেন তারই নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। লখিন্দর শর্মা, অজারাম শর্মা, ভয়ানকচন্দ্র শর্মা ও ষন্ডামার্ক শর্মা—এই চারজন ছেলের মা হলেন ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণী। এই চারজনের মধ্যে প্রথম তিনজন ভাই মাকে দেখে না। লখিন্দর শর্মা হ্যান্ডনোটের দালাল এবং এক রক্ষিতার ভরণপোষণ করে। অজারাম শর্মা মোক্তার এবং শালীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। ভয়ানকচন্দ্র শর্মা ব্রাহ্ম ও তার স্ত্রী মদ্দামণি একরোখা, নিচ ও স্বার্থপর রমণী। এই তিন পুত্র তাদের জ্ঞাতি খুড়ো রংলালের বুদ্ধির কৌশলে কেমন করে শায়েস্তা হল তারই উপভোগ্য ছবি 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না" প্রহসনে দেখানো হয়েছে। এই প্রহসনের চরিত্রগুলির নামকরণও বিচিত্র ধরনের। মদ,বেশ্যা,ব্রাহ্মধর্মের মত বিষয়গুলিকে অতুলকৃষ্ণ মিত্র যে মনে থেকে মেনে নিতে পারেননি তা তাঁর এই প্রহসনটি পাঠ করলেই বোঝা যায়।

নগর মহানগর যতদিন থাকবে ততদিন মধ্যবিত্ত সেখানে থাকবে। থাকবে সেই সব মধ্যবিত্তদের স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভাঙ্গার বা গড়ার ইতিহাস। এইসব মধ্যবিত্তদের জীবনের ব্যর্থতা, অসহায়তা, অক্ষমতা, স্বার্থপরতা, বিবেকহীনতা, লোভ, লালসা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, মানবিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদিকে অতুলকৃষ্ণ মিত্র তাঁর 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না" প্রহসনটিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক মধ্যবিত্ত পরিবারে বিধবা বৃদ্ধ মায়ের অবস্থানটা ঠিক কি রকম বা কোথায়? সেই ছবি তুলে ধরতে গিয়ে অতুলকৃষ্ণ মিত্র ওই মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। বিধবা বৃদ্ধা ব্রহ্মময়ীর চার ছেলে —লখিন্দর শর্মা,অজারাম শর্মা,ভয়ানকচন্দ্র শর্মা ও ষণ্ডামার্ক শর্মা। প্রথম তিন ছেলে নিজের মায়ের খোঁজ খবর নেয় না। ষন্ডামার্ক এবং তাদের বিধবা বোন তারা মায়ের দেখাশোনা করে। তাদের জ্ঞাতিখুড়ো রংলাল মাঝেমধ্যে ব্রহ্মময়ীর খোঁজ নেন। একদিন তিনি ব্রহ্মময়ীর তিন ছেলেকে কিছু উপদেশ দেন যাতে তারা তাদের মাকে দেখে অর্থাৎ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয় সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেন। তখন মধ্যবিত্ত মানসিকতার ছেলেরা এক একজন এক একটা অজুহাত দেখায়, অজুহাত দেখিয়ে তারা তাদের মায়ের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। এই তিন ছেলের প্রতিজনই কিছু না কিছু ইনকাম করে স্ত্রী পুত্র বেশ্যা প্রতিপালন করে।

মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকট ও স্বভাব চরিত্র কীভাবে তার মন ও মানসিকতাকে পাল্টে দেয় সেই ছবি আমরা দেখতে পায় ব্রহ্মময়ীর বড় ছেলে লখিন্দর শর্মার মধ্যে। সে হ্যান্ডনোটের দালালি করে,অনেক নাবালক ছেলের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দু'পয়সা রোজগার করে। কিন্তু পরে একসময় জোচ্চুরিতে ধরা পড়ে তিন বছরের জন্য জেলে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভুষো মালের দালালি করতে শুরু করে। আর এসব করেই সে দুটো সংসার প্রতিপালন করে — একটা নিজের স্ত্রীর সংসার আর একটা তার রক্ষিতার সংসার।



ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VIII, Issue : XVII

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষিতার ছেলেপুলে এবং সংসারবৃদ্ধি ঘটেছে ও তার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়েছে। একেই তাদের খরচ, উপরন্ত তার আত্মীয় কুটুমরাও আসতে আরম্ভ করেছে। তাদের খরচও টানতে হয়, কেননা —

'বিশেষতঃ রাঁড়মহলে বাস কোরে যখন "লোচ্চা লখিন্দর" টাইটেল বেরুলো তখন ত আর তাদের সঙ্গে কুটুম-কুটুম্বিতে দুপয়সা না খরচ কোরে থাকতে পারি না! যা আনি - খুড়োমশাই, দুঃখের কথা বলবো কি, যা আনি - তার একটী পয়সা বাজে খরচ করি না, সব এনে - এই আমার ভোঁদড়ের মায়ের হাতে ফেলে দিই - তবুও কুলোয় না-"[১]

ভোঁদড়ের মা কুড়ুনিই সব টাকা নিয়ে নেয়, তারপরে সে মাকে দেবার পয়সা কোথায় পাবে ? যদিবা দেওয়ার কথা ভাবতো তার মাঝেই সে তার গহনা বন্ধক দিয়ে এক কিস্তি মাল আমদানি করে মহাজন হয়ে বসতে চায়। সেই জন্য এখন তার কাছে এক করা কানা কড়িও নেই। তাইবুড়ি মাকে দেখার থেকে মহাজন হওয়াটা তার কাছে জরুরী হয়ে পড়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার লখিন্দরের আর্থিক সংকট তার মানবিকতা বোধকেও তলানিতে ঠেকিয়েছে।

অজারাম শর্মার সমস্যাও লখিন্দর শর্মার মতোই। চুরি জোচ্চুরি করে সে মোক্তারি পাস করে কোনরকমে স্ত্রী-পুত্র ও বিধবা শালীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে দশটি সন্তান নিয়ে দিনগুজরান করছিল। কিন্তু মোক্তারি করতে গিয়ে শেষে এক বিধবাকে ঠকাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে জজ সাহেব তার নামটা রোল থেকে কেটে দেন। এর ফলে বাধ্য হয়ে সে হোমিওপ্যাথি বই কিনে আর এক বাক্স ওষুধ নিয়ে একটা ডাক্তারখানা খুলে ডাক্তারি করতে আরম্ভ করে। তাতে তার যা ইনকাম হয় সেই টাকায় মায়ের ভরণপোষণ করার কথা সে ভাবতে পারে না কারণ, "১০/১১টী ছেলেকে ভাসিয়ে - বিশেষ সেই এক গেরস্তোর মেয়ে, অপর কেউ নয়; মেগের বোন শালী, আমার জন্যে জাত,কুল, মান সব জলাঞ্জলি দিয়েছে, তাকে রীতিমত সুখে না রেখে তো আর আমি অপরের জন্য ভাবতে পারি না?"[২]

আসল বউয়ের মাত্র দুটি সন্তান। সুতরাং শালীর সন্তানদেরই দাপট বেশি, তাদেরকেই দেখতে হয় অজারামকে। তাদের পিছনেই তার ইনকামের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হয়। তাই বিধবা বৃদ্ধা মা তার কাছে একটা 'অপর' ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্রহ্মময়ীর তৃতীয় সন্তান ভয়ানকচন্দ্র শর্মা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার মনের কোন উন্নতি হয়নি। বাইরের বেশভূষা ও কথার চমৎকারিত্বে পাশচাত্য শিক্ষার কথা বলে উপায়হীনা বৃদ্ধা বিধবা মায়ের ভরণপোষণ নিতে অস্বীকার করে। অন্য দুই ভাইয়ের মত তার কোন রক্ষিতা নেই কিন্তু তার স্ত্রী মিসেস মদ্দামণি সকলের উপর দিয়ে চলে। তাছাড়া সে নিজেও অনেকটা মধ্যবিত্তসুলভ স্বার্থপর।

কিন্তু সেসব কথা উল্লেখ না করে সে ধর্মীয় বক্তৃতার ভঙ্গিতে প্রমাণ করতে চায় যে মা হচ্ছে সন্তানের পরম শত্রু কারণ,—

"তিনিই তো নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য আমাকে দশ দশটা মাস পেটে ধরিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া এই চিরপরিশ্রমের জগতে ছাড়িয়া দিয়েছেন —প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ — খাটিয়াই মরিতেছি! তিনি শত্রুর কার্য করিয়াছেন! তবে আমাদের এই মাথার ঘাম ফেলা, private school -এর secretary থেকে ঝাড়ুদারি পর্য্যন্ত করা টাকা - মাগের বিলাসে না দিয়ে - ছেলের সখে না খরচ কোরে কেন অমন পরম শত্রু মাতাকে খাওয়াইব?"[৩]

মধ্যবিত্তের পকেটে টাকা না থাকলেও শখ যোলআনা পূরণ করা চায়। অজারামের শালী তথা রক্ষিতা বাতাসি ও লখিন্দরের রক্ষিতা কুড়ুনি তাদের ট্যাঁপা—টেঁপীর (কুকুর-কুকুরীর) বিয়ের ব্যবস্থা করেছে প্রায় দুশো টাকা খরচ করে। গোটা বিশ্বে নাম ছড়াবে এই লোভ দেখিয়ে ভয়ানকচন্দ্র তাদের ব্রাহ্ম মতে বিয়ে দেয়। রেজিস্ট্রি করে সিভিল ম্যারেজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মধ্যবিত্তের তথা সেই সময়ের ব্রাহ্মদের বিবাহ বন্ধন বলতে যা বোঝাত সেই ছবি অতুলকৃষ্ণ মিত্র সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এইভাবে — "হে সুসভ্যা সুভব্যা টেঁপি গৃহিণি! তোমার পাষণ্ড ষন্ড পৌত্তলিকদের মতন ঘরে পুরিয়া রাখিব না, তোমার পিঠে স্বাধীনতার পাখা বাঁধিয়াদিব - তুমি যথা ইচ্ছা যাহার সহিত ইচ্ছা উড়িয়া বেড়াইবে - ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খাইবে - হোটেলে খানা খাইবে - আর আমার নাকে দড়ী দিয়া যথেচ্ছা টানিয়া লইয়া বেড়াইবে - তাহাতে বাধা দিব না - বাধা দিই ত তোমার পায়ের ক্ষুদেক্ষুদে শ্লিপার যেন অনবরত আমার মস্তকে পড়িতে থাকে। ..হে ভ্যাভাকান্ত ম্যাড়াকান্ত প্রাণকান্ত ট্যাঁপা ! তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া গুনে আটকা পড়িয়া ট্যাঁক ও পকেট বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া - তোমায় অনুগ্রহ করিয়া - আমি বিদ্যাবতী,বুদ্ধিমতী, রসিকা, প্রেমিকা, সুসভ্যা, সুভব্যা, টেঁপীরানী - আমার দেহ বিক্রয় করিতেছি। আমার প্রশস্ত ও পরিবর্তনশীল মন ও পরপুরুষ-প্রেমরসে ডুবু ডুবু প্রাণের সহিত তোমার কোন সংস্রব রহিবে না। আমি তোমায় নিত্য নূতন রঙ্গ দেখাইব -রঙ্গিণী বলিয়া কলিকাতার বাজারে বিখ্যাত হইব! সহচরি-সভায় নাম লিখাইব! তোমার ট্যাঁকখুলিয়া, পকেটঝাড়িয়া, বাক্স ভাঙ্গিয়া যত টাকা পাইব - সমস্ত আমার বিলাসে খরচ করিব! অকুলান হইলে তোমার নামে ধার করিব, তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে পরিশোধ করিবে- না করিলে একদিন দেখিব - দুদিন দেখিব, তিনদিনের দিন তোমার কপালে কলা ঠেকাইয়া অপরের কোলে গিয়া বসিব! মাথা খুঁড়িলেও ফিরিয়া আসিব না!"[৪]

শহরের অর্থনীতি চলে নগদ ক্যাশের উপর। ক্যাশ ছাড়া সেখানে কিছুই হয় না। তাই ভয়ানকচন্দ্রের ছেলে বেঁড়েবাবু মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সমস্যায় পড়লে বাবার কাছে দৌড়ে আসে ক্যাশ চাইতে। আবার তার মাও সহচরীসভা থেকে ফেরার সময় হুইস্কি খেয়ে রাস্তার





ধারে পড়ে থাকলে কনস্টেবল তাকেও হাজতে পুরে দেয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাকে পঁচিশ টাকা ফাইন করেন। সে টাকাও ক্যাশে দিতে হবে বলে বেঁড়েবাবু তার বাবার কাছ থেকে জোর করে টাকার পরিবর্তে হাতঘড়ি ও সোনার চেন নিয়ে ছুটে চলে যায়। শীল-পেয়াদা চল্লিশ টাকার জন্য অজারামের ওষুধের দোকান শীল করলে অজারাম মান- সম্মান বাঁচানোর জন্য তার শালী বাতাসীর কাছে চল্লিশ টাকা হাতে-পায়ে ধরে আদায় করেছে। আবার মধ্যবিত্ত অল্প পরিশ্রমে বেশি ফল আশা করে। তাই লখিন্দর ও কড়ুনী দুজনে আশা করেছিল দুর্ভিক্ষের বাজারে হাজার টাকায় হাজার টাকা লাভ হবে,তাই দুশোপঞ্চাশ মন চাল কিনে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তাদের কপাল মন্দ, সেই চালবোঝায় নৌকা লক্ষ্মীর দয়ে ভুস করে ডুবে যায়।

মধ্যবিত্তের অতিরিক্ত লোভ কীভাবে তাদেরকে নাকাল করে, তার ছবিও অতুলকৃষ্ণ মিত্র এই প্রহসনের মধ্যে দেখিয়েছেন। ব্রহ্মময়ীর তিন ছেলেই যখন তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে তখন ষণ্ডামার্ক, রংলাল এবং ব্রাহ্মময়ী তিনজনে মিলে যুক্তি করে তার ছেলেদের কাছ থেকে কীভাবে টাকা আদায় করা যায় তার ফন্দি আঁটেন। ষণ্ডামার্ক লখিন্দরকে বলে—'মা মরো মরো'। মার সিন্দুকে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আছে। তাদের মা আসলে কৃপণ তাই এসব এতদিন ছেলেদেরও জানতে দেয়নি। রংলালকে শতকরা দশ টাকা সুদে চারহাজার টাকা ধার দিয়েছে, চৈতন্য কবিরাজ তাদের মায়ের চিকিৎসা করছে, হয়তো আজকালই মারা যাবে। সেই জন্য সে মায়ের সিন্দুক দখল করার জন্য হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে এসেছে। তাকে বলে মায়ের তিনশোপঞ্চাশ টাকা ঋণ আছে সেই টাকা যে শোধ করবে তাকেই মা তার সমস্ত সম্পত্তি দেবে। সেটুকু তাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। লখিন্দর কড়ুনীর উৎসাহে ও আশ্বাসে সানন্দে সেই টাকা দিতে রাজি হয়ে যায়। এবং তারপর ষন্ডামার্কে সতর্ক করে লখিন্দর বলে অন্য কেউ যেন এ ব্যাপারে না জানতে পারে। লখিন্দর চলে গেলে অজারাম এবং ভয়ানকচন্দ্রর সঙ্গেও ষন্ডামার্ক একই রকম শর্ত করে। সকলেরই ধারনা অন্য দুই ভাই এই শর্ত সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ব্রহ্মময়ী শয্যাগতা। ষন্ডামার্ক এবং তার বোন তারা উপস্থিত, চৈতন্য কবিরাজ চিকিৎসায় নিয়োজিত, এমন সময় ভয়ানকচন্দ্র আসে। ভয়ানককে ষন্ডামার্ক বলে ওই টাকা দিয়ে যে মায়ের ঋণ শোধ করবে তাকে মা তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবে। তিনজনই এক এক করে মায়ের দেনা শোধ করবার জন্য সাড়ে তিনশো টাকা করে দিয়ে চলে যায়। কেউই কারো কথা জানতে পারে না। তারপর কবিরাজ বলে আর দেরি নায়, এবার গঙ্গা যাত্রার উদ্যোগ করতে হবে। তখন তারা কান্নার ভান করে। তার কান্না শুনে অজারাম ভয়ানকচন্দ্র লখিন্দর সকলেই ছুটে আসে এবং সকলেই সকলের মতলব বুঝতে পারে। তবুও তারা বেপরোয়া হয়ে সিন্দুকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর তাদের জ্ঞাতি খুড়ো রংলাল তাদেরকে নিরস্ত করার জন্য

লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বলেন এবং সিন্দুক খুলে এক একটি জুতোর মালা তিন ছেলের গলায় পরিয়ে দেন এবং তিনটি মুড়ো ঝাটার মালা বের করে তাদের তিন স্ত্রীকে পরিয়ে দেন। এই অবস্থায় তিন ভাইয়ের যখন মাথা গরম হয়ে ওঠে এবং একটা হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করে তখন রংলাল খুড়ো বলেন বাইরে দশজন জোয়ান বাগদী তিনি লাঠি হাতে বসিয়ে রেখেছেন, তখন অগত্যা তারা শান্ত হয় এবং তাদের মা ব্রহ্মময়ী অর্থলোভী সন্তানদের ধিক্কার দেন।

যে ছেলেরা বিভিন্ন অজুহাতে তাদের মায়ের দেখাশোনার ভার নিতে অস্বীকার করেছে কৌশলে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে ব্রহ্মময়ী ও তার বিধবা মেয়ে তারার বাকী জীবনটা অতিবাহিত করার ব্যবস্থা করে এ প্রহসনের সমাপ্তি ঘটেছে। এরকম ভাবেই অতুলকৃষ্ণ মিত্র এই প্রহসনে উদ্ভূত সংকট ও সেই সংকটগুলি থেকে উত্তরণের ছবি তুলে ধরেছেন।

**তথ্যসূত্র :**

১। অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অতুল-গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ), বসুমতী কার্যালয়, ১৩১৫, কলকাতা -১২, পৃষ্ঠা-২৮০
২। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৮২
৩। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮২
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৬



## সৃজনকর্মে সমকালীন ভাবনা এবং শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যনির্মাণ

**ড. শর্মিলা ঘোষ**

সমকালীন ভাবনা শম্ভু মিত্রের সৃজন প্রক্রিয়ায় কাজ করেছে বিশেষ তাৎপর্যে। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সেকথা বিশেষভাবে সত্য। একেবারে প্রথম পর্ব থেকেই তাঁর নাট্য প্রযোজনায় সমকালীন প্রেক্ষাপট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে একটি সাক্ষাৎকারে শম্ভু মিত্র স্পষ্টভাবেই বলেছেন ‘মনে হয় আমি এতদিন যা করেছি সবারই পেছনে বোধহয় কোথাও একটা চেষ্টা আছে আমার চারপাশের এই রিয়ালিটিকে বোঝবার বা ছোঁবার। এরকম একটা চেষ্টা বোধহয় আছে, মানে যখনই যে নাটক করে থাকি, যেমনভাবেই করেছি— বোধহয় এ ধরনের একটা চেষ্টা আছে। নবনাট্য বা গণনাট্য বা যাই হোক সেইসব সেই সূত্রেই আনা।’[১]

উপরের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে নির্দেশক শম্ভু মিত্র একেবারে প্রথম থেকেই চারপাশের বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন তাঁর নাটকে। আর তার ফল স্বরূপ ‘সমসময়’ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তাঁর প্রযোজনায়।

তবে একথাও সত্য যে নির্দেশক শম্ভু মিত্রের প্রথম পর্বের নাট্যপ্রযোজনায় সমসময়ের যে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তী ধ্রুপদী পর্বের নাট্য প্রযোজনায় তা যেন কিছুটা অপ্রত্যক্ষ, আবার শেষ পর্বে শম্ভু মিত্র বেছে নিচ্ছেন একেবারে সমকালীন নাটককাদের নাটক যার মধ্যে দিয়ে সমকালের স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা রূপ পেয়েছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে।

আমরা এই প্রবন্ধে পেশাদারী মঞ্চ ত্যাগ এবং বহুরূপী প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী পর্বে শম্ভু মিত্রের নাট্য প্রযোজনায় আর সমকালীন ভাবনা এবং সমসময়ের অভিঘাত দেখাতে চেষ্টা করব।

১৯৪২ সালে পেশাদারী মঞ্চ ছেড়ে শম্ভু মিত্রের বেরিয়ে আসা এবং ওই বছরই ‘ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ প্রতিষ্ঠা এক আশ্চর্য সমাপতন সন্দেহ নেই। বন্ধু বিনয় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্যের সূত্রে শম্ভু মিত্র সেখানে যোগ দিলেন ১৯৪৩ সালের প্রথমদিকে। প্রাথমিকভাবে নির্দেশক হতে না চাইলেও এখানে যোগ দিয়ে শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল ‘অন্যদের একটু দেখিয়ে- টেকিয়ে না দিলে এ অভিনয়গুলো হবেই না। মানে করাই যাবে না। সেজন্য আমাকে খানিকটা বাধ্য হয়ে ওই অপরকে দেখানোর কাজ শুরু করতে হল, নইলে ওইটে (নির্দেশক) হবার ইচ্ছেই আমার ছিল না।’[২]

শম্ভু মিত্র নির্দেশিত প্রথম নাটক বিনয় ঘোষের ‘ল্যাবরেটরি।’ ১৯৪৩ এর মে মাসে কলকাতার নাট্য ভারতী রঙ্গালয়ে বিজন ভট্টাচার্য রচিত ও নির্দেশিত “আগুন” নাটকটির

সঙ্গে "ল্যাবরেটরি" নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। আবার মে মাসের শেষ দিকে ২২ থেকে ২৫ শে মে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে "ল্যাবরেটরি" অভিনীত হয়।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম বুলেটিনে ল্যাবরেটরি নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনা ও অভিনয়ের অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছিল।

The Bengali Play– or rather the last scene of the play 'Laboratory' had certain dynamic qualities which were good. The technique of using slogans from offstage rising up into a crescendo gave the play its dynamic quality and should be recommended to all other groups to be used whenever suitable. The acting in the Bengali Play was certainly about the best in the whole show.'[৩]

ল্যাবরেটরি নাটকের শেষ দৃশ্যে ধীরে ধীরে স্লোগান ব্যবহারের কৌশল অথবা এক বিরাট সংখ্যক মানুষের কোলাহল কল্পনায় ধরা দেবার প্রসঙ্গে মনে হয় নবান্ন নাটকের প্রথম দৃশ্যের পরিকল্পনা বুঝি এরই পরিবর্ধিত এবং পরিবর্তিত রূপ। যদিও শম্ভু মিত্র তেমনটা কখনো বলেননি। নবান্ন নাটকের প্রথম দৃশ্যের জন্য তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর "দিগ্বিজয়ী" নাটকের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন তাঁর নানা লেখায়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ল্যাবরেটরি নাটকের শেষ দৃশ্য এবং নবান্ন নাটকের প্রথম দৃশ্যের প্রয়োগ ভাবনায় কোথাও যেন মিল রয়েছে।

শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় পরবর্তী নাটক বিজন ভট্টাচার্য্যের "জবানবন্দী"। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর সংখ্যা অরণি পত্রিকায় এর প্রথম প্রকাশ। প্রথম অভিনয় ১৯৪৪ এর ৩রা জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে। জবানবন্দী থেকেই শুরু হলো শম্ভু মিত্র - বিজন ভট্টাচার্যের যুগলবন্দী, যা এর পরবর্তীতে "নবান্ন" নাটকে পৌঁছে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। '৪৩ এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা "জবানবন্দী" নাটকে সময়ের বিভিন্ন ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট। আবার শম্ভু মিত্রের নির্দেশনার ক্ষেত্রেও এই নাটক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বলা বাহুল্য শম্ভু মিত্রের সমকালীন ভাবনা কোন না কোনভাবে এই নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই তিনি এই নাটকটিকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর প্রয়োজনায়।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক লিখেছেন —'গোটা সাংস্কৃতিক জগতে তোলপাড় শুরু হয়েছে তখন। সীমানা ভাঙছে — অরাগঁ, এল্যুয়ার, মাতিস, পিকাসো, পিসকাটর,ব্রেশট, নেরুদা থেকে এই ভারতে এক ঝাঁক মানুষ নতুন করে জীবনের সত্য খুঁজতে চাইছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — বাংলার কুখ্যাত দুর্ভিক্ষ— স্বাধীনতার আন্দোলন নতুন শব্দে জীবনের প্রকাশ চাইছে। শম্ভু মিত্র তাদেরই অন্যতম হয়ে সৃজনের কাজ শুরু করলেন।'[৪] মনে রাখতে হবে এর





কিছুদিন আগেই পেশাদারি মঞ্চ ছেড়ে এসেছেন তিনি। সেই অভিনয় ভঙ্গি পরিত্যাগ করে এক ভিন্ন অভিনয় ধারার সন্ধান তিনি করছিলেন। আর তাকেই রূপ দিতে লাগলেন ধীরে ধীরে। ল্যাবরেটরি থেকেই সে কাজ শুরু হয়েছিল। জবানবন্দী নির্দেশনায় শম্ভু মিত্র আরো এক নতুন দিশা দেখালেন বাংলা নাটককে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্মেলক অভিনয়ের গ্রন্থনার দিকে বিশেষ জোর দেওয়ার প্রসঙ্গটি। জবানবন্দি নাটকে শম্ভু মিত্র এই কাজটি করেছিলেন। কারণ তিনি পেশাদারী মঞ্চের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলেন যে এই দিকটাকে খুব অবহেলা করা হয়। ফলে 'অভিনয়ে হাঁটা-বসা ও সংলাপ বলার মধ্যে সেই পরিমিতি ও তীক্ষ্ণতা থাকে না যাতে দৃশ্যের নিহিত নাটকীয় তীব্রতা স্পষ্ট হয়।'৫। জবানবন্দী নাটকে সে বিষয়ে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন শম্ভু মিত্র এবং অভিনয়ে সেই নাটকীয় তীব্রতা নিয়ে আসতে সফল হয়েছিলেন।

শুধুমাত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রে নয়, নাট্য প্রয়োগের অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও শম্ভু মিত্র বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। মঞ্চ সজ্জায় স্টার থিয়েটারের কাঠের ফ্রেমগুলো উল্টো করে দাঁড় করিয়ে ব্যবহার করা হতো। তার ফলে পরান মন্ডলদের সামাজিক অবস্থান মানুষের কাছে প্রকাশিত হবে, সামাজিক ঔদাসীন্যের নগ্নরূপ টা কিছুটা স্পষ্ট হবে এমনটাই মনে হয়েছিল শম্ভু মিত্রের।

একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন জবানবন্দীর প্রথম দৃশ্যটা কিছুটা আবছা আলোয় করা হত। প্রথম দৃশ্যের শেষ অংশে গ্রাম ছাড়ার সময় পরান মন্ডল এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকত এবং আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সেই মাটি গলে গলে পড়তে থাকত। এবং এই শেষের জায়গাটা একটু প্রোলং করা হতো। তাঁর কথায় —'সেন্টিমেন্টের যা কিছু ব্যাপার তা এই দৃশ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পরের দৃশ্যগুলো প্রখর আলোয় করা হতো। একেবারে স্টার্ক— উলঙ্গ করে দেখানো —ক্রুয়েলটিটা দেখানো— ক্রুরতাটা স্পষ্ট করতে চেয়েছিলাম।'[৬]

অর্থাৎ জবানবন্দী নাটকের বক্তব্য বিষয় যেমন সমসময়কে প্রকাশ করছে তার সমস্ত ক্ষত চিহ্ন নিয়ে, অন্যদিকে এর রূপনির্মাণে প্রয়োগকলার নতুন নতুন নিরীক্ষাকে নিয়ে আসছেন নির্দেশক। শম্ভু মিত্রের সমকালীন ভাবনা কাজ করছে জবানবন্দী নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে। নির্দেশকের এই নতুন ভাবনাকে, প্রয়োগকলার এই নতুন পরীক্ষাকে গ্রহণ করছেন দর্শক সমালোচক।

বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক জবানবন্দী সম্পর্কে লিখেছেন 'বাংলা নাটক বাঙালির জীবনী নেমে আসতে চাইছে এবং সে কাজটা এত চমৎকারভাবে সম্পন্ন হচ্ছে যাতে নাটকের সামাজিক উদ্দেশ্যও আরো সার্থকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।'[৭] কথাটি সত্য কিন্তু শুধু বাঙালি জীবনে তো নয়, নেমিচাঁদ জৈনের অনুবাদে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় হিন্দিতে অভিনীত হল

"জবানবন্দী" নাটকের হিন্দি অনুবাদ — 'অন্তিম অভিলাষ।' এই নাটকের হাত ধরে সারা ভারতবর্ষের কাছে পৌঁছল আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের নতুন ভাবনাচিন্তা। অধুনা মুম্বাই এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এই নাটক। জানা যায় এই অভিনয় থেকে লক্ষাধিক টাকা বাংলার রিলিফের জন্য তোলা হয়েছিল। "জবানবন্দী" নাটকে কোন চরিত্রে অভিনয় না করলেও হিন্দি প্রযোজনায় নির্দেশক শম্ভু মিত্রই প্রধান চরিত্র পরান মন্ডলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অন্তিম অভিলাষ দেখে বম্বে ক্রনিকল পত্রিকায় খাজা আহমেদ আব্বাস লিখেছিলেন,

"The play–Antim Abhilash–directed with forceful imagination by Sombhu Mitra– is instinct with utter realism. 'Sombhu Mitra's own characterisation of Paran– the old peasant–is one of the most memorable performances I have ever seen on the stage or screen." (বম্বে ক্রনিকল, খাজা আহমেদ আব্বাস)।

গণনাট্য সংঘের পরবর্তী নাটক "নবান্ন"। বিজন ভট্টাচার্যের লেখা এবং শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যুগ্ম পরিচালনায় এই নাটকে মন্বন্তর তার সমস্ত ক্ষত চিহ্ন নিয়ে প্রকাশিত হলো এক ব্যাপ্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্যে। ১৯৪৪ এর ২৪ শে অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে "নবান্ন" অভিনয় ইতিহাস সৃষ্টি করল। আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের সূচনা হলো "নবান্ন" অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এমনটা মনে করা হয়। একদিকে শম্ভু মিত্রের দ্বারা প্রয়োগ কৌশলের নানা দিক সম্পাদন আর অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্য্যের অব্যর্থ ডায়লেক্ট উচ্চারণ শিক্ষা, অসামান্য অভিনয় শিক্ষা এবং গানের তালিম এইসব মিলে "নবান্ন" প্রযোজনা এক চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করতে পেরেছিল।

শম্ভু মিত্র "নবান্ন" নাটকটির ব্যাপক সম্পাদনা করেছিলেন। বইটি যেভাবে ছাপা আছে, সেভাবে অভিনয় করা হয়নি। অনেক এডিট করা হয়েছিল। দৃশ্যসজ্জায় চটের পর্দার ব্যবহার এই নাটকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ ধরনের প্রয়োগ বাংলা নাটকে একেবারেই প্রথম। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পরামর্শে শম্ভু মিত্র এটি করেছিলেন। এরই সঙ্গে সামান্যতম উপকরণ ব্যবহার করে দাতব্য চিকিৎসালয়ের দৃশ্যটি বাস্তব করে তোলা হয়েছিল। একটা টেবিল, একটা কি দুটো চেয়ার ও একটা বেঞ্চি এই সামান্য আসবাব দিয়ে দৃশ্যটি সাজিয়ে লালসালুতে সাদা অক্ষরে লেখা থাকতো দাতব্য চিকিৎসালয়। এই সামান্য আয়োজনেই দর্শক কিন্তু মেনে নিয়েছিল, বিশ্বাস করেছিল যে এটি একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। কোন অসুবিধা হয়নি অভিনয়ের ক্ষেত্রে। একই রকম অনাড়ম্বর ভাবে একটা রেলিং আর একটা বেঞ্চির সাহায্যে পার্কের দৃশ্য তৈরি হয়েছিল এবং তা দর্শকদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিল। বস্তুত এর আগে বাংলানাট্যে এমন সোজাসুজি





দর্শকের কাছে কোন স্থানের পরিচয় দেওয়া হয়নি সম্ভবত। এর ফলে দর্শক সোজাসুজি সংযোগ স্থাপন করতে পারলেন মূল নাট্যভাবনার সঙ্গে। এবং বাংলা নাটক অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারল তার প্রয়োগ কলার ক্ষেত্রে। শম্ভু মিত্র পরবর্তী কালে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন —"It was just written "Charitable Dispensary" with a chair and a table and the people accepted it as the real location. We didn't need to put up sets. They took it for granted because they didn't want to know– what a charitable dispensary looks like– perhaps they have seen enough. They wanted to know the human beings who were there– not the sets.'[৮]

নবান্ন নাটকের প্রয়োগ সংক্রান্ত এই আলোচনায় পোশাক এবং সাজসজ্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছেঁড়া চট এবং নোংরা কাপড় পরানো হয়েছিল চরিত্রদের। সাজসজ্জা ও মেকআপে একেবারে বাস্তবিক দুর্ভিক্ষের মানুষগুলি যেন মঞ্চে উঠে এসেছিলেন বলে মনে করেছিলেন বিভিন্ন সমালোচকরা। নবান্ন নাটকের প্রয়োগ ভাবনায় আরেকটি অসামান্য সৃজন এর আবহ সৃষ্টির পরিকল্পনা। দুই দৃশ্যের মাঝে "ফ্যান দাও", "ফ্যান দাও" ধ্বনি কোরাসে দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় এই চিৎকার পথে ঘাটে শোনা যেত। ফলে দর্শকদের কাছে এটা অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য এ ধরনের আবহ ইতিপূর্বে কখনো বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যে প্রয়োগ করা হয়নি।

এখানে বলা প্রয়োজন একেবারে কিশোর বয়স থেকেই পেশাদার মঞ্চের একজন নিয়মিত দর্শক ছিলেন শম্ভু মিত্র। এর ফলে পেশাদার মঞ্চের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা এবং অসামান্য কিছু অভিনয় দেখা ছিল তাঁর। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার নানা সূত্র তিনি প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর নির্দেশনার ক্ষেত্রে। কিন্তু পরবর্তীকালে একজন অভিনেতা রূপে পেশাদারী মঞ্চে যোগ দেবার পর সেই মান তিনি আর খুঁজে পাননি। ফলে বেরিয়ে এসেছিলেন পেশাদার থিয়েটার ছেড়ে। তাঁর মনে হয়েছিল যে পেশাদার তকমা নেওয়ার মতো মূল্য এই থিয়েটারের নেই। ..'ওই থিয়েটার তার নির্দিষ্ট কাজটাই ঠিকভাবে করতে পারছে না। একটা থিয়েটার তার সমাজের জন্য যা যা করতে পারে, করা উচিত তার কিছুই হচ্ছিল না। এই অনুভব থেকেই পেশাদার মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।'[৯]

এই সময় থেকেই একটা অন্য ধরনের থিয়েটারের কথা ভাবছেন তিনি। যদিও তার রূপটা কি হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি। সেই ধারনাটাই গড়ে উঠল প্রথমে "ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে" যোগ দেবার পর "ল্যাবরেটরি" এবং তারপর গণনাট্য সঙ্গে যুক্ত হয়ে "জবানবন্দী" ও "নবান্ন" নাটক পরিচালনার মধ্যে দিয়ে।

শম্ভু মিত্রের সমকালীন নাট্য ভাবনা প্রকাশ্যের ক্ষেত্রে এবং নাট্য প্রযোজনায় প্রয়োগ কৌশলগত নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এই তিনটি নাটক বিশেষত "জবানবন্দী" এবং "নবান্ন" বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শম্ভু মিত্র বিজন ভট্টাচার্য্যের যুগলবন্দী বাংলা থিয়েটারকে একটি নতুন দিকনির্দেশ করেছিল। থিয়েটারের দর্শক মহৎ কিছু দেখার আস্বাদ অনুভব করেছিলেন। একটি দেশ বা জাতির নিজস্ব সত্তাপরিচয়ের অন্বেষণ শুরু হয়েছিল "নবান্ন" থেকে এমনটা বলা যেতে পারে। আর সে কারণেই নবান্ন একটি ছাঁচভাঙ্গা প্রযোজনা হয়ে উঠতে পেরেছিল।

নির্দেশক শম্ভু মিত্রের সৃজন কথাকে বুঝতে হলে, তাঁর সৃষ্টির গভীরে ঢুকতে হলে বহুরূপী পূর্ববর্তী এই গণনাট্য সংঘের পর্বটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

**তথ্যসূত্র :**


১। "শম্ভু মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—"সুবীর রায়চৌধুরী, বহুরূপী পত্রিকা, মে ১৯৯৫।

২। ঐ।

৩। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম বুলেটিন থেকে প্রাপ্ত। (সৌজন্য —নাট্যশোধ সংস্থা)

৪। দেবাশিস মজুমদার। নাট্যচিন্তা বর্ষ ৩৪,সংখ্যা ১-৬।

৫। শম্ভু মিত্র, কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছান গেল। সন্মার্গ সপর্যা।

৬। "প্রশ্নের উত্তরে শম্ভু মিত্র" — চিত্তরঞ্জন ঘোষ গৃহীত সাক্ষাৎকার। বহুরূপী পত্রিকা, জুন ১৯৭০।

৭। শেখর সমাদ্দার, "শম্ভু মিত্রের নাট্য সাধনা" "বাংলা নাট্য সংস্কৃতি ইতিহাস" প্রথম সংস্করণ, প্রয়াগ,কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০।

৯। শেষ সাক্ষাৎকার। সানন্দা। জুন ১৯৯৭।




## 'নলিনী'র নামভূমিকা থেকে 'মায়ার খেলা'র প্রমদা : 'মর্মে যে ক্রন্দন তন্বী'

**প্রীতম চক্রবর্তী**

'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।'[১] এই 'অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটক' ছিল 'নলিনী'। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদেয় তথ্য থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পর (এর মাঝে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরন্ময়ীও বিবাহ হয়েছিল) একটি আনন্দ-উৎসবের উদ্যোগ নিয়ে নাটকটি লেখা হয়েছিল। অনুমান করা হয়, নাটকটি কবির একক রচনা নয়, কারণ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী এই রচনার যে পাণ্ডুলিপিটি রবীন্দ্রভবনে দিয়েছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—'আনন্দ-উল্লাসকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার জন্য একটি অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইল। যৌথ-রচনা— বিবাহ-উৎসবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তরুণ-তরুণীরা স্থির করিলেন যে নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং। সেইজন্য মোটামুটিভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপরজন তাহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে অভিনেতা-লেখকদের হাতে-হাতে ঘুরিয়া একটা জিনিস খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যায় না। নাটক এভাবে বারোয়ারি সমবায়-পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয় না। শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়াকে ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম রাখা হইল 'নলিনী'। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম। ইহাই তাঁহার প্রথম গদ্য-নাটক।'[২] অনুমান করা হয় কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক প্রয়াণের কারণে এই নাটক অভিনীত হয়নি।

'গদ্য-নাটক'টির বিষয় নলিনী ও নীরদের প্রেম যার মধ্যে ছিল বিচ্ছেদ-বেদনা—

দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল রয়ে।
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল কয়ে।।

কিন্তু 'নলিনী' নাটকে নায়ক-নায়িকার 'চিরদিন ছাড়াছাড়ি' হয়নি, বরং নীরজার অকালমৃত্যু মিলন ঘটিয়েছে নীরদ ও নলিনীর। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্যাস 'মালঞ্চে' আদিত্যের 'নন্দনবনের ইন্দ্রাণী' বা 'রংমহলের সাকী' নীরজার মৃত্যুর মতো বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা না আনলেও নাটকের হতভাগিনী নীরজা নলিনীর কাছে 'দুঃখের স্মৃতিমাত্র' হয়ে থাকেনি। নাটকের নীরজা মহৎ আদর্শে গড়া চরিত্র। তবে নলিনী সেখানে খণ্ড চরিত্র মাত্র, তার রূপ কিছুটা পরিপূর্ণ হয়েছে 'মায়ার খেলা'য় পৌঁছে।

নলিনী চরিত্রের বিরহ আর মিলন ছড়িয়ে পড়েছে 'মায়ার খেলা'র শান্তা ও প্রমদার মধ্যে। স্বর্ণকুমারী দেবীর মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত হবে, এমন উদ্দেশ্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্য লিখেছিলেন 'শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে' এবং তাঁকেই বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। বিজ্ঞাপনে জানিয়েছিলেন 'ইহার আখ্যানভাগ কোনো সমাজ বিশেষে দেশ বিশেষে বদ্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজ নিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীতভাবে ভরসা করি এই গ্রন্থে সাধারণ মানবপ্রকৃতি বিরুদ্ধ কিছু নাই।'[৩] বলা বাহুল্য, সঙ্গীতের বৈচিত্র্যে ও বিন্যাসে এর 'আখ্যান গ্রহণ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ' হতে পারে, এমনটা অনুমান করেই রবীন্দ্রনাথ এর কাহিনি গদ্যে সংক্ষেপে জানিয়েও দেন। মূলত গানের সুরে নরনারীর মিলন-বিচ্ছেদের অনুভূতি, প্রেমের উন্মেষ-বিকাশ ও পরিণতিকেই তুলে ধরেছেন স্রষ্টা। শান্তা নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে চেয়েছিল অমরের কাছে; অমর সেই অনুভূতি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। মায়াকুমারীরা গেয়েছে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

এরপর অমর যার কাছে পৌঁছেছে, সে প্রমদা।
প্রমদা বহু সখী পরিবেষ্টিতা, যাকে ঘিরে লাবণ্য ফুটে ওঠে তরুতলে। সে যেন বৃন্দাবনের রাধিকা। সখীরা তাকে বাসকসজ্জায় সাজায়। কিন্তু এ নারীর জীবনে প্রিয়-পুরুষ অনুপস্থিত। বিশেষ পুরুষের প্রতি প্রমদার নেই কোনো আকর্ষণ। তাই সখীদের প্রশ্ন—

আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে।

কিন্তু প্রমদার কাছে ভালোবাসা 'মিছে কথা'- 'জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া/ জীবনের সুখ নাশা।' প্রকৃত প্রেমের সাধারণ লক্ষণে মিশে থাকে যে আত্মনিবেদন, তার প্রতি সুতীব্র অনীহা প্রমদার। সে একেবারে সহ্য করতে চায় না 'সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা' 'পরের মুখের হাসি'র জন্য নিজেকে ভাসাতে চায় না অশ্রুসাগরে। তাই কুমারের নিবেদিত প্রেমের প্রত্যুত্তরে অনায়াসে বলে যায়—

কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই।





বনের 'হা-হুতাশ', লতার দীর্ঘশ্বাস কিংবা ভেসে আসা ফুলের সুবাস হেলায় অগ্রাহ্য করে প্রমদা। অশোকের প্রেমের প্রত্যুত্তরেও প্রমদার অনীহাই প্রকাশ পেয়েছে; প্রেম তার কাছে 'ছল' মাত্র প্রেমের জন্য 'আঁখিজল' প্রমদার কাছে 'মিছে'—

জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল।

প্রমদার প্রেম-ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান শান্তার, সে ভালোবেসেছে অমরকে। অমরের প্রতি শান্তার ভালোবাসার গভীরতা ধরা পড়ে তারই গীতাংশে—

তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো।
...
যদি আর-কারে ভালোবাসো,
যদি আর ফিরে নাহি আসো,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও
আমি যত দুখ পাই গো।

প্রমদা কিন্তু এই 'দুখ'-এর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে গিয়েই অস্বীকার করেছে প্রেমকে। প্রমথনাথ বিশীর কথায় 'প্রমদা ও নলিনী প্রেমের মোহ। শান্তা ও নীরজা প্রেমের আশ্রয়; চোখ মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের অল্প, কিন্তু জীবন স্নিগ্ধ করিবার ক্ষমতায় তাহারা অসাধারণ।'[৪] অর্থাৎ 'প্রেমের মোহ বা রোমান্সের চেয়ে মানুষের পক্ষে প্রেমের আশ্রয়ের প্রয়োজন বেশি' এই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে শান্তা ও প্রমদার পরিপূরক অবস্থানে।

অশোক বা কুমারের ভালবাসাকে অবহেলায় অস্বীকার করলেও অমরের 'আকুল অধর আঁখি'কে হেলায় সরাতে পারেনি প্রমদা। 'প্রেমপাশে ধরা' পড়লেও 'অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল, প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে সখীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া অমরকে প্রচুর ভৎসনা করিল। সরলহৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝিয়া হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া গেল। ব্যাকুলহৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবকাশ পাইল না।' এতদিন অশোক বা কুমারের মতো প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষদের ফিরিয়ে দিয়েছে প্রমদা, এবার নিজের কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে তৈরি হয়ে গেল ব্যবধান। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা' গ্রন্থে জানাচ্ছেন 'প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মনোভাব এই গীতিনাট্যে লক্ষ্য করা যায়। সেটি তাঁহার প্রথম বয়সের 'কবি-কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র মধ্যেও পাওয়া যায়। কামনার বস্তুকে নিকটে থাকিতেও ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়া দূরে তাহাকে

খুঁজিতে গেলে মানুষ তাহাকে পায় না, নিকটের বস্তুকেও হারায়।—

"কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।"

প্রেম সম্বন্ধে কবির আর একটি বিশিষ্ট মত এই যে, দুঃখ আর বিরহের আগুনে পরিশুদ্ধ না হইলে প্রেম সত্যকার ও পরিপূর্ণ হইতে পারে না।'[৫] এই বিরহানলে পুড়ে অমর শান্তার পুনর্মিলন বলা ভালো সত্যকার মিলন, যে মিলনের পটভূমিতে এসেছে 'মধুর বসন্ত'। অমরও বুঝেছে নিজের ভুল। কিন্তু অমরের প্রেমের উন্মেষে প্রমদার ভূমিকা অনুভব করেছিল শান্তা—

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে!
...
পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দলে।

শান্তা অমরের মিলনকুঞ্জে এসেছে প্রমদা। 'নলিনী' নাটকে প্রায় একইরকম পরিস্থিতিতে 'শীর্ণ-মলিন' বেশে প্রবেশ করেছিল নাম-চরিত্র, যাকে দেখে নীরদ বলেছিল 'এ কি নলিনী না নলিনীর স্বপ্ন', এখানেও অমর প্রমদাকে দেখে একাধিকবার বলেছে—

এ কী স্বপ্ন! এ কী মায়া!
এ কী প্রমদা! এ কী প্রমদার ছায়া!

তার 'কুসুমকোমল' হৃদয় ঝরে গেছে 'অনাদরে'। সে আর আগের মতো সগর্বে বলতে পারে না—

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।

বরং হাহাকার করে তাকে বলত হয়েছে

কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে।
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলি নে।

শান্তা দুঃখের পাথার অতিক্রম করে পেয়েছে অমরকে, বিরহানলে পুড়ে সে খাঁটি সোনা। তাই শেষ গীতি-সংলাপে বলে যায়—

তোমার সকল দুখ আমি সহিব
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন,
তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।





অন্যদিকে প্রমদা নিবেদিত প্রাণ হতে পারেনি। অশোক বা কুমারের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল তার অহংকার। নিজে ধরা না দিয়ে 'পরশ-পুলকরস'-এর মধ্যে নিজের নামকে সে সার্থক করে তুলেছিল। শান্তা ও প্রমদা এই দুই নামকরণেও রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের ব্যঞ্জনাকে ধরছেন। শেষ পর্যন্ত 'বৃথা অভিসার' শেষে অন্তিক উত্তরণ অবশ্য ঘটেছে প্রমদার, নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেই করুণ পরিণতিকে স্বীকার করে নিয়েছে—

তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না।

এই পরিণতি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 'দুঃখকে বাদ দিয়া প্রেমের কল্পনা তিনি করেন নাই। মায়ার খেলার অবসান প্রেমে, কিন্তু সে প্রেম দুঃখের সঙ্গে জড়িত। শান্তা, অমর, প্রমদা কেহই সুখী হইল না, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রেমের স্বরূপকে চিনিতে পারিল ইহা সুখ না হইলেও মহৎ সান্ত্বনা।'[৬]

অনেক পরে, 'প্রথম সংস্করণের কিছু গান বাদ দিয়ে ও পরে লেখা কিছু গান যুক্ত করে' ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা'কে নৃত্যনাট্যের রূপ দিলেন ('নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা')'... গীতিনাট্যের যুগ অবসিত হয়ে, নৃত্যনাট্যের যুগ এসে তাঁর সৃষ্টি ঐশ্বর্য যখন ভরিয়ে তুলেছিল, তখন তিনি এটিকে আবার নৃত্যনাট্য রূপ দেবার আয়োজন করেছিলেন। ১৯৩৮ এর দোল পূর্ণিমার রাতে সেই আয়োজনের অংশবিশেষ একটিবার অনুষ্ঠিত হয়ে কালের বুকে প্রায় নীরব হয়ে আছে।'[৭] এই নব-সংরূপে প্রমদা চরিত্র এবং নাট্যকাহিনিতে বেশ স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন স্রষ্টা। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'-র গঠন বা নির্মাণ কৌশলের পরিচয় দিতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার জানিয়েছিলেন 'মায়ার খেলার গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।'[৮] এই 'সত্যকার নারী'-কেই অমর বলেছে 'চিরবিরহের সাধনা'। শান্তা সেখানে লজ্জিত হয়েছে, নিজে সরে গিয়ে অমরের পাশে বসিয়েছে প্রমদাকে—

আমি নাই, আমি নাই
আদরিনী লহো তবে ঠাঁই যেথা তব আসন বিরাজে।

নৃত্যনাট্যে গীতিনাট্যের বেশ কিছু গান বর্জিত হয়ে একাধিক নতুন গানের সংযোজন ঘটেছে, 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের সখীর গান 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা' শোনা গেছে প্রমদার সখীর কণ্ঠে। কিন্তু সবচেয়ে বড় বদল ঘটেছে নৃত্যনাট্যের সমাপ্তিতে। প্রমদা ও অমরের মিলনে অন্যান্য স্ত্রী চরিত্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়েছে শান্তা—

শুভ মিলনলগনে বাজুক বাঁশি,
মেঘমুক্ত গগনে জাগুক হাসি।

'মায়ার খেলা' সম্বন্ধে অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন 'মায়ার খেলা' 'মানসী' যুগে লিখিত হয়। 'মানসী' কাব্যের মধ্যে যে নিষ্ফলতার কারুণ্য এবং অপ্রকাশের বেদনাময় সুরটি প্রতিধ্বনিত, তাহা এই নাটকেও ফুটিয়াছে। দুরাশায় বুক বাঁধিয়া কল্পিত প্রেমের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলে কেবল ব্যর্থ হইতে হয়, প্রেম যে ধরা দিবার জন্য সাগ্রহ বাহু প্রসারিত করিয়া আমাদের পাশেই বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা জানিলে প্রেমকে পাওয়া যাইবে। নাটকটির দ্বিতীয় কথা দুঃখ ও বিচ্ছেদের হোমাগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারিলেই প্রেমের খাঁটি পরিশুদ্ধ রূপের সহিত পরিচয় হয়। আত্মসুখের জন্য প্রেম আশা করিলে সুখ নষ্ট হয়, প্রেমও মিলে না।'[৯] গীতিনাট্যের শেষে মায়াকুমারীদের কণ্ঠে শুনি—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম
প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়।
এমনি মায়ার ছলনা।

সেই মায়ার টানে যখন অমরের কাছে প্রমদা এসেছে, ততক্ষণে অমর-শান্তার 'মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি'। সেখানে প্রমদা 'শরতের মেঘ' হয়ে দাঁড়িয়েছে চাঁদের সভাতে। অমরের কাছে সে ছায়ামাত্র; বসন্তের ফুল আর মিলনের বংশীধ্বনির মানে প্রমদা সম্পর্কে সখীদের ভাবনা—

সখীর হৃদয় কুসুমকোমল
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়!
...
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখীজনে যেন দেখিতে না পায়।

প্রমদা ও অমরের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল শান্তারও 'গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে'। নিজেকে সে সরিয়ে নিতেও চেয়েছিল—

আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে।

চপলা প্রমদা নয়, বিরহিনী প্রমদাকে দেখে শুধু শান্তা বা অমর নয়, প্রমদার আরেক পাণিপ্রার্থী অশোকও বুঝেছে—

হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ননীরে।

বেলা যে ফুরিয়েছে, সে অনুভূতি জেগেছে 'দলিত কুসুম'-সম প্রমদারও। যে একসময় বলেছিল 'কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই' অথবা 'সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন মনে', তারই কণ্ঠে শুনি শূন্যতার প্রতিধ্বনি—



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ফুরায়ে গিয়েছে বেলা এখন এ মিছে খেলা
নিশান্তে মিলন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।

তার মলিন মালা গ্রহণ করেনি অমরও। 'ম্লান আলো', 'ম্লান আশা', 'চিরবিষাদ' কিংবা 'নীরব নিশানা' অমরের এসব অনুভূতি নিয়ে তাকে গ্রহণ করেছে শান্তা যে 'ভুল ভাঙা দিবালোকে' প্রেমাস্পদকে শোনাতে চায়- 'প্রশান্ত সুখের কথা'। আর এসবের মাঝে জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছে প্রমদা, বুঝে নিয়েছে 'বিশ্বজোড়া ফাঁদ' পেতে রেখেছে মায়া; তারই খেলা চলেছে অনুক্ষণ। পূর্ণ হয় না— 'প্রাণের বাসনা', ফিরে যেতে হয় 'ম্লানমুখে'

তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না।

আত্মাভিমানী প্রমদার মনে প্রেম এলেও সে অভিমানিনী হবার অবকাশ আর পায়নি, ভালোবাসার জন্য হাহাকারেই কাহিনির সমাপ্তি। মায়াকুমারীদের কণ্ঠে শুনি- 'প্রেম কাহিনী-গান'এর অবসানে 'কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল'। এই চোখের জলই প্রমদার আশ্রয়, 'মায়ার ছলনা'য় এই তার প্রাপ্তি। পরিণতির এমন ইঙ্গিত নাট্যকার প্রমদা চরিত্রের প্রাথমিক পরিচয়েই রেখেছিলেন। চোখের জলে ভেসে আর পথের ধুলায় মিশে সুদর্শনা পেয়েছিল তার রাজাকে। এখানে অবশ্য 'অভিমানের বদলে' বরণডালা সাজানোর অবকাশ পায়নি প্রমদা।

এই প্রেম ও পরিণতি সম্পর্কে সুতপা ভট্টাচার্য 'রবীন্দ্রনাথের নাটকে মেয়েরা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন 'নারী পুরুষ সম্পর্কের একটা প্রধান দিক হল প্রেম, যুগ যুগ ধরে প্রেমেরই চিত্রালি রচিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন মহলে। সেই প্রেমেরই দ্বন্দ্ব নিয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম পর্যায়ের গদ্যনাটক 'নলিনী', আর কিছু পরে তার গীতরূপান্তর 'মায়ার খেলা'। এ নাটক দুটিতে দেখি পুরুষের ততটা নয়, যতটা নারীর প্রেমের বৈশিষ্ট্য নাট্যকার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বোঝা যায়, প্রেমের প্রসাধনকলার থেকে প্রেমের আশ্রয়দানের দিকটি নারীচরিত্রের শ্রেয়তর দিক তাঁর মতে। তাই 'মায়ার খেলা'র শেষে দেখি শান্তার প্রেমে অমর আশ্রয় পায়, আর ব্যর্থ প্রেমের বোঝা বয়ে কেঁদে বেড়ায় প্রমদা কেননা সে 'সুখের লাগি' প্রেম চেয়েছিল, প্রেম তার কাছে ছিল নিছক লীলাবিলাস। ... রবীন্দ্রনাটকের যে ভাবদ্বন্দ্ব নানা রূপে প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায়ে বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসেছে, তাকে বলা যায় অহং-এর সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্বে, বলা বাহুল্য, সব সময়ই প্রেমের জয় হয়, অহং থেকে প্রেমে উত্তীর্ণ হয় ব্যক্তিচৈতন্য।'[১০] এই ভাবনাতেই 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য এবং প্রমদা চরিত্র, উভয়েই পৌঁছে গেছে কাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে। তাই হয়ত অর্ধশতক পেরিয়ে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে পৌঁছে সমাপ্তিতে সুখের মুখ দেখেছে প্রমদা।

**তথ্যসূত্র :**

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৭৪৪

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৭, পুনর্মুদ্রণ, ১৪২৬, পৃষ্ঠা- ১৯৩

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' একাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৪৩

৪. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৯

৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ১৪০৫, পৃষ্ঠা- ৪৪

৬. প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮

৭. কবিতা চন্দ, 'গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে : রবীন্দ্রসৃষ্টি সূত্রে' (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ, ১৪২০, পৃষ্ঠা- ১০৭

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৭

৯. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ২৫৬

১০. সুতপা ভট্টাচার্য, 'সে নহি নহি', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা সংস্করণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৯০



## অন্ধকারের নাটক 'রাজা অয়দিপাউস' এবং শম্ভু মিত্র : একটি পর্যালোচনা

**শ্রী সত্যজিৎ বসাক**

নাট্যকার শম্ভু মিত্র বাংলা নাটকে আধুনিকতার পথ নির্মাণে, সৃজনে বহুমাত্রিকতায় এবং ঐতিহ্য ভাবনায় একজন সফল নির্দেশক। তিনি বাংলা নাট্যমঞ্চকে করে তুলেছিলেন আধুনিক ও ঐতিহ্যিক ধারার সঙ্গে ঐশ্বর্যবান। এককথায় শম্ভু মিত্র নাট্যমঞ্চে প্রাণশক্তি স্থাপনে নব্যতার প্রবর্তক। শম্ভু মিত্রের নির্দেশিত নাটকবোধে নবীন ও দীপ্তিতে আলোকিত। বাংলা নাটকের মঞ্চধারায় নব্য ও আধুনিক প্রতিশ্রুতির জনক হলেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র। রূপান্তর নাটকের নির্দেশনা প্রয়োগরীতি ও মঞ্চকুশলতার পাশাপাশি নির্দেশিত অন্যান্য নাটকে শ্রেষ্ঠতার শীর্ষে পৌঁছানোর সাধনায় তাঁর সমান কোনো ব্যক্তি আছে বলে মনে হয় না। মোটকথা শম্ভু মিত্রের নির্দেশিত মৌলিক নাটক এবং রূপান্তরিত নাট্যধারা সম্পর্কে তাঁর বোধ বুদ্ধি চেতনা সাধনা সিদ্ধি একবিংশ শতকে বিরল।

শম্ভু মিত্র বাংলা নাট্যমঞ্চে আধুনিকতার পথ প্রদর্শক তিনি বিভিন্ন নাটক মঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নাট্যাভিনয়ের শিখর স্পর্শ করেছিলেন এবং পেশাদারি ও বানিজ্যিক নাট্যমঞ্চের বৃত্তটা ভেঙে নবনাট্য আন্দোলনে নতুন প্রবাহের সূচনা করেছিলেন। এই মহান মানুষটি বাংলার নাট্যমঞ্চকে দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমে, চিন্তা ভাবনায়, প্রজ্ঞায়, মননে এবং অনুজদের দীক্ষাদানের মাধ্যমে ও নবরীতি কৌশলে উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। নাটক ও নাট্যভাবনায় শম্ভু মিত্রের অপরিসীম সৃজন প্রতিভা প্রগাঢ় থাকার কারণে তিনি এক উন্নত মানের অভিনয় —রীতি ও মঞ্চশৈলী নির্মাণ করে গেছেন। আজকের দিনে তাঁর শ্রেষ্ঠতা বাংলা আধুনিক নাটকে শম্ভু মিত্র অধ্যায় নামে পরিচিত হয়ে আছে।

বিভিন্ন নাটকে নির্দেশনা ও অভিনয়ের সুদক্ষতায় শম্ভু মিত্র দর্শকদের হৃদয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিশীলিত ভাবে জীবন সম্পর্কে এমনভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে শুধুমাত্র শম্ভু মিত্রেরই একক অবদান বলা যেতে পারে। যেমন রাজা নাটকে শম্ভু মিত্রের অভিনয়ের গুণে দর্শকদের অন্তরে যে টানটান উত্তেজনা, নির্দেশনা ও অভিনয়ের আবহে তৈরী রাজা অয়দিপাউসের আর্তনাদ — হাহাকার, আবার রাজা নাটকে দেখা গেছে শম্ভু মিত্রের কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, অন্ধকার মঞ্চের ভিতর দিয়ে শম্ভু মিত্রের উচ্চারিত কণ্ঠস্বর যা তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে। এ-কণ্ঠস্বর কখনো মৃদু, কখনো তীব্র, আবার কখনো সূক্ষ্ম । তাঁর অভিনয়ের নৈপুন্যতার দিক থেকে তিনি সেখানে একক ব্যক্তিত্ব, নিঃসঙ্গ ও অপরাজেয়। সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে তিনি ছিলেন একেবারেই ভিন্ন।

নাট্যকার শম্ভু মিত্র ১৯৬৪ সালে বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীতে তিনি অন্ধকারের নাটক উপহার দিলেন। প্রথম নাটকটি হলো 'রাজা অয়দিপাউস' এবং দ্বিতীয় নাটকটি হলো 'রাজা'। প্রথম

নাটকটি গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের লেখা ‘কিং ইদিপাস’ নাটকের রূপান্তর এবং দ্বিতীয় নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। ‘রাজা অয়দিপাউস’ নাটকটি নাট্যকার শম্ভু মিত্র স্বয়ং বাংলায় নাট্যরূপান্তরিত করেন। ‘রাজা অয়দিপাউস’ নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে এবং নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। নাটকটি প্রথম মঞ্চে অভিনীত হয় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে ১৯৬৪ সালের ১২ই জুন তারিখে। আবার ১৯৬৪ সালেরই ১২ই জুন তারিখের সংখ্যায় ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’-য় প্রকাশিত হয় ‘রাজা অয়দিপাউস’ নাটকটির প্রযোজনা সম্পর্কে যথার্থ কিছু কথা —

“The stage setting pillared front of a palace and intelligent spacing of levels–suited the peculiar mixture of grandeur and pure simplicity of action which mark the play. It may not be fair to compare the Bengali play with the original— but although the translation was ably done in keeping with the poetic spirit of the original– one missing element was the famous Sophoclean irony– which is vain was sought by this reviewer in the dialogue. Bahurupee seems to have put all their eggs in the basket of ‘pity and horror’.” [১]

‘রাজা অয়দিপাউস’ এবং ‘রাজা’ নামে নাটক দুইটিকে বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী ‘অন্ধকারের নাটক’ হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে এই দুইটি নাটককে ‘কেন অন্ধকারের নাটক’ বলা হয়েছে জ্জ বহুরূপীর নাট্যলিপিতে অন্ধকারের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, অন্ধকার হলো জীবনের অপর এক নাম। ‘রাজা অয়দিপাউস’ নাটকটিতে রাজা অয়দিপাউস এক অতি ভয়ংকর ভবিতব্যের সামনে মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিভিন্ন দার্শনিকগণ, কবি-লেখককেরা, বিজ্ঞানীরা এবং শিল্পীরা তারা তাদের নিজেদের মতো করে অন্ধকারকে উপলব্ধি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাদের সৃষ্টিতে। কখনো তারা তাদের লেখা কাব্যে, গল্পে, কখনো বা উপকথায় আবার কখনো গানের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি গুলোর দ্বারা তুলে ধরতে চেয়েছেন অন্ধকারের নির্মম সত্যটাকে। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে অবস্থানকারী মানুষের জগৎ পরিধি চেনা থেকে অচেনা আর জানা থেকে অজানা পর্যন্ত বিস্তৃত। জগৎকে চেনা ও জানার মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে আলোর। আবার অন্ধকারে পরিপূর্ণ অচেনা ও অজানার জগৎ। বিশ্বব্রহ্মান্ডের এই অন্ধকারে পরিপূর্ণ অচেনা ও অজানার জগৎকে উপলব্ধি করতে হয় স্পর্শাতীত আর বর্ণনাতীত অনুভুতির মাধ্যমে। এই বিশ্বব্রহ্মান্ড ব্যাপ্ত হয়ে আছে আলোর আর অন্ধকারের সংঘর্ষে। এই আলোর আর অন্ধকারের বিবাদে কবি ও শিল্পীরা খুঁজে পান মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ। যেভাবে ‘রাজা অয়দিপাউস’ নাটকটিতে স্বয়ং রাজা অয়দিপাউস এবং রানী সুদর্শনা খুঁজে পেয়েছিল জীবনের মানে এবং মুখোমুখি হয়েছিল এক চরম ও নিষ্ঠুর সত্যের কাছে। আর এই চরম ও নিষ্ঠুর সত্য জানতে পেরে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

রাজা অয়দিপাউসের জীবনে নেমে এলো এক অতীব ঘন অন্ধকার ও চরম বিপর্যয়। সে বিপর্যস্ত এক নিষ্ঠুর নিয়তির তাড়নায় এমনকি রাজা অয়দিপাউসের দেবতা এ্যাপোল্লন তিনিও মর্মাহত নিয়তির তাড়নায়। এ্যাপোল্লন রাজা অয়দিপাউসের দেবতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজা অয়দিপাউসকে বাঁচাতে আসেননি। যে চোখের আলোয় সারা বিশ্বব্রহ্মান্ডকে দর্শন করা যায় ও উপলব্ধি করা যায়, দেহের সেই অমূল্য রত্ন চোখ দুইটিকে রাজা অয়দিপাউস নিজের কৃতকর্মের অনুতাপে ও আত্মধিক্কারে উপড়ে নিলেন। কিসের সত্য জানতে পেরে রাজা অয়দিপাউস দেহের সেই অমূল্য রত্ন চোখ দুইটিকে অন্ধ করে দেন? কিসের জন্য রাজা অয়দিপাউসের জীবনে নেমে এলো এক ঘন অন্ধকার ও চরম বিপর্যয়? রাজা অয়দিপাউস যখন জানতে পারলেন যে তিনি একজন পিতৃঘাতী, পিতাকে বধকারী এক রাজা। যে রাজা তার মায়ের শয্যাকে কলঙ্কিত করেছিল। যে রাজা তার নিজের মায়ের গর্ভে নিজের ঔরসজাত সন্তানের জন্ম দিয়েছে। যে রাজা তার নিজের মা’য়ের শরীরকে কামনা লালসার শিকার বানিয়েছে। এই চরম ও অবিশ্বাস্য সত্য সামনে আসার পর রাজা অয়দিপাউসের প্রেমিকা পরম পরিতাপে বা মর্মাহত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। সেই প্রেমিকার গর্ভজাত সন্তানেরা অভিশপ্ত। রাজা অয়দিপাউস অনন্ত অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে তার জীবন আত্মতৃপ্তিতে ভরা। অচেনা অজানা রানী য়োকাস্ত জন্মদাতা ছিলেন পিতা রাজা লাইয়ুস এবং জন্মদাত্রী ছিলেন মাতা য়োকাস্ত। রাজা অয়দিপাউস অপমানিত হয়ে সে তার নিজের পিতাকে স্পর্ধিত পথিক মনে করে পথের মধ্যে তাকে হত্যা করেছিল। ভিন রাজ্য থেকে আসা অচেনা অজানা রানী য়োকাস্তকে বলপূর্বক রাজা অয়দিপাউস বিবাহ করেছিল তার সম্পূর্ণ অজান্তে। আসলে ওই অচেনা অজানা রানী য়োকাস্তই হলেন রাজা অয়দিপাউসের জন্মদাত্রী মাতা। রাজা অয়দিপাউস জানে তার জন্ম, কর্ম, প্রেম এই সব কিছুই অভিশপ্ত। নাটকে রাজা অয়দিপাউসের কণ্ঠে শোনা যায় তার বেদনাময় আর্তনাদ —

“সব ঘটলো — সব সত্য হোল। আলো — আলো ! আমার জন্ম অভিশপ্ত , আমার প্রেম অভিশপ্ত, আমার কর্ম অভিশপ্ত।”[২]

সে তার নিজের গর্ভধারিণী মায়ের গর্ভে জন্ম দিয়েছে অভিশপ্ত সন্তানের। সমাজে পাপ কখনও একা বা বিছিন্নভাবে বসবাস করে না। সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে রাজা অয়দিপাউস খুঁজে পেল যে এই জঘন্য পাপের মূলে তিনি স্বয়ং রয়েছেন। রাজা অয়দিপাউসের অনুতপ্ত স্বরে শোনা গেছে —

“কিথাইরোন, তুমি আমাকে হত্যা না করে বাঁচিয়ে রাখলে কেন ? সেই নির্জন উপত্যকার রাস্তা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখলো যে আমি আমার পিতার রক্তপাত করলাম। আমার নিজের রক্ত। যে বিবাহের অনুষ্ঠান আমার জন্মদান করেছে — সেই অনুষ্ঠানেই আবার পিতা হোল ভ্রাতা, সন্তান হোল স্বামী, মাতা হোল স্ত্রী... ! ওঃ ! ঈশ্বরের দোহাই তোমরা আমাকে

সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করো — যাতে কোনো মানুষ আর কখনো আমাকে দেখতে না পায়। এই আমার মিনতি, আমার অনুরোধ , তোমরা আমাকে সাহায্য করো।"[৩]

এই পাপের অনুশোচনায় আত্মধিক্কারে তিনি অন্ধত্বকে বেছে নিলেন। তিনি অন্ধকারে অবস্থান করতে চাইলেন কারণ অন্ধকারই আনে জীবনের প্রসন্নতার আলো। নাটকের শেষ দিকে রাজা অয়দিপাউস বলেছেন —

"নিয়তি! আমার বিধিলিপি কি এখনো সম্পূর্ণ হয়নি? কিথাইরোন ! তোমারই বুকে আমার সমাধির ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে প্রেরণ করেছিলেন , কিন্তু তুমি আমাকে গ্রহণ করো নি। ব্যাধি আমাকে বিনাশ করেনি। অপঘাত আমাকে হত্যা করেনি। জানি না কোন এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দেবতারা আমাকে এই পরমায়ু ভিক্ষা দিয়েছেন। আমার সে বিধিলিপি পূর্ণ হবে কবে? ...নিয়তি, আমার বিধিলিপি পূর্ণ করার পথে তুমি আমাকে চালনা করো...আমাকে আমার সম্পূর্ণতার পথে তুমি নিয়ে চলো..." [৪]

শম্ভু মিত্রের 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকটিতে একটি প্রাচীন নাট্যলীলার রূপান্তরিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানে বর্ণিত হয়েছে সফোক্লেসের ভাগ্যের উতীরিত জীবনের কথা। নাট্যকার শম্ভু মিত্রের ঈশ্বরের মহিমা ও মানুষের ভাগ্য এইসবের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকটিতে লক্ষ্য করা গেছে যে, সমস্ত থেবাই পাপের অন্ধকারে নিপীড়িত। নিয়তির এমনই খেলা যে, রাজা অয়দিপাউসের গর্ভধারিণী মা যিনি আবার তিনিই তার সহধর্মিনী। এইরকম ঘৃণ্যতম সম্পর্কের চিন্তাভাবনা কল্পনাতেও বিরল যেটা 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকটিতে বাস্তব রূপ দেখানো হয়েছে। তবে রাজা অয়দিপাউস নিজের অজ্ঞাতে নিয়তির নির্মম পরিহাসে এক অতি জঘন্য পাপ করেছিল। শেষ পর্যন্ত রাজা অয়দিপাউস এতো নিম্নমানের পাপ কার্য্যের ফলে তিনি তার চোখের আলো বিসর্জন দেয়। আর তিনি অন্ধ হয়ে যান কারণ তিনি তার ওই পাপময় চোখ দিয়ে পৃথিবীর সত্য সুন্দর আলোকে ভরা রূপটিকে দুষিত করতে চায় না। এইদিকে রাজমাতা ও রাজরানী এই দুই ধরনের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে তিনিও বেঁচে থাকতে চাননি, আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তার কাছে। এক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—

"প্রবল বুদ্ধি অয়দিপাউস অন্ধকারকে চিনতে পারেনি। তার ভাগ্য বড় নিষ্ঠুর। নাটকের শেষে নিজের হাতে চোখের আলোকে সে নিভিয়ে দেয়। অজান্তে সে তার মায়ের শয্যাকে কলুষিত করেছে। সে যখন 'আলো, আলো' বলে আর্তি প্রকাশ করে, ততক্ষণে রানী গলায় রজ্জু দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার সন্তানরা অভিশপ্ত। চোখের আলো নিভিয়ে দিয়ে হতভাগ্য অয়দিপাউস কি অন্ধকারের মধ্যে কোন প্রশান্তির অভিজ্ঞান পেয়েছিল? কোন প্রসন্নতার আশীর্বাদ ? এ যে — অপাবৃত সত্যের প্রকাশ।"[৫]





'রাজা অয়দিপাউস' নাটকটিকে অন্ধকারের নাটক হিসেবে বলা হয়েছিল ১৯৬৪ সালে বহুরূপীর দ্বিতীয় নাট্যোৎসবে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই 'রাজা অয়দিপাউস' নাটক সম্পর্কে খুবই তাতর্যময় মন্তব্য করেছেন —

"তবে কি শম্ভু মিত্র-এর অনুসন্ধান অন্ধকারেই আবদ্ধ? মহৎ শিল্পীর তপস্যা তো আলোর তপস্যা, তবে কেন এই অন্ধকারের আহ্বান? অন্ধকার তো মহৎ শিল্পীর নাট্যভাবনাকে কলঙ্কিত করে। প্রকৃতপক্ষে এই অন্ধকার শব্দটি শম্ভু মিত্র-এর অনুভবে দার্শনিক তাতর্য নিয়ে ধরা দিয়েছিল। এই অন্ধকার সূর্যের অবর্তমানে যে তমসা, তা নয়। আলোর বিপরীতার্থক শব্দও নয়। এ অন্ধকার মুদিত নেত্র যোগীর ধ্যানের জগতের অন্ধকার। বাইরের জগতের কোলাহল ও তুচ্ছতা থেকে এসে আমরা যখন মনের গহনে ডুব দিয়ে কোনও সত্যকে উপলব্ধির চেষ্টা করি, তখন মনের ভিতরের অন্ধকার কিন্তু শূন্যতার রূপ নেয়, সত্যকে আবিষ্কার করার একটি উপযোগী পরিমন্ডল। মাতৃগর্ভের অন্ধকার যেভাবে নবজাতকের জন্ম ঘটে, সেভাবে অন্তরের উপলব্ধির অন্ধকার থেকে সত্যের জন্ম হয়। ...এই অন্ধকার আসলে আলোতে ফিরে আসার পথ। তাই 'এ আঁধার আলোর অধিক'। তাই রাজা অয়দিপাউসও নিজের হাতে চোখের আলোকে নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের সামনে দাঁড়ায়, আর তখনই সে ফিরে পায় প্রশান্তির অভিজ্ঞান। অন্ধকার তখন গভীরতম আলো।" [৬]

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের একমাত্র কন্যা শাঁওলী মিত্র 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকটির সম্পর্কে তার উপলব্ধিটি নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে —

"রাজা অয়দিপাউস তার বুদ্ধির জোরে স্ফিংক্সকে পরাজিত করে থেবাই-এর রাজা হয়েছিল। থেবাই নগরী এই আগন্তুক যুবককে সাদরে নিয়ে গিয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে সিংহাসনে বসিয়েছিল। এ-রাজ্যের পতিহারা রাজ্ঞীকে তদানীন্তন নিয়মানুযায়ী সঁপে দিয়েছিল অয়দিপাউসের হাতে। এই গৌরবের প্রাপ্তিই তাকে তার অজ্ঞাতে টেনে নিয়ে গেল অপমান-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রান্তে, সে জানতে পারল সে পিতৃহন্তা। নিজের জন্মদাত্রীর গর্ভে সে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। নাটকের শেষ অন্ধ অয়দিপাউস বলে 'নিয়তি আর কি সঞ্চারিত রেখেছে আমার জন্য?' প্রাসাদ ছেড়ে অন্ধ অয়দিপাউসকে চলে যেতে হয়। অপবিত্র সেই বীর যার দিকে লোকে আঙ্গুল তুলে 'পাপী' বলে অভিহিত করবে। অথচ জ্ঞানতঃ সে কোন পাপ করেনি।"[৭]

'রাজা অয়দিপাউস' নাটকটিতে রাজা অয়দিপাউস নিজের অজান্তে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এক অতি ঘৃণ্যতম ও জঘন্য পাপকার্য করেছিল। সত্যান্বেষী রাজা অয়দিপাউস সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে সত্য উদঘাটনের তাগিদে ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন। যখন রাজা অয়দিপাউস জানতে পেরেছেন সেই নিষ্ঠুর সত্য, তখন যে শাস্তি তিনি প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন, সেই শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেকে অন্ধ করেছেন নিজেরই হাতে এবং রাজার বেশ ছেড়ে ভিক্ষুকের বেশে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন।

আমরা যেখানে নিজেদের জ্ঞাত পাপের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাই, সেখানে রাজা অয়দিপাউস তাঁর নিজের অজান্তে ঘটা এক অতীত সত্যের সামনে দাঁড়িয়েছেন নির্ভয়ে। রাজা অয়দিপাউসের মতন এমন মহত্ব আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রকাশিত হলে আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ এবং আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশ এত বিষাক্ত হয়ে উঠতো না।

**তথ্যসূত্র :**


১. জগন্নাথ ঘোষ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা , দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০০৭৩, পুনর্মুর্দণ : জুন ২০১৬ , পৃষ্ঠা নং — ৫৯

২. শাঁওলী মিত্র, শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-২ , প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা — ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং — ৩৭৮

৩. শাঁওলী মিত্র, শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-২, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা — ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং — ৩৮১

৪. শাঁওলী মিত্র, শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-২, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা — ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং — ৩৮৩

৫. কুমার রায়, প্রাপ্ত্যাশা ও নিয়তাপ্তি, শম্ভু মিত্র, নির্মাণ ও সৃজন, প্রতিক্ষণ, ৭ নং জওহরলাল নেহেরু রোড, কোলকাতা -৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ — বইমেলা, জানুয়ারী — ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং — ৫২

৬. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনা, নাট্যচিন্তা, সম্পাদক চক্রবর্তী রথীন, কোলকাতা — ৭০০০৯২, বর্ষ-১৫, সংখ্যা — ৭ থেকে ১২ , মে'১৯৯৭ থেকে অক্টোবর' ১৯৯৭ , পৃষ্ঠা নং — ৬৩

৭. শাঁওলী মিত্র, শম্ভু মিত্র : সৎ নাট্য, শম্ভু মিত্র ও সৎনাট্য, মিত্র ও ঘোষ, ১০ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা — ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তকমেলা, মাঘ ১৪০৬, পৃষ্ঠা নং — ৯৯




## সন্মার্গ সপর্যা : শম্ভু মিত্রের নাট্য-দর্শন

**তিথি ঘোষ**

বহুযুগ ধরে বাংলার প্রবহমান চেতনার উত্তরসূরী হিসেবে গণ্য শম্ভু মিত্র। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি। মানুষের যন্ত্রণা নিয়ে ভারতীয় থিয়েটারে এক অস্পষ্ট কল্পনার বীজ বপন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য নাটক ও রবীন্দ্র ভাব ঐতিহ্যে লালিত তাঁর চেতনা। নাট্যনির্দেশক ও নাট্যরূপদাতা শম্ভু মিত্র বাংলা অভিনয় ও মঞ্চসজ্জাকে "রাজা অউদিপউস" এর প্রযোজনার মধ্য দিয়ে উৎকর্ষের চরম স্তরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছিলেন। একঘেঁয়েমি, প্রথাসর্বস্বতা থেকে তিনি আলোর, রূপের,ব্যঞ্জনার বার্তাবাহী। "রাজা অউদিপউস" নাটকে শিল্পী আলো অন্ধকারের মাঝে জীবনের যথার্থতা কে খুঁজে পেয়েছিলেন। "রাজা" নাটকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি ও প্রতীককে একটি বিন্দুতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। শম্ভু মিত্র তাঁর প্রযোজনার দ্বারা সেটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

আগামী প্রজন্মের মুখ চেয়ে ভারতীয় নাট্যের স্বরূপ সন্ধানে তাঁর এক "গুঢ়তর অন্বেষণের" প্রকাশ "সন্মার্গ সপর্যা"(১৩৯৬), "আত্মোপলব্ধির তীর্থযাত্রা" করেছেন রচনাটিতে। অভিনয়, মঞ্চসজ্জার পাশাপাশি অভিনেতা ও তার অভিনয় দক্ষতার দিকেও তিনি সচেতন ছিলেন। নাট্যকার ও অভিনেতার দুইয়ের সংযোগেই শিল্প গঠিত হয়। সমাজের কথা, জীবনের কথা, গভীর চেতনাবোধ নিয়ে শিল্প একতন্ত্রীতে বেজে ওঠে। চরিত্রের প্রয়োজনানুসারে অভিনেতার সুর ও স্বরের পরিবর্তন ঘটে। নাটকের ব্যাপ্তি ও প্রসার অনেকাংশে অভিনেতার শিল্পকলা ও শিল্পশৈলীর উপর নির্ভর করে। পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে সংস্কৃতিচেতনা, শিল্পবোধ বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু খেলো জিনিসের প্রতি আসক্তি আপেক্ষিক, স্বদেশী শিল্পবোধ আমাদের মননের,শিল্পের চাহিদা পূরণ করে। কাঠামোকে অভিন্ন রেখে থিয়েটারের গঠন রীতিতে, আঙ্গিকে বৈচিত্র্য সাধিত হল। সাম্রাজ্যগ্রাসের আধিপত্য সামাজিক দায়ভারকে অন্য পথে রূপ দিয়েছে, তথাপি দেশাত্মবোধ আগ্রাসনের কাছে নতিস্বীকার করেনি।

'নতুন করে খুঁজে পেতে হবে তাকে। আমাদের অনেকের চেষ্টা সেই পথে। এমন একটা নাট্যশিল্প খুঁজে পেতে চাই যা একান্ত ভাবে বাঙালির। কেউ যেন আমাদের অভিনয় দেখে না বলতে পারে যে "চতুর্থ শ্রেণীর বিদেশী থিয়েটার"। আমাদের বাংলার ছবি, বাংলার নাচ, বাংলার কাব্য যেন প্রাণ দেয় সেই নাট্যের। বাংলার নিগূঢ় প্রাণ যেন প্রকাশ পায় তাতে, সেই হবে আমাদের "যাত্রা", আমাদের বাঙালি থিয়েটার'। শম্ভু মিত্রের

বিশ্লেষণটি যেমন ব্যক্তিনিষ্ঠ, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যসংস্কৃতিকে অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে ভারতীয়দের কাছে নাটকের আদর্শ প্রচার করেছেন। জীবন দিয়ে নাট্যদর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্পের জন্য এক অনলস সাধনার প্রকাশ ঘটেছে।

বহু যুগ ধরে বাংলার প্রবহমান চেতনার উত্তরসূরী হিসাবে গণ্য শম্ভু মিত্র। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনিই। মানুষকে আনন্দ দান ও মহৎ করে তোলাতে ব্রতী হয়েছিলেন, যুদ্ধ পরবর্তী নাট্যশিল্পে নাটকের উপস্থাপন রীতিতে আলোড়ন এসেছিল, সেই সঙ্গে নবজীবনের উত্তরণের পথও প্রস্তুত  হয়েছিল। শিল্পী তাঁর শৈল্পিক সত্তার দ্বারাই খন্ড কালের মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ এনেছিলেন, প্রাচীন পরম্পরাকে ধারণ করেই প্রগতির পথে বিকাশ লাভ  করেছিলেন। সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টায় মানুষের যন্ত্রণা নিয়ে ভারতীয় থিয়েটারে এক অস্পষ্ট কল্পনার বীজ বপন করেছিলেন তিনি। ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য নাটক ও রবীন্দ্র ভাব ঐতিহ্যে লালিত তাঁর চেতনা। বাহ্যিক অভিনয় সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন— 'অভিনয়ে আমাদের স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে হয়। এই মূলসূত্রটা আমাদের গোড়াতেই ধরে নেওয়া ভালো। কারণ প্রত্যেক শিল্প প্রকাশের মূল উৎসই হোল তৎকালীন জীবন স্রোত। সমসাময়িক মানুষের নানান অনুভবের যে বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায় তাই প্রতিফলিত হয় তৎকালীন শিল্পের রূপে। কেবল বিষয়বস্তুতে নয়, তার প্রকাশের রূপেও এবং সেটা নিছক অনুকরণ নয়। বলা যায়, প্রত্যেক যুগে বাস্তববোধ ও কল্পনা মিশে যা মানসপটভূমিকা তৈরি হয় তার সুরটি খুঁজে পেলেই শিল্পী নন্দিত হন'।[১]

অভিজ্ঞতার উন্মেষের দ্বারাই শম্ভু মিত্র পুরাতনের আগল মোচন করে নতুনের বার্তা বয়ে এনেছিলেন। নাট্যনির্দেশক ও নাট্য রূপদাতা শম্ভু মিত্র অভিনয় ও মঞ্চসজ্জাকে "রাজা অয়দিপউসের" মধ্য দিয়ে উৎকর্ষের চরমস্তরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছিলেন।" বহুরূপীর" প্রথম মুদ্রিত প্রচার পত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল—'আমরা ভালো নাটক অভিনয় করতে চাই, যে নাটকে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবন গঠনের প্রয়াস আছে।'[২]

নিজের কর্তব্যাদি সম্পর্কে সচেতন শিল্পী শিল্পের আত্মপ্রকাশকে মুখ্য বলে বিবেচিত করেন- 'দেশের ঐতিহ্যের ভান্ডারে যে সমস্ত সাহিত্য সম্পদ আছে তার মধ্যে নাটকগুলির গল্প উপন্যাসাদির প্রয়োজন মতো নাট্যরূপ দিয়ে সেগুলিকে অভিনয় করে জনপ্রিয় করে তোলাও আমাদের কর্তব্য মনে করি।'

একঘেঁয়েমি, প্রথা সর্বস্বতা থেকে তিনি আলোর, রূপের,ব্যঞ্জনার বার্তাবাহী। "রাজা অয়দিপউস" নাটকে আলো ও অন্ধকারের মাঝে জীবনের যথার্থতা কে খুঁজে পেয়েছিলেন-





'আলো-আঁধারীর দুনিয়ায় হিসেবের বাইরেও হিসেব আছে একজনের দেনা অন্যজনে বর্তায়, এক অজেয় অন্ধকার নিষ্কলঙ্ককে শাস্তি দেয়, যাকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না, তার বাড়ানো হাতে মানুষকে মাশুল তুলে দিতে হয়।'[৩]

"রাজা" নাটকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি ও প্রতীককে একটি বিন্দুতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। শম্ভু মিত্র তাঁর প্রযোজনার দ্বারা সেটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। তাঁর প্রযোজনা কর্মের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—'বহুরূপীর অন্যতম শিল্পী শম্ভু মিত্রের নাট্যনির্দেশনা প্রশংসার দাবি রাখে। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক চিত্তকে আবিষ্ট রাখার যে প্রয়াস তার মধ্যেই নাটকের সাফল্য ও সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। রানীর অন্ধকার ঘর, নেপথ্য থেকে রাজার রানী,রাজপথে নগরবাসীর উৎসব যাত্রা এবং শেষ দৃশ্যে রানীর বন্দি জীবন অবসানের দৃশ্যব্যঞ্জনা দর্শক মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'[৪]

আগামী প্রজন্মের মুখ চেয়ে ভারতীয় নাট্যের স্বরূপ সন্ধানে তাঁর এক "গুঢ়তর অন্বেষণের" প্রকাশ "সন্মার্গ সপর্যা"(১৩৯৬) "আত্মোপলব্ধির তীর্থযাত্রা" করেছেন রচনাটিতে। "সন্মার্গ সপর্যা"র ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন—'সমাজের মানসকেন্দ্রে খোঁজবার মধ্য দিয়ে ভারতীয় নাট্যকলার ভিত্তি বোঝবার মধ্য দিয়ে আরো একটা গুঢ়তর অন্বেষণ তো নিরন্তর ছিলই... অন্বেষণটা কেবলমাত্র ভারতীয় নাট্যরূপের একটা আঙ্গিক গত কৌশল খুঁজে পাবার জন্য নয়, কিংবা গভীর দেশপ্রেমের অন্ধ অহংকার বশে নয়, ওটা হোল মূল উদ্দেশ্যটায় পৌঁছোবার একটা উপযুক্ততম পথ খোঁজা। যদি ভুল পথ ধরা হয় তাহলে নৈবেদ্য আর শেষপর্যন্ত রাজার কাছে পৌঁছয় না, ভুলপথের "সুবর্ণ" দেরই হাতে গিয়ে পড়ে।'[৫]

অভিনয়, মঞ্চসজ্জার পাশাপাশি অভিনেতা ও তার অভিনয় দক্ষতার দিকেও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি বলতেন অভিনয় ও আবৃত্তি উভয়েরই শিকড় এক মাটিতে, উভয়কে শিল্পিত করতে উচ্চারণ সঠিক হওয়া প্রয়োজন। উভয়ের মধ্যে এক নিবীড় যোগ আছে। উচ্চারণের নৈরাজ্য শম্ভু মিত্রের অপছন্দের ছিল। উচ্চারণের পাশাপাশি চরিত্রকে পরিস্ফুট করা অভিনেতার অন্যতম দায়ভার। অভিনেতাকে সেই ভাষা আয়ত্ত করতে হবে যা সকলের বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহ্য হবে। নাট্যকার ও অভিনেতার দুইয়ের সংযোগেই শিল্প গঠিত হয়।সমাজের কথা,জীবনের কথা,গভীর চেতনাবোধ নিয়ে শিল্প একতন্ত্রীতে বেজে ওঠে—'কোন শিল্পকলাই কোনদিন "স্বাভাবিক" নয়, স্বাভাবিক যে ঘটনাগুলো জীবনে ঘটে তারই মধ্যে থেকে বেছে নিতে হয়, সাজিয়ে নিতে হয়, তবেই শিল্পকলা এবং এই বাছাবাছি ও সাজানো গোছানোর মধ্যে একটা ছন্দ থাকা প্রয়োজন। এটা শিল্প সৃষ্টির নিজের নিয়মেই ঘটে।'[৬]

চর্চিত শিল্পের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। সময়কে নিয়েই তার সৃষ্টি ও বিলোপ,

অভিনবত্ব শিল্পের মান রুচি ও মূল্যবোধকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যায়। শিল্পের অন্তর্নিহিত সারবস্তু উপলব্ধি করতে দর্শককে সচেষ্ট করে। ভাব ভাষায় রূপপ্রাপ্ত হয়। মঞ্চ ও তার সজ্জা শিল্পের আরেকটি আবশ্যিক শর্ত হয়ে ওঠে- 'মঞ্চের সজ্জা যদি আমাদের শিল্পরুচিকে তৃপ্ত না করে তাহলে নাটকের অন্তর্নিহিত রসবস্তুর প্রকাশের পথে ব্যাঘাত হয়।'[৭] (মঞ্চসজ্জার ভূমিকা)

মঞ্চসজ্জার গুরুত্ব প্রসঙ্গে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "অভাব নাটকঃ একটি আবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে শম্ভু মিত্রের উক্ত ভাষণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছেন—'শম্ভুবাবু দেখালেন মঞ্চসজ্জা, নটনটির পোশাক আর আলোকসম্পাতের যাদু ছাড়াও নাটক হয়। দর্শকদের কল্পনা শক্তির ওপর আস্থা রাখতে হয়, সেই কল্পনার উৎসমুখ কে খুলে দিতে হয়। তখন প্রেক্ষাগৃহ আর মঞ্চের ফারাকটা অনেকখানি ঘুচে যায়।'[৮]

নাট্যাভিনয়ে মঞ্চসজ্জার দ্বারাই মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। মঞ্চসজ্জায় যেমন অর্থময়তা থাকে তেমনি দর্শকের মনের পরিতৃপ্তি ঘটায়। তাই নাট্যকার কম্পোজিশনের দিকে বিশেষ সচেতন হন। শিল্পের প্রতিটি বস্তুর সমতা ও ছন্দোবদ্ধতা দর্শকের আকাঙ্খার পরিনিবৃত্তি ঘটায়। সুপরিকল্পনার দ্বারা মঞ্চসজ্জায় বৈচিত্র্য আসে।

নাট্য পরিকল্পনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়, চরিত্র, মঞ্চসজ্জা, সংলাপ প্রতিটি আনুসঙ্গিক উপাদানের উপর স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব আরোপিত হল। অভিনেতা চরিত্রের উপযুক্ত করে নিজেকে উপস্থাপন করলেন। অভিনয় বাস্তবানুগ হয়ে ওঠার ফলে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপিত হল। সাধারণ কথাও মঞ্চে বাস্তবায়িত হবার ফলে মঞ্চে অভিনবত্বের সঞ্চার ঘটে—'লেখাতে যে কথাটা একমাত্রার একটি তুচ্ছ কথা সেটাকে মঞ্চের উপরে যে কোনো অভিনেতা মোটামুটি অর্থটা বজায় রেখে বললেই আমাদের কাছে অনেক বাস্তব লাগে'।[৯]

অভিনয়ের দ্বারা জীবন্ত রূপের পরিস্ফুটন ঘটে ও চরিত্র গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়। চরিত্রের প্রয়োজনানুসারে অভিনেতার সুর ও স্বরের পরিবর্তন ঘটে। বিষয়বস্তু সঙ্গে অভিনেতা যেমন নিজেকে একাত্ম করে তোলেন, অনুরূপভাবে দর্শকেরাও ভাব বস্তু ও চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেন— 'মুখ ও তার সূক্ষ্ম ভাব পরিবর্তন না দেখতে পেলে অভিনয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শকদের অন্তরঙ্গতা ক্ষুণ হয়।'[১০]

অভিনেতা ও অভিনেয় চরিত্র একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। কারণ অভিনয়ের মধ্যে নাট্যের প্রাণ নিহিত থাকে— 'অভিনেতার রক্ত মাংসের শরীর, তার গলার একেবারে নিজস্ব আওয়াজ, এমনকি তার খুঁতগুলোও সেই সংলাপকে একটা ত্রিমাত্রিক চেহারা দেয়।'[১১] (আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আমরা)

নাট্যাভিনয়ে অভিনেতা তার সত্তার অতিরিক্ত চেতনাকে বিষয়ের চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত





করে তোলে। জীবনে বোধের গভীরতা আবেগ ও প্রজ্ঞার মধ্যে জারিত হয় এবং সৎ প্রচেষ্টার দ্বারাই নাট্যসংস্কৃতি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে—'নিজের অভিনেয় চরিত্রের ব্যক্তিগত গল্পটাকে প্রকাশ করাই হোল অভিনেতার কাজ।'[১২]

নাট্য সংস্কৃতি ভাবাপন্নবোধ সকলের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত ইতিবাচক ভাবধারার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। নাটককারের পাশাপাশি অভিনেতাকেও সততা শিখতে হয়, কেবল মাত্র সামাজিক সততা নয়, নিজের কাছে সৎ হওয়া, নিজের আত্মার প্রতি সৎ হওয়াও আবশ্যক— 'তাই নাট্যসংস্কৃতি যাতে আমাদের দেশের গৌরবের বস্তু হয় তার জন্য চেষ্টা করার দায়িত্ব অনেকের এবং অনেক প্রকারের।'[১৩]

'নাট্য সংস্কৃতি গড়ে তোলবার কাজে অনলস সাধকের দরকার আজও আছে।'[১৪]

অভিনেতা তার দক্ষতা ও অন্তর্নিহিত শিল্পবেত্তার দ্বারাই নিজেকে প্রকাশ ঘটান এবং রসোপলব্ধির উপযোগী করে উপস্থাপন করেন। অভিনীত চরিত্র মানুষের হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করে। প্রত্যেকের নিজের নিজের শৈল্পিক প্রতিভার দ্বারাই নাট্য বস্তুটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। সঙ্গীত, নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারা উপস্থাপনশৈলীকে আকর্ষণীয় করে তোলে- 'নাট্য বস্তুটি কেবলমাত্র নাটকেই আছে এবং সেটাকে পড়ে আমরা যতটুকু যেমন বুঝি সেই ততটুকুই যদি কোন অভিনেতা প্রকাশ করতে পারেন তাহলে আমরা সেই অভিনেতাকে শিল্পী বলি।'[১৫]

শিল্পী তার নিজস্বতা ও দক্ষতার দ্বারাই মানুষের কাছে তার image এর প্রকাশ ঘটায়। নাটকের ব্যাপ্তি ও প্রসার অনেকাংশে অভিনেতার শিল্পকলা ও শিল্পশৈলীর উপর নির্ভর করে। জাগতিক বোধ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে উপলব্ধ হবার ফলেই প্রকাশে বৈচিত্র্য ঘটে যেটি শিল্পীর একান্ত অন্তরানুভূতি—'সেটা হলো শিল্পীর গভীরতম সত্তার উপলব্ধি অনুযায়ী, সেইজন্য একই বহির্জগত বারবার ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর চোখে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। সেই নাটকে যতো ব্যাপ্তি থাকবে ততই সে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে।'[১৬]

আধুনিকতার মোহে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার ফলে আমাদের সংস্কৃতির আজ ভগ্নদশা। বিদেশি ঐশ্বর্য, চাকচিক্যে স্বদেশী ঐতিহ্যে লালিত যাত্রার আজ মুমূর্ষ অবস্থা। পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে সংস্কৃতি চেতনা, শিল্পবোধ বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু খেলো জিনিসের প্রতি আসক্তি আপেক্ষিক, স্বদেশী শিল্পবোধই আমাদের মননের, শিল্পের চাহিদা পূরণ করে। 'যাত্রা ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন।'[১৭]

'বাংলার অভিনয় পদ্ধতি হচ্ছে কথকথার বংশধর। কথা কইতে কইতে গান গেয়ে ওঠা যাত্রারও নিয়ম, থিয়েটারেরও নিয়ম, সিনেমারও নিয়ম।'[১৮]

পুরাতনকে সঙ্গে নিয়েই নতুনের পদসঞ্চরণ। বাঙালির নাট্য ঐতিহ্যের শাশ্বত প্রকাশ

কথকথার মধ্য দিয়ে তাই ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে অভিনয়কে বাস্তবানুগ, শিল্প গুণান্বিত, রুচিশীল হওয়াই আবশ্যক বলে মনে হয়েছিল তাঁর, আর তাতেই প্রকাশ পাবে বাঙালীর নিজস্বতাবোধ, চিন্তা চেতনা,শিল্পীর যথার্থতা, চিন্তার ফসল জ্ঞানের শাখাতে প্রতিফলিত হবে। বাঙালির প্রজ্ঞা, ভাবানুভূতি,আবেগ শিল্পে রূপপ্রাপ্ত হবে— 'নতুন করে খুঁজে পেতে হবে তাকে। আমাদের অনেকের চেষ্টা সেই পথে, এমন একটা নাট্যশিল্প খুঁজে পেতে চাই যা একান্ত ভাবে বাঙালির, কেউ যেন আমাদের অভিনয় দেখে না বলতে পারে যে "চতুর্থ শ্রেণীর বিদেশী থিয়েটার"। আমাদের বাংলার ছবি, বাংলার নাচ, বাংলার কাব্য যেন প্রাণ দেয় সেই নাট্যের। বাংলা নিগূঢ় প্রাণ যেন প্রকাশ পায় তাতে, সেই হবে আমাদের "যাত্রা", আমাদের বাঙালি থিয়েটার।'[১৯]

থিয়েটারের বিষয়বস্তুতে যেমন পরিবর্তন ঘটল তেমনি মঞ্চসজ্জায় নতুনের ছোঁয়া লাগল। নতুন ভাবনা, ধ্যানধারণার মত মঞ্চসজ্জায় অভিনব কৌশল অবলম্বন করা হল। কাঠামোকে অভিন্ন রেখে থিয়েটারের গঠনরীতিতে, আঙ্গিকে বৈচিত্র্য সাধিত হল— 'প্রতীকের বিরল সংস্থানে মঞ্চসজ্জায় এল রুচি,এল অর্থ নিগূঢ়তা।'[২০]

সামাজিক প্রেক্ষিত, সমাজ পরিমণ্ডল নাটকে প্রভাব ফেলেছে। সাম্রাজ্যগ্রাসের দাপটের কাছে নাটককারেরা তাদের সামাজিক দায়ভারকে অন্য পথে রূপ দিয়েছে। প্রতিবাদ করেছে মোড়কের আবরণে তথাপি দেশাত্মবোধ আগ্রাসনের কাছে নতিস্বীকার করেনি।—

'আমাদের দেশে তেমনই একটা আলোড়নের সময়ে থিয়েটার তুলে ধরেছে দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা। শিবাজীকে নিয়ে, সিরাজদৌল্লাকে নিয়ে, রানা প্রতাপকে নিয়ে, আরো কত ঐতিহাসিক নামকে কেন্দ্র করে আমাদের নাটককাররা আমাদের পরাধীনতার জ্বালাকে ভাষা দিয়েছেন।'[২১] তিনি যে বিশ্লেষণটি করেছেন সেটি যেমন ব্যক্তিনিষ্ঠ, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যসংস্কৃতিকে অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে নাটকের আদর্শ প্রচার করেছেন, এ আলোচনা যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত, জীবন দিয়ে তিনি তাঁর নাট্যদর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্প ও শিল্পীর দায়বদ্ধতা ফুটে উঠেছে তাঁর আলোচনায়। তিনি আদর্শবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নাটককার ও নাট্যকারের বিচার বিশ্লেষণ করে নাট্যদর্শন নির্মাণ করেছেন। প্রয়োগগত দিকের পাশাপাশি তাঁর আলোচনায় এসেছে আদর্শগত দিকের আলোচনা। শিল্পের জন্য তাঁর এক অনলস সাধনার প্রকাশ ঘটেছে।

**তথ্যসূত্র :**


১। বহুরূপী ৬৫, ১ মে ১৯১৯ অভিনয় শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ" শীর্ষক নিবন্ধ
২। বহুরূপী ১৯৪৮, ১৯৮৮- স্বপন কুমার মজুমদার পৃ.-১৯
৩। "রাজা অয়দিপাউসের" নাট্যলিপি







৪। "জনসেবক" পত্রিকা ২৬ জুন ১৯৫৪
৫। "সন্মার্গ সপর্যা" ভূমিকা
৬। অভিনয়,নাটক,মঞ্চ-শম্ভু মিত্র দ্রষ্টব্য- অভিনয় কি? পৃ.- ৯৫
৭। সন্মার্গ সপর্যা, মঞ্চসজ্জার ভূমিকা,পৃ.- ৪৫
৮। "অভাব নাটকঃএকটি আবেদন"- দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। "সন্মার্গ সপর্যা"- "আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আমরা"পৃ.-৫১
১০। ঐ, ঐ, পৃ.-৫০
১১। ঐ, ঐ, পৃ.- ৫১
১২। ঐ, "কিছু পুরনো কথা" পৃ.- ৬২
১৩। ঐ, "নবনাট্যের বিচার", পৃ.- ৫৮
১৪। ঐ, ঐ, পৃ.-৫৬
১৫। ঐ, "একটি আলোচনা", পৃ.-৬৭
১৬। ঐ, ঐ, পৃ.-৬৯
১৭। ঐ, "বাংলা থিয়েটার", পৃ.-১৪
১৮। ঐ, ঐ, পৃ.-১৩
১৯। ঐ, ঐ, পৃ.-১৩
২০। ঐ, ঐ, পৃ.-১৫
২১। ঐ, ঐ, পৃ.-১৩

## সৃষ্টির মনের কথা : শম্ভু মিত্রের 'কিছু স্মরণীয় অভিনয়'

লিপিকা সরকার

'কিছু স্মরণীয় অভিনয়' প্রবন্ধে লেখক বহুগুণী অভিনেতার হৃদয়স্পর্শী অভিনয়-কথা স্মরণ করেছেন। এই অভিনয়গুলো নিঃসন্দেহে প্রাবন্ধিকের অভিনয় জীবনকে সমৃদ্ধি প্রদান করেছিল। প্রথমে লেখক 'আলমগীর' নাটকের অভিনয় দিয়ে স্মৃতির পাতা মনের গভীর থেকে ওলটাতে শুরু করেছেন। ১৯৬৫ সালে লেখা প্রবন্ধটিতে ভালো অভিনয় কোনগভীর চেতনা থেকে উঠে আসে তা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, একই সঙ্গে বর্তমান অভিনেতাদের সমৃদ্ধ করেছেন এবং পাঠকবর্গকে তৃপ্ত করেছেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত 'আলমগীর' একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। দর্শকচিত্তে এই নাটকটির আবেদন এক অন্যমাত্রা এনে দিয়েছিল। নাটকটি প্রথমে প্রবন্ধিক খুব ভালো করে পাঠ করেছিলেন। তারপর যখন শিশিরকুমার এই নাটকটি এডিট করে মঞ্চস্থ করেছিলেন, লেখক তা দেখে ভীষণভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই অফুরান মুগ্ধতা নিয়েই শম্ভু মিত্র বলেছেন, 'নাটক কি করে কাটতে হয় ও সাজাতে হয়, সে সম্পর্কে সেই বোধহয় আমার প্রথম শিক্ষা।'[১] লেখক বিশেষভাবে নাটকের সেই দৃশ্যটি স্মরণ করেছেন, যেখানে তয়বর খাঁ এসে নিজের পরিচয় দেয় এবং মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় আলমগীর তাকে চিনতে পারছেন না অথচ চিনতে চাইছেন। আলমগীর যেন 'স্মৃতির অত্যন্ত গভীর' প্রদেশ থেকে তয়বরকে চেনার প্রাণপ্রণ চেষ্টা করছেন। বহুবার তয়বর নামটি উচ্চারণ করেছেন, হৃদয়ের গভীর স্থল থেকে পরতে পরতে উন্মোচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তার স্মরণে এসেছে 'ও হ্যাঁ, তাইতো, তয়বর, সেনাপতি তয়বর হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বিশ্বস্ত অনুচর তয়বর,— বুঝতে পেরেছি তয়বর ঠিক, তয়বর।

এই সমস্ত ভাবটা তিনি প্রকাশ করতেন কেবল বারংবার নানারকমে ঐ 'তয়বর' নামটি উচ্চারণ করে। এবং সেই বলবার ধরনে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারতুম যে ঐ মানুষটির মনটা কীরকম ভাবে আস্তে আস্তে আবার আমাদের এই দৈনন্দিন জগতের স্তরে ফিরে আসছে। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।'[২] লেখক বহুবার এই নাটকটি দেখেছেন। কিন্তু যতবার তিনি এটি দেখেছেন ততবার তাঁর নতুন মনে হয়েছে। প্রত্যেকদিন প্রত্যেক অভিনয়ে এই নাটকে যে ছন্দের দোলাটা চলত তা যেন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অর্থ বহন করতো। আর লেখক বারবার তা দেখতে দেখতে মুগ্ধতায় আবিষ্ট হয়ে যেতেন। নাটকের কোন মহৎ উদ্দেশ্য লেখককে এই মুগ্ধতা দান করতো না, শুধুমাত্র এর অভিনয়েই লেখক



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

সমৃদ্ধ এবং আপ্লুত। তবে কোনোদিন এর কোনো অংশের অভিনয় যদি দৈবাৎ খারাপ হয়ে যেত, তবে লেখক ভীষণ দুঃখ পেতেন।

নাটকের আর একটি জায়গা লেখক উল্লেখ করেছেন, যেখানে দিলীর খাঁর কাছে আলমগীর তার একটি স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছেন। অদ্ভুত সেই স্বপ্নে দেহ ছেড়ে আত্মা ঊর্ধ্বমুখে চলে গেলে মৃত তৃষ্ণার্ত শরীরটার পাশে সকলে জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। আলমগীর চেষ্টা করেও সে জল পান করতে পারলেন না। এই না পারার জন্য আলমগীর প্রশ্ন করেন দিলীর খাঁকে, 'সেই তুমিও নিয়ে এলে জল, কিন্তু আমি সে-জল পান করতে পারলাম না। কেন পারলাম না দিলীর?

...মঞ্চের উপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কতবার এই অংশটুকুর অভিনয় দেখেছি এবং প্রতিবারই মনে হোত যেন ভাদুড়ীমশায়ের কণ্ঠস্বর একটা মোহ বিস্তার ক'রে আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে। কী অদ্ভুত relaxed বলে মনে হতো তাঁকে। কণ্ঠ যেন অসুস্থ, ক্লান্ত লোকের। আর সেই আস্তে আস্তে কথা বলার মধ্যে কত সুক্ষ্ম স্বরবৈচিত্র্য যেন পলকে পলকে ঝলসে উঠতো। কেবল কণ্ঠের কারুকার্যেই যেন মানুষ বুঝুক না-বুঝুক কেমন তন্দ্গত হয়ে যেতো। এগুলোর মধ্যে কোথাও কোন গলা ফাটানো প্রগতিবাদ বা দাগাবুলানো ইন্টেলেকচুয়ালিজম-এর প্রদর্শন ছিলো না। কিন্তু অভিনয়কলা হিসেবে অতুলনীয় ছিলো।'[৩]

"আলমগীর" নাটকের উদিপুরীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন শ্রীমতি প্রভাদেবী। অন্যান্য অভিনেত্রীর এই চরিত্রে অভিনয় লেখক দেখেছেন। কিন্তু আলমগীরের প্রতি উদিপুরীর প্রেম, রাগ-অনুরাগ যেভাবে প্রভাদেবীর অভিনয়ে প্রকাশ পেত তা আর কারো অভিনয়ে অত মন্ময় হয়ে ওঠেনি। প্রভাদেবীর অভিনয়ে লেখকের মন ভরে উঠত। এরকমই মন ভুলানো আরেকটি অভিনয় লেখক দেখেছিলেন 'কর্ণার্জুন' নাটকে। প্রভাদেবী সেখানে কুন্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। একজন খ্যাতনামা অভিনেতার 'সম্মানরজনীতে' এই অভিনয় হয়েছিল। লেখক বলেছেন এই ধরনের সম্মিলিত অভিনয়ে সকলে মনোযোগী থাকেন না। ব্যক্তিগত কিছু কারিশ্মা প্রকাশই অভিনেতাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে। একরকম হৈ-হট্টগোলের মধ্যে কুন্তী কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। মুহূর্তে 'অদ্ভুত মিষ্টি এক কণ্ঠস্বরে এই বিধবা নারী বর্ণনা করলেন যে-ছেলেকে তিনি জন্ম কালে বিসর্জন দিয়েছেন সেই ছেলে কেমন করে বারে বারে তার স্বপ্নের মধ্যে এসে তাকে আকুল করে তুলেছে।'[৪]

ভালো অভিনয় দেখার আনন্দজনিত উপলব্ধির সক্ষমতা লাভ করতে পেরেছেন বলে তিনি ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞ। অল্পতেই তিনি খুব মুগ্ধ হয়ে যান। সেজন্য হয়তো তাঁকে অনেকে বোকা মনে করতে পারেন, কিন্তু এই বোকামির জন্য তিনি নিজে গর্ববোধ করেন, কেননা বেশি চালাক হলে হয়তো এই আনন্দ তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন না, প্রাবন্ধিক

নিজে একথা বলেছেন। প্রভাদেবীর যে অভিনয়গুলো তাঁর ভালো লেগেছিল, তার মধ্যে আর একটি হলো 'বিন্দুর ছেলে'। 'বিন্দুর ছেলে' নাটকে বড় বউয়ের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন। এটিও প্রভাদেবীর অবিস্মরণীয় একটি অভিনয় ছিল।

প্রভাদেবীর এই অভিনয়, বলাবাহুল্য লেখকের কাছে এক অসাধারণ বিস্ময়। নাটকে প্রভাদেবী বলতেন, 'তুই কাকে কি বল্লি লা ছোট বউ!' সেটা আমার কাছে পৃথিবীর বিখ্যাত অভিনয়ের মধ্যে গণনীয়। একজন শুদ্ধচিত্ত মানুষ যখন অচিন্ত্যনীয় আঘাত পায়, যাকে সে অন্ধের মত বিশ্বাস করেছে, ভালোবেসেছে, সেই তারই ব্যবহারে যখন সে-বিশ্বাস ভেঙে যায়, তখন তার সেই কষ্ট দেখে আমার মনের মধ্যে যা-কিছু সৎ, যা কিছু মহৎ, যা কিছু শুদ্ধ, সে-সব যেন কাঁদে।...সেই একটি দৃশ্যের অভিনয়ে যে গভীরতা প্রকাশ পেত তাতে একজন বিরাট শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।'[৫]

লেখক বারবার যে কথাটি বলেছেন এখানেও আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শিল্পের বিচার করতে হবে তার গভীরতা দিয়ে, আধুনিক বুলি বা 'কোন চালু ফ্যাশন' এর ছোঁয়া দিয়ে নয়। মতামত নয়, অভিনেতার মনের প্রকাশেই অভিনয়ে গভীরতা আসে। একজন অভিনেতা হিসেবে শম্ভু মিত্রের স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমার মত অসংখ্য মানুষ আগ্রহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে নাট্যাভিনয়ের দোরে আসে মানুষের এই বৈচিত্র্যময় প্রকাশ দেখবে বলে, কোন 'confounded philosophy '-র জন্য নয়। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় হল মানুষ।'[৬]

মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের এরকম মহৎ অভিনয় তিনি স্মরণ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। নিজের এক সন্তানের আত্মহত্যার পরেও তিনি অন্যদের বুঝিয়েছেন, 'বিশ্বাস হারাতে নেই, রাত্রি যত অন্ধকারই হোক, একদিন তারপরে সকাল হবেই।'[৭] কিন্তু এই মানুষটার জীবনে আর সকাল আসে না। নাটকের শেষে দেখা যায় তার আরেক মেয়ে পাগল হয়ে যায়। জামাই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তার মাটির ঘরে তখন তিনি একমাত্র কর্তা। বৃদ্ধ সত্যপ্রসন্ন তখনও উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তবু আমি কাঁদবো না। তুমি আমায় কাঁদাও দেখি, স্টুপিড, তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না। সেই সময়ে মহর্ষির সেই বিশাল চোখ দু'টো যেন উদ্ভ্রান্তের মতো তাকাতো। চোখের শিরাগুলো লাল হয়ে ফুলে উঠতো। তাঁর ঠোঁট বেঁকে যেতো। আর অতো বড়ো শরীরটা যেন থর থর করে কাঁপতো। একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলতেন,— তুমি স্টুপিড,— তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না—।'[৮] মহর্ষির এই অভিনয় দেখে লোকে অসম্ভব স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হয়ে যেত। এই অভিনয় দেখে লোকে কাঁদতো না, কিন্তু দর্শকের গলার কাছে শুকিয়ে যেত, দর্শকের ঢোক গিলতে কষ্ট হতো।





অসম্ভব ভালো এই সকল অভিনয় দেখতে দেখতে লেখক লক্ষ করেন, অভিনয়ের যে গভীর আবেগ এখানে প্রকাশিত তা নাটকের গণ্ডি পেড়িয়ে অন্যখানে গিয়ে পৌঁছায়। অভিনয়ের মাধুর্য যখন সেই জায়গায় পৌঁছতে পারে তখন তা হয়ে ওঠে মহৎ অভিনয়। আলোচ্য প্রবন্ধে শম্ভু মিত্র বিভিন্ন অভিনেতার অভিনয়ের কথা মনে করতে করতে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় নিয়ে স্মরণ করেছেন। তাঁর অভিনয় লেখক দেখেছিলেন 'মহানিশা', 'বাংলার মেয়ে' ইত্যাদি নাটকে। এই ধরনের 'নগণ্য নাটকে অভূতপূর্ব ও অনতিক্রম্য' অভিনয় করে গেছেন শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী। যারা তাঁর এই অভিনয় দেখেছেন তারা জানেন, নাটক ছাড়িয়ে তাঁর অভিনয় কোথায় গিয়ে পৌঁছাত।

'মহানিশা' নাটকে দেখা যায়, তিনি ভীষণ বদমেজাজি লোক। তার ওপর সুদখোর। গ্রামের এই সুদখোর 'খিটখিটে স্বভাবের' মানুষটির মুখেই একদিন তার ভরা সংসারের গল্প শুনে দর্শকের অনুভূতি কিছু অন্যরকমই হয়। তিনি সেই বর্ণনা শুরু করেছিলেন ব্যাঙ্গ মিশিয়ে 'অলিপ্ত তৃতীয় ব্যক্তির মত'। বলতে বলতে তার গলা ধরে যায়। এই 'নিঃসঙ্গ বদমেজাজি মানুষটার গোপন ক্ষতের জায়গাটা যেন হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে'। লেখক বলেছেন, 'এই প্রকাশ কোন ভারী, গম্ভীর, আবেগপ্রবণ গলায় বা ভঙ্গিতে হয়নি। তাঁর গলা ছিল হাল্কা, একটু চড়ার দিকে। বাচনভঙ্গি ছিল স্বাভাবিক কথা বলবারই মতো। এই অভিনয়ে বরঞ্চ খিচিয়ে ওঠার ভাব ছিল বেশি। সেই কাঠামোর মধ্যেই তিনি অতিকৃতির সাহায্য না-নিয়ে-এমন একটা সুর আনতেন যে বর্ণনার শেষটুকুতে মনে হতো লোকটা যেন আর্তনাদ ক'রে বিলাপ করে উঠলো।'[৯]

তাঁর আর একটি অনবদ্য নাট্যাভিনয়ের কথা লেখক স্মরণ করেছেন, 'বাংলার মেয়ে'। 'প্যানপেনে' একটি নাটক। এক 'আত্মত্যাগিনী' মেয়েকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজের 'কুসংস্কারগুলোর গুণকীর্তন' করা হয়েছে। এই নাটকের ঘটনা লেখকের একেবারে অপছন্দ। এরকম নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে তিনি তিতিবিরক্ত। নাটক না দেখেই সেখান থেকে চলে আসবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন সঙ্গীর অনুরোধে তিনি যোগেশবাবুর অভিনয়ের অংশটুকু দেখার জন্য রয়ে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে এই বন্ধুদের প্রতি লেখক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে যান, এত সুন্দর একটা অভিনয় দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। শহর কলকাতা থেকে দূরে 'ইংরেজ পদানত বাংলার যুদ্ধকালীন মফস্বল' এর একটি মঞ্চে এই অভিনয় হয়েছিল। সেখানে 'দৃশ্যের বাহার', 'আলোর কায়দা' এসব কিছুই ছিল না। ছোট একটি মঞ্চ। রঙ উঠে যাওয়া আঁকা পটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চটি। খ্যাতনামা অভিনেতা যোগেশচন্দ্র মঞ্চে এলেন। 'সাত্ত্বিক আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের' ভূমিকায় তিনি অভিনয় করছিলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যায়, তিনি

'মিতভাষী', 'সহিষ্ণু', 'দুঃখের আঘাতে জীর্ণ' একজন মানুষ, বয়সে বৃদ্ধ হলেও তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী।

মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। জামাই এসে কেঁদে জানায় যে, সে তার স্ত্রী-কে হত্যা করে ফেলেছে। কয়েকদিন অভুক্ত ছিল, কোনো কারণে রেগে হাত ধরে 'হ্যাঁচকা' টান দিতেই দুর্বল শরীর মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী মারা যায়। বৃদ্ধ পিতা কন্যার মৃত্যু সংবাদে অকস্মাৎ বসে পড়েন। 'তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে প্রশ্ন করেন— সে কোথায়?— জামাই এর নির্দেশে উঠে ধীরে ধীরে মঞ্চের পিছনে লুণ্ঠিতা মেয়ের মৃতদেহের কাছে যান। নিচু হয়ে ঝুঁকে ডাকেন ভবানী! ভবানী! তোকে যে নিয়ে যেতে এসেছিলুম মা। কোনো কান্না নেই, কোনো হাহাকার নেই, গলার স্বরে কোনো কৃত্রিম কম্পন নেই। অথচ আওয়াজটার মধ্যে কিরকম যে একটা ভীষণ কষ্টের প্রকাশ হয়। সেই দু'টো ডাক শুনে আমাদের সকলের চোখ জ্বালা ক'রে জল এসে গেলো।'[১০] লেখক দেখেছেন উইংসে দাঁড়িয়ে থিয়েটারের মেয়েরা পর্যন্ত মুখে আঁচল গুঁজে হু-হু করে কেঁদে উঠেছে। আর লেখক এই অভিনয় দেখতে দেখতে কোন জগতে পৌঁছে যান নিজেই জানেন না। যখন সচেতন হয়ে ওঠেন, তখন দেখেন, প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি মানুষ ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অদ্ভুত ব্যাপার, যে সকলকে এই এমনভাবে কাঁদাচ্ছে, যার দুঃখে বাকি সকলে কাঁদছে, যার দুঃখে সকলে এত অধীর, কিন্তু তার চোখে একফোঁটা জল নেই।

বৃদ্ধ তখন আপনমনে কিছু বিড়বিড় করে বলতে থাকেন। তার চোখে জল আসছে না, ঘটনাটা বৃদ্ধ গিয়ে তার বৌমাকে জানাতে চান। বৌমা কাঁদলে হয়তো তারও কান্না পাবে, চোখে জল আসবে, একটু প্রাণ ভরে তিনি কাঁদতে পারবেন। আপন মনে এসব বলতে বলতে তিনি সামনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন। লেখকের তখন মনে হয়, তার এই চুপ করে থাকার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সময়ও যেন থমকে দাঁড়ায়। একটা 'নিঃশ্বাস' টেনে বললেন, 'শিব শম্ভু, শিব শম্ভু! তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। সাজঘরে তিনি তখন কাপড় বদলাচ্ছেন, আমি উত্তেজিত হয়ে সেখানে গিয়ে বললুম, ...আপনি কি করে করলেন ওটা? তখনো যোগেশবাবু যেন সজল হয়ে আছেন। একটু হেসে প্রায় আপন মনেই বললেন, কি জানো, ধ্যান করতে হয়, ধ্যান করলে মন দিয়ে ধ্যান করলে, তারপর পাওয়া যায়।'[১১]

এইসব মন্ত্রমুগ্ধ অভিনয়ে লেখক অভিভূত হয়ে যান। চেতনার অতল স্তর থেকে এর উৎপত্তি। গভীর সাধনা দিয়ে তা আয়ত্ত্ব করতে হয়। যে-কোনো শিল্পই সাধনার বিষয়, সাধক তা বুঝে নেন। শম্ভু মিত্রের এই প্রবন্ধ, এই সমৃদ্ধ আলোচনা আমাদের মনকেও উন্নত করে। নিজের কাজে সচেতনভাবে শতাংশ দিতে পারলে হয়তো সেই সাধনার





প্রকাশ ঘটতে পারে। প্রবন্ধ পাঠে বারবার মনে হয় একজন সাধক যেন নিজের মনের অনুভূতির আর্ঘ্য সাজিয়ে পূর্বসূরিদের সাধনসম্পদের আরাধনায় বসেছেন, ভক্তিবনতচিত্তে। আজীবন নিজের সৃষ্টিতে তিনি এই পৌরোহিত্য করে গেছেন।

**তথ্যসূত্র :**


১) রচনাসমগ্র-২, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা -২০১৭, পৃষ্ঠা-৬৬।
২) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৬।
৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮।
৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮।
৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮।
৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৯।
৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৯।
৯) তদেব, পৃষ্ঠা -৭০।
১০) তদেব, পৃষ্ঠা-৭১।
১১) তদেব, পৃষ্ঠা-৭২।

# ব্রাত্য বসুর ‘রুদ্ধসঙ্গীত’ নাটকে সমকালীন সমাজ : একটি সমীক্ষা

গোলকপতি ধল

এযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রবল পরাক্রান্ত এক প্রতিভাবান নাট্যশিল্পী হলেন ব্রাত্য বসু। নাট্যকার রূপে তিনি যে সমকালীন ভারতে সর্বোত্তম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর রচিত নাটকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনই সংখ্যার প্রাচুর্যে ও তিনি অন্য সকল নাট্যকারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। তার জলন্ত উদাহরণ হল ‘কালিন্দী ব্রাত্যজন’ নাট্যদল প্রযোজিত প্রথম মঞ্চস্থ নাটক “রুদ্ধ সঙ্গীত” (২০০৯)। যার মূল বিষয়বস্তু হল কিংবদন্তি শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনী, তাঁর সমকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং রাজনীতির সঙ্গে লড়াইয়ের স্তর পরম্পরায় উদ্দিষ্ট শিল্পীর ক্রমশ একা হয়ে যাওয়ার কাহিনী। নাটকটির কাহিনির প্রেক্ষাপট ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৯ কিন্ত নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২০০৯ সালের ২০ শে মার্চ। শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তি তথা রাজনৈতিক ও সমকালীন সমাজের রূপ ফুটে উঠেছে এই নাটকের মধ্যে। এছাড়াও গণমাধ্যমের যাতায়াত বাঙালি সমকালীন সমাজে কিভাবে প্রতিফলিত হয় তার প্রতিফলন রয়েছে এই নাটকে। “রুদ্ধ সঙ্গীত” নাটকটি আসলে পূর্বপুরুষের প্রতি নাট্যকারের একপ্রকার স্মৃতিতর্পন। তাই নাট্যকার ব্রাত্য বসু তাঁর “রুদ্ধ সঙ্গীত” নাটকটিতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর জোর দিলেও তিনি সমকালীন সমাজের যে বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন তা অনন্য।

“ পথে এবার নামো সাথী
পথেই হবে পথ চেনা”[১]

ঐতিহাসিক চরিত্র বা চরিত্রদের নিয়ে রচিত সংলাপ পূর্ণ সত্য না অর্ধসত্য তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্ত একুশ শতকে পৌঁছে ঐতিহাসিক সত্য বলে কিছু হয় না। তাই সেই আলোচনায় কিছুটা বিরতি দেওয়ার সময় এসেছে। যে সংশয়ের কথা দিয়ে সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছে তা শুধু কথার কথা নয়। কারণ শুধু পৃষ্ঠাঙ্কের পরিসর দিয়ে কোন বইয়ের উৎকর্ষ বিচার করা বাতুলতা মাত্র। শিল্পীর কোন ধর্ম হয় না, জাত হয় না আবার জাত শিল্পীও কোন বিশেষ দেশকালের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকেন। সম্ভবত সেই কারণেই দেবব্রত বিশ্বাস স্বয়ং একজন জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক অচলায়তন ছেড়ে সকলের মাঝে গানকে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই জীবন্ত অবস্থায় দেবব্রত বিশ্বাস যে সুবিচার পাননি নাট্যকার ব্রাত্য বসু “রুদ্ধ সঙ্গীত” (২০০৯) নাটকের মাধ্যমেই মানুষের কাছে থাকা তার সমস্ত ঋণ শোধ করার চেষ্টা করছেন মাত্র। আর সেই কারণেই অতি সতর্কতার সঙ্গে তাঁর নাটকে কালের গর্ভ থেকে উঠে এসেছে দেবব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, শম্ভু মিত্র, সলিল চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার, প্রমোদ দাশগুপ্তের মত





প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্ররা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সময়পর্ব এই নাটকের উপজীব্য কিন্ত অবিশ্বাস্যভাবে সমসময়ের অভিঘাতক চিহ্নিত করে এক ‘রাদারট্রুথ’কে—

“ঋত্বিক : আমাদের পার্টির চাপে বিধান রায় থানার লক আপে মার উইথড্র করতে বাধ্য হয়েছেন, কুচবিহারে ভুখা মিছিলের ওপর যে পুলিশ গুলি চালিয়ে পাঁচজনকে মারলো, আমাদের পার্টিই একমাত্র মৃতদের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তার পরেও বলছ আমাদের পার্টির ওপর তোমার বিশ্বাস নেই?

দেবব্রত: সবই ঠিক আছে। কিন্ত ঋত্বিক তোমার পার্টি গিয়্যা যহন এরপর ক্ষমতায় বসবা, তহন তারা যে আবার জনগণের উপরে গুলি চালাইব না অ্যামন কুনো গ্যারান্টি দিতা পার?

ঋত্বিক: হতেই পারে না। আমাদের পার্টি কখনওই গ্রামের গরীব কৃষক বা শ্রমিকের ওপর গুলি চালাবে না।

দেবব্রত: দেহা যাক। ঋত্বিক আমি অন্তর থিক্যা বিশ্বাস করি- ক্ষ্যামতা হইত্যাছে ক্ষ্যামতা। সে তোমারে মারবাই, আবার সে নানাভাবে ওই মারণরে জাস্টিফাইও করবা। হেইডা হইল গিয়্যা ক্ষমতার কল।”[২]

ব্রাত্য বসু রচিত “রুদ্ধ সঙ্গীত” নাটকটি হল আসলে একক মানুষের সংগ্রামের কাহিনী, যে নিজের জীবনের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে পিছপা হয় না, যে তার নিজের অনুভূত কোন সত্যের জন্য অনবরত একাই লড়াই করে। তাই জর্জ বিশ্বাস আজ সকলের কাছে এক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী রূপে পরিচিত হয়েছেন। এই শিল্পীর লড়াই মূলত তিনটি স্তরে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

প্রথম স্তরটি হল পার্টির সঙ্গে, দ্বিতীয় স্তরটি হল সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এবং তৃতীয় স্তরটি হল মিডিয়া বা সংবাদপত্রের সঙ্গে। জর্জ বিশ্বাসের আত্মসম্মান বোধ সাংঘাতিক তাই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন কিন্ত কারোর কাছে মাথা নত করলেন না।যদিও নাট্যকার এই নাটকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন নি তবুও শেষ দৃশ্যে যখন—

“আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান”[৩]

সেই সময়ে সকলকে চমক দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র গর্জনের উল্লাস সমন্বিত একটি সিম্ফনি সদৃশ মিউজিক। যা প্রমাণ করে শিল্পীর ব্যক্তি জীবন যেমনই হোক না কেন তাঁর শিল্পী জীবন মৃত্যুহীন।

“রুদ্ধ সঙ্গীত” হল প্রকৃত পক্ষে একজন শিল্পীকে ব্রাত্য করে দেওয়ার কাহিনি। মানুষকে ব্রাত্য করে দেওয়ার সংলাপ নিয়ে যাঁরা চলেন এই নাটকটি হল তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত। নাট্যকার ব্রাত্য বসু তাঁর নাটকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার চেয়ে সময়কেই

বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছেন । তাই তাঁর নাটকে নতুন ও পুরানো মিলেমিশে একাকার হয়েগিয়েছে। তাঁর মতে ‘রুদ্ধ সঙ্গীত আমার কাছে সময়রূপ সাগরের পুনরাবৃত্তি, ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিত্র নয়’।

ইতিহাস আর বর্তমানের সেতুবন্ধের নাটক হিসাবে ‘রুদ্ধ সঙ্গীত’ অন্যতম। ব্রাত্য বসু তাঁর নাটকের মাধ্যমে কিংবদন্তি দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনকে কেন্দ্র করে একটা পুরনো সময়কে নিজের তথা বর্তমান সময়ে এনে উপস্থাপিত করেছেন। দেবব্রত বিশ্বাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতার সূত্রে রাষ্ট্র রাজনীতি সংস্কৃতির মধ্যে যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং তার বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বন্দ্ব অথবা সংগীতশিল্পী নাট্যকারের যে আপোষহীন লড়াই তা আসলে সমসাময়িক সময়ের অভিঘাতকেই কুণ্ঠাহীনভাবে যুগে যুগে চিত্রায়িত করে চলেছে।

অতি সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের ইঁট গেঁথেছেন যারা তারাই নাটকের কুশীলব। যেমন জ্যোতি বসু ও সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ। এদের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নাট্যকার ও পরিচালক যেন তাদের এক সরু তারের উপর হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন। একটু ভারসাম্য হারালেই সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়াও সন্তোষ কুমার, ঋত্বিক, প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ সমস্ত চরিত্রই নাট্যকার অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সেই সঙ্গে সুদীপ সান্যালের আলো, দোয়েলপাখি দাশগুপ্তের পোষাক পরিকল্পনা এবং সুকল্যান ভট্টাচার্যের নৃত্য ভাবনাও প্রশংসনীয়। এইসব কিছু মিলে “রুদ্ধ সঙ্গীত” নাটকটি সমসাময়িক সময়ের অভিঘাতকেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে।

একজন নাট্যকার বা শিল্পী তার নাট্যকলার মাধ্যমে সময়কে বাঁধতে চান কিন্ত কেউ তা পারে আবার কেউ তা পারেনা। আসলে বর্তমান সময়ে সাইবার বিস্ফোরণ সেই সকল বাধা ভেঙে দিয়েছে। তাই আজ দেশীয় মডেলের ছাঁচে ইউরোপীয় ভাবনাকে বিনির্মিত করা এক প্রতীচ্য দৃষ্টিকোণ হয়ে উঠেছে আবার ইউরোপীয় মডেলের ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটকে বুঝতে চাওয়া স্বাদেশিকতার ছকে পরিনত হয়েছে। আসলে ব্রাত্য বসুর নাটক গুলির মধ্যে সময় অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে। কখনও আমাদের ফেলে আসা পুরোনো সময় আবার কখনও বা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া নতুন সময় এই সমস্ত কিছু বারবার পরিবর্তিত হয়ে ব্রাত্য বসুর নাটকে স্থান পেয়েছে। কখনও তিনি বহুমুখী অর্থসম্পন্ন সংলাপের মাধ্যমে আবার কখনও কেবলমাত্র আটপৌরে ভঙ্গিতে সময়ের কথা, সকল মানুষের মনের কথা সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। তাই ব্রাত্য বসুর নাটক দেখে অনেকে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন কারণ নিজের চেহারাটা সকলের সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়। ব্রাত্য বসুর কথায়—

“আমরা যে ভাবে বাঁচি, এই তথাকথিত middle class security-এর মধ্যে আসলে এই বাঁচাটার কোন মানে নেই, আমরা basically অসাড় senseless.”[৪]



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

এর থেকে অন্যরকম বাঁচে যারা, তারা ঘুরে ফিরে আসে তাঁর নাটকে। ব্রাত্য বসুর নাটকে দেশকালপাত্রের নির্দিষ্ট ছাঁচ থাকলেও তিনি তা ভেঙে বেরিয়ে আসেন বারবার। তাই তাঁর নাটক পড়ে ও দেখে দর্শক এক বিপন্ন বিস্ময় অনুভব করে।

নতুন শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ব্রাত্য বসুর নাটক বাংলা মঞ্চে সাফল্যের বিচারে অন্তত দর্শক সমাগমের পরিসংখ্যানে এখন শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।কিন্ত “রুদ্ধ সঙ্গীত” নাটক তাঁকে যে খ্যাতি দান করেছে তা আজও অবিচল রয়েছে। বিষয় ভাবনার দিক থেকে তাঁর নাটকে একঘেয়ে হয়ে যাওয়ার জায়গা নেই বললেই চলে। নিজেকে ভেঙে গড়ে তোলার চেষ্টাই তাকেই অনবরত জীবন্ত থাকার পথ দেখিয়েছে-এটাই তাঁর সৃজনশীলতার বড় জোর। কালের ভিতর দাঁড়িয়ে কালক্রমে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা যে ব্রাত্য বসুর ছিল তাই তিনি তাঁর নাটকে বারবার প্রমানিত করেছেন। তবে শুধুমাত্র “রুদ্ধ সঙ্গীত” নাটকটিই যে তাঁকে তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি এনে দিয়েছে তা নয়,তাঁর রচিত আরও অসংখ্য নাটকের জনপ্রিয়তাও কিছু অংশে কম নয়।

**তথ্যসূত্র :**

১ . ব্রাত্য বসু, নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০১০ পৃ ২৯৯
২. ঐ, পৃ ৩১০
৩. পরবাস: বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি,সংখ্যা ৫৫, অক্টোবর ২০১৩
৪. ব্রাত্য বসু, মুখোমুখি আলাপে : সুমন দে, এ. বি. পি. আনন্দ ২৮ শে মে, ২০১৩

# ব্রাত্য বসুর 'উইংকেল টুইংকেল' এক সমকালীন রাজনৈতিক অভিজ্ঞান

তাপস চক্রবর্তী

মানুষ যখন বিপন্ন, সমাজ যখন কলুষিত, হতাশাগ্রস্থ-সুবিধাবাদী মানুষদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক ঘোলাজলে মাছ ধরতে যখন ক্ষমতাশীল সুবিধাবাদীদের ব্যস্ততা; সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দল বদল ও রাজনীতি চরিত্রের অবনমনকে অসাধারণ নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন আধুনিককালের অন্যতম নাট্যকার ব্রাত্য বসু। তাঁর অন্যতম নাটক 'উইংকেল টুইংকেল'। এই নাটকটিতে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, ও নেতাদের চরিত্রের অসাধারণ রূপ। নাট্যকার ব্রাত্য বসুর 'উইংকেল টুইংকেল' নাটকটি প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালে কলকাতার সংস্মৃতি নাট্য দলের প্রযোজনায়, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস নাট্যমঞ্চে। নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায়।

নাটকটিতে প্রথম দেখা যায় ২০০২ সালের প্রভাতের মনোরম দৃশ্য। সেখানে একজন পুলিশ ও জনৈক ভদ্রলোক প্রাতঃভ্রমণ হেতু একটি বেদিতে বসে ১৯৭০-৭১ সালের ঘটনা বর্ণনা করছেন। জনৈক ভদ্রলোক জানায় তার যুবক বয়সে যে পুলিশ দেখেছিল তাদের চেহারা ছিল কীচক সুলভ, আর বর্তমান তোষামোদকারী পুলিশদের চেহারা যেন ললিপপ মার্কা। নাটকটির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। রেডিও বার্তায় উঠে আসে সেই পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ১৯৭১ সালে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। এরপরের ঘটনা একেবারে ২০০২ সালে।

এই নাটকের নাট্যকার অত্যন্ত সুকৌশলে রেডিওর সংবাদ পরিবেশন কে কাজে লাগিয়ে সময়ের প্রবাহমানতা নাটকে তুলে ধরেছেন। সকালে বেতারযন্ত্রে পরিবেশিত হচ্ছে ২০০২ সালে ভোটের ফলাফল। জনৈক ভদ্রলোক রঞ্জন খবরের কাগজে একান্ত মনোযোগী পুলিশকে জানায় গোয়েঙ্কারা নাকি পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পের মরুদ্যান বলেছেন-টিভি নিউজে এই খবর দেখিয়েছে। তিনি আরো জানান তাদের যৌবনকালে গান্ধীজির সঙ্গে নাকি বিড়লাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সবকিছু যেন বদলে গেল।

ভোরবেলা একজন পুলিশের সঙ্গে বসে জনৈক ভদ্রলোক জিলাপি খাচ্ছে এই ঘটনাটা যেন অভাবনীয় ছিল ষাট সত্তরের দশকে। তখন পুলিশ দেখলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। তার মুখ থেকে শোনা যায় ১৯৭৬ সালের ঘটনা। জনৈক ভদ্র লোক রঞ্জন এর স্মৃতিচারণায় ধরা পড়ে -একদিন সন্ধ্যায় কমিউনিস্ট করার অপরাধে তৎকালীন শাসকদলের পুলিশ বামপন্থী নেতা সব্যসাচী সেনকে লক্ষ্য করে হঠাৎ গুলি করে। ওই গুলির আঘাতে সব্যসাচী সেন জ্ঞান হারায়। ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ২৬ বছর পর। এইরকম এক সকালে সব্যসাচী সেনকে আবার একই রূপে ওই পার্কের জঙ্গলের মধ্যে





থেকে বাইরে আসতে দেখে ওই জনৈক ব্যক্তি। সব্যসাচী সেনকে দেখে হতবাক বিস্মিত হয়ে যায় সে। নিজের দৃষ্টির প্রতি সংসাত্মক হয়ে পরে। জনৈক ভদ্রলোক ভাবেন, ২৫-২৬ বছর পর সব্যসাচীর প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটা যদি সে বাড়ির লোককে বলে, তারা ভাববে 'সাতসকালে বাংলা টেনে ভুল বকছে'। নাট্যকার ব্রাত্য বসু সব্যসাচী সেনের জীবনের রাজনৈতিক আদর্শ রক্ষার লড়াই তুলে ধরার পাশাপাশি রাজনৈতিক চরিত্র বদল কে অসামান্য দক্ষতা অঙ্কন করেছেন।

নাট্যকার ব্রাত্য বসু 'উইঙ্কেল টুইঙ্কেল' নাটক রচনায় রিপভ্যান উইঙ্কেল এর কাহিনি অনুসরনে কমিউনিস্ট সব্যসাচী সেন চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন। রিপভ্যান উইঙ্কেল যিনি এগারো বছর পর জেগে উঠেছিলেন এবং দেখেছিলেন তার চারপাশের সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। সব্যসাচী সেনের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছে। তিনিও একপ্রকার অদৃশ্যভাবে ২৬ বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। হঠাৎ তিনি আবার জেগে ওঠেন। সব্যসাচীর ফিরে আসার মধ্য দিয়ে রাজনীতির চরিত্রের অবনমনের দিকগুলি নাটকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন।

সাব্যসাচীর অবর্তমানে তার দুই সন্তান জীবনের অনেকটা অংশ পিতৃহীন অবস্থায় কাটিয়েছে। তারা এখন বড় হয়েছে। পুত্র সন্তান ইন্দ্র বর্তমানে শিক্ষিত বেকার। সে বামফ্রন্ট সরকারের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বীতশ্রদ্ধ, কারণ বর্তমানে রাজনীতি কোন আদর্শের পথে চলে না। সুবিধা ভোগীরা তাদের প্রয়োজনমতো রাজনীতিকে ব্যবহার করে। পুলিশও হয়ে উঠেছে রাজনীতির দাস। যে দল ভারী, যেখানে গেলে সহজে প্রমোশন পাওয়া যাবে, সেই সব দিকে পুলিশ কর্তাদের নজর। তাই পার্কের পুলিসটি রাজনৈতিক নেতা অরিজিৎদাকে দেখে তোষামোদ করতে যায়। এমনকি তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে নিজের প্রমোশনের ব্যাপারে খবর নিতে চায়। বর্তমানে রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা কতটা কলুষিত চরিত্রেরসংলাপে মধ্যে দিয়ে নাট্যকার নাটকে তুলে ধরেছেন—

তন্ময়: অরিজিৎ দা।

অরিজিৎ: কি তন্ময়? কি খবর?

তন্ময়: ভাল দাদা। আপনার?

অরিজিৎ: ওই চলে যাচ্ছে আরকী। তারপর, কাল কী বলে তোমরা আমাদের ওপর লাঠি চালালে?

তন্ময়: (একগাল হেসে) আমি ছিলাম না দাদা।

অরিজিৎ: ওই হল। তোমাদের লোক তো বটে।

তন্ময়: নিশ্চয়ই ওপর তলার হুকুম ছিল। ছাড়া পেলেন কখন?

অরিজিৎ: এক ঘণ্টার মধ্যেই। রাতে দেখলাম গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে। সকালে উঠে চলে এলাম পার্কে।

তন্ময়: কালকের ব্যাপারে আপনারা আর এগোবেন?

অরিজিৎ: জরুর। রানাঘাটেও আমাদের তিনটে ছেলেকে ওরা মেরে ফেলেছে। তার মধ্যে একটা ছিল অজিত দার গ্রুপের ছেলে। সদ্য আমাদের কাছে আবার ফিরে এসেছিল। দেখি, আজ ইফতিকার সাহেবের বাড়ি দাওয়াত আছে। ওনাকেও বলতে হবে।

তন্ময়: সেকী দাদা! ইফতিকার সাহেব তো আপনাদের অপোজিশান।

অরিজিৎ: উনি দীর্ঘদিন আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। পলিটিক্স মানে তো আর পরিবার-বন্ধুত্ব বিসর্জন দিতে পারিনা।[১]

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পুলিশ তন্ময় বাবু এবং রাজনৈতিক নেতা অরিজিতের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। আসলে বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক নেতারা সাধারন মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা নিরাপদে থাকতে ভালবাসে। তাদের সঙ্গে বিরোধী দলের নেতাদের প্রকাশ্যমঞ্চে বিরোধীতা দেখা গেলেও মঞ্চের বাইরে তারা একে অপরের ফ্যামেলি ফ্রেন্ড। রঞ্জনের কথায় পিসফুল 'কো-একজিসটেন্স'। পুলিশ কর্তারা এসব রাজনৈতিক নেতাদের পদলেহনকারি, সুবিধাভোগী। পুলিশ কর্তা তন্ময়বাবু রাজনৈতিক নেতা অরিজিৎ বাবুকে বলতে শোনা যায় —

'তাহলে দাদা আমার ব্যাপারটা তো আপনি ইফতিকার সাহেব কে বলতে পারেন, অনেকদিন প্রমোশন টা আটকে আছে।'[২]

নাট্য কাহিনিতে দেখা যায় ছাব্বিস বছর পর সব্যসাচী সেন ফিরে আসেন। তখন জগৎ জীবন অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। যে রাজনৈতিক কারণে সব্যসাচী কে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে একদিন, সেই রাজনৈতিক চরিত্র বদলে গেছে। তাই কমরেড সব্যসাচী সেন নিজের বাড়িতে এসে, নিজেই হয়ে গেছে অচেনা। যে আদর্শ, যে সমাজতান্ত্রিক নেশা নিয়ে সব্যসাচী সেন কে বাবার কাছ থেকে ত্যাজ্যপুত্র হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল, সেই বামপন্থী দলের নেতারা আজ নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। সব্যসাচী সেন যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে ছিল সেই কংগ্রেস দল ভেঙ্গে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস হয়েছে। ছাব্বিস বছর পর ঘুম ভেঙে চারিদিকের পরিবর্তন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। তাই সে প্রশ্ন করেছে—

"আচ্ছা বলতে পারেন, এই পালটানো টা কি আমাদের ভেতর থেকে হয়, নাকি বাইরে থেকে? আর চারপাশটা, সেটারই বা কী হয়?"[৩]

বলা শক্ত, বলা কঠিন, পাল্টে যায় তার কতটুকু আমরা বলতে পারি। সব্যসাচীর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী, কন্যা ইন্দ্রাণী, পুত্র ইন্দ্র। ইন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সক্রিয় কর্মী। অপরদিকে সব্যসাচী সেন একজন কমিউনিস্ট লিডার। ইন্দ্র তার মায়ের কাছ থেকে শুনেছে সত্তরের দশকের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী। রাজলক্ষ্মী ইন্দ্রকে বলে—





"তোরা সেসব দিন দেখিসনি। রাত্রে তোর বাবাকে খেতে দিতে যাব- শুনলাম পাড়া ঘিরে ফেলেছে। একদিকে পুলিশ, আরেক দিকে কংগ্রেসি গুন্ডার দল। তোর বাবা খাবার টুকুও মুখে দিতে পারেনি।"[৪]

রাজনীতির বর্তমান ছবিটা ইন্দ্রের কাছে অনেকটাই স্পষ্ট। সে জানে সেই সময় যারা কংগ্রেসী হয়ে অত্যাচার করেছে, সময়ের পালাবদলে তারা শাসক বামপন্থী দলের সক্রিয় কর্মী।

তাই ইন্দ্র তার মায়ের উদ্দেশ্যে বলে—

"সেইসব গুন্ডাদের আজ অনেকেই তোমাদের পার্টি করে"।[৫]

আসলে ইন্দ্র আজ বেকার। তারা মা, বাবা যে দলের জন্য সারাজীবন লড়াই করল, সেই দলের সুবিধাবাদী নেতারা নিজের স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত। চরম দুঃখ যন্ত্রণায় ইন্দ্র তার মাকে বলে —

"ইউনিয়ন সেক্রেটারির শালীর ছেলেই তো চাকরীটা পাবে— আমার চেয়ে অন্তত তিন গুণ খারাপ রেজাল্ট ছিল মালটার।"

'রাজনীতি করলেই যে কিছু পাওয়া যায় সেটা একটা বাচ্চাও জানে। তোমাদের পার্টিই জানিয়েছে।'[৬]

বর্তমান রাজনীতি চলছে চাওয়া-পাওয়া নীতির উপর নির্ভর করে। সব্যসাচী সেন রাজলক্ষ্মী পার্টির জন্য সবকিছু ছেড়েছে, নিজের জীবনকে বাজি রেখেছে পুলিশের গুলির সামনে; সেই পার্টি আজ কিছু স্বার্থসিদ্ধি কামি মানুষের দ্বারা চালিত নিয়ন্ত্রিত। রাজলক্ষ্মী প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে ইন্দ্রকে বলেছে—

রাজলক্ষ্মী—'অথচ আমরা কিন্তু করতাম কিছু দেবার জন্য"।[৭]

ইন্দ্র তার মাকে উত্তর দেয়

"সে তোমার মত বোকা এখনো কিছু আছে। যুগটা পাল্টে গেছে মা। আমাদের সময়ে যে পারছে নিজেরটা গুছোচ্ছে"। সব্বাই। যে পারছে না, হয় অন্ধকারে গুটিয়ে থাকছে, নয় ফ্রাসটেটেড হয়ে অন্যকে গালমন্দ করে চলেছে। ইডিওলজি। ইডিওলজি কপচে আর কথা বলে কোন লাভ নেই মা। লোকে কাজটা দেখে, কাজ। একটা মানুষ কী ভাবে আর কী বলে, সেই টুপি দিয়ে এখন আর চলবেনা- লোকটা কী করছে- সেটাই আসল।'[৮]

রাজলক্ষ্মীর মনে সদা সর্বদা আদর্শবাদী মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। সে সব্যসাচী সম্পর্কে কন্যাকে বলে—কোন কমরেড এর মধ্যে একটুখানি আদর্শ ত্রুটি ঘটলে, তোর বাবা তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঝাতেন। বাড়িতে বসে থেকে বুজবার চেষ্টা করত তার প্রবলেমটা কোথায়। রাজনৈতিক আদর্শচ্যুত না হয়ে রাজলক্ষ্মী নিজের দলের সম্পর্কে বলেন—

"তার ছেলে হয়ে তোর দাদা কোন পার্টি করে, যারা বিজেপির মতো একটা ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দলকে পশ্চিমবঙ্গে হাত ধরে ডেকে এনেছে"।

ইন্দ্র: 'হ্যাঁ এনেছে বেশ করেছে। বিজেপি কি মুসলিম লীগের চেয়েও বেশি সাম্প্রদায়িক? বলো- কেরলে তোমরা হাত মেলাওনি। বাজপেয়ির সাথে হাত ধরাধরি করে শহীদ মিনারে মিটিং করেছিল কে? উত্তর দাও।'[৯]

ইন্দ্রঃ "ভণ্ডামো করার সময় বলবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি, আর তার বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে গেলে বলবে হয় প্রতিক্রিয়াশীল, নয় বিরোধীপক্ষ, যেন-তেন প্রকারেণ ব্রান্ডেড করো। ঠিক আছে তাহলে তাই হোক। পিডিএস এফ এস ডি এস আর করা সম্ভব নয়- যারা ক্ষীর পায়নি তাদের বেশিরভাগই ওখানে গিয়ে ভিড়েছে। আমি তবে লুচ্চাই হব, যা পারি তাই করবো।"

ইন্দ্র: "আমি চেঁচাব, হ্যাঁ আমি তৃণমূল করি। পরিষ্কার শুনে নাও ওখানে যদি আমার ধান্দা ঠিকঠাক না পোষায় তাহলে কাল দরকার পরলে ওই বিজেপি করব।রাম মন্দির চাইব, কর সেবা করব, ময়দানে গিয়ে হাফপান্ট পরে মার্চ করব।"[১০]

প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্র বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি। রাজনীতিকে কেবলমাত্র বাঁচবার অবলম্বন করে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায়। তাই নিজের মনে ক্ষোভ যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। কমরেড সব্যসাচী সেন বরানগরে রাজলক্ষ্মীকে দেখে বলতো কমরেড নবযুগ আনবে না। সেই সব্যসাচী সেন ছাব্বিশ বছর পর ঘুম থেকে জেগে ওঠে অনেক কিছুই চিনতে পারছেনা। চিনতে পারছে না তার পরিবারের পুত্র-কন্যাকে। চিনতে পারছেনা পুরনো শহরটাকে। শচীন তেন্ডুলকরের সে নাম শুনেনি, শচীন কর্তার নাম সে শুনেছে। মেট্রো মানে সব্যসাচী জানেনা মেট্রো রেল, তার কাছে মেট্রো হল সিনেমা হল।

সব্যসাচী সেনের কাছে এখন ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাস, কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক এগিয়ে গেছে। সালটা ২০০২। এই সময়ের হিসাব সব্যসাচীর অজানা। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে জগত, বদলে গেছে জীবন। ১৯৭০ সালের ১২ ই আগস্ট দুর্গাপুর মুভমেন্ট এর সময় ঋত্বিক ঘটক নতুন সিনেমার লোকেশন নিচ্ছিলেন। সেই ঋত্বিক ঘটক এখন আর নেই। এখন হিন্দি ফিল্ম স্টার ঋত্বিক রোশনের সময়। ঋত্বিক রোশনকে সব্যসাচী চিনে না। বন্ধু রাজেন জেল থেকে বেরিয়ে আজ চুপচাপ হয়ে গেছে। সব্যসাচী সেন বাংলা কংগ্রেস শুনেছে, নব কংগ্রেস শুনেছে, তৃণমূল কংগ্রেস শব্দটা শুনেনি। সব্যসাচী সেনের মুখেই শোনা যায় ইন্দ্রাগান্ধি নাকি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য কংগ্রেস ভেঙেছেন।

সব্যসাচী সেন যে মনেপ্রাণে ছিলেন কমিউনিস্ট, আর তার বাবা বিনয় ভূষণ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেস নেতা। সব্যসাচীর পুত্র ইন্দ্র বর্তমানে তৃণমূল দলের রাজনৈতিক কর্মী। সবাচীর কাছে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাস হলেও, প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্র স্মরণ করিয়ে দেয় বর্তমান সালটা জানুয়ারি ২০০২। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নয়, বুদ্ধদেব



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ভট্টাচার্য। অর্থমন্ত্রী অজিত পাঁজা নয়, সূর্যকান্ত মিশ্র। তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী নয়, প্রণব মুখার্জী। সব্যসাচি সেন জানে না, ইন্টারনেট গ্লোবালাইজেশন ওসামা বিন লাদেন- কিছুই জানেনা।

যেই কংগ্রেসীরা প্রবল ভাবে অত্যাচার চালিয়েছে কমিউনিস্টদের ওপর, সেই দল ইন্দ্র করে, একথা শুনে সব্যসাচী ঘৃণা প্রকাশ করেছে। তারপর সব্যসাচী সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন—

সব্যসাচীঃ "ঠিক, ঠিক বলেছে আমার ছেলে। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে এটা ২০০২ সাল। নতুন সময়। নতুন দিন। নতুন শব্দ। পুরনো সময় মরে গেছে। পুরনো দিন চলে গেছে, পুরানো শব্দেরা হারিয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা পুরনো মানুষ হঠাৎ ফিরে এসেছে আজকের দিনে।"[১১]

সময়ের প্রবাহে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে যাচ্ছে এবং যাবে। তবুও একটি মানুষ আদর্শ নীতিবোধ কে অঁকড়ে ধরে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান সুবিধাবাদী রাজনৈতিক বড় নেতারা, তাদের স্বার্থের জন্য নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। এককালের পুরানো রাজনৈতিক বন্ধু সনৎ চক্রবর্তী সে ও পার্টির বিরাট নেতা। নেতাজি নগরে সনৎ চক্রবর্তীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সব্যসাচী কে রাজলক্ষ্মী বলে—

"বিশাল পার্টির নেতা। উত্তর ২৪ পরগনার ভেড়ির মালিক, প্রোমোটার, জমি-জিরেত সব নাকি ওর হাতে।"[১২]

রাজনৈতিক নেতাদের বর্তমান রূপ টা কতটা স্বার্থপর ও নির্লজ্জ হতে পারে তা সনৎ চক্রবর্তীকে দিয়ে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। এই সনৎ নকশালপন্থী আন্দোলনের সময় ধরা পরেনি। কারণ তারা কোন এক মামা রঞ্জিত গুপ্তকে চিনত। তার সুবাধে সনৎ বেঁচে যায়। সনদ সবসাচীকে বলত স্টালিনের চেলা, আর সবসাচী সনৎকে বলত সিদ্ধার্থ রায়ের দালাল। আজ সেই সনৎ বামপন্থী দলের বড় নেতা। সনদ চরিত্রের এই রাজনৈতিক নীতিভ্রষ্টতার প্রসঙ্গে সব্যসাচী সনদকে জিজ্ঞাসা করে—

"আচ্ছা সনৎ তোর রাতের বেলা ক্রাইসিস হয় না যখন বেশিনে মুখ ধুতে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াস? নিজেকে বলিসনা কি করছি আমি? বলনা?"

সনদঃ "আমার বেসিনের সামনে আয়নার কাচ নেই রে ভাই, নাতি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছে। তোকে একদিন নিয়ে যাব, যা ব্যাট করে না- পুরো সৌরভ, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করবে।"

রাজনৈতিক নেতা সনৎ চক্রবর্তী অত্যন্ত রসিকতা করে বক্রোক্তি প্রয়োগ করে। রাজনৈতিক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে নিয়ে, বর্তমানে নিজের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি করায় বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মূল উদ্দেশ্য। সনৎ জানায়—

“আমাদের দেশ আধা ফিউডাল, আধা ক্যাপিটালিস্ট। পুঁজির বিকাশ আগে ঠিকঠাক হতে দে।”[১৩]

সমাজ পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। সুবিধাবাদীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে চলে যায় তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা ধরে রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। যারা বলে সাধারণ মানুষের বিকাশ ঘটাবো, তারাই আজ আত্মপুঁজির বিকাশ এর জন্য ব্যস্ত। তারাই এখন ধনতন্ত্রের পূজারী। শুধু কোন একটা রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে নয়, এ বিষয় ভাবনা বর্তমান সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষ, বেকার যুবক যুবতী- কর্মহীন হয়ে গহন অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। নাটকের পরিণতিতে দেখা যায় একটি বিশেষ সাক্ষাতার দিতে গিয়ে সব্যসাচীর বমি আসে। মেকি লোক ভোলানো প্রশ্নে তার গা গুলিয়ে ওঠে। মেয়ে ইন্দিরা তার বাবার সম্পর্কে টিভি চ্যানেলে গুছিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

সব্যসাচী কাহিনী সূত্রে সনৎকে প্রাভদা পত্রিকার কথা বলে। প্রাভদা মানে সত্য। সনৎ জানায় প্রাভদা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে সত্য লুকিয়ে আছে অসত্যের অন্ধকারে। যে আনন্দবাজার পত্রিকা কমিউনিস্টবিরোধী পত্রিকা ছিল আজ এখন সেই পত্রিকা ও সরকারের পক্ষে। সনৎ জানায় সব্যসাচীকে নিয়ে আনন্দবাজারে একটি স্টোরি বার করবে। নাম হবে “ঘুম ভাঙ্গা পাখি” সব্যসাচী জানতে চায়—‘আনন্দবাজার তোদের কথা শুনবে?’

সনৎ: ‘শুনবে ভাই, নিশ্চয়ই শুনবে। সেরকম খুঁটি যদি কালটিভেট করতে পারি কেন শুনবেনা। তাছাড়া ওরা তো আমাদের এখন তত ক্রিটিসাইজ করেনা। নিউ চেঞ্জটা ওরা খুব ভালোভাবে নিয়েছে। সেই জায়গা থেকে তোকে যদি কারেক্টলি প্রজেক্ট করা যায়- তাহলে—।’

সব্যসাচীঃ ‘আনন্দবাজার তোদের বন্ধু হয়ে গেছে?’

সনৎ: ‘এভাবে বলিস না। বন্ধুত্ব টন্ধুত্ব বুঝি না- এখন সবই ইস্যুভিত্তিক কোয়ালিশনের যুগ- আমাদের ইস্যুকে যে সাপোর্ট করবে সেই আমাদের বন্ধু। আর সেটাই তো হওয়া উচিত।’[১৪]

এইভাবে বর্তমান রাজনীতি চাকা ঘুরছে। একথা রাজনৈতিক নেতা সনৎ জানায় সব্যসাচী সেনকে। নাটকের পরিণতিতে দেখা যায় ইন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস দল ছেড়ে দিয়েছে। সে বুঝেছে সব রাজনৈতিক দলে চরিত্র একই। আসলে বর্তমান সমাজে রাজনীতির চরিত্রটাই বদলে গেছে। তৃণমূল দল ছেড়ে দেওয়াই সনৎ ইন্দ্রকে নিজের দলে টানার চেষ্টা করে। সনৎ ইন্দ্রকে বলে—

‘এবার তাহলে একদিন আমার অফিসে আয়। কথা বলতে তো কোন ক্ষতি নেই। ’

ইন্দ্রঃ ক্ষতি আছে।

সনদঃ কি?





ইন্দ্রঃ ‘অশিক্ষিত বর্বর, শিক্ষিত বর্বরদের মধ্যে আমি খুব বেশি তফাৎ দেখিনা কাকা। একজন পেটে ছুরি মারে, আর একজন পিঠে। ফলাফল একই হয়, এইটুকু যা তফাত।’

ইন্দ্রের কথাবার্তায় প্রতিবাদী ইন্দ্রকে রাজনীতির ক্ষমতার স্পর্শী বর্তমান সরকারের নেতা জানান—

সনদঃ ‘দিন-দুপুরে অনেক ছেলে উধাও হয়ে যায় জানিস তো ইন্দ্র। উধাও। হাফিশ। তারপর আর কেউ তাকে কোনদিন খুঁজে পায়না।’

এমনকি সনদ এ কথা জানায় তবেত্ত ‘আমি জানি আগামী পচিশ বছর আমি বা আমরাই পার্টিতে বেশি করে থাকবো। তোর মা বা বাবা নয়।’

বর্তমান দিনে প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা নাট্যকার তুলে ধরেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টি, সোশালিস্ট ,বলশোভিক সবই একাকার হয়ে গেছে। প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মীরা হয়ে গেছে বাতিল। ইন্দ্র সব্যসাচী সেনকে অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা ক্ষোভ নিয়ে জানায়—

‘আপনি বুঝতে পারছেন তো? আপনারা এই সোসাইটিতে এখন বাতিল, লজঝরে, বুঝতে পারছেন? আপনার নিজেকে নিয়ে কষ্ট হচ্ছে না? মনে হচ্ছে না যা ভেবেছেন, যা করেছেন যা বলেছেন তার আসলে কোনো মানে নেই। নিজেকে ডাসটবিন লাগছেনা। দেখুন সব্যসাচী তিরিশ বছর পর আপনার দুনিয়াটা এভাবে পাল্টে গেছে। মাথায় কোন ছাতা নেই, পাশে কোনও শিবিরনেই, সঙ্গে কোনো মিছিল নেই, আপনি এখন একা। পুরোপুরি একা।’

‘পক্ষ নিন সব্যসাচী, পক্ষ, কোনো না কোনোও পক্ষ আপনাকে নিতেই হবে। সঙ্ঘ ছাড়া, পক্ষ ছাড়া, শিবির ছাড়া, আপনার ভবিতব্য হবে রিপভ্যান উইঙ্কেল মতো। সেও ঘুম থেকে উঠে এসে কারোও সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেনি- কারোও সঙ্গে না। পক্ষ নেন সব্যসাচী। কোনোও না কোনো পক্ষ।’[১৫]

সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ছবির পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জমি, মস্তান, প্রোমোটার, চেয়ারম্যান, মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং, ক্লাব, ভেরি। এসব কিছুই এখনকার রাজনীতির অঙ্গ। এই পরিবর্তনে রাজেন মল্লিক যেএকদিন ছিল নকশালপন্থী আন্দোলনের নেতা, সেও আজ পাড়ার মস্তানদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। কারো নৈতিকতা মানবিকতা কিছু নেই।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃত স্বার্থহীন মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে মানুষ হিসেবে মান আর হুস হারিয়ে গেছে। আজকের দিনে আমরা মানুষ চিনি তার দুর্বলতা দিয়ে। তাই কাউকে পরিচয় দিতে বলতে শোনা যায়না—

‘ওই মানুষটাকগো যে খুব সুন্দর আর উদার। কি মহৎ। না, শুনবে ওই যে লোকটা কানা, ওই যে লোকটা খোড়া, ওই যে লোকটা মোটা, ওই যে লোকটা পাগল, ওই যে লোকটা পাগল আছে, পাগল হবে ওই যে লোকটা।’[১৬]

এই নাটকে বামপন্থি দলের ভাঙ্গন ও একাধিক উপদলের পরিচয় উঠে এসেছে। রাজেন তার রাজনৈতিক জীবনের অনেক বন্ধুদের খবর রাখে। সত্তরের দশকে অনেক রাজনৈতিক বন্ধু, রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরে আসতে পেরেছে। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই হতাশার অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে। ক্ষমতা দখল করেছে সুযোগ সন্ধানী কয়েক জন। এই আত্ম-অনুশোচনায় রাজেন বলে—

'আচ্ছা আমরা পাল্টালাম না কেন? বোকা বলে? বুদ্ধিমান তাহলে কাকে বলে? বুদ্ধিমান কে? বলতে পারিস তুই আমায়?'[১৭]

নাটকটিতে সত্তরের দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলন, নকশালপন্থী আন্দোলনের পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। সময় সমাজ যে কতটা পরিবর্তিত, রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র পরিবর্তনের স্বরূপটিও সমগ্র নাটকে জুড়ে বিদ্যমান। প্রকৃত নেতারা আজ মুখ লুকিয়েছে অন্ধকারে, ভন্ড নেতারা কায়েম করেছে দেশের শাসনভার। ফলে সমগ্র রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে। নাট্যকার ব্রাত্য বসুর 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' হয়ে উঠেছে সমকালীন রাজনৈতিক অভিজ্ঞান ।

**তথ্যসূত্র :**


১) ব্রাত্য বসু, 'নাট্য সমগ্র', প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
২) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৪৫/ম দৃশ্য
৩) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৪৬/১ম দৃশ্য
৪) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৪৮/২য় দৃশ্য
৫) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৪৯/২য় দৃশ্য
৬) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৪৯/২য় দৃশ্য
৭) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৪৯/২য় দৃশ্য
৮) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৫০/২য় দৃশ্য
৯) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৫৭/৩য় দৃশ্য
১০) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৬১/৪র্থ দৃশ্য
১১) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৬৪/৫ম দৃশ্য
১২) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৬৩/৫ম দৃশ্য
১৩) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৬৫/৫ম দৃশ্য
১৪) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৬৮/৬ষঠ দৃশ্য
১৫) দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা -২৬৮/৬ষঠ দৃশ্য




## বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত ছড়ার পাঠান্তর : একটি সমীক্ষা

**ড. বিশ্বজিৎ পাত্র**

ছড়া হল মানুষের আদিতম সাহিত্য প্রয়াসগুলির অন্যতম। মূলত "মৌখিক আবৃত্তির জন্য মুখে মুখেই যাহা রচিত হয়, তাহাই ছড়া"[১] ছড়া তাই বাক্কেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এই পর্যায়ের উপকরণ মাত্রেই মুখে মুখে সৃষ্টিলাভ করে মুখে মুখেই জীবিত থাকে। জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচক মত পোষণ করেন " Folk Literature is simply Literature transmitted orally."[২] লোককাহিনি, লোকগীতিকা, ছড়া, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ, প্রাবচন, হেঁয়ালি, লোকবিশ্বাস, লোক-শব্দালংকার, লোকবক্তৃতা, লোকসঙ্গীত, লোকোপমা, লোকনাম, লোকগাথা প্রভৃতি সবই বাক্‌কেন্দ্রিক ফোকলোর। "বাক্‌কেন্দ্রিক ফোকলোর-এর জন্ম যেমন মুখে মুখে, পূর্ববর্তী সমাজ থেকেপরবর্তী সমাজে, এক দেশ বা সমাজ থেকে অন্য দেশ বা সমাজে তার প্রচার তেমনি মুখে মুখেই হয়ে থাকে।"[৩] ছড়া যেহেতু মুখে মুখে রচিত এবং মুখে মুখেই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে, এক দেশ বা সমাজ থেকে অন্য দেশ বা সমাজে কিংবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রচারিত হয়, তাই একই ছড়ার নানা পাঠ দুর্লক্ষ্য নয়। ছড়ার এই পরিবর্তন বা পাঠান্তর ঘটে থাকে তার নমনীয় ও পরিবর্তনশীল স্বভাবের কারণে। কেননা, এর উৎস, ধারক, বাহক এবং রসগ্রাহক যেহেতু লোকসমাজ তাই তারা তাদের প্রয়োজন মতো এর রূপান্তর বা পরিবর্তন করে নেয়।

আবার অঞ্চল ভেদে ভাষাগত পার্থক্য, আবৃত্তিকারীর উচ্চারণের ত্রুটি কিংবা অক্ষমতা অথবা তার স্মৃতি দুর্বলতায় একই ছড়ার নানা পাঠভেদ ঘটে থাকে। এরকম রূপান্তর বা পরিবর্তন যেমন খেলার ছড়ার ক্ষেত্রে বালক-বালিকার কণ্ঠে ঘটে তেমনি জননীর ফেলে আসা শৈশবে শ্রুত ছড়া তার সন্তানকে বলতে গিয়ে স্মৃতি দুর্বলতার জন্য বা বৈচিত্র আনার জন্যও হয়ে থাকে। তাছাড়া অসংলগ্নতা যেখানে ছড়ার মূল বৈশিষ্ট্য সেখানে ভাবের ধারাবাহিকতা রক্ষার কোনো দায় থাকে না। তাই ছড়ার বিস্মৃত অংশ নিজের মতো করে পূরণ করে নিয়ে সকলেই সৃষ্টির আনন্দ লাভ করতে চায়। কেননা, "প্রতিটি মানুষের মধ্যে কম বেশি সৃজনী ক্ষমতা থাকে কিন্তু ভাব বা ভাবনা থাকলেও প্রকাশ ক্ষমতা সকলের থাকে না, কিন্তু সৃষ্টির আনন্দের স্বাদ সকলেই পেতে চায়। সৃষ্টির ব্যাকুলতা কম-বেশি সকলের মধ্যেই থাকে।"[৪] ছড়ায় যেহেতু সুসংহত ভাবপ্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকে না তাই এর ব্যবহারকারিনী কখনও কিছু পদ সমষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ে, কখনও বা বিশেষ পংক্তির পরিবর্তন করে অথবা ইচ্ছামত বাক্যাংশ বা পংক্তি বিশেষের সংযোজন ঘটিয়ে নিজের সৃষ্টিসত্ত্বাকে কাজে লাগিয়ে থাকেন। "অর্থের ধারাবাহিকতা রক্ষা কিম্বা বক্তব্য বিষয়ে কার্য্যকারণ সম্পর্ক রক্ষার দায় বহন করতে হয় না বলেই এটা সম্ভব হয়। তার অর্থ এই নয় যে সব

সময় ব্যবহারকারিণী ইচ্ছামত ছড়ার প্রচলিত পাঠের পরিবর্তন ঘটান। অনেক সময়ে স্মৃতিও কারণ হয়ে দেখা দেয়। পূর্বে যখন গৌরীদান প্রথার চল ছিল, তখন অল্প বয়সী মেয়ে বিবাহ সূত্রে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেত শ্বশুর ঘর করতে। বিবাহের দু'চার বছর পর সে যখন জননী হত, তখন শৈশবে শ্রুত ছড়া আত্মজকে ভোলাতে ব্যবহার করতে গিয়ে বিস্মৃত অংশ নিজের মত করে পূরণ করে নিত।”[৫]

রবীন্দ্রনাথ ছড়ার এই নিয়ত পরিবর্তনশীলতার জন্যই ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন- “আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান।” [৬] এ প্রসঙ্গে ছড়ার পাঠান্তরের বিষয়টিও তিনি প্রথম আমাদের সামনে দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরেন তাঁর ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের ‘ছেলেভুলানো ছড়া :২’ প্রবন্ধের ভূমিকা অংশে। এবিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ- “ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা (dialect) লক্ষিত হইবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জনীয় নহে। কারন, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় আথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয় না। কারন, এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা, ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃত ভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকালপাত্রবিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়তপরিবর্তনশীত প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।”[৭]

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে প্রচলিত ছড়ার পাঠান্তর, পাঠান্তরের প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য কারণ হিসেবে - স্থানভেদ, প্রয়োগকারীর স্মৃতি দূর্বলতা, ভিন্ন পরিবেশের প্রভাব ও অসংলগ্নতার সুযোগে বিস্মৃত অংশ নিজের মতো করে পূরণ করে নেওয়ার ঝোঁক কাজ করেছে বলে মনে হয়। যেমন —

ক) সন্ধ্যার বাতি লড়ে চড়ে
যত দেবতা রক্ষা কর্য়ে
আমাদের ধনকে যে গো দেইখতে লারে মনে মনে
তার মুখ পুড়াব গো তুষের আগুনে
যে দ্যাখে গো ভাল্যে ভাল্যে
তার চখ্যে দিব গো ভালাই তেল
যে আমাদের ধনকে খুড়্যে
তার মুখটি ধড়ধড়িয়ে পুড়ে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

খ) আলোর বাতি নড়ে চড়ে
আমাদের সনার মুখটি যেন কেউ না খুড়্যে
যে খুইড়বে সনার মুখটি
তার মুখটি যেন আগে খুড়্যে

গ) আলর বাতি নড়ে চড়ে
সনাকে যে দেইখতে লারে তার মুখটি পুড়ে।

ঘ) আলোর বাতি নড়ে চড়ে
যে আমার ভাইকে খুড়্যে
তার মুখ পিদিমে পুড়ে।

এখানকার জনজীবনে তুলসীতলায় সন্ধ্যারতির পর বাড়ির কচিকাচাদের আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার মুখের চারপাশে প্রদীপটিকে ঘুরিয়ে এই ছড়াগুলি এখনো বলার চল আছে। এর পিছনে সন্তানকে কেউ নজর দিতে পারবে না এইধরণের জাদুবিশ্বাসও সুপ্ত আছে। প্রয়োগকারীর মনের সেই সুপ্ত বাসনাই ছড়াগুলির কথাবস্তুতে উঠে এসেছে। প্রথম তিনটি ছড়ার কথায় বলে দেয় তা জননীর কণ্ঠাশ্রিত। তবে প্রথম ছড়ার ‘ধন’ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছড়ার স্নেহ সম্ভাষণে ‘সনা’ হয়ে পাঠভেদ তৈরি করেছে। এর পরেই তিনি দিব্য দিয়েছেন যদি তার ‘ধন’ বা ‘সনা’কে কেউ দেখতে না পারে কিম্বা তার মুখ ‘খুড়তে’ (নজর দোষ দিতে) আসে তবে তার মুখটি যেন আগে পুড়ে বা ‘খুড়্যে’। আর চতুর্থ ছড়ার আরতিকারী সন্তানের দিদিমা বা ঠাকুমা হওয়ায় ‘ধন’ বা ‘সনা’র পরিবর্তে ভাই সম্বোধন শোনা গেছে। তবে প্রথম ছড়ার সঙ্গে কথা-শরীরে বড় পরিবর্তন ঘটেছে প্রয়োগকারীর বিস্মৃতির কারণে। কেননা, “এইসকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।” ৮ তাই প্রথম ছড়ার তুষের আগুন, চেয়ে চেয়ে দেখা ও চোখ ভালাই তেল দেওয়ার প্রসঙ্গ বাকি তিনটি ছড়ার ক্ষেত্রে নেই। আবার ছড়ার বিষয় যেহেতু আহৃত হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সেহেতু প্রথম ছড়ার বিষয় বা বস্তুর অবর্তমানে বর্তমানের অভিজ্ঞতা বাকি তিনটি ছড়ায় উক্ত আনুপস্থিতির কারণ। এর ফলেও এই পাঠভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। বিবাহ ও অনান্য অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক কয়েকটি প্রচলিত ছড়ারও স্থান এবং পাত্র ভেদে নানা পাঠকে খুঁজে পাওয়া যায় —

ক) ইস্কুল মেলার ধারে ধারে টগর ফুল বই ফুটে না
আমাদের ধনি রগড় দিচ্ছে পালকিতে বই যাব না।

খ) ইস্কুল মেলার ধারে ধারে টগর ফুল বই ফুটে না
আমাদের বাবু মান কইরেছে পালকি ভিন্ন যাব না।

লক্ষণীয় দুটি ছড়াতেই প্রথম পংক্তি অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু ক) ছড়াটি মেয়ের বাড়িতে সমবেত মহিলাদের কণ্ঠে গীত হওয়ায় 'ধনি' বা মেয়ের কথা বলা হয়েছে এবং 'ধনি রগড় দিচ্ছে' বা সে জেদ ধরেছে পালকিতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যখন ওই ছড়াটি ছেলের বিয়ে উপলক্ষে গীত হচ্ছে তখন তা স্বাভাবিকভাবেই 'ধনি'র পরিবর্তে 'বাবু' হয়ে গেছে এবং 'রগড় দিচ্ছে' কথাটিও পরিবর্তিত হয়ে 'মান করেছে' হয়ে গেছে। কেননা, 'ধনি' 'রগড়' বা জেদ করলেও পুত্র সন্তানের প্রতি স্নেহাধিক্যের কারণেই সে 'মান' করেছে। এভাবে ছড়াটির পাঠান্তর ঘটেছে। এরকম পাঠান্তর শিশুদের জন্য রচিত ছড়াতেও মেলে,

ক) দোল দোল দোল
কীসের এত গোল
খঁকা যাইচ্ছে বিয়া কইত্যে
সাত শত ঢোল।

খ) দোল দোল দলনি
রাঙা মাথায় চিরুনি
দইলতে দইলতে আইল বান
কুড়াই পাইলম সোনার চাঁদ
যাক ধন থাক লাড়া
কিনে দিব হাঁসা ঘড়া।

দুটি ছড়াই ঘুমপাড়ানি ছড়ার অন্তর্গত দোলনার ছড়া। দোলাতে দোলাতে শিশুকে ঘুমপাড়ানোই ছড়াগুলির উদ্দেশ্য ফলে স্নেহ-চাপড়ের সঙ্গে দোলানোর তালে তালে ছড়াগুলির সুর এবং ধ্বনিটিই প্রধান বিবেচ্য হওয়ায় কথাবস্তুতে নানা রূপান্তর ঘটে গেছে। প্রথম ছড়ায় জননী বা শিশুধাত্রীর খোকাকে নিয়ে আহ্লাদের কথায় তার বিয়ে করতে যাওয়া (খঁকা যাইচ্ছে বিয়া কইত্যে) এবং সেই বিয়েতে 'সাত শত ঢোল' এর কথা বেশ মানানসই। আবার দ্বিতীয় ছড়াটিতে ধাত্রীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার মূল উদ্দেশ্য দুলিয়ে ঘুমপাড়ানোর চিত্র এক থাকলেও তার মনোবাসনা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে 'খকা'র বিয়ের চিত্রের স্থলে 'রাঙা মাথায় চিরুনি /দইলতে দইলতে আইল বান / কুড়াই পাইলম সোনার চাঁদ / যাক ধন থাক লাড়া / কিনে দিব হাঁসা ঘড়া।' প্রভৃতি প্রসঙ্গ জুড়ে গেছে ছড়ার অসংলগ্নতার সুযোগে। ছড়ার কামচারি ও কামরূপধারী স্বভাবের জন্যই এই পাঠান্তর গড়ে উঠেছে। ঘুমপাড়ানি ছড়ার মতো কান্নানিবারক ছড়ার ক্ষেত্রেও নানা পাঠ লক্ষণীয়,

ক) কীসের লাইগে কাঁদরে ধনি
কী না দিতে পারি
মনে কল্ল্যে সগ্গের চাঁদ
হাতে দিতে পারি।





খ) কীসের লাগ্যে কাঁদিস রে
কী না দিতে পারি।
চাঁদের লাগ্যে কাঁদিস রে
মন দুঃখে মরি।
দিনে চাঁদ গো কুথায় পাব
রাত্যে চাঁদের বাজার দিব
চাঁদ দিব নাই গো চাঁদের মালা দিব
সে চাঁদ লিয়ে গো উদয় হব।

এই কান্না নিবারক ছড়াগুলিতে সন্তানের কান্না থামানোর জন্য জননী বা জননীস্থানীয়ার প্রতিশ্রুতি এবং কান্নাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতির বৃদ্ধি কিম্বা স্থানান্তরে তার রূপান্তর ছড়াটির দুটি পাঠ গড়ে তুলেছে। তাই প্রথম ছড়ায় কান্না থামাতে 'সগ্গের চাঁদ' হাতে দেবার কথা থাকলেও দ্বিতীয় ছড়ায় তা 'রাত্যে চাঁদের বাজার' ও 'চাঁদের মালা' দেবার প্রতিশ্রুতির হেরফেরে পাঠান্তর সৃষ্টি হয়েছে। শিশুকে দেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনো বালাই নেই বলেই কান্না বৃদ্ধির সাথে প্রতিশ্রুতিরও বৃদ্ধির কারণে এই পাঠান্তর ঘটে থাকতে পারে। এ সংক্রান্ত অন্য একটি ছড়ারও দুটি পাঠ পাওয়া গেছে —

ক) আঁক বাড়ির ধারে গো
কাদে ছেল্যা কান্দে গো
আইস বাবা কলে লিব
বড় দয়া লাগে গো।

খ) আঁক বাড়ির গাঁজাড়ে
কার ছেল্যা কান্দে রে
আইস ছেল্যা কোলে লিব
বড় সুখ লাগে রে।

এই দুটি ছড়ার ক্ষেত্রে প্রথম ছড়াটির থেকে দ্বিতীয় ছড়ায় কয়েকটি শব্দের অদল-বদল ঘটেছে। যেমন- প্রথম ছড়ার 'ধারে গো', 'কান্দে গো', 'বাবা', 'দয়া লাগে গো' দ্বিতীয় ছড়ায় হয়ে গেছে 'গাঁজাড়ে', 'কান্দে রে', 'ছেল্যা', এবং 'সুখ লাগে রে'। লক্ষণীয় দুটি ছড়াতেই মানবিক গুনের প্রকাশ ঘটলেও দ্বিতীয় ছড়ায় মাতৃহৃদয়ের আকুলতাই প্রধান, সম্ভবত জননী সন্তানহীনা। এই সন্তানহীনা জননীর মাতৃহৃদয়ের আকুলতাই 'আইস ছেল্যা কোলে লিব/বড় সুখ লাগে রে' ছড়াটির দ্বিতীয় পাঠ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এবিষয়ক অপর একটি ছড়ার দুটি পাঠ হল —

ক) ছোট পুটি খ্যাঙরা মুখি
ফেলছু কেনে চইখের জল

তুমায় আমি দিতে পারি
ঝুমুমি আর খেলার বল।

খ) গোমা মুখি ছোট্ট খুঁকি
ফেলছু কেনে চইখের জল
আমি তুমায় দিতে পারি
ঝুমুমি আর খেলার বল।

এই দুটি ছড়ার পাঠভেদ গড়ে দিয়েছে সন্তানের প্রতি স্নেহ-সম্ভাষণের তারতম্য। এর ফলে প্রথম ছড়ার 'ছোট পুটি' ও 'খ্যাঙরা মুখি' দ্বিতীয় ছড়ায় 'ছোট্ট খুঁকি' এবং 'গোমা মুখি' সম্ভাষণে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার 'খ্যাঙরা মুখি' ও 'গোমা মুখি' এই দুটি শব্দের মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গবৈষম্যের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা, খোকা সবসময়েই 'চাঁদ মুখ' কিন্তু খুকি 'খ্যাঙরা মুখি' বা 'গোমা মুখি'। নারী-পুরুষের সামাজিক যে বৈষম্য তা শিশুদের মধ্যে নেমে আসার কারণেও এই পাঠান্তর ঘটে থাকতে পারে।

ক) আয়রে সব ছেল্যা পেল্যারা
মাছ ধইরতে যাব
মাছের কাঁটা পায়ে ঢুইকেছে
দলায় চাপ্যে যাব
দলায় আছে কামরাঙা
খাইতে খাইতে যাব
পথে আছে ছ'পন কড়ি
গুইনতে গুইনতে যাব।

খ) আয়রে ছানাপনারা
মাছ ধইরতে যাব
মাছের কাঁটা পায়ে ঢুইকলে
দলায় চাইপে যাব
দলায় আছে ছপন কড়ি
গুনতে গুনতে যাব
একটি কড়ি বাড়্যে গেল্যে
মিঠাই কিনে খাব
সে মিঠাই কিইহল?
বিড়ালে খাইল।
সে বিড়ালটি কি হইল?



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

গাছে উইঠেছে।
সে গাছটি কি হইল?
কাইটে কুট্যে পিড়া বানাইল।
সে পিড়াটি কি হইল?
বউ বস্যেছে।
সে বউটি কি হইল?
জলকে যাইয়ে ডুইবে মইরেছে।

এখানে প্রথম ছড়ার 'দলায়' রাখা 'কামরাঙা' খেতে যাওয়ার প্রসঙ্গটি দ্বিতীয় ছড়ায় স্থানভেদে 'মিঠাই কিনে' খাওয়াতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এছাড়া 'পথে ছ'পন কড়ি' থাকার কথা নয় ভেবে দ্বিতীয় আবৃত্তিকারী মনে করায় হয়তো তা 'দলায়' রাখার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ছড়ার শেষাংশের প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিমাটিও প্রশ্নোত্তরবাচক খেলার ছড়ার অংশবিশেষ ঢুকে পড়েছে বলেই মনে হয়। আসলে "ছড়ার মধ্যে কোন চিত্রই যেমন স্থায়ী হইতে পারে না, এখানেও"[৯] তেমনি পরপর কয়েকটি চিত্র- মিঠাই কেনার কথা, সেই মিঠাই বিড়ালের খেয়ে ফেলা, বিড়ালের গাছে উঠা, গাছ কেটে পিড়া বানান, পিড়াতে বউ বসা এবং তার জলে ডুবে মরার কথা ভিড় করেছে। এক্ষেত্রে বউয়ের জলে ডুবে মরার কথা বেশ তাৎপুর্যপূর্ণ। প্রথমত এর মাধ্যমে উঠে এসেছে সামাজিক জীবন-যাপনের অতীত কাহিনি। তখনকার দিনে মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে যেত এবং অল্পবয়সি বউদের ঘাটে জল আনতেও যেতে হত। এভাবে ঘাটে জল আনতে গিয়ে কিম্বা স্নান করতে নেমে কোনো বাল্যবধূর জলে ডুবে মরার স্মৃতি হয়তো এর মধ্যে রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অবহেলিত। পরিবার জীবনে শাশুড়ি ননদিনির সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে কোন্দল প্রায় নিত্য ঘটনা। সেদিক থেকে বধূর জলে ডুবে আত্মহত্যাও অবিশ্বাস্য নয়। সেই স্মৃতিও সমাজবাহিত হয়ে শিশুর খেলার ছড়ায় চলে আসতে পারে। সুতরাং এই বধূর ডুবে মরার পিছনে দুর্ঘটনাজনিত বা স্বেচ্ছামৃত্যুর স্মৃতি রয়ে গেছে বলে মনে হয়, যা ছড়াটির পাঠান্তর সৃষ্টিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

ছড়ার পাঠান্তর সম্পর্কিত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে ছড়ার পাঠান্তরের পিছনে স্থানভেদ, আবৃত্তিকারীর বিস্মৃতি, বিস্মৃত অংশ নিজের মতো করে পূরণ করে নেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয় কাজ করেছে। এই পাঠভেদ যেমন গড়ে উঠেছে শব্দের অদল-বদলে তেমনি পংক্তির পরিবর্তনে। অনেকক্ষেত্রে আবার ছড়ার অসংলগ্নতার সুযোগে একটি ছড়ার অংশ বিশেষ ধ্বনি-সুষমার উপর ভর করে অন্য ছড়ায় ঢুকে পড়েছে। তবে এই পাঠান্তর ঘটেছে মূলত আনুষ্ঠানিক ছড়া, শিশুকেন্দ্রিক ছড়া এবং খেলার ছড়াগুলিতে। ব্রত কিম্বা মন্ত্রের ছড়ায় এই পাঠান্তর ঘটেনি। যেহেতু মন্ত্রের ছড়া সর্বজন ব্যবহৃত নয়, নির্দিষ্ট কিছু

মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এর সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও কাঙ্খিত ফললাভে বিঘ্ন ঘটায় তাই এর পাঠান্তর ঘটেনি। এই ধর্মভীতিই মন্ত্রের ছড়াগুলির ভাব ও ভাষাকে আজও অবিকৃত রেখেছে।

**তথ্যসূত্র :**

১) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য। দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা- ১
২) মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, অবসর, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ২০
৩) তদেব। পৃষ্ঠা- ২০
৪) সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), বাংলার ছড়া: ছড়ার বাংলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৩
৫) তদেব। পৃষ্ঠা- ১৩
৬) রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড। ১৯৮৭, শু১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ : পৃষ্ঠা- ৭৬৯
৭) তদেব। পৃষ্ঠা- ৭৭০
৮) তদেব। পৃষ্ঠা- ৭৫০
৯) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য। দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা- ৮৬



## প্রবাহমান সাহিত্য ধারায় জনজাতির উপস্থিতি

**ড. মৌসুমী ব্যানার্জী**

পৃথিবীর ইতিহাসে আদিবাসী মানুষ ও অরণ্য জনজাতি সমার্থক। জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতিকে অবহমান কাল ধরে বহন করে চলেছে এই জনজাতি সমাজ। সভ্য জগৎ থেকে অনেক দূরে থেকেও তথাকথিত সভ্য জমিদার, মহাজন, রাজা বা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে নিপীড়িত, শোষিত, লাঞ্ছিত হয় এসেছে তারা। কেবলমাত্র সভ্য সমাজের ধূর্ত বুদ্ধিমত্তা নয়, নিজেদের সহজ, সরল লোভহীন জীবনযাত্রা বারে বারে তাদের ঠেলে দিয়েছে মৃত্যু উপত্যকায়। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নানা ভাবে স্থান পেয়েছে অরণ্য জনজাতি। এই প্রবন্ধে মূলত শেষ সহস্রাব্দ অর্থাৎ ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বিবেচনা করা হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে বিভিন্নরূপে আদিবাসী জনজাতিরা প্রতীয়মান হয়েছে। কোথাও তাদের উল্লেখ অনার্যরূপে, আবার কোথাও দস্যু-রাক্ষস-পণি-অসুর ইত্যাদি পরিচয়ে। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ 'বেদ' এর প্রথম ভাগ ঋগ্বেদ সংহিতা'-য় 'দস্যু' জাতির কথা বলা হয়েছে। সেখানে আর্যরা যেমন 'গৌর-কান্তি', সব্রত এবং যজ্ঞ করে, অনার্য বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ বর্ণ, অন্যব্রত, এবং যজ্ঞে বিশ্বাস করে না। ঋগ্বেদ সংহিতা'-য় 'পণি' নামক অনার্য জাতিকে সংহার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া, এই গ্রন্থে 'অসুর' শব্দটিরও বারবার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে আর্যদের সাথে অনার্যদের যে যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে বৃহদ্রথ, অর্বুদ, শবর, মহিষাসুর প্রভৃতি বীর অসুরদের কথা আলোচিত হয়েছে।

প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ-এ রাক্ষস-দানব-দৈত্য প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনু সংহিতায় অনার্যরা উল্লিখিত। রামায়ণ এবং মহাভারত গ্রন্থদ্বয় বিভিন্ন অনার্যজাতির পরিচয় প্রদান করে; যেমন, শবর, মূতিব পুলিন্দ, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি। ভারতবর্ষের আদিম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ, যেমন বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে যে প্রাচীন জনজাতি বিভিন্নরূপে আবর্তিত হয়েছে, সেই ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। প্রাচীন বাংলা চর্যাসাহিত্যে প্রতিফলিত চণ্ডাল-নিষাদ-শবর প্রভৃতিরা মূলত ভারতবর্ষের প্রাচীন জনজাতিগুলির বংশধর। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত অনার্য, শবর, পুলিন্দ, কিরাত নামক অরণ্যচারী জাতির পূজিত দেবতারূপে চণ্ডী, সূর্যদেবতা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু ব্যাধের কথা উল্লেখ রয়েছে। সে ব্যাধ জাতির প্রতিনিধি। এছাড়া, শিবায়ন কাব্যে দেবী চণ্ডীর কোচনী রূপ, অর্থাৎ আদিবাসী জনজাতিভুক্ত কোচ জাতীয় রমণীর বেশ ধারণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির মিলন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে আর্য-অনার্য সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতিফলন নবরূপে প্রতীয়মান হয়, মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে; এই কাব্যে মধুকবি অনার্যদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদান করেছেন এবং তাদের বীর ও মানবিক রূপটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্য জাতির সহাবস্থানের কথা প্রতিভাত হয়েছে নবীনচন্দ্র সেন-এর কলমে। নবীনচন্দ্র সেন-এর লেখা রৈবতক' প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে, 'কুরুক্ষত্র' প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে এবং 'প্রভাস' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। এই কাব্য তিনটিতেই তিনি ভারতবর্ষের অখণ্ড সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিবিধ' প্রবন্ধের অন্তর্গত 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে বাংলার প্রাচীন জনজাতিগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। সঞ্জীবকুমার চট্রোপাধ্যায়ের ভ্রমণমূলক কাহিনি 'পালামৌ'-তে 'কোল' এবং 'অসুর' অরণ্য জনজাতির অবস্থান, আচার-আচরণ ইত্যাদি উদ্ভাসিত হয়েছে, পরবর্তীতে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনি' প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে; এখানে 'ভীল বিদ্রোহ'-এর প্রেক্ষাপটে ভীল জনজাতীয় গোষ্ঠীর জীবন ও চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাসে জুমচাষকারী জুমিয়া আদিবাসী ও কুকি আদিবাসীদের কথা উল্লেখ করেন, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য ত্রিপুরায় রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সৈন্যদলে উপস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পে লেপাচা ভুটিয়াদের উপস্থাপন রয়েছে। ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' আত্মপ্রকাশ করে। 'কল্লোল'-এর সহযাত্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'কয়লা কুঠি' গল্প সংকলনটি প্রকাশ করেন। 'কয়লা কুঠি'-র অন্তর্গত 'নারীর মন', 'মা', 'ঝুমুর' প্রভৃতি গল্পে বর্ধমানের রানিগঞ্জ, বিহারের ধানবাদ খনি অঞ্চলের সাঁওতাল ও অন্যান্য জনজাতির নিঃস্ব-রিক্ত জীবনের কথা চিত্রিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে জনজাতি জীবনের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনা হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর প্রকাশ, ১৯৩৯ সালে 'আরণ্যক' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসটি ছাড়াও আর যে সকল রচনায় জনজাতি জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল তাঁর ভ্রমণ-কাহিনিমূলক রচনা 'অভিযাত্রিক' (১৯৪১), 'স্মৃতির রেখা' (১৯৪১), 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪৩), 'উর্মিমুখর' (১৯৪৪), 'বনে-পাহাড়ে' (১৯৪৫), 'হে অরণ্য কথা কও' (১৯৪৮)। 'আরণ্যক' প্রকাশের ঠিক পরেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। এই উপন্যাসে বীরভূমের সাঁওতাল জনজাতি গোষ্ঠীর জীবন ও ভাবনার বিষয়টি সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত। বীরভূমের ইতিহাসে ১৮৫৪ সালে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, সেই প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর "কালিন্দী" উপন্যাসটি রচনা করেন। 'কালিন্দী' রচনার দীর্ঘ সময় পর ১৯৬৬ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যবহ্নি' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি সাঁওতাল জনজাতির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। ১৭৯০ সালের পরবর্তী সময়ে চুয়াড়রা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যে



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই চুয়াড় বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ১৯৬৪ সালে চুয়াড় জনজাতির জীবনের বাস্তব চিত্র সুস্পষ্ট করেন তাঁর 'জঙ্গলগড়' উপন্যাসে। ১৩৫৬ এবং ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বিহারের তাৎমাটুলি অঞ্চলে বসবাসকারী ওঁরাও জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত ধাঙড়দের জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় নারায়ণ সান্যালের 'দণ্ডকশবরী'। এই উপন্যাসে মারিয়া-মুরিয়াদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া বোন্ডো, শবর প্রভৃতি জনজাতির কথাও উল্লিখিত। ১৯৫৫ সাল প্রকাশিত হয় পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর 'ভাগনাদিহির মাঠে'। রাজমহলের সাঁওতাল জনজাতি গোষ্ঠী, যাদের পূর্ববসতি ভাগনাদিহি, তাদের সমাজজীবনের কথা আলোচিত হয়েছে এই উপন্যাসে। রমাপদ চৌধুরীর 'অরণ্য আদিম' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। এই উপন্যাসে একাধিক জনজাতি গোষ্ঠীর জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে - জুয়াং, বিরহর, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি। সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এই উপন্যাসে সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি জনজাতির জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। উপন্যাসটিতে ইংরেজ সরকারের তীব্র শাসন-শোষণের চিত্র প্রকট হয়। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের মুণ্ডা, ওরাও এবং তিব্বতী-চীনা ভাষাগোষ্ঠীর লেপচা, ভূটিয়া প্রভৃতি জনজাতিদের নিয়ে সমরেশ বসু একাধিক উপন্যাস রচনা করেন। ১৯৭১ পূর্ববর্তী সময়ে, তাঁর 'দুই অরণ্য' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। জনজাতি সমাজের বিশ্বাস, সংস্কার-প্রথা, উৎসব-পার্বণ, রূপকথা-উপকথা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত নাগা পাহাড়ের নাগা জনজাতিদের নিয়ে রচিত হয় কথাকার প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী'। এই উপন্যাসটির আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৬ সালে। ১৯৭১ পূর্ববর্তী সময়ে মহাশ্বেতাদেবীর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞ্রির জীবন ও মত্যু'। ১৯৬৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে এই উপন্যাসটি, যেখানে ভীমাদলের রাজা গর্গবল্লভ দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছে চুয়াড় জনজাতি। অরণ্য-জঙ্গল প্রেক্ষাপটে, ১৯৭০ সালে প্রকাশিত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ-র 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসের কাহিনিতে প্রাসঙ্গিকভাবেই স্থান পেয়েছে ওঁরাও জনজাতি এবং খাঁরওয়ার অরণ্য জনজাতি। ছোটোনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ-এর রুমান্ডি ও সংলগ্ন অরণ্যবসতি নিয়ে উপন্যাসটির বিন্যাস।

সুতরাং বলা যেতে পারে আদি অনন্তকাল ধরে ভারতবর্ষের সাহিত্যভাবনায় অরণ্যচারী জনজাতিগুলির বিভিন্ন অভিধায় প্রকাশ ঘটেছে, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্য বা তথাকথিত সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে অসভ্য-বর্বর জাতি রূপে পরিগণিত হয়েছে। তাদের ভাবনায় ভাবনা মিলিয়ে, তাদেরকে দেখার মতো মনের মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তবুও ভারতবর্ষের

প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত অনার্যরা পরবর্তীতে জনজাতিরূপে বাংলা সাহিত্যে আলোচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বমহিমায় ভাস্বর।

১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত অরণ্য জনজাতি সম্বন্ধীয় উপন্যাসে উপস্থিত জনজাতি জীবন ও সংস্কৃতির বিষয়টি এখানে গভীরভাবে বিবেচিত হয়েছে। এই সময়কালে বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে যে সকল জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি চিত্রিত হয়েছে তার একটি বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত হল।

**মুণ্ডা জনজাতি :**

**অরণ্যের অধিকার :** মহাশ্বেতা দেবী রচিত 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটির প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৭৭ সালে। এই উপন্যাসে লেখিকা যে আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, তারা মুণ্ডা জনজাতি গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ভুক্ত।

**চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর :** মহাশ্বেতা দেবীর 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে মুণ্ডা জনজাতিদের কথা। সুদীর্ঘ উপন্যাসটিতে কাল প্রেক্ষাপটও দীর্ঘায়িত, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আশির দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। পালামৌ জেলার চোট্টি নদীর তীরের চোট্টি, কুরমী প্রভৃতি গ্রামকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির বিস্তার।

**মন চলো বনে :** সমরেশ বসু রচিত 'মন চলো বনে' উপন্যাসটি ১৯৭৩ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখক যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারা মুণ্ডা জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।

**বনের সঙ্গে খেলা :** সমরেশ বসু রচিত 'বনের সঙ্গে খেলা' উপন্যাসটি ১৯৭৪ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখক যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারা মুণ্ডা জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।

**প্রেম নামে বন :** কালকূট (সমরেশ বসু) রচিত 'প্রেম নামে বন' উপন্যাসটি ১৯৭৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখক যে অরণ্যচারী জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারা মুণ্ডা জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৭২-এর ৩০ জানুয়ারী পাকিস্তানী গুপ্ত খুনীদের গুলিতে মীরপুরে নিহত হন বিখ্যাত বাংলাদেশী ঔপন্যাসিক জাহির রায়হান। সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে লেখক এই উপন্যাস শুরু করেন। সুতরাং ধরা যেতে পারে এই উপন্যাসের কাল পটভূমি সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ। বিহার-উড়িষ্যার সারেন্ডা অরণ্য মাঝে অবস্থিত গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি প্রবাহিত হয়েছে।

**শালডুংরি :** বুদ্ধদেব গুহ রচিত 'শালডুংরি' উপন্যাসটি ১৯৮৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখক যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারা মুণ্ডা জনজাতি



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

সম্প্রদায়ভুক্ত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সময়কালকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা এই উপন্যাসের। মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা পর্বতমালার পাহাড় আর অরণ্য মধ্যে শালডুংরি হল উপন্যাসের স্থান প্রেক্ষাপট। পাশাপাশি রয়েছে টিগোরিয়া হাট। এছাড়া কাছাকাছি আছে ভালুকগাড়ার চার্চ। পাশেই অন্ধকার পাহাড়তলির ঘন জঙ্গল, যেখানে বসবাস সব হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের। ঘন্টা চারেকের হাঁটা পথে গুটিংগাড়া গ্রাম।

**সাঁওতাল জনজাতি :**

**অক্লান্ত কৌরব :** মহাশ্বেতা দেবীর 'অক্লান্ত কৌরব' উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮২ সালে। এই উপন্যাসটিতে যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ আছে তারা হল সাঁওতাল। সত্তরের দশকের শেষের দিকে যখন অপারেশন বর্গা আইনটি সঠিকভাবে প্রচলিত হল, সেই সময়ের ভাবনাকে সঙ্গে নিয়ে উপন্যাসটির আত্মপ্রকাশ। জাগুলা-পিয়াসোল-কাঁকড়াসোল- চরসা-পলতাকুড়ি-কদমখুঞ্জা-বাকুলি-সুড়া-গঞ্জরসুল-খেজুরহাটা-তালহাটা প্রভৃতি অরণ্য-গ্রাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসটি।

**হুলমাহা :** মহাশ্বেতা দেবী রচিত 'হুলমাহা' উপন্যাসটির প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৫ সালে। এই উপন্যাসে লেখিকা যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারা সাঁওতাল জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। হুল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর 'হুলমাহা' উপন্যাসটি।

**মাতালের হাট :** আব্দুল জব্বার রচিত 'মাতালের হাট' উপন্যাসটি ১৯৯৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখক যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারা সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত। আনুমানিক ষাটের দশককে কাল-প্রেক্ষাপট রূপে বিবেচিত করে উপন্যাসটি পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসটি একটি সুবৃহৎ ভৌগোলিক পরিসরের আয়োজন করেছে। উল্লিখিত হয়েছে টাটানগর, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া। এছাড়াও রাঁচি, খড়্গপুর, বীরভূম থেকে শুরু করে হাওড়া, কলকাতা পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে এই উপন্যাসে। কিন্তু মূল যে আদিবাসী অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে-তা হল পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মিলনস্থলে ঝাড়গ্রামের কাছে বংশীঢল গ্রাম। তার একদিকে শাল, পিয়াল মহয়ার অরণ্যে ঘেরা সবুজের মেলা, উত্তর-পশ্চিমে গুরুমহিষানী পাহাড়, ঢালু পাহাড়ী উচু-নীচু জায়গা, নীচু জায়গায় মাঝে মাঝে ধান খেত আর পাশ দিয়ে বয়ে চলা সুবর্ণরেখা নদী।

**বারো বন তেরো পাহাড় :** কালিপদ ঘটক রচিত 'বারো বন তেরো পাহাড়' উপন্যাসটি ১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশ হয়। এই উপন্যাসে লেখক যে অরণ্যচারী জনজাতিদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাঁওতাল। বিংশ শতাব্দীর পাঁচ থেকে সাতের দশকের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসটি মূলত সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া জনজাতিদের

নিয়ে। বীরভূম জেলার উত্তরে পাকুড় থেকে তিনপাহাড়, সেখান থেকে সাহেবগঞ্জ, তেলগড়িয়া হয়ে দুমকা পর্যন্ত এবং উত্তরে গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চলটি যার পার্বত্য নাম 'দামিন-ই-কো', সেখানে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমতেত বাস সাঁওতাল জনজাতির। পাহাড়তলি ময়দান ও কুলডাঙ্গা, কুন্থলিচক, ভাদুপাড়া, বগার্বাদি প্রভৃতি গ্রামে বসবাস করে সাঁওতাল জনজাতিভুক্ত মানুষগুলি।

**পঞ্চতপা :** আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'পঞ্চতপা' উপন্যাসটি ১৯৮৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখক যে পাহাড় ও অরণ্যাচ্ছন্ন জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারাও সাঁওতাল। আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে কাল-প্রেক্ষাপটরূপে বিবেচিত করে উপন্যাসটি পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসটি একটি নদীকে কেন্দ্র করে ড্যাম তৈরির প্রকল্প--এই পরিসরে আয়োজিত হয়েছে। উল্লিখিত হয়েছে মাড়াই নদী এবং পাহাড়ী ভৌগোলিক অঞ্চল। মাড়াই-এর এপার ওপার দুপারেই পাহাড়। পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী গভীর জনঙ্গলাকীর্ণ, তার মধ্য দিয়ে একে বোঁকে গেছে মাড়াই; এক রেখা মাত্র। মাড়াই নদীটি মূলত খরাপ্রবণ, বর্ষার সময় কিছুটা জল এসে মাড়াই-এর তৃষ্ণা মেটায়। এই আগুনসম নদীর বুকে জল পরিবহন করার প্রচেষ্টা অর্থাৎ ড্যাম প্রকল্প নিয়েই সমগ্র উপন্যাসটি সুসজ্জিত।

**লোধা জনজাতি :**

**ব্যাধখণ্ড :** মহাশ্বেতা দেবী রচিত ব্যাধখণ্ড উপন্যাসটি ১৯৯৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখিকা যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারা 'আখোটিয়া ব্যাধ' (লোধাশবর) জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসটি রচিত। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্য ও গ্রামকে কন্দ্র করে এই উপন্যাসটি পরিবেশিত।

**নাগেসিয়া জনজাতি :**

**টরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা :** মহাশ্বেতা দেবী রচিত 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসটি ১৯৮৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখিকা যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তারা নাগেসিয়া জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর মধ্যপ্রদেশের নাগেসিয়া জনজাতিদের নিয়ে লেখা এই উপন্যাস। স্বাধীনতা এবং চল্লিশ বছর এই বিষয় দুটির উল্লেখ, মহাশ্বেতা দেবী এখানে বিশেষভাবে করেছেন;

কারণ, স্বাধীনতা হল একটি দেশের নাগরিকদের কাছে সর্বোচ্চ গৌরব আর আবেগ, আর চল্লিশ বছর একটি সুদীর্ঘ সময়কাল। কিন্তু নাগেসিয়াদের জীবনে স্বাধীনতার গুরুত্ব কতটা, আর সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরে তাদের জীবনের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে, সেটি ভীষণভাবেই অস্পষ্ট।

**শবর জনজাতি (বসু শবর) :**

**আড়কাঠি :** ভগীরথ মিশ্র রচিত 'আড়কাঠি' উপন্যাসটি ১৯৯৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপন্যাসে লেখক যে অরণ্য জনজাতির কথা উল্লেখ করেছেন, তারা "শবের



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

(বসু শবর) জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। উপন্যাসের প্রকাশ ১৯৯৩ সালে। ধরা যেতে পারে সেই সময়কালের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। এমনিতে কোনো সময়কালের উল্লেখ না থাকলেও, যেখানে কলকাতা শহরের আনন্দম সংস্থা কেবল বিনোদনের জন্য থার্ড ক্লাস যাত্রাদলকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দেয়, তখন সময়কালটি প্রকাশনার সমসাময়িক রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া শহর থেকে আরও দক্ষিণ পশ্চিমে রাণীবাঁধ এলাকা সন্নিকটে জঙ্গল-ডুংরি ঘেরা পরিবেশের পটভূমিকায় এই উপন্যাসের উপস্থাপন।

**রাভা জনজাতি :**

**বিনদনি :** অমিয়ভূষণ মজুমদারের বিনদনি উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৫ সালে। এই উপন্যাসে সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির বর্ণনা দিয়েছেন। আনুমানিক আশির দশকে অর্থাৎ এই উপন্যাসের প্রকাশকালের সমসাময়িক সময়ের (যখন একজন শ্রেমিকের দৈনিক মজুরি ছিল তেরো টাকা চার আনা) প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। মূলতঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শুরু করে আসাম অবধি ভৌগোলিক স্থান প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটির বিন্যাস। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অরণ্য-নদী গ্রামাঞ্চলের, যেমন তাল্লিগুড়ি, অন্দরম তাল্লিগুড়ি, বাহির তাল্লিগুড়ি, চিকলিগুড়ি, শালবাড়ি, মাকালগুড়, বুড়ির হাট, প্রমোদনগর, ভোটমারি, তুরুককাটা, কামাক্ষাগুড়ি, গোপালগঞ্জ, রামপুর, শালমারি, মাগুরমারী, রায়ডাক নদী প্রভৃতি ভূখণ্ড জুড়ে বিন্যস্ত হয়েছে-উপন্যাসটির কলেবর। উপন্যাসে যে রাভা জনজাতির উল্লখ করা হয়েছে, তারা দীর্ঘদিন যাবৎ একটি মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাসের কারণে নিজস্ব সংস্কৃতি-ভাষা-ভাবনা থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে অবস্থান করেছে এবং করছে।

**মাককচ হরিণ :** অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মাককচ হরিণ' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতিদের নিয়ে। এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। আশির দশকের কাল প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয়েছে মাকচক হরিণ উপন্যাসটি।

পর্যালোচনায় দেখা যায় সাহিত্যে এই উপস্থিতি মূলত তাদের সংস্কৃতি ও সরল জীবন যাপনকে ব্যাখ্যা করে; তাছাড়া তাদের প্রতি হয়ে চলা ধারাবাহিক শাসন-শোষণ-অত্যাচারের কাহিনিও স্থান পেয়েছে সাহিত্যের আঙ্গিকে। কিন্তু ধীরে ধীরে সময় পরিবর্তিত হচ্ছে; ভাবনা-চিন্তা-দর্শন পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমান ও বিগত দশকের পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে, মূলস্রোতে জনজাতি মানুষের দ্রুত উপস্থিতি বিগত কয়েক দশকে যে পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে তা তার পূর্ববর্তী সহস্রাব্দেও সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র মূল স্রোতের সাথে মিশে যাওয়া নয়, দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে তাদের জীবন-সংস্কার-সংস্কৃতিতে। আশা রাখা যায় আগামীর বাংলা তথা ভারতীয় কিংবা বিশ্বসাহিত্যি নিশ্চিতভাবে এই বিবর্তন ও পরিবর্তনের ছবি আপন করে নেবে।

# মানভূমের বাংলার সাহিত্য আন্দোলন এবং ঝুমুর প্রসঙ্গ

ড. দয়াময় রায়

পূর্বতন মানভূম জেলা লোক সংস্কৃতির এক আকর ভূম। মানভূম নাচভূম বা গানভূম রূপে সুপরিচিত। লোক সংস্কৃতির এক বিরাট বিপুল বৈচিত্র্যে মান্য বাংলায় যেসব লেখালেখি হয়েছে এই ভূমিতে তার একটা অবলোকন তুলে ধরা যেতে পারে। লোকগানের ক্ষেত্রে ঝুমুর মৌখিক সাহিত্য সংস্কৃতির এক বিপুল সম্ভার আছে সেকথা সর্বজন বিদিত।

কিন্তু সেই ঝুমুরও লেখ্য রূপে ধরা দিয়েছে হাজার বছর বেশি আগের চর্যাপদে কিংবা আটশ বছর আগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। অন্যদিকে প্রায় দেড়শ দু'শো বছর আগে এখানকার লোক কবিদের রচনার লেখ্য রূপ কিংবা মুদ্রিত হয়েছে। ভবপ্রীতানন্দ ওঝার 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী' প্রকাশ সেকথারই প্রমাণ দেয়। এছাড়া অন্যান্য যেমন রাজপুরোহিত রাখাল চক্রবর্তীর বিভিন্ন গ্রন্থগুলির মধ্যে পঞ্চকোটের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করা যায়। অর্থাৎ লোক কবিতা, মুখের কবিতা, ঝুমুর, ভাদু, টুসুগান বা করম জাওয়া গীত, বিহার গীত, সারিগান প্রভৃতির পাশাপাশি জংগল মহল বা মানভূম ভূখন্ডের অনেক আগে থেকেই মান্য বাংলায় কবিতাধর্মী নাট্যধর্মী নানান ধরনের লেখালেখি চলতে থাকে। বিশেষ ভাবে জাঁতগান তার মধ্যে অন্যতম। এভাবেই পদ্যময় পুরাণ নির্ভর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। "জাল বিছিয়ে আকর মাটি রেখে গেল কাঁকর মাটি" অসাধারণ কবিতায় যেন মানভূম জেলা থেকে পুরুলিয়ার জেলার জন্মের বেদনার ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা রূপে জন্মের অনেক আগে থেকেই জঙ্গল মহল (১৮০৫) জেলা বা মানভূম জেলায় ( ১৮৩৩) আদিগন্ত টাইড়ঁ বাইদ আর শক্ত পাথুরে মাটির বুকে সাহিত্য সৃজনের বিশেষত বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ফল্গুধারার মতো স্রোত বহমান থেকেছে অন্তরালে।

'মানভূমে নাচভূমে গানভূমে
পুরুলিয়া যে জন্ম নিল সাবেক মানভূমে,
মানভূম তো মিস্টি মধুর
নাচে গানে সমুদ্দুর।
নাচভূমে আর গানভূমে।
ছৌ-ঝুমুরে মিস্টি সুরে-
লাগড়া বাজে গুম গুমে।
পুরুলিয়া যে জন্ম নিল সাবেক মানভূমে।
টুসু ভাদু, করম- জাওয়া,
উতল উদাস পাগলা হাওয়া,
হাসে কাশ, রাঙায় পলাশ,





পাহাড় টিলায় ধুম জমে।
পুরুলিয়া যে জন্ম নিল সাবেক মানভূমে,
নাচভূমে আর গানভূমে।
লাগড়া বাজে গুম গুমে।
গরীব দু:খী যত মানুষ,
গানে নাচে দারুণ খুশ।
পুরুলিয়া যে জন্ম নিল সাবেক মানভূমে।
যত সাধ আর স্বপ্ন,
সুরে ছন্দে তালে মগ্ন,
ডুব দেয় তো মরমে।
নাচভূমে আর গানভূমে।
পুরুলিয়া যে জন্ম নিল সাবেক মানভূমে।
সাধের মানভূমে,
লাগড়া বাজে গুম গুমে।
নাচভূমে গো গানভূমে।
বলে দয়াময় মোহময় মানভূমে।
পুরুলিয়া যে জন্ম নিল সাবেক মানভূমে।'

বাংলা সাহিত্য বারেবারে যে গতি বদল করেছে তার মূলে বিভিন্ন সময় কবি সাহিত্যিকেরা তাঁদের মত এবং পথকে কোনো না কোনো পত্রিকার মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। যেমন বঙ্গদর্শন, কল্লোল যুগ, সবুজ পত্রের যুগ, হাংরি জেনারেশন কিংবা সারা বাংলা জুড়ে ছোটোছোটো যে কোনো পত্র-পত্রিকা আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের গতিকে সেসব পত্রিকাগুলি পরিচালনা করেছে।

সাময়িক পত্রের প্রকাশের ঠিক ২০০ বছরের মাথায় দক্ষিণ -পশ্চিম সীমান্ত বাংলাতেও ত্রিশের দশকে, ষাটের দশকে কিংবা হাল আমলেও পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উদাহরণ হিসেবে বাঁকুড়ার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "প্রবাসী" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশ কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প প্রকাশের ভিতর দিয়ে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। এরকম অজস্র প্রমাণ রয়েছে।

বাংলা কবিতার জন্মের বয়স নয় নয় করে এগারো বারোশ' বছর অতিক্রান্ত। পয়ার, ত্রিপদী ছন্দ, প্রাচীন মাত্রাবৃত্তের আবেষ্টন ঘিরে বাংলা ভাষার কাব্য সূচনা ঘটে চর্যাপদে। সেই ধারাবাহিক গীতধর্মী কাব্যধারার সৃজনশৈলী নিয়েই প্রাচীন মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক বাংলা কাব্য জগত রচিত। এমনকি উত্তর আধুনিক কাল পেরিয়ে শূন্য দশকের কাব্য বা একুশ শতকের চর্চা শুরু হয়েছে। তার প্রমাণ শত শত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, হাজার হাজার

কবিতার জন্ম। হয়তো বা এক এক বছরের কোলকাতা বই মেলাতেও কয়েক শ’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তারপর মফঃস্বলের বুকেও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ফলে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা কাব্য চর্চার সাথে সাথে উত্তর, দক্ষিণ বাংলায় কিংবা মধ্য বাংলায় উপভাষা নির্ভর কাব্যধারাও অব্যাহত। কবিতা কি কেন লেখা হয় এ নিয়ে পন্ডিত মহল বা কাব্য রসিকদের নিরন্তর আলোচনা চলছে এবং তা চলবেও।

কালের প্রবাহে বারেবারে কবিতা আধুনিক হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যাকে নদীর বাঁক নেওয়া বলেছেন, অর্থাৎ একটা মর্জি বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ধারণ করবে কে? এটা কালের ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।”

এই কাল আর ভাব নিয়ে আবার আবু সয়ীদ আইয়ুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বলে গিয়েছেন—যে, কালের দিক থেকে যে কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে সে কবিতা রবীন্দ্র -প্রভাব মুক্ত আবার অন্তত মুক্তি প্রয়াসী কবিতাই আধুনিক কবিতাকেই তিনি আধুনিক কবিতা বলে চিহ্নিত করেছেন।” এই আলোচনা বহু চর্চিত, বহুল প্রচলিত।

আবার অন্যদিকে মধুসূদন দত্তই প্রথম যে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম দেন যে কাব্য কলায়, রবীন্দ্রনাথে তা আরো আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনা উপমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যেকার আন্দোলনেও আধুনিকতা এভাবেই বাংলা কবিতার গতি বদল করেছে। নদীর স্রোতের মতোই বাংলার সেই ধারা প্রবাহিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রতিভার পড়ন্তবেলায় শরীর মনে দীর্ণ অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে জীর্ণ এককথায় ভগ্নহৃদয়ে পঞ্চকোটাধিপতি নীলমণি সিংহদেবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই মধুকবির প্রথম আবির্ভাব ঘটে এই অগ্নিভূমে। পুরুলিয়া জজকোর্টে এক জরুরী মামলার কাজে।

পুরুলিয়া শহরের পূর্বতন সংস্কৃতি দপ্তরের পশ্চিমে জি, ই, এল চার্চে শ্রীমান খ্রিস্টদাসকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাকালে ধর্মপিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে

“কবির ধর্মপুত্র” নামে সনেটটি লেখেন। যা ১৮৭২ সালের নভেম্বর সংখ্যায় ” জ্যোতিরিঙ্গণ” পত্রিকায় প্রকাশ পায়—

‘হে পুত্র,পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দনের নীরে
-----------------------------------------------
খ্রীস্টদাস, লভো নাম,আশীর্বাদ করি,
জনক জননীসহ, প্রেম কুতূহলে!’

পুরুলিয়া শহরের জি, ই, এল চার্চে কবিকে সম্বর্ধিত করার সময় তিনি “পুরুলিয়া”





নামে যে সনেট- টি লেখেন তাতে পুরুলিয়া জেলাকে প্রথম কাব্যিক প্রয়োগে “পুরুল্যে” বলে উল্লেখ করেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম “পুরুলিয়া” শব্দটির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। যা “জ্যোতিরিঙ্গণ” পত্রিকার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—

‘পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত -মন্ডলে;
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জংগলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল- ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভূর কিঅনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবানতুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।’

বাংলা কবিতার প্রায় বারোশ’ বছরের পথ চলায় একটি প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া, তার প্রাণ কেন্দ্রের মর্মমূলে মূলত লোক সংস্কৃতির প্রবাহ, তবুও সেই জেলার বুকেও অজস্র পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেয়ে চলেছে শতাধিক বছর ধরে। এর ফলে এই জেলায় কাব্যকলা, কাব্য চর্চা হয়নি এমন তো নয়। যদিও বিহার বাংলা এই টানাটানিতে এ ভূমির শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত। সেই ধারানুস্রোতে মানভূম জেলা তথা পুরুলিয়াতে কাব্য আন্দোলন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

মানভুম গেজেটিয়ারে সেই পত্র-পত্রিকার ইতিহাস প্রসঙ্গ খুব কম হলেও আলোচিত হয়েছে—যেমন

‘Two News papers– the Manbhum and the Purulia Darpan dealing with topics of local interest are published at Purulia. The Santhal Mission Press at Pokhuria Publishes a quarterly magazine dealing with the progress of Medical Mission of India.’

(Gazetteer of the Manbhum District-H.Coupland– 1910)

পাহাড়ি ঝরনার মতো চলমান স্রোতধারা হল লিটল ম্যাগাজিন এবং নতুন লেখকদের আগমনের জীবন্ত দলিল সাময়িক পত্র। কে পরাধীন ভারতে এ জেলার সবচেয়ে শক্তিশালী

পত্রিকা ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত "মুক্তি" (১৯২৫) পত্রিকা। স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল আবহে মনন চর্চা অপেক্ষা স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্যই পত্রিকাটি নেতৃত্ব দিতে থাকে "মুক্তি", এজন্য "মুক্তি"-কে এ মাটির মুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক বলা হয়ে থাকে। আসলে মুক্তি তখন মুক্তি কামনায় ব্যাকুল ভারতবাসীর অন্তরের শপথ। এই প্রেরণার ফলশ্রুতির ফলে এভাবেই তরুণের শক্তির ঐক্যবদ্ধ আত্মপ্রকাশ। স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলা ভাষার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এবং দেশ গড়ার কাজে মুক্তি পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে, ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর মানভূম জেলা ত্রিখন্ডিত হয়ে পুরুলিয়া জেলার জন্ম। বাংলা ভুক্তির পরপরই অনেক গুলি পত্রিকার জন্ম হয়, যদিও সে আলোচনা অন্যত্র করা যেতে পারে। কিছু পত্রিকা হয়তো জন্মের পরই অবলুপ্ত কিন্তু বেশ কিছু পত্রিকার কথা উল্লেখ করতেই হয়।

বিগত শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে লোক সংস্কৃতি এবং মান্য বাংলায় কবিতা চর্চার এক পরিবেশ রচিত হয়। "ছত্রাক" পত্রিকা সেই ধারার উদগাতা। তারপর "আমরা সত্তরের যীশু" দিয়ে, কিংবা সুদূর মণিহারা থেকে "কেতকী" যা পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করল সাড়ম্বরে বা অন্যান্য বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা পুরুলিয়া জেলার কাব্য কবিতার আন্দোলনের মানচিত্রে রেখাপাত করে। আরো পরে নাটমন্দির সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ জেলার সাথে সারা রাজ্য এমন কি বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকের কবিতা ছড়া গল্প প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

পত্র-পত্রিকার সেই পূর্ণ ইতিহাস প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হতে পারে। কবিদের, লেখকদের স্বাধীন সত্তা মননের অভিঘাতে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক, এই অভিমুখই যাতে প্রসারিত হতে পারে তার নানা অনুশীলন, এও যেন এক আন্দোলন। সে ধারা অব্যাহত, প্রতি বছর বিভিন্ন সাহিত্য আসরে সারা রাজ্যের কবি, সাহিত্যিকেরা এসে মিলিত হচ্ছেন। এরূপ এক জেলার প্রাণধর্মে, অস্থিমজ্জায় লোকসংস্কৃতি, বিশেষ ভাবে তার চর্চা অনুশীলন এবং ঝুমুর প্রসঙ্গ বারেবারে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

সভ্যতা সংস্কৃতিতে নৃত্য, গীত, চিত্র ও সাহিত্য এই চতুর্বিধ আঙ্গিকের মধ্যে নাচ মানব সভ্যতা সংস্কৃতির প্রথম সোপান। তারপর গান, চিত্র এবং সব শেষে সাহিত্য। অথচ শেষের স্তরটি এখন চূড়ান্তভাবে এগিয়ে গেছে। তার কারণই হল সাহিত্য লিখিত রূপ। সেই প্রাচীন ধারাস্রোতের বহমানতায় নৃত্য অর্থাৎ আদিম মানুষের "কুন্দন নৃত্য" আজকের যুগ অবধি তার নানান রূপান্তরকরণ ঘটে চলেছে। যা ধীরে ধীরে লোকাধারকে আশ্রয় করেই ধ্রুপদী নৃত্য শৈলীতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে মানব সভ্যতার সংস্কৃতির যা ভিত্তি তার মূলে আছে লোক পরম্পরা। লোক জীবনের অনাবিল উৎসারেই নৃত্য গীত পাশাপাশি





প্রবহমমান। আর যে লোক সংস্কৃতির ভিত্তিমূল অবলম্বন করে পরবর্তীকালে ক্লাসিক্যাল নৃত্য গীত ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই লোকগান বা লোকনাচ অবলম্বিত হয়েই যে কোন ধ্রুপদী নৃত্যগীত ধারা আজ সমৃদ্ধ হয়েছে প্রচারের আলোকিত অবলোকনে।

পুরুলিয়া জেলার লোক সংস্কৃতির মর্ম মূলে গান আর নাচ এবং শস্যকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান। লোকাচার পার্বণ নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা মানুষের জীবন সংস্কৃতি এই ভূমিখন্ডটিকে গৌরবান্বিত করেছে। আজকের দিনেও লোক সংস্কৃতির সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক এ জেলা। যার উজ্জ্বলতায় সারা বিশ্ব উচ্ছ্বসিত।

চর্যাপদ ও ঝুমুর—ঝুমুর গানের ওজস্বিতার কথা, ভাষা গৌরব, পুরাণ থেকে হাল আমলের যেকোন বিষয় বা প্রসঙ্গ আধুনিকমনস্ক পাঠকের কাছে স্বীকৃত, সমাদৃত।

বাংলা লোকগানের জগতে মানভূম পুরুলিয়ার ঝুমুরগান প্রসিদ্ধ। যা হাজার বছর ধরে তার ঐতিহ্যানুসরণে রচিত হয়ে মুখে মুখে গীত হয়ে আসছে বলে একালের বহু লোক গবেষক মনে করেন।

বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে ঝুমুর গানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শব্দ, সুর, ভাষা, মাটির কথা, মানুষের বেদনাবোধ, উপমা, রূপক, অলংকার, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক তথা লোক সংস্কৃতির নিবিড় অনুষঙ্গ চর্যাপদে ধরা পড়ে। প্রান্তিক মানুষের জীবনকথা, সাদামাটা জীবনের লোককৃতি ধরা পড়ে বিভিন্ন পদে, যেমন—

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী।"

অহল্যাভূমি এ মাটির বুকে এরকম অন্ত্যেবাসী মানুষের কুঁড়েঘর এবং মানুষ মানুষী এখনো কত রয়েছে তা যত্রতত্র লক্ষ্য করা যায়।

কিংবা,  
নৃত্য গীত বাদ্য সমন্বিত যে লোক সংস্কৃতি তারও  
নানান পরিচয় চর্যাপদে মেলে, যেমন—  
'এক সো পদুমা চৌষট্টি পাখুড়ি  
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।'

আবার গুঞ্জামালার কর্ণাভরণ কুন্তল শবরীর সাজসজ্জা, সে দিক থেকে দেখতে গেলে হয়তো দেখা যাবে যে লোক সংস্কৃতির বিপুল ভান্ডারের ঐতিহ্য আজো ঝুমুর গানে লক্ষ্য করা যায়।

এভাবেই বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন

"চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" মানভূম পুরুলিয়ার লোক জীবন সংস্কৃতি, ভাষার রূপের পরিচয় কিছু কিছু স্থানে মেলে। আচার অনুষ্ঠান, বিবাহ রীতি, একান্নবর্তী পরিবারের বাঁধন কিংবা গ্রামীণ জীবনের টুকরো টুকরো ছবির নিবিড় সাঙ্গীকরণ ঘটেছে অনেক পদে।

চর্যাপদের প্রাপ্তি ঘটেছে পার্বত্যভূমি নেপালের রাজ দরবারে ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন জাগে মনে

বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য পদকারেদের কারো কারো আবাস কি এ প্রান্তভূমি! আর তাঁরা কি জৈন প্রভাবের কারণে ধীরে ধীরে নেপাল ত্রিহুতের চলে গেছেন। তাঁদের গীতধারার ভেতরে এ মাটি গান সুর যেন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এ তো প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার।

তবে একটা কথা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, চর্যাগীতির মধ্যে লোকসংস্কৃতির লোকভাষা লোকগান, লোকনাচের এক নিবিড় বন্ধন ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে।

তখনই প্রশ্ন জাগে মনে, অথচ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জনপ্রিয় লোকগান বাংলার লোকসংস্কৃতি ভূক্ত হলেও ময়মনসিংহ গীতিকার মতো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্য সারণিতে স্থান পায় নি।

তার কারণ কি লিখিত রূপেরই অভাব, নাকি অনাদর আর অবহেলায় পড়ে থাকা এই লোকসংস্কৃতি বা লোকশ্রুতি মান্যজনের স্বীকৃতির অপেক্ষায়!

আগেই বলেছি যে মানভূম লোকসংস্কৃতির এক আকর ভূম একথা সর্বজন বিদিত। লোকভূমি মানভূম থেকেই পুরুলিয়ার জন্ম। কিন্তু মানভূমের নামেই সেই লোক সংস্কৃতি সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে মর্যাদার আসনে উন্নীত। পদ্মশ্রী গম্ভীর সিংমুড়ার ছৌনাচের বিশ্বজুড়ে প্রচার প্রসার লোক সংস্কৃতির মর্যাদা দারুণভাবে ছড়িয়েছে, পরবর্তীক্ষেত্রে ছৌনাচের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পুরষ্কারে ভূষিত হন ছৌশিল্পী নেপাল মাহাতো। ছৌ নাচের প্রায় দু'শো বছরের ধারায় অগণিত প্রখ্যাত ছৌ শিল্পীগণ তাঁদের শিল্প সাধনায় এই লোকনাচের ধারাটিকে দেশ বিদেশে মর্যাদার আসনে তুলে ধরেছেন এবং সে ধারা আজো অব্যাহত বিশ্বভুবনে।

তেমনি এ মাটি ঝুমুরের ঝরনা, কালে কালে সময়ের স্রোতে ঝুমুর গীতধারা এগিয়ে চলেছে। ঝুমুরের উদ্ভব বিকাশ এবং বিবর্তন নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করার ইচ্ছে জাগে মানভূম লোকগান শিল্পী গোষ্ঠীর। যেকোন ক্ষেত্রে এ দেশের ইতিহাস রচনায় ব্রিটিশ নির্ভরতা থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারি নি। তেমনি এ মাটির বুকে অজস্র লোকগান লোকনাচ নিয়ে লেখা কিংবা চর্চা নিয়ে আমাদের নির্ভরতার অনেক দ্বন্দ্ব আছে। স্বীকার করি বা না করি। আবার যাঁরা এ নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের কারো কারো একমুখীন আলোচনা নিয়েও কম দ্বন্দ্ব হয় নি। জ্ঞানের বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয় কিন্তু ভাবের বিষয়ে ব্যাখ্যা এক হতে পারে না, আলাদা হওয়ার সুযোগ আছেই। যেকারণে ভিন্ন মত ভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। যেমন "ঝুমুর" শব্দের অর্থ কি? কবে থেকে ঝুমুরের সৃষ্টি, ঝুমুর গানের নানা ভাগ, ঝুমুর গানের ভাষা কোন স্তরের? ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষার অন্তরালে আরো কত নিভাষা বা ভাষা সম্প্রদায়ের ভাষা বিধি চালু এ নিয়ে নিরন্তর মতান্তর আছে বা থাকতে পারে। কিংবা ঝুমুর গানের যুগ বিভাগ অনুসারী আলোচনা নিয়ে যুক্তি





নির্ভর তথ্য উপস্থাপন করা, একালে ঝুমুর গানের গতি প্রকৃতি, গায়কী কিংবা ভাষাবিন্যাস বা বিষয় সূচি নিয়ে প্রতিনিয়ত নানা প্রশ্ন জাগে পাঠক শ্রোতা মনে।

ভবপ্রীতানন্দ ওঝার গানের ভাষা যে যুগের ভাষা তার মধ্যে তৎসম শব্দের পদ্যরূপধর্মীতা একালের কোনো ঝুমুর কবির গানে নিশ্চিত তা পাওয়া যাবে না। অথচ আমরা নিরন্তর অবচেতনে বলে যাচ্ছি তার বিশুদ্ধতা রক্ষার কথা। যুগ জীবনের কথার সাযুজ্য, ভাষার ছাঁদ দশ কিমি অন্তর বদলে বদলে যায়। একারণে গানের ভাষায় সেই পরিবর্তন প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। তা না হলে যে কোনো গান কবিতার এত রূপান্তর ঘটে কি করে?

বিশুদ্ধতা রক্ষার দাবী তুলতেই হবে। কিন্তু "আমরা যা করি তা ভালো অন্যেরা যা করে তা খারাপ এজাতীয় ভাবনার জন্ম হতে পারে। সেক্ষেত্রে সংস্কৃতি অবরূদ্ধ হতে বাধ্য, ভাষার মতোই সংস্কৃতিও বহমান অন্তঃসলিলা, চলতে চলতেই সংস্কৃতি ঋদ্ধ হয় আবার অবরূদ্ধও হতে পারে। বেড়া দেওয়া সংস্কৃতি এগিয়ে যেতে পারে না। ছৌনাচ আজ বিশ্বমুখীন তার মূলে কিন্তু বেড়া ভাঙা বিস্তার। লোকমান্যতাই সংস্কৃতির প্রাণ, লোকাচার বা পার্বণ নির্ভরতা ছাড়া বাকি যে কোন সাংস্কৃতিক দিক বা লোকযান যুগ জীবনের সংস্পর্শে পালটাতে বাধ্য, আমাদের এ নিয়ে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, প্রতিবাদ করি কিন্তু উপায় নেই। "ময়মনসিংহগীতিকা" সংগ্রহের সাথে সাথে তার রূপ-রূপান্তর ঘটতে থাকে কেননা সংগ্রাহকদের রুচি, মানসিকতার প্রভাব পড়তে বাধ্য। তা বলে থামলে চলবে না। সেকারণে আমাদের জেলায় ঝুমুর নিয়ে যে আবেগ তার লিখিতভাবে পরিচয় হাজার বছরের বেশি আগের চর্যাপদেই উল্লেখ পাই। ঝুমুরের রাগ রাগিনীর কথা থেকে তা বোঝা যায়। যদিও এ নিয়ে বহু প্রশ্ন বহু জিজ্ঞাসার জন্ম দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রকৃত গবেষণার মাধ্যমে ঝুমুর তার উৎস, বিকাশ, বিবর্তন নিয়ে তথ্য নির্ভর লেখা জরুরী। আন্দাজে ঢিল মেরে জলের গভীরতা মাপা যায় না। সংস্কৃতির যেকোন মাধ্যমের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। সংস্কৃতির ধর্মই হলো সংশ্লেষণ। সংস্কারের ভিতর দিয়েই সংস্কৃতির অগ্রগতি। আজ আমরা যাকে লোকজ বলে যে নৃত্যগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার কথা বলছি তাকে কোন প্রাচীর দিয়ে আগলে রাখব! বিশ্বায়ন নির্ভর সমাজ সংস্কৃতি তার প্রভাবকে কে রোধে, কে রুদ্ধ করতে পারবে গতিপথ? নিন্দা নিশ্চয়ই করবো যদি ভাষা সুর কেউ চুরি করে নেয়, কেউ যদি খারাপ কিছু মিশ্রণ করে, মূলে আঘাত করে তাহলে তো প্রতিবাদ অনিবার্য। কিন্তু লোক শিল্পীরা এই মহান নৃত্যগীত ধারাগুলিকে এ ভূমের বাইরে তুলে ধরতে চায় সবসময় প্রতিনিয়ত করছেনও তা, সেখানে মিশ্র সংস্কৃতির একটা রূপ দেখতে পাওয়া যাবেই। যেমন ছৌ নাচের ক্ষেত্রটি হয়েছে, সাবেকিয়ানা আর থাকছে কি? ঝুমুর গানের বদলে অন্য গান, আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার, পালার বদল , আবহ সৃষ্টি, নেপথ্য সংলাপের প্রয়োগ প্রভৃতি নানান বিষয় সংযোজিত হচ্ছে। এ যেন "কার সাধ্য যে রোধে তার গতি", প্রবাহকে রোধ করতে গেলে বাঁধ শক্ত করতে হয়, কিন্তু হাতের মুঠি ফোনের যুগে তা মনে হয় প্রায় অসম্ভব।

লোক সংস্কৃতির মধ্যে সবাই তার শ্বাস নেবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এটাই যেকোন সংস্কৃতির প্রাণ ধর্ম। সংস্কৃতি জলাশয় নয় বরং বলা ভালো এক স্রোতধারা তার মধ্যে যা আসে তা স্বচ্ছতা নিয়েই আসে।

একালের আধুনিক পাঠক শ্রোতাদের কাছে যেভাবে ঝুমুরগান শ্রেয় এবং প্রিয় হয়ে উঠেছে, তাতে মনে হয় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে যেভাবে গ্রাম জীবন থেকে মুখে মুখে চলে আসা ময়মনসিংহ এলাকার লোক কাহিনী সমাদর লাভ করেছে, ঝুমুরের ঝরনার এ প্রাপ্তিও হয়তো কোনোকালে বিশ্বময় হবে তার মূলধারাকে অবলম্বন করেই। তবে এ গীতধারা সংরক্ষিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার গায়কী তারও সংরক্ষণ জরুরী। সংস্কৃতি মাটি নির্ভর, জাতি ধর্মের উপরে তার বাস। সেখানে লোকাচার লোকসংস্কৃতির একটা অংশ, তার বিশুদ্ধতা রক্ষিত থাকতে পারে কিন্তু লোক সংস্কৃতি বৃহত্তর জগতের সাথে সংমিলিত হতে চায়, হয়েও যায়, তখন তার মূলগত ঐতিহ্য ধরে রাখতে গেলেই লিখিত বা সংরক্ষণ রূপ জরুরী হয়ে পড়ে। একারণেই চর্চা, অনুশীলনের সাথে সাথে দরকার অধ্যয়নও। কারণ সমাজের ভাঙাগড়ার সাথে অর্থনীতির প্রভাব সংস্কৃতির উপরে পড়ে কেননা সংস্কৃতি মূলহীন বৃক্ষ নয়। তার শিঁকড় মাটিতেই প্রোথিত।

**তথ্যসূত্র :**


১) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, তৃতীয় খন্ড, ১৯৫৬।
২) নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৪২৬।
৩) কিরিটি মাহাত, ঝুমুর পরিক্রমা (আদি থেকে ইতিহাস), মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, ১ লা ডিসেম্বর, ২০১৯।
৪) নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ঝুমুর, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, পঃ বঃ সরকার, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।
৫) বিনয় মাহাত, লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪।
৬) কল্যাণী শঙ্কর ঘটক, ঐতিহ্যের দর্পণে চর্যাগীতি, পারুল, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪।
৭) ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়, বাংলার লোকনৃত্য ও গৌড়ীয় নৃত্য, লোকশ্রুতি / ১২, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৭৬।
৮) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক নৃত্য, প্রথম খন্ড, ছৌ, ১৯৭৬।
৯) ড. দয়াময় রায়, ছৌসম্রাট পদ্মশ্রী গম্ভীর সিংমুড়ার জীবন ও শিল্পকর্ম, ( তৃতীয় সংস্করণ), মানভূম সংবাদ পাব্লিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মাঘ, ১৪২৭।
১০) Gazetteer of the Manbhum District-H. Coupland– 1910).




## ভাদু গান : দার্শনিকতার প্রেক্ষিতে

**উপানন্দ ধবল**

ভাদু মূলত লোকদেবী। ভাদুগীত ও নৃত্যকে আশ্রয় করে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বাউরি, বাগ্দি, মাহাত, কুম্ভকার, মাল, মাহালী, কুড়মী, সাঁওতাল প্রভৃতি প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভাদ্র মাসের পয়লা (১ তারিখ) থেকে সংক্রান্তি অর্থাৎ সমগ্র ভাদ্রমাস জুড়ে যে লোকোৎসব পালন করে, তা-ই হল ভাদু-পরব।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল তথা মানভূম হল ভাদু গান ও উৎসবের প্রধান ক্ষেত্রভূমি। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর, মানবাজার, হুড়া, বলরামপুর, বান্দোয়ান, পাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ যেমন তালডাংরা, সিমলাপাল, সারেঙ্গা, রায়পুর, মটগোদা, রাণীবাঁধ, খাতড়া প্রভৃতি অঞ্চলে, বর্ধমানের পশ্চিম অংশে, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলা, ঝাড়খণ্ডের সিংভূম, রাঁচী ও হাজারীবাগ জেলার কিছু অংশ ছাড়াও বীরভূম জেলায় ভাদুগান প্রচলিত।

ভাদুগানের উৎস সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি ও মতামত প্রচলিত আছে। এগুলির মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কালকেন্দ্রিক ও ফসলকেন্দ্রিক নামকরণই ব্যাপক প্রচলিত। কারো কারো মতে ভাদোই ফসল থেকে 'ভাদু' নামের উৎপত্তি। এই ভাদোই ফসল হল ভাদোই ধান যা ভাদ্র মাসে উৎপাদিত হয়। আবার আদিবাসী সমাজে প্রচলিত "করম" উৎসবের রূপান্তর ঘটেছে ভাদুতে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে লিখেছেন— 'পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি যখন আদিবাসীর বর্ষা-উৎসবের 'করম' সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে, তখন পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিনী কুমারীদিগের কণ্ঠনিঃসৃত ভাদুগানের ভিতর দিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব-দক্ষিণ মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্দমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়; তাহা হিন্দুপ্রভাব-বশতঃ বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ করিয়াছেতাহা ভাদুপূজা নামে পরিচিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর 'করম'-উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র। নৃত্য এবং গীতই করম-উৎসবের প্রধান অঙ্গ, ভাদু পূজারও তাহাই; তবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর গৃহে ইহার নৃত্যাংশ স্বভাবতঃই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আদিবাসীর করম-উৎসব বর্ষা-উৎসব, ভাদু-উৎসবও বর্ষা-উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ষা বা ভরা ভাদ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদু-উৎসব, ইহার গান ভাদুগান।'[১]

আবার কাশীপুর-রাজকন্যা ভদ্রাবতীর নামানুসারে ভাদুর উৎপত্তি বলে নানা কাহিনি প্রচলিত হয়ে আসছে। লোকসংস্কৃতি-গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়— "আনুমানিক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মানভূম জিলার পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে নীলমণিসিংহ দেবশর্মা

নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার ভদ্রেশ্বরী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। ভদ্রেশ্বরী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রাজান্তঃপুরের মধ্যে অধিকাংশ অনূঢ়া রাজকন্যার জীবন যে ভাবে কাটিয়া যায়, তাঁহার জীবনও সেই ভাবেই কাটিতেছিল। এই ভাবেই একদিন ভদ্রেশ্বরী পরলোক গমন করিলেন। প্রাণাধিকা কন্যার অকাল পরলোক-গমনে রাজা নিদারুণ ব্যথিত হইলেন তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, রাজকন্যার স্মৃতিরক্ষার জন্য ভাদ্রমাসে পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার নামে উৎসব পালন করিতে হইবে। প্রজাগণ সানন্দে আদেশ পালন করিল। তারপর মানভূম হইতে তাহা বাঁকুড়া, বর্দমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিল। আধুনিক কালে রচিত বহু ভাদুগানের ভিতর দিয়াই এই বিষয়টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বহু পূর্ব হইতেই এই উৎসব এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহার সঙ্গে কাশীপুররাজ ও তাঁহার কন্যার নাম আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। কাশীপুর রাজপরিবারের এই বিবরণটি ঐতিহাসিক সত্য।”[২]

অপর এক কিংবদন্তি থেকে জানা যায় কাশীপুররাজ নীলমনি সিংহের কন্যা ভদ্রাবতী ছিলেন রূপে গুণে অসামান্যা এবং প্রজাদরদী। এখন ভদ্রাবতীর বিবাহ স্থির হলে বিবাহের দিন তার ভাবি স্বামীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। এই ঘটনায় ভদ্রাবতী মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন এবং আত্মাহূতি দেন। রাজা নীলমনি সিং কনিষ্ঠা-কন্যা ভদ্রাবতীর সতীত্বের এই অমর-স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে ভাদু-পূজা ও ভাদু-গানের প্রচলন করেন।

ভাদু কাল্পনিক এবং লৌকিক দেবী, প্রথমদিকে তার নিজস্ব কোন মূর্তি ছিল না। একটি পোড়ামাটির পাত্রে ফুল ও প্রদীপ সাজিয়ে সারা ভাদ্রমাস সন্ধ্যাকালে এর পূজা করা হত। কিন্তু বর্তমানে ভাদুর মূর্তি তৈরি করে তার বন্দনা করা হয়। ভাদু পূজায় কোন মন্ত্রতন্ত্রের বালাই নেই। গানই হল ভাদুর মন্ত্র, এবং কুমারী ও সধবা মেয়েরাই তার প্রধান উপাসক। ভাদ্রের প্রথম দিন বেদী করে পাতা হয় ভাদুর মূর্তি। ভাদুর উপকরণ সামান্যই— ধূপ, প্রদীপ, নানারকম ফুল এবং সমবেত সংগীত শেষে নানা ধরনের মিষ্টান্ন, যেমন; পেঁড়া, জিলাপি, খাজা, লবঙ্গ, গজা, ভাজামিষ্টি, সন্দেশ, মিঠাই, কোথাও চপ, সিঙ্গাড়া ইত্যাদি। আর ভাদ্রসংক্রান্তির পরদিন হয় ভাদুকে জলে বিসর্জন।

ভাদুগান যেহেতু লোকসাহিত্য, তাই স্বাভাবিকভাবেই এইসব গানে লোকদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত-বাংলা ঘন জঙ্গল অথবা লাল কাঁকুরে মাটির দেশ ভাদুগানের লীলাক্ষেত্র। এখানে কৃষিব্যবস্থা তত উন্নতি নয়। এখানে লোকসমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই গায়ে-গতরে খেটে দু-বেলা দু-মুঠো অন্নসংস্থানের উপায় করে। মাটির কাছাকাছি অবস্থান করাতে এরা ভাদুকে মর্ত্যভূমিরই একজন— নিজেদের ঘরের কন্যা বা মাতা হিসাবেই গ্রহণ করেছে। জগতের সমস্ত ঠাকুরদেবতাকে এক দেবীর মধ্যে খুঁজে পাওয়ার বাসনা থেকেই উক্ত এলাকার নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত মা-বোনেরা ভাদুকে যেন নিজেদের





গৃহ-হৃদয়-মন্দিরে স্থান দিয়েছে। তাদের বন্দনাগানে ভাদু তাই ধনদাত্রী, বিদ্যাদাত্রী— সমস্ত দেবীর সারাৎসার। এই লৌকিক দেবী যেন সমস্ত সংগতির মূল। একটি প্রচলিত ভাদুগানে সেই ধর্মীয় দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে—

“সাঁঝ দিলাম সন্ধ্যা দিলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি গো।
সব ঠাকুরের সন্ধ্যা লাও মা, লক্ষ্মী সরস্বতী গো।।
সব সঙ্গতি পরাণ-গতি, সন্ধ্যা দাও ভাদুর কাছে।
শঙ্খ বাজাও ঘন্টা বাজাও, ঘরে ভাদু ধন আছে।।”

ভাদু একই আধারে মাতা এবং কন্যা। আর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার লোকপ্রবাদেও আছে— ‘বিটি মাটি সমান।’ কাশীপুরের রাজার বিটি (মেয়ে) ভদ্রাবতী কোন এক জাতীয়তা মন্ত্রে, না কি যাদুমন্ত্রে এই অঞ্চলে সকলের আদরের কন্যা “ভাদু” হয়ে উঠল তা এক আশ্চর্য কিংবদন্তি। এ বিষয়ে নিবেদিতা দিন্দা লিখেছেন—

“প্রথমে পূজাটি ছিল রাজবাড়ীর উৎসব। পরে বিভিন্ন গ্রামে এই উৎসবটি ছড়িয়ে পড়ে। উচ্চ বর্ণ থেকে নিম্ন বর্ণের মধ্যেই পূজা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। বিশেষত বাউরি, বাগদি, রাজোয়াড় প্রভৃতি তপশিলি জাতিগুলি ভাদু পূজায় মেতে ওঠে। জীবনের একঘেঁয়েমি, অবসাদ, দুঃখ-বেদনা ভুলে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়। কালক্রমে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে ভাদুর আরাধনা বিস্তার লাভ করে।”[৩] এই ভাদুর সঙ্গে শাক্ত পদাবলির উমা বিষয়ক গানের সাদৃশ্য অতি সহজেই চোখে পড়ে। হিমালয় কন্যা উমা মাত্র তিনদিনের জন্য বৎসরান্তে মর্ত্যপৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে মা মেনকার হৃদয়োচ্ছ্বাস ও আকুতি যেন উপচে পড়ে—

“উমা গো যদি দয়া কোরে হিমপুরে এলি,
আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাষাণ বক্ষে ধোরে,
আছি শূন্য ঘরে।
কেবল মরি নাই— মা বেঁচে আছি,
দুর্গা দুর্গা নাম কোরে।।”[৪]

ভাদ্রের শুরুতে বৎসরান্তে ভাদুর আগমনীতেও তার বন্দনা; ভাদুগানের অন্যতম বিষয় ও সুর—

“একটি বছর পরে
ওলো ভাদু আস্যেছু মোদের ঘরে।
ফুলের আসর ফুলের বাসর গো
ফুলের করি বিছানা।
গানে গানে প্রাণ মাতাব

মন মাতাব অন্তরে।
ফ্যালফ্যালি ব্লু শাড়ি যে গো
গায়ে করে আবরণ।
একটি বছর পরে
ওলো ভাদু আস্যেছু মোদের ঘরে।।"

কিন্তু আবাহনের উল্টোপিঠেই আছে বিসর্জন। আগমনীর আনন্দ ধুয়ে যায় বিষাদের অশ্রুজলে। শাক্ত পদাবলীর উমাসঙ্গীতে যেমন আগমনীর পর বিজয়া, তেমনি ভাদ্র-সংক্রান্তিতে ভাদুর বিদায় দৃশ্যে কেবলই প্রিয়জন হারানোর ব্যাথা। উমাসঙ্গীত ও ভাদুসঙ্গীত উভয়কেই তাই রসজ্ঞ সমালোচকের ভাষায় বলা যায়— 'Drama of welcome and farewell.'। আগমন ও বিদায়ের মাঝখানে একটি নিশির বাধা। নিশি ফুরোলে মা মেনকার 'নয়নের মণি' উমা বিদায় নেবেন। তিনদিন ধরে স্বর্ণদীপের ন্যায় দেদীপ্যমান উমা ফিরে যাবেন কৈলাসে, মা মেনকা সে বেদনায় গেয়ে ওঠেন—

"কি হলো, নবমী নিশি হৈলো অবসান গো।
বিশাল ডুমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।।
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী-পানে চেয়ে দেখ—
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান।।"[৫]

বাংলার জঙ্গলমহল ও রুখা টাঁড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভাদু হল আদরের সন্তান, তথা 'ধন' বা 'মণি'। তাকে বিসর্জনের ভাবানুষঙ্গে বাঙালি রমণীমণে স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় কন্যা বিদায়-বিচ্ছেদের ভাবনা—

"নিশি শেষ হল ধন
ভাদু মায়ের কর গো তোরা খুব যতন।
কাল সকালে যেতে হলে
মন করে কেমন কেমন।।
আলতা পরিয়ে চুল আঁচড়ে
বাঁধ বেণী করোগো যতন।
নিশি শেষ হল ধন।।
ভাদু মায়ের করো গো তোরা খুব যতন।
নিশি শেষ হল ধন।।"

বাংলার এইসব রুক্ষ-শুষ্ক অনুর্বর প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় নিত্যই অভাব। সেই অভাবের সংসারে সন্তানের অনেক চাহিদাই অভিভাবকেরা পূরণ করতে পারে না। কিন্তু সেই অভাবের স্থান পূরণ করতে তারা আশ্রয় নেয় ভালোবাসা আর আদরের। যত্ন করে সামান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়েই তারা ভাদু-কন্যার হৃদয় জুড়িয়ে দিতে চায়—





"ও ভাদু মা, ও ভাদু মা, আমি তোমার মা হব।
আঁচল ভরে মুড়ি দিব বদন ভরে চুমু খাব।।"

ভাদুপূজা ও গানের পশ্চাতে মনস্তাত্ত্বিক দর্শনটিকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সন্তান ও ফসলের আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষ যে নানা ধরনের ব্রত পালন করে থাকে, তার মূলে রয়েছে সদৃশমূলক যাদু-বিশ্বাস। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় প্রান্তজনের কাছে ভদু হল ষাঁড়া-ষষ্ঠী বা লক্ষ্মীর অনুরূপ দেবী। তাই সন্তান ও ফসলের আকাঙ্ক্ষা থেকে ভাদুগান ও পূজার প্রচলন দেখা যায়। একটি ভাদুগানে তার তাই বলা হয়েছে—

"কোলে যদি আসে ভাদু।
আসছে বছর আনব যাদু।।'

শুধু সন্তান নয়, ভাদু কৃপা করলে, জীবনে আসে সমৃদ্ধি— তাই ভাদুকে আপ্যায়ন ও তার বন্দনা ভাদুগানের প্রচলনের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক। একটি ভাদুগানে প্রতিফলিত হয়েছে সেই মনস্তাত্ত্বিক দর্শন—

"ভাদুকে আনিতে যাব
চন্দন কাঠের চৌদলে।
যদি ভাদু দয়া কর
রাখব সোনার মন্দিরে।
ভাদু আসছে কত গম্ভীরে
সোনার মন্দিরে।।"

অনুরূপ কামনা থেকে অনুরূপ ফল দেবে— এই সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস থেকেই ভাদুর কাছে সমৃদ্ধি চাওয়া।

ভাদুগান-রচয়িতাদের শিশু-মনস্তত্ত্ব সমালোচকদের মুগ্ধ না করে পারে না। ভাদুগানের ভজনকারীদের নিকট ভাদু তাদের গৃহস্থ সন্তান। তাকে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে বড় করে তোলা, আদর যত্ন, তার খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক, তার শিক্ষা, খেলাধুলা, প্রেম-বিবাহ যাবতীয় বিষয়েই অভিভাবকের সস্নেহ প্রযত্ন ভাদুগানে সম্যক লক্ষিত হয়। ভাদু শুধু কন্যা নয়— রাজকন্যা। তাই তাকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করার ক্ষেত্রেও গান রচয়িতাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এমনই একটি গানে পাই—

"ভাদু রাজার বিটি
আলবের্ট কাটে বেঁধেছে মাথার ঝুটি
পাশ-চিরুনি প্রজাপতি
বাঁশ-পাতায় জুঞ্জি খাড়ি
ভাদু রাজার বিটি।"

ভাদুগান রচয়িতারা প্রত্যন্ত পাড়াগাঁয়ের। সেখানে রাস্তাঘাট কাঁচা। জলনিকাশি ব্যবস্থা

নেই বললেই চলে। রাস্তার তুলনায় ঘরগুলি উঁচুতে থাকায় বর্ষার জল কুলি তথা রাস্তাতেই বয়ে যায়। ভাদুগানে উঠে এসেছে সেই সামাজিক পরিবেশ—

"চল ভাদু চল লাইতে যাব
কুলিতে বাঁধ বাঁধাব।
কুলির জলে সিনান করে
একমাথা চুল শুকাব।।"

'একমাথা চুল' মানে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঋতুবিশেষের ব্যাধি; যেমন বর্ষাকালে চোখ ওঠা বা "জয় বাংলা (কনজাংটি ভাইরাস)"র মতো ব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে ভাদুকে নতুন জলে স্নান করতে নিষেধ করার কথা পাই একটি ভাদু গানে। এইগানেই আবার ব্যাধির নিরাকরণ রূপে পাই প্রাথমিক লোকচিকিৎসার কথা—

"ভাদু করি গো মানা,
নতুন জলে সাঁতার দিতে যেও না
ভাদু করি গো মানা।।
ঘরে ঘরে চোখ উঠেছে গো
চোখে বড় যন্তনা।
হাতে লইয়া হলদি কানি
তারপরে ডাক্তারখানা।।
ভাদু করি গো মানা,
নতুন জলে সাঁতার দিতে যেও না।
ভাদু করি গো মানা।।"

ভাদুগানে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত চালচিত্র যে ভাবে ফুটে উঠেছে, তাতে বিভিন্ন সময়ের ভাদুগান রচয়িতাদের সমাজদর্শন-অভিজ্ঞতার সম্যক পরিচয় মেলে। ভাদুগানের এলাকা বরাবরই অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে। তখনও দামোদর বাঁধ, কংসাবতী ড্যাম ইত্যাদি জলাধার গড়ে ওঠেনি, বর্ষা ছাড়া চাষবাস এখানে সেভাবে হত না। এলাকার মানুষ জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য ঝরিয়া, রাণিগঞ্জ আসানশোল দুর্গাপুরের কয়লাখনি অথবা শিল্পাঞ্চলে কাজ করতে যেত সপরিবারে। জীবিকার খোঁজে অজয় দামোদর পেরিয়ে কোলফিল্ড এরিয়ায় কাজ করতে যাওয়ার কথা পাই দক্ষিণ বাঁকুড়ায় প্রচলিত একটি ভাদু গানে—

"উত্তরকুলি গেছিলে ভাদু,
ময়লা পাথর কাটাতে
এত কেনে দেরি হল মা?
অজয়ে বান পড়েছে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

অজয় ভেঙ্গে জয় জয় দিব।
মণ্ডা ভেঙে জল খাব।
এসো আমার প্রাণের ভাদু
কোলে লয়ে পার হব।।"

বালিকা-শিশু থেকে কুমারী এমনকি বিবাহিতা কন্যা, আবার তারই মাতৃমূর্তি—গীতিকাররা নানা বয়সের উপযোগী ভাদুগান রচনা করেছেন। ভাদু বড় হয়, তাকে স্কুলে ভর্তি করার ছবি পাই একটি গানে। নারী শিক্ষা ও নারী-প্রগতির বিজ্ঞাপন হয়ে পড়ে ভাদু—

"বলি ও বকুল ফুল।
আমার ভাদু যাবে গো একবার ইস্কুল
বলি ও বকুল ফুল।।
জামা জোড়া এঁটে দিব গো।(২)
কানেতে হইবে দুল।। (২)
পাড়ায় পাড়ায় আসবে মাস্টার।(২)
পরীক্ষাতে হয় না ভুল।
বলি ও বকুল ফুল।"

ভালোবাসা এবং দারিদ্র্য— দুইয়ের টানাপোড়ন থেকেই আদরের কন্যা ভাদু কখনো হয়ে ওঠে অভিমানী। তার অভিমান ভাঙাতে মিষ্টির থালা হাতে এগিয়ে আসে অভিভাবকেরা—

"আমার ভাদু মান করেছন গো, (২)
উ-পাড়ার বকুল তলে,
আনগো থালা, লে গো মিষ্টি
চলযাব মান ভাঙাতে (২)
মানের কপাট খুল ভাদু গো (২)
মান ভাঙাতে এসেছি (২)
আমরা মায়ের শিশু ছেলে
মান ভাঙাবার কী জানি?
জোড়া পানের খিলি
এতদিন তুই কার গালে ভরা ছিলি?"

ভাদু বড় হয়ে ওঠে। মানবিক ভাদুর জীবনে আসে প্রেম। কিন্তু প্রেমে কারো ভাগ্যে জুটে সফলতা, কারো ভাগ্যে যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা। কুমারী বয়সে দৈহিক আসঙ্গলিপ্সা যে দুঃখের কারণ হতে পারে, সে বিষয়ে ভাদুগীতিকাররা সচেতন করে,দিয়েছেন। দেহপ্রেমকে শসার

সাথে তুলনা করে তাঁরা প্রতীকে-ইঙ্গিতে যৌনমনস্তত্ত্বে সুনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি গানে পাই—

"শসা তলের ভাদু তুমি শসা যেন খাইঅ না
শিশিরেতে উঠ্‌-ডুবু ঘরকে কেনে আস্য না।।
ভাদু করেছিলাম মানা
ও ভাদুধন প্রেমের শসা খাইঅ না।।
প্রেমের শসা খেলে ভাদু ঘটবে কত লাঞ্ছনা।
ভাদু করেছিলাম মানা
ও ভাদু ধন প্রেমের শসা খাইঅ না।
ভাদু করেছিলাম মানা।।"

সম্বন্ধ করে অভিমান ভাঙিয়ে ভাদুর বিয়ে দিতে হয়। ট্রেনে-মোটরে অনেক দূর থেকে হয়তো বর আসবে। এতোদূরে শ্বশুরঘর, স্বাভাবিকভাবেই ভাদুমণির অভিমান হয়। এমনই এক অভিমান-ভাঙানো গান—

"রেলে ট্রেনে বর আসছ্যে
রাজার ট্যাস্কি মোটরে।
গুরুগুরু শব্দে নামবে এসে
বর্ধমানের শহরে।
ভাদু করগো বিয়ে।
মান কেন কপাট দিয়ে
ভাদু করগো বিয়ে।।"

এরপর ভাদুর শ্বশুরবাড়ি যাবার উদ্যাপন-পালা। ঢাঁক বাজিয়ে নতুন শাড়িতে তাকে বিদায় জানাতে হবে—

"ভাদুর যাবার বেলা
কিনে দেব লৈতন ছাঁচের আকবালা।
ভাদুর ঢাকে দে ভাই খাড়ি।
আমার ভাদু যাচ্ছেরে শ্বশুর বাড়ি।
ভাদুর ঢাকে দে ভাই খাড়ি।।"

বিয়ে দেবার পরও ভাদুধনকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। যে-কালে কুলীন সমাজে বহুবিবাহ প্রথার চল ছিল, সেকালে তার আঁচ সমাজের সর্বস্তরেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ভাদুর জীবনেও তাই স্বাভাবিকভাবেই আসে সতীন-সমস্যা। সতীন-কাঁটা থেকে সাবধান করতে তাই গাওয়া হয়—

"উপর পাড়ায় যেও ভাদু





নামঅ পাড়ায় এস না।
নামঅ পাড়ায় সতীন আছে
পান দিলে পান খেও না।"

কালক্রমে সংসারের নতুন বৌমা থেকে মা হয়ে ওঠে ভাদু। গীত রচয়িতারা মাতৃত্বের (বিশেষত ব্যাটাছেলের মায়ের) সম্মান দাবী রেখে গান গায়—

"পুরুলার একটি বেগুন
বউকে রাঁধতে দিও না।
বউ হয়েছে বেটার মা
বউকে কিছু বল না।"

এইভাবে ভাদু দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত-বাংলায় হয়ে ওঠে ঘরেরই একজন। যার সুখে আনন্দিত আর দুঃখে ব্যথিত হন গীতিকারেরা। সারা ভাদ্রমাস জুড়ে যে মাটির ভাদুকে কন্যাজ্ঞানে বন্দনা করা হয়, পয়লা আশ্বিনের সকালে যখন তাকে বিদায় দেওয়া হয়, মনে করা হয়, সে যেন শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে— ফিরে আসবে একটি বছর পরে। ভাদুর বিদায়ের মধ্যেই যেন আছে আবাহনের ইঙ্গিত। সমবেতকণ্ঠে ভাদুর ব্রতীরা তাই গেয়ে ওঠেন—

"ভাদু যাই বলো না,
যাই বলিলে আমরা প্রাণে বাঁচবো না
ভাদু যাই বলো না
জলে হেলা জলে খেলা গো।
জলে তোমার কে আছে?
আপন মনে বুঝিয়ে দেখ,
জলে তোমার কে আছে?
আপন মনে বুঝিয়ে দেখ,
জলে শ্বশুর ঘর আছে।।"

**তথ্যসূত্র :**

১। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, "বাংলার লোকসাহিত্য", পরিবর্ধিত ২য় সং, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ১৮১
২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২
৩। নিবেদিতা দিন্দা, "তপশিলি জাতির চালচিত্রে ভাদু", কার্তিককুমার মণ্ডল (সম্পা) লোকসংস্কৃতির দর্পণে পুরুলিয়া, সংবেদন, মালদা, ২০১৮, পৃ-১০৪
৪। উদয়চাঁদ বৈরাগী, আগমনী (গান), অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা) "শাক্ত পদাবলী" ১২শ সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ২০১০, পৃ. ২৭
৫। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, বিজয়া (গান), অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা) "শাক্ত পদাবলী" ১২শ সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ২০১০, পৃ. ৪৪।

## রাঢ় বাংলার গাঁ জনের পরব — ‘গাজন’

তৃষ্ণা ধবল

রাঢ়বঙ্গের অতি জনপ্রিয় ও প্রধান উৎসব হল গাজন। গ্রামের মানুষের আনন্দ বিনোদনের মূল উৎসব এটি। গাজন এমন একটি উৎসব যেখানে গ্রামের মানুষ বছরের শেষে এক জায়গায় মিলিত হয়ে আনন্দ - উৎসবে মেতে ওঠে। রাঢ়বাংলার বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে চৈত্র-বৈশাখ মাস জুড়ে গাজন উৎসব চলতে থাকে। রাঢ় বাংলা জনপ্রিয় দেবতা শিব। তাই শিবের পূজা সর্বত্রই। শিবকে কেন্দ্র করে গাজন উৎসবের সূচনা হলেও, রাঢ়বঙ্গে শিব ছাড়াও ধর্মরাজের গাজন, মনসার গাজন, শীতলার গাজন, বলরামের গাজন ইত্যাদি নানা দেবদেবী কেন্দ্রিক গাজন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

গাজনের উৎপত্তি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানা মতভেদ লক্ষ্য করা যায় - গাজন শব্দটি এসেছে সংস্কৃত গর্জন, প্রাকৃত গজ্জন, হিন্দি বাজনা থেকে কিন্তু মূল অর্থ সিংহনাদ অর্থাৎ সম্মিলিত ভক্ত্যাসন্ন্যাসীর গর্জন থেকে গাজন। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের বিবাহ হয়েছিল নীল চন্ডিকার সঙ্গে, ওই পূণ্য তিথিতে গাজন উৎসব পালিত হয়ে আসছে। বিবাহ উৎসবে ভক্ত্যারা হল শিবের বরযাত্রী। ভক্ত্যাসন্ন্যাসীরা মহাদেবের জয়ধ্বনি করতে করতে বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়, সেই সমবেত গর্জন থেকে গাজন শব্দটি এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানেও সমবেত ভক্তদের কোলাহল ও গর্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ। আবার অনেক গবেষক মনে করেন — গাঁ অর্থাৎ গ্রাম এবং জন শব্দের অর্থ জনসাধারণ, অর্থাৎ গাজন হল গ্রামের জনসাধারণের উৎসব। গাজনের মূল আকর্ষণ চড়ক ঘোরা যা সূর্যের বর্ষ পরিক্রমার প্রতীক। একটি শাল বা গাজরী বা গর্জন গাছের ডাল পোঁতা থাকে, যারা ভক্ত্যা হয় তারা শরীরে তীর বা লোহার বঁড়শি বিদ্ধ করে ঐ ডালটিতে উঠে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে - এই গর্জন গাছের ডাল থেকে গাজন শব্দটির উৎপত্তি বলেও অনেকে মনে করেন। কারও মতে বৃষ্টির কামনায় গাজনের সূত্রপাত। গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন সব শুকিয়ে যায়, দগ্ধ প্রান্তর ধু ধু করে তখন কৃষি প্রধান দেশের জনসাধারণ বর্ষনের প্রার্থনা করে শিবের মাথায় জল ঢালে, ছড়া কাটে এবং সূচনা হয় গাজন উৎসবের।

গাজন সম্পর্কে পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন- রাঢ় অঞ্চলে কথিত আছে, অন্ত্যজদের রাজা বাণের কন্যা ঊষার প্রেমিক ছিলেন কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। ক্রুদ্ধ রাজা বাণ অনিরুদ্ধকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন এবং যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল সেই সময় বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে বাণ রাজার অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ টুকরো হয়ে পড়ে, মৃত্যুর আগে বাণ কৃষ্ণের কাছে এক বর লাভ করেন - যেহেতু অন্ত্যজ কন্যা কৃষ্ণের বংশধরের জননী হবেন তাই বছরের একদিন অন্ত্যজরা, সকলের কাছে পূজা পাবেন। সেই দিনটিই হল গাজনের তিথি। যারা গাজনের ভক্ত্যা হয় তারা সেই দিন কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন





করে থাকে। এবং সাধারণ মানুষ সেই দিন তাদের শিবের প্রতিনিধি রূপে পুজো করেন। আবার মধ্যযুগের প্রভাবশালী ব্রাহ্মণরা মনে করতেন গাজন ছিল এক অনার্য সংস্কৃতির ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যাতে সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষেরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। আবার অনেকে মনে করেন শিব পূজা বা গাজন উৎসব বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তিত রূপ।

গাজন কথার অর্থের কোন শেষ নেই, শিবের মাহাত্ম্য নিয়ে গান — গাজন, ভক্ত্যাদের কঠিন ব্রতপালন — গাজন, শিব মন্দিরের চারপাশে বিচিত্র অনুষ্ঠান — গাজন, সং সেজে ভক্তদের উন্মত্ত নৃত্য — গাজন। সুধীর কুমার মিত্র লিখেছেন শিবের প্রতি কামনায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে শিব সম্বন্ধীয় গীতিকে গাজন বলা হয়।

শুধু রাঢ়বঙ্গই নয় গাজন পুরো পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় লোক উৎসব। যা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে প্রচলিত। এই গাজন উৎসব উত্তরবঙ্গে গম্ভীরা, দিনাজপুরে গামিরা, মালদহে গম্ভীর বা গম্ভীরা নামে প্রচলিত। এছাড়া পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায় চড়ক মেলা নামে ও খ্যাত। এ ছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নীলপূজা, সাহীযাত্রা ইত্যাদিও বলা হয়। আবার পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও এর বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। গুজরাটি ভাষায় গাজন কে বলা হয় গাজরু, মারাঠি ভাষায় গাজনেং, পাঞ্জাবিতে বলা হয় গজ্জণা, সিন্ধী ভাষায় বলা হয় গজনু বা গজন্ন। শুধু তাই নয় গাজনের বিস্তার দেশের মাটি ছাড়িয়ে বিদেশেও। গ্রীসে Bachchu দেবতাকে বলা হত Dionysus। এই দেবতার গাজন অনুষ্ঠিত হত। প্রাচীন জার্মানিতে গাজন উৎসবের অনুরূপ উৎসবের প্রচলন ছিল, আবার ইউরোপীয় কার্নিভালের সঙ্গেও গাজনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, মিশরের লিঙ্গদেব আসীরসকে গাজন উপলক্ষে ৩৮০ কলসী দুধে স্নান করানো হত। তাই বলা যেতে পারে গাজনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

গাজন উৎসবের মূল উপকরণ এর আচার অনুষ্ঠান। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানই গাজনকে পরিপূর্ণতা দান করে। গাজন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে প্রচলিত হলেও গাজনের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছু মিল দেখা যায়। আবার আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। ভক্ত্যারা কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে এই আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। গাজনের আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে - হবিষান্ন্য, পাটা স্নান, হিন্দোল-দোল, ধুনাপুড়ানো, কাঁটাঝাপ, বাণফোঁড়া, চড়কঘোরা, আগুন সন্ন্যাস, ফলার, জাগরন, ফল ও গামীর গাছকাটা অনুষ্ঠান, তেল হোলদা, শালে ভর দেওয়া, যুদ্ধানুষ্ঠান, মালা আদান অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েকটি আচার সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

১) হবিষান্ন্য অর্থাৎ ভক্ত্যাদের গাজনের আগের দিন সম্পন্ন নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হয়।

২) গাজনের প্রথম দিন ফলার অর্থাৎ এই দিন ভক্ত্যাগণ একবার মাত্র আহার গ্রহণ করে। শুধু ফল গ্রহণ করে, তাই ফল + আহার = ফলাহার থেকে ফলার শব্দটি এসেছে।

৩) ফল ও গামীর গাছ কাটা অনুষ্ঠান - গাজনের দ্বিতীয় দিনে কোনো কোনো জায়গায়

এই অনুষ্ঠানটি দেখা যায়। এই দিন সকালে সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ বাঁধে অর্থাৎ নানা রকমের টাটকা ফল খেজুর, শশা, তরমুজ, আপেল, বেল, আম, ইত্যাদি সংগ্রহ করে একটি নতুন বাঁশের চালুনিতে রেখে গামছা বেঁধে দেয়, এবং সন্ধ্যার পূর্বে নদী ঘাটে পুজো দিয়ে গামীর গাছের তলায় উপস্থিত হয় ও পুরোহিতরা ভক্ত্যাদের হাতে মন্ত্র পাঠ করা মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেয় এবং সকলে গামীর গাছের ডাল নিয়ে নাচতে নাচতে মন্দিরে ফিরে আসে। এই গামীর গাছের ডাল একে অপরের হাতে দিয়ে, শিবকে সাক্ষী রেখে গামীর অর্থাৎ বন্ধুত্ব পাতায়।

৪) পাটাস্নান - মন্দিরের ভিতরে রাখা সারাবছর পূজিত হওয়া পাটাকে গাজনের দিন ভক্ত্যারা শোভাযাত্রা করে নিকটবর্তী পুকুর বা নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যায়, সেই পাটার তলে বসে ভক্ত্যারা পাটা ধোয়া জলে স্নান করে। মানুষের বিশ্বাস পাটা ধোয়া জলে স্নান করলে নানা রকম রোগ মুক্তি ঘটে এবং মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বেল কাঠ দ্বারা নির্মিত পাটাটি আসলে শিবলিঙ্গের প্রতিকৃতি রূপে বাইরে আনা হয় এবং তা পুনরায় মন্দিরের মধ্যে সংরক্ষিত করে পুজো করা হয়। আসলে পাট হচ্ছে শিবলিঙ্গের প্রতীক বা পুরুষ প্রতীক। যেহেতু শিবলিঙ্গকে কোন পূজা অনুষ্ঠানে মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে না, তাই পাটা স্নানের মাধ্যমে তা করা হয়। ঠিক যেমন দেবীদুর্গার নবপত্রিকা স্নানের ব্যবস্থা।

৫) ধুনাপুড়ানো - এই অনুষ্ঠানের নারী-পুরুষ সকলে সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করে। ব্রতীরা স্নান সেরে জ্বলন্ত ধুনোর খোলা মাথায় রেখে শোভাযাত্রা করে মন্দির প্রাঙ্গনে আসে। মাঝে মাঝে ধুনা দিয়ে আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করা হয়। প্রায় ৫০—৬০ জন ব্রতী এইভাবে আসেন, যা দেখে দূর থেকে মনে হয় যেন আলোর মেলা। ধুনোর গন্ধে মেলা প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে। কোথাও আবার দেখা যায় যাদের মানত থাকে তারা মাটিতে শুয়ে তাদের বুকে, মাথায়, পিঠে ও হাতে মাটির খোলা রেখে তাতে আখের খোয়া দিয়ে আগুন জেলে ধুনো পুড়ায়, আবার অনেক জায়গায় জ্বলন্ত ধুনুচি নিয়ে নাচ করতেও দেখা যায়।

৬) হিন্দোল-দোল অর্থাৎ সন্ন্যাসীরা পা দুটো বাঁশে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাথা নিচু করে দোল খায় আর নিচে জ্বলে আগুনের কুন্ড। এইসময় ছড়া কাটে, ঢাকি ঢাক বাজায়।

৭) আগুন ঝাঁপ - মন্দির চত্বরে কাঠকয়লা পুড়িয়ে আগুন জ্বলানো হয় এবং সেই কাঠ-কয়লার ওপরে সন্ন্যাসীরা আরাধ্য দেবতার জয়ধ্বনি দিতে দিতে ঝাঁপ দেয় যা আগুন ঝাঁপনামে পরিচিত। এ আচার খুবই কঠিন, গভীর সাধনা ছাড়া এ সম্ভব নয়।

৮) বানফোঁড়া - গাজনের মূল অনুষ্ঠান এটি। ভক্ত সন্ন্যাসীরা মন্দিরের নিকটবর্তী পুকুর বা নদীতে স্নান সেরে দণ্ডী কেটে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয় এবং লোহার শলাকা বা তির দেহের বিভিন্ন জায়গায় বুকে, জিভে, পিঠে, হাতে, ফুঁড়ে নানারকম ক্রিয়া-কলাপ করে থাকে নাচতে থাকে।

৯) চড়ক ঘোরা - চড়ক ঘোরার মধ্য দিয়েই গাজন উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। মন্দির



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

প্রাঙ্গণে একটি শাল বা গাজরী বা গর্জন গাছের খুঁটি পোতা থাকে এবং ভক্ত্যাগণ পিঠে লোহার শলাকা বিঁধে সেই খুঁটিতে ওঠে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এই অনুষ্ঠান চড়ক ঘোরা নামে পরিচিত।

১০) আঁশপান্না — শেষদিন কোথাও কোথাও দেখা যায় আঁশপান্নার ভাত অর্থাৎ মাছ ভাত খাইয়ে গাজনের পরিসমাপ্তি ঘটতে, - এই সব নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গাজন উৎসব সম্পন্ন হয়। রাঢ়বঙ্গ জেলা গুলিতেই এর আধিক্য বেশি।

রাঢ়বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই অসংখ্য শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এর মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি শিবের গাজন হল - বাঁকুড়া জেলার পাঁচালের শিবের গাজন, এক্তেশ্বরের শিব গাজন, কোতুলপুরের ননগরের শিব গাজন, নিকুঞ্জপুরের বুড়ো শিবের গাজন, বর্ধমানের গুসকরায় সোমনাথেশ্বরের গাজন, কুড়মুন গ্রামে ঈশানেশ্বরের গাজন, এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর, গড়বেতা, পাঁশকুড়া, সবং, পিংলা, দাঁতন, বীরভূমের মল্লারপুর, সাহাপুর, যদুপুর প্রভৃতি স্থানে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

i) এখানকার গ্রামে গঞ্জে পুরো চৈত্র মাস জুড়ে চলে গাজনের আয়োজন, চৈত্র সংক্রান্তিতে ঘটে তার সমাপ্তি। কোন কোন জায়গায় চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচ সাত দিন পূর্ব থেকে উৎসবের সূচনা হয়, কোথাও আবার পনেরো দিন আগে থেকেই চলে নানা অনুষ্ঠান, কোথাও আবার সংক্রান্তির আগের দিন থেকে হয় গাজনের সূচনা।

ii) তবে শুধু শিব নয়, ধর্মরাজ কে কেন্দ্র করেও রাঢ়বঙ্গে গাজনের ঢল চোখে পড়ে। ধর্মরাজ আদি দেবতা। পাল সেন যুগে এমন কি তার আগেও অস্ট্রিক দেবতা হিসেবে ধর্ম ঠাকুরের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব পড়েছে এবং এক বিচিত্র লোকধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে অনেকে সূর্য, বরুণ, যমরাজ, ইত্যাদি দেবতার মিল খুঁজে পেয়েছেন। ধর্ম ঠাকুর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পূজিত হন কোথাও কালুরায়, কোথাও কালাচাঁদ, বাঁকুড়া রায়, কোথায় আবার বুড়োরাজ ইত্যাদি নানা নামে তিনি পরিচিত। এই ধর্মরাজের পুজো কে কেন্দ্র করে রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে ধর্মের গাজন দেখা যায়। এখানকার বিখ্যাত কয়েকটি ধর্মরাজের গাজন হল — বীরভূমের ঈশ্বরপুর, মেটেলা ও বাঁধেরশোল গ্রামে, পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর, গোকুলপুর, সবং এর খোড়াই গ্রামে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজের গাজন, রায়পুরের মটগোদার গাজন ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বর্ধমানের বুড়োরাজের গাজন, যেখানে শিব ও ধর্মের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

iii) মনসার গাজন - বনজঙ্গলে ঘেরা রাঢ়বঙ্গ। এখানে সর্পাঘাতে মানুষের মানুষের মৃত্যু সংখ্যা বেশি। তাই সাপের ভয় থেকে বাঁচতে এখানকার মানুষ সর্পদেবী মনসার পুজো করেন। আর এই মনসা পুজো কে কেন্দ্র করে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এখানকার গ্রামে

গঞ্জে দেখা যায় মনসার গাজন। এখানকার বিখ্যাত কয়েকটি মনসার গাজন হল পুরুলিয়ার নড়রা, বলরামপুর থানার রুচাপ, বর্ধমানের মেমারী থানার সাতগাছিয়া, জামালপুরের শ্রীকৃষ্ণপুর, বীরভূমের নানুর থানার কুমিরদা, বাঁকুড়ার কোতুলপুর, ছাতনার গোপালপুর, ইত্যাদি। মনসা রাঢ়বঙ্গের প্রধান লৌকিক দেবী। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে সর্প পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে, যা এখানকার মাটির কাছাকাছি মানুষের প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

iv) বলরামের গাজন - শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরামকে কেন্দ্র করে গাজন রাঢ়বঙ্গে একমাত্র বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত বোড়ো গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয়। বলরামের এই মূর্তি ভারতের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীন মূর্তি। অনুমান করা যায় এখানে বলরামের মন্দির নির্মিত হয় ষোড়শ শতকের পূর্বে। বলরামকে এখানে সবাই খুব মান্য করে। এই গ্রামে শ্রী শ্রী বলরামদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে - একবার নদীতে এক বিরাট নিমকাঠ ভাসতে ভাসতে এই গ্রামে এসে আটকে যায়, সেই সময়ে সেখানের এক সেবাইত স্বপ্নাদেশ পান স্বয়ং ভগবান অনন্ত বাসুদেব উপস্থিত হয়েছেন এবং ওই নিম কাঠ দিয়েই তার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূর্তির উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট। মূর্তিটি একটি বিরাট পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে। বলরামের গাজন শুরু হয় অক্ষয় তৃতীয়ার স্নানযাত্রা দিয়ে এবং স্নানযাত্রার পর অক্ষয় তৃতীয়া থেকে নৃসিংহ চতুর্দশী বা শুক্লা চতুর্দশী পর্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকে। এই সময় সেবাইতের বাড়িতে শিলা এনে পুজো করা হয়, এবং অক্ষয় তৃতীয়ার তিনদিন পর নৃসিংহ চতুর্দশী এবং বুদ্ধ পূর্ণিমার সংযোগ ক্ষণে বলরামের তিনটি চোখ বুলিয়ে দেওয়ার রীতি হল বলরামের চক্ষুদান উৎসব। এরপর একাদশী তিথিতে হয় মূল গাজন।

এই রকমই রাঢ়বঙ্গের নানা লৌকিক দেব দেবী কে নিয়ে আরো অনেক গাজন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। মিহিরচৌধুরী কামিল্যা আরো বেশ কয়েকটি গাজনের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন -

ক) অকাল গাজন - চৈত্র মাস হল গাজনের সময় কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যায় চৈত্র ছাড়াও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অকালে অনুষ্ঠিত হওয়া গাজন হল অকাল গাজন বা আপাল গাজন।

খ) বারো বছরি গাজন - আবার কোন কোন জায়গায় এক যুগে একবার গাজন হয় অর্থাৎ বারো বছর পর পর হয় বলে একে বলা হয় বারো বছরি গাজন।

গ) হুচুক গাজন- হুজুগে পড়ে অল্প সময়ের জন্য মাত্র দু তিন ঘন্টার সময়ে গাজন অনুষ্ঠিত হলে তাকে বলে হুচুক গাজন।

ঘ) চৈতি গাজন- সাধারণত সব গাজনই চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় তাই সেগুলিকে চৈতি গাজনও বলা হয়।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

তবে সে যাই হোক না কেন, আসলে গাজন হল বৃহত্তর বাঙালি জীবনের এক প্রধান উৎসব। যা এখানকার জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এখানে মিলন ঘটে মানুষের সাথে মানুষের। গাজনের মধ্য দিয়ে সম্মিলিত জনগণ আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। রাঢ়বঙ্গের অধিকাংশ মানুষ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী। হাজার কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে এদের দিন চলে। নিত্যদিনের কর্মের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে নিজেকে হারিয়ে দেয় উৎসব - পার্বণে। এই গাজনের মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন ঘটে অন্যদিকে তেমনি এক সংস্কৃতির সঙ্গে আরেক সংস্কৃতির মিলন ঘটে এবং এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়। তাই রাঢ়বঙ্গের প্রধান উৎসব গাজন হয়ে উঠেছে গাঁ জনের পরব বা গ্রামের সাধারণ মানুষের উৎসব।

**তথ্যসূত্র :**

১) বিনয় ঘোষ,পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খন্ড
২) পল্লব সেনগুপ্ত, পূজা পার্বণের উৎস কথা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪
৩) মনোজিৎ অধিকারী, গাজন, দে'জপাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৬
৪) ড. প্রদ্যোত কুমার মাইতি, উৎসব, বিনোদন,পূজাচারও অনুষ্ঠানাদির আঙিনায় বাংলা, পুস্তক বিপণি, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
৫) প্রণব সরকার সম্পাদিত পত্রিকা, স্বদেশচর্চা লোক, বাংলার লৌকিক দেবদেবী ১, ১৭ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

# লুপ্ত লুপ্তপ্রায় 'ধাইমা'

দশরথ রজক

আমাদের দেশ, কাল, সমাজ অগ্রগতির ভাবনা নিয়ে যে প্রবহমানতার পথে হাঁটছে তাতে সমাজ ভাবনায়, সংসার ভাবনায় এবং জীবন ভাবনায় বহু সৃষ্টি, সংস্কৃতি দিনে দিনে অতীত হয়ে পড়ছে। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, সামাজিক কাজকর্ম, ধর্মীয় রীতিনীতি, জাতি ও তাদের জীবনযাত্রা, শিল্প- সাহিত্য, বিজ্ঞান - প্রভৃতি বহু বিষয় কালের গতিতে কত অবহেলায় নিষ্প্রয়োজন হচ্ছে। ফলে অতীতে চলমান বহু বিষয় অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে এবং লুপ্ত হতে চলেছে। তাই লুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় বিষয়গুলি কোন এক কালের স্রোতে মানুষের বিশ্বাস, ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণে উন্নত জীবন যাপনে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু এ কালীন উচ্চ শিক্ষা মনস্ক ব্যক্তিবর্গ উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বহু পুরাতন কে বাতিল বা বিভাজন বা চ্যুত করতে চাইছে এবং বহু নতুনের জন্ম দিয়ে সমাজকে আধুনিকতার মোড়কে বাঁধতে চাইছে। ফলে বহু প্রাচীন সংস্কৃতি মহাকালের নিরিখে তলিয়ে যাচ্ছে এবং আধুনিকতা মাথাচাড়া দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। চেতনা নতুনত্বের উন্মেষ ঘটায়, আধুনিকতা বস্তুগত ও তত্ত্বগত ভীত মজবুত করে। বর্তমানে আমরা যে সমস্ত পুরোনোকে নিষ্প্রয়োজন ভেবে নতুন যে সমস্ত বিষয়কে জীবন প্রবাহ সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য গ্রহণ করছি সেগুলিও আমাদেরকে কতটা আধুনিক করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে তা সেখানেও আমাদের প্রশ্ন থেকে যায়। মূল্যবোধের মূল্য যাচাই করতে যে ইতিহাস ধরা পড়েছে তা পাঠকবর্গ কে অবশ্যই ভাবতে শেখাবে।

রাঢ় বাংলার লাল কাঁকুরে মাটিতে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভুম, বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর সমৃদ্ধ। এই লাল মাটির দেশে "ধাইমা" সুপরিচিত ও সুপ্রাচীন একটি নাম। ধাইমা কথাটি তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ধাত্রী থেকে এসেছে। বলা যেতে পারে ধাত্রীমাতা-ধাইমা (বিশেষ্য)। ধাত্রী মাতার ন্যায় যে স্ত্রীলোক শিশু পালন করেন তিনি ধাইমা। যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করায়; প্রসূতি কে সাহায্য করে, আঁতুড়ঘরে প্রসূতি ও নবজাতক শিশুর সেবা করেন এবং যে নিজের স্তন্য অন্যের সন্তান পালন করেন তিনিই ধাইমা। এখন শুদ্ধ বাংলায় যাদের আয়া বলা হয়। অতীতে বাঙালির ঘরে ঘরে এই নামের স্ত্রীলোকটি অতি পরিচিত ছিল। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীয়ানা যতদিন বিরাজমান হয়তো ততদিন এই নাম কমবেশি সকলেই মনে রাখবেন।

নিম্নবর্গ শ্রেণীর মহিলারা ধাইমার কাজ করত। বিশেষ করে বাউরী, হাড়ী, ডোম শ্রেণির বয়স্ক মহিলারা। প্রসবিনী প্রসব যন্ত্রণায় যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়তেন তখন ধাইমার ডাক পড়ে। ঘরের মধ্যে ধাইমা একা প্রসব করানোর যাবতীয় কাজ করে। ধাইমা সঙ্গে নেয় একটি বাঁশের ঝুড়ি, এক বাটি গরম জল, বাঁশের ছিলকি, সাবান, ফিটকিরি, সরষের তেল, নারকেল তেল, সূত, লাইকিস্ত পাতার রস যা নাড়ি শুকনো করার জন্য নাড়ির মুখে দিত। ধাইমা হাঁটু গেড়ে





ঝুড়ি নিয়ে সন্তান প্রসব করাতো। সন্তান প্রসবকালীন যে ফুল বের হতো তা কেটে ধাইমা মাটিতে পুঁতে দিত। প্রসবের জন্য যা যা করণীয় সবই তিনি নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে করতেন।

সন্তান প্রসব থেকে ২১দিন ধাইমা ঘুমভরা চোখে রাত্রি জাগত। সন্তানের আমাশয় হলে, মায়ের অজীর্ণ অম্বল হলে, মায়ের স্তনে দুধ না এলে, ছেলে দুধ না খেতে চাইলে, মায়ের প্রসব- দ্বার এবং সন্তানের নাড়ি যাতে সুস্থ থাকে তার জন্য নূন্যতম ২১ দিন প্রসবিনী ও সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে একই ঘরে ধাইমা থাকে। সে ঘরে আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না। মা ও সন্তানের পরিত্যক্ত ময়লা কাপড় চোপড় পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে সোডা ও সার্ফ জলে চুবিয়ে কেচে শুকনো করতে দেয়। তেল মাখানো, মলাম মাখানো, স্নান করানো সমস্ত দিক থেকে মা ও সন্তানকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে ধাইমা বদ্ধপরিকর। যে ২১ দিন ধাইমা থাকতো সেই দিনগুলির মধ্যে কিছু নিয়মকানুন ও সংস্কার তিনি করতেন। যেমন—

**৪ দিনে ঝাল ভাত :** সন্তান প্রসবের পর মা এই দিনে প্রথম ভাত খায়। ভাতে থাকে শাক-সবজি, ডাল সেদ্ধ, পোস্ত বাটা ও মাছ এই চার রকম তরিতরকারি দিয়ে সেদিন মাকে অল্প পরিমাণ নুন ঝাল সহকারে ভাত খেতে হয়। এরূপ খাবারের ফলে মায়ের ভালো ঘুম হয়।

**৫ দিনে পাচুটা :** ধাইমা সোডা দিয়ে কাপড়চোপড় কাচে, মায়ের গায়ে কোমরে তেল মাখায়। পরিবার ও ভায়াদরা হাঁড়ি, কড়াই মেজে রান্না বসান। নাপিতের ক্ষৌর কর্মের মধ্য দিয়ে জাতশৌচ মুক্তি পায়।

**৬/৭ দিনে ষেটারা পাতা :** সন্তান পলনের দেবী হলেন মা ষষ্ঠী। ষষ্ঠীর অপর এক নাম "ষাটা"। ষাট অর্থে ষষ্ঠী আর অড় বা আড়া অর্থে পাতা। তাই "ষাট" ও "অড়" শব্দের মিলনে ষেটারা পাতা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং ষেটারা পাতা মানে ষষ্ঠী পাতা ও তার পূজা করা। এই দিন শিশুর কল্যাণে মা ষষ্ঠীর বিধান। লোক- বিশ্বাস আছে যে পুত্র সন্তান হলে ছয় দিনের দিন এবং কন্যা সন্তান হলে সাত দিনের দিন এই ষেটারা পাতা হয়। এ ও প্রচলন আছে যে এই দিন রাত্রে ভাগ্যদেবতা এসে সন্তানের ললাটে ভাগ্য লিখে যায়। সেই জন্য ষেটারার প্রধান উপকরণ দোয়াত কলম। যেটি সদ্যোজাত শিশুর মাথার কাছে রাখা হয়। কেতকাদাস তার মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখ—

'ছদিনে ষাট্টারাঃ করিল বান্যারাঃ বিহিত ষষ্ঠীর পূজা।
সনকা বান্যানিঃ নানা সজ্জা আনিঃ কিঙ্করে ডাকিল দ্বিজা।।
সনকা সুন্দরীঃ ষষ্ঠী পূজা করিঃ যাহার যে নীত আছে।
হাতে খড়গ লয়্যাঃ রহিল জাগিয়াঃ মসিপত্র থুয়্যা কাছে।।'

সাধারণত অঁতুড় ঘরে ষষ্ঠী দেবীর কৃপালাভের জন্য ষেটারা পাতা হয়। এর উপকরণে লাগে- ৫টি, ৮টি অথবা ২১ টি কড়ি। ৫টি গোবরের ডেলা, ৪টি সরকাঠি, সুতো, প্রদীপ, ধুপ, সিঁদুর, ঘট, আমপল্লব, বর্ণপরিচয় বই, বাতাসা, চাল, কিছু ধান, ভেলাই, সাপের খোলস,

সাদা কাগজ, সরকাঠির তৈরি কলম, কালি ভরা দোয়াত, কাঠের পিঁড়ি, তালপাতা, বাঁশ পাতা ও আট রকমের কলাই ইত্যাদি।

প্রথমে ধাইমা আঁতুড় ঘরের ঈশান কোণে সন্তানের মাথার দিকের দেওয়ালে একটি গোবরের ডেলা নিয়ে পুত্তলিকা অঙ্কন করে। তারপর তাতে বংশপ্রথা অনুযায়ী কড়ি সেঁটে তাতে সিন্দুর লাগানো হয়। দেওয়ালের নিচে আলপনা আঁকা পিঁড়ি বসিয়ে তার উপর ধান দিয়ে আমপল্লব সহ জলপূর্ণ ঘট পাতা হয়। এরপর সমস্ত উপকরণ দিয়ে পূজা করা হয়। পূজার সময় প্রদীপ জ্বালানো হয়। সেই প্রদীপ সারারাত ঘর আলোকিত করে রাখে। তারপর সদ্যোজাতককে ষষ্ঠী দেবীর কাছে শুইয়ে মা প্রণাম করে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামের পুরোহিত শক্তিপদ শর্মাকে যেটারা থানে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেতে শোনা যায়—

‘ওঁ দ্বারপাল নমস্তভ্যং সব্বেষাং শ্রীফলপ্রদ।
ত্বৎ প্রসাদাদবিঘ্নেন চিরং জীবাণু বালকঃ।।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ওঁ আয়াহি বললে দেবী মহাষষ্ঠীতে বিশ্রুতে।
ধাত্রীরূপেন যে পুত্রং ষষ্ঠীজাগরবাসরে।
ষষ্ঠীমাবাহ্য আসনাদি ষোড়শোপচারৈঃ সম্পুজ্য
পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা প্রানমেৎ।।’

(পুরোহিত দর্পণ)

**৮ দিনে আটকলাই :** আট রকমের কলাই থেকে এই আটকলাই কথাটির প্রচলন। এই দিন সন্ধ্যায় পাড়ার বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের দল প্রসবিনীর বাড়িতে এসে পুরাতন কুলো পেটাতে পেটাতে ছড়া বলে-

‘আটকলায়ে বাটকলায়ে
ছেলে পুয়োতি ভালো
মায়ের কোলে ছেলে দিয়ে
বাপের দাঁড়ি ছিঁড়।’

বাঁকুড়া জেলার জয়পুর গ্রামে ঝর্না বাউরী নামে এক ধাইমার মুখে এরূপ ছড়া আজও শোনা যায়। এছাড়াও কোন কোন গ্রামে শোনা যায়—

‘আটকলাইয়া পাট কলাইয়া
বউ পোয়াতি ভালো
বউ এর কোলে ছ্যেলা দিয়ে
বাপের দাঁড়ি ছিঁড়।’

ছড়া বলা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দলকে ‘আটকল্যায়া দল’ বলা হয়। এই দল ছড়া



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বলতে বলতে কুলো নিয়ে ৯ পাক ঘুরে। শেষে একজন এক নিঃশ্বাসে কুলোটিকে বাড়ির চালের উপর ছুঁড়ে দেয়। কুলোটি বাড়ির চালে আটকে গেলে সকলে দাঁড়িয়ে নবজাতককে আশীর্বাদ করে। এরপর ধাইমা ও বাড়ির ঠাকুমা এক- দু টাকার খুচরো কয়েন ও কড়ি বাড়ির উঠানে ছড়াতে থাকে। তিনবার এই পয়সা ও কড়ি ছড়াতে হয়। ছেলেমেয়েরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে সেই পয়সা ও কড়ি কুড়াতে থাকে। এবং সেইগুলি কুড়াতে কুড়াতে ছেলেমেয়ের দল গোলাকার দাঁড়িয়ে নানা ছন্দের ছড়া গান বলে—

‘ছ্যেলার হাতে দুটি বেল
ছ্যেলার ধাইমা পয়সা ফেল
ছ্যেলা কাঁদে টঁহা টঁহা
ছ্যেলার ধাইমা পয়সা ছ্যড়া।’

এসব ছড়া বলতে বলতে আটকল্যায়া দল ধাইমাকে ঠাট্টা করে বলে-

‘আটকল্যায়া বাট কল্যায়া
পো পোয়াতি ভালো?
ধাইমা আছে আঁতুড় শালে
সে-ও আছে তো ভালো?’

ধাইমা উত্তরে বলে—

‘পো করে টঁহা টঁহা
মায়ের কোলে শুয়ে
ধাইমা দেয় আগুনের সেঁক
কাপড়-চোপড় ধুয়ে।’

সবশেষে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল পয়সা, কড়ি, শাল পাতার খালাতে মুড়ি, মিষ্টি, আট রকমের কলাই নিয়ে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে।

ছেলেমেয়েদের কুলো বাজানো নিয়ে দাদু ঠাকুমার মুখে আদিম গল্প শোনা যায়। আগে আদিম মানুষ হিংস্র পশুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য গুহার চারিদিকে বড় বড় পাথর রাখতো এবং তার পাশে আগুন জ্বালাত। পাথরের গায়ে বড় বড় গাছের ডাল দিয়ে আঘাত করতো, তাতে ধবধবশব্দ হতো। সেই শব্দের ভয়ে বন্য পশুরা গুহার কাছে আসতো না। এমনকি অপদেবতারাও আসতো না। হয়ত এখন ও সে আদিম বিশ্বাসকে মেনে নিয়ে সদ্যোজাত শিশুকে বিভিন্ন হিংস্র পশু ও অশুভ শক্তি থেকে রক্ষার্থে কোথাও কুলো, আবার তার সাথে থালা, বাটি বাজানো লক্ষ্য করা যায়-

‘বাটি বাজা, কুলোয় ঘা
ভূত-প্রেত ঘরকে যা।’

**৯দিনে লত্তা :** লত্তার দিন নাপিতে নখ কাটেন। ধাইমা মা ও সন্তানকে তেল মাখায়।

কাঁসার থালায় জল দিয়ে তাতে হলুদ, পাঁচটি ধান- দুব্বা, কাজল লতা, পেরেক দিয়ে সেই জলে সন্তানকে স্রান করায়। এদিন সদ্যোজাত প্রথম স্রান করে।

**২১দিনে একুশা :** ২১দিনে সকলে নখ কেঁটে পরিবার ছোঁয়াচ থেকে মুক্তি পায়। এই দিনে প্রসবিনী তেল, সাবান মেখে মাথা ঘষে পুকুরে স্নান করেন। সন্তানকে স্নান করানো হয় কাঁসার থালায় হলুদ জলে ধান দূর্বা দিয়ে। তারপর মা ও সন্তান দুজনেই নতুন বস্ত্র পরিধান করে। এই দিনে ধাইমাও নতুন বস্ত্র ও পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী পারিশ্রমিক নিয়ে নিজের বাড়ি যায়।

এইভাবে ২১ দিন পার করে মা ও সন্তানকে সুস্থ রেখে ধাইমার বাড়ি ফেরার ঘটনা অন্য পেশায় বিরল।

বাংলা সাহিত্যে বহু লেখক ও কবির লেখনীতে ধাইমার প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ধাত্রী দেবতা" উপন্যাসে ধাত্রী দেবী নামে চিকিৎসা শিক্ষার একটি প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। ইতিহাস পড়লে জানা যায় সম্রাট আকবর ধাত্রীদের কাছে মানুষ হয়েছিলেন। ধাত্রীমাতা পান্না তো নিজের সন্তানের বিনিময়ে উদয় সিংহকে বাঁচিয়ে বড় করে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে উদয় সিংহ মেবারের রাজা হয়েছিলেন। আবার "বীরাঙ্গনা" কবিতায় নজরুল ইসলামের খেদোক্তি ঝঙ্কৃত হয়েছে এইভাবে-

"ক'জন করিল তপস্যা তাই সন্তান-লাভ করে? কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুড়ে জন্মে মরে?'

লোকগান ও গীতিপালায় ধাইমার উল্লেখ পাওয়া গেছে। লোকশিল্পীর অপটু হাতে নানা রকম দেহতত্ত্বের গান, ভক্তিমূলক গান লিখে নিজেরাই সুর দিয়ে গেয়ে থাকেন-

'আমার ধাইমা গেণী বাউরী
বাবার ধাইমাও সে
বল বল ওগো বাবু
শিবের ধাইমাকে?'

আবার ভাদুগানে শোনা যায়—

'ওগো বলি সবে
মাটির কোলে জন্ম হয় কেমন করে।।
জনক রাজার কন্যা সীতা গো
ডিম্ব ভিতরে থাক
নারীছেদন কেই বা করে
ধাইমা হয় কোন জনে।।'

সভ্যতা এগিয়ে চলেছে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নতি ঘটেছে। দেশ ও দশের মঙ্গলার্থে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক সুশিক্ষিত সমাজ



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ধাইমার দিয়ে সন্তান প্রসবের ভাবনা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। আগে ধাইমা ধারালো বাসের ছিলকি দিয়ে সদ্যোজাত শিশুর নারী কাঁটা ও নাভিদেশে সরষের তেল মাখিয়ে দেওয়ার জন্য নাভিতে সেপটিক বা ঘা হয়ে যেত। ফলে অনেক শিশু মারা যেত। বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার ফলে রোধ করা গেছে। এখন মানুষ সচেতন হওয়ায় ধাইমার সন্তান প্রসবের পদ্ধতি এবং রীতিনীতি পছন্দ করে না। প্রায় প্রতি এক হাজার জন বসবাসকারী গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা সাবসেন্টার সরকার গড়ে তুলেছে। যেখানে ডাক্তার- নার্স সর্বদা সজাগ। গর্ভে সন্তান এলেই গর্ভবতী মাকে নানাভাবে বিনা পয়সায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ওষুধপত্র দেওয়া হচ্ছে। আইসিডিএস অফিস থেকে গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হচ্ছে। প্রসবের সময় বিনা পয়সায় গাড়ি করে মাকে ঘর থেকে হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রতি দশ হাজার জন পিছু একটি করে হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। এভাবে ঘরে ঘরে চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকার ফলে ধাইমাকে আর কেউ সন্তান প্রসবের জন্য ডাকে না। এতে করে ধাইমা আস্তে আস্তে সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে পড়েছে। এরা বেশিরভাগই গরিব নিরক্ষর হওয়ায় এবং আয় থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ধাইমারা বেকার ও দরিদ্র হয়ে পড়েছে। আর্থিক অনটন থেকে রক্ষার্থে এরা এখন পেশা বদলে হাট ঝাঁটায়, খেজুর পাতার ঝাঁটা বানায়, তালায় তৈরি করে, অপরের বাড়িতে ঝি এর কাজ করে। এদের আবার অনেক পরিবারের মেয়েরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মদ বিক্রি করে। দরিদ্র এদের নিত্য সঙ্গী। তবে বর্তমানে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ফলে এরা সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে পারছে। অনেকে পরিবারের সন্তানরা আবার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কাজও করছে। তাই অনেক পরিবার থেকে মহিলাদের ধাইমার কাজ করতে আর পাঠাই না। এভাবে আস্তে আস্তে সমাজে ধাইমারা অবলুপ্তির পথে। তাই অদূর ভবিষ্যতে ধাইমার অস্তিত্ব থাকবে কিনা তা এখন ভাববার বিষয়।

**তথ্যসূত্র :**

১. নারায়ন সম্রাট , বাংলার- সংস্কৃতি : লুপ্ত ও লুপ্ত প্রায় (গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেন যুগ থেকে অদ্যবধি), দেশ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০১৮, কলকাতা।

২. ড. সুজিত কুমার বিশ্বাস, রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি, আনন্দ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা।

৩. বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেব দেবী ও লোকবিশ্বাস। প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০1

৪. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. সনৎ কুমার নস্কর, কেতকা ক্ষেমানন্দ বিরোচিত মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

৬. মেঘদূত ভুঁই, সীমান্ত রায়ের লোকসংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২২

# মতুয়া ধর্মসাহিত্য : মতুয়া আন্দোলনের প্রতিবিম্বিত রূপ

**সঙ্গীতা ব্যানার্জী**

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সফলডাঙ্গা গ্রামের সচ্ছল পরিবারজাত নমঃশূদ্র বৈষ্ণব যশোবন্ত ঠাকুর ও অন্নপূর্ণা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮২২ সালের ১১ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।হরিচাঁদ ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মীয় জীবন ও কর্মসাধনাকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছে, যার সাহিত্যমূল্য ও ঐতিহাসিকতা এবং অনুপ্রেরণার শক্তি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। এগুলির মধ্যে অন্যতম আকর গ্রন্থগুলি হল — (১) তারকচন্দ্র সরকার রচিত 'শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত', (২) বিচরণ পাগল রচিত 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ মাহাত্ম্য', (৩) আচার্য মহানন্দ হালদার রচিত 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত', (৪) কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার —কৃত 'শ্রী শ্রী মহাসংকীর্তন', (৫) সূর্য্য গোঁসাই রচিত ' শ্রী শ্রী গোপালচাঁদ লীলাসঙ্গীত', (৬) অশ্বিনীকুমার সরকার রচিত 'শ্রী শ্রী হরিসঙ্গীত', (৭) বিচরণ পাগল —কৃত 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত্রসুধা' , (৮) ড. মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস রচিত 'হরিচাঁদ তত্ত্বামৃত' প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনা গৃহজীবনকেন্দ্রিক ছিল।তাঁর সমসাময়িক তারকচন্দ্র সরকার রচিত 'শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত' গ্রন্থটিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনার সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত দুঃখ, অসাম্য দূরীকরণের মাধ্যমে মানবজীবনকে পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যেই যে তাঁর আবির্ভাব এবং তিনিই যে ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক,সেই তথ্যই বারংবার বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। "পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার"[১] হরিচাঁদ ঠাকুর একদিকে পুরোহিততন্ত্রকৃত শোষণ থেকে পরিত্রাণ প্রদান ও অন্যদিকে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে মুক্তি দিতেই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর নির্দেশিত পন্থাটি হল "মেতে যায় হরি বলে ভঙ্গী করে কত,/ হরি বলে মেতে থাকে ও বেটারা 'মতো'। /বেদ বিধি নাহি মানে, না মানে ব্রাহ্মণ,/গো ব্রাহ্মণে ভক্তিবাদী যত লোক ছিল/ভক্ত দলে 'মতো' বলে বাদে ফেলে দিল।/বহিরঙ্গ লোক যদি কভু নাম করে/ 'মতো' 'মতো' বলি সবে তারে ব্যঙ্গ করে।"[২]

'মতুয়া' শব্দটির উৎপত্তি 'মত্ততা' বা 'মাতোয়ারা' থেকে।অনুসারীদের নাম সংকীর্তনে মেতে থাকার কারণেই 'মত' শব্দটির ব্যবহার। উচ্চবর্ণের হিন্দু ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষ্ণবরা সেই কারণে তাঁদের 'মোতো' বলে বিদ্রুপ করতেন। এই বিদ্রুপাত্মক শব্দটিকে হরিচাঁদ ঠাকুর শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করে 'মতুয়া'-র সৃষ্টি করেন।" দেশ ভরি শব্দ হল মতুয়া মতুয়া / — / সবে করে উপহাস ওই বেটা মত।।/তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁদ।/ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।।"[৩]

ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানসর্বস্বতা বর্জিত এই মতুয়া ধর্মে দেবদেবীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদের





একমাত্র পাথেয় হল কীর্তন। "দম দম মারো ডঙ্কা, ছিঁড়ে ফেলো সব শঙ্কা।"[৪] কিংবা "কেমনে পালিবে ধর্ম অন্ন চিন্তা যার।"[৫] অথবা "সন্ন্যাসীর ধর্ম যাহা, এই ধর্ম নহে তাহা।"[৬] - হল মতুয়া ধর্মের মূল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রপৌত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর মতুয়াদের সম্পর্কে বলেছেন, "শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন ইহধাম ত্যাগ করেন। আমার পিতামহ উত্তর সাধকরূপে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিবার উদ্যোগ করেন এবং তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল ইহাদিগকে 'মতুয়া' বলা হয়। 'মতুয়া' শব্দের অর্থ কি তা বলা প্রয়োজন। শ্রী শ্রী হরিঠাকুরের নামে ও প্রেমে যারা মাতোয়ারা তাহারাই 'মতুয়া' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[৭] বিভিন্ন মতুয়া কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকরা মতুয়াদের আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। হরিনাম সংকীর্তনের সময় মতুয়াদের আত্মবিস্মৃত হয়ে ভাবজগতে বিলীন হওয়া প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন — "জাতি কুল ছেড়ে দিয়ে প্রেমে মত্ত থাকে যারা তাঁরাই যথার্থে "মতুয়া।"[৮] মতুয়া সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন —"নামে প্রেমে মাতোয়ারা মতুয়া এবং প্রচলিত ধ্যানধারণায় যাদের বিশ্বাস নেই , কিংবা চলতি প্রথায় বিদ্রোহী যারা, তাঁরাই মতুয়া।"[৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর অন্ত্যজ শ্রেণির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ধর্মকে সমাজ কল্যাণার্থে ব্যবহার করেছিলেন। কুসংস্কার পরিত্যাগ করে হরিনামের সঙ্গে কর্মাদর্শকে সম্পৃক্ত করে হরিচাঁদ ঠাকুর যে কর্মপ্রয়াস নেন তা হলো "শুদ্ধ মানুষেতে আর্তি এই হয় মূল।।/জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা/ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।/এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জানাইতে।/জনম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।"[১০] প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকে লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে হরিচাঁদ ঠাকুর নিম্নবর্ণীয় মানুষগুলির করুণ অনুভূতিকে স্পর্শ করেছিলেন। তিনি তীর্থযাত্রার তুলনায় গৃহধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। 'হরিনাম' তথা 'হরিবোল' —কে মুক্তির পথ হিসাবে নির্দেশ করেছিলেন। "বিরাগ বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি আচরণ।/রাগ ভক্তি দিয়া মাতাইল সর্বজন।।/গৃহে থাকি প্রেম ভক্তি সেই হয় শ্রেষ্ঠ।/অনুরাগ বিরাগেতে প্রেম ইষ্ট নিষ্ঠ।।/—/গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।/বানপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়।।/—/যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।/সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে।"[১১] ষড়েন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার।/তীর্থে গেলে ফল প্রাপ্তি না হইবে তার।।/দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।/তার দরশনে সব তীর্থ দরশন।।/গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।/সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।"[১২] শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতিসাধনই নয়, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও মতুয়াদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য তিনি প্রয়াস নিয়েছিলেন। "যশোবন্ত পুত্র আমি নাম হরিচাঁদ।/এবার করিব যত পতিত আবাদ।।/এদেশে আবাদি তোরা চিনিলি না কেহ।/মাটি যে অফলা থাকে এ বড়

সন্দেহ।।/পতিত আবাদ জন্য আসা এদেশেতে।/কি ফল ফলিবে টের পাবি ভবিষ্যতে।।/খাটি মাটি হলে ফল না হল বিফল।/ভক্তি ভরে ডাকে তারে দেই প্রেমফল।।/যে ফল চাহিবি তোরা সে ফল পাইবি।/---/সফলা নগরী রই যে চাহে যে ফল।/বিফল না হয় ফল সে পায় সে ফল।।"[১৩] হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বলা যায় "রোগযুক্ত লোক যত প্রভুস্থানে যায়।/কীর্তনের ধূলা অঙ্গে মাখিবারে কয়।।/অমনি সারিয়া ব্যাধি করে সংকীর্তন।/কেহ বা লোটায় ধরে প্রভুর চরণ।।/কেহ কেহ মনে মনে করেন মানসা।/ব্যাধিমুক্তি হোক মোর পূর্ণ হোক আশা।।/হরি লুঠ দিব এনে শ্রীহরির স্থানে।/কেহ কেহ মুদ্রা দিব মনে মনে মানে।।/কীর্তনে আসিয়া কেহ গায়ে মাখে ধূলি।/রোগমুক্ত হয়ে নাচে দুই বাহু তুলি।।/—/পাঁচ সাত গ্রামে ক্রমে শব্দ হল ভারি।/কত লোক আসিত দেখিব বলে হরি।।"[১৪]

মতুয়া ধর্মে স্ত্রী জাতিকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। হরিচাঁদ পত্নী শান্তি দেবী, গুরুচাঁদ পত্নী সত্যভামা দেবী এবং প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের স্ত্রী বীণাপাণি দেবী (বড়মা), শুধু তাই নয় বর্তমানে বিভিন্ন মতুয়া নামসংকীর্তন দলের প্রধান রূপে নারীদের বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যায়। মমতা বালা ঠাকুরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতা সবিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া সমাজে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ও সমাজে তাদের অধিকার স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মতুয়া সমাজে নারী স্বাধীনতা স্পষ্ট। দরিদ্র্যতার কারণে পরিবারের প্রয়োজনে তারা পুরুষের মতোই বিভিন্ন কাজে যুক্ত হত। প্রকাশ্য রাস্তাঘাট ও হাট-বাজারে যাতায়াতে তারা কোনোরকম বাধার সম্মুখীন হত না। পণপ্রথার মাত্রা কম ছিল ও বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল।[১৫] পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন কম ছিল এবং শাস্ত্রীয় আচারবিহীন পূজার্চনার ক্ষেত্রে যেমন হ্যাচড়া পূজা, শুভ চণ্ডী পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদিতে মেয়েরাই প্রথম সারিতে ছিল। হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন "ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ"[১৬] লীলামৃত গ্রন্থে বলা হয় — "মেয়ে পুরুষে বসি একপাতে খায়/ মেয়েদের এঁটো খায় পদধূলা লয়/পুরুষ ঢলিয়া পড়ে মেয়েদের পায়ে।"[১৭] ব্যবহারিক তথা সাংসারিক জীবনে নারী পুরুষের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে সমতার কথা মতুয়া সমাজে স্বীকৃত।মতুয়ারা মনে করে নারীজাতি ধর্মের পথে অন্তরায় নয়।'এক নারী ব্রহ্মচারী' অথবা 'পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করবে'—একদিকে যেমন পুরুষের বহুবিবাহের পরিপন্থী ছিল, অন্যদিকে তেমনি ইন্দ্রিয় সংযম এবং স্ত্রী জাতির প্রতি সম্মানজ্ঞাপনের প্রবণতা প্রকাশ পায়। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার পূর্ণ অধিকার ও বিধবা নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন মতুয়াদের মানসিক অগ্রগতির পরিচয় দেয়। 'লীলামৃত'-এ অত্যাচারী নায়েবের বিচারের জন্য 'প্রতীকী বিচারালয়'-এর প্রতিষ্ঠা, নারীবিচারক, মুহুরি, পেয়াদা ও উকিলের কল্পনা, নারী স্বাধিকার এবং কর্মজগতে নারীর সম্মানপূর্বক অংশগ্রহণের ইঙ্গিতবাহী। এমনকি





হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় বহুসংখ্যক বিধবার পুনর্বিবাহের কর্মসূচী গৃহীত হয়। মতুয়া সাহিত্যিক মনোহর মৌলী বিশ্বাস মতুয়া নারীদের প্রশংসাপূর্বক বলেছেন — "যে কোনো এক মতুয়া হরিসভায় কিংবা হরিকীর্তনে গেলে মেয়েদের শিল্পচর্চা দেখে অবাক হতে হয়। পুরুষের তুলনায় তাঁরাই সঙ্গীত পরিবেশনে অধিক অংশগ্রহণ করেন।তাদের সে চর্চা নন্দিত শিল্পে বন্দিত, উন্নত ও মনোমুগ্ধকর। পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ যে নারীদের জন্য প্রতিটি হরিসভার নারীরা সেই আত্মশক্তির পরিচয় দিয়ে থাকেন।"[১৮] মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিবাচক বিষয় হল এখানে ভ্রূণ হত্যা অপ্রতুল এবং নারীরা এখানে পুরুষের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয় না। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষের কাছে সদর্থ ভাবেই গৃহীত হয়েছে।

মতুয়া নারীদের বৃহত্তর অংশটি নমঃশূদ্র সমাজের অভ্যন্তরে থাকলেও বর্তমানে নিম্নবর্গীয় সমাজের সকল জাতির অভ্যন্তরে মতুয়া মহিলাদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। মতুয়া সমাজের অভ্যন্তরে মতুয়া মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ছিল পুরুষের সমকক্ষ। মতুয়াদের সমানাধিকারের আদর্শানুসারে যেহেতু সমাজের অর্ধেক অংশ নারী ,তাই নারীদের উন্নয়নের বাইরে রাখলে সমগ্র জাতিই পিছিয়ে পড়বে। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ভারতে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সমাজ ও সাংসারিক জীবনে যেহেতু নারী পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে দায়বদ্ধ , তাই নারীকে উপেক্ষা করা মতুয়া সমাজে অসমীচীন। মতুয়াদের মধ্যে আদর্শপ্রাণা মহিলারা 'মতুয়া মাতা' কিংবা 'মা গোঁসাই' নামে পরিচিত ছিলেন। আইচার মালা ও গামছা হল মতুয়াদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।নারী সাধিকাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রসমতি, কুসুম,বউ ঠাকুরাণী, প্রমিলা, ফুলমালা দেবী, দারিয়ার মেয়ে এলোকেশী তপতি বা তোতা সাবিত্রী, কাঞ্চন, শান্তি বিনোদিনী, ভগবতী, কৈলাসমণি সরস্বতী বা গোধূলি হাটবাড়ি (গুরু বড় ধালীর স্ত্রী), জয়মতি, ময়নামতি, লালমতি, মালঞ্চ, বিলাসিনী, হেমন্ত কুমারী, অম্বিকা দেবী, পাগলী দাস, জানকী, রাধামণি, কন্যা বিরজা সাধনা, প্রভাতী, রতন, পদ্মা ঠাকুরাণী, সাধনা, মানবেন্দ্রের জননী - এই প্রধানা নারী সাধিকার সংখ্যা চৌত্রিশ।[১৯] গুরুচাঁদ লীলায় এই চৌত্রিশ গোপী স্থান পেয়েছেন। "চৌত্রিশ সে গোপী জানি ব্রজ গোপী রয়।"[২০] নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রসঙ্গে "হে'রে মতুয়ারা গণে আনন্দিত সর্বজনে/নাম রসে হইল মগন।/নর নারী সবে মিলি,করিতেছে প্রেমকেলি,/আঁখি জলে ভেসেছে বদন।"[২১] "নরে বলে হরি হরি উলুধ্বনি করে নারী/ধান্ন দূর্বা কেহ শিরে দেয়।"[২২]

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বাংলার ধর্মীয় ইতিহাস এবং দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তুচ্যুতির ইতিহাস পর্যালোচনা দু'শো বছরের প্রাচীন নিম্নবর্ণীয় ধর্মীয় সম্প্রদায় মতুয়াদের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের প্রসঙ্গ আলোচনা ব্যতীত অপূর্ণ থেকে যায়- মতুয়া ধর্মসাহিত্য যার প্রতিফলন।

তথ্যসূত্র :

১। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, অষ্টম সংস্করণ, ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ২০০৭ , পৃষ্ঠা ১
২। প্রাগুক্ত, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, পৃষ্ঠা ৯৪
৩। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৭
৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৯
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৭০
৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৭১
৭। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি, ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪
৮। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত প্রচার সঙ্ঘের স্মারণিকা, চাঁদপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৫
৯। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ও অন্ত্যজ বাংলার নবজাগরণ, চতুর্থ দুনিয়া ,কলিকাতা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১
১০। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ, মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১১
১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৩২
১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৩২
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৫০
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮
১৫। Nirmal Kumar Bose – The Structure of Hindu Society – (Revired Edition) – Orient Longman – 1957 –p 162
১৬। পূর্বোক্তি, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, অষ্টম সংস্করণ, ঠাকুরনগর, উত্তর চব্বিশ পরগণা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১০৫
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৭ - ১০৯
১৮। মনোহর মৌলি বিশ্বাস, 'মতুয়া ধর্মান্দোলন ও নারীবাদ', চাঁড়াল , কল্যাণী ঠাকুর (সম্পা), মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৮৮
১৯। নন্দদুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন এবং দলিত জাগরণ, (রোহিনী) রোহিনি নন্দন, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৫২ - ২৫৮
২০। মহানন্দ হালদার, গুরুচাঁদ চরিত, ওড়াকান্দি, বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৩০০
২১। তদেব, পৃষ্ঠা ৩১১
২২। তদেব, পৃষ্ঠা ২৩৮



## মানভূম সংস্কৃতির মুখপত্র ছত্রাক : নানান প্রসঙ্গ

**সুরঞ্জন রজক**

মানভূম সংস্কৃতির ব্যাপকতার মাধ্যম যদি বলা যায় মানভূম সাহিত্য তথা লোকসাহিত্য - শিল্পকলাকে, তাহলে সেই শিল্পকলার প্রচারে এগিয়ে আসা মাধ্যম হল মানভূমের পত্র-পত্রিকা। মানভূমের ভাষা, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিশ্বাস, মানভূমি পুরাকৃতি, মন্দির-স্থাপত্য মাহাত্ম্য, বিভিন্ন উৎসব, মেলা তথা আদিবাসি জীবনের চিরগাথার সৃষ্টিকারী শিল্পী-সাহিত্যিকগন একাধারে এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার আধার ও নির্মাতা।

কবিতা, গান, সুর, তাল, ছন্দ, লয় অলঙ্কারে গ্রথিত মানভূমের লোকসাহিত্য তথা সংস্কৃতি-চর্চা। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বাহক প্রমুখ ব্যক্তিত্বের পীঠস্থান এই মানভূম, যারা আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির ধারাকে শ্রেষ্ঠত্বের ফল্গুধারায় উত্তীর্ণ করে তুলেছেন। সেই ধারা মানভূমি ঝুমুর গানে হোক বা ছৌ-এর তালে অথবা নাচনী নাচের আসরে হোক বা মাদল-ধামসার প্রতিধ্বনিতে তা সর্বত্রই মুখরিত। 'মানভূম' নামক শব্দের উচ্চারণ যদি কোনো কিছুতে বর্তমানে উঠে আসে, তা হল এই অঞ্চলের লোকসাহিত্যচর্চা বা গবেষনার নামান্তরে। ঠিক এই কারণেই তার ঔজ্জ্বল্য বা মহিমা উত্তরোত্তর ছড়িয়ে পড়ছে সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষ জুড়ে।

মানভূম লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সাহিত্যচর্চায় 'অনৃজু', 'আখড়া', 'অড়', 'সংবর্তিকা', 'ছত্রাক' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু মানভূম লোকসাহিত্যের উজ্জ্বলতার সলতে পাকিয়েছে যে পত্রিকা তা হল অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়ের অমর সৃষ্টি ত্রৈমাসিক 'ছত্রাক' পত্রিকা। 'ছত্রাক' পত্রিকাটি পঁয়তাল্লিশ (৪৫) বছর ধরে মানভূম লোকসংস্কৃতির চর্চায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সেই কর্মকুশলতার দায়িত্বে ছিলেন সুবোধ বসু রায় মহাশয়। তিনি পাশে পেয়েছিলেন,—ড. অপূর্ব সান্যাল, ড. শক্তি দত্ত, সঞ্জীব গাঙ্গুলি, নরেন্দ্রনাথ ফৌজদার প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের।

'ছত্রাক' আসলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মানভূম শিল্পকলার অন্দরে উঠে আসা একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, যেটি ১৯৭০ সাল থেকে 'মানভূম সংস্কৃতির মুখপত্র' হিসেবে কাজ শুরু করে। ঠিক এমন সময় 'সময় ও শ্রুতি', 'সবুজসকাল', 'সত্তরের জার্নাল', 'সাহিত্য বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকারও আবির্ভাব ঘটে। অনেকেই এই 'ছত্রাক' পত্রিকাকে প্রকাশকালে মিনি পত্রিকা নামেও চিহ্নিত করতেন। এটি শারদ উৎসবের প্রাক্কালে ১৩৭৭ সালে পুরুলিয়া শহরে বছরে চারটি সংখ্যায় শিল্প-সাহিত্যমূলক রচনাও নানান প্রসঙ্গ নিয়ে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় লেখালেখির সূত্র ধরে যাঁদের সঙ্গে ঘরোয়া সম্পর্ক তৈরি হয় ছত্রাকের, তাঁরা হলেন — অরুণপ্রকাশ সিংহ, জয়া মিশ্র, মহাশ্বেতা দেবী, মহাবীর নন্দী, ড. সুধীর করণ, নির্মল হালদার, তরুণ চৌধুরী প্রমুখ।

মানভূম লোকউৎসবের পীঠস্থান। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ যেমন চর্চিত বিষয়, তেমনি মানভূম অঞ্চলের আদিবাসি মানুষজনের পার্বণও কোনো অংশে কম নয়। 'ছত্রাক' পত্রিকায় আলোচিত বা চর্চিত কোনো বিষয়ের কথা বললে, তা অবশ্যই মানভূমের পাবর্ন-উৎসব অন্যতম। সেই পার্বণ-উৎসবের কথা কখনও প্রবাদ-প্রবচন, কখনও বা ঝুমুর গানে, ছড়ার মাধ্যমেও উঠে আসে। যে সমস্ত উৎসব মানভূমের বুকে মানুষের মনে আনন্দ-হিল্লোল জাগায়, যেমন - ছাতা পরব, বাহা পরব, ইদ পরব, টুসু-ভাদু পরব, পৌষ পার্বণ, শিবের গাজন, মানভূমের দুর্গোৎসব প্রভৃতি।

'পুরুলিয়ার মেলা (৫)-আনাড়ার মেলা' শীর্ষক প্রবন্ধে সিরাজুল হক-এর কথা মতে, পুরুলিয়ার পাতকুমের রাজা তীর্থ সেরে ফিরছেন। চৈত্র মাসের দাবদাহে তিনি ক্লান্ত-অবসন্ন প্রায় অবস্থায় পথেই দেখতে পান এক অলৌকিক দৃশ্য। একটা ঝোপের পাশে একটি গাই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তার স্তন থেকে ঝরঝর করে দুধ ঝরে পড়ছে। সকলেই কৌতূহলবশত দেখলো সেই দুধ ঝরে পড়ছে একটি পাথরের মাথায়। এই দৃশ্য সকলকে প্রতিভাত করে, এমনি এমনি সেই পাথরের মাথায় দুধ ঝরে পড়ছে না! তা আসলে শিব ঠাকুর। উক্ত দৃশ্য দেখে রাজা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন এবং তিনি মনে করলেন তাঁর তীর্থ যাত্রা সার্থক হয়েছে। খুশি হয়ে তিনি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরুলিয়ার আনাড়ার শিব মন্দির আসলে পাতকুমের রাজার তৈরি। শুরু হল প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন মেলা। আনাড়ার মেলার এই কিংবদন্তি এখনো লোকের মুখে শোনা যায়। এই একই কাহিনি আরও দু'চার জায়গায় সংযোগ তৈরি করে শিবের গাজন মেলা শুরু হয়।

মানভূম তথা পুরুলিয়ার দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে নানান অলৌকিক গল্প-কথা শুনতে পাওয়া যায়। কথায় আছে—

"শিখরে পা, মল্লে রা

সাক্ষাৎ দেখবি যদি শান্তীপুরে যা।"[১]

শিখরভূমে অর্থাৎ কাশীপুরের দুর্গা মন্দিরে থালায় সিঁদুর রেখে দিলে পূজার পরে মায়ের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। মল্লভূমে 'মা' বলে ডাকলে মা মহামায়ার সাড়া পাওয়া যায়। শান্তীপুরে দেবীর দর্শনের প্রার্থনা জানালে দেবীর সাক্ষাৎ মেলে। এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে আজও।

১৩৮৮, শারদীয়া সংখ্যা-দ্বাদশবর্ষ, প্রথম সংখ্যাতে শ্রী সৃষ্টিধর মাহাত বাবা 'পুরুলিয়ার দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা'য় বলেছেন,—বরাবাজার থানার বরাবাজার-নামোপাড়ার দুর্গাপূজা সম্পর্কে একটি অলৌকিক ঘটনার গল্প শোনা যায়। বরাবাজারের কাছেই যে নেংসাই নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই নদীতে নামোপাড়ার অধিকাংশ মেয়েরা ভাল সংগ্রহ স্নান করতে যায়। বহুদিন পূর্বে ঐ নদী-ঘাট দিয়ে এক শাঁখারী ব্রাহ্মণ শাঁখা বিক্রয়ের



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

জন্য বাজারে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পিছন দিক থেকে একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণকে ডাকলে, "ঠাকুর, আমাকে এক জোড়া শাঁখা পরিয়ে দাও তো।"[২] ব্রাহ্মণ বললে,—"দেখ মা ! ,নদীর ঘাটে তোমার মতো মেয়েকে কি করে শাঁখা পরাই ? কোনটি তোমাদের বাড়ি? তুমি বাড়ি চলো, আমি শাঁখা দেব। আমি বাড়িতে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"৩ এবার মেয়েটি বললে,—"আমার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হবে। আমার বাবা বড় ভালো লোক। তুমি আমাকে শাঁখা দাও। আমাকে শাঁখা পরালে রাগ করবে না বরং উচিত মতো তোমার শাঁখার দাম দিয়ে দিবে।"[৪]

মেয়েটির বারবার অনুরোধে ব্রাহ্মণ তার হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। শাঁখা পরে মেয়েটি বললে, "ঐ দুর্গা মন্দির দেখছো, ঐ পাশের বাড়িটি আমাদের ওখানে যাও। বাবাকে বলবে রান্না ঘরের পূর্ব দিকের কুলুঙ্গিতে পয়সা আছে, শাঁখার দাম দিয়ে দিবে।"[৫] শাঁখা দিয়ে ব্রাহ্মণ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে আর মেয়েটির কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেন না। মনে কিছু না করে ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট বাড়িতে এসে শাঁখার দাম চাইলে বাড়ির কর্তা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর তো কোন মেয়ে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণের কথা মতো পূর্ব দিকের কুলুঙ্গিতে শাঁখার দামের পয়সা খানা পান। তাঁর বুঝতে বাকি থাকল না, মেয়ে সেজে "মা দুর্গা" শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে গেছেন।

এই ভাবেই সেখানে দুর্গাপূজা শুরু হয়। অনুরূপ ভাবে মানবাজার থানার খাটচিরি গ্রামেও মা দুর্গার মেয়ের বেশে শাঁখা পরার গল্প প্রচলিত আছে। একদিকে যেমন অলৌকিক ঘটনার কথা ছড়িয়ে আছে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে দুর্গাপূজা বিষয়ক অনেক নূতন-পুরাতন ঝুমুর গান ছড়িয়ে আছে। যেমন- পুরুলিয়ার হুড়া থানার হুড়া গ্রামের পরেশ কর্মকারের রচনায় উঠে এসেছে—

"হেমা হেমাঙ্গিনী / তুমি মা ত্রি-জগতের জননী/ মা গো ওগো মা।

মায়ের পদতলে/ মহিষাসুর গো/ ওগো মা।"[৬]

আবার, কাশীপুরের রাজ কবি ভবপ্রীতানন্দের রচনায়—

"কে বামা কেশরী পরে, দশ করে অস্ত্র ধরে/

নাচিছে ঘর সমরে — রূপে জিনি চপলা।/

মহেশ প্রেম পাগলা।"[৭]

শুধুমাত্র তাই-ই নয়, ঝুমুর গানেও যেমন দুর্গা পূজার কথা আসে ঠিক তেমনি লোকগীতিতেও তাঁর উল্লেখ মেলে। যেমন—টুসু গানে—

"শাড়ি কিনে দে গো শাশুড়ি,

আমি দুর্গাপূজা দেখতে যাব খাটচিরি।"[৮]

ভাদরিয়া দাঁড়শাল গানে,—

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা সবার পতিঘরে কেবল

আমার দু'নয়ন লোরে।
হামকে গাঁথি গেলাক মন সুতাক ডোরে জ্বর জ্বর
প্রেম স্বরে।"(রং)[৯]

পুরুলিয়াতে সাধারণত মহিষমর্দিনী মূর্তিই পূজা করা হয়ে থাকে। সাধারণ ভাবেই মূর্তি তৈরি করা হয়, তবে যাঁদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল সেই সব পূজা কমিটির লোক ধ্রুবদাস, তারাপদ কুম্ভকার, বিরিঞ্চি কুম্ভকারকে দিয়ে অধিকতর সুন্দর মূর্তি তৈরি করান। এখানকার মানুষ দুর্গা পূজার উৎসব শেষ করে অহিরা গানের সুর তোলে। এই ভাবেই নানা উৎসব-অনুষ্ঠান, কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে মিলন ও বিদায়ের আবহে পূজার দিনগুলো শেষ হয়।

এবার আসা যাক মানভূমের আরেক উৎসব তথা পরব 'গাঁয়ের পরব' এর কথায়। এই উৎসব চৈত্র মাসে হয়ে থাকে। গাঁয়ের পরব আসলে 'শিবের গাজন' উৎসবেরেই নামান্তর। অনেকেই একে অপরকে জিজ্ঞেস করে থাকেন, — তোমাদের গাঁয়ের পরব কত দিনে হে? তাই গাঁয়ের পরব অর্থে গ্রামের নানান পূজা-পার্বণকে বোঝায়। আবার অনেকে মনসাপূজা, শিবপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, শারুল পূজা, রথ, করম, ইদ, ছাতা, বাদনা, মকর, জাওয়া সকলকেই বুঝে থাকেন।

তবুও কিছু কিছু অঞ্চলে সেই সব পরবের বা পার্বণের নাম নিয়ে বিতর্ক থেকে থাকে। যে যেমন ভাবে পারে বলে থাকে। কেউ চৈত্র মাসের গাঁয়ের পরবকে 'ভগতা পরব' বলে, কেউ আবার চৈত পরব বা মেলা বলে থাকে, কেউ কুঁড়া পরব, ছৌ পরব, আম খাওয়া পরব, চড়ক পরব ইত্যাদি বলে থাকে।

পুরুলিয়ার লোকউৎসবের মধ্যে 'বাহা পরব'ও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যা 'ছত্রাক' পত্রিকায় সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। 'বসন্তের বাহা পরব' শীর্ষক রচনায় বিশাখা মাঝি লিখেছেন,-"দোল পূর্ণিমার হোলিখেলা সাঙ্গ হলে তার জের টুকুকে ধরে রাখে সাঁওতালদের বাহা পরব। 'বাহা'র অর্থ ফুল ও 'পরব' এর অর্থ পার্বণ। আক্ষরিক অর্থে যাই বোঝাক না কেন, এটা হচ্ছে সৃজন দেবতাকে বড় করে সেবা কারার পরব।"[১১] লৌকিক প্রবাদ আছে যে, সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা নাকি তাদের ধর্ম নির্দিষ্ট করার জন্য দশ বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েছিল। অবশেষে সারি সারজম অর্থাৎ শাল তলায় তাদের ধর্ম সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসে। ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনটিকে স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে বাহা পরব করে থাকে।

এছাড়াও ছাতা পরবকে উপলক্ষ্য করে সিরাজুল হক তাঁর 'চাকলতোড়ের মেলা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন,—

"জয়পুরের রাস-পূর্ণিমা বরাবাজারের ইদ রে
কাশীপুরের দুগগা পূজা
চাকলতোড়ের ছাতারে "[১২]





অনেক আগেকার প্রবাদ বাক্য এটি। চাকলতোড়ের ছাতা মেলা, যেটি ভাদ্র মাসের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয়। বলা হয় 'ছাতা পরব'। মেলায় কাছাকাছি মানুষের ভিড় হয়। সমস্ত জনজাতি, উপজাতির মানুষ এই মেলায় সমবেত হন। হাজির হন সমস্ত পরিবার নিয়ে।

মানভূমের গৌরব কখনই ক্ষুন্ন হয়নি, এই মেলা মাঠে ঘাটে অনুষ্ঠিত হওয়ায়। কথায় বলা হয় টাইড়-টিকড়ের মেলা। সারি সারি দোকান, মহিলাদের সাজের পসারি, নানান খেলনাজাতীয় সামান, ছেলেভুলানো খেলাও আয়োজিত হয়।

চাকলতোড়ের এই মেলার উৎপত্তি বা গুরুত্ব একটু স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় পঞ্চকোটরাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন একসময়। পুরুলিয়া সদরের ট্রেজারি, থানা ইত্যাদি নিজের দখলে এনে একদিন পুরুলিয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। প্রমাণ করে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুলিয়া পিছিয়ে নেই। এক সময় সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। ঠিক সেই সময় এই সাঁওতাল শক্তিকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে একত্রিত ও সাংগঠনিক ভাবে ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পঞ্চকোটরাজ। শোনা যায়, সাঁওতালদের হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণে সমবেত হন এই চাকলতোড়ের ছাতা মেলাস্থলে। এই সেই মাঠ যেখানে লুকিয়ে আছে সাঁওতালী গণসংগ্রামের এক স্মরণীয় ইতিহাস। সেই চাকলতোড়ের ছাতা পরব দেখতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে মন ছটপট করা অবস্থার কথা উঠে আসে গানে গানে,—

"চল গে চল দ্যেখতে যাব—
চাকলতোড়ের ছাতা,
মেনেক, কাঁসাই নদীতে বান প্যড়েছে—
পাইরাব কেমনে?"[১৩]

স্থানীয় সাঁওতাল সমাজে একটা লৌকিকতা প্রচলিত আছে যে, মেয়েদের কমপক্ষে একবার চাকলতোড়ের ছাতা মেলা দেখতে যেতেই হয়।

**পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ—**

ছত্রাক-এর অন্যতম সেরা গল্পকার পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে মানভূমের ছোটগল্পকারদের মধ্যে প্রধান গল্পকার ছিলেন পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম পতাকী, পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক, নেশায় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তাঁর শিল্পচর্চা বহুমাত্রিক। অনেকে বাংলা সাহিত্যের মানিকবাবুর সঙ্গে তাঁর তুলনা টানতেন। 'ছত্রাক' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম একজন ছিলেন তিনি। বিখ্যাত গুণী ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সংগীত, নাট্য-অভিনয় নানান দিকে তাঁর বিচরণ ছিল।

মানভূমের ভূমিপুত্র হিসেবে তিনি ১৯২৯ সালে বর্তমান পুরুলিয়ার নডিহার ড. গিরীন্দ্রমোহন মুখার্জি রোডের নিজস্ব বসতবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নলিণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা সুরবালাদেবী। 'ছত্রাক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর গল্প প্রকাশিত হত। যদিও তাঁর প্রকাশিত আট-নয়টি গল্প ও একটি উপন্যাস ছাড়া আর কিছুই সংগ্রহে নেই। শোনা যায় 'ছত্রাক'—এ গল্প প্রকাশের পূর্বেই কলকাতার 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়।

তাঁর 'বদন চৌকিদার' গল্পটি সবার নজর কেড়ে নিয়েছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে পুরুলিয়ার দক্ষিনাংশে চারটি থানায় প্রবল কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। বলরামপুর থানা ছিল তার কেন্দ্রস্থল। কৃষক আন্দোলনের নেতা সমর রায়, তার মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল দু'হাজার টাকা। তৎকালীন সরকার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষক, ছাপোষা মানুষের বাঁচার, সংগ্রামের গল্প 'বদন চৌকিদার'। 'বদন' চরিত্রটি কৃষক, গরীব হতদরিদ্র মানুষের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই গল্পে। গল্পটির প্রেক্ষাপট বিশাল হলেও লেখক তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

এই গল্পটির রেশ টেনে তিনি লিখেছিলেন 'শিবির' নামক আরেকটি গল্প। জ্বলন্ত সংগ্রামের চিত্র এখানেও ভেসে উঠেছে। তাছাড়া তাঁর লেখা 'মামলা', গল্পটি প্রকাশিত হয় 'ছত্রাক'-দ্বিতীয়বর্ষ-১৩৮০-নববর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায়। এছাড়া 'কিরা' প্রকাশিত হয়- 'ছত্রাক'-তৃতীয়বর্ষ-প্রথম সংখ্যাতে, 'নাগর' প্রকাশিত হয়—'ছত্রাক'— ৭ম বর্ষ — ১৩৮৩- শারদীয়া সংখ্যা- ১ম সংখ্যাতে, 'গাছতল' প্রকাশিত হয়—'ছত্রাক' — ৬ষ্ঠ বর্ষ- ২য়/ ৩য় সংখ্যা-টুসু ও নববর্ষ সংখ্যাতে, 'অগ্নিগর্ভ' প্রকাশিত হয়—'ছত্রাক'- অষ্ঠবিংশতিবর্ষ- ৩য় সংখ্যা-বৈশাখ ১৪০৫ সালে। এছাড়াও মানভূমের মানুষজন, পরিবেশের কথা সম্বন্বিত রচনা 'ডাঙাডহরের পদাবলী'ও 'ছত্রাক'-এ প্রকাশিত হয়। মানভুম সংস্কৃতি শিল্পকলার ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ।

পরবর্তী প্রসঙ্গ একটু অন্যরকম, মানভূমের ভিন্নতর দিক উন্মোচিত হয়েছে এখানে। কোনো অঞ্চলের জনমানসের সন্ধান নিতে গেলে সেই অঞ্চলের প্রচলিত প্রবাদবাক্য গুলির সঙ্গে পরিচয় আবশ্যিক। কেন না, ঐ সব প্রবাদবাক্যের মধ্যে আঞ্চলিক লোকচরিত্র, জীবনধারা, পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গির বহু তথ্য নিহিত থাকে। প্রবাদ আসলে লোক-জীবনদর্শন তথা দর্পণ। এর ব্যবহার বিশেষ সীমানায় সীমায়িত হলেও স-বিশেষ ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধর্মী, সুদূরপ্রসারী, শ্লেষবান-সন্ধানমূলক।

গঠনগত ও ভাবের দিক থেকে বাংলা ও বিহারের পার্শবর্তী অঞ্চলের (বিশেষ করে রাঁচির পাঁচপরগনিয়া ও বাঁকুড়া) প্রবাদবাক্য গুলির সঙ্গে মানভূমের (১৯৫৬ সালের আগের) প্রবাদগুলির সাদৃশ্য বা মিল সহজেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন—বাংলা ভাষা থেকে নেওয়া- 'যার শিল যার নডহা,তারই ভাঙি দাঁতের গড়া'। এখানে শুধুমাত্র আঞ্চলিক টান





এসেছে। 'হাগন্তির লাজ নাই ত দেখন্তির কিসের লাজ', 'যার গহনা তাকেই সাজে অপর লককে ঠডকা বাজে' ইত্যাদি। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবাদের বিশ্লেষণ রূপ তুলে দেওয়া হল-

১। 'জরু—গরু-ধান তিন থাকতে বিদ্যবান' —

প্রবাদটি একপদা। দ্বিতীয় পদটি উহ্য আছে। অনুক্ত পদের অর্থ 'মানুষের কোনো দুঃখ-কষ্ট হয় না'। সমস্ত পদের অর্থ হল, -'জরু' অর্থাৎ পত্নী (মানব অর্জিত আদিম অথচ প্রধান নিজ অধিকৃত সম্পদ), 'গরু' অর্থাৎ গো সম্পদ (গরুকে সম্পদ রূপে গণ্য করা হত, কৃষিক্ষেত্রে একমাত্র গো-ধনই ছিল মূলধন) এবং ধান্য সম্পদ যে ব্যক্তির কাছে আছে, তার সংসার জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দের হয়ে থাকে। প্রবাদটি উপদেশরূপে সন্তান-সন্ততিদের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

২। 'জলে হাগলেই উফলে' —

প্রবাদটির মূল কথা হল মানুষ ক্লেশদায়ক অসামাজিক, অপকর্ম যত গোপনেই সংগঠিত হোক না কেন তা প্রকাশিত হবেই। জল স্নানার্থে, পানার্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ যদি জল দূষিত করার অভিপ্রায়ে জলের ভিতরে গোপনে মলত্যাগ করে, তবে সেই মল সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে ওঠে জলের উপরিভাগে এবং সকলেই তা দেখে ফেলে। সুতরাং মলত্যাগের গোপনীয়তা নষ্ট হয়। সামাজিক অপকর্ম যাতে অতি গোপনে কেউ না করে সেই জন্য উক্ত প্রবাদ দ্বারা ইঙ্গিতে দুষ্কৃতকারীকে সাবধান করা হয়।

৩। 'জলহা আঢ়ায় জলহিনকে, জলহিন আঢ়ায় বৌঠানকে' —

'জলহা' মুসলমান তন্তুবায় পুরুষ মানুষ। জলহিন তার স্ত্রীকে বোঝায়। এখানে এদের মতো সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ যারা কর্মঠ নয়, অলস প্রকৃতির। জলহা তার স্ত্রীকে কোনো কাজের জন্য আদেশ বা নির্দেশ দিলে, জলহিন তার নিজের বৌমাকে সেই কাজ করতে বলেন। কর্মবিমুখ মানুষের মতো অলস হবেন না। সেই অর্থে এই প্রবাদের অবতরণা।

৪। 'কুলের কইনা চেপটিও ভালো'—

কনে নির্বাচন করার সময় স্বজাতীয় সদ্বংশের মেয়ে পছন্দ করাই ভালো। চেহারার সামান্য খুঁৎ থাকলেও, নাক কিছুটা বসা হলেও ক্ষতি হয় না। যার সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে হবে তার সঙ্গে রীতিনীতির ও স্বভাবের মিল থাকাই শ্রেয়। দেহ-সৌষ্ঠবের আকর্ষণ বিকর্ষণ দুদিনেই কেটে যায়। এই প্রবাদে সামাজিক নীতি শিক্ষার কথা উঠে এসেছে।

৫। 'কোথাকার কে
গোটা দুই আমড়া ভাতে দে'—

আলাপ-পরিচয়হীন এমন লোককে খাতির করার প্রয়োজনও নেই। দুটো আমড়া ভাতে দিয়ে ভাতের থালা ধরে দিলেই যথেষ্ট। এই প্রবাদে নীতিশিক্ষার চেষ্টা করা হয়নি। প্রাত্যহিক জীবনের (গৃহস্থ) একটি ছবি আঁকা হয়েছে।

৬। 'খড়া বিড়ালের আরশোলা পথ্যি'—

অক্ষমকে অবস্থার দাস হয়ে চলতে হয়। খোঁড়া হয়ে বিড়াল যখন মুখরোচক খাবার জোগাড় করতে পারে না, তখন যা পায় তাই খায়। এমনকি আরশোলা ধরেই তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। প্রবাদটির শব্দচয়ন, রূপকল্প, বাক্যগঠন লক্ষণীয়। যুক্তি, উপদেশ, ভাষা বিন্যাসের কোন প্রয়াসই নেই এতে। চারটি আটপৌরে শব্দের মধ্যে অভিজ্ঞতা এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে অন্তর্নিহিত নীতিশিক্ষাটি আর আলাদা ভাবে বলতে হয়নি।

৭। 'গাঁ বড় তার উপর কুলহি'—

এই প্রবাদটি ব্যাঙ্গার্থকমূলক। উপর কুলহি, নামো কুলহি ইত্যাদি রাস্তার নামকরণ শুনলে স্বভাবতই মনে হয় গ্রামটি বর্ধিষ্ণু এবং ব্যাপক। ক্ষুদ্রত্ব গোপন করার জন্য অনেক সময় ঢক্কানিনাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রবাদটি বাংলা প্রবাদবাক্য,—'বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর' এর সঙ্গে তুলনীয়।

৮। 'গাঁয়ের ক'না সিঘাননাকী'—

পরিচিত ও সহজলভ্য ব্যক্তি বা বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। এই জন্য বিবাহের অভিপ্রায়ে পাত্রীর গুনাগুন বিচার করতে বসলেই পরিচিতা গ্রামকন্যাকে কুৎসিত বলে মনে করে। এখানে 'সিঘান' কথার অর্থ সিকনী। এই প্রবাদটি বাংলা প্রবাদবাক্য 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' এর সঙ্গে তুলনীয়।

আলোচিত এই রকম প্রবাদ আরও রয়েছে। সেই গুলোকে কখনো পারিবারিক প্রবাদ, কখনো সামাজিক প্রবাদ, মনুষ্যেতর প্রাণী বিষয়ক প্রবাদ, স্থানবাচক প্রবাদ, জাতিবাচক প্রবাদ নানান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সেগুলোর কিছু কিছু তুলে দেওয়া হল। যেমন- 'ঘরেও ভাত নাই মায়েও মারেছে', 'ঘরে নাই খরচি জনার খায়ে মরছি', 'বৃন্দাবনে সবাই সতী নাম কিনেছে রাই', 'কামারিনের ছ্যেলা হল, কুমহারিন ডাল ভাত খাল্য', 'বড় বড় বাঁদরের বড় বড় লেজ', 'হরিণের শিং-হে মাছি বসে নাই', 'চাষা চিনহায় আইড়ে, তাঁতি চিনহায় পাইড়ে', 'মুখে পান হাতে চুন, তবে জানবে মানভুম' ইত্যাদি।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ছত্রাক'—এ নানান প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, সকল প্রসঙ্গ এই আলোচনায় তুলে ধরা অসম্ভব। যতটা এখানে বিশ্লেষণ করা হল তা অল্পেরও অল্প অংশ বলে মনে করি। 'মানভুম সংস্কৃতির মুখপত্র' হিসেবে 'ছত্রাক' ও সুবোধ বসু রায় যে অবদান মানভূমি লোক-চর্চার অন্দরে তুলে ধরেছেন তা অনস্বীকার্য, অতুলনীয়।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

**তথ্যসূত্র :**


১) বসু রায়, সুবোধ- 'ছত্রাক' পত্রিকা, দ্বাদশবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৮।

২) তদেব, পৃ. ২।

৩) তদেব, পৃ.২।

৪) তদেব, পৃ.২।

৫) তদেব, পৃ.৩।

৬) তদেব, পৃ.৪।

৭) তদেব, পৃ.৪।

৮) তদেব, পৃ.৫।

৯) তদেব, পৃ.৫।

১০) সুবোধ বসু রায়, —'ছত্রাক' পত্রিকা, একাদশবর্ষ, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৭। প্রবন্ধ- 'গাঁয়ের পরব'-শ্রী সৃষ্টিধর মাহাত। পৃ. ৯-১১।

১১) সুবোধ বসু রায়, —'ছত্রাক' পত্রিকা, দশমবর্ষ, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা , ১৩৮৬। প্রবন্ধ- 'বসন্তের বাহা পরব' — বিশাখা মাঝি। পৃ. ৮৩-৯২।

১২) সুবোধ বসু রায়, — 'ছত্রাক' পত্রিকা, দশমবর্ষ, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৬। প্রবন্ধ- 'চাকলতোড়েরমেলা' — সিরাজুল হক। পৃ. ২৪-৩১।

১৩) ক) দিলীপ কুমার গোস্বামী, —'মানভুমের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার' বজ্রভূমি প্রকাশনী, বিদ্যাসাগর পল্লী, পুরুলিয়া। গ্রন্থাকারে প্রকাশ- ২-১-২০১৯।

খ) সুবোধ বসু রায়, —'ছত্রাক' পত্রিকা, দ্বিতীয়বর্ষ —প্রথম সংখ্যা, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭১-১৪০৫।

১৪) ক) সুবোধ বসু রায়, —'ছত্রাক' পত্রিকা, দ্বিতীয়বর্ষ, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা, প্রথম সংখ্যা, ১৯৭১।

খ) সুবোধ বসু রায়, — 'ছত্রাক' পত্রিকা, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮২।

গ) সুবোধ বসু রায়, — 'ছত্রাক' পত্রিকা, তৃতীয়বর্ষ, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা,প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৯।

ঘ) সুবোধ বসু রায়, — 'ছত্রাক' পত্রিকা, চতুর্থবর্ষ, প্রকাশ- শারদীয়া সংখ্যা, প্রথম সংখ্যা, ১৩৮০।

১৫) মিতা ঘোষ বক্সি, — 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি', অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ২০১০।

# হংসেশ্বরী মন্দির পরিকল্পনার অন্তরালে সাধন তত্ত্বের ইঙ্গিত

**বেবী পাত্র (সামন্ত)**

ধরণীর উত্থিত কোলাহলে মুখরিত বিশ্ব জগৎ অথচ সেই কোলাহলের মাঝেও মৌন হয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে লাজুক নববধূর মতো বসে আছেন হংসেশ্বরী। হুগলি জেলার উত্তরে অবস্থিত বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত মন্দির হংসেশ্বরী মন্দির। নানাবিধ আকর্ষণে আমি, তুমি সংসার সাগরে একাকার হয়ে বিরাজ করে। সংসারের ঘূর্ণাবর্তের চক্রে চলে জীবনের ঘূর্ণন। কখনো আস্তিক কিংবা নাস্তিক সকলেই মহামিলনের পথেই সামিল হওয়ার জন্য এগিয়ে যায় শুধু রেখে যায় ভিন্ন জীবন দর্শন। বিশ্বাস, অবিশ্বাস ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। নিজস্ব চিন্তাধারার স্বাধীন বিকাশ ঘটানো ব্যক্তির এক্তিয়ার। আমরা জন্মলগ্ন থেকেই বোদ্ধা হয়ে জন্মাই না। পারিপার্শিক বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমরা বড় হই। হংসেশ্বরী মন্দির আমাদের প্রজ্ঞাকে নতুন রূপ দান করে। চিরাচরিত বাংলার মন্দিরের আদলের পরিবর্তে এই মন্দিরটি একেবারে ভিন্নধর্মী মন্দির। যার গঠনে রয়েছে গূঢ় সাধনতত্ত্বের ইঙ্গিত। মন্দির গঠন পরিকল্পনায় এই ইঙ্গিত ধরা পড়েছে।

হংসেশ্বরী মন্দির শুধু পূর্ব-রাঢ় বাংলার নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরগুলির মধ্যে একটি অন্যতম বিখ্যাত মন্দির। মন্দিরের প্রকরণ স্বতন্ত্র। বাংলার মন্দির চর্চার ইতিহাসে এই ধরনের মন্দির আর কোথাও নেই। পূর্ব-রাঢ় বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গের মন্দির স্থাপত্যের যে বিশিষ্ট নির্মাণ পদ্ধতি এতকাল প্রচলিত সেদিক থেকে হংসেশ্বরী মন্দিরের গঠন একেবারে স্বতন্ত্র। এই মন্দিরের গঠন পরিকল্পনার মধ্যে সাধনতত্ত্বের গূঢ় রহস্য জড়িয়ে আছে। বাংলার মন্দির পরিকল্পনায় চালা রীতি, রত্ন রীতিরই প্রচলন আছে, কিন্তু এই মন্দিরের মধ্যে সেইসব বৈশিষ্ট্য থেকে একেবারে ভিন্নধর্মী। এই মন্দিরের মতো বিচিত্র গঠন ও সাধন তাৎপর্যের অনুরূপ কোনো মন্দির আর কোথাও নেই। সাধন তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই অভিনব মন্দিরটির নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়েছিলেন মাহারাজ নৃসিংহদেব। নৃসিংহদেবের এই অভিনব মন্দির তৈরির পরিকল্পনার পিছনে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। নৃসিংহদেবের মায়ের মৃত্যু হলে সাংসারিক বন্ধন ছিঁড়ে মুক্তির পথে পা বাড়ালেন। নির্ভরযোগ্য কর্মচারীদের হাতে রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করে কয়েকজন সঙ্গী সাথীকে নিয়ে কশীর উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়লেন। কাশীতে পৌঁছে নৃসিংহদেব পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন। যেন এতদিনের সব হারানো ধন তিনি খুঁজে পেলেন। মনের মধ্যে অপার প্রশান্তি। সংসারের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত। জাগতিক বন্ধন তিনি ছিঁড়ে ভাবের আকাশে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সংসারের কোনো শৃঙ্খল তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। সবকিছুর মধ্যেই তিনি মুক্তি খুঁজে পেলেন। মানুষের মৃত্যু জাগতিক নিয়মেই হবে। বিশ্ব চরাচরে পঞ্চভূতে সকলেই লীন হয়ে যাবে। মায়ের মৃত্যু তাঁর জীবনের অনেক পরিবর্তন ঘটায়।





মানুষের দেহ চিতার আগুনে ছাই হয়ে মিশে যায়। তাঁর মনে জাগে

"ন জয়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন—
নায়াং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

(ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। আত্মা কারান্তর হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় নাই। আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরানো। শরীর নিহত হইলেও তাহার নাশ হয় না।)

কাশীতে তিনি জীবনের প্রকৃত রহস্যের সারতত্ত্ব উদ্ঘাটনে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এইভাবেই কেটে গেল তিনটি বছর। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে তিনি দর্শন পেলেন এক অপরূপ রূপ ধারী দেবীর। আদ্যাশক্তি কালী তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন হংসেশ্বরী রূপে। সহস্রদল পদ্মের ওপরে অষ্টদল পদ্ম, তার উপরে শায়িত শবরূপ মহাদেবের হৃদয় থেকে উত্থিত পদ্মের ওপরে বাম পা ভাঁজ করে বসে আছেন এক অপূর্ব দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। দেবী নীলবর্ণা, চতুর্ভুজা, বাম হাতের ওপরে আছে খড়গ, নিচের হাতে নরমুণ্ড এবং ডান হাতের ওপরের হাত বরাভয় রূপে জগত সংসারকে অভয় দিচ্ছেন আর নিচের হাতে সিদ্ধি। দেবী ত্রিনয়নী। নৃসিংহদেব ধ্যানযোগে সেই অপরূপ মূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন আর আদেশ পেলেন তিনি ষটচক্রভেদ প্রণালী অনুসারে যেন মন্দির করেন। আদেশ পেয়ে কাল বিলম্ব করলেন না। অবশেষে কাল বিলম্ব না করে তিনি বংশবাটিতে এসে পৌঁছান ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে। মন্দির নির্মাণের পাথর ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেইসঙ্গে দক্ষ কারিগরদের নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন বংশবাটিতে। নির্দেশানুসারে কাশী থেকে বড় একটি নিমকাঠও আনা হয় দেবীর মূর্তি তৈরির জন্য।

রাজার ইচ্ছায় হংসেশ্বরী মন্দিরের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করা হয় ১৮০১ সালে। দ্রুতগতিতে মন্দিরের কাজ চলতে লাগল। নিখুঁত জ্যামিতির নক্সা অনুসারে মন্দিরের কাজ চলতে থাকল। জ্যামিতির নক্সার কাজের ওপরে ফুল, লতা, পাতা খোদাই করা হল। নাটমন্দিরের পাথরের কাজ নৃসিংহদেবের তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত হল। নৃসিংহদেব পরলোকগমন করলেন ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়া স্ত্রী শঙ্করী মন্দিরের অবশিষ্ট কাজগুলি নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ করেন। গর্ভগৃহটি কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। সহস্রদল পদ্মের ওপরে কালীযন্ত্র নির্মাণ করা হয়। সহস্রদল পদ্মের ওপরে শায়িত।

অবশেষে এল সেই মহেন্দ্রক্ষণ। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন অর্থাৎ ১২২১ বঙ্গাব্দের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিনে হংসেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হল। বহু জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তি, সঙ্গে রাজ পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন এই মাহেন্দ্রক্ষণে। রাজার স্বপ্নে দেখা দেবী রূপের লৌকিক

রূপ হংসেশ্বরী রূপে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে একটি প্রতিষ্ঠাফলকে মন্দিরের কাল জ্ঞাপক একটি শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ :

"শাকাব্দে রস বহ্নি মৈত্র গণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার চতুর্দশেশ্বর সমং হংসেশ্বরী রাজিতং।।
ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে।। শকাব্দ ১৭৩৬
(রস = ৬, বহ্নি = ৩, মৈত্র =১৭)
বামাগতি সূত্র অনুযায়ী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ।

মন্দিরের গর্ভগৃহের বাইরে একটি অষ্টভুজা দুর্গা আছে। যেটি পাশের পুকুর থেকে পাওয়া গিয়েছিল। এই মূর্তিটি রাজা নৃসিংহদেব ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে একটি মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে মন্দিরটি ভেঙে গেলেও নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য নতুন করে আর মন্দির সংস্কার করা সম্ভবপর হয়নি।

বর্তমানে তাই ওই মন্দিরের মহিষামর্দিনীর মূর্তিটি এই মন্দিরেই এনে রাখা হয়েছে। বর্তমানে এখানেই পূজা করা হয়। দেবীর নিত্যপূজা হয় এছাড়াও সন্ধ্যারতিও হয়। দুপুরে অন্নভোগেরও ব্যবস্থা আছে। স্নানযাত্রাতে দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা করা হয়। এই দিন দেবীর নৈবেদ্যে আমিষ দেওয়া হয়। বলিপ্রথা এই মন্দিরে এখনো প্রচলিত আছে। বছরে চারবার বলি দেওয়া হয়। স্নানযাত্রায় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে, দুর্গা পূজার সন্ধিতে বলি দেওয়া হয় এছাড়াও শ্যামা পূজায় দু'বার বলি দেওয়া হয়। সকালের বলি দেওয়া মাংসকে মহাপ্রসাদ বলা হয় আর এই মহাপ্রসাদ দেবীকে নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হয়। শ্যামা পূজার দিনই সন্ধ্যায় বলি দেওয়া হয়। যদিও বলিপ্রথার ঘোর বিরোধী অনেকেই তবুও এই প্রথা এখনো চলে আসছে।

হংসেশ্বরী আসলে কালীর শান্ত, সৌম্য রূপ। এই রূপেই দেবী এখানে বিরাজ করেন। কেবলমাত্র শ্যামাপূজার রাতে সন্ধ্যারতির পর দেবীর শান্ত, স্নিগ্ধ রূপের পরিবর্তে দেবীর রুদ্র রূপ ধারন করানো হয়। শ্যামা পূজার সন্ধ্যারতির পর দেবীর বসন খুলে রাজবেশ পরানো হয়। দেবীর পরিধানে কোনো বস্ত্র থাকে না। গলায় ফুলের মালা আর বহুবিধ স্বর্ণ অলংকারে দেবীকে সাজানো হয়। সোনার জিহ্বা পরানো হয়। দেবীর করাল বদনা, এলায়িত কেশে সাজানো হয়। আবার ভোরের আলোর ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দেবী রুদ্র রূপ পরিত্যাগ করে শান্ত, সৌম্য মূর্তিতে ফিরে আসেন জগত জননী হিসাবে। দেবীর যে রূপে বিরাজ করছেন পুনরায় সেই রূপ ধারন করেন।

এই মন্দিরের চারপাশে গোলকধাঁধার মত অবস্থান করছে বারোটি শিবলিঙ্গ। দোতলায় আছে একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ।এই মন্দিরের দেবী নিজের ইচ্ছায় এইরূপে প্রকটিত হয়েছেন।





দেবীর যে রূপের সঙ্গে সচরাচর আমরা পরিচিত সেই রূপের সঙ্গে হংসেশ্বরী রূপের মিলের থেকে অমিলই বেশি। দেবীর রূপকল্পনার ভাবনায় অভিনবত্বের ছোঁয়া আছে। দেবীকে দর্শন মাত্রই মনের মধ্যে আমাদের মনে হবে দেবীর এ কোন রূপ আমরা দেখছি! এক অভিনব কালী মূর্তি অভয়দাত্রী হিসাবে বিরাজ করছেন। নৃসিংহদেবের স্বপ্ন দেখা মূর্তির মতই। দেবীর বেদীটি পঞ্চমুণ্ডির আসনে নির্মিত। বেদীতে প্রথমে সহস্র পদ্ম আছ, তারপরে গোলাপী পদ্ম অষ্টদলের। ত্রিকোণ বেদীর ওপরে মহাকাল শায়িত। মহাকালের হৃদয় থেকে একটি পদ্মের বৃন্ত বেরিয়ে ওপরের দিকে ওঠে গেছে সেই প্রস্ফুটিত দ্বাদশ পদ্মের ওপরে দেবী বাম পাটি সিংহাসনের মতো উপবেশন করে আছেন এবং ডান পাটি মহাকালের দেহের ওপরে। বেদী এবং মহাকাল এই দু'টিই পাথরের। নিমকাঠের হংসেশ্বরীর মূর্তিটি বারো বছর অন্তর রঙ করা হয়। দেবীর গায়ের রঙ নীল বর্ণের। দেবী যে শতদলের ওপরে উপবেশন এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যের অবতারনা করছি। ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত মনে করা হত পদ্মের বৃন্তটি মহাকালের নাভি থেকে উত্থিত হয়ে আছে, আসলে তা নয় এটা উত্থিত হয়ে হৃদয় থেকে। হংসেশ্বরী দক্ষিণাকালীরই রূপ তাই এই দেবীর পূজা হয় দক্ষিণাকালীর ধ্যানমন্ত্রে। হংসেশ্বরী সাগর তরঙ্গের মত বিরাজ করছেন আর মহাকাল শিব হলেন পরম ব্রহ্ম মাঝ সমুদ্রের মত শান্ত। উপনিষদ এ 'হংস' শব্দের অর্থ সূর্য বা জ্ঞান। সুতরাং যিনি জ্ঞানস্বরূপা তিনিই হংসেশ্বরী। এই জ্ঞান কোনো বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বিষয়বস্তুর উর্ধে নিরপেক্ষ জ্ঞান। ঋক বেদে 'হংস' শব্দটি তাত্ত্বিক পূর্ণ। এটিই মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রের বিষয়ে শৈবাগমে শিব পার্বতীকে বলেছেন—

"হ কারেণ বহির্য্যাতি স কারণ বিশেষ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে বলা যায়- জগতের সকল প্রাণীই হ-কার উচ্চারণ করতে করতে বাইরে বেরোয় এবং 'স' কার উচ্চারণ করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করছে। মহাবিশ্বের সকল জীবই এই হংসমন্ত্র যপ করে চলেছে নিজেদের অজান্তেই। যার বহিঃ প্রকাশ শ্বাস- প্রশ্বাস। মন্দিরের গঠনগত দিকের মধ্যে সাধন তত্ত্বের ইংগিতও মেলে। আমাদের দেহের বামদিকে আছে ইড়া নামক নাড়ী এবং ডানদিকে থাকে পিঙ্গলা। দু'টি নাড়ীর মাঝে আছে সুষুম্না। সুষুম্না অতি সূক্ষ্মভাবে মাথায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। আমাদের দেহের নানা চেতনা ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অবশেষে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে মহা নির্বাণ লাভ করে আমাদের চৈতন্যের উদ্রেগ হয়। তন্ত্রের নিবৃত্তি মার্গের সাধনাকে বলা হয় 'ষটচক্রভেদ' সাধনা। এই মত অনুয়ায়ী আমাদের দেহকে ছটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক, একটি ভাগের এক, একটি চক্র। কুণ্ডলিনী শক্তিই জীবাত্মার প্রাণ। গুরুর সাহচর্যেই দ্বারা এই শক্তি জাগ্রত হলেই জীবের উচ্চগতি লাভ হয়।

হংসেশ্বরীর মন্দিরটি প্রায় সত্তর ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। মন্দিরের গঠন শৈলীতে অভিনবত্বের

ছাপ রয়েছে। মন্দিরটি অসাধারণ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত। মন্দিরটি হংসতত্ত্বের ভাবনাকে কেন্দ্র করে গঠিত। সাধনতন্ত্র হংসতত্ত্বের সরলীকৃত রূপ। হংস যুগে হংসতত্ত্বের বিশাল ব্যাপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালে হংসতত্ত্বের বিশাল ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় অংশ ছাকনির ন্যায় ছেঁকে তন্ত্রবিদ্যার সৃষ্টি। যতটুকু গ্রহণ করবে ততটুকুই ফল লাভ করবে তন্ত্রবিদ্যার মূল ভাবনার মধ্যে নিহিত। বর্তমান তন্ত্র সাধনার অপর নাম নিবৃত্তি মার্গ। নিবৃত্তি মার্গের সাধনাকে বলা হয় 'ষটচক্রভেদ' সাধনা। তন্ত্র সাধনামতে মানবদেহের ছয়টি ভাগ এক, একটি ভাগকে 'চক্র' বলা হয়। প্রতিটি চক্রের আলাদা নাম যার বহিঃপ্রকাশ পদ্মের মাধ্যমে হয়। পর্যায়ক্রমে চক্রগুলির নাম হল—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা। মুক্ত অঙ্গনের নাম সহস্রার। এইসব চক্রগুলির অবস্থান সম্পর্কে তপন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জগজ্জনী হংসেশ্বরী' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—

"মূলাধার- মানবদেহের গুহ্যদেশ এবং লিঙ্গ বা যোনিমূলের ঠিক মধ্যবর্তী অংশে মূলাধার পদ্ম অবস্থিত।

স্বাধিষ্ঠান- লিঙ্গমূল বা যোনিমূলে এই পদ্মের অবস্থান।

মণিপুর- আমাদের নাভিদেশে মণিপুর পদ্মের অবস্থান।

অনাহত- চতুর্থ পদ্ম অনাহতের অবস্থান হৃদয়ে।

বিশুদ্ধ- আমাদের কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ পদ্ম অবস্থিত।

আজ্ঞা- আজ্ঞা পদ্মের অবস্থান আমাদের ভ্রু দুটির ঠিক মাঝখানে

সহস্রার- সহস্রার বা শতদল পদ্মের অবস্থান মস্তিষ্কে। যাকে বলা হয় চিদাকাশ বা চিদসমুদ্র। ব্রহ্মময় পরিবেশ।"(১)

আমাদের দেহকে সুস্থ, সচল রাখতে সারা দেহে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রায় তিন লক্ষ নাড়ী। এই নাড়ীগুলির মধ্যে চৌদ্দটি প্রধান নাড়ী। নাড়ীর মধ্যে- ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাণী এবং চিত্রাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। সুষুম্না নাড়ী মূলাধার থেকে উৎপন্ন হয়ে ডিম্বাকৃতি নাভিচক্রের মাঝখান দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

তেরোটি পদ্মফুলের শঙ্কু আকৃতির শিখর আছে এই ধরনের মন্দির প্রকরণ মন্দিরটির শিল্প প্রকরণ দিকের অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের ছয়টি তল আছে। তিনতলায় বারান্দায় কোণে আটটি পদ্ম আকৃতির শিখর আছে, পাঁচ তলার ওপরে চারটি এবং কেন্দ্র অর্থাৎ ছয় তলায় একটি পদ্মের শিখর আছে। সর্বশেষ পদ্মটি অন্যান্য পদ্মের তুলনায় বড় এর ওপরে আছে একটি চক্র এবং চক্রের ওপরে আছে ত্রিশূল। পদ্মের আকৃতি শঙ্কু অর্থাৎ কুঁড়ি আকারে। মন্দিরের গঠন প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্মময় দিকের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই মন্দিরের গঠন প্রণালীর মধ্যে মানব দেহের ষটচক্রের নিয়ম অনুসৃত। মন্দির প্রকরণের মধ্যে রয়েছে গূঢ় রহস্য। গর্ভ গৃহ থেকে প্রতিটি শিখরের সঙ্গে সংযোগপথ রয়েছে। সিঁড়ির



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

পথের সংযোগকে অবলম্বন করেই গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। এই গোলকধাঁধায় ঢুকে বেরনোর পথ সহজে পাওয়া যায় না। এর নিহিতার্থ অর্থ গুরুর সাহায্য ছাড়া ষটচক্র ভেদ করা সম্ভব নয়। কুণ্ডলিনী শক্তির প্রকাশ হংসেশ্বরী।

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হলে যেমন মহানির্বাণ লাভ করা যায় না। তেমনি চৈতন্য লাভ করতে গেলে আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্রেগ ঘটাতে হয়, কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্রেগ হলেই ঊর্দগামী হয়ে ধীরে, ধীরে ওপরে অনাবিল আনন্দের সুখানুভূতি লাভ করে আর তারপর মস্তকে উপনীত হলে মহানির্বাণ লাভ করে। হংসেশ্বরী মন্দিরে সাধনতত্ত্বের সেই রূপই মন্দিরের গঠনের মধ্যে নিহিত।

**তথ্যসূত্র :**

(১) তপন চট্টোপাধ্যায়, 'জগজ্জনী হংসেশ্বরী' সবিতা প্রকাশনী, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি, পঞ্চম সংস্করণ, ২৩ শে কার্তিক, ১৪২২, পৃ.- ১২৫

# বাংলার লোকায়ত জীবন ও ময়মনসিংহ গীতিকা

পরাশর গঙ্গোপাধ্যায়

লোক সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। লোকসাহিত্য লোকের সাহিত্য, লোক জীবনে বসবাসকারী রচয়িতা লোকজীবন স্পর্শী নানা ঘটনার মালা গেঁথেছেন পালা গুলোর মধ্যে। লোক সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে একটি হল "গীতিকা"। অনেকে ইংরেজি "ব্যালাড" শব্দের সঙ্গে গীতিকাকে সমার্থক করলেও গীতিকা আর ব্যালাড কিন্তু এক নয়। কারণ বাংলাদেশে যে গীতিকার প্রচলন রয়েছে নৃত্যের সঙ্গে তা সম্পর্কিত নয়। গীতিকা বিষয়বস্তুর দিক থেকে বহুমাত্রিক আবার আঙ্গিকের দিক থেকেও বহুমাত্রিক। সুরের দ্বারাই গীতিকা সমৃদ্ধ। গীতিকা কাহিনী প্রধান। গীতিকার গায়ক গায়েন নামে পরিচিত। মধ্যযুগীয় যাত্রা বা পালাগান রচয়িতা লোক কবিগনই গীতিকার পদকর্তা হিসেবে পরিগণিত। গীতিকা সৃষ্টি হয়েছিল প্রকৃতির স্বাভাবিক ঐশ্বর্যে।

**গীতিকার বৈশিষ্ট্য :**

১: কোন কাহিনী বা ঘটনা লোক ঐতিহ্যে পড়ে বিভিন্ন পাঠভেদের মাধ্যমে লোক গীতিকার সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ের প্রচেষ্টাতেই গীতিকার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে কাজ করেছিল একটা সামাজিক প্রেরণা।

২: বাংলা গীতিকায় প্রেমতত্ত্বের সরলতা -জটিলতার দিকই প্রস্ফুটিত হয়েছে। এছাড়া মধ্যযুগীয় মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস, সমস্তই স্থান পেয়েছে এখানে। এককথায় গীতিকা তাই হয়ে উঠেছে গ্রামীণ সমাজের ঘরের কথা।

৩: লোক জীবন কেন্দ্রিক একটি কাহিনী বা গল্প গীতিকার উপজীব্য। এতে কোন উপকাহিনী বা "সাবপ্লট" থাকে না। একমুখীণতাই এই গল্পের বৈশিষ্ট্য। সংগীতের মাধ্যমে এটি পরিবেশিত হয়।

৪: গীতিকায় নাটকীয়তা বর্তমান। নাটকীয় সংলাপের আকারেই চরিত্রগুলি কাহিনীকে পরিবেশন করে থাকে। সেই সংলাপের মাধ্যমে নীতি বা উপদেশের পরিবর্তে সরল একমুখী কাহিনী পরিবেশিত হয়।

৫: গীতিকায় নিতান্তই কথিত বা লোক ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর বর্ণনাভঙ্গিও লৌকিক—

'ভিনদেশী পুরুষ দেখি চান্দেরবরণ।।
লাজ রক্ত হইল কন্যা পরথম যৈবন।।'





৬: বন্দনার মাধ্যমে গীতিকার সূচনা হয়। এই বন্দনা দেবদেবীর পাশাপাশি পিতা-মাতা, ওস্তাদ, এমন কি তরুলতার ও হয়ে থাকে। বন্দনা অংশে বহুমাত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়।

৭: ছন্দের বহুমাত্রিকতা এতে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ এতে প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন—

'বাপের আগে। কইও ঘোড়া। কইও মায়ের। আগে। (4+4+4+2)
তোমার কন্যা। মহুয়ারে। খাইছে জংলার। বাঘে।' (4+4+4+2)

৮: ছন্দের ন্যায় অলংকার প্রয়োগেও কবিগণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যেমনঃ
'শুকাইয়া গেছে তার যৌবন কমল।' (কমলা)(রূপক অলংকার)

৯: প্রথম শ্রেণীর শ্লীল লোকসাহিত্য হিসাবে গীতিকা পরিগণিত। কোন অবস্থাতেই এখানে সূলতা বা অশ্লীলতা স্থান পায়নি। মহুয়া পালায় যেমন দেহভোগের ব্যাপার নেই, তেমনি মলুয়া পালাতেও শিল্পসম্মতভাবে উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে দৈহিক ক্ষুধার নিদর্শন ঘটেছে নিরসন ঘটেছে, আবার চন্দ্রাবতী পালাতেও শ্লীলতা বজায় রেখেছেন কবি।

১০: এটি স্মৃতি ও শ্রুতি ধর্মী।পাঠান্তর এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়। যেমনঃ "চোরের ধন কাইড়া লইলে নাইসে বড়ো দায়।"

পাঠান্তর: চোরের ধন চুরি করলে নাই সে বড়ো দায়। (রতন ঠাকুরের পালা)

**গীতিকার ভাগ :**

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা গীতিকাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। ক) নাথ গীতিকা, খ) পূর্ববঙ্গ গীতিকা, গ) ময়মনসিংহ গীতিকা।

**ক) নাথগীতিকা :** মূলত উত্তরবঙ্গ থেকে বিহার সহ উত্তর ভারতে প্রচলিত। নাথ সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই গীতিকার জন্ম হয়েছিল। নাথ ধর্ম সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ভিত্তিক রচনা এই গীতিকাগুলি। এর দুটি ভাগ ঃ ১) নাথ গুরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনী যা গোরক্ষ বিজয় বা মীনচেতন নামে পরিচিত। ২) রাজকুমার গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস নেবার কাহিনী। গোপিচাঁদের পাঁচালী, গোপিচাঁদের সন্ন্যাস, গোবিন্দ চন্দ্রের গীত, ময়নামতির গান প্রভৃতি নামে দ্বিতীয় ভাগটি পরিচিত।

**খ) পূর্ববঙ্গ গীতিকা:** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাহকেরা ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট থেকে অনেক গান সংগ্রহ করেন। আশুতোষ চৌধুরী' নিজাম ডাকাতের পালা ','কফিনচোরা', 'ভেলুয়া', 'হাতিখেদা', 'কমল- সদাগর' ও 'সুজা -তনয়ার বিলাপ' সংগ্রহ করেন। বিহারীলাল রায় 'মানিকতারা' বা 'ডাকাইতের পালা', 'বারতীর্থের ডাক' সংগ্রহ করেন। নগেন্দ্র চন্দ্র দে 'মাঞ্জুর মা', 'রাজা রঘুরপালা', 'বীর নারানের পালা' সংগ্রহ

করেন। সেগুলির সঙ্গে আরো পালা সংগ্রহ করে তিনটি খন্ডে প্রকাশিত হয়। এদের নাম দেওয়া হয় পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

**গ) ময়মনসিংহ গীতিকা :** ময়মনসিংহ গীতিকায় ঐ অঞ্চলের মোট ১০ টি পালা সংযোজিত হয়েছে। পালাগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন চন্দ্রকুমার দে। পালা সংগ্রাহক হিসাবে তার অবদান অনস্বীকার্য। এ ছাড়া ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক নিজ প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক পালা সংগ্রহ করেন এবং ১৯৭০ও ১৯৭৫ সালে মোট সাত খন্ডে সেগুলি প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' থেকে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে উক্ত লেখকের সম্পাদিত গীতিকায়। তবে পালাগুলো প্রথম প্রকাশ করে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এ প্রসঙ্গে ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, 'তবে এ কথা নিশ্চিত যে ড. দীনেশচন্দ্র আমাদের হারানো গীতিকা সম্পদকে উদ্ধার করে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশের দশক থেকেই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশকে বিশ্ববরেণ্য করে তুলেন। ক্ষিতীশ মৌলিক অসম্পূর্ণ পালাগুলিকে পূর্ণতা দিয়ে তাদের আরো নির্ভরযোগ্য করে গীতিকা সাহিত্যকে বিজ্ঞানভিত্তিক নয় শুধু, এ দিগন্তে যে এখনো কাজ করার প্রচুর সুযোগ আছে তার প্রতিও অঙ্গুলি সংকেত করে গেছেন।'

তাই পালাগুলো নিছক গান বা নাট্যাভিনয় নয়, এগুলোর সাথে মিশে আছে লোক হৃদয়ের নানা অব্যক্ত কথা। অনেকে মনে করেন গীতিকাগুলিতে আদিম জীবনের প্রতিচ্ছবির পরিস্ফুটন ঘটেছে। আদিম জীবন এবং লোক জীবন এক নয়। লোক মানুষের সামগ্রিক জীবনাচরণ প্রস্ফুটিত হয়েছে পালাগুলোর ছত্রে ছত্রে। এ কারণে পালাগুলো মানুষের হৃদয় স্পর্শ এবং আলোড়িত করেছে।

**গীতিকা: মূল চিত্র :**

"লোক" শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল "ফোক"। আর এই ফোক শব্দ নিয়ে শুরু হয়েছে নানা মতানৈক্য। কেউ বলেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষই ফোক। আবার কেউ বলেছেন "লোক" গ্রাম-শহর, সাধারণ বা অসাধারণভাবে জীবন- যাপন করতে পারে। আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীগণ মৌলিক সংস্কৃতির অধিকারী মানব গোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য এই শব্দ অনেক সময় ব্যবহার করে থাকেন। মূলত লোক বলতে আমরা তাদেরকেই বুঝব যারা গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং সংহত সমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। যারা মৌলিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ময়মনসিংহ গীতিকায় এইসব মানুষদের জীবনাচরণ ফুটে উঠেছে। কেননা লোককবি এই মানুষদের সমাজেই বসবাসকারী মানুষ। সংগ্রাহক



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

লোককবির নিকট থেকে লোক জীবনের খবর সংগ্রহ করেছেন এবং সম্পাদক সেগুলো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে বিশ্ব দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন। যা লোকজীবন চিত্রের দলিল স্বরূপ ময়মনসিংহ গীতিকার প্রতিটি পাতায় পুঞ্জিভূত।

ময়মনসিংহ গীতিকায় যে ১০ টি পালা স্থান পায় সেগুলি হল মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারাম পালা ,রূপবতী,কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা। ময়মনসিংহ গীতিকার পালাগুলো মূলত প্রেম- বিরহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রেমকে কেন্দ্র করে কাহিনী অন্তিমের পথে ধাবিত হয়েছে। আর এই প্রেমের বর্ণনা করতে গিয়ে লোককবি লোকজীবনের নানা বাস্তব- অবাস্তব চিত্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। যাতে কাহিনী লোক জীবন স্পর্শী রূপ পরিগ্রহ করেছে। শুরুতেই মহুয়া পালা চিত্রিত হয়েছে। মহুয়া একটি ফুলের নাম। যে ফুলের সৌরভে মাদকতা বর্তমান। কবি দ্বিজ কানাই প্রণীত মহুয়া পালায় মহুয়া একটি জ্যান্ত ফুল। যে ফুলের সৌন্দর্যে নদের চাঁদ পাগল। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নদের চাঁদ ও মহুয়ার মিলন হয়। তবে সে মিলন প্রতিষ্ঠিত হয় মৃত্যুর পর অন্ধকার কবরে।

মহুয়া পালার বন্দনা অংশে লোক জীবনের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। যেখানে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায় বড় হয়ে উঠেনি। কেননা লোক জীবনে বসবাসকারী মানুষ অন্ধ ধর্ম চেতনাকে ছাপিয়ে রেখে সব সময় উর্ধে অবস্থান করেছেন। তাই পালাগুলো ধর্ম- বর্ণ- গোত্র নির্বিশেষে গীত হয়েছে এবং সকল স্তরের শ্রোতামন্ডলী এই পালা দেখে প্রীত হয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধর্ম কেন্দ্রিক এবং স্থূলতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকার পালা গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, লোকজীবন ধর্মের কড়াল ছোবলে মৃত্যুবরণ করেনি। ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে তারা ঐতিহ্যকে লালন করেছেন—

'উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্বত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাত পাথথর,
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উর্দিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান,
সভা কইরা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম।।'

পৃথিবীতে মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় মৌল উপাদান হল খাদ্য। পেটে ক্ষুধা আছে বলেই আমরা গতিশীল। তাই খাদ্য অন্বেষণ ও জীবন ধারণের জন্য মানুষ বেছে নেয়

বৈচিত্র্যময় পেশা। সেসব পেশার মধ্য দিয়ে মানুষ দু'মুঠো অন্ন জুগিয়ে বাঁচার লড়াই করে। মহুয়া পালায় আমরা লোক পেশাকে আশ্রয় করে লোক জীবনের চিত্র দেখতে পাই। যেখানে বেদে পেশাকে সঙ্গী করে যাযাবর শ্রেণীর একদল মানুষ বাঁচার লড়াইয়ে ব্যস্তত্ত

'হুমরা বাইদ্যা ডাক দিয়া কয় মাইকঙ্কিয়া ওরে ভাই।
খেলা দেখাইবারে চল বৈদেশেতে যাই।।'

লোক জীবন সবসময়ই অলস এবং আনন্দহীন। লোক মানুষ সারাদিন কাঠফাটা রোদে মাঠে কাজ করে অবসর সময় গল্প গুজবের মাধ্যমে কাটায়। বর্তমানের মতো আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম তখন ছিল না। মাঝেমধ্যে তারা লোক উৎসব কিংবা লোক খেলার মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করত। মহুয়া পালায় হুমরা বাইদ্যার দল যখন ঠাকুরবাড়ি তামাশার আসর বসায় তখন লোক জীবনের বিনোদন তৃষ্ণার চিত্র অনায়াসে চিত্রিত হয়।

'যখন নাকি হুমরা বাইদ্যা ডুলে মাইলো বাড়ী।
নদ্যাপুরে  যত মানুষ লাগল দৌড়াদৌড়ি।
একজনে ডাক দিয়ে কয় রে আর একজনের ঠাই।
ঠাকুর বাড়ী বাইদ্যার তামশা চল দেইখ্যা আই।।'

মহুয়া পালাটি মূলত মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রেমকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছে। ঠাকুরবাড়ি সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে মহুয়া নদের চাঁদের চোখে ধরা পড়ে। শুধু  নদের চাঁদই নয়, মহুয়াও নদের চাঁদকে গোপনে স্বীয় মনে ঠাই দেয়। দুজনের প্রেমাসক্ত মনের আকুতি প্রকাশের জন্য  পুকুর ঘাটকে বেছে নেয়। এখান থেকে বোঝা যায় লোক জীবনের প্রেম ও জলের ঘাটের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্তমান। লোক জীবনের প্রেম বাস্তব প্রেম। সেখানে হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে জলের ঘাটে নানা বুদ্ধিদীপ্ত উপমার মাধ্যমে—

'লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসি বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।
কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙআমি ডুইব্যা মরি।।'

ময়মনসিংহ গীতিকায় লোক জীবনের প্রেম অসাধারণ ভাবে ফুটে উঠেছে। ছায়া শীতল গ্রামের পুকুর ঘাটেই প্রেমের সূচনা হয়েছে। মহুয়া ও নদের চাঁদের মত মলুয়া পালায় চাঁদ বিনোদ ও মলুয়ার প্রেমও পুকুর ঘাটে সূচিত হয়েছে। চন্দ্রাবতী পালায় জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর প্রেম ফুলবাগিচায় শুরু হলেও জয়ানন্দ পরনারী আসক্ত হয়। আসক্তির বহিঃ প্রকাশ ঘটে পুকুর ঘাটে গাছের বাকলে প্রেমপত্র লেখার মাধ্যমে। এই কারণে চন্দ্রাবতী



ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VIII, Issue : XVII

পালা মোড় নেয় বিরহের দিকে এবং জলে ডুবে জয়নন্দের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে—

'সরমে মরণ আইল কথা কওয়া দায়।
জলের ঘাটে গিয়া নাগর উকি জুকি চায়,
লিখিয়া রাখিল পত্র ইজল গাছের মূলে।
এইখানে পড়িব কন্যা নয়ন ফিরাইলে।।'

গ্রামেগঞ্জে একসময় মানুষ মারা গেলে শোনা যেত ভূত-প্রেত কিংবা জিনে ধরে মারা গেছে। এক সময় ঝাড়-ফুক, মন্ত্র -তন্ত্র, গাছ- গাছড়াই ছিল চিকিৎসার প্রধান উপকরণ।যাকে এখন আমরা লোক চিকিৎসা বলে জানি। লোক জীবনের নানা অসুখ-বিসুখ লোক চিকিৎসার উপরেই নির্ভর ছিল। মহুয়া পালায় নদের চাঁদের যখন জ্বর হয় তখন সন্ন্যাসী কর্তৃক চিকিৎসার ধরণ ও উপাদান লক্ষ্য করা যায়—

'বনে আছে গাছের পাতা, তুইলা দিবাম আমি।
এই গাছে বাচিবে তোমার পতির পরাণী।
দারুণ আকাল্যা জর হাড়ে লাগ্যা আছে।
পরাণে বাঁচিয়া আছে মইরা না সে গেছে।
শ্বাসেতে ধরিয়া পাতা আন নদীর পানি।
এক মন্ত্রে বাঁচাইব তাহার পরানি।।'

লোক বিশ্বাস আছে বাড়িতে মেহমান আসা ভালো। কিন্তু মেহমান শুধু আসলেই হলো না, তাকে আপ্যায়নের বিষয়টাও সংস্কৃতির ভেদে ভিন্নতর। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের কোন কোন স্থানে মেহমানকে মিষ্টি ও পান দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ময়মনসিংহ গীতিকায় মেহমান আপ্যায়নের চিত্র অবলোকন করা যায়। বসতে দেওয়া থেকে শুরু করে মেহমানের খাতির যত্নের বিবরণও পাওয়া যায়—

'আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পীরা।
জল পান করিতে দিয়াম সালী ধানের চিরা।
সালি ধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা।
ঘরে আছে মহিষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা।।'

লোক জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র। নানা অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে জীবন বয়ে চলে অন্তিমের পথে। শোষকের ঋণ শোধ করতে গিয়ে বিনোদের সংসারের কি হাল হয় মলুয়া পালায় অনায়াসে সেই চিত্র চিত্রিত হয়েছে—

'আছিল হলের গরু বেচিয়া খাইল।
পাচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে দিল।
খেত খোলা নাই তার ,নাই হালের গরু।
না বুনায় ধান কালাই না বুনায় সরু।।'

ময়মনসিংহ গীতিকায় দেখা যায় দু'মুঠো অন্নের জন্য বিক্রি করতে হয়েছে নারীর প্রিয় জিনিস অলংকার। এখান থেকে আমরা লোক জীবনে ব্যবহার্য অলংকারের বর্ণনাও পাই। এছাড়া নারীর বারোমাসির বর্ণনাও পাওয়া যায়—

'নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল।
গলায় যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল।
শায়ণ মাসেতে মলুয়ার পায়ের খাড়ু বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে।
হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্র মাস যায়।
পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাস খায়।।'

লোক জীবনে বসবাসকারী মানুষের ঘরবাড়ির চিত্র আমরা ময়মনসিংহ গীতিকায় দেখতে পাই। সেই উলুছনে ছাওয়া আটচালা চৌচালা ঘর বর্তমান সময়ে দেখা দুষ্প্রাপ্য। যেখানে বসবাস করে লোক জীবন অতিবাহিত হয় —

'আটচালা চৌচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দর।
ভালা কইরা বান্ধে বিনোদ বার-দুয়াইরা ঘর;
শীতল পাটী দিয়া বিনোদ ঘরে দিল বেড়া।
উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহারা।।'

হরেক রকমের লোক বিশ্বাস লোক জীবনের সাথে জড়িত। নানা বিপদে-আপদে লোক মানুষ বিভিন্ন লোক দেবতা, পীর, আওলিয়া দরবেশের শরণাপন্ন হত।রোগ নিরাময়ের জন্য পশু- পাখি কিম্বা সিন্নি মানত করত। মূলত তখন থেকে মাজার সংস্কৃতির প্রচলন ঘটে। এই মানত করার মধ্য দিয়ে লোক বিশ্বাসের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা দেখতে পাই—

'জোড়া মইষ দিয়া মায় মানসিক করে।
মায়ত কান্দিয়া কয় পুত্র বুঝি মরে।।'

লোক জীবন সবসময়ই নানা বিশ্বাস সংস্কারে আবদ্ধ। বাইরে যাওয়ার সময় মাথায় আঘাত পেলে বসে যেতে হয়, এক শালিক পাখি দেখা অশুভ,রাতে কুকুর কাদা অশুভ ,সন্ধ্যার সময় ঘর থেকে চাল দিলে লক্ষী চলে যায় এমন নানা বিশ্বাস সংস্কার লোক



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

জীবনে প্রচলিত। ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা লোক বিশ্বাস- সংস্কারের চিত্র অবলোকন করি—

'যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বার যে চাহিল।
তার পরে মেলা দিয়া সামনে দেখে তেলী।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালী।
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া।
নানা অলক্ষণ দেখে পন্থে মেলা দিয়া।।'

মানুষের নেশার অন্ত নাই। উচ্চবিত্ত -নিম্নবিত্ত সবার মাঝেই নেশা বর্তমান। লোক জীবনেও মাদকের নেশা প্রচলিত। কেউ পান খায়, কেউ গুল, গুটকী, চুয়ানি, ভাঙ গাজা ইত্যাদি। ময়মনসিংহ গীতিকায় লোক নেশা তামাক সেবনের বর্ণনা দৃষ্টিগোচর হয় —

'কিছু কিছু তামুক আর টিক্কা দিল সাথে।
মেলা কইরা বিনোদ বাহির হইল পথে।।'

কোরমা, পোলাও, বিরিয়ানি এসব খাদ্য তালিকার সাথে লোক জীবনের পরিচয় নাই। বাড়ির আশেপাশে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান দিয়ে তৈরি বাহারী খাবার লোক মানুষ খেয়ে থাকে। ময়মনসিংহ গীতিকায় লোক খাদ্যের বিবরণ দিতে লোক কবি ভুলে যাননি ত্ত

'মান কচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
মাছের সরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার। কাইট্টা লইছে কই মাছ চরচরি খারা।
ভালা কইরে রান্ধে বেনুন দিয়া কল্যাজিরা।
একে একে রান্ধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি।
শুকনা মাছ পুইড়া রান্ধে আগল বেসাতি।।'

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল বিয়ে। বিয়ের মাধ্যমে নারী -পুরুষের যৌনতার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তাই বাল্যকাল থেকেই বিয়ে নিয়ে মানুষের মধ্যে কৌতুহল কাজ করে। আবার বিয়ে নিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতি বলয়ে নানা ধরনের আচার-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিয়ে একটা শুভ কার্য, তাই শুভ দিনের ব্যাপারটিও বিবাহের সাথে জড়িত। আবার শুভ-অশুভ দিন নিয়ে রয়েছে লোকসমাজে নানা বিধি-নিষেধ। মলুয়া পালায় আমরা দেখতে পাই—

'শায়ন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেহুলা রাঢ়ি হইছে।
ভাদ্র মাসে শাস্ত্র মতে দেবকাযর্য্য মানা।
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা।।'

নয়নচাঁদ ঘোষ প্রণীত চন্দ্রাবতী পালায়ও লোক জীবনের নানা বিশ্বাস, আচার, সংস্কারের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। মূলত দুই নারী ও এক পুরুষের প্রেম নিয়ে চন্দ্রাবতী একটি ট্র্যাজিক পালা। প্রেমাখ্যান হলেও লোক জীবন উপেক্ষিত নয়। এ পালায় লোক জীবনে বিয়েকে কেন্দ্র করে কুষ্টি বিচারের চিত্র ধরা পড়ে। কুষ্টির ওপর নির্ভর করে লোক জীবনের ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, দিন-ক্ষণ ধার্য হয়—

'কুষ্টি বিচারি কৈল সবর্ব সুলক্ষণ।
বরকন্যার এমন মিল ঘটে কদাচন।
কুষ্টিতে মিলিছে ভাল যখন এই বরে।
এই বরে কন্যা দান করিব সুস্থরে।।'

এক সময় বিয়ের ৪-৫ দিন আগে থেকে গীত গাওয়া হত। মূলত নারীরা এ গানের স্রষ্টা এবং গায়ক। সারারাত ধরে এয়োগণ কনেকে মাঝখানে বসিয়ে গান গায় এবং গানের মাধ্যমে হাসিঠাট্টা করে। আবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুত্র বা কন্যার মঙ্গল কামনায় সোহাগ মাগে। তেল, সিঁদুর, চাউল, হলুদ ইত্যাদি দিয়ে সোহাগ ডালা সাজিয়ে সোহাগ মাগার দৃশ্য ময়মনসিংহ গীতিকায় দেখা যায়। যা লোক জীবনের বিবাহাচারের স্বরূপ উন্মোচন করে—

'মাথায় লক্ষ্মীর কুলা অঞ্চলে ঘুড়িয়া।
সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া।
উত্তম সাইলের চাউলে পিটালি বাটিয়া,
বন্দনা করিল আগে তিন আবা দিয়া।'

যুগে যুগে মানুষের কল্যাণার্থে নানা ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সব সময় একশ্রেণীর মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে ব্যবসা করেছে। মলুয়া পালায় দেখা যায় সুন্দরী নারী ভোগের লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য কাজী নানা ফতোয়া জারি করেছে—

বিনোদের উপরে কাজী পরণা জারি করে।
হুকুম লিখিয়া দিল পরনা উপরে।
সাদি কইরাছ তুমি গেছে ছয় মাস। নজর মরেচা রইছে তোমার অপরকাশ।।'

স্বামী ,সন্তান, সংসারের মঙ্গলের জন্য গ্রামীণ নারীরা নানা ব্রত পালন করে থাকে। তাদের বিশ্বাস ব্রত পালন করলে মঙ্গল হয়। মলুয়া পালায় স্বীয় সতীত্ব রক্ষার্থে ব্রত পালনের কথা জানতে পারা যায়—

'বার মাসের বর্ত মোর নয় মাসে গেছে।
পরতষ্টাি করিতে আর তিন মাস আছে।।'



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

লোক জীবনে লোক সমাজের নিষ্ঠুরতার চিত্র আমরা দেখতে পাই। দেওয়ানের ঘরে মলুয়াবন্দী থাকার কারণে লোকসমাজ তার উপর নিষ্ঠুর আইন প্রণয়ন করে। মুসলমানের হাতে অন্ন খেয়েছে বলে মলুয়ার জাত নষ্ট হয়েছে, সে সমাজের অস্পৃশ্য ব্যক্তি। এর ফলে একটা সতী সাদ্ধি নারীর জীবন অকালে নষ্ট হতে দেখা যায়। এখানে জাতের কাছে মানুষ গৌণ—

'বিনোদের মামা বলে হালুদার সরদার
যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাতি যাইবে তার।
বিনোদের পিশা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া।
ঘরেতে না লইব কন্যা জাতিধর্ম ছাড়িয়া।।'

ময়মনসিংহ গীতিকায় কাজলরেখা পালাটি মূলত রূপকথা। রূপকথায় অতিপ্রাকৃত শক্তির ভিড় বেশি এবং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভেদী। যার কারণে এই পালা লোক জীবন ঘেঁষা নয়; তবে লোক উপাদান একেবারে উপেক্ষিত নয়। লোক জীবনের রূপকথার ভূমিকা অপরিসীম। এখানে লোক জীবনের নানা অধ্যায় রূপকথায় চিত্রিত হয়েছে। এই পালায় লোক জীবনের নান্দনিক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সূচ রাজার নির্দেশে কাজলরেখা কর্তৃক আলপনা আঁকা লোক জীবনের নান্দনিক দিকের পরিচয় বহন করে—

'উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।
ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া। পিটালি করিয়া কন্যা পর্থমে আকিল।
বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল।'

মনসুর বয়াতি প্রণীত দেওয়ানা মদিনা পালায় আমরা লোক জীবনের নানা লোক উপাদান ব্যবহারের চিত্র পাই। যা অবলোকন করে লোক জীবনধারা সম্পর্কে কিঞ্চিত হলেও ধারণা পাওয়া যায়। পালাটি শুরু হয় নারীর আর্তনাদ নিয়ে। যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সন্তানের মঙ্গল কামনায় নারীর বিধি-নিষেধ। পালার শুরুতেই সতীন প্রসঙ্গ এসেছে, যা লোক জীবন সংশ্লিষ্ট—

'সতীন বালাই কিয়া কই তোমার কাছে।
এতিম ধনেরা মোর দুঃখু পাইব পাছে।।'

নানান রকম বাহারী লোকখেলার মধ্য দিয়ে লোক জীবন অতিবাহিত হয়। এসব লোক খেলা লোক জীবনের সাথে একসূত্রে গাঁথা। ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা লোক খেলা বিশেষ করে জলের খেলা নৌকা বাইচের সাক্ষাৎ পাই। আবার নৌকা বাইচকে কেন্দ্র করে আড়ং বা মেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রম ক্লান্ত লোক জীবন একটু প্রশান্তির জন্য মেতে ওঠে মিলন মেলায় —

'নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও সাজাইয়া।
আড়ং জমিব কত দেশ ভাসাইয়া।।'

লোক গীতিকা বা পালাগুলো মূলত লোক জীবনেরই সৃষ্টি এবং বংশ পরম্পরায় তা প্রবাহমান। কিন্তু সেটা লিখিত নয়, মৌখিক আকারে। তাই পালাগুলো খাঁটি ফোকলোর উপাদান। লোক কবি লোক সমাজ থেকে নানা সূত্র নিয়ে পালাগুলো রূপায়ণ করেছেন। এছাড়া লোক কবি লোক সমাজেরই অংশ এবং লোক জীবনে বসবাসকারী মানুষ।তাই কবি লোক জীবনকে উপেক্ষা করতে পারেননি। প্রবাহমান লোক জীবনের নানা দৃশ্য সংযোজন করে ময়মনসিংহ গীতিকার পালা গুলো রচনা করেছেন। সে কারণেই পালা গুলো ছত্রে ছত্রে লোক জীবন চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। উন্মোচিত হয়েছে লোক জীবনের স্বরূপ। সভ্যতার অগ্রগতির ধারায় লোক জীবন আজ বিলুপ্তির পথে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রায় আধুনিকতার ছাপ পরিপুষ্ট। এ পরিবর্তন লোক জীবনেরই বিবর্তিত রূপ।

**তথ্যসূত্র :**


১) লোকসাহিত্য জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২) গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, ডঃ বরুন কুমার চক্রবর্তী
৩) বাংলা লোকসাহিত্য (১৯৬২), আশুতোষ ভট্টাচার্য
৪) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫) ময়মনসিংহ ও প্রাচীন প্রবন্ধ গীতিকা, আশিষ ঘোষ
৬) ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন, ডঃ মহারুল ইসলাম বাংলা একাডেমী ঢাকা
৭) লোকসাহিত্য, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী




## বাঁকুড়া জেলার কিংবদন্তি : সমীক্ষা ভিত্তিক পর্যালোচনা

**সোনাই চ্যাটার্জী**

দেশ-কাল-স্থান নির্বিশেষে প্রতিটি জাতির নিজস্ব কিছু ইতিহাস বিদ্যমান। যুগ যুগ ধরে মানুষ এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত নদীর বহমান স্রোতের মত লোকমুখে প্রচলিত কাহিনিগুলিকে বয়ে নিয়ে চলেছে। সময়ের হাত ধরে পরিবর্তনের স্পর্শে কাহিনিগুলি বদল হতে হতে নবরূপ পেয়েছে,যার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ খুবই ক্ষুদ্র মানের। ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে গ্রাম্য মানুষরা নিজেদের মতো করে কিছু লোককাহিনির জন্ম দেয়, এগুলিকে সাধারণ ভাষায় কিংবদন্তি বলা হয়। ইংরাজি LEGEND শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করলে দাঁড়ায় কিংবদন্তি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানে শব্দটির অর্থ করেছেন 'সত্য বা অসত্য কাহিনী'। সত্য,মিথ্যা ও সম্ভাবনার ত্রিবেণী সঙ্গমে কিংবদন্তির কায়া গঠিত হয়। ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত কিংবদন্তি পরিভাষাটির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে বলেছেন — "প্রাথমিক অবস্থায় কিংবদন্তীর মধ্যে ইতিহাসের সত্যরূপ অবশ্যই থাকে কিন্তু পরবর্তী কালে পল্লবিত হতে হতে ইতিহাস প্রায় মুছে যায়, রয়ে যায় সম্ভব অসম্ভবের এক অপরূপ কাহিনী।"[১] এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইতিহাস যদি মাথার চুল হয়, তবে খোঁপা হল কিংবদন্তি।

অনেকদিন আগে কোনো ভোজ অনুষ্ঠানে মহাপুরুষ,সন্ন্যাসী বা ধর্মঠাকুরের জীবনকাহিনী বর্ণনা করা হত, এগুলিকেই আগে কিংবদন্তি বা Legends বলা হত। সাধারণত ঐতিহ্যগত ভাবে কোন ঘটনা,চরিত্রের বীরত্ব, স্থানের মাহাত্ম্য, দেবদেবীর অলৌকিক ঘটনা প্রজন্ম পরম্পরায় প্রচলিত আছে, এইসব বিষয়গুলিই কিংবদন্তি নামে আখ্যায়িত। ডঃ রিচার্ড ক্যাভেনডিস কিংবদন্তি সম্পর্কে জানিয়েছেন — "Legends are told as good stories–enjoyable in their own right and so they often describe what ought to have happened instead of what actually did."[২] অর্থাৎ কিংবদন্তিগুলিকে তাদের নিজস্বভাবে উপভোগযোগ্য ভালো গল্প হিসাবে বলা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তার পরিবর্তে কী হওয়া উচিত ছিল তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হয়।

কিংবদন্তির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করছি —

১। লোককথার মতো কিংবদন্তিরও লেখক পরিচিতির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

২। কিংবদন্তির আকৃতি সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে থাকে। অতিরঞ্জিত গল্পরসের স্থান অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

৩। একটি ঘটনা বা অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়, সেখানে কাহিনি কাঠামো তেমন ভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

৪। ইতিহাসের সূক্ষ্ম যোগ কিংবদন্তির মধ্যে লক্ষণীয়, ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত হয়ে কিংবদন্তি আত্মপ্রকাশ করে।

৫। লৌকিক ও অলৌকিক দুই ধরনের চরিত্রের সংমিশ্রণে কিংবদন্তি সৃষ্টি হতে পারে, তবে অলৌকিক চরিত্রগুলি গ্রাম্য সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রসারিত ও প্রচলিত হতে হতে লৌকিক চরিত্রের মাঝে ঢুকে পড়ে এবং লৌকিক চরিত্রের ভূমিকা পালন করে।

৬। মানুষের চরিত্র গঠনের পাশাপাশি সমাজ গঠনেও এর অবদান অপরিসীম। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক,সামাজিক,ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানান ঘটনার চড়াই উতরাই কিংবদন্তির কাহিনির মাঝে স্থান পায়, যেগুলি সমাজের অমূল্য রসদ।

৭। কিংবদন্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কাহিনিগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হতে দেখা যায়।

৮। লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার কিংবদন্তির কাহিনির মাঝে লুকিয়ে থাকে।

৯। কিংবদন্তির কাহিনিগুলিতে কৌতূহল থাকার কারণে লোকে এই কাহিনিগুলি মনোযোগ সহকারে শুনে এবং সত্য হোক বা মিথ্যা হোক বিশ্বাস করে।

আমাদের আলোচনার বিষয় ' বাঁকুড়া জেলার কিংবদন্তি', অন্যান্য জেলাগুলির মত বাঁকুড়া জেলাতেও অজস্র কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত কিংবদন্তিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে —

(ক) স্থান,বৃক্ষ,বাঁধ বা জলাশয় নামভিত্তিক কিংবদন্তি।

(খ) ঐতিহাসিক চরিত্র কেন্দ্রিক বা ঘটনা কেন্দ্রিক কিংবদন্তি।

(গ) পৌরাণিক কেন্দ্রিক কিংবদন্তি।

(ঘ) বিবিধ।

বাঁকুড়া জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত কিংবদন্তির কাহিনিবলীগুলি নিম্নে উল্লেখ করছি-

**বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ** আমরা সবাই জানি, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজরা সাতটি বাঁধ খনন করিয়েছিল,এখনও বাঁধগুলি চোখে পড়ে, তার মধ্যে লালবাঁধের নাম নিয়ে লোকমুখে জনশ্রুতি আছে। রাজা একদিন যাবার আগে রানির কাছে গিয়ে বলে তোমার জন্য কি নিয়ে আসবো রানি জানতেন রাজা গঙ্গাতীরে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, তাই তিনি এক কলসি গঙ্গোদক নিয়ে আসতে বলেন। রাজা যুদ্ধ জয় করে ফেরার পথে রানির কথা ভুলে যান, উল্টে সঙ্গে করে আনেন এক যবন কন্যাকে; সে দেখতে অসাধারণ রূপসী ছিল। রাজা তার রুপের মোহে অন্ধ হয়ে যায়, তার কথার বশবর্তী হয়ে রাজা তার রাজত্বপাঠ চালাতে থাকে। এর ফলে রাজ্য রাসাতলে ডুবে যেতে থাকে। রাজ্যে প্রজাদের উপর অত্যাচার



ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VIII, Issue : XVII

বৃদ্ধি পায়। মন্ত্রী রানির কাছে বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। এরপর মন্ত্রী আর রানি মিলে কি করণীয় তার শলাপরামর্শ করে নেন। একদিন যবন কন্যা ও রাজা যখন প্রেমালাপে মও তখন রানি রাজার বুক লক্ষ করে বিষ তির নিক্ষেপ করেন, রাজার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়; যবন কন্যাকে রানি হত্যা করে তার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে পাশের বাঁধে ভাসিয়ে দিতে বলেন। যবন কন্যার রক্তে বাঁধের জল লালবর্ণ ধারণ করে। সেই থেকেই বাঁধের নাম হয় লালবাঁধ। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এই ঘটনা সত্যি সত্যি একদিন ঘটেছিল।

**কাঁসাচরা পুকুর** বাঁকুড়া শহরের ধর্মীয় স্থানগুলির মধ্যে এক্তেশ্বর অতি জনপ্রিয় একটি ধর্মস্থান। জেলা থেকে গ্রামের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার মত। গ্রামে কাঁসাচরা নামে একটি পুকুর রয়েছে। এই পুকুর নিয়ে কাহিনি প্রচলিত আছে যে, পূর্বে গ্রামের মানুষ বিবাহের আগেরদিন পান সুপারি পুকুর ঘাটের পাশে নামিয়ে নিমন্ত্রণ করে যেত। পরের দিন বিবাহের কাজে ব্যবহৃত কাঁসার বাসন পত্র পুকুর থেকে ভেসে উঠত। বিবাহের কাজ সম্পন্ন হলে ভাল করে ধুয়ে পুকুর পাড়ে রেখে আসত, আর পিছন ফিরে তাকাবার জো ছিল না। একদিন এক পরিবারের ঝি (চাকরানি) বিবাহের বাসনপত্র চুরি করে। সেই থেকে পুকুরে কাঁসার বাসনপত্র ওঠা বন্ধ হয়ে যায়।

**এক্তেশ্বর মন্দির** এক্তেশ্বর মন্দিরের নাম উৎপত্তি নিয়ে শোনা যায়, একবার সামন্তরাজ ও মল্লরাজের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ দেখা দিলে; স্বয়ং মহাদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বিবাদের নিস্পত্তি করেন। দুই পক্ষের মাঝে একতা স্থাপন করেন স্বয়ং ঈশ্বর, এই জন্য একতার ঈশ্বর থেকে গ্রামের নাম হয় এক্তেশ্বর। মন্দির নিয়ে স্থানীয় পুরোহিতরা বলেন এক্তেশ্বর নাকি বৃন্দাবন হত, কোকিল ডেকে ফেলায় তা আর হয়নি। আজও মন্দিরগাত্রে একটি সাপ, ব্যাঙ, কোকিল এর প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। আবার মন্দির নির্মাণকে আবর্তিত করে জনশ্রুতি রয়েছে এটি নাকি রাক্ষসরা তৈরি করেছিল। ধূলিস্বর্ণ (মতান্তরে দ্বারকেশ্বর) নদী দিয়ে জাহাজে করে সোনা আমদানি রপ্তানি করা হত বলে শোনা যায়।

**বালসীর চাঁপাগাছ** পাত্রসায়র থানার বালসী গ্রামে একটি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির রয়েছে। এই মদিরের বিগ্রহ ও এক সন্ন্যাসীকে নিয়ে জনশ্রুতি আছে। জানা যায় সন্ন্যাসী গ্রামের বাসিন্দা মোহন চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোহন ও তার মার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বলেন আমি তোমাদের একটি বিগ্রহ দেবো। সেই রাতেই মোহনের মা স্বপ্নাদেশ পান সন্ন্যাসী যে বিগ্রহটি দেবেন সেটি না নিয়ে যেন সন্ন্যাসীর জটায় লুকানো বিগ্রহটি চান। স্বপ্নাদেশানুসারে মহিলা জটার ভিতর লুকানো মূর্তিটি চেয়ে বসেন, সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন এই মহিলাও তার মত লক্ষ্মীনারায়ণের একনিষ্ঠ সেবক। তখন তিনি বিগ্রহটি মহিলাকে

দান করেন, কিন্তু বিগ্রহটি ছিল সন্ন্যাসীর প্রাণস্বরূপ, তাই তিনি এই স্থান ছেড়ে আর যেতে পারেননি। মন্দির স্থাপিত হওয়ার কিছুদিন পর সন্ন্যাসী নিজের ইচ্ছামৃত্যুর কথা জানান এবং এও বলেন তাকে যেন মন্দিরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়, সমাধির উপর একটি চাঁপাগাছ লাগানো হয়। ঐ চাঁপাগাছের ফুল দিয়ে মন্দির বিগ্রহের পূজা হত। শোনা যায় গাছটি একসময় মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার নব পুস্প-পত্রে ভোরে ওঠে গাছটি। আজও মন্দিরে গেলে উত্তর দিকে গাছটি দেখতে পাওয়া যায়।

**দলমাদল কামান** মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা শিল্পের পাশাপাশি নজর কাড়ে একটি কামান। এখানকার মানুষদের লোকমুখে জানা যায় অষ্টাদশ শতকে বাংলা বর্গী ও অন্যান্য হানাদার দলের আক্রমনে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। মল্লরাজ গোপাল সিংহদেবের সেনাবাহিনীর উপর হামলা করে বর্গী বাহিনী, সৈন্যরা যখন বর্গীদের কাছে পরাজিত প্রায় নিশ্চিত; এমতাবস্থায় রাজা তার কুলদেবতা মদনমোহনের শরণাপন্ন হন। তারপর নাকি স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার মদনমোহন দুই বগলে দুটি কামান নিয়ে বর্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, বর্গীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। মদনমোহনের এই কীর্তির কথা পালা করে এখনও বিভিন্ন আসরে গাওয়া হয়। এই দুটি কামানের একটি বিষ্ণুপুর ছিন্নমস্তা মন্দিরের অনতিদূরেই রয়েছে, এটি এখন হেরিটেজ রূপে সংরক্ষিত। এই দলমাদল কামানের ইতিহাসের সঙ্গে কিংবদন্তি ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে।

**রঙ্কিনী দেবী** দক্ষিণ বাঁকুড়ার খাতড়ার কুলদেবী হলেন রঙ্কিনী। দেবী রঙ্কিনী একদিন রাজবাড়ির কোলাহলে বিরক্ত হয়ে রানিকে স্বপ্ন দেয় তাকে রাজবাড়ি থেকে দূরে জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করতে। রাজাকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন যেন প্রতিষ্ঠিত স্থানে কোন মন্দির স্থাপন না করা হয়। সেই নির্দেশানুসারে রাজা দেবীকে জঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী রঙ্কিনীর পূজারীদের নিয়েও কিংবদন্তি চালু আছে পূজারি ব্রাহ্মণ মুখুটিদের প্রচুর গরু ছিল। এতগুলি গরুর দুধ দুয়া চাট্টিখানি কথা নয়, এই বিপদ থেকে রেহাই করলেন দেবী রঙ্কিনী। তিনি স্বপ্নে আজ্ঞা দিলেন বাসনপত্র ধুয়ে গাই দুয়ার জন্য রেখে দিতে। গ্রামবাসীদের কথা মত দেবী স্বয়ং দুধ দোহন করতেন। একদিন দেবীর দুধ দুয়ার দৃশ্য এক ধোপা দেখে ফেলেন, দেবী তাকে একথা জানাতে নিষেধ করেন সবাইকে। কিন্তু ধোপা মুখ ফস্কে একথা জানিয়ে দেয় সকলকে। ফলস্বরূপ তার পরদিন ধোপাটির মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত উটতে থাকে এবং ধোপাটির মৃত্যু ঘটে। তারপর থেকে মুখুজ্জ্যেদের দুধ দুয়া বন্ধ হয়ে যায়।

**শুভঙ্কর** বাঙালির গণিত চর্চায় শুভঙ্করের অবদান অপরিসীম। গ্রামের মানুষরা একসময় সুর করে শুভঙ্করের আর্যা পাঠ করত। অঙ্কের কঠিন বিষয়কে তিনি সহজ করে মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারতেন। এই ব্যাক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তি আছে- গ্রীষ্মের এক



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বিকেলে বিষ্ণুপুরের মহারাজা তাঁর সহচরদের নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন, একটি মস্ত লম্বা তাল গাছ দেখতে পেলেন; তিনি সহচরদের কাছে জানতে চাইলেন গাছটি কত লম্বা হতে পারে। কেউ উত্তর দিতে পারল না, রাজা চৈতন্য সিংহ বলেন আজ এখানে শুভঙ্কর উপস্থিত থাকলে এর উত্তর বলে দিতে পারত। সবাই উৎসুক হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, রাজা বললেন; তাঁর আসল নাম জগন্নাথ চৌধুরী, আমার পিতা গোপাল সিংহ তাঁকে শুভঙ্কর উপাধি দেন। শুভঙ্কর অল্প বয়স থেকেই মেধাবী ছিল। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে ফারসি,বাংলা ছাড়াও নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। একবার রাজ্যে তীব্র জলকষ্ট দেখা দিলে শুভঙ্কর বড়জোড়া, সোনামুখি ও পাত্রসায়র থানার মধ্যে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সেচখাল নির্মাণ করে। সেই প্রাচীনতম খাল আজও বর্তমান আছে, যা শুভঙ্করের দাঁড়া বা শুভঙ্করের খাল নামে পরিচিত।

**টুসু** বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার জনপ্রিয় কৃষিকেন্দিক লোকউৎসব হল টুসু। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে গোটা পৌষ মাস ধরে টুসু বন্দনা চলে। টুসুকে নিয়ে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে- টুসু দেখতে অপরূপা সুন্দরী ছিল। একদিন এক মুসলমান শাসকের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ে টুসু, নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে নদীতে ঝাঁপ দেয় টুসু। টুসুকে গ্রাম্য নারীরা সতীত্বের প্রতীক ছাড়াও ঘরের লক্ষ্মী বলে মনে করে। টুসুকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া জেলায় পোরকুলে মেলা বসে।

**হীড়বাঁধের বরকনে ঠাকুর** হীড়বাঁধ অঞ্চলের লৌকিক দেবী বরকনে ঠাকুর। এই দেবীকে নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে কিংবদন্তি শোনা যায়- বর, কনে ও বরযাত্রীদের নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হায়রান হয়ে জল খেতে নামে হীড়বাঁধ জলে। হঠাৎ কোন দৈবরোষে বরকনে, বরযাত্রী, বাজনদার ডুবে যায়। এই বাঁধের জলে ডুবে যাওয়া সমস্ত কিছুই পাষাণ হয়ে যায় বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। গ্রামের একটি উঁচু জায়গা, স্থানীয় ভাষায় যাকে ডুংরি বলা হয়, সেখানেই ছোট বড় কতগুলি পাথর দেখা যাই এগুলি নাকি সেই ডুবে যাওয়া বরকনে,বরযাত্রী, বাজনদার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কাহিনি চলে আসছে।

**ননদ ভাঁজ** রাইপুর দেমুসনা গ্রামের লৌকিক দেবী ননদ ভাঁজ ঠাকুর। এই ঠাকুরকে নিয়ে জনশ্রুতি রয়েছে যে, একটি পরিবারের এক বৌ শ্বশুর ঘরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ননদ বাঁচাতে এসে তাকে ছোঁয়া মাত্র পাথর হয়ে যায়। এর পর থেকে গ্রামে বিভিন্ন মহামারী, অনাবৃষ্টি শুরু হয়। তখন গ্রামের বড় মানুষরা ননদ ভাঁজের পূজা করতে বলেন সকলকে। অন্য একটি মতে বলা হয়, ননদ ও ভাঁজের সম্পর্ক যাতে আরও মধুর হয় সেই জন্য এই পূজা চলে আসছে।

বাঁকুড়া জেলায় এইধরনের বহু কিংবদন্তি গ্রাম্য মানুষরা বহন করে চলেছে। তবে

আগে যে, গল্প শোনার ভিড় জমত পাড়ার চন্ডীমন্ডপ, বয়স্ক দাদু দিদার কাছে; এখন আর তা লক্ষ করা যায় না। বয়স্ক মানুষদের গলায় আক্ষেপের সুর। কচিকাঁচাদের মনোজগতে মোবাইল রুপী যন্ত্রদানবের হানা গল্প শোনার আকর্ষণকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি মানুষ পুরনো গল্পগুলি ভুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। হয়ত একদিন এই কিংবদন্তিগুলির অকাল মৃত্যু ঘটবে। আমাদের উচিত গ্রাম বাংলার এই অমূল্য সম্পদের ভান্ডার যাতে শেষ না হয়ে যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

লোকসাহিত্য অনেকটা পরিযায়ী পাখীর মত। দেশ কালের গন্ডি ভেদ করে অবাধ যাতায়াত করে। বাঁকুড়া জেলার উপরিউক্ত কিংবদন্তিগুলির সঙ্গে অন্য জেলার কিংবদন্তির তাই মিল থাকতেই পারে, এতে দোষের কিছু নেই।

**তথ্যসূত্র :**

১। সৌগত চট্টোপাধ্যায়, লোককথার বর্ণমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতাঃ প্রথম প্রকাশ, ২০১৪

২। শীলা বসাক, বাংলার কিংবদন্তি, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩



## ‘শুকতারা’র কবিতা ও ছড়ায় বাংলার বারো মাস : প্রসঙ্গ ফুল্লরার বারোমাস্যা

**শুভঙ্কর ঘোড়ুই**

‘শুকতারা’ মাসিক পত্রিকার **Target Reader** মূলত ছোটরা। অর্থাৎ এই পত্রিকার একটি বছরে বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়, আর এই সংখ্যাগুলি গণনা হয় বাংলার বারোটা মাস অনুযায়ী। ‘শুকতারা’র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। ফাল্গুন প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে মাঘ দ্বাদশ সংখ্যায় শেষ হয় একটি বর্ষ। আমরা মূলত ‘শুকতারা’র প্রথম পঞ্চাশ (১৩৫৪-১৪০৪) বছরের মধ্যে প্রকাশিত বাংলার বারো মাস সংক্রান্ত কবিতা ও ছড়ার ওপর ভিত্তি করে মূল বিষয়টির ওপর আলোকপাত করবো।

বারো মাস কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এর কাছাকাছি আরও একটি শব্দবন্ধ আমাদের মনে আসে,—‘বারোমাস্যা’। এখানে আমি উদাহরণ স্বরূপ দেখানোর জন্য কেবলমাত্র ফুল্লরার বারোমাস্যার কথা তুলে ধরেছি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’-এর আখেটিক খণ্ডে দেবী চণ্ডীর কাছে ফুল্লরার বারোমাস্যার কথা যেন হয়ে পড়ে এক নারীর বারো মাসের সুখ-দুখের যাপনচিত্র। এই বারোমাস্যাটিকে আমরা বর্তমানে ‘শুকতারা’র কবিতা ও ছড়ার পাশাপাশি বিশ্লেষণ করব। মনে রাখতে হবে বারোমাস্যায় মূলত নারীর দুঃখ ও কষ্টের কথাই ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু ‘শুকতারা’র কবিতা বা ছড়াগুলি তো আর বারোমাস্যা নয়। তাই এখানে কেবলমাত্র দুঃখ-কষ্ট নয়, এখানে মন্দের পাশাপাশি বাংলার প্রতিটা মাসের আনন্দ-উৎসব, লোকসংস্কৃতি, ঋতু পরিক্রমা ইত্যাদিও তুলে ধরা হয়েছে। দুঃখের পাশাপাশি এই আনন্দ মুখর দিকগুলিও আমরা দেখব ‘শুকতারা’র কবিতা ও ছড়াগুলির ওপর ভিত্তি করে। ফুল্লরা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের দুর্ভোগ বোঝাতে গিয়ে দেবী চণ্ডীকে বলেছে

“ভেরাণ্ডার খুঁটি তার আছে মধ্য ঘরে। / প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।
বৈশাখে অনল সম খরতর খরা। / তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।।...
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন। / রবিকরে করে সর্ব শরীর দাহন।।”[১]

‘শুকতারা’য় বৈশাখ মাসকে কেন্দ্র করে মোট ছ’টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ফুল্লরার বারোমাস্যার অনুরূপ বৈশাখ মাসে ঝড়ের বর্ণনা আমরা দেখি মুস্তাফা নাশাদের ‘কালবৈশাখী’ (বৈশাখ ১৩৯৮) ছড়ায়,

“কালবৈশাখী ঝড়, / উঠলে বাড়ি ঘড়;/ ভাঙে মড় মড়াৎ!
শুধু কি ঐ শোন, / বাজও পড়ছে বোন;/ বাপরে, কড়কড়াৎ!”[২]

কালবৈশাখীর এই একই রূপ ফুটে ওঠে অসীমকুমার রায়ের ‘কালবৈশাখী’ (বৈশাখ ১৩৬৫) ছড়াতেও। এছাড়া, শ্রীমতীনীলা দত্তের ‘বোশেখ’ (বৈশাখ ১৩৬৬) কবিতায় দেখি গ্রীষ্মের দাবদাহের রূপ,

বোশেখ এল, ঋতুরঙ্গে অহংকারে দৃপ্ত, / জ্বলছে চিতা বসুন্ধরার তবুও নয় তৃপ্ত।...[৩]

‘শুকতারা’র বৈশাখ মাস নিয়ে কবিতায় গ্রীষ্মের দাবদাহ ও কালবৈশাখী ছাড়াও আরও অন্যান্য কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, সুনির্মল বসু বৈশাখ মাসকে কেন্দ্র করে ‘শুকতারায়’ দুটি কবিতা রচনা করেছেন। বৈশাখে কে ডাক দিয়েছে?’ (বৈশাখ ১৩৫৭) কবিতায় তিনি শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক উন্নতিসাধনের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি ‘এলো বৈশাখ’ (বৈশাখ ১৩৫৫) কবিতাটি যখন লিখছেন তখন আমাদের দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। সেই স্বাধীনতার আনন্দ ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে পড়েছে এই কবিতায়

“এলো বৈশাখ, এলো বৈশাখ, / স্বাধীন-ভারতে এলো বৈশাখ, / বাতাসে বাতাসে চলে কানাকানি, / পাখির কণ্ঠে বাজে ঐ শাঁখ। / এলো বৈশাখ।”[৪]

এখানে নববর্ষের আনন্দের সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কবিতায় সময়কালটা খুব জরুরী। সেটা সদ্য স্বাধীনতার সময়কাল। ঠিক এইভাবেই সনৎকুমার ভট্টাচার্য্যের অগ্রহায়ণ মাস নিয়ে ‘অঘান-অন্তে’ (পৌষ ১৩৫৫) কবিতায় দেখি প্রসঙ্গক্রমেই চলে এসেছে স্বাধীনতার আনন্দময় মুহূর্ত। আবার নবগোপাল সিংহের বৈশাখী’ (বৈশাখ ১৩৫৭) কবিতায় বৈশাখের বুদ্ধ পূর্ণিমা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মমাসে তাঁদের আদর্শকে আত্তিকরণ করার কথা বলা হয়েছে।

‘শুকতারা’য় জ্যৈষ্ঠ মাস শিরোনামে দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বেনু গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যৈষ্ঠে’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) কবিতায় গ্রীষ্মের দাবদাহের রূপ ঠিক ফুল্লরার জ্যৈষ্ঠ মাস বর্ণনার অনুরূপ বলেই মনে হয়,

“পৃথিবীর শ্যামলিমা জ্বলে পুড়ে হলো ছাই, / জ্যৈষ্ঠের বুকে বুঝি দয়া-মায়া কিছু নাই।”[৫]

আবার এই একই সংখ্যাতেই নবগোপাল সিংহ লিখেছেন ‘তিরিশে জ্যৈষ্ঠ’ কবিতা। এই কবিতায় গরমের দাবদাহ নয়, বরং আশার কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তিনি কবিতার নামও দেন ‘তিরিশে জ্যৈষ্ঠ’ অর্থাৎ আষাঢ়ের আগমনের প্রত্যাশায়,

‘জ্যৈষ্ঠ এসে মিষ্টি হেসে / আষাঢ়কে আজ কইলো ডেকে,
কাজ ফুরোল, এবার আমি / বিদায় নেব এখান থেকে।”[৬]

জ্যৈষ্ঠের বিদায়ের পর এল আষাঢ়। আষাঢ় হল বর্ষার মাস। বর্ষাকে নিয়ে কবি সমাজ অতীত থেকে বর্তমানে সর্বদাই উদ্বেলিত। কালিদাস (‘মেঘদূত’) থেকে রবীন্দ্রনাথ (‘বর্ষাযাপন’ কবিতা) সর্বত্রই তার উদাহরণ পাওয়া যায়। ‘শুকতারা’য় বর্ষা ঋতুকে নিয়ে একাধিক কবিতা প্রকাশিত হলেও, আষাঢ় মাস শিরোনামে মোট চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি হল কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের ‘আষাঢ় এলো’ (আষাঢ় ১৩৬০); এই কবিতায় গরমের দাবদাহের পর আষাঢ়ের আগমনে লেখক নিজেই আত্মহারা। সেই বাঁধনহারা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

আনন্দই ফুটে উঠেছে এই কবিতার স্তবকে স্তবকে,

“আষাঢ় এলো গগনতলে / ভাসিয়ে ভুবন বৃষ্টিজলে,
দগ্ধমাটি পরাণ পেলো ধারার পরশ পেয়ে।।”[৭]

এছাড়াও শ্রীঅরুণকুমার মিত্রের ‘আষাঢ়ে’ (আষাঢ় ১৩৬৬) ও ফণিভূষণ বিশ্বাসের ‘আষাঢ়ে’ (আষাঢ় ১৩৬৬) কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে বর্ষার কাব্যিক রূপের পাশাপাশি প্লাবিত রূপ। এবার আসা যাক ফুল্লরার বারোমাস্যা প্রসঙ্গে। ফুল্লরা আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে

“আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘ জল। / বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।।...
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী। / সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।।...
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল। / নদনদী একাকার আট দিকে জল।।[৮]

অর্থাৎ ফুল্লরার কাছে পুরো বর্ষাকাল হয়ে উঠেছে সমস্যার কারণ। ফুল্লরার বর্ণিত এই আষাঢ়ের বর্ণনা ‘শুকতারা’য় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘আষাঢ়ের কবিতা’য় (শারদীয়া ১৩৯৩) ফুটে উঠেছে,

“আষাঢ় মাসেই জল থই-থই / কলকাতা শহরে।
রিকশা ডোবে, ট্যাক্সি ডোবে, / ডুবল ঠেলাগাড়ি,
কোমরজলেই লোকগুলো দেয় / দিগ্বিদিক পাড়ি।...
“ডুবল আমার শহরতলির / বসতবাড়িটাও।
‘আয় বৃষ্টি’ আর বলি না / যাও বৃষ্টি, যাও।”[৯]

আবার শ্রাবণ মাসের বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ হাজরার ‘শ্রাবণ মাসের গল্প’ (শ্রাবণ ১৩৫৮) কবিতা হয়ে ওঠে ফুল্লরার শ্রাবণ বর্ণনার অনুরূপ,

“শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে আজ, পথ-ঘাটে সব কাদা,
এমন দিনে ঘোড়া কি কারো চলতে পারে দাদা?”[১০]

শ্রাবণ মাস নিয়ে এই কবিতাটি ছাড়াও নুরুল হাসান (১৩৫৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৩৬৩) ও শ্রীমতী দেববালা বিশ্বাসের (১৩৬৭) আরও তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এই তিন কবিতায় শ্রাবণের বর্ষণের কাব্যিক রূপটাই বেশি করে প্রকাশ পায়।

এরপর শ্রীসুধীরকুমার রায়ের ‘ভাদরের বায়না’ ছড়াটিতে ভাদরের বৃষ্টির সঙ্গে ছোট্ট খুকির কান্নাকে এক করে দেখা হয়েছে,

“রিমঝিম রিমঝিম ভাদরের কান্না, / অভিমানী মেয়ে ওরে চুপ কর আর না।”[১১]

এই ছড়াটি ছাড়াও ‘শুকতারা’য় অশোককুমার (১৩৬৫) ও তপতীরাণীর (১৩৭০) দুটি কবিতায় ভাদ্র মাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর আশ্বিন হল শারদোৎসবের মাস। ঘরে অভাব থাকলেও দেবী চণ্ডীর কাছে ফুল্লরা আশ্বিন মাসের কথা বলতে গিয়ে অবধারিতভাবেই নিয়ে এসেছে দেবী অম্বিকার প্রসঙ্গ,

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে। / ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে।।"[১২]

'শুকতারা'য় শারদোৎসব নিয়ে একাধিক কবিতা ও ছড়া প্রকাশিত হলেও আশ্বিন মাস শিরোনামে মোট দুটি ছড়া ও একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীদীপক চৌধুরীর লেখা 'আশ্বিন এলো' (আশ্বিন ১৩৬২) কবিতায় আশ্বিনমাসের প্রকৃতির সৌন্দর্য, এই সময় গ্রাম-বাংলায় চাষীদের কাজকর্ম ও দেবীর বোধনের সূচনা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও সলিল মিত্রের 'আশ্বিন' (শারদীয়া ১৩৯৯) ও কৃষ্ণ ধরের লেখা 'আশ্বিনের ছড়া'য় (শারদীয়া ১৪০৩) কাশ ফুলের দোলা, শিউলি ফুল, দুর্গা পুজোর আনন্দ ইত্যাদি নিয়ে শারদীয়ার মুহূর্তকেই বর্ণনা করা হয়েছে,

"বেশ তো আছি পুজোর ক'দিন হৈচৈ আর হাসিতে

সকাল-বিকেল বাদ্যি-বাজনা ঢাক-ঢোল আর কাঁসিতে।...[১৩]

আশ্বিনের পর আসে কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ। এই দুই মাস জুড়ে থাকে শীতের হিমেল পরশ এবং নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দ। এই মাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুল্লরা দেবী চণ্ডীকে বলেছে,

কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম। / করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।...

মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান। / হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।[১৪]

অনুরূপভাবেই 'শুকতারা'য় অসিতকুমার চৌধুরীর 'কে?' (পৌষ ১৩৮৬) কবিতায় উঠে আসে কার্তিকের হিম শীতল আবহাওয়া এবং অগ্রহায়ণের নবান্ন উৎসবের কথা,

"কাত্তিক থেকে হিমের পরশ। / অঘ্রাণে পাকা ধানের হরষ?"[১৫]

এছাড়াও অবনী সাহার 'বারো মাসের পিঠেপুলি' (বৈশাখ ১৩৯৯) কবিতায় উঠে আসে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের নবান্ন উৎসবের চিত্র,

"কার্তিক অঘ্রাণ দুই মাস / চাষীর ঘরে ফুল বাতাস / নবান্নের ধুম লেগে যায় / যার রে।"[১৬]

আবার, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় স্বপনবুড়োর 'ভাইফোঁটা' ও মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বোন পড়ে মন্তর' কবিতায় দেখতে পাই কার্তিকে মাসে দীপাবলীর পর ভাইফোঁটা আচার-অনুষ্ঠানের একটি চিত্র।

বাংলায় পৌষ হল পার্বণের মাস। এই মাসেও থাকে হিমেল আবহাওয়া। ফুল্লরা বলেছে এই পার্বণের মাসে সকলে সুখী থাকলেও সে নিজে অসুখী, আর সেখানেই তার আক্ষেপ,

পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্বজন।... / অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন।।[১৭]

কিন্তু 'শুকতারা'য় পৌষকে আনন্দের মাস হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে। তাই নরোত্তম হালদারের লেখা 'পৌষপার্বণে' (পৌষ ১৩৬৫) কবিতায় আমরা দেখি,

"এলোরে পৌষপার্বণ / একটি বছর পরে

পিঠেপুলি খাওয়ার তরে / জিভেতে জল সরে।"[১৮]





এই কবিতাটি ছাড়াও পৌষ মাসকে নিয়ে 'শুকতারা'য় বেনু গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি (১৩৬১ ও ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে) ও যতীন্দ্রমোহন মজুমদারের একটি কবিতা (১৩৬৫ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়েছে। এই তিন কবিতাতেও পৌষের উৎসবমুখর পরিবেশ হয়ে উঠেছে মূল উপজীব্য।

মাঘেও থাকে শীত, থাকে কুয়াশা। এই কুয়াশা থাকবার কারণেই কালকেতু অরণ্যে গিয়ে কোনো শিকারের সন্ধান পায় না। থাকতে হয় উপবাসী। এই আক্ষেপ দেবী চণ্ডীর কাছে করেছে ফুল্লরা,

নিদারুণ মাঘ মাস সদাই কুজ্ঝটী। / আন্ধারে লুকায় মুখ না পায় আখেটী।।[১৯]

অপর দিকে 'শুকতারা'য় কমল লাহিড়ীর 'বারো মাসের গান' (শারদীয়া ১৩৯৫) কবিতায় মাঘ মাসে হিমেল হাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে সেখানে উঠে আসে সরস্বতী আরাধনার প্রসঙ্গ,

"হিমেল হাওয়ার পরশ মেখে / পৌষ আর মাঘ আসে।

সরস্বতী মায়ের পুজোয় / খুশিতে মন হাসে।"[২০]

শীতের শেষে আসে বসন্ত। বসন্তের মাস ফাল্গুন। সেই মাসেও ফুল্লরার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছে এইভাবে,

"সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুন মাসে। / পোড়ায়ে রমণীগন বসন্ত-বাতাসে।।

যুবতী-পুরুষ অঙ্গ পোড়ায় মদনে। / ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে।।"[২১]

যেহেতু 'শুকতারা' পত্রিকার টার্গেট রিডার ছোটরা সেইজন্য এখানে বসন্তকে মিলনের ঋতু হিসেবে নয়, রঙের ঋতু, উৎসবের ঋতু হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাই সুধীরকুমার রায়ের 'ফাল্গুন' (ফাল্গুন ১৩৬২) কবিতায় দেখি রঙের উৎসব

"দোল দোল দোল দোল / আমোদেতে উতরোল / রঙ গুলে খোকাখুকু ছুটলো।।"[২২]

'শুকতারা'য় ফাল্গুন মাস নিয়ে সুধীরকুমার রায়ের এই কবিতাটি ছাড়া আরও সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ঋতুরাজ বসন্তের বর্ণনা এবং 'শুকতারা'র বর্ষপূর্তির আনন্দ।

ঋতুচক্রের নিয়ম অনুযায়ী বসন্তের শেষে পুনরায় আসে গ্রীষ্ম ঋতু। চৈত্র মাস থেকেই এই গ্রীষ্মের দাবদাহ বাড়তে থাকে ক্রমশ। এই দাবদাহের চিত্রই ফুল্লরা দেবীচণ্ডীর কাছে বর্ণনা করে এইভাবে,

"অনল সমান পোড়ে চইতের খরা। / ক্ষুদ সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা।।"[২৩]

অনুরূপভাবে 'শুকতারা'র কবিতাতেও চৈত্রের দাবদাহের চিত্র ফুটে ওঠে। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চৈত্রে' (চৈত্র ১৩৫৮) কবিতায় লিখেছেন

শুষ্ক-খরা পত্র-ঝরা / চৈত্র কাঁদে রৌদ্র ভরা, / গুঞ্জরিয়া মৌমাছিরা শেষ বসন্ত গায়।।"[২৪]

শুধু চৈত্রের দাবদাহ নয়, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যের চৈত্রের ভোর' (চৈত্র ১৩৬৭) কবিতায় এই মাসের মনোরম সকালের স্নিগ্ধ পরিবেশকে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও, চৈত্রের শিবের গাজন, চড়ক উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির চিত্রও যথাযথভাবে দেখা যায় 'শুকতারা'র কবিতায়। কমল লাহিড়ীর 'বারোমাসের গান' (শারদীয়া ১৩৯৫) কবিতার শেষ পংক্তিতে দেখি,

"বছর শেষে চৈত্র শোনায় / শিব ঠাকুরের গান।"[২৫]

আবার অবনী সাহার 'বারোমাসের পিঠেপুলি' কবিতার শেষ পংক্তিতে পাই চড়ক উৎসবের কথা

"ছেলে বুড়ো সবাই মিলে / চড়ক পুজোর মজা কোথায় পাই রে।"[২৬]

'শুকতারা'য় বাংলার এক একটি আলাদা মাস নিয়ে কবিতা ছাড়াও তিনটি কবিতায় একত্রে বাংলার বারোটি মাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই তিনটি কবিতায় ফুল্লরার বারোমাস্যার মতো কেবল দুঃখের কথা নয় এখানে বাঙালীর বারোটি মাস জুড়ে আচার-অনুষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ। পার্বণে খাওয়া হয় পিঠে পুলি। আর তাই অবনী সাহা 'বারো মাসের পিঠেপুলি' (বৈশাখ ১৩৯৯) কবিতার শিরোনামে 'পিঠেপুলি' শব্দটা ব্যবহার করে 'বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ' প্রবাদটিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আম, আষাঢ়ে কাঁঠাল, শ্রাবণ-ভাদ্রে তাল ইত্যাদি ফলের নাম পাওয়া যায় এই কবিতায়। এরপর আশ্বিনে নাটাই ব্রতের জন্য পিঠেপুলি, কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে চাষীর ঘরে নবান্ন উৎসবের ধুম, পৌষে পিঠেপুলি, ফাল্গুনে বসন্ত, আর চৈত্রে চড়ক উৎসবএইভাবেই বাঙালীর বারো মাসের পার্বণ ও উৎসবের আনন্দমুখর চিত্র ফুটে উঠেছে এই কবিতায়।

এরপর, কমল লাহিড়ীর 'বারো মাসের গান' (শারদীয়া ১৩৯৫) কবিতাটিতেও বাংলার বারোটি মাসের বর্ণনা করা হয়েছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-কাঁঠাল, আষাঢ়-শ্রাবণে মেঘ বৃষ্টি ও রথের মেলা, ভাদ্রের মেঘ ও আশ্বিনের মা দুর্গার আবাহন, কার্তিক-অগ্রহায়ণে আকাশপ্রদীপ জ্বালানো, পৌষ-মাঘের শীত ও সরস্বতী পুজো, ফাগুনে বসন্ত এবং সব শেষে চৈত্রে শিব ঠাকুরের গাজনএইভাবে বাংলার বারো মাসে আচার এবং অনুষ্ঠানকে তুলে ধরা হয়েছে এই কবিতায়।

এই দুই কবিতা ছাড়াও অসিতকুমার চৌধুরীর 'কে?' (পৌষ ১৩৮৬) কবিতায় বারোটি লাইনে বাংলার বারোটি মাসের বর্ণনা করা হয়েছে। বৈশাখে গাছের শাখায় নতুন পাতা গজোনা থেকে শুরু করে আষাঢ়-শ্রাবণের প্লাবন, কার্তিকের হিম, পৌষে সোনার ধান, ফাগুনে দখিনা বাতাস ও চৈত্রে নতুন বছরের আভাসের কথা জানিয়ে লেখক শেষ করেছেন বারো মাসের বন্দনা।

'শুকতারা'র প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলার বারোটি মাসকে নিয়ে প্রায় আটত্রিশটি ছড়া ও কবিতা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন সংখ্যায়। আর আলোচিত 'শুকতারা'র শেষ তিনটি



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

কবিতা যেন হয়ে উঠেছে বাঙালীর বারোমাস্যা। এই বারোমাস্যায় কেবল দুঃখের কথা নয়, এখানে বলা হয় বাঙালীর উৎসব ও আনন্দে দিন যাপনের কথা। সেই সঙ্গে বাংলার লোকসংস্কৃতি, ছয় ঋতু, আচার, অনুষ্ঠান এই সমস্ত কিছুই উঠে আসে এই কবিতা ও ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে। আসলে সাহিত্যে বাংলার ঘরের কথা বলতে গেলে অবধারিত ভাবেই চলে আসে বাংলার মাস ও ঋতুর প্রসঙ্গ; ঠিক যেমন এসেছে ফুল্লরার বারোমাস্যায়, তেমনি এসেছে 'শুকতারা'র কবিতা ও ছড়ায়। এইভাবেই বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে জড়িয়ে থাকে বাংলার বারো মাস।

**তথ্যসূত্র :**

১। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, নভেম্বর ২০১৪ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ.৫৪
২। মুস্তাফা নাশাদ, কালবৈশাখী, শুকতারা, বৈশাখ ১৩৯৮, পৃ.১৭৭
৩। শ্রীমতী নীলা দত্ত, বোশেখ, শুকতারা, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ.২১৫
৪। সুনির্মল বসু, এলো বৈশাখ, শুকতারা, বৈশাখ ১৩৫৫, পৃ.১১১
৫। বেনু গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যৈষ্ঠে, শুকতারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, পৃ.২২৭
৬। নবগোপাল সিংহ, তিরিশে জ্যৈষ্ঠ, শুকতারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, পৃ.২৮০
৭। কালিদাস মুখোপাধ্যায়, আষাঢ় এলো, শুকতারা, আষাঢ় ১৩৬০, পৃ.৩২৯
৮। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪
৯। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আষাঢ়ের কবিতা, শুকতারা, শারদীয়া ১৩৯৩, পৃ.২২৫
১০। বিশ্বনাথ হাজরা, শ্রাবণ মাসের গল্প, শুকতারা, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ.৪০২
১১। সুধীরকুমার রায়, ভাদরের বায়না, শুকতারা, ভাদ্র ১৩৬২, পৃ.৪৯৮
১২। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪
১৩। কৃষ্ণ ধর, আশ্বিনের ছড়া, শুকতারা, শারদীয়া ১৪০৩, পৃ.১৫
১৪। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪
১৫। অসিতকুমার চৌধুরী, কে?, শুকতারা, পৌষ ১৩৮৬, পৃ.৮৪৯
১৬। অবনী সাহা, বারোমাসের পিঠেপুলি, শুকতারা, বৈশাখ ১৩৯৯, পৃ.১৪৯
১৭। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫
১৮। নরোত্তম হালদার, পৌষপার্বণে, শুকতারা, পৌষ ১৩৬৫, পৃ. ৮২৭
১৯। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫
২০। কমল লাহিড়ী, বারোমাসের গান, শুকতারা, শারদীয়া ১৩৯৫, পৃ.২৭৪
২১। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫
২২। সুধীরকুমার রায়, ফাল্গুন, শুকতারা, ফাল্গুন ১৩৬২, পৃ.১১
২৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫
২৪। শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈত্র, শুকতারা, চৈত্র ১৩৫৮, পৃ.৮৭
২৫। কমল লাহিড়ী, বারোমাসের গান, শুকতারা, শারদীয়া ১৩৯৫, পৃ.২৭৪
২৬। অবনী সাহা, বারোমাসের পিঠেপুলি, শুকতারা, বৈশাখ ১৩৯৯, পৃ.১৪৯

# শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিবর্তনের ধারায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর রচনা

**বিদিশা সরকার**

শিশু-কিশোর সাহিত্য এই শব্দগুচ্ছ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে শিশু-কিশোর সাহিত্যকে এক তালিকাভূক্ত করা যায় কিনা। যা শিশুপাঠ্য তা সদ্য কিশোরও পড়ে। কিন্তু যা শুধুই কিশোরপাঠ্য তা শিশুর বোধগম্য নয়। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে প্রবেশের বয়সসীমা সাত-আট বছর। জন্ম থেকে ছয়-সাত বছর বয়স পর্যন্ত একটি শিশু মায়ের কোলে বসে যে সব ছড়া বা গল্প শোনে তা শিশুমনে কল্পনার বিস্তার ঘটায়। এই পর্যায়ের শিশুসাহিত্য প্রভাবতী দেবী রচনা করেন নি। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'এ মাধব এর বয়স দশ, নবীনের বয়স নয়, যাদবের বয়স আট। এরা সকলেই শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে প্রবেশ করেছে। এদের কথাই যখন গল্পকার শোনাচ্ছেন, স্বাভাবিকভাবেই তা শুধুই শিশুপাঠ্য থাকছে না, হয়ে উঠছে কিশোরপাঠ্যও। অক্ষরজ্ঞান শিশু বয়সে হলেও যখন গল্পের বই পড়তে শুরু করে তখন বয়স কৈশোরে পৌঁছে যায়। এরকম অঙ্কের হিসেব কখনোই কোন সাহিত্যের গণ্ডি তৈরি করতে পারে না। তাই আমরা বলতেই পারি শিশু-কিশোর সাহিত্যের পাঠক শৈশবের সীমানা এবং কৈশোরের প্রথম কয়েকটা বছরের মধ্যেই রয়েছে।

ভারতীয় শিশুসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র'র হাত ধরে। রাজা অমর শক্তির তিন ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'পঞ্চতন্ত্র' রচনা করেন। নীতিশিক্ষা প্রচারের জন্য রচনা করেন 'হিতোপদেশ'। এছাড়া সোমদেবের 'কথা সরিৎ-সাগর' ছিল প্রাচীন ভারতের প্রথম রূপকথা। এর বহু আগে বৌদ্ধজাতকের কাহিনি; কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের উদয়নের গল্প শিশুদের মনোরঞ্জন করতো।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কালসীমায় আমরা যতটুকু অতীতে যেতে পেরেছি তারও অনেক আগে থেকেই শিশুসাহিত্য গড়ে উঠেছে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে, যা ছিল মৌখিক। সচেতনভাবে শিশুসাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্য সাহিত্য চর্চার সময়েই। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'দিগদর্শন'। এই পত্রিকার নাম পত্রে এর প্রকাশের উদ্দেশ্য বলা ছিল 'যুবালোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'। এই 'যুব' হচ্ছে সেই সব শিশু-কিশোর যাদের অক্ষরজ্ঞান হয়েছে। এছাড়াও 'পশ্বাবলী'(১৮২২), 'পক্ষির বৃত্তান্ত'(১৮৪৪), 'জ্ঞানোদয়'(১৮৩১), 'বিদ্যাদর্পণ'(১৮৫৩), 'সত্যপ্রদীপ'(১৮৬০), 'অবোধবন্ধু'(১৮৬৬), বালকবন্ধু(১৮৭৮), বালক হিতৈষী(১৮৮১), সখা(১৮৮৩), বালিকা(১৮৮৩), বাল্যবন্ধু(১৮৮৩), বালক(১৮৮৫), শিক্ষা(১৮৮৮), শিশুবান্ধব(১৮৯০), 'সাথী'(১৮৯৩)





যা পরে 'সখা ও সাথী'(১৮৯৪) নামে প্রকাশিত হয়, মুকুল(১৮৯৫), শৈশব সখা(১৮৯৬), সন্দেশ(১৯১৩) ইত্যাদি পত্রিকার হাত ধরে বাংলা শিশুসাহিত্য পরিণত হয়েছে।

শুধুই পত্রিকা নয় গ্রন্থের তালিকাটাও দীর্ঘ। যদিও উনিশ শতকের প্রথমদিকে ছোটদের জন্য যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার বেশিরভাগই অনুবাদ এবং দু-একটি লোকজ উৎস থেকে গৃহীত। যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন'(১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮); চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস'(১৮০৫); উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (১৮৩৩); মূলত ছাত্রদের শিক্ষাদানের উদ্দ্যেশে লিখিত হয়েছিল। ১৮৪৭ এ প্রকাশ পায় বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। যা শিশুসাহিত্যকে তার দীর্ঘদিনের জড়তা কাটিয়ে সাবলীল করে তুলেছিল। 'জীবনচরিত'(১৮৪৯), 'বোধদয়'(১৮৫১), ঋজুপাঠ(তিন খণ্ড ১৮৫১-৫২-৫৩), বর্ণপরিচয়(দুইখণ্ড ১৮৫৫), কথামালা(১৮৫৬), চরিতাবলী(১৮৫৬), আখ্যানমঞ্জরীর(১৮৬৩) মধ্যে দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে শুধু নয় পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ১৮৫০এ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', ১৮৫২তে অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র 'চারুপাঠ' উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

এই সাহিত্যধারার চর্চা শুরু হয়েছিল পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা পূরণ করতে, সময়ের সঙ্গে তা সাহিত্যের মোড়ক ধারণ করে। বাংলা প্রাইমারের উদ্দেশ্য ছিল অক্ষর জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা। প্রথম উদ্দেশ্য প্রাইমারেই সীমাবদ্ধ থাকলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য শিশুসাহিত্য বা শিশু-কিশোর সাহিত্যের মধ্যে জারিত হয়। একুশ শতকেও ছোটদের জন্য লেখা যে কোন গল্প আমরা নীতিকথা(moral of the story) দিয়ে শেষ করি। পর পর কতগুলো উপদেশ বাক্য লিখে দিলে তা সহজবোধ্য হলেও ছোটরা পড়ার আগ্রহবোধ করে না। কারণ তারা ঠাকুমা দিদিমার কাছ থেকে রূপকথার গল্প শুনে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই রূপকথার সুন্দর কাহিনির মধ্যে ছিল এক রাজার সাত রানি বা অপুত্রক রাজার পুত্রলাভের জন্য নানা প্রচেষ্টার কাহিনি। যা মনোরঞ্জন করলেও শিশুশিক্ষার পরিপন্থী। তাই শিশুমনের খোরাক মেটাতে কাহিনির সঙ্গে নৈতিকতার উপদেশ মিলেমিশে সৃষ্টি হয় শিশু-কিশোর সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ চর্চার পাশাপাশি শিশুসাহিত্যের চর্চাও করেছেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। যা একেবারেই অনালোচিত। তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে আলোচনা করতে পারি। এক নীতিকথা ধর্মী গল্প, দুই শিশু মনোরঞ্জক গল্প, তিন রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি, তিন রহস্যময় গোয়েন্দা কাহিনি।

**এক**

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী 'শুকতারা'র(১৩৬০,কার্তিক) পাতায় লিখলেন 'জয় পরাজয়'। গল্পের প্রধান চরিত্র ঈশানচন্দ্র শাস্ত্রী। গ্রামের স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক তিনি। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা যখন সেক্রেটারি বনমালী চ্যাটার্জীর হাতের পুতুল হয়ে গেছে তখন

ঈশানচন্দ্র শাস্ত্রীর আদর্শের বিচ্যুতি হয়নি। সেক্রেটারি বনমালী চ্যাটার্জী, বিরাট টাকার মালিক। তার ছেলে রাখাল। পড়াশুনা কিছুই পারে না। ছেলেকে পরীক্ষায় পাস করানোর জন্য বনমালী চ্যাটার্জী স্কুলের শিক্ষকদের পরিবার সহ বাড়িতে ডেকে ভুরিভোজ খাইয়ে খুশি করেন, রাখাল শিক্ষকের স্ত্রীদের কাপড় ,আলতা উপহার দেয়। অন্যদিকে বনমালী চ্যাটার্জীর বাজার সরকার উমাপতির ছেলে গোবিন্দ। সে পড়াশুনায় ভালো। ডবল প্রমোশন পেয়ে ক্লাসে উঠেছে। তাই মাস্টারমশাই ঈশানচন্দ্রের কাছে সে হয়ে উঠেছে স্নেহের পাত্র। আর 'নর' শব্দের ধাতুরূপ না পারার জন্য রাখালকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখেন তিনি। সেক্রেটারির ছেলে রাখাল, অন্য কোন শিক্ষক তাকে কোনদিনও শাসন করেনি। তাই বনমালী চ্যাটার্জী কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, কর্মচারীদের ছেলের সামনে তার ছেলেকে শাস্তি পেতে হবে। তাই সে গোবিন্দর স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ঈশানচন্দ্র শাস্ত্রী মেধাবী গোবিন্দর প্রতি এই অবিচার মেনে নিতে পারেন না। তিনি গোবিন্দকে নিজের দায়িত্বে কলকাতায় নিয়ে যান পড়াশোনার জন্য। প্রকৃত শিক্ষকের কাছে মেধা গুরুত্ব পায় টাকা পয়সার জৌলুস নয়। এই ছোট্ট কথাটাই প্রভাবতী দেবী তাঁর পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রভাবতীর রাখাল আসলে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বেনী' (শিশু শিক্ষা-৩), বিদ্যাসাগরের 'রাখাল' (বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ)এর উত্তরসূরী। আবার গোবিন্দ চরিত্রটি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'সুশীল ও সুবোধ' বালক 'গোপাল'(শিশু শিক্ষা-৩) বা বিদ্যাসাগরের 'গোপাল'(বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ)এর সঙ্গে তুলনীয়। বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়'এর দ্বিতীয় ভাগে ভুবন ও যাদব নামে আরও দুটি চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন। দুষ্টু রাখাল ও যাদবের সামনে শান্তশিষ্ট গোপাল ও ভুবনকে আদর্শ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন বিদ্যাসাগর। প্রভাবতী দেবীও একই পথের পথিক। এমনকি চরিত্রের নামকরণের ক্ষেত্রেও পূর্বজদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

একুশ শতকে এসে গবেষক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন বর্ণপরিচয়ের গোপাল ও রাখাল বাংলা সাহিত্যে কিভাবে বদলে গেছে। তিনি বলেছেন:

বিদ্যাসাগরের 'গোপাল' ও 'রাখাল'রা কেবল বর্ণপরিচয় নয়, গোটা বাংলা শিশুসাহিত্য ছেয়ে আছে : বিভিন্ন নামে, নানা বেশে, নানা চেহারায় তারা দেখা দিয়েছে। ওই দুই আদিরূপের মধ্যে সংঘাত উনিশ এবং বিশ শতকের বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য, অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ।[১]

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলতে পারি বর্ণপরিচয়ের একশো বছর পরে প্রভাবতীর সাহিত্যে এই সংঘাত স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। 'দেবালয়ের প্রদীপ'এর উদয়ন বা 'মানিক জোড়'এর শান্ত এই সংঘাতের ফসল। তাদের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখিকা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

শুধুই সুবোধ বালক নয়, পাশাপাশি সমাজের প্রতি একজন মানুষের দায়িত্ব বিষয়েও পাঠককে সচেতন করেছেন।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বর্ণপরিচয়-এর দেড়শো' বছর নামের প্রবন্ধে বলেন

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম প্রকাশের পর আজ দেড়শো বছর ধরে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ বাঙালি শিশুর বিদ্যারম্ভের প্রথম সোপান হিসেবে আদৃত হয়ে আসছে। তবে এই দীর্ঘ সময়ের অবকাশে বাঙালির জীবনে প্রভূত ওলটপালট ঘটে গেছে। বাংলা ভাষার ব্যবহারেও ঘটেছে প্রচুর অদলবদল। সেদিনকার সমাজ আর মূল্যবোধের সঙ্গে আজকের সমাজ আর মূল্যবোধের ফারাক অনেকখানি। তাই স্বীকার করতে হবে বিদ্যাসাগরের প্রাইমার নানা দিক দিয়ে তার উপযোগিতা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছে।[২]

বাংলা প্রাইমারের সময় পেরিয়ে প্রায় একশো বছর পর প্রভাবতী দেবী, গল্পের মধ্যে ছোটদের সামাজিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি পিতামাতা, শিক্ষকের চারিত্রিক বিবর্তনের দিকটিও স্পষ্ট করে তুলেছেন। যে সমস্ত শিক্ষক ভেট নিয়ে রাখালের মতো ছেলেকে প্রশ্রয় দেন বিদ্যাসাগরের সময় সেরকম শিক্ষক হয়তো ছিলেনই না। আজকের শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রভাবতীর সময় থেকে প্রায় ৫০-৬০ বছর পেরিয়ে এসেছে। তাই কালের নিয়মে প্রভাবতীর মূল্যবোধের সঙ্গে আজকের মূল্যবোধের পার্থক্য খুব স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগর যেমন নীতিহীন 'মাধব'কে মেনে নিতে পারেননি, একই ভাবে প্রভাবতী দেবীও রাখালকে আপরাধী করে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। প্রাইমারের সময় থেকে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য এই একুশ শতকে এসেও একই যত্নে শিশুর বোধের বিকাশের সহায়ক হয়ে পরিবেশিত হয়েছে। শিশুসাহিত্যিকরা মনোরঞ্জনের পাশাপাশি শিশুশিক্ষার প্রতিও সমান যত্নশীল থেকেছেন।

**দুই**

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী রচিত 'প্যাগোডার দেশে', 'দুই দৈত্য' এবং 'আসামের জঙ্গলে' এই তিনিটি বই 'অনুপ্রভা সিরিজ'এ 'শরৎ সাহিত্য ভবন' থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে প্রকাশিত ২২টি গল্পের মধ্যে নীতিকথা, রূপকথা ধর্মী গল্প ছাড়াও আছে পশুকথা। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'যেমন কর্ম তেম্নি ফল' গল্পটি। একেবারে পঞ্চতন্ত্রের আদলে তৈরি। 'সিঞ্চাদোর মেয়ে' গল্পে লেখিকা রূপকথার পটভুমি তৈরি করার চেষ্টা করেছেন ঠিকই কিন্তু পরিণতিতে বাস্তবেই ফিরে এসেছেন। আসলে প্রভাবতীর সময়টা রূপকথার গল্পকে পেরিয়ে এসেছিল। এই 'অনুপ্রভা সিরিজ' প্রকাশ হয়েছিল ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের পূজোর উপহার স্বরূপ। এর প্রতি কপির দাম ছিল একটাকা। সে সময় শিশু-কিশোরের নিত্য নতুন বিনোদনের জন্য টিভি, কম্পিউটার বা মোবাইল ছিল না। তাই শিশুমনের খোরাক পূরণ করতে একই বছরে একটা সিরিজে,

শুধুমাত্র প্রভাবতী দেবীর ২২ টি গল্প প্রকাশ পায়। শিশু-কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে সেইসময়ে প্রভাবতী দেবী খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

**তিন**

প্রভাবতী দেবী শিশু-কিশোরদের জন্য যেসব সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তারমধ্যে অন্যতম একটি হল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। যেমন'আটলান্টিকের তীরে', 'ইথিওপিয়ার বন্দী', 'ভূমধ্যসাগরের যাত্রী', 'কোহিমার পথে'। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধনে এই কাহিনিগুলো লেখা হয়েছে। বিশ শতকের তিনের দশকের পর থেকে এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলো লেখা শুরু হয়। এক্ষেত্রে প্রভাবতীর উত্তরসূরী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০এ প্রকাশিত তাঁর 'যকের ধন', 'আবার যকের ধন', 'মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার', 'অজানা দ্বীপের রানী' সব মিলে প্রায় ষাটটি রোমাঞ্চ কাহিনি লিখেছেন তিনি। এছাড়াও সুনির্মল বসুর 'মরণ ফাঁদ'(১৯৩৫), 'আদিম দ্বীপে'(১৯৪০), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়'(১৯৩৮), 'হীরা মাণিক জ্বলে(১৯৪৬) ইত্যাদি আরও অনেক গল্পকারের গল্প এই সময় জনপ্রিয়তা পায়। এদের উত্তরসূরী প্রভাবতী দেবী।

'আটলান্টিকের তীরে', 'ইথিওপিয়ার বন্দী'(অভিযান সিরিজ), 'ভূমধ্যসাগরের যাত্রী'(অলকনন্দা সিরিজ) নামের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিতে যাত্রাপথের বর্ণনা, বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক তথ্য, সেখানকার আদিবাসীদের জীবন যাত্রার কথা লেখিকা পাঠকদের জানান। 'আটলান্টিকের তীরে' গল্পের নায়ক প্রতুল। সে ডাক্তারি পাস করে গ্রামের একটি ডাক্তারখানায় কুড়ি টাকা বেতনে কাজ করে। আর মনে মনে একটা স্বপ্নকে লালন করে ছোটবেলার ভূগোলের বইয়ে পড়া আফ্রিকা মহাদেশের জঙ্গল, জানোয়ার সে দেখবে। শান্তপল্লীর বৈচিত্র্যহীন জীবন তাঁর ভালো লাগে না। এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় 'চঁদের পাহাড়'এর শঙ্করের কথা। প্রতুল ডাক্তারির চাকরি নিয়ে যায় গাম্বিয়ার বেথার্স শহরে। যাত্রাপথের সুন্দর বর্ণনা লেখিকা দিয়েছেন। বোঝা যায় শিশুমনে পৃথিবীর মানচিত্রের স্পষ্ট ছবি তিনি আঁকতে চেয়েছিলেন এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামলো এইখানে জাহাজ প্রবেশ করবে লোহিত সাগরের মধ্যে যার একদিকে এশিয়া আর একদিকে আফ্রিকা।[৩]

শুধুই পথের বর্ণনা নয় আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গল্পের ছলে বলে যান লেখিকা। এর পাশাপাশি রয়েছে রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি। বাঘ সিংহ, কুমীর শিকারের গল্প। জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচলেও অসভ্য পিগমিদের কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ অবস্থা হয় প্রতুল ও তার সঙ্গী মিঃ গ্রেভিসের। একইভাবে 'ইথিওপিয়ার বন্দী' কাহিনিতে রয়েছে গাল্লা সম্প্রদায়ের কথা। গাল্লাদের পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, ধর্মাচরণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিয়েছেন প্রভাবতী দেবী। বন্দী অবস্থায়





শক্তিনাথকে, গাল্লারা গোরু, ভেড়া, ঘোড়ার ঠ্যাং ঝলসানো অবস্থায় খেতে দেয়। লেখিকা এখানে শিশুমনে অতিরঞ্জিত কল্পনার বীজ বুনেছেন একই সঙ্গে গাল্লাদের বাসস্থান 'টুকুল' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আবার 'ভূমধ্যসাগরের যাত্রী' গল্পে বাঙালি ছেলে দেবল মিশররের মরুভূমিতে উটের পিঠে বসে বেদুইনদের সঙ্গে বীরের মতো যুদ্ধ করেছে। রহস্য-রোমাঞ্চর সঙ্গে সহজ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন কখনো উট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য, কখনো আলবার্টরস (albatross) এর কথা, কখনো বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আবার সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এই সব মিলিয়ে প্রভাবতীর অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ হয়ে উঠেছে ছোটদের সহায়ক পাঠ।

**চার**

প্রভাবতী দেবীর সাহিত্য চর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর গোয়েন্দা সাহিত্য। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রের স্রষ্টা। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, কুমারিকা সিরিজ, কৃষ্ণা সিরিজ ও প্রহেলিকা সিরিজে কৃষ্ণা ও শিখা নামে যে গোয়েন্দা চরিত্রদুটি তিনি সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার সূচনা করে। গোয়েন্দা সাহিত্য কবে প্রথম লেখা হয়েছিল তার তারিখ সময় নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ধারণা করা হয় ঋক বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে প্রথম গোয়েন্দার উল্লেখ আছে। সেখানে সরমা নামে এক কুক্কুরীর সাহায়তায় দেবতারা তাদের হারিয়ে যাওয়া গোরু পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে বিখ্যাত 'আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যুর' কাহিনি। সেখানে গৃহস্থের অল্পবয়সী পরিচারিকা বুদ্ধির জোরে চল্লিশ জন দস্যুর প্রাণ নেয়। গোয়েন্দা সাহিত্য যখন সেভাবে গড়ে ওঠেনি সেই সময় দস্যুদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে একজন নারীর ভূমিকা সত্যি তাৎপর্যপূর্ণ। আমেরিকায় গোয়েন্দা উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় লেখিকা অ্যানা ক্যাথরিন গ্রিনের(১৮৪৮-১৯৩৫) লেখনীতে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রিনের সৃষ্ট দুটি গোয়েন্দা চরিত্রই নারী। একজন এমিলিয়া বাটারওয়ার্থ ও অপরজন ভায়ালেট স্ট্রেঞ্জ। ব্রিটিশ মহিলাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ডেম আগাথা ক্রিস্টি। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র মিস্ মার্পল।

বাংলা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দার আবির্ভাব বিশ শতকে প্রভাবতী দেবীর হাত ধরে। গোয়েন্দা পেশায় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সাহসিকতারও প্রয়োজন, বাঙালি মেয়েদের সেই সাহস দেখাতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। প্রভাবতী দেবীর পূর্ববর্তী নারী সাহিত্যিক সরলাবালা দাসী, সুষমা সেন, প্রতিভা বসু, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রমুখের কলমে গোয়েন্দা কাহিনি সৃষ্টি হলেও সেখানে পুরুষ গোয়েন্দাদেরই জয় জয়াকার। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি' এবং প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের 'ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি' এই দুই গল্পে মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র আছে। বিন্দিপিসি কাঁথা সেলাই করতে করতে একটি হত্যা রহস্যের সমাধান করেন; অন্যদিকে মৃত ঠাকুরদার হত্যাকারীকে কীর্তনের আসরে বসে ধরে ফেলেন

ঠাকুরমা। এই গোয়েন্দাপিসি ও ঠাকুমার পরে প্রভাবতীর কৃষ্ণা ও শিখা একেবারে অন্য ধারার চরিত্র।

কৃষ্ণা একজন সাহসী মেয়ে, পরিস্থিতি তাকে গোয়েন্দা তৈরি করে। 'গুপ্তঘাতক' ও 'হত্যার প্রতিশোধ' গল্পদুটি বালিকা কৃষ্ণার গোয়েন্দা কৃষ্ণা হয়ে ওঠার গল্প বলে। কৃষ্ণা ১৬/১৭ বছরের বালিকা হলেও বেশ দায়িত্বপরায়ণ।

এই বয়সে কৃষ্ণা মাতৃভাষা ছাড়া আরও পাঁচ-সাতটি ভাষা শিখিয়াছে। কেবল শিখিয়াছে বলিলেই হইবে না, যে কোনো ভাষায় সে অনর্গল কথা বলিতে পারে, পড়িতে পারে। পিতা তাহাকে অশ্বারোহণে পারদর্শিনী করিয়াছেন, মোটর সে নিজেই চালায়, পিতার সহিত বর্মার জঙ্গলে সে বহু শিকার করিয়াছে। উপযুক্ত ব্যায়ামের ফলে তাহার দেহ সুগঠিত, শক্তিশালিনী, দেহে যেমন তাহার অটুট শক্তি অন্তরে তাহার তেমনই অকুতো -সাহস।[৪]

বাংলা সাহিত্য এরকম নারী চরিত্র দেখলো এই প্রথম। মেয়েদের দুর্বলতা ভীরুতার অপবাদকে তিনি মানতে চাননি। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্র কৃষ্ণা ও শিখা সাহসে, বুদ্ধিতে, অস্ত্রচালনায় পারদর্শী।

'গুপ্তঘাতক' ও 'হত্যার প্রতিশোধ' আলাদা কোন গল্প নয়। একই গল্পের দুটি পর্ব বলা যায়। 'গুপ্তঘাতক' এ ইউউইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য মিঃ চৌধুরী কৃষ্ণাকে নিয়ে বর্মা থেকে কলকাতায় আসে। কলকাতায় ইউউইন হত্যা করে মিঃ চৌধুরীকে। 'হত্যার প্রতিশোধ' গল্পে কৃষ্ণা ইউউইনকে ধরার জন্য বর্মায় যায়। বাবা ও মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে কৃষ্ণা একজন সাধারণ কলেজ পড়ুয়া থেকে হয়ে ওঠে গোয়েন্দা। এই দুই বইয়ের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে দেব সাহিত্য-কুটীর থেকে প্রকাশিত হয় 'কৃষ্ণা সিরিজ'। এই সিরিজের প্রথম বই 'কারগারে কৃষ্ণা'। যার শুরুতেই লেখা আছে স্কুল-কলেজের মেয়েদের ডিটেকটিভ উপন্যাস।[৫]

এই উপন্যাসে কৃষ্ণা একেবারে পূর্ণ গোয়েন্দার চরিত্রে অবতীর্ণ হয়। 'মায়াবী ও কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণার অভিযান', 'কৃষ্ণার পরিচয়', 'বনে জঙ্গলে কৃষ্ণা', 'মুক্তি-পথে কৃষ্ণা', 'কৃষ্ণার জয়যাত্রা' প্রভৃতি কাহিনির মধ্যে দিয়ে গোয়েন্দা কৃষ্ণা আরও পরিণত হয়েছে। একজন পেশাদার গোয়েন্দা হিসেবে তার পরিচিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—

আপনার নাম শুনেছি কৃষ্ণা দেবী,—বাঙালাদেশের মেয়ে — ডিটেকটিভ! নতুন ব্যাপার! আপনিই প্রথম এ কাজে নেমেছেন। আপনার খ্যাতি শুনে শুধু আমরা নই, আরও অনেকে ভাবে আপনার বয়স হয়েছে। কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, তা ভাবতে পারিনি। আমার মেয়ে আপনার চেয়ে বয়সে বড়। এই বয়সে আপনি এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সত্যই আশ্চর্য![৬]

আশ্চর্য শুধু এইটুকুই নয় এরপর কৃষ্ণার যোগ্য উত্তরসূরী শিখার আবির্ভাব। কৃষ্ণা তার



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

মা বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গোয়েন্দা হয়, শিখার আবির্ভাব গোয়েন্দা হয়েই, সে শখের গোয়েন্দা তথা প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। 'বিজয়িনী শিখা', 'শিখা ও সবিতা', 'রহস্যময়ী শিখা', 'দুর্গম পথে শিখা', 'শিখার আবিষ্কার' 'শিখার ছদ্মবেশ', 'শিখার অগ্নিপরীক্ষা' ইত্যাদি কাহিনির মধ্যে দিয়ে বাংলা কিশোর সাহিত্য প্রথম কিশোরীর বীরত্বের কথা বললো।

প্রভাবতী দেবীর শিশু-কিশোর সাহিত্যের সৃষ্টিতে যে ধারাগুলো আমরা পাই তা বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই এসেছে একথা লেখাই বাহুল্য। শিশু-কিশোর সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় নারী গোয়েন্দা চরিত্রের সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি নতুন মাইলফলক তৈরি করলেন যার বিবর্তিত রূপ আজকের মিতিন মাসি, গোয়েন্দা গার্গী বা গোয়েন্দা রুদ্রাণীরা।

**তথ্যসূত্র :**


১। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস। কারিগর, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পৃ.২৯।

২। মুখোপাধ্যায় অমিতাভ। 'বর্ণপরিচয়-এর দেড়শো বছর', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১১২ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, পৃ.১৬৮।

৩। সরস্বতী দেবী, প্রভাবতী। আটলান্টিকের তীরে। মর্ডাণ ইণ্ডিয়া প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ । পৃ.১৪

৪। সরস্বতী দেবী, প্রভাবতী। গুপ্তঘাতক। দেব সাহিত্য-কুটীর। পৃ.২০

৫। সরস্বতী দেবী, প্রভাবতী। কারাগারে কৃষ্ণা। দেব সাহিত্য-কুটীর। পৃ.১

৬। রণিতা চট্টোপাধ্যায়, (সম্পা), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, গোয়েন্দা কৃষ্ণা , প্রথম প্রকাশ, দেব সাহিত্য কুটীর , জানুয়ারী ২০২০ ,পৃ.৩১৭

# সত্যজিৎ-সাহিত্যে লিঙ্গ রাজনীতি : তত্ত্ব, বিতর্ক ও সুলুকসন্ধান

**অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়**

সাহিত্য-রচয়িতা হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের আগমন কিছুটা ব্যতিক্রমী। ১৯৬১ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় নবপর্যায়ের 'সন্দেশ' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে গুরুতর অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত টানা লিখে গেছেন তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার জন্য। ফেলুদা, শঙ্কু, তারিণীখুড়োর মতো চরিত্র-সৃষ্টি ছাড়াও 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু', 'খগম', 'ক্লাস ফ্রেন্ড', 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর'-এর মতো অনন্যসাধারণ গল্প এবং 'ফটিকচাঁদ'-এর মতো উপন্যাস যেকোনো সাহিত্যিকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। সৃজনের যথার্থ কদর হলেও পাঠকের চোখে এর লিঙ্গগত একমাত্রিকতা চোখ এড়িয়ে যায়নি। সেই একমাত্রিকতা থেকেই জন্ম হয়েছে বিতর্কের; যাতে স্বয়ং লেখককেও আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু কথা বলতে হয়েছে। বিতর্কের মূল সুরটি অভিযোগের — নারীচরিত্র এতো কম কেন ? এবং সেখান থেকে বিতর্ক মোড় নেয় আরো অন্যদিকে — তথাকথিত ছোটদের লেখায় নারীচরিত্র ও 'বয়স্ক' উপাদানের সমীকরণ।

গবেষক-সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন —

ছোটদের প্রবেশ নেই এমন একান্ত বয়স্ক উপাদান এড়িয়ে গিয়েছেন সত্যজিৎ। এর ফলে লেখায় অবশ্য এক ধরনের সীমাবদ্ধতাও এসে যায়। যেমন পুরুষ-নারী সম্পর্কের সব জটিলতা তাঁকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়েছে। পাছে সেই বিপদে পড়তে হয় , তাই তাঁর গল্পে মেয়ে চরিত্র প্রায় নেই। তাঁর গল্পের জগৎ শুধু পুরুষের পৃথিবী।[১]

বক্তব্য থেকে বাচ্যার্থ ধরতে অসুবিধা হয় না ; নারীর অনুষঙ্গে জটিলতা (মূলত যৌনতাকেন্দ্রিক) এলে ছোটদের লেখার 'পবিত্রতা' নষ্ট হবে। অতএব সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাজ্য না হয়ে পারে না। আধুনিক পৃথিবীর উত্তর উপনিবেশবাদ, নারীবাদ, পরিবেশবাদের আবহে স্বাভাবিকভাবেই এই বাচ্যার্থ নিয়ে মুক্তচিন্তকদের মধ্যে আপত্তি উঠেছে বহুকাল ধরেই। নারীর সঙ্গে যৌন জটিলতা এবং কৈশোরের বিষম সম্পর্কের সরল সমীকরণ যথার্থই জোরালো নয়। তাই সত্যজিৎ রায়ের শতবর্ষ পেরিয়ে হালের আধুনিক কালের সমালোচক আরেকটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন —

সত্যজিৎ রায় তো বিশের দশকের সুকুমার রায়ের প্রজন্মের নন , তাঁর গল্পগুলো তো প্রকাশ পাচ্ছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তর দশক, আশির দশক জুড়ে, তাও তিনি কেন এত স্বচ্ছন্দ হবেন শুধুই পুরুষ চরিত্র নির্মাণে, আর ছোটদের গল্প থেকে পুরোপুরি বাদই দিয়ে দেবেন মেয়েদের?[২]

এই ক্ষুব্ধ প্রশ্ন থেকেই সমালোচক যশোধরা রায়চৌধুরী তুলে আনেন ভেতরের লিঙ্গ-রাজনীতির বিষয় —





মহাপুরুষরা বাণী দেন, উপদেশ দেন, কামিনীকাঞ্চন উভয়ের থেকে দূরে থাকার। এই দর্শন বলে, নারী নরকের দ্বার। কচি সুকুমার কিশোরদের মনে নারীর সঙ্গ আর অনুষঙ্গ দুইই তো বিশেষভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। তাই স্ক্রাবার ও সাবান চাই, চাই ঝকঝকে পবিত্র নারী-বর্জিত কিশোর সাহিত্য। ১৮০০ শতক বাহিত এই মূল্যবোধ ১৯৭০-৮০ অব্দি অতিমাত্রায় সক্রিয় থেকে গেছে। যাকে বলে চরিত্রগুলো ডেটল আর ফিনাইল দিয়ে মোছা, ভিক্টোরীয় মুল্যবোধে চোবানো।[৩]

অন্যদিকে বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণও সমান উল্লেখের দাবি রাখে। সম্প্রতি (২০২১) বৈদ্যুতিন সংবাদ পত্রে আলোচক তাপস দাস লিখেছেন—

মহিলা জাতি সম্পর্কে কোনো অবমাননাকর উক্তি করা তো দূরে থাক, পঁয়ত্রিশটি ফেলুদা কাহিনীতে কোথাও লিঙ্গবিভাজন সংক্রান্ত মহিলাদের কোন সীমাবদ্ধতা দেখানোর সামান্যতম প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ চেষ্টা করা হয়নি। ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দাগিরিতে এমন কোন ঘটনার, আলোচনার অথবা পরিকল্পনার উল্লেখ নেই যার মাধ্যমে জেন্ডার ইকুয়ালিটির সামান্যতম ভায়োলেশন হয়েছে এমন অভিযোগ আনা যেতে পারে। যদিও ফেলুদার উপন্যাসে সিগনিফিক্যান্ট মহিলা চরিত্র কম এসেছেন, কিন্তু যখন এসেছেন তখন তাঁরা বর্ণময় এবং অ্যাপ্রিসিয়েশনের যোগ্য হয়েই এসেছেন, উপরের উদাহরণগুলো দেখার পরে সে ব্যাপারে কোনো বিবাদ থাকার কথা নয়। ফলত, সাধারণভাবে তো দূরস্থান, এমনকি মেল গেজের (male gaze) ধোয়াঁটে উপপ্রমেয় প্রয়োগ করেও ফেলু মিত্তিরের কোনো কার্যকলাপকেই পুরুষতান্ত্রিক বলা যাবে না। শুধুমাত্র মহিলা চরিত্র কম, সেই কষ্টকল্পনা দিয়ে ফেলুদার কাহিনীতে লিঙ্গবিভাজনের তত্ত্ব দাঁড় করাতে গেলে তা অতিসাধারণীকরণ, অগভীর একদেশদর্শিতা এবং উদ্দেশ্যমূলক হবে।[৪]

আলোচ্য কিশোর কিশোরীদের জীবনে 'প্রেমের' অভাব বিষয়ে তাঁর পরের কথাগুলি আরো যুক্তিযুক্ত —

এটাও ভুলে গেলে চলবে না, উপরের বক্তব্যের কিশোর কিশোরীরা ষাট সত্তর আশির দশকের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠা ইন্টারনেটহীন, কম্পালসারি ডেটিং (বান্ধবী/বিশেষ পুরুষ বন্ধু না থাকলে মান থাকে না) হীন কিশোর কিশোরী। 'প্রেমের' কথা আলোচনা করতে যাদের লজ্জায় কান লাল হয়ে যেত এবং তা আড়ালে আড়ালে গুজগুজ ফুসফুস করেই হত শুধু, মা বাবার বা পরিবারের কোন গুরুজনের সামনে নৈব নৈব চ। ফলে চোদ্দ বছরের তোপসের ঘোষিত গার্লফ্রেন্ড থাকবে, এই আশা করাটাই অন্যায় — বিশেষত যে টাইমলাইনে ফেলুদা লেখা হচ্ছে। ষাট সত্তর আশির দশকে সন্দেশ পত্রিকায় প্রেমের গল্প বেরোচ্ছে — ব্যাপারটা আদৌ কল্পনা করা যায় কি? কিন্তু এখন আনন্দমেলায় দিব্বি প্রেমের গল্প বেরোচ্ছে, পান্ডব গোয়েন্দা পর্দায় এনে বাচ্চু প্রেমে পড়ছে বাবলুর এবং

ঘুরে ঘুরে গান গাইছে। সময় এবং সমাজের একটা প্রভাব তো শিশু/কিশোর সাহিত্যের ওপরে অবশ্যই থাকবে, থাকতে বাধ্য। ২০২১ সালের আবহে বসে, ষাটের দশকে কিশোর সাহিত্যে মহিলা চরিত্র ছিল না ফলে সেই সাহিত্য রিগ্রেসিভ — এভাবে দেগে দেওয়া মূর্খের কাজ।[৫]

দুই পরস্পরবিরোধী মতের আবহে শেষমেশ সত্যজিতের সাহিত্যের জোরই প্রমাণিত হয়; যেখানে এক পক্ষ আরো প্রত্যাশায় নারী-পুরুষের সমান পরিসর চেয়ে বৈচিত্র্য দাবি করেন, আরেক পক্ষ সমকালীন সামাজিক ও মানসিক কাঠামোর প্রসঙ্গ তুলে প্রথম পক্ষের অভিযোগের যাথার্থ্য বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং সাহিত্যের উৎকৃষ্টতা দেখেন। কিন্তু উভয়ই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য সত্যজিতের কলমকে; গ্রহণযোগ্যতার আবশ্যিক স্তরটুকু না পূরণ হলে পরবর্তী চাহিদার আবির্ভাব সম্ভব নয়।

কিন্তু এই বিতর্কের কতোটা সত্যি ? কতোটা গ্রাহ্য দুই পক্ষের যুক্তি ?

এইসব প্রশ্নের উত্তর থেকে নিছক বিতর্কের আবহ থেকে গিয়ে পড়তে হয় তত্ত্বের পরিসরে, যেখানে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ডে এই 'তথাকথিত' বিতর্কের কারণ ও সুলুকসন্ধান মেলে।

**তত্ত্ব ও সুলুকসন্ধান :**

যেকোনো মানুষ তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মানসিক কাঠামো নিয়ে বেড়ে ওঠেন। অনেক বদল এলেও খাঁটি মানসিক গঠনটি মূলত এক থাকে। সত্যজিৎ রায়ের পরিমণ্ডল থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে পড়ে —

১. ঔপনিবেশিক কালের ছোটবেলা - সুতরাং ব্রিটিশ শিক্ষার অভীপ্সিত কিছু বৈশিষ্ট্য তৎকালীন সমস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালিকেই মানসিক ভাবে প্রভাবিত করেছিলো।

২. ব্রাহ্ম পরিমণ্ডল — অনেক মুক্তচিন্তা ও সংস্কারমুক্ততা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরিবারগুলি কিছু বিষয়ে সন্দিহান ও দ্বিধাগ্রস্ত থাকতেন।

৩. সত্যজিতের শৈশবের ও কৈশোরের নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা

ঔপনিবেশিক শৈশব ও কৈশোরে যেকোনো সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালি পরিবারের ইংরাজি চর্চা একটি সাধারণ বিষয় ছিলো। বিশেষ করে কিশোর বয়সের কল্পনাপ্রবণ জগতের কাছে ইংরাজি সাহিত্যের অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা এবং শিকার কাহিনির গুরুত্ব আজও অপরিসীম। সত্যজিৎ রায়ের কৈশোর মূলত কেটেছে এইসমস্ত তথাকথিত মূলধারার জনপ্রিয় সংরূপের নিবিড় পাঠের মাধ্যমে। তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আশিস নন্দীর মূল্যবান কিছু বক্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণীয় —

Ray's popular fiction is set in a nearly all-male world, the tendency is even more apparent in his fiction, Women enter this world rarely and as subordinate presences – much as they do in





classical Victorian thrillers – in Arthur Conan Doyle's and G.K. Chesterton's works. even Ray's science fiction introduces a similar doubling (255-56)

ঔপনিবেশিক সময়ের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের পক্ষে ধ্রুপদি ইংরাজি উপন্যাসের আঙ্গিক ও বিষয়ের অনুসরণ, হোক তা অজান্তে, প্রায় অবধারিত ছিলো। সুতরাং সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যভুবনে পুরুষ-আধিপত্য অনেকটাই সময়ের ফলশ্রুতি। ব্যক্তিগত পাঠাভ্যাসেও সত্যজিৎ উল্লিখিত লেখকদের অনুরাগী ছিলেন; মনস্তত্ত্ব বিচারে লেখকের পাঠ-পরিসর বৈজ্ঞানিক কারণেই তাঁর চরিত্রের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। তাই সত্যজিতের লেখার পক্ষে পুরুষচরিত্রের আধিক্য অভিযোগের ভাগী হতে পারে না।

ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলের বিষয়টিও সমান তাৎপর্যপূর্ণ; মুক্তচিন্তা সত্ত্বেও নারী-পুরুষ বিষয়ে কিছু রক্ষণশীলতা ব্রাহ্ম সত্যজিতের পক্ষে অনিবার্য ছিলো। তাই কিশোরদের রচনায় নারী চরিত্র এনে তাঁদের মুখ্য জায়গা দেওয়া বিষয়ে তাঁর অস্বস্তির কারণ ছিলো। অন্যদিকে ব্রাহ্ম নৈতিকতা ও চিন্তন প্রক্রিয়াও ঔপনিবেশিক কালের ফসল, সুতরাং ব্রিটিশ চিন্তন কোনো না কোনো সূত্রে অবশ্যই ব্রাহ্ম ভাবধারাকে প্রভাবিত করেছিলো। একই কথা আশিস নন্দী বলছেন—

By the time Satyajit was born – the family culture had become – through the Brahmo connection with late Victorian culture– aggressively Anglophile.[৬]

সুতরাং একদিকে ব্রিটিশ-আনীত ভিক্টোরিয়ান শুদ্ধতা ও অন্যদিকে দেশীয় ব্রাহ্ম ঐতিহ্যের মিলিত সমাগমে সমৃদ্ধ রায় পরিবারের সন্তান সত্যজিৎ তাঁর কিশোরসাহিত্যে নারী-পুরুষের সমান অবস্থান দেখাবেন — এই আশা অমূলক।

কিন্তু পাঠকসমাজের চাপে শেষ পর্যায়ের ফেলুদা-কাহিনিতে তিনটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র এনেছিলেন লেখক সত্যজিৎ; 'শকুন্তলার কণ্ঠহারে' শীলা, যে ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে আগ্রহী এক আধুনিকা, 'ডঃ মুনসীর ডায়েরি'-তে ডাক্তার মুনসীর স্ত্রী ডলি, যিনি নিজেই হত্যার মূল হোতা এবং 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ নীলিমা , মূল্যবান টেপটি ফেলুদার হাতে তুলে দিয়ে যিনি রহস্য উদঘাটনের রাস্তা খুলে দেন। অল্প পরিসরে 'বোসপুকুরে খুনখারাপি'-র ভাইঝি লীনাও বেশ উজ্জ্বল। অবশ্য 'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য'-এর টিনা খুবই নিষ্প্রভ, বৃদ্ধ সত্যজিতের সেই অক্ষমতা এক্ষেত্রে বিচার্য হবে না। কিন্তু বাকি তিনটি চরিত্র আশিস নন্দী কথিত নারীর 'সাবঅর্ডিনেট প্রেজেন্স' বা গৌণ উপস্থিতির বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেয়, এঁরা কেউই গৌণ নন, ডলি মুনসী তো ননই। তবে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ সত্যি; 'অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু' গল্পে টিপুর মা, 'অতিথি' গল্পে অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও বাবলুর মা বা সত্যজিতের রূপকথাগুলিতে রাজকন্যার চরিত্ররা কেউই তেমন

গুরুত্বপূর্ণ নন, তাঁদের উপস্থিতি গল্পের ঘটনায় নতুন উপাদান যোগ করে না বা প্রভাবিতও করে না সে অর্থে। সুতরাং অভিযোগের সত্যতাও আছে। তা অনস্বীকার্য নয়।

সত্যজিতের শৈশব, বিশেষত কৈশোরের কিছু সীমাবদ্ধতাও তাঁর কথনবিশ্বের পরিসীমা নির্ধারণে প্রভাব ফেলেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথমত, মূলত পুরুষ অধ্যুষিত শিক্ষায়তনের পাঠ সত্যজিতকে দেখিয়েছিলো মূলত একটি লিঙ্গ পরিচয়ের যাবতীয় আবেগ ও কার্যকলাপ। এমনকি পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনের কমার্শিয়াল আর্টের প্রশিক্ষণেও তাঁর ঘনিষ্ঠ বর্গের সবাই পুরুষ, পরবর্তী কর্মক্ষেত্রও। বহু বৈচিত্র্যময় পুরুষ চরিত্র বাস্তবে প্রত্যক্ষ করার ফল ফলেছে সাহিত্যে এবং আকৈশোর নারী মনের বিবর্তন ও রকমারি অনুভূতির ওঠাপড়া নিজের গল্পে লেখার মতো করে তিনি দেখেননি। মনে রাখতে হবে তাঁর চলচ্চিত্রের স্মরণীয় নারীচরিত্রের প্রায় সবাই অন্য লেখকের কলমের সৃষ্টি।

দ্বিতীয়ত, কৈশোরের এই অজানিত অভিজ্ঞতা থেকেই পরবর্তীকালে সত্যজিতের মধ্যে নারীর বুদ্ধি, মনন ও বিবর্তনের প্রতি ঝোঁক ধরা পড়েছে চলচ্চিত্রে। সাহিত্যে পড়েনি। অধ্যাপক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় তাঁর বইতে একটি দরকারি বক্তব্য রেখেছেন —

I would still like to indicate that Ray seems to be fascinated with the idea of girls growing into women through processes unknown to boys. Perhaps– since tracking childhood demystifies the adult– Ray avoided developing his ideas on universal childhood and focused on boyhood alone.[৭]

কিশোরী থেকে নারী হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়া যে অর্থে সমাপ্তি, চারুলতায় বিধৃত এবং নারীত্বের বহুধা অভিমুখ চলচ্চিত্রে তিনি দেখতে চেয়েছেন, তা সাহিত্যে সম্ভব ছিলো না। ছোটবেলার রহস্যময় মধুরতা বজায় রাখতে তাই 'ইউনিভার্সাল' ছোটবেলার বদলে শুধু 'ছেলে'বেলাই যুক্তিযুক্ত ছিলো তাঁর পক্ষে। এবং শেষে, নিজের কৈশোরের একাকিত্ব ও অভিজ্ঞতা অবশ্যই তাঁকে প্রভাবিত করেছে একাধিক চরিত্রচিত্রণে, সেখানে নিজের লিঙ্গপরিচয়ের কারণেই পুরুষের আনাগোনা বেশি।

একই কথা বলেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় —

girls should indeed have a childhood – except that he – from his position of masculinity – did not have the privilege of seeing it.[৯]

**কথাশেষে :**

ইতিমধ্যেই শতবর্ষ অতিক্রান্ত। নানা বিতর্কে, মতে ও ভিন্নমতে সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য, ছোটদের জন্য লেখা হলেও তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পেরেছে। ভবিষ্যতে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ ও ব্যাখ্যা এসে সাহিত্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে পাঠক ও





সমালোচককূলকে। সত্যজিৎ রায় নিজে তাঁর সাহিত্যকৃতিকে তেমন গুরুত্ব না দিতে চাইলেও বাংলা সংস্কৃতিতে তাঁর অনস্বীকার্য ভূমিকা বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও গবেষকদের নতুন করে ভাবাতে বাধ্য করে। এই প্রবহমানতার মধ্যেই সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যের সার্থকতা। তাই লিঙ্গ, সমাজ, ইতিহাস নিয়ে তাঁর সাহিত্যবিচারের প্রবণতাও একই মানদণ্ডে সার্থক।

**তথ্যসূত্র :**

১। গুপ্ত, ক্ষেত্র; "সত্যজিৎ : ছোটোদের লেখক, বড়োদেরও"; সত্যজিতের সাহিত্য; অভিযান পাবলিশার্স; ২০১৮; পৃঃ ১৬

২। রায়চৌধুরী, যশোধরা; "কিশোর সাহিত্য বিষয়ে এক কিশোরীকে"; ক্রোড়পত্র : শতবর্ষে সত্যজিৎ, মল্লার, ২১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; ২০২২; পৃঃ ৩৩০

৩। তদেব; পৃঃ ৩৩২

৪। দাস, তাপস; "ফেলুদার চরিত্রায়ন কি পুরুষতান্ত্রিক?" ; ttps-nagorik.net.opinion' satyajit Ray birth-centenary-feluda-characterization.; ২০২১

৫। তদেব

৬। Nandy– Ashis—"Satyajit Rat's Secret Guide to Exquisite Murders" — The Savage Freud and other essays on possible and retrievable selves — Oxford University Press; ২০২১ ; p- ২৫৫-৫৬

৭। তদেব; পৃঃ- ২৪২-৪৩

৮। Mukhopadhyay– Anindita — "Not Out of the Blue" — Childrenós Games and Adult's Gambits - From Vidyasagar to Satyajit Ray — Orient Blackswan — 2019 — p. ৩৪৯-৫০

৯। তদেব; পৃঃ ৩৫০

# ভাষার আশ্চর্য ব্যবহার : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য

**অনির্বাণ মান্না**

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোরসাহিত্য-বিষয়ক ছোটগল্প কিংবা উপন্যাসগুলি পাঠকমহলে আজও ভীষণভাবে জনপ্রিয় এবং সমাদৃত। এর কারণ, কাহিনির অভিনবত্ব, নাটকীয়তা, মজাদার চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি হলেও কৌতুককর সংলাপ, অভিনব ভাষা ও শব্দের ব্যবহারের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। উপমার আশ্চর্য ব্যবহার, পান(Pun)-এর স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগে শিব্রামীয় ভাষারীতির সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এককথায় এই সব গল্প-উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভাষা নিয়ে খেলেছেন, শব্দ নিয়ে খেলেছেন।

অভিনব ভাষা সৃষ্টি ও তার সুপ্রযুক্ত ব্যবহারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোরসাহিত্য হাস্যরসে সিক্ত হয়েছে। এই ভাষা চরিত্রগুলির আজগুবি মনোভাব, গুলবাজি, দুষ্টুমি, আড্ডাধর্মীতার অনুসারী হয়ে কাহিনিকে যেমন করে তুলেছে চরম কৌতুকবহ, তেমনই চরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে মজাদার, প্রাণবন্ত।

**(ক) অভিনব ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংলাপ :** 'ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় উক্তিটি টেনিদার। মাঝেমধ্যেই টেনিদা চেঁচিয়ে বলে ওঠে 'ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস', অমনি প্যালারাম, হাবুল আর ক্যাবলা একসঙ্গে চিৎকার করে দুয়ো দেয় 'ইয়াক ইয়াক!' এই শব্দবন্ধটি এতবার ব্যবহৃত হয়েছে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, এর প্রকৃত অর্থ কী তা জানার জন্য পাঠকের মনে ভীষণ কৌতূহল তৈরি হয়।

মেফিস্টোফিলিস হলশয়তানের ডান হাত, জার্মানির ফাউস্ট উপকথায় এর উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতকে ক্রিস্টোফার মার্লো-র লেখা 'ডক্টর ফস্টাস' নাটকের অন্যতম চরিত্র এই মেফিস্টোফিলিস। পার্থিব ঐশ্বর্যের বিনিময়ে আত্মাকে বিক্রয় করার প্রসঙ্গ আছে এই নাটকে। এই প্রসঙ্গেই জন্ম নেওয়া বিখ্যাত ইংরাজি প্রবাদ "Selling one's soul to the Devil".

'ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস'এর আক্ষরিক অর্থের ব্যাখ্যা হল, মহান শয়তানের (মেফিস্টোফিলিস) উদ্দেশ্য। 'ইয়াক ইয়াক' হল পূর্বের বক্তব্যকে সমর্থন করা। বিজ্ঞ সমাজমনস্কতার চোখে কিশোরদের দুষ্টুমিপূর্ণ কার্যাবলী শয়তানি ছাড়া কিছু নয়। মেফিস্টোফিলিসের জয়গান এবং তাকে কেন্দ্র করে টেনিদা, প্যালারাম, ক্যাবলা, হাবুলের নানান কার্যাবলী সেই ভাবনারই ব্যঙ্গাত্মক জবাব বলা যেতে পারে।

'চারমূর্তির অভিযান'-এ ক্রিসমাসের ছুটিতে কুট্টিমামার কাছে ডুয়ার্সে চারমূর্তি অর্থাৎ টেনিদা, প্যালারাম, হাবুল আর ক্যাবলা বেড়াতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। টেনিদার প্রস্তাবে





সবাই বেড়াতে যেতে রাজি হলে টেনিদা আনন্দে এই শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাকি তিনজন।

'ঢাউস' গল্পে বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন টেনিদা রকে বসে প্রথম বলেছিল 'ডি -লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক!' এটা শুনে প্যালা বিস্মিত হয়ে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে টেনিদা বলেছিল, এর অর্থ প্যালা বুঝবে না। কেননা, এটা ফরাসী ভাষা। টেনিদা চালিয়াতি করছে জেনে প্যালাও জার্মান ভাষা আওড়েছিল 'হিটলার - নাৎসি - বার্লিন-কটাকট!' অর্থহীন শব্দ প্রয়োগে টেনিদাকে জবাব দিতে চেয়েছিল প্যালা। এসব দেখে শুনে হাবুলও আঞ্চলিক বাঙাল ভাষা বলে তার অর্থ জানতে চেয়েছে। যদিও সেই বাক্যের অর্থ কেউ বলতে পারে নি। শেষপর্যন্ত হাবুল নিজেই 'মেকুরে হুড়ুম খাইয়া হক্কৈড় করছে'-এর অর্থ বলেছে। এর মানে বিড়াল মুড়ি খেয়ে এঁটো করেছে। এই ভাষাচর্চা চলাকালীন ক্যাবলা কিন্তু 'মেফিস্টোফিলিস' মানে শয়তানএকথা বললে টেনিদা চটে গিয়ে পণ্ডিতি ফলাতে বারণ করেছে। তারপরেই টেনিদা মোক্ষম মন্তব্যটি করেছে "কাল যখন মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক ইয়াক করে আকাশে উড়বেতখন টের পাবি।"[১]

অর্থাৎ, এখানে 'মেফিস্টোফিলিস' মানে ঘুড়ি আর তা পৎপৎ করে আকাশে উড়বে অর্থে 'ইয়াক ইয়াক ইয়াক'-কে বোঝানো হয়েছে। বলে রাখা ভালো, এই ঢাউস ঘুড়ির টানেই টেনিদা আকাশে উড়েছে। পরিশেষে আউটরাম ঘাটের একটা মস্ত গাছের মগডালে আটকে কোনওক্রমে প্রাণ রক্ষা হয়েছে টেনিদার।

টেনিদা বানিয়ে বানিয়ে এমন সব ভাষা তৈরি করে ফেলে যা পাঠকের কাছে অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র ক্যাবলার কাছে ধরা পড়ে যায় টেনিদা। 'চেঙ্গিস আর হ্যামলিনের বাঁশিওলা' গল্পে টেনিদা হঠাৎই ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটি ইতিহাস বইয়ের নাম বলল। বইটির নাম'স্তোরিয়া দে মাগোরা পুঁদিচ্চেরি বোনানজা বাই সিলিনি কামুচ্চি'। ক্যাবলা অন্যত্র বলেছে পুঁদিচ্চেরি মানে পণ্ডিচেরী। কিন্তু টেনিদার কাছে এর অর্থ ডেনজারাস। টেনিদা ল্যাটিন ভাষা কবে শিখেছে তা সে জানেনা হাবুল একথা বললে টেনিদা বলেছে—

"নিজের গুণের কথা সব কি বলতে আছে রে। লজ্জা করে না ? আমি আবার এ-ব্যাপারে একটু মানে মেফিস্টোফিলিস বাংলায় যাকে বলে বিনয়ী।"[২]

'নিদারুণ প্রতিশোধ'-এ প্যালারাম তার মেজদার সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিল। সার্কাস কেমন দেখলটেনিদার জিজ্ঞাসার উত্তরে প্যালারাম বলেছিল"খাসা! ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস যাকে বলে!"

'ব্রহ্মবিকাশের দন্তবিকাশ' গল্পের বৃত্তান্ত খুবই মজার। ব্রহ্মবিকাশ অন্যকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করে এমন হাসায় যে নিমন্ত্রিত খেতে পারে না। শুধু হাসে। সেই সুযোগে

ব্রহ্মবিকাশ নিজেই তা খেয়ে নেয়। অনেকটা শেয়াল আর সারসের গল্পের মতো। টেনিদা ইতিমধ্যে একবার ঠকেছে। এবার সে প্যালারামকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। তাই যাবার আগে একটা প্ল্যান তৈরি করতে চায় টেনিদা। টেনিদা তাই প্যালারামকে বলেছে "ইয়ার্কি দিসনি ব্যাপারটা খুব পুঁদিচ্চেরি একেবারে মেফিস্টোফিলিস যাকে বলে।" অর্থাৎ, সিরিয়াস ব্যাপার বোঝানো হয়েছে।

'কাঁকড়াবিছে' গল্পে চাটুজ্জেদের রকে বসে টেনিদা, হাবুল আর প্যালা যখন ভুট্টাপোড়া খাচ্ছে তখন ক্যাবলা একটা কাঁকড়াবিছে মেরে এসে বলেছে"ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস! মেরেছি একটাকে !" এখানে কাঁকড়াবিছে মারার সাফল্যই মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

'টেনিদা আর ইয়েতি' গল্পটি আজগুবির চূড়ান্ত। গুলবাজিতে টেনিদা একনম্বর। তাই টেনিদা অনায়াসেই বলে ইয়েতি কামড়ালে হাইড্রোফোবিয়া হয়। এমনকি সনন্ত ষণ্ডন্ত প্রত্যয় পর্যন্ত হতে পারে। টেনিদা একথাও বলে ফরাসী ভাষায় 'মি ঘৎ' মানে 'হে ঈশ্বর'। এসব কথা শুনে ক্যাবলা তর্ক করলে ফাইন হিসেবে তাকে টেনিদা আট আনার আলুর চপ কিনে আনা করিয়েছে। সেই চপে কামড় দিয়ে টেনিদা বলেছে 'বেড়ে ভাজে লোকটা' অর্থাৎ 'যাকে বলে মেফিস্টোফিলিস'। এখানে শব্দটির ব্যবহার প্রশংসাসূচক।

'ঝাউ বাংলোর রহস্য' উপন্যাসে সাতকড়ি সাঁতরা ওরফে পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা গল্পকার। সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্প বানাবার ইচ্ছায় সে আর তার বন্ধু জগবন্ধু ছদ্মবেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে চারমূর্তিকে ভয় দেখায়। পুণ্ডরীকের সবুজ দাড়ি দেখে ভয় পায় টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল আর প্যালা। একটা রহস্যময়, রোমাঞ্চকর আবহ তৈরি হয়। ঘাবড়ে গিয়ে টেনিদা বলে'ডিলা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস'। অর্থাৎ এই শব্দবন্ধের মাধ্যমে টেনিদার ভয়ার্ত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। যদিও সবুজ দাড়িওলা লোকটি মেফিস্টোফিলিসের মানে জানে। সে এটাও বলেছে সে দশ বছর ফ্রান্সে ছিল। এরকম ফরাসী ভাষা সে কখনও শোনে নি। অর্থাৎ এটি ফরাসী শব্দ নয়। এছাড়াও সে বলেছে এই শব্দটির অর্থ শয়তান। তাই বুড়ো মানুষটাকে 'শয়তান' বলে টেনিদারা গালি দিচ্ছে কিনা জানতে চেয়েছে সে।

'ঝাউ বাংলোর রহস্য' উপন্যাসে চারমূর্তি দার্জিলিং থেকে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য নীলপাহাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়িতে যখন যাত্রা শুরু করেছে, তখন টেনিদা হাঁক ছেড়ে বলেছে 'পটলডাঙা'। বাকি তিনজন শেয়ালের মতো কোরাসে বলেছে জিন্দাবাদ। এত ভ্রমণে, অ্যাডভেঞ্চারেও চারমূর্তি পটলডাঙার কথা ভোলেনি। টেনিদা বলেছে 'পটলডাঙা আমাদের মাদারল্যাণ্ড'। হাবুল বলেছে'মাদারপাড়া'। ক্যাবলা বলেছে 'ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস'। অর্থাৎ, 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জন্মভূমি'।

এই উপন্যাসেই কাটামুণ্ডুর নাচ, হাঁড়িচাচার বীভৎস ডাক শুনে ক্যাবলা ছাড়া সকলেই ভয়ে অস্থির। মাথার উপর এককুঁজো জল ঢেলে ক্যাবলা ছদ্মবেশী হাঁড়িচাচাকে তাড়িয়েছে। বিজ্ঞানমনস্ক ক্যাবলার বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে, কাটা মুণ্ডু ফুণ্ডু কিছু নয়, ভয় দেখানোর জন্য





কাগজের মুখোশকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। রাতের বেলায় অবশেষে পুণ্ডরীক কুণ্ডু ওরফে সাতকড়ি এসেছে। ক্যাবলার ব্যাখ্যা, সাতকড়িকে দেখতে পাওয়া টেনিদা অবশেষে সাহস সঞ্চয় করেছে। তার সব রাগ গিয়ে পড়েছে মুণ্ডুটার ওপর। রাগ প্রশমনের জন্য টেনিদা তার বিখ্যাত উক্তিকেই ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করে বলেছে—

"ব্যাটা নির্ঘাত মেফিস্টোফিলিস। একবার সামনে পেলে এমন দুটো ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেরে দেব যে ইয়াক-ইয়াক হয়ে যাবে।"[৩]

প্রত্যক্ষভাবে না বললেও বুঝে নিতে পারি, টেনিদা বলতে চেয়েছে, মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান। ডি-লা-গ্র্যান্ডি মানে ঘুষি। ইয়াক-ইয়াক-এর অর্থ চিৎপটাং বা ধরাশায়ী করা।

সাতকড়ি টেনিদার ভুল শুধরে দিতে চেয়ে বলেছে "মেফিস্টোফিলিস হল শয়তান পুরুষ ফরাসী ভাষায় মাসক্যুল্যাঁ ! আর মাসক্যুল্যাঁ হলে বলা উচিত ল্য গ্রাঁ। অর্থাৎ কিনা মস্ত বড়। আর 'ডি'অর্থাৎ 'দ্য' টা ওখানে"। যদিও এসব কিছুকে পাত্তাই দেয়নি টেনিদা।

'কম্বল নিরুদ্দেশ' উপন্যাসে কম্বলকে উদ্ধার করার জন্য চারমূর্তি গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করেছে। সন্দেহজনক মন নিয়ে তারা ক্রমশ রহস্য উন্মোচনের দিকে এগিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে মেফিস্টোফিলিসের অর্থও গেছে বদলে। টেনিদা বলেছে "ব্যাপারটা খুব মেফিস্টোফিলিস বলে মনে হচ্ছে। মানে সাংঘাতিক। এত সাংঘাতিক যে পুঁদিচ্চেরিও বলা যেতে পারে।"

অর্থাৎ এখানে মেফিস্টোফিলিস আর পুঁদিচ্চেরি অর্থের দিক থেকে প্রায় সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে একটু পরেই ঘোরতর চিন্তায় হাবুডুবু খাওয়া টেনিদা ঝালমুড়ি খেতে খেতে বলেছে "যতই ভাবছি, আমার মনটা ততই মেফিস্টোফিলিস হয়ে যাচ্ছে।"

পরবর্তী কথাবার্তার ধরন দেখে অনুমান করা যায়, এখানে মেফিস্টোফিলিস মানে উদাস হওয়া নয়, এর অর্থ মন সন্দেহজনক হয়ে উঠছে।

অবশ্য প্রবাদপ্রতিম এই বাক্যাংশটি সম্পর্কে নারায়ণবাবুর নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা ছিল। এই বিষয়ে তাঁকে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় একবার প্রশ্ন করলে তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন—

"বুঝলেন না, ওটা হল টেনিদার আনন্দপ্রকাশের পথডি লা গ্রাণ্ডিসমেফিস্টোফিলিস"।[৪]

শুধুমাত্র আনন্দপ্রকাশ নয়, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানান অনুভূতি প্রকাশের অবলম্বন হয়ে উঠেছে সংলাপটি। জাদুকরের ছোঁয়ায় শব্দগত অর্থ অতিক্রম করে সংলাপ বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে পাঠকের কাছে 'কমিক রিলিফ' হয়ে উঠেছে।

**(খ) পশুর আচরণ অনুযায়ী বিভিন্ন নামকরণ :** পশুর বিভিন্ন আচরণে প্রযুক্ত শব্দগুলির ব্যাখ্যা বেশ অভিনব এবং হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক।

প্যালাকে নিয়ে বল্টুদার ঘোড়ায় চড়ার আজব অভিজ্ঞতার গল্প হল 'ঘোড়াটোড়ার ব্যাপার'। ঘোড়ার পিঠে চাপতে গিয়ে প্যালা ঘোড়ার ল্যাজে পা দিতেই ঘটেছে বিপত্তি। ঘোড়া লাফিয়ে উঠলে এক লাফে প্যালা বারান্দায় কিন্তু ঘোড়ার পিঠে তখনও চেপে আছে বল্টুদা। এর পরেই ঘোড়ার বিভিন্ন আচরণ অনুযায়ী ঘোড়ার নামকরণ থেকে শুরু করে তার বংশগত যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(i) পাঁই পাঁই ঘুরছে বলেই তার নাম ঘোড়া। লাট্টুও ঘোরে। তাই ঘোড়া হল লাট্টুর বংশধর।

(ii) সামনের পা-দুটো আকাশে তুললে ঘোড়া হয়ে যায় পক্ষীরাজের বংশধর।

(iii) লাফালে ঘোড়া হয় কাঙারুর বংশধর।

(iv) নাচলে ঘোড়ার পূর্বপুরুষ বোধহয় রায়বেশে নাচত।

(v) ঘোড়ার অট্টহাসি'ঘোড়াট্টহাস্য'।

**(গ) সাদৃশ্যজনিত কারণে অভিনব নামের উত্থাপন :**

(i) 'হরিশপুরের রসিকতা' গল্পে নিতাই গায়ে সেন্ট মেখেছে। সুগন্ধী গায়ে মেখেছে বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'গন্ধমাদন'।

(ii) 'ভালোয়-ভালোয়' গল্পে একশো বছরের পুরনো গাড়ির দেখা মিলেছে। সেই গাড়িতে চাপলে ওষ্ঠাগত প্রাণ। অথচ বলা হয়েছে হেলতে দুলতে যাওয়া গাড়িতে চাপলে ঘুম চল আসবে। সেজন্যই গাড়ির নাম 'দোদুলদোলা'।

(iii) শুধুমাত্র উচ্চারণ-সাদৃশ্যে ইটালির মুসোলিনী হয়ে গেছে বেলেঘাটার মৃণালিনী মাসিমার বড় বোন।

**(ঘ) শব্দের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ :**

এক একটি শব্দের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ এবং তাকে কেন্দ্র করে হাস্যরস সৃষ্টি লেখকের দক্ষতাকেই প্রতিষ্ঠা করে। এই ধরনের বিশ্লেষণ কাহিনিকে বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করে তোলে। যেমন 'দুর্ধর্ষ মটর-সাইকেল' গল্পে 'আলুবখরা' শব্দের বহুমাত্রিক ব্যাখ্যায় প্যালারাম বলেছে

"সেটা আলুও নয়দাম না দিয়ে বখরাও তাতে পাওয়া যায় না। ওদিকে রাঁধতে গেলে বিস্তর বখেরা চিনি চাই, কিসমিস চাইএ চাই ও চাই। আর কাঁচা খেলে 'বোখার' হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।"[৫]

এখানে আলুবখরা টকজাতীয় একপ্রকার ফল। ফলত তা আলু নয়। প্রসঙ্গক্রমে, উচ্চারণগত আরও তিনটি শব্দের ব্যবহার ঘটেছে যার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

(ক) বখরা অর্থে ভাগ বা অংশ। (খ) বখেরা মানে ঝঞ্ঝাট বা ঝামেলা। (গ) বোখার অর্থে জ্বর।

'বখরা' শব্দের প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের অর্থগত বিচিত্র ব্যাখ্যায় পাঠক চমৎকৃত হয়।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

প্রসঙ্গক্রমে এই জাতীয় আর একটি উদাহরণ দিয়েছে প্যালারাম। সেটি হল কাঠবিড়ালি। কাঠবিড়ালি শব্দের মধ্যে ভিন্ন দুটি শব্দ লুকিয়ে আছে কাঠ ও বিড়ালি। কাঠবিড়ালি কাঠ নয়, তাকে জ্বালানির মতো ব্যবহার করে রান্না করা যায় না। আবার সেটা বিড়ালিও নয় যে সে ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর ধরে খাবে।

**(ঙ) অভিনব ভাষাসৃষ্টির উদ্ভাবনী শক্তিতে অনন্য টেনিদা :**

এই ভাষার সবটাই গুলবাজির উপর ভিত্তি করে নির্মিত হলেও সাদৃশ্যজনিত বিশ্বাসযোগ্যতায় তা একনিষ্ঠ। বিভিন্ন দেশের ভাষা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কৃত্রিম অথচ বিশ্বাসযোগ্য এই ভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। 'দশানন চরিত'-এ টেনিদা প্যালারামের কাছে বিভিন্ন দেশের লোকের নাম বলেছে। জাপানের বিখ্যাত গায়কের নাম দিয়েছে 'তাকানাচি'। লণ্ডনের মুরগির দোকানদারের নাম 'চিকেনসন'। ফ্রান্সের সানাইওলার নাম মঁসিয়ো প্যাঁকে। উদাহরণগুলির প্রত্যেকটিতেই সেই দেশের ভাষাগত মিল লক্ষণীয়। নাচের সঙ্গে গানের সম্পর্ক। তাই জাপানি শব্দের সাদৃশ্যে গায়কের নামের সঙ্গে অনায়াসে স্থান পায় 'নাচি' শব্দ। কিংবা মুরগির ইংরেজি পরিভাষা চিকেন বলে দোকানদারের নাম হয় চিকেনসন। সানাই প্যাঁ করে বাজে। তাই সানাইওলার নাম মঁসিয়ো প্যাঁকে। এই অভিনব নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনাবিল হাস্যরস।

'হনোলুলুর মাকুদা' গল্পে বাগবাজারের বেচারাম গড়গড়ি বিভিন্ন দেশের বিশ্বাসযোগ্য আজগুবি ভাষা বলে টেনিদা আর প্যালাকে বিশ্বপর্যটক পরিচয় দিয়ে ঠকিয়েছে এবং ভরপেট খাবার খেয়েছে। তারসঙ্গে নিয়েছে দু'প্যাকেট সিগারেট। ট্যাক্সিভাড়া বাবদ অতিরিক্ত তিনটাকা আদায় করেছে। বেচারাম নিজেকে হনোলুলুর বাসিন্দা বলে নিজের নাম বলেছে ম্যাকাদিনি বেনিহিতো অ্যাসপারাগাস ডি প্রোফাণ্ডিস। সংক্ষেপে ম্যাকাদিনি। তার থেকে মাকুদা।

মাকুদা অনর্গল মনগড়া জাপানি, জার্মানী কিংবা ফরাসী ভাষা বলতে পারে। এই সব দেশে গেলে সেই দেশের লোকেরা মাকুদাকে খুব সেবাযত্ন করেছে। একথা মাকুদা নিজেই জানিয়েছে টেনিদাকে। জাপানে যেতেই দুজন লোক স্যালুট করে মাকুদাকে বলেছে 'ইসিকিমা কিচিকিচি।' এর অর্থ মাকু কি বিদেশী? উত্তরে মাকুদা বলেছে'উচি উচি' অর্থাৎ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ'। তারপর লোকদুটো বলেছে 'ওকাকুরা আসাবুরো'। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে মাকুদাকে যেতে বলেছে। তারপর হোটেলে খাইয়ে মাকুদাকে তারা দুশো ইয়েন দিয়ে বলেছে 'দোজিমুরা কাঁচুমাচু'। তার মানে সামান্য কিছু হাতখরচ দেওয়া হল।

প্রত্যেকটি বাক্য পাঠকের মনে হাসির উদ্রেক ঘটায়। চিত্রশিল্পী ওকাকুরার পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে পাঠককে যেমন ভাষার ইঙ্গিত দেওয়া হয়, তেমনই বাংলা শব্দ কাঁচুমাচু স্থান পায় জাপানি ভাষায়। একইভাবে হাস্যকর ফরাসী ভাষায় কথা বলে মাকুদা। শেষমেশ হনোলুলু ভাষায় বাংলাদেশ সম্পর্কে তিরস্কার করে মাকুদা বলেছে'এক নম্বরের গফানজেন'। অর্থাৎ অতিশয় বাজে জায়গা। কেননা, বাংলাদেশে মাকুদাকে কেউ অভ্যর্থনা করে নি।

আর এই ভাষার জাদুতেই মোহিত করে মাকুদা টেনিদা এবং প্যালাকে ঠকিয়ে বিশ্বপর্যটকের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন দেশের বিশ্বাসযোগ্য মনগড়া ভাষাসৃষ্টি শুধু নয়, পশুদের ভাষারও অর্থ বুঝে তার মজাদার ব্যাখ্যা করে হয়েছে। 'কুট্টিমামার দন্তকাহিনী'তে কুট্টিমামা বাঘের ভাষা বুঝতে পেরেছে। বাঘের ভয়ে কুট্টিমামা যখন গাছের উপর উঠেছে তখন গাছের গুঁড়ি আঁচড়ে বাঘ ডাকল 'ঘঁর-র্-ঘুঁ-ঘুঁ। তার মানে বাঘ বলতে চাইল, কুট্টিমামা একনম্বরের ঘুঘু। এরপর বাঘের ডাকে ভয় পেয়ে কুট্টিমামার হাত থেকে কালীসিঙির মহাভারত বাঘের মুখে পড়ে বত্রিশটি দাঁত ভেঙে গেল। বাঘ পালিয়ে গেল। পরের দিন বাংলোর বেড়ার সামনে সেই বাঘ কান্নার সুরে ডাকল 'ঘ্যাং-ঘ্যাঁ-ভ্যাঁও।' অর্থাৎ বাঘটা যেন বলতে চাইদাদা, দাঁত তো সব গেল। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। এখন কী করা যায়! তার পরের দিন বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটো খুলে কুট্টিমামা দাঁত মাজছিল। তখন বাঘ এসে বলল'ঘোঁয়াৎ ঘালুম !' অর্থাৎ 'তোফাএই তো পেলুম।' তার মানে বাঘ কুট্টিমামার দু'পাটি বাঁধানো দাঁত পরে নিল মুখে। 'দুর্যোধনের প্রতিহিংসা' গল্পেও পশুদের ডাকের অর্থ বিশ্লেষণ করে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে।

বহুভাষা-বিশারদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কিশোর সাহিত্যে ভাষা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেননি। বরং এর সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতাকে কাজে লাগিয়ে উতরোল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। লোককথায় দেখা যায় পশুপাখি ও মানুষ পরস্পরের কথা বুঝতে ও বলতে পারে। সেই ভাষা মানুষেরই ভাষা। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর কাহিনিতে পশুরা নিজেদের ভাষাতেই কথা বলেছে। পরে মানুষের ভাষায় তা পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে, অসঙ্গতির আবহে পাঠক নিশ্চিতভাবে আপ্লুত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের ধারায়। কিশোর মনস্তত্ত্ব ও ভাষা ব্যবহারের নিপুণ দক্ষতা না থাকলে এই জাতীয় সাহিত্য নির্মাণ অসম্ভব। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

**তথ্যসূত্র :**


১. টেনিদার উক্তি, 'ঢাউস', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য', সম্পাদনা আশাদেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৬, অষ্টম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃঃ ৫২০

২. ওই, 'চেঙ্গিস আর হ্যামলিনের বাঁশিওলা', পৃঃ ৪৯৯

৩. ওই, 'ঝাউ বাংলোর রহস্য', পৃঃ ১৯৯

৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্মৃতিধার্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালি ও কলম', চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, গ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃঃ ৫৭১

৫. প্যালার উক্তি, 'দুধর্ষ মটর-সাইকেল', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য', সম্পাদনা আশাদেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৬, অষ্টম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃঃ ৫২৫




# ভাষা শিক্ষায় বানানের গুরুত্ব : প্রেক্ষিত বাংলা ভাষা

**ড. মৃদুল ঘোষ**

পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মতো বাংলা ভাষায় ভাষাজিজ্ঞাসা-দ্যোতক হিসেবে ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণ ইত্যাদি শব্দ শিথিলভাবে Philology– কখনো বা Linguistics এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে Philology G Linguistics এর শব্দদুটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। Philology হল সাধারণ ভাষাতত্ত্ব তথা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব; Linguistics হল Science of Language অর্থাৎ ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা। এক কথায় স্বীকার করতে হয় ভাষার বিজ্ঞানসম্মত পঠন-পাঠন হল ভাষাবিজ্ঞান। কোন ভাষার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা হল ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা আলোচনার প্রাথমিক ধাপ হল ভাষার তথ্য সংগ্রহ, নথিভুক্তিকরণ, পর্যবেক্ষণ, তথ্য বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণ এবং ভবিষ্যৎ নির্দেশ। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত বিভিন্ন ধাপগুলি পরপর অনুসরণ করা হয় বলে বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞান পুরোপুরি বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করেছে।

ভাষাচর্চার পরিধি ক্রমবৃদ্ধির কারণে ভাষাবিজ্ঞানকে প্রধান দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন- ১. কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞান (Central Linguistics) ২. পরিমন্ডলীয় ভাষাবিজ্ঞান (Peripheral Linguistics)। পরিমন্ডলীয় ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ শাখা ফলিত বা প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান (Applied Linguistics)। ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের শাখায় মাতৃভাষা শিক্ষণ, বিদেশী ভাষা শিক্ষণ, কম্পিউটার-ভাষাবিজ্ঞান, ভাষা পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হয়। তারই হাত ধরে ফলিত বা প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় পরিধির মধ্যে এসেছে আভিধানবিজ্ঞান (Lexicography ), লিপিবিজ্ঞান (Graphics), শৈলীবিজ্ঞান(Stylistics), উপভাষাবিজ্ঞান (Dialectology), সমাজভাষা বিজ্ঞান (Sociolinguistics) ইত্যাদি। তবে এবিষয়ে অনেকে সহমত পোষণ করেননি। ভাষার ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে অভিধান। অভিধানের মধ্যে দিয়ে শব্দের ব্যুৎপত্তি, একাধিক প্রতিশব্দ ও সর্বজন স্বীকৃত উচ্চারণ জানতে পারে শিক্ষার্থী। ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষার্থীর বানান শিক্ষা অন্যতম। যথার্থ নানান শিক্ষলাভের দ্বারা শিশু থেকে প্রবীণ ব্যক্তি যথার্থ ভাষাজ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন।

অনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে ভারতের বৈয়াকরণ পাণিনি ভাষা পরিকল্পনার কাজটি শুরু করেছিলেন। পাণিনি পরবর্তীকালে কাত্যায়ন, পাণিনির দেড় হাজার সূত্র সংশোধন করেন। এরপর পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, জয়াদিত্য, বামন প্রমুখেরা ভাষা পরিকল্পনার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মান্য সংস্কৃতের লেখ্য ভাষারূপ ভাষা পরিকল্পনার ফসল। কোন ব্যক্তিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস না থাকলেও বিভিন্ন সময়ে সরকারি, প্রশাসনিক

কাজকর্মে ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ভাষা পরিকল্পনার ফলে সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে মুসলিম শাসনকালে আরবি-ফারসি ভাষা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হত। ইংরেজ শাসিত ভারতে ইংরেজি ভাষা, স্বাধীন ভারতে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা সরকারিভাবে প্রচলিত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় ভাষা-সংস্কার ও পরিকল্পনার প্রচেষ্টা শুরু হয় ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। আধুনিককালে বাংলা ভাষা পরিকল্পনার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ প্রমুখ ভাষাবিদগণ। পাশ্চাত্যের ভাষা পরিকল্পনার ধারা অগ্রসর হয়েছে ফার্দিনান্দ দ্যা সোস্যুর, প্রিন্স নিকোলাস ত্রুবেৎসকয়, ফ্রানৎস বোয়েস, এডওয়ার্ড সাপির, হেনরি গ্লিসন, জার্নাড, চার্লস হকেট, ড্যানিয়েল জোনসপ্রমুখের হাতে। ভারতের বিশিষ্ট ভাষাবিদ লিখেছেন, "কোন রাষ্ট্র বা অঞ্চলের, কোন প্রশাসনিক বা শিক্ষাগত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেই রাষ্ট্র বা অঞ্চলের ভাষা বা ভাষাগুচ্ছের, অবস্থা ও উপাদান পরিবর্তনের জন্য সচেতন ব্যবস্থা গ্রহণের নামই ভাষা-পরিকল্পনা।"[১] ভাষা পরিকল্পনা ও সংস্কারের অন্যতম দিক হল বানান শিক্ষা ও সংস্কার। বাংলায় মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কালে বাংলা লিপি হিসেবে সংস্কৃত বর্ণমালাই ছিল আমাদের আদর্শ। লিপিকরদের শিক্ষা ও রুচির প্রতিফলন দেখা যেত বানানে। ফলে বানানে কোন একরূপতা বা সামঞ্জস্য ছিল না। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজন হল পরিকল্পনা মাফিক বানান সংস্কারের। ক্রমে শিক্ষার্থীদের মনে বানান বিষয়ে নানা প্রশ্নের উদয় হল। আধুনিক কালের ভাষাবিদগণ পরিকল্পিতভাবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীদের নিকট বানান খানিকটা নিয়ন্ত্রিত রাখবার চেষ্টা করা হয়েছিল। উনিশ শতকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়ের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা রাজনারায়ণ বসুর সময় পর্যন্ত বাংলা বানানকে নিরূপিত ও বিধিবদ্ধ করবার প্রয়াস দেখা গেছে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে বাংলা বানানকে যুক্তি নির্ভর ও সরল করবার প্রয়াস দেখা যায়। ১৯৩৬ সালে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' নতুন নতুন শব্দের বানান নির্ধারিত করে দিয়েছিল। যেমন এই সময় থেকে বর্ণের দ্বিত্ব লোপ পেল, অতৎসম শব্দে হ্রস্ব চিহ্ন চালু হল, কিন্তু স্ত্রী লিঙ্গে দীর্ঘ স্বর থেকে গেল। এরকম বহুবিধ পরিবর্তন হলেও বানান সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হল না। অতি সম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ঢাকার বাংলা একাডেমি, আনন্দবাজার পত্রিকা, সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলা বানান সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নানা সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি উদ্যোগের ফলে বানানের জটিলতা ক্রমশ কমে এসেছে। শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষা শিক্ষার পথ ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে।

ভাষা পরিকল্পনার অন্যতম দিক হল বানান বিষয়ে যথাযথ সচেতনতা অবলম্বন।



ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VIII, Issue : XVII

হাজার বছরের বাংলা ভাষা এই পরিকল্পনার ধারা মেনে সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ও সংস্কারের পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলা ভাষার সূচনালগ্ন থেকেই শিক্ষার্থীর নিকটে বানান নিয়ে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- চর্যাগীতিতে 'সবরী' ও 'শবরী' দুরকম বানান পাওয়া যাচ্ছে। অতীত থেকে বর্তমানকাল অবধি তার কায়া নির্মাণে বহুবিধ প্রভাব, উত্তরাধিকার ও বিবর্তনের হাত ধরে বানানে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে তৎসম শব্দের সংস্কৃত রূপ, অন্যদিকে অর্ধ তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানান নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি ধ্বনিমালার সঙ্গে বর্ণমালার একটা অসামঞ্জস্য শিক্ষার্থীদের বানান ভুলের প্রবণতা বাড়িয়ে তুলেছে। সংক্ষেপে বাংলা বানানের সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :-

১) তৎসম, অর্ধ তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশী শব্দের উচ্চারণ ও বানান সমস্যা।
২) 'ই'-কার ও 'ঈ'-কার জনিত সমস্যা।
৩) 'উ'-কার ও 'ঊ'-কার জনিত সমস্যা।
৪) 'ঋ'-কার ও 'রি' সমস্যা।
৫) 'ণ' ও 'ন' জনিত সমস্যা।
৬) 'জ' ও 'য' জনিত সমস্যা।
৭) 'শ', 'ষ', 'স' জনিত সমস্যা।
৮) 'য'-ফলা ব্যবহারে কোথায় 'অ্যা' বা 'আ' কার হবে সেই সমস্যা।

বাংলা বানান বিষয়ে আজও সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত বা মান্য বানান রীতি গড়ে ওঠেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ঢাকার বাংলা একাডেমি, আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী, সাহিত্য সংসদ নানা ধরনের বানান শিক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সবসময়ে সেগুলিতে কোন না কোন বিভ্রান্তি থেকে গেছে।

বাংলা বানানের যথেচ্ছাচারিতা বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলা ভাষা সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রী তথা জনসাধারণের মনে একটা স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব গড়ে উঠছে। ছাত্রছাত্রীদের মনে এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে, বাংলা শব্দের বানান যে কোন ভাবে লিখলেই চলে যাবে। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজী ও ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় ভাষা শিক্ষার্থীর কাছে বাংলা বানানের গুরুত্ব ক্রমে লঘু হতে শুরু করেছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞাপন ও পোস্টার এর প্রাচুর্য বাংলা বানানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। দেশভাগের ফলে এদেশে বাংলা ভাষার ওপর হিন্দির প্রভাব বেড়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার উন্নতি ও ব্যবহার সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারেনি। বাংলা ভাষার নরবড়ে বানানরীতি দেখলে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার অভাব সহজে চোখে পড়ে। গদ্যভাষার জন্মলগ্নের সাধু রীতি ও বিশ শতকে চলিত রীতির বাংলা ভাষা

প্রবর্তনের ফলে স্বেচ্ছাচারিতার ভাব আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলা বানান সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রাচীন সমস্যা গুলি অধিক জটিলতর হয়ে উঠেছে। চলিত বাংলায় বানানের প্রাচুর্য বেড়ে যাওয়ায় নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে একজন ভাষা শিক্ষার্থীকে।

বাংলা বানানের বিভ্রান্তি সমাধানে বিগত শতাব্দী জুড়ে নানা প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত মহলানবিশ কিংবা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর প্রচেষ্ঠার পর ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গঠিত 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে। তদানীন্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বানান সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিতভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, ... তাহাদের বানানে বহু স্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলেরই কিছু কিছু আসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ... প্রায় দুইশত লেখক ও আধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন। ... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকাদিতে ভবিষ্যৎ এই নিয়মাবলী সম্মত বানান গৃহীত হইবে। আবশ্যক হইলে উহা সংশোধিত পরিবর্তিত হইতে পারিবে।"২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বানানের এই নিয়ম মেনে লিখবার সম্মতি প্রদান করে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে হয়, সে সময় বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিও এই ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে সীমায়িত ছিল। বলা চলে এই বানান বিষয়ক নীতি ও পদ্ধতি পরবর্তীকালে বাংলা বানান রীতিকে বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে। এই সময় থেকে বাংলা ভাষার বানানের ক্ষেত্রে বহু বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করা হল। সেগুলি হল ১) বিকল্প বানান বর্জন করতে হবে। ২) উচ্চারণমুখী বানানের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে হরফের পরিমিতি বজায় রাখতে হবে। ৩) বানান পরিবর্তনে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হবে। ৪) বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণের সময় প্রতিবেশি ভাষার বানানপদ্ধতির কথা স্মরণ রাখতে হবে। ৫) বানানের প্রয়োগ বাহুল্য বর্জন করতে হবে। ৬) বানানের সূত্র রচনায় সমরূপ বানান যেন অর্থবিভ্রাট না ঘটায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। ৭) যথা সম্ভব বাংলা বানানে আদর্শ কথ্য বাংলা উচ্চারণ রক্ষা করতে হবে, আঞ্চলিকতা ও ঔপভাষিকতা বর্জনীয়। ৯) ধ্বনি ও বর্ণের ব্যবহারে হ্রস্ব-দীর্ঘ রূপ, বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বিকল্প ব্যবহার, দ্বিত্ব ব্যবহার, হসন্ত ব্যবহার এবং ব্যকরণের বিভিন্ন পদ ব্যবহারের বিধি প্রবর্তিত হল। এভাবে বাঙালি জাতির বানান শিক্ষার পথ পর্যায়ক্রমে প্রসারিত হল।

১৯৮৬ সালের ২০ মে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা বানান



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বিধিতে বহুবিধ পরিবর্তনের ভাবনা শুরু হয়। ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান বিষয়ে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মসূত্র প্রচলনের সুপারিশ করে। সেই সুপারিশ পত্রের ভুমিকায় লেখা হয়েছিল, "প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায় অবধি পাঠ্যপুস্তক রচিত হলে, এবং ব্যানার ইত্যাদির ঘোষণায়, দূরদর্শনের বিজ্ঞপ্তিতে, সরকারি নানা প্রচারপত্রে তা অনুসৃত হলে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে এক ধরনের বানানরীতিতে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হবে এবং বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর হতে পারবে।"[৩] এই সময়ে বাংলা আকাদেমির বানান সংস্কার সমিতির অধিবেশনে বহু ভাষাবিদ নানা প্রস্তাব পর্যালোচনার পর অধিকাংশ আলোচক উচ্চারণ অনুগ বানানের স্বপক্ষে মত দেননি। তাই পুনরায় বাংলা শব্দের তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি এই কটি পর্যায়ে বিভক্ত করে সেগুলির বানান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। এই সুপারিশ অনুসারে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৯৭ সালে বানান বিষয়ক অভিধান প্রনয়ণ করে। এর ফলে এপার বাংলার বানান পদ্ধতিতে একটি সরলীকৃত ও পরিমার্জিত বানানবিধি কার্যকরী হয় এবং শিক্ষার্থীর বানান বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিন্তু বর্তমানকালের শিক্ষার্থীর অন্যমনস্কতা, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক মণ্ডলীর যথার্থ অনুসন্ধিৎসার অভাব বানানচর্চাকে অনেকাংশে গুরুত্বহীন করে তুলেছে। নানা কারণে বাংলা বানানে ভুলের প্রবণতা যেন ক্রমবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। বিদ্যালয় শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যখন মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে উপনীত হয়, সে সময়েও তাঁদের যথার্থ বানানের জ্ঞান হয় না।

নিম্নে একজন বাংলা সাম্মানিক স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীর বানান ভুলের নমুনা (১৭.০২.২০২২ সংগৃহীত) উল্লেখ করা হল,

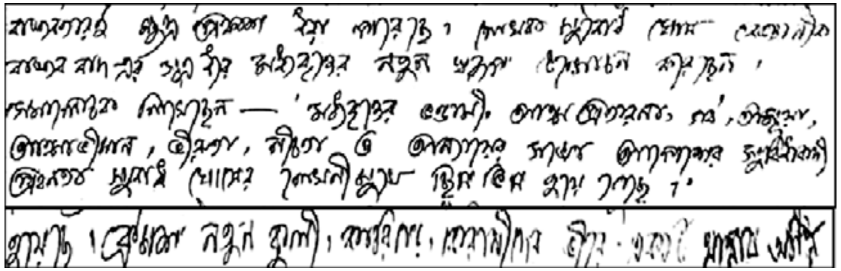

এই শিক্ষার্থী বৈজ্ঞানিক' শব্দটি লিখেছে বৈজ্ঞানীক', 'মধ্যবিত্ত' শব্দ লিখেছে 'মধ্যবৃত্ত', 'ভণ্ডামি' শব্দ লিখেছে 'ভণ্ডামী', 'আত্মভিমান' শব্দটি লিখেছে 'আত্মাভীমান' হিসেবে। ঐ শিক্ষার্থীর লিখিত গদ্য ভাষার বানানের খাতা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে শতকরা ১৫ থেকে ২০ টি বানান ভুল লিখেছে। এমনকি দেখা যাচ্ছে কুলি, কারিগর, ভিড়, ইত্যাদি সাধারণ

শব্দগুলির বানান সে ভুল লিখছে। এভাবেই প্রতিনিয়ত ভাষা শিক্ষার্থীর বানানের জ্ঞান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এছাড়া বর্তমানে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার এর মতো বৈদ্যুতিন মাধ্যমে লিখবার সময় মোবাইল, কম্পিউটার এর কী-বোর্ড ব্যবহারে সকল শ্রেণির মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। আমার মনে হয় গোটা বিশ্বের মানুষদেরই বাংলা ভাষা লিখনের ক্ষেত্রে রীতি নীতি নিয়ম কানুন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার সময় এসেছে। না হলে বাংলা বানানের এই 'জগাখিচুরি' গোছের চর্চা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ভাষা শিক্ষার্থীদের ভুল বানান লেখার প্রবণতার সম্ভাব্য কারণ ও সম্ভাব্য সমাধানের কথা উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করব। সেগুলি হল :-

**ক) পরিবেশগত দিক :** সোশাল মিডিয়া, চারপাশের বিজ্ঞাপন, দোকানের সাইনবোর্ড, দোকানের নাম ছাপা ব্যাগ, ক্যালেন্ডার, ফেস্টুন, দেওয়াল লিখন, পোস্টার থেকে পার্কের বিভিন্ন স্থান এবং পণ্যবাহী-যাত্রীবাহী গাড়ির বাইরে-ভেতরে সর্বত্র ভুল, অশুদ্ধ, পুরোনো বানানের ছড়াছড়ি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা এগুলি দেখার ফলে বানান সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মায়। এই ভুল বানানগুলি তাদের কাছে ঠিক বলে মনে হতে থাকে। পণ্যবাহী-যাত্রীবাহী গাড়ি বা সাধারণ দোকানের সাইনবোর্ড লেখার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত মানুষেরা কাজ করেন বলে তাদের এসম্পর্কে ততখানি সচেতনতা থাকে না। তাই অতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের জন্যও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও বানান শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বানান শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশের আনুকুল্যের দিকগুলি নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে।

**অ) শিক্ষকের ভুমিকা :** সাধারণভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নতুন শিক্ষার্থীরা প্রথম বানান শিক্ষা লাভ করে। শিশু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের বাক্যকে বেদবাক্য বলে মনে করেন। তাদের খাতা ও ব্ল্যাকবোর্ড এ শিক্ষক মহাশয় যে বানান লিখে দেন সেটিকে একমাত্র ধ্রুব সত্য বলে মনে করে। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়দের বানান সম্পর্কে সময়োচিত অভ্যাস ও সচেতনতার অভাবের কারণে শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক শিক্ষক নতুন বানান বিধি আয়ত্ব করতে না পেরে অনীহা বশত পুরোনো বানানেই ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যস্ত করে তোলেন। ফলে এক বিষম সমস্যার সম্মুখীন হয় শিক্ষার্থীরা। সুতরাং শিক্ষক মহাশয়দের এই মনোভাব পরিবর্তন করে যুগোপযোগী বানান শেখানোয় অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

**আ) বানানের রূপভেদ দূরীকরণ :** দৈনিক পত্র-পত্রিকা, পুরাতন কালে ছাপা বাংলা গ্রন্থ কিংবা বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে ছাপা বিভিন্ন বাংলা গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বানান দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৪ সালে সরকারিভাবে আকাদেমি বানানবিধি মেনে স্কুল পাঠ্য পুস্তকগুলি ছাপানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু আকাদেমি বানানের সঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকারা সম্যকরূপে পরিচিতি লাভ করেননি। শুধু তাই নয়, অনেকে এই বানানের





যৌক্তিকতাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ফলত শিক্ষার্থীর পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষকের পাঠ দানের বানানে বিস্তর প্রভেদ দেখা দিয়েছে। নতুন শিক্ষার্থী দুই ধরনের বানান সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেও তার যথার্থ উত্তর পেল না। ফলত বানান নিয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। একইভাবে সেই শিক্ষার্থী যখন স্নাতক স্তরে শিক্ষালাভের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করল সেগুলিতে পুরোনো বানান দেখে হতচকিত হয়ে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনাবোধ সম্পর্কে সংশয়াপন্ন হল। এভাবে ভুলে ভরা নতুন বানান ও পুরাতন বানানের মিশ্ররূপ প্রচলিত হল। যতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষা শিক্ষার সর্বস্তরে এই মান্য রূপ গৃহীত না হবে ততদিন এই সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব। এই দুঃসাধ্য কাজটি সম্পন্ন হতে কত সময় প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব।

**ই) আঞ্চলিকতা :** আঞ্চলিকতার কারণে অশিক্ষিত, অল্প ও অর্ধ শিক্ষিত মানুষেরাও নিজের পারিপার্শিক পরিবেশ ও পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত ভাষা প্রয়োগের কারণে আঞ্চলিক টান অনুসারে বানানের বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে। 'লাল' কে 'নাল', 'যেতাম' কে 'যাইতাম', 'খাচ্ছি' কে 'খাচি', 'নীল' কে 'লীল', 'লবন' কে 'লুন' এসব বহুল প্রয়োগ করে। প্রকৃত বানান শিক্ষার পক্ষে এগুলি অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য ছাত্র-শিক্ষক উভয়ে শুদ্ধ ও মান্য রূপ ব্যবহার করলে বানান ভুল ও ভাষার মান বৃদ্ধি ঘটতে পারে বলে মনে করি।

**খ) মানসিক দিক :** ভাষা পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ তথা বানানের একটি সর্বজন গ্রাহ্য রূপ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বৃহত্তর জনসমাজের মানসিকতার পরিবর্তন। এক্ষেত্রে মানসিক সদিচ্ছা সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান। একটি মান্য বানানের গ্রহণযোগ্য রূপ সর্বত্র প্রচলনে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় তা নিম্নরূপ :-

**অ) অনাগ্রহ :** বানান শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানুষজনের আগ্রহের উপর। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সহ সকল মানুষেরা বানান সম্পর্কিত নতুন ভাবনা ও যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে নতুন ধারণাগুলি সার্বিক মর্যাদা লাভ করে। সকলের সহমতের ভিত্তিতে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তায় ভাবিত হলে বানানের উন্নতি সম্ভব হবে। বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রসার ও তেমনি বৃদ্ধি পাবে। নতুন ও পুরাতন শিক্ষার্থী যদি সমান আগ্রহের সঙ্গে যৌক্তিক বানানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয় তবে ভাষা শিক্ষায় বানানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

**আ) অসচেতনতা :** অধিকাংশ শিক্ষার্থী কোন বিষয়ের দ্রুত পঠনের সময় বানানের প্রতি ততখানি মনোযোগ দেয় না। ফলে অসচেতনতার কারণে শিক্ষার্থী ভুল বানানের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। এমনকি সচেতনতার অভাবে বয়স্ক মানুষেরা ভুল বানানে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে পরবর্তী প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একবার ভুল বানানটি রপ্ত হয়ে যাবার পর আর

শুদ্ধ বানানটিকে তারা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না। এভাবে অসাবধানতার কারণে বানান নিয়ে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই শ্রেণিভেদে সকলকে সাবধানী দৃষ্টিভঙ্গীতে বানান লিখন ও উচ্চারণে নজর দিতে হবে।

**ই) মানসিক চাঞ্চল্য :** শিক্ষার্থীর মানসিক চঞ্চলতার কারণে বানান ভুলের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাইরের নানা অভিঘাত, প্রক্ষোভ, উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা বানান শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলে প্রকৃত বানানটি শেখা হয় না।

**গ) শারীরিক দিক :** মানুষের শরীরের নানা শারীরিক অক্ষমতার কারণে ভাষা শিক্ষার প্রধান অবলম্বন বানানচর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাগযন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ত্রুটি, শারীরিক দুর্বলতা, নৃতাত্ত্বিক গঠনের কারণে শব্দের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটতে পারে। অজ্ঞতা বশত কেউ শব্দ উচ্চারণ করলে সেই বানান লিখে ফেলা হলে বানান ভুলের প্রবণতা বেড়ে যায়। ফলত শারীরিক দিক থেকে উচ্চারণ বিকৃতি ও বানান ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয়। প্রাকৃতিক বা জন্মসূত্রে বাগযন্ত্রের ত্রুটি সম্পন্ন মানুষদের পক্ষে এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

**ঘ) ভাষাতাত্ত্বিক দিক :** ভাষাতাত্ত্বিক নানা বিচার বিশ্লেষণ, নতুন নিয়ম বিধির যথেচ্ছাচার, ভাষা সম্পর্কিত নতুন নতুন মতবাদ প্রতিনিয়ত বনানের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। একারণে ধ্বনিমালা ও বর্ণমালাগত নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রজন্মের পর প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের।

**অ) ধ্বনিগত সমস্যা :** প্রাচীন বাংলার সময় থেকে বর্তমান কালের সরলীকৃত বাংলা ভাষার ধ্বনিরূপ কম বেশি বদলে যাচ্ছে। পৃথিবীর যে কোন জীবন্ত ভাষাতে এরকম ঘটনা ঘটে থাকে। কখনো নতুন ধ্বনির আবির্ভাব কিংবা বিলুপ্তি ঘটে। ফলে ধ্বনিমালায় সংস্কারের প্রয়োজন হয়। বাংলা ভাষার বানানে ধ্বনিগত পরিবর্তনগুলি  নিম্নরূপ :-

* সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনের সময়কালে বাংলা রূপ নেওয়ার সময় 'স'এর ব্যবহার বেশি থাকলেও 'শ' 'ষ' এর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে তিনটির বদলে একটি 'শ' উচ্চারিত হলেও লেখার বেলায় তিনটির পৃথক অবস্থান দেখানো হয়েছে।

ধ্বনিমালায় একটি 'জ' কিন্তু লিখিত রূপে 'য' এবং 'জ' এর অবস্থান সুনির্দিষ্ট।

একমাত্র 'ঋ' ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে 'ঋ' ও 'রি' একই ধ্বনি। কিন্তু শব্দভেদে তাদের অবস্থান পৃথক।

'ণ' ও 'ন' এর পৃথক উচ্চারণ না থাকলেও ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুসারে লিখিত রূপ আছে।

বহুস্থলে 'ন্দ্র' ও 'ঙ' একই হলেও শব্দের বানানে দুরকম প্রয়োগ আছে। যেমন- ব্যাঙ/ব্যাং।

'ঁ' ও 'ঞ' এর ক্ষেত্রেও একই সমস্যা আছে। যেমন মিঞা/ মিয়াঁ।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

'ঙ' ও 'ঙ্গ' উচ্চারণ ও লেখ রূপে বিভ্রান্তি আছে। ভাঙা/ ভাঙ্গা।

বাংলা ধ্বনিমালায় 'অ্যা' ধ্বনির উচ্চারণ অস্তিত্ব থাকলেও লেখার ক্ষেত্রে রূপ নেই।

**আ) বর্ণ সমস্যা :** বাংলা বানানের সংযুক্ত বর্ণের গঠনগত সমস্যা অতীব গুরুতর। দুই বা তিন বর্ণ জুড়ে বাংলায় যুক্ত বর্ণ তৈরি হয়, তা অন্য কোন ভাষায় নেই। কখনো বর্ণগুলি নিজেদের অবয়ব অটুট রেখে, আবার কখনো রূপ পরিবর্তন করে লিখিত হয়। ফলে বানান শিক্ষার্থীর মনে নানারকম বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। বানান লিখতে গিয়ে তারা যেমন বিভ্রান্ত হয়, তেমনি শিক্ষণীয় বানান সম্পর্কে শিথিলতা জন্মায়। কিন্তু সময়ের অবকাশে আগামী দিনে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে বলেই আমার মনে হয়।

পরিশেষে বাংলা ভাষা শিক্ষায় বানানের গুরুত্ব সম্পর্কে সময়োপযোগী, কালোপোযোগী ও যুক্তিগ্রাহ্য মান্য নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রকৃত ভাষা শিক্ষার গতিকে তরান্বিত করবে বলে আমার মনে হয়। শৈশব থেকে শিশু যে বানানের জ্ঞান লাভ করে, ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে তা সচেতনতার সঙ্গে লালন পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। মাতৃভাষার প্রতি এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোধ সমস্ত বাংলাভাষী মানুষদের অবশ্য পালন করতে হবে। বিদেশি যে কোন ভাষাভাষী মানুষেরা যখন বাংলা ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ দেখান তাদেরকেও সঠিক ভাবে ভাষাজ্ঞান লাভের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করতে হবে। বাংলা ভাষার বর্ণ পরিচয়, ধ্বনিতত্ত্ব, উচ্চারণ রীতি, শব্দগঠনের প্রক্রিয়া ইত্যাদি ব্যাকরণগত দিক সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান লাভ করতে হবে। অধুনা ফেসবুকের পাতায় কবি, গদ্যকারদের বাংলা বানান আসম্ভব ভুলে ভরা। এরা অনেকেই স্বঘোষিত কবি ব্যক্তিত্ব। চর্চা চলুক ক্ষতি নাই। কিন্তু তা হতে হবে নিয়ম মেনে। এটাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। সর্বোপরি অনতিবিলম্বে সমস্ত ধরনের সমাজ মাধ্যমে বাংলা ভাষা লেখার সময় মানুষকে সচেতনতার পথ অবলম্বন করতে হবে। বাংলা বানানের নানা বিকৃতি, অপপ্রয়োগ, লিখন বিভ্রাট, দ্রুত গতিতে ভুল বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাংলা বানানের খঞ্জত্ব, পঙ্গুত্বকেই প্রমান করবে। সুতরাং বাংলা বানানের অপপ্রবর্তনের চেষ্টাকে সচেতন ভাষাবোধ সম্পন্ন সামাজিক মানুষকেই রুখে দিতে হবে, তবেই বাংলা বানানের চরম উন্নতি সাধন ঘটবে।

**সূত্রনির্দেশ :**

১. পবিত্র সরকার, 'ভাষা, দেশ, কাল', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ- জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ পৃ. ৩০
২. পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাঙলা বানান বিধি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৮
৩. ঐ, পৃ. ১১৩

# বঙ্গদর্শন পত্রিকা ও বঙ্কিমের বিজ্ঞান সাধনা

স্বরূপ দে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিজ্ঞান সচেতক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনারও সূত্রপাত আরও জোড়ালো হয়। দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গে বিজ্ঞানও বাংলা ভাষায় রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে উঠে। 'বঙ্গদর্শন' ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি,অর্থনীতি, সমাজতত্ত্বের পাশাপাশি বিজ্ঞানকেও তাঁর অঙ্গনে ঠাঁই দিল। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলন, বাঙালি তথা ভারতবাসীকে উন্নতির পর্যয়ে নিয়ে যেতে গেলে প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। বিজ্ঞানচর্চাই পারবে বাঙালি তথা ভারতবাসীকে সচেতন ও যুক্তিনিষ্ঠ করতে। তাই তিনি বার্তা দিলেন জনকল্যানের স্বার্থে বিজ্ঞানকে পর্যালোচনা করা। এ প্রসঙ্গে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য়ের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক "বঙ্গদর্শনে'র সূচনা থেকেই জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাটি বঙ্কিম মাথায় রেখেছিলেন। বুঝেছিলেন বিজ্ঞানচর্চাকে বিজ্ঞানচেতনাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে"।[১] অমিত্রসূদণ ভট্টাচার্য তাই 'বঙ্গদর্শনে'র বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে আরও বলেন,"সাহিত্য পত্রিকার ১/৩ ভাগ জুড়ে বিজ্ঞান। এবং প্রথম প্রবর্তনাতেই"।২ তবে 'বঙ্গদর্শনে'র বিজ্ঞানচিন্তা সূত্রপাতের অনেক আগেই, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, বিজ্ঞান চিন্তা ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সমালোচক বলেন, "বস্তুতঃ এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত"।[৩] বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুটা আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছিলেন :

"বড়ো অরণ্যে শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাকেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে"।[৪]

'বঙ্গদর্শন'-এ এই বিজ্ঞানচর্চার কান্ডারি ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র বিজ্ঞানচর্চার পথপ্রদর্শক। শুধু তাই নয় তাঁর হাত ধরেই বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিজ্ঞান মনস্কতা নতুন ভাষা পায়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিজ্ঞানকে পাঠকের সম্মুখে নিয়ে এলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন প্রতিটি মানুষের জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞানচর্চাকে, বিজ্ঞানচেতনাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাই বলেছেন ঃ

"তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান,





কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন"।[৫]

২

বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চা ছিল যুক্তিবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ। তা ছিল তথ্য, তত্ত্ব ও পরিসংখ্যানের যথার্থ প্রয়োগ। বিজ্ঞানচর্চার কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে গতি, জগতের বিশেষ অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধমাত্র।'৬ তবে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে 'বঙ্গদর্শনে' যে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই তার বীজ উপ্ত হয়েছিল। ফলে 'বঙ্গদর্শনে' বিজ্ঞানচর্চার পূর্বে, তার একটি ক্রমধারাবাহিকতা তথা প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই বিজ্ঞানচর্চার সেই প্রেক্ষাপটকে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মিশনারীদের দ্বারা। 'শ্রীরামপুর মিশন' (১৮০০ খ্রি.), 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭ খ্রি.) 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭ খ্রি.) এর ত্রিবেণী শক্তির প্রচেষ্টাতেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় প্রাথমিক গতিলাভ হয়।

এর পরবর্তীতে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এবং এই 'স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন-রবার্সনের 'অঙ্কপুস্তকম', উইলিয়াম হফকিন্স ও পিয়ার্স-এর 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮১৯), ইউলিয়াট ইয়েটসের 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩১) ইত্যাদি। এছাড়াও ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশ করে। যেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা যে বাঙালির মধ্য দিয়ে প্রথম প্রতিফলিত হয়েছিল তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৩ সালে আমহার্সকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার কথাও তিনি বলেছিলেন। এর পরবর্তীতে অক্ষয় কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬ খ্রি.) আবির্ভাব। তাঁর প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'ভূগোল' (১৮৪১ খ্রি.) প্রকাশিত। এছাড়াও তাঁর বিজ্ঞান চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতি সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১-১৮৫৩ খ্রি.), ও 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬ খ্রি.) গ্রন্থদুটিতে।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকে সর্বাত্মক করে তোলার জন্য 'বোধোদয়' (১৮৫০ খ্রিঃ), 'জীবনচরিত' (১৮৪৯ খ্রিঃ) দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এছাড়াও 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্ববর্তী সময়ে যারা বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯ খ্রি.), দ্বারকানাথ ঠাকুর

(১৭৯৪—১৮৪৬ খ্রি.), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২ খ্রি —১৮৯১ খ্রি.), মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩ খ্রি.—১৯০৪ খ্রি.), প্রমুখ। 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বে, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও বিজ্ঞানচর্চার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যেমন—বিজ্ঞান সেবধি, আয়ুর্বদে দর্পণ, বিজ্ঞান মিহিরোদয়, বিজ্ঞান কৌমুদী ইত্যাদি। এই পত্রিকাগুলি ছাড়াও অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩ খ্রি.) পত্রিকাতেও বিজ্ঞানচর্চা লক্ষ্য করা যায়। ফলে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বেই সমগ্র বিশ্ব ও ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল। সকল মানুষকে বিজ্ঞন চেতনায় সচেতন করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যঃ

"যেখানে তোমার সূর্য আলোক দেয়,...জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক্, কেহই না মানুক্, সে যেন একপ্রান্তে থাকিয়া তোমাকে না চিনে, তোমাকে মানিয়া চলে।"[৭]

'বঙ্গদর্শনে' বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়েই। এবং তাঁকে অনুসরণ করে 'বঙ্গদর্শনে'র অন্যান্য লেখকেরা। সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়েরই সমুচিত পর্যালোচনা ছাড়া মানুষের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়, বলে তাদের ধারণা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে, অন্তর্বিজ্ঞানের সঙ্গে বহির্বিজ্ঞানের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষেই বিজ্ঞান সম্পর্কে বঙ্কিম বলেছিলেন :

"বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে, কিন্তু যে বিজ্ঞানকে অবমাননা করে বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু"।[৮]

ফলে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' শুধু বিজ্ঞান প্রসঙ্গই নিয়ে আসেননি, তার পেছনে তিনি সতর্কবার্তাও দেন। বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে, 'গোয়টের বৈজ্ঞানিক গবেষণা' শীর্ষক প্রবন্ধের শুরুতেই হেল্‌মহোল্‌ৎস বলেছিলেন :

"it could not but be that Goethe– whose comprehensive genius was most strikinglylife like freshness the realities of nature and human life in their minutest details."[৯]

'বঙ্গদর্শনে' বিজ্ঞানচর্চার প্রধান কান্ডারি ছিলেন দুইজন ব্যক্তি, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। এছাড়াও 'বঙ্গদর্শনে'র অনেক লেখক বিজ্ঞানচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে জগদানন্দ রায়ের মতো ব্যক্তিবর্গ।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সকল লেখকের মতকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য বিজ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানচর্চা দ্বারা বাঙালি যাতে বস্তুগতভাবে লাভবান হয় সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাই যখন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জুলাই 'Indian Association for the cultivation of





Science' বা 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করেছিলেন। তাই বিজ্ঞানের কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন,

"একদিন — তখন দিন হয় নাই — এককালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না, - বায়ু ছিল না,.... তাহা ছিল জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে।"[১০]

বঙ্কিমের নিজেরও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে Idea তথা ধারনা ছিল। একটি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্রের পুত্র বিপিনচন্দ্রকে লেখেন,

"মেজবাবুর রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। আমার নিজের ব্যবস্থা, এক আধ dose china দিবে, China এ অবস্থায় বলকারক।"[১১]

যাইহোক 'বঙ্গদর্শনে' বিজ্ঞানচর্চা সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ছিল। আর বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান গবেষক।

৪

বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিশেষ আগ্রহী ও অনুরাগী। পড়াশুনার ব্যাপ্তিই তাঁকে বিজ্ঞানচর্চার অনুধাবনে সাহায্য করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার ফলে, বিজ্ঞান তার কাছের মানুষ হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশকালে, আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানচর্চা তার কয়েকটি ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন বিজ্ঞান পুস্তক বাংলাতে লেখা হতে হবে। এবং চিত্রসহযোগে পরিস্কার ভাষায় তা লেখা হবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উল্লেখযোগ্য :

"আর এক শ্রেনীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, "কোনটি মানিতে হইবে তাহা জানিনা। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না। বিজ্ঞানে কি আছে তাহাও জানি না।"[১২]

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অনেক পূর্বেই বিজ্ঞানচিন্তা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন। এই সময় কলকাতায় 'Bengal Social Science Association' এ বঙ্কিমচন্দ্র 'A popular Literature for Bengal' শীর্ষক একটি লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন ১৮৭০ এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

"To Bengali literature must continue to be assigned to subordinate function of being the literature for the people of Bengal– and it is as yet hardly capable of occupying even that subordinate– but extremely in portent– position."[১৩] অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চায় তিনি বাংলা ভাষা গ্রহণের বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রথম ভাগেই বঙ্কিম বিজ্ঞানকে পাঠকের সামনে নিয়ে এলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতেই বিজ্ঞানের প্রকাশ শুরু হল। রয়াল ৮ পেজি ফর্মার ৪৮ পাতার পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা ৪৯ থেকে ৯৬। ৭২ থেকে ৮৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। সাহিত্য পত্রিকার ১/৩ ভাগ জুড়ে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যাত্রার

শুরুতেই বঙ্কিম ‘বিজ্ঞান কৌতুক’ শিরোনামে দুটি নিবন্ধ লিখলেন। প্রথমটি ‘স্যার উইলিয়াম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা’, দ্বিতীয়টি ‘আশ্চর্য সৌরৎপাত’। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলি পরবর্তীতে ‘বিজ্ঞানরহস্য’ সন্দর্ভে একত্রিত করেছেন, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

**৫**

‘বঙ্গদর্শনে’ বঙ্কিমচন্দ্রের মোট ৯ টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি নিম্নরূপ :

১) ‘সর উইলিয়াম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা’ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ)

২) ‘আশ্চর্য সৌরৎপাত’ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ)

৩) ‘আকাশে কত তারা আছে?’ (অগ্রহায়ণ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ)

৪) ‘ধূলা’ (ফাল্গুন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ)

৫) ‘চঞ্চল জগৎ’ (ভাদ্র, ১২৮০ বঙ্গাব্দ)

৬) জৈবনিক’ (কার্তিক, ১২৮০ বঙ্গাব্দ)

৭) ‘গগণ পর্য্যটন’ (পৌষ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ)

৮) ‘কত কাল মনুষ্য? (ফাল্গুন, ১২৮০ বঙ্গাব্দ)

৯) ‘পরিমাণ-রহস্য’ (চৈত্র, ১২৮০ বঙ্গাব্দ)

এই প্রবন্ধগুলি সবই ‘বিজ্ঞানরহস্য’ বইতে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে নয়টি প্রবন্ধ ছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণেও নয়টি প্রবন্ধ ছিল। তবে প্রথম সংস্করণের সংকলিত ‘সর উইলিয়াম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা’ পরিত্যক্ত হয় বরং তার জায়গায় ১২৮১ চৈত্রের ‘ভ্রমর’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘চন্দ্রালোক’ প্রবন্ধটি অন্তর্ভূক্ত হয়। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

“এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্সলী, টিন্ডল, প্রকটর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে।”[১৪]

‘বিজ্ঞান কৌতুক’ শিরোনামে ‘বঙ্গদর্শনে’ বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। যথা এক ‘সর উইলিয়াম টমসন কৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা ছিল “পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি হইল কি প্রকারে?”[১৫] জীব হইতে জীবের জন্ম এই নিয়ম; তবে বিনা জীবে জীব হইল কি একারে?” টমসন বলেছেন,

“অনেক উল্কাপিন্ড বীজবাহী অন্য গ্রহ হইতে বীজ আনিয়া এই পৃথিবীতে বপন করিয়াছে”।[১৬]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একে মেনে নিতে পারেননি। বঙ্কিম বলেছেন ঃ

‘বুঝিলাম, এই পৃথিবী, অন্যগ্রহপ্রেরিত বীজে, উদ্ভিদ ও জীবাদি সৃষ্টি বিশিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে, সে গ্রহেই বা প্রথম জীব কোথা হইতে আসিল?’[১৭]





আমরা আবার জিজ্ঞাসা করিব, ‘সে অন্য গ্রহেই বা বীজ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ পারস্পযের আদি নাই।’[১৮]

‘আশ্চার্য সৌরৎপাত’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে সূর্যদেহ বিস্ফোরণ, সৌর শিখার প্রচণ্ডবেগে উৎক্ষেপণ ও সৌরদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে বিলীণ হওয়ার কথাও ব্যক্ত হয়েছে। সৌরৎপাতের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

“নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখন্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্তে সৌর গগণ ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ সকল উর্দ্বে ধাবিত হইতেছে।”[১৯]

শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বলেছেন। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে উর্দ্বে নিক্ষিপ্ত বস্তু আবার নিম্নেই ফিরে আসে। তাই বঙ্কিম বলেছেন, ‘আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড উর্দ্বে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ...।”[২০]

‘আকাশে কত তারা আছে?’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সূর্যের সঙ্গে তারার তুলনা করেছেন। যেখানে দৃশ্যমান বিন্দুবৎ নক্ষত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই সূর্য্যের চেয়ে আকারে বড়, তার কথাও প্রবন্ধে উল্লেখ হয়েছে। এছাড়াও প্রাবন্ধিক বঙ্কিম এই প্রবন্ধে নীহারিকা প্রসঙ্গ এনেছেন। বঙ্কিম বলেছেন,

“দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগণা ভাণ্ডারে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধুম্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে।”[২১]

আবার ছায়াপথের কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন :

“আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে মন্দাকিনী বলি।”[২২]

সর উইলিয়াম হর্শেল গণনা করে স্থির করেছেন যে, কেবল ছায়াপথের মধ্যেই ১৮০,০০০,০০, (এক কোটি আশি লক্ষ) তারা আছে। প্রবন্ধের শেষে আর এক বৈজ্ঞানিক সত্য দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করেছেন। বঙ্কিম বলেছেন,

“পৃথিবীর মধ্যে এককনা বালুকা, জগৎমধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র — বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব।”[২৩]

বঙ্কিমচন্দ্র ‘ধূলা’ প্রবন্ধটি আচার্য্য টিন্ডল এর ‘Dust and Diseases’ অবলম্বনে রচিত। এই প্রবন্ধে কৌতুকের মধ্য দিয়ে গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান করেছেন বঙ্কিম। প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, ধূলার মত সাধারণ পদার্থ আর সংসারে নেই। ধূলা সর্বত্রব্যাপী, আর এই সর্বত্রব্যাপী ধূলিকণা থেকেই বিভিন্ন সংক্রামক পীড়ার সৃষ্টি হয়। বঙ্কিম বলেছেনঃ

"ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ, সংক্রামক জ্বরের বীজে জ্বর উৎপন্ন হয়; বসন্তের বীজে বসন্ত জমে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা ইত্যাদি।"[২৪]

বঙ্কিম বলেছেন, এই পীড়াবীজে যে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয় তাই নয়, পীড়াবীজের জন্য ক্ষতাদি শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়। যত 'বাবুগিরি' করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিস্কৃতি নাই।

'চঞ্চল জগৎ' প্রবন্ধটির ইংরেজি পরিভাষা হল — ' The universe in motion'। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম গতিশীলতাকেই জগতের নিয়ম বলেছেন। শুধু পৃথিবী নয়, সমগ্র সৌরজগৎই গতিসূত্রে আবদ্ধ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

"যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী।"[২৫]

গগণরহস্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য রয়েছে এই প্রবন্ধে। শুধু তাই নয়, পদার্থবিদ্যা বিষয়ক ভাবনারও পরিচয়ও আমরা এই প্রবন্ধে পাই।

জৈবনিক' প্রবন্ধটি বঙ্কিমের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে জৈবনিকের ব্যাখ্যা, তথা জৈবনিকের গঠন, কার্যকারিতা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, বঙ্কিম বলেছেন এই জৈবনিকই বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হাম্বোলট বা শঙ্করাচার্যের পাণ্ডিত্য সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া। তাই বঙ্কিম বলেছেন,

"আমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃহে ও রসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।"[২৬]

জৈবনিক' প্রবন্ধটি রসায়ন শ্রেণীভুক্ত। আমাদের শাস্ত্রে মানবজীবনের সাথে পঞ্চভূতের যে সম্পর্ক আছে, তা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সেই পঞ্চভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাঁদের মতে জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান ও যবক্ষারজান—এই চারটির সংযোগের ফল হল জৈবনিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

"ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।"[২৭]

'গগণ পর্য্যটন' প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের নিরীখে রচিত। প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় রয়েছে। যেমন বেলুনে ব্যবহৃত গ্যাস কি, ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুর চাপে, বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর চাপ, এবং তাপমাত্রার তারতম্য, আকাশে নীলিমার কারণ ইত্যাদি। বঙ্কিম বলেছেন, মস্তকোপরে, আকাশ অতি নিবিড় নীল, সে নীলিমা আশ্চর্য।

এরোপ্লেন তখনো আবিস্কৃত হয়নি। কিন্তু বঙ্কিমই 'গগণ পর্য্যটন' প্রবন্ধে উড়োজাহাজের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে গেছেন। গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মসুর ফ্লামারিয়ঁ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের শেষে তাঁর উক্তিই তুলে ধরেছেন,



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

"যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাস্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গপদ প্রাপ্তিয় সম্ভাবনা।"[২৮]

'কত কাল মনুষ্য!' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম নিদর্শন। এই প্রবন্ধটি charler Lyell-এর (১৭৯৭-১৮৭৫ খ্রি.) 'Antiquity of Man' অবলম্বনে রচিত। এখানে বঙ্কিম পৃথিবীর উৎপত্তি, জীবের ফসিল, আদিম মানুষের চিহ্ন ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন,

"বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমত শক্তি হয় নাই যে জগৎ অনাদি, কি সাদি, তাহার মীমাংসা করেন। তবে এক কালে, জগতের যে রূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম"।[২৯]

'পরিমাণ—রহস্য' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে'র অন্যতম বিজ্ঞান প্রবন্ধ। এখানে বঙ্কিম একদিকে যেমন পৃথিবীর ওজন, সূর্যের দূরত্ব ইত্যাদির পরিচয় আছে, তেমনি অপরদিকে নক্ষত্রের সংখ্যা, সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণও পাওয়া যায়। আসলে বঙ্কিম এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিম প্রবন্ধে বলেছেন, আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যা বিশ্বাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নয়।

যাইহোক 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমের বিজ্ঞান প্রবন্ধ একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। তবে বঙ্কিমের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি বিজ্ঞানকে সকল মানুষের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে হয়, তার জন্য প্রয়োজন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা। এমত বিজ্ঞান বার্তাবাহক বঙ্কিম প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা, তুমি অত জগৎ, সৃষ্টি সায়েন্স ফায়েস এ সব করছো কেন?"[৩০] যদিও রামকৃষ্ণের বক্তব্য ঠিক বিজ্ঞান বিরোধী ছিল না। বঙ্কিম সম্বন্ধে তার আলাদা প্রত্যাশাই এখানে ধরা পড়েছে।

**৬**

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানের চর্চায়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেই, তাঁর বিজ্ঞান ভাবনার মতামতকে তুলে ধরেছেন। ফলে প্রসঙ্গক্রমে, উঠে এসেছে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীব ও শারীরবিদ্যা, আকাশ, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি। এই সব বিষয়ে তিনি যেমন তথ্যনিষ্ঠ মতামতকে তুলে ধরেছেন তেমনি অন্যের মতকেও যুক্তি দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান ভাবনাকে সময়ের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে গড়ে তুলে ছিলেন। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার সার্থকতা।

**তথ্যসূত্র :**

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : বলাকা : বাঙালীর বিজ্ঞানচর্চা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ২৭-২৮
২. তদেব, পৃ. ৩০০-৩০২
৩. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৪,পৃ ৫২

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা পত্র, বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৫১৯-৫২০

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৫৩৪

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসব, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম খণ্ড, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২ সাল, কলকাতা, পৃ. ৪৮৭

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চঞ্চল জগৎ, বঙ্গদর্শন,দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৮০,পৃ. ১৯৩

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, বঙ্গদর্শন,প্রথম খণ্ড, প্রথম বর্ষ, ১৮৭৩, পৃ. ২০৮

৯. দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৪-৩৫

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, : কত কাল মনুষ্য?, বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৮০, কাঁটালপাড়া,পৃ. ৫০৯-৫১০

১১. তদেব,পৃ. ৯৭৪

১২. তদেব, পৃ. ৩০৪-৩০৫

১৩. Bankimchandra Chattapadhaya –A Popular Literature for Bengal–Bankim Rachanabali– Voll. III– Sahitya Sansad–2011–kolkata– P. 97

১৪. তদেব,পৃ. ১৯

১৫. তদেব,পৃ. ৭৪

১৬. তদেব,পৃ. ৭৪

১৭. তদেব,পৃ. ৭৫

১৮. তদেব,পৃ. ৭৫

১৯. তদেব,পৃ. ৭৮

২০. তদেব,পৃ. ৭৯

২১. তদেব,পৃ. ৩৭৮

২২. তদেব,পৃ. ৩৭৭

২৩. তদেব,পৃ. ৩৭৯

২৪. তদেব,পৃ. ৩৬৬

২৫. তদেব,পৃ. ১৯৭

২৬. তদেব,পৃ. ৩০৬

২৭. তদেব,পৃ. ৩০৩

২৮. তদেব,পৃ. ৩৫৪

২৯. তদেব,পৃ. ৫০৯

৩০. শ্রীম কথিত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড), তৃতীয় ভাগ, কথামৃত ভবন, পূর্ণ প্রকাশন, ২০০৮, পৃ ৫




# বিশ শতকের প্রেক্ষিতে ভারত-শিল্পচর্চার অভিমুখ ও প্রবাসী পত্রিকা

**দেবজ্যোতি মণ্ডল**

প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্যের মতো শিল্পকলাও রাজকীয় পৃষ্টপোষকতায় সমৃদ্ধ লাভ করেছে। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসের দিকে তাকালে স্পষ্টই চোখে পড়ে যে, ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, থেকে শুরু করে মুঘল অনুচিত্র পর্যন্ত সব শিল্পকলাই সমকালীন রাজকীয় পৃষ্টপোষকতায় নান্দনিক উৎকর্ষ লাভ করেছিল। যদিও এই প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়পর্বে যথার্থ পৃষ্টপোষকতার অভাবে অনেক শিল্পচর্চার অবলুপ্তি ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় পাশ্চাত্য শিল্পের পাশাপাশি ভারত শিল্পের চর্চাও শুরু হয়। আধুনিক যুগে শিল্পকলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে শিল্পসাধনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শিল্পচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন রাজা-নবাব-বাদশা থেকে ঔপনিবেশিক শাসকরা। আধুনিক যুগে গণমাধ্যমের প্রয়াস এই পৃষ্টপোষকতায় পরিবর্তন এনেছে। শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে তথা সাধারণ জনমানসের কাছে শিল্পের নান্দনিকতাকে এনে হাজির করার ক্ষেত্রে সমকালীন সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকাগুলি যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এপ্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে এদেশের মানুষের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় সংবাদপত্রের, পরে সাময়িক পত্রের পথ চলা শুরু হয়।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িক পত্রগুলিতে মূলত সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, শাস্ত্র, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক রচনাই প্রকাশিত হতো। অধিকাংশ সংবাদপত্রগুলিই কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হতো। ফলে এই সমস্ত সংবাদপত্র ও পত্র- পত্রিকায় শিল্পচর্চা বিষয়ে কোনরকম উৎসাহ চোখে পড়ে না। যদিও এই সময়ের বহু প্রকাশিত বইয়ে প্রচ্ছদের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। প্রচ্ছদের শৈল্পিকমান নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও অলঙ্করণ শিল্পের ছোঁয়া যে সেই সময়ের সাহিত্যে স্বল্প হলেও পড়েছিল, তা স্বীকার করতে বাধা নেই। দরবারি চিত্রকলার জায়গায় উঠে এল ‘কোম্পানি চিত্রকলা’। ফলে ভারতীয় শিল্পের চর্চার পরিবর্তে ইংরেজ সরকারের পৃষ্টপোষকতায় ইউরোপীয় শিল্পের চর্চা শুরু হয়। ইংরেজ শিল্পীদের পাশাপাশি একদল ভারতীয় শিল্পীর উদ্ভব হল, যারা কাঠ খোদাই ও ধাতু খোদাই শিল্পকে জীবিকা করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে জন্ম হয় আরেক শ্রেণির শিল্পীর, যারা ইংরেজ শিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্য রীতিতে শিল্পচর্চা শুরু করেছিলেন। সমকালীন ‘সমাচার দর্পণ’, ‘জ্ঞানান্বেষণ’, ‘শিল্প পুষ্পাঞ্জলি’, ‘সম্বাদ ভাস্কর’ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিল্প বিষয়ক আলোচনা সভার কথা পাওয়া যায়। এইসব পত্রিকায় শিল্পকলার প্রসঙ্গ থাকলেও ভারতীয় শিল্পকলার বিষয়ে কোন সম্যক ধারণা পাওয়া যায় না। সেই দিক থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'ভারতী-বালক' পত্রিকা এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় ভারতীয় শিল্পী ও ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই পত্রিকাগুলিতে ভারতীয় শিল্পীদের কথা ও শিল্পবিষয়ক লেখালেখির সঙ্গে একবর্ণ ও বহুবর্ণে ছাপা ছবি প্রকাশ করা হয়। তবে এই সময়কালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' (১২৯৯ ব. থেকে ১৩০২ ব.) এবং মন্মথনাথ চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'শিল্প ও সাহিত্য' (১৩০৫ ব. থেকে ) পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত ভারতীয় শিল্প ও শিল্পের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাগুলি ভারত শিল্পচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উনিশ শতকে ভারত শিল্পের ইতিহাস চর্চার ধারার সূচনা করেন রাম রাজ। তাঁর 'মানসার' গ্রন্থে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্যের সঙ্গে মূর্তি ও চিত্রকলার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন- "রাম রাজের লেখায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এক বাঙালি শিল্পী শ্যামাচরণ প্রামাণিক, যিনি সর্বপ্রথম কোনো আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষায় ভারত-শিল্প বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"[১] পরবর্তী শতকের শুরুতেই ভারত শিল্পচর্চার আলোচনা এক অন্য মাত্রা লাভ করে। ভারতীয় শিল্পকলার উন্মেষের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে এক নতুন শৈলীর জন্ম হল। নব্যবঙ্গীয় শৈলীর মধ্যদিয়ে অবনীন্দ্রনাথ দেশীয় শিল্পের পথ খুঁজে পেলেন। ভারতীয় অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা রেখে প্রাচীন গুহাচিত্র, মুঘল অনুচিত্র, রাজপুত চিত্রকলার সমন্বয়ে এক নতুন শিল্প শৈলী সৃষ্টি করেন। সরকারি আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেল থেকে শুরু করে নিবেদিতা, আনন্দ কুমারস্বামী, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কলাসমালোচকরা এই নব্যবঙ্গীয় শিল্পীর পক্ষে লেখনী ধরেন। যদিও এই শৈলীর বিপরীতে অক্ষয়কুমার মৈত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, উপেন্দ্রকিশোর রায় প্রমুখজন সোচ্চার হয়েছিলেন। ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই শৈলীতে পরিপ্রেক্ষিত ও চরিত্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে বাস্তবিকতা লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে তাঁর মনে করেন। বাস্তবিকতার নিরিখে ভারতীয় শিল্পের চর্চার ফলে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে।

ভারত শিল্পচর্চার এই দ্বৈত অবস্থানের মাঝে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ করেন। সুদীর্ঘ সত্তর বছর ধরে উৎকর্ষ বজায় রেখে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমকালীন ধর্ম, দর্শন, তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরে বেরিয়ে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্যকে জনমানসে প্রচার করেছিল। শুধু তাই নয়, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমারের মতো ভারতীয় শিল্পীদের পাশাপাশি রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলোসহ পাশ্চাত্য শিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পকর্মের আলোচনা পত্রিকাকে সমৃদ্ধ দান করে। এপ্রসঙ্গে রামানন্দ সম্পাদিত 'প্রবাসী'-র শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে ভারত শিল্পচর্চার অভিমুখকে সহজেই ধরা যেতে পারে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

প্রবাসী পত্রিকা প্রথম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায়। এই সংখ্যায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'অজন্টা-গুহা—চিত্রাবলী' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে অজন্তা গুহাচিত্রের কথা বলতে গিয়ে অজন্তার ছবিগুলির নিখুঁত বর্ণনা করেছেন। বুদ্ধদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত এই চিত্রকলা থেকে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশের কথাও আলোচিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে ফার্গুসন সাহেবের মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণকে সামনে এনেছেন প্রাবন্ধিক — "অজন্টাচিত্রগুলি আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রের সমতুল্য নহে, কিন্তু সে গুলি যে যুগে চিত্রিত হইয়াছিল, তৎকালীক ইউরোপীয় চিত্র অপেক্ষা নিশ্চয় উৎকৃষ্ট।"[২] পরবর্তীকালে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর লেখা 'অজন্তার চিত্রাবলী' নামক প্রবন্ধটি আষাঢ়, ১৩২১ সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়। এছাড়াও ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় অসিতকুমার হালদারের লেখা 'বাঘগুহা' নামক প্রবন্ধটি ভারত শিল্পচর্চার ধারাকে যে আরও গতিশীল করে তোলে, তা অস্বীকার করা যায় না। এইভাবে প্রবাসী পত্রিকার হাত ধরে বিশ শতকের পাঠকমহল ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার ঐশ্বর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে শুরু করে।

এই সময়পর্বে লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ভারতের তক্ষণ ও চিত্রবিদ্যা' নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, পাশচাত্যের তুলনায় ভারতীয় শিল্পকলার উন্নতি ঘটলেও তা প্রচারের অভাবে ভারতীয় শিল্পীদের উন্নতি ঘটে নি। ইসলামিক সময়পর্বে শিল্পের উন্নতি ঘটলেও আধুনিক যুগে এই উন্নতির ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ শাসনকালে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা সূত্রপাত ভারতীয় শিল্পের অবনতির পথকে আরও প্রশস্ত করে। পরবর্তীকালে বিশ শতকে অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে ভারতীয় শিল্পের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। এইভাবে প্রাবন্ধিক সাধারণ জনমানসে ভারতীয় শিল্পকলার মূল রসের সন্ধান দিয়েছেন।

শ্রাবণ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা 'ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের শিল্পের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্মসাধনার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। প্রথমদিকে ব্রিটিশ কলারসিকদের একটি দল ভারতীয় শিল্পের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। ভারতীয় শিল্পের অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, উপনিষদের সময়কালে ভারতীয় শিল্পকলার জন্ম হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনই ভারতীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত ভিত্তি। তাই বিশ শতকে সমগ্র বাংলাদেশে শিল্পসাধনার যে ঢেউ উঠেছিল, তার গভীরে আছে দেশের সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস ও সৌন্দর্যতত্ত্ব। এখানেই ভারত শিল্পের অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সমরেন্দ্রনাথের লেখা 'মোগল চিত্রের আমদানী' বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। বৌদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় চিত্রকলার তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি, তা ঠিক। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল শিল্পরীতি ভারত শিল্পকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। আকবরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই শিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। যদিও এই

সময়ের হিন্দু শিল্পীরা পারসিক পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কন করতেন বলে জানা যায়। এপ্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন— "মোগলশিল্প পারসিক ও হিন্দুশিল্পের উপর গঠিত। যতদিন পর্যন্ত, মোগলচিত্র পারসিক ও হিন্দুচিত্রের প্রভাব দূর করতে পারে নি ততদিন সে ছিল ক্ষীণ অমুক্ত। মোগলশিল্পী এ সময় স্থির করতে পারছিল না কোনটা ত্যাগ করবে, কোনটা রাখবে, বা কোনটা ফুটিয়ে তুলবে। শিল্পী তাই একই চিত্রে খানিকটা হিন্দু খানিকটা মোগল ধরণের ছাপ দিয়ে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়েছিল।"[৩] এছাড়াও স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বস্ত্রবয়ন, হাতির দাঁতের কাজ, রত্ন-অলঙ্কার সহ তৈজস, প্রস্তর ও মৃৎপাত্র প্রভৃতি শিল্পে মুঘল আমল বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এপ্রসঙ্গে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলা' ও ব্রজসুন্দর সান্যালের লেখা 'মোগল-রাজত্বে চিত্র-কলা' প্রবন্ধেও পারসিক ও চৈনিক চিত্রকলার প্রভাবে যে মোগল চিত্রকলার উদ্ভব হয়েছে তা স্পষ্টতই আলোচনা করা হয়েছে। আপাতঅর্থে এই আলোচনাকে আধুনিক ভারত শিল্পচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে হয় না। কিন্তু লেখক ও সম্পাদক আসলে এর মধ্যদিয়ে ভারতীয় অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটানোর যেমন চেষ্টা করছেন, তেমনি ভারত শিল্পচর্চার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন।

কার্তিকচন্দ্র দাসের লেখা 'ভারতীয় স্থাপত্যের দাবী' নামক রচনাটি বৈশাখ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে ফার্গুসনের 'History of Indian and Eastern Architecure' গ্রন্থের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনিই প্রথম ভারতীয় স্থাপত্যকলার প্রতি টান অনুভব করেন। একজন বিদেশি কলারসিকের পক্ষে ভারত শিল্পের চর্চা করা এক গুরুত্বপূর্ণ নজির। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের স্থাপত্যকীর্তির কথা বলতে গিয়ে দিল্লি, বুলন্দশহর, মাদ্রাজ, জয়পুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের মন্দির, স্মৃতিসৌধের নাম উঠে এসেছে।

এই বিশেষ কালপর্বে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'র 'ভারত-শিল্প-সম্ভার' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সেখানে ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে শিল্পদ্রব্য কেনা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেছেন। এরফলে ভারত শিল্পের গুরুত্ব যে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সস্তা বিদেশি দ্রব্যের মোহে আচ্ছন্ন শিক্ষিত ভারতবাসীর দেশীয় শিল্পের চর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষিত সমাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতশিল্প পুনরুজ্জীবিত হতে পারে বলে মনে করা হয়- "এসময়ে দেশের লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে প্রকৃত পন্থা আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। সাধ্যমত স্বদেশের বস্তু ব্যবহার করিব-এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না হইলে ফল হইবে না।"[৪] এছাড়াও যোগেশচন্দ্র রায় 'দেশে কলার বিস্তার' নামক প্রবন্ধটি কার্তিক, ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায়। দেশীয় শিল্পের প্রতি ভারতবাসীর উৎসাহের পরিবর্তে বিদেশিদের আকর্ষণ অনেক বেশি। ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে আলোচনা করে প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন, পাশ্চাত্য বা অন্যদেশের তুলনায়



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

ভারত শিল্পের সৌন্দর্য কোনো অংশে কম নয়। স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিলাতি দ্রব্য বয়কট ও দেশীয় শিল্পকলার প্রদর্শনীর মধ্যদিয়ে শিল্পীদের উৎসাহদানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে দেশীয় শিল্পদ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

রমাপ্রসাদ চন্দ 'ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা' প্রবন্ধে নব্যভারতীয় শিল্পকলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি দাবী করেছেন শিক্ষিত রুচিশীল দেশবাসী তাঁরা নব্যভারতীয় শিল্পের প্রতি আস্থা রাখতে পারেননি। বরং তাদের গৃহে শিল্পী রবি বর্মার ছবি স্থান পেয়েছিল। অজন্তা চিত্রকলা বা ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্যশিল্পের মতো 'স্বভাবানুকরণ' অবনীন্দ্রনাথের শৈলীতে ছিল না। রমাপ্রসাদের বিরোধিতা উত্তরে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ভারতীয় শিল্পের স্বাভাবিকতা গুণ না থাকলে হ্যাভেল সাহেব, নিবেদিতার মতো কলারসিকেরা এই শিল্পকলার স্বপক্ষে মন্তব্য করতেন না। নব্যভারতীয় শিল্পীরা শিল্পের নতুন দিকের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা উৎকৃষ্ট মানের ছবি অঙ্কন করে গেছেন। এপ্রসঙ্গে সম্পাদক ভারতশিল্প সম্পর্কে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন —" আমি এক সময়ে রবিবর্মা ও তাঁহার সম্প্রদায়ের গোঁড়া ছিলাম। আমার লেখা তাঁহার সচিত্র জীবনচরিত এখনও বাজারে বিক্রী হয়। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞপাশে বদ্ধ। ৫।৬ বৎসর পূর্বে ছবি সম্বন্ধে স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার সহিত উত্তেজিত ভাবে চিঠি লিখিয়া রবিবর্মা পক্ষাবলম্বনপূর্বক তর্ক করিয়াছিলাম। আমার চিঠির উত্তরে সেই মনস্বিনী বত্রিশ পৃষ্ঠা এক চিঠি লিখিয়া, একটু বিবেচনার পর, তাহা আমাকে পাঠান নাই। পরে স্বর্গীয়া লেখিকারই মুখে শুনিয়াছি যে তিনি এই ভাবিয়া আমাকে ইহা পাঠান নাই যে আমি ছবি দেখিতে দেখিতে উহার মর্মজ্ঞ হইব, তর্ক দ্বারা আমার চোখ খুলিবে না। মর্মজ্ঞ হইয়াছি কি না, জানি না; কিন্তু এখন, তাঁহার যেরূপ ছবি ভাল লাগিত, আমিও তদ্রূপ ছবির অনুরাগী হইয়াছি।"[৫] একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা নিবেদিতার সংস্পর্শ সম্পাদক রামানন্দের চোখ খুলে দেয়। ভারত শিল্প চর্চার শুরুর দিকে রবি বর্মার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন রামানন্দ। পরে নব্যভারতীয় শিল্পের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। ফলে সম্পাদক হিসাবে প্রবাসী পত্রিকায় পাশ্চাত্য অনুকরণধর্মী শিল্পের বিপরীতে গিয়ে দেশীয় শিল্পের অভিনব চর্চা শুরু করেন। এইভাবেই 'প্রবাসী'কে কেন্দ্র করে ভারত শিল্পচর্চার অভিমুখ বদলে যেতে থাকে।

এপ্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, দীর্ঘদিন ধরে নিবেদিতার সহায়তায় 'প্রবাসী'তে বহু দেশি- বিদেশি ছবি পরিচয়সহ প্রকাশ পেয়েছিল। পরবর্তীকালে রামানন্দের ইংরেজি পত্রিকা 'মর্ডান রিভিউ' তে নিবেদিতার শিল্প বিষয়ক আলোচনাগুলি ভারত শিল্পের চর্চাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যায়।

আষাঢ়, ১৩২১ বঙ্গাব্দের 'ভারত-শিল্পের অন্তর্পকৃতি' শীর্ষক রচনায় শিল্পী অসিতকুমার হালদার সুকুমার কলাশিল্পের মূলে রূপকের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেন। শিল্পী আসলে

অন্তরের সৌন্দর্যকে নানা রূপে, নানা ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। জাপানি শিল্পী ওকাকুরার প্রসঙ্গ টেনে প্রাবন্ধিক শিল্পীর গুণ হিসাবে প্রাচীন আদর্শ, স্বকীয় ভাবনা ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংযোগকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'প্রকৃতির যে সব জিনিস আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই, ভারতশিল্প তা নকল করবার চেষ্টা কখনও করে নি', তাই ভারতশিল্পের চর্চায় প্রকৃতির কথা থাকলেও প্রকৃতিকে অনুকরণ করার প্রসঙ্গ নেই। আবার নলিনীকুমার ভদ্র 'ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্ম' প্রবন্ধে ভারতীয় শিল্পকলার আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই শিল্পে অধ্যাত্ম-ভাব-কল্পনার রূপায়ণ অনেক বেশি, ফলে শিল্পীরা আধ্যাত্মিক পারিপার্শিক পরিমণ্ডল তৈরি করেছেন। পাশ্চাত্য শিল্পীদের মতো ভারতীয় শিল্পীরা বাস্তবের অনুকরণ করেন না, তাঁরা রক্ত মাংসের দেহের মধ্যে বিদেহী সত্তাকে প্রকাশ করেন। ফলে ভারতীয় শিল্প বাস্তবের থেকে অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করে। এখানেই ভারতীয় শিল্প অন্যান্য শিল্পকলার থেকে স্বতন্ত্র।

আবার মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিকতা' প্রবন্ধে অজন্তার চিত্রশৈলীর প্রাণসত্তা অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় শিল্পীরা রূপের মাধ্যমে অরূপকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। অন্যান্য দেশের শিল্পীদের মতো স্বদেশি শিল্পীরাও দেশীয় ঐতিহ্য মেনে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা সৃষ্টি করেছেন। 'ভারতীয় শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি' শীর্ষক রচনায় সমালোচক সুধীরচন্দ্র খাস্তগীর জানিয়েছেন, পরাধীন দেশে ভারতীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার যে প্রচেষ্টা, তার পশ্চাতে ছিল উগ্র স্বদেশপ্রীতি। তারফলে এক লহমায় বিদেশি দ্রব্যের দলে বিদেশি চিত্রকলাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যদিও স্বাধীনতার পরে শিল্পীদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। ভারতীয় শিল্পের সমালোচনায় শুধু বিদেশিদের নয়, ভারতীয় কলারসিকদের এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে বিদেশি কলাসমালোচকেরা যথার্থ ভারত শিল্পকলার বিচার করতে পারবেন না। স্বাধীনতার পরে শিল্পের কদর বাড়লেও ভারত শিল্পচর্চার গতিপ্রকৃতিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথার্থ সমালোচকের অভাব আছে , এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আর তাই অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার কথা তাঁর 'ভারতের শিক্ষাতন্ত্রে কলা-শিল্পের স্থান' প্রবন্ধে করেছেন। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেছেন — "সুরশিল্পের ক্ষেত্রে যে নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে তার অনুরূপ কোনও চেষ্টা রূপশিল্পের ক্ষেত্রে আজও দেখা গেল না। সাধারণ লেখাপড়ার বিদ্যালয়ে রূপবিদ্যার বড় একটা স্থান নাই।" ৬ যদিও কিছু স্কুলে চিত্রকলার চর্চা হতো। আসলে শিশুকাল থেকেই সৌন্দর্যবোধের জাগরণের বিষয়ে ভারতবাসীর সদিচ্ছার অভাব লক্ষ্য করা যায়। আধুনিককালে শিশুচিত্তের বিকাশের ক্ষেত্রে চিত্র তথা শিল্পকলার পাঠ দেওয়া প্রয়োজন। শিল্পকে যারা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। এবিষয়ে বোম্বাই প্রদেশের সরকার শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের সমন্বয়ের জন্য



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বিশেষ কমিটি গড়ে তুলেছেন। এরফলে হয়তো ভারতবর্ষে শিক্ষাধারা তার প্রকৃত পথ খুঁজে পাবে বলে আশা করা যায়। এপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে, সেটি হল শিল্পশিক্ষার সঙ্গে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সংযোগসাধন করা। শিল্পপতিদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ব্যাতিত ভারতীয় শিল্পকলার উন্নতি একপ্রকার অসম্ভব। "ভারতশিল্পের মান নির্ণয়ে শিল্প-আলোচকরা সমসাময়িক পত্রপত্রিকার পাতায় পাতায় যুক্তি-তর্কের সুবিশাল বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন। এরই আড়ালে তৈরি হচ্ছিল শিল্পীদের একক সত্তা এবং জনমানসে শিল্পের প্রচার ও প্রসার।"[৭]

সমগ্র বিশ শতক জুড়ে শিল্পকলার ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা- নিরীক্ষা চলেছে। ভারত শিল্পকলার চর্চার ক্ষেত্রে তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তবে শুধুমাত্র গতানুগতিক রীতির অনুসরণ করলে ভারত শিল্পচর্চার অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব নয়। তার সাথে অজন্তা, বাগ গুহা চিত্রশৈলী, মুঘল-রাজপুত শিল্পশৈলী সঙ্গে পাশ্চাত্যের নানা মত ও পথের অনুসরণ ভারতীয় শিল্পকলার রূপায়নকে সার্থক করে তুলতে পারে। বড় কথা হল এটাই যে, আর্টের কোনো জাত নেই, কোনো কাল নেই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আঙ্গিকের ভাবধারার আদান-প্রদান ভারতীয় শিল্পকলাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে। ক্রমবর্ধমান ভাঙাগড়ার খেলার মাধ্যমে শিল্পচর্চার অগ্রগতি সম্ভবপর বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাই শুধুমাত্র দেশজ শিল্পের প্রতি আস্থা না রেখে বৈশ্বিক শিল্পভাবনার দিকে নজর দিলেন। ১৯১৯ এ গড়ে তোলেন কলাভবন। নব্যভারতীয় শিল্পের প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসে ভারতীয় শিল্পচর্চার নতুন এক নতুন দিক উম্থাপিত করেন। এখান থেকে ভারত শিল্পের চর্চা আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

**তথ্যসূত্র:**

১. অশোক ভট্টাচার্য, ভারত-শিল্প ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, শ্রী ভারতী প্রেস, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ- ১৯
২. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ- ১৩
৩. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী পত্রিকা, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ- ১২৮
৪. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী পত্রিকা, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩০৯, পৃ -২০
৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী পত্রিকা, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২০, পৃ - ২০২
৬. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী পত্রিকা, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫৪, পৃ ১৮
৭. অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), দশদিশি শিল্পকলা সিরিজ প্রথম ভাগ, নারায়ণ সাহু, বাংলা পত্র- পত্রিকায় শিল্প আলোচনার সূচনা, ২০০৪, পৃ- ১২৭

# বাংলাদেশে পত্র পত্রিকার পরিচয় ও সবুজ পত্র

রানা ভট্টাচার্য

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা দিগদর্শন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে শ্রীরামপুর মিশন থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দিগদর্শনের পরে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে মার্শম্যানের সম্পাদনায় সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় জজ, কালেক্টর সাহেবদের নিয়োগের খবর, নতুন আইন প্রণয়ণের খবর, বাণিজ্যের বিবরণ, ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের নানা প্রদেশের সংবাদ, সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, বিদ্যাচর্চা, পুস্তক চর্চার বিবরণ ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হত। এই সময় প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় কলকাতা থেকে বাঙ্গাল গেজেটি নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে Baptist Auxaliary Missionary Society থেকে গসপেল ম্যাগাজীন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টীয় ধর্ম ও তত্ত্ব বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা। খ্রিস্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা নিন্দাবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ রামমোহন রায় শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে Brahmunical Magazine The Missionary and The Brahmun NO.1 ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসনারি সম্বাদ সং ১ ১৮২১ নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্মের নিন্দার প্রতিবাদ করা ও হিন্দুধর্মের উদারতার কথা তুলে ধরা।

১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌথ উদ্যোগে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয়। লোকহিত সাধন এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য। সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় সম্বাদ কৌমুদী জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়েছিল। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক মাসিক পত্রিকা পশ্বাবলী প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে জন্তুর বিবরণ এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর কাঠ খোদাই চিত্র থাকত। ওই বছরের মার্চ মাসে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে ভিন্ন মত হওয়ায় ভবানীচরণ সম্বাদ কৌমুদীর সংসর্গ ত্যাগ করেন। সমসাময়িক কালে আরো কয়েকটি পত্রিকা, যথাক্রমে খ্রিস্টের রাজ্যবৃদ্ধি(১৮২২), সম্বাদ তিমিরনাশক(১৮২৩), বঙ্গদূত(১৮২৯), ব্যবহার দর্পণ (১৮২৯), শাস্ত্র প্রকাশ(১৮৩০) প্রকাশিত হয়।





১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বারত্রয়িক রূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি দৈনিক রূপে প্রকাশিত হয় এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের গৌরব অর্জন করে। রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের লেখনীতে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। ওই বছর সমাচার সভারাজেন্দ্র ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইয়ং বেঙ্গল দের মুখপত্র ছিল পত্রিকাটি। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্বাদ রত্নাকর, সম্বাদ সারসংগ্রহ, জ্ঞানোদয়, বিজ্ঞান সেবধি, সংবাদ রত্নাবলী, বিজ্ঞান সারসংগ্রহ, প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর-এর বাড়িতে তত্ত্ববোধিনী সভা গড়ে ওঠে। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনা ও ব্রহ্ম বিদ্যার প্রচার সাধন। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র রূপে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজনীতি, প্রভৃতি নানা বিষয়ক আলোচনাধর্মী রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হত। অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, চারুপাঠ প্রভৃতি বিখ্যাত রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনীর সমসময়ে সম্বাদ গুণাকর, সম্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী, সংবাদ সৌদামিনী, সম্বাদ দিবাকর, সম্বাদ ভাস্কর, সম্বাদ রসরাজ প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক কালে বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় জাম-ই-জাহান-নুমা (উর্দু), মীরাৎ- উল-আখবার (ফার্সী), উদন্ত মার্তণ্ড (হিন্দি) প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী যা অন্যান্য আঞ্চলিক পত্রিকাকে প্রভাবিত করেছিল।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার উদ্দিষ্ট পাঠক ছিলেন সমাজের মহিলারা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জানানো হয় স্ত্রীলোকদের মঙ্গলের জন্য পত্রিকাটি ছাপা হবে এবং পত্রিকাটি ভাষা হবে যে ভাষায় সচরাচর কথাবার্তা হয় অর্থাৎ চলিত গদ্যে। প্রতি মাসে এই পত্রিকার একটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হত, মূল্য ছিল এক আনা। প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকায়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাসিক পত্রিকার বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য প্রকাশিত হয় মুদাগর পত্রিকা।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র রূপে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা বিদ্যোৎসাহিনী প্রকাশিত হয়। এই প্রত্রিকায় বাল্যবিবাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, সভ্যতার অগ্রগতি বিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হত। কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা প্রভৃতি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড ও ব্রায়ান স্মিথের সম্পাদনায় এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ প্রকাশিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরবর্তী সময়ে সম্পাদক হন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতসঙ্গীত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লালবিহারী দের সম্পাদনায় অরুণোদয় পত্রিকা ওই বছরই প্রকাশিত হয়। পত্রিকার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পত্রিকার ভাষা কেমন হবে তা বলতে গিয়ে সম্পাদকীয় কলমে বলা হয়- পত্রিকার ভাষা হবে সুকোমল ও সুগম, গুরুগম্ভীর ভাষার প্রয়োগ করা হবে না, বাক্য হবে সরল, শব্দের প্রয়োগ হবে যথাযথ।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং এক বছরের জন্য ( ১৩ জুন ১৮৫৭ - ১৩ জুন ১৮৫৮) সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন। এই আইন ১৮৫৭ সালের ১৫ আইন নামে খ্যাত। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রতি সোমবার প্রকাশিত হত। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম রাজনৈতিক পত্রিকা। বাংলা ভাষার বিকাশ ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আগেকার সাহেবি বাংলা, মৈথিলি বাংলা, সংস্কৃত বাংলা ভেঙ্গে বিশুদ্ধ বাংলা লেখবার ও সাহিত্যে আনবার প্রয়াস শুরু হয় সোমপ্রকাশ পত্রিকায়, যা বাংলা ভাষা বিকাশে সহায়ক হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় পূর্ণিমা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক সময়ে হিতবিলাসিনী, ভারতবর্ষীয় সভা, সৌদামিনী, রঙ্গপুর দিক প্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিবিধার্থ-সংগ্রহের অভাব পূরণার্থে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা রহস্য সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গ্রামের মানুষের সমস্যা, অত্যাচারিত হওয়ার নানা ঘটনার কথা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এপ্রিলেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা অবোধবন্ধু প্রকাশিত হয়। বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিসর্গ সন্দর্শন, বঙ্গসুন্দরী, সুরবালা কাব্য, কৃষ্ণকমলের পৌলবর্জনী, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত, প্রভৃতি কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আগস্ট মাসে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মহিলাদের শিক্ষিত ও সচেতন করা তোলা সর্বোপরি মহিলাদের মঙ্গল কামনার্থে এই পত্রিকার প্রকাশ। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা সচিত্র ভারত সংবাদ



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

প্রকাশিত হয়। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্তি ও জীবন চরিত্রের গল্প, পুরাবৃত্ত, দেশ বিদেশের সংবাদ ও অন্যান্য ঘটনার সারমর্ম সকল বিষয় চলিত বঙ্গভাষায় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন প্রকাশের প্রধান অভিপ্রায় ছিল ইংরেজি ভাষা থেকে পাওয়া বিদ্যাকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বঙ্গদর্শনে শুধু সাহিত্য নয়, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, গ্রন্থালোচনা, বাংলা ভাষা, সমাজতত্ত্ব, বাঙালির জীবনচর্চা, কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রামদাস সেন, রামগতি ন্যায়রত্ন, মদনমোহন তর্কালংকার, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকের লেখা বঙ্গদর্শন পত্রিকায় স্থান পায়। বঙ্গদর্শন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ, এই পত্রিকা সাহিত্য ও সমালোচনার উপযুক্ত ভাষা ও আদর্শ সৃষ্টি করেছে। এই পত্রিকার অন্যতম আদর্শ ছিল সমাজ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনে সহায়তা করা এবং পাশাত্য দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচিত করে তোলা। বঙ্গদর্শনে ব্যক্তিগত নিবন্ধ রচনারও সূচনা ঘটে।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবেই এই মাসিকপত্রের প্রকাশ। পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষণা ও পরিচালনায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ভারতী পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ভাষার আলোচনা, জ্ঞানোপার্জন, ভাব সমৃদ্ধিতে সাহায্য করা। পত্রিকাটি পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি পর্যন্ত জীবিত ছিল। ১২৮৪ থেকে ১৩৩৩ পর্যন্ত অনেকেই সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গদ্যরীতির বিবর্তনে পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অসিতকুমার হালদার, সতেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বড়দিদি উপন্যাস ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় নবজীবন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে ধর্ম তত্ত্বের ব্যাখ্যা থাকত। হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ বিষয়ক নানা লেখা স্থান পেত পত্রিকা জুড়ে। সূচনা ছাড়া নবজীবন প্রথম সংখ্যায় আটটি লেখা স্থান পায়। এরমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ‘ধর্মজিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়। নবজীবনে প্রথম

থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন ধর্মের কথা প্রচার করতে শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন, সুখ, ভক্তি, প্রীতি, দয়া, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, প্রভৃতি প্রবন্ধ নবজীবনে প্রকাশিত হয়। ওই বছরই বঙ্কিম জামাতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধায়ের সম্পাদনায় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা প্রচার প্রকাশিত হয়। 'সীতারাম' উপন্যাস সহ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৯০ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন প্রকাশ বন্ধের পর ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনার জন্য বিশেষ করে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও ভাবনাকে সমকালের দৃষ্টিভঙ্গির উপযুক্ত করে গড়ে তুলে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে প্রচার-এর মত একটি পত্রিকার কথা ভেবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রচার পত্রিকাটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাকে ফলপ্রসূ হতে সহায়তা করে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা বালক প্রকাশিত হয়। কবিতা, গান, উপন্যাস, গল্প, চিঠি মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটির মতো রবীন্দ্রনাথের লেখা বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক বছর প্রকাশিত হওয়ার পর বালক পত্রিকা ভারতীর পত্রিকার সঙ্গে মিশে যায়, নাম হয় ভারতী ও বালক। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এই পত্রিকায় প্রথম প্রাচীন লোকাচার ভেঙ্গে হিন্দু নারী সমাজে আধুনিক রীতি নীতি প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন। এছাড়াও ছোটদের বিদ্যাশিক্ষা, চালচলন, রুচি এবং মানসিক বিকাশে নতুন ধারা আনবার লক্ষে বালক পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এই পত্রিকায় সাত ভাই চম্পা, টাক ডুমা ডুমডুম রূপকথাগুলির নাট্যরূপ প্রকাশ করেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। বাংলা শিশু সাহিত্য রচনার বিকাশে পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম ছিল।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য কল্পদ্রুম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা থেকে সম্পাদক হন। তিনি সাহিত্য কল্পদ্রুম পত্রিকার নামকরণ করেন সাহিত্য। এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের সেবা, বৃদ্ধি ও যা সত্য-সুন্দর সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্য পত্রিকার নিয়মিত লেখক তালিকায় ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, দীনেন্দ্র কুমার রায় সহ আরও অনেকে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা সাধনা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকার শেষ বছরে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র ছোটগল্পের বিকাশের ধারায় এই পত্রিকার অবদান ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের সমস্যাপূরণ, মেঘ ও রৌদ্র, অনধিকার প্রবেশ সহ প্রায় আটত্রিশটি ছোটগল্প এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় হিতবাদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ছোটোগল্পের বিকাশে এই পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এই পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প দেনাপাওনা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

প্রকাশিত হয়। পোস্টমাস্টার, গিন্নী, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান প্রভৃতি বিখ্যাত ছোটগল্প প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র রূপে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে বেঙ্গল একাদেমি অব লিটারেচার নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার ঘটানো। পরে উমেশচন্দ্র বটব্যাল সংস্থার নাম পালটে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রাখার প্রস্তাব দেন এবং তা সভায় গৃহীত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, খগেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি তরল প্রকৃতির সাহিত্য এই পত্রিকা প্রকাশ করবে না। এতে সেই ধরণের প্রবন্ধ স্থান পাবে যেখানে নতুন তত্ত্ব, তথ্য প্রকাশিত হবে। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে তা যত সংক্ষিপ্ত হোক পরিষৎ তা প্রকাশ করবে।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রদীপ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার শুরুতেই বলা হয় নতুন কিছু করবার চেষ্টা পত্রিকার পাতা জুড়ে দেখা যাবে। এই পত্রিকায় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের মরিব কি বাঁচিব, শষ্য ও স্বাস্থ্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মায়াবাদ, সুখীর উক্তি দুঃখীর উক্তি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি, রজনীকান্ত চক্রবর্তীর লেখা জীবনী মূলক রচনা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাস কলিকাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস লাল পল্টন, জলধর সেনের ভ্রমণমূলক রচনা প্রবাসের সুখ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ হাফটোন ছবি, দীনেন্দ্রকুমার রায়, রাধামণী দেবী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গল্প, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান মূলক প্রবন্ধ আলোকতত্ত্ব প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি আজও জীবিত। উদ্বোধন পত্রিকা নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সব অর্থেই উদ্বোধন একটি সার্থক সম্পূর্ণ পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পসহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা এই পত্রিকায় ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন। পাঁচ বছর এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ (১৯০১-১৯০৫ খ্রিঃ)। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' বিখ্যাত উপন্যাস দুটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়,

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চণ্ডীচরণ বন্ধোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি নিয়মিত লেখালেখি করতেন এই পত্রিকায়। ১৯০১ এলাহাবাদ শহরের প্রয়াগ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। রচনা গুলির মধ্যে 'গোরা', 'জীবনস্মৃতি', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'শেষের কবিতা', ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে এই পত্রিকায় হারামণি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। এতে সারা বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত লোকসঙ্গীত সংকলিত হত। হারামণির প্রথম ভাগে গগন হরকরার আমি কথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে গানগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধ কর্তার ইছায় কর্ম, ছোটো ও বড়ো, ছোটগল্প অতিথি, পনরক্ষা, কর্তার ভূত প্রভৃতি রচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধায়ের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা অর্চনা প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রশেখর মুখোপাধায়ের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা উপাসনা। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত চতুর্থ সাময়িক পত্রিকা ভাণ্ডার পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মানসী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মানসী পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল নতুন নতুন লেখকের খোঁজ ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করা। এই পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনার পাশাপাশি ফটোগ্রাফি ও ছবি ছাপা হতো। পরবর্তী সময়ে মানসী মর্মবাণী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পত্রিকার নাম হয় মানসী ও মর্মবাণী। সমসময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা যমুনা প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু লেখা যমুনায় প্রকাশিত হয়। সমাজ ও ধর্মের উন্নতি সাধনের সঙ্গে নতুন লেখক লেখিকার সম্ভাবনাকে তুলে ধরার জন্য যমুনা পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় গল্পলহরী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ছোটদের পত্রিকা সন্দেশ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় সন্দেশ পত্রিকার পথচলা শুরু হয়। উপেন্দ্রকিশোরের পাশাপাশি নিয়মিত লিখতেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুকুমার রায় সন্দেশ পত্রিকায়। সন্দেশ পূর্ববর্তী ছোটদের আরও কয়েকটি পত্রিকা হল প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত সখা(১৮৮৩ খ্রীঃ), শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত পত্রিকা সখা ও সাথী (১৮৯৪ খ্রীঃ) মুকুল (১৮৯৫ খ্রীঃ) প্রভৃতি। সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল, শিশুদের আনন্দের সাথে সাথে জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ও সুকুমার চিত্তবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করা।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে জলধর সেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য আলোচনা, ধর্মদর্শন, সমাজ, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশ পেত। লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন



ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VIII, Issue : XVII

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধি বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কালিদাস রায় প্রমুখ। শরৎচন্দ্রের বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে, বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত (১-৩পর্ব), দেবদাস, নিষ্কৃতি, গৃহদাহ, দত্তা, দেনা-পাওনা, নববিধান, শেষপ্রশ্ন, শেষের পরিচয়, একাদশী বৈরাগী প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্প ভারতবর্ষ পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজ পত্র প্রকাশিত হয়। বাংলা চলিত গদ্যের বিকাশে পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী একটি সাহিত্যপত্র প্রবর্তনের সংকল্প প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ৫৪ তম জন্মদিনে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজ পত্র প্রকাশিত হয়। বাংলা চলিত গদ্যের বিকাশে পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞাপন হীন ক্ষুরধার লেখনী সমৃদ্ধ সবুজ পত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন ধারায় চালিত করে। এই পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সব ধরণের লেখায় প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি দুটি পর্বে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়- প্রথম পর্ব(১৩২১-২৮) এবং দ্বিতীয় পর্ব(১৩৩০-৩৪)। সবুজ পত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর মেজদা যোগেশ চৌধুরীর উইকলি নোটস প্রেস ও ক্রান্তিক প্রেস থেকে ছাপা হত। পত্রিকার প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। পত্রিকার প্রচ্ছদে ছিল যৌবনের সবুজ রং, সবুজের ওপর কালো তালপাতার ছবি। এর মাঝে ছিল নবজীবনের শাশ্বত বাণী, "ওঁ প্রাণায় স্বাহা"। প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা এবং বার্ষিক মূল্য দু টাকা ছ আনা। প্রথম সংখ্যার লেখক ছিলেন তিনজন। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী নিজে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২১) সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর দুটি প্রবন্ধ, "মুখবন্ধ" ও বীরবল ছদ্মনামে "সবুজ পত্র"; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা "সবুজের অভিযান" ও গল্প "হালদার গোষ্ঠী" এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা কবিতা সবুজ পাতার গান প্রকাশিত হয়। পত্রিকার শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রমেশ বসুর লেখা প্রবন্ধ বঙ্কিম সাহিত্যে মানবতার আদর্শ, দিলীপ কুমার রায়ের লেখা প্রবন্ধ ভ্রাম্যমান জল্পনা, নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের লেখা প্রবন্ধ বার্ধক্য ও বৃদ্ধের আবদার, ননীমাধব চৌধুরীর চীন ও ইউরোপ প্রবন্ধ, প্রমথ চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথ ও টমসন প্রবন্ধ, ফরাসী সাহিত্য প্রবন্ধ, পূর্ব ও পশ্চিম প্রবন্ধ ও বর্ষশেষ(সম্পাদকের নিবেদন), প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রবন্ধ। পত্রিকার প্রথম দিক জুড়ে প্রকাশিত হত কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, কথিকা। পরবর্তী সময়ে চিঠি, উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা ধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা জুড়ে বহু সংখ্যক লেখকের নাম আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী ছাডাও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিত কুমার চক্রবর্তী, কালিদাস রায়, প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র কুমার বসু,

রমাপ্রসাদ চন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সতীশচন্দ্র ঘটক, রামকমল মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সরযুবালা দাশগুপ্ত, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, কিরণ শঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ভুপেন্দ্রনাথ মৈত্র, বরদাচরণ গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ। লেখার বিষয়ের মধ্যে থাকত সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, অলংকারশাস্ত্র, সংগীত, চিত্রকলা, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, শিক্ষা, জাতীয় কংগ্রেস, কৃষক জমিদার সম্পর্কিত রচনা, ভ্রমণকাহিনি প্রায় সমস্ত ধরণের রচনা প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রথম বছর জুড়ে বেশির ভাগ লেখা সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। পত্রিকার প্রথম বছরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মোট সাতটি গল্প প্রকাশিত হয়  যথা- হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা। দ্বিতীয় বছরের শেষ সংখ্যা থেকে প্রমথ চৌধুরীর লেখা গল্প চারইয়ারী কথা প্রকাশিত হতে থাকে। সবুজপত্রে তিনি আরো অনেকগুলি গল্প লিখেছিলেন, যথা- বড়বাবুর বড়দিন, আহুতি, একট সাদা গল্প প্রভৃতি। পত্রিকা জুড়ে প্রকাশিত কয়েকটি রচনা হল- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ছন্দ(প্রবন্ধ), রমাপ্রসাড চন্দের উত্তরাপথে রাষ্টীয় ঐক্য(প্রবন্ধ), সতীশচন্দ্র ঘটকের হাসি(প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস গল্প,যা পরবর্তীতে চতুরঙ্গ উপন্যাস নামে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফাল্গুনী(নাটক), সরযুবালা দাশগুপ্তের অন্নপূর্ণা(নাটক), বিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের হিতসাধন(কথিকা), প্রিয়নাথ সেনের প্রাচীন ফারসী কবিতা থেকে অনুদিত অব্যক্ত বাসনা(কবিতা), ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর আদর্শ(প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরেবাইরে (উপন্যাস), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বলাকা (কবিতা), সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মনীষীমঙ্গল(কবিতা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈরাগ্য সাধন(নাটক), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রীর পত্র(প্রবন্ধ), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের তীর্থ ভ্রমণ(পুস্তক সমালোচনা, রিচার্ড মিল্টনের লেখা এলেগোরি অবলম্বনে কিরণ শঙ্কর রায়ের কবির বিদায়(গল্প), হারিতকৃষ্ণ দেবের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা(প্রবন্ধ), বীরবলের শিশু সাহিত্য(প্রবন্ধ), সুরেশচন্দ্র সেনের বিদ্যাপতি(প্রবন্ধ), অতুলচন্দ্র গুপ্তের বাঙ্গালীর শিক্ষা(প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গ মর্ত্য(নাটক), সুরেশচন্দ্র চকবর্তীর মানুষ ও সমাজ(প্রবন্ধ), কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সোহাগ(কবিতা), তারিকুল আলমের আজ ঈদ(প্রবন্ধ), সতীশচন্দ্র ঘটকের ক্ষুধা(প্রবন্ধ), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মানবী(কবিতা), কান্তিচন্দ্র ঘোষের সনেট(কবিতা), সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাব্যজিজ্ঞাসা(প্রবন্ধ), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা(প্রবন্ধ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রবীন্দ্রনাথ(কবিতা), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একখানি পত্র(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা), প্রমথনাথ বিশীর পাখির কথা(প্রবন্ধ) প্রভৃতি।

সবুজ পত্র পাঠকরা পড়তেন শুধুমাত্র চলিত গদ্যে লেখা বলে তা কিন্তু নয়, সবুজ





পত্র তাঁদের নিয়ে যেত ঘরের উঠোন থেকে বাইরের খোলা মাঠে, দেশ থেকে বিশ্বে আর অতীত থেকে বর্তমানে, পুরাতন থেকে নতুনে। সবুজ পত্র গতানুগতিক ধরনের পত্রিকা ছিল না, পত্রিকাটি পুরোনো চিন্তা ও অস্পষ্ট মনোভাবকে কখনোই প্রশ্রয় দিত না। নতুন নতুন বিষয়ের জ্ঞান সংগ্রহ করা ও দেশ বিদেশে প্রচারিত বিভিন্ন মত ও পথকে যাচাই করা তার অন্যতম মুখ্য কর্ম ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবুজ পত্র পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটির মুল সুর বেঁধে দেন, তাঁর লেখা সবুজের আহ্বান কবিতায়- ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা/ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে বলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙালি জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন “একটা নতুন কিছু কর।” তবে সবুজ পত্র নতুন কিছু করবার জন্য প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য মূলত চারটি, প্রথমত: বাংলা গদ্যে সাধু ভাষার নির্ভরশীলতা কাটিয়ে চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রচেষ্টা;  দ্বিতীয়ত: সংকীর্ণ চিন্তা ঝেড়ে মুছে বিশ্বজনীন আধুনিক চিন্তা ভাবনা গ্রহণ করা;  তৃতীয়ত: সাহিত্যে ও সমাজে ইউরোপীয় ভাবধারার নতুনত্বকে আহ্বান করা ও যৌবনের গান গাওয়া; চতুর্থত: একদল নতুন লেখকের সৃষ্টি, যাঁরা অন্তত পুরাতন ধ্যান ধারণাইয় বিশ্বাসী না হয়ে বিশ্বব্যাপী নতুন চিন্তা চেতনার অংশীদার হয়ে উঠবে।

**তথ্যসহায়ক:**


১। অশোককুমার সরকার, বাংলা সাময়িক পত্রিকার ক্রমবিকাশ পঞ্জি, অতএব প্রকাশনী। কলকাতা, ১৯৯৫

২। তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত) বাংলা পত্র পত্রিকা সম্পাদক ও সম্পাদনা, কোরক, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িক-পত্র (১ম ও ২য় খন্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৩

৪। সন্দীপ দত্ত বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিবৃত্ত (১৮১৮-১৮৯৯), গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২

৫। সন্দীপ দত্ত বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিবৃত্ত (১৯০০-১৯৫০), গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬

৬। সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১০

৭। স্বপন বসু ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), দুই শতকের বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্রিকা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৫

# ‘বঙ্গদর্শন’-এ রবীন্দ্ররচনা

**স্বরূপ দত্ত**

রবীন্দ্রনাথ ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদনার কাজ করেন বৈশাখ ১৩০৮ থেকে চৈত্র ১৩১২ — পাঁচ বছরে মোট ৬০টি সংখ্যা। হ্যাঁ ‘সম্পাদনার কাজ করেন’ এই বাক্যাংশটি খুব সন্তর্পণে এবং সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি। কারণ রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ‘বঙ্গদর্শন’-এর স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন না, ছিলেন কেবলই একজন সম্পাদক, বলা যায় কর্মচারী। ফলত বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শন বা শ্রীশচন্দ্র-শৈলেশচন্দ্রদের বঙ্গদর্শন — এই কথাগুলি বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে চললেও, রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শন কথাটি সর্বতোভাবে এঁদের সঙ্গে এই একই পঙ্কিতে সেই অর্থে উচ্চারণ করা উচিত বলে অন্তত আমি মনে করি না। বৈশাখ ১৩০৮, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ‘নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন’-এর প্রথম সংখ্যায় ‘নিবেদন’ অংশে শ্রীশচন্দ্রের লেখা কথাগুলি এক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় —

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এক্ষণে রাজকার্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেইজন্য অনুজ শ্রীমানশৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।[১]

এখানে দু’টি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘নিশ্চিন্ত’ এবং ‘তত্ত্বাবধান’ — কেমন যেন বৈপরীত্যময় দু’টি শব্দ। অর্থাৎ, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে যেমন বঙ্কিমই ছিলেন সব, এক্ষেত্রে কিন্তু তা হল না, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হলেও কেবল তাঁর একার উপর ভরসা না করে শ্রীশচন্দ্র তাঁর ভাই শৈলেশচন্দ্রের উপর এক প্রকার monitoring-এর দায়িত্ব দিচ্ছেন। যদিও ‘নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন’-এর পরিচালনা থেকে উদ্দেশ্য নির্ধারণে মোটামুটি রবীন্দ্রনাথই ছিলেন শেষ কথা। এখানেই আরেকটি বিষয় একটু ভাববার আছে, কারণ ওই শব্দ দু’টি আপাতভাবে বিপরীত মনে হলেও, আসলে কিন্তু তা নয়। ইতিপূর্বে ‘সাধনা’ ও ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনা করা রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যব্যক্তিত্ব সে সময় দ্বিতীয়রহিত, ফলত এটা স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে শ্রীশচন্দ্ররা কিছুটা ‘নিশ্চিন্ত’ হবেন। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথেরও পত্রিকা সম্পাদনার ধরন ছিল অনেকটাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ। আর এখানেই সমস্যা, আর তাই ‘তত্ত্বাবধান’-এর প্রশ্ন। বৈশাখ ১২৮৪, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত প্রথম সংখ্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ শীর্ষক রচনায় বঙ্কিম লিখেছিলেন —





যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় সাময়িকপত্র এবং এতদ্দেশীয় সাময়িকপত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে এখানে যিনি সম্পাদক তিনিই প্রধান লেখক — ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র — কদাচিৎ লেখক। পত্র ও প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটক মাত্র — স্বয়ং বরকর্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন না। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।[২]

সঞ্জীবচন্দ্র আর শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন নিয়ে বঙ্কিমের এই ইচ্ছা অনেকাংশেই পূর্ণতা পেয়েছিল, তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, ‘সাধনা’ ও ‘ভারতী’তে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, বঙ্গদর্শনে আবারও লেখার ক্ষেত্রে সম্পাদককেন্দ্রিকতার যুগ ফিরে আসতে চলেছে। বাস্তবে হয়েছেও তাই, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মোট লেখার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়েই রবীন্দ্রনাথ। সম্পাদনার প্রথম দুই বছরে তো প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ লেখা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই, অবশ্য তৃতীয় বছর থেকেই স্বসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তাঁর রচনার সংখ্যা ক্রমশ নিম্নমুখী। —

| বর্ষ | মোট রচনা | সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের রচনা | অন্যান্য লেখকদের রচনা |
|---|---|---|---|
| ১৩০৮ | ১৩১ | ৫০ | ৮১ |
| ১৩০৯ | ১৬৬ | ৫৯ | ৮৭ |
| ১৩১০ | ১৩২ | ৩৭ | ৯৫ |
| ১৩১১ | ৯৫ | ২৯ | ৬৬ |
| ১৩১২ | ১২০ | ২৮ | ৯১ |
| ৬০টি সংখ্যা | ৬৪৪ | ২০৩ | ৪৪০ |

‘সাধনা’-‘ভারতী’-র সম্পাদক-লেখক রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ে এসে অবশ্য অনেক বেশি সংযত রচনার সংখ্যাগত বিচারে। যেখানে অগ্রহায়ণ ১৩০১ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩০২ ‘সাধনা’য় প্রকাশিত মোট রচনার প্রায় ৫৯.২৮ শতাংশ এবং বৈশাখ ১৩০৫ থেকে ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫ ‘ভারতী’তে প্রকাশিত মোট রচনার ৫২.৫৬ শতাংশই রবীন্দ্রনাথের, সেখানে ‘বঙ্গদর্শন’-এর পাঁচ বছরে তুলনায় অনেকটাই কম — ৩১.৫২ শতাংশ। আসলে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে সেভাবে বাইরের লেখকদের থেকে রচনাসংগ্রহ করতে কিছুটা অপারগ ছিলেন, হয়তো কিছুটা অনিচ্ছুকও ছিলেন। এর কারণ হতে পারে,

তাঁর একার উপর পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত দায়ভার এবং লেখার মান সম্পর্কে তাঁর অতি সতর্কতা। ফলত সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চাপ বেড়েছে বারবার। আর তাই দীর্ঘদিন ধরে কোনো পত্রিকাই তিনি সেভাবে সম্পাদনা করতে পারেননি, এমনকি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক'-এর কর্মাধ্যক্ষ পদেও একই ঘটনা। 'বঙ্গদর্শন'-এ আর লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের রইল না। সম্ভবত শ্রীশচন্দ্র অনুজ শৈলেশচন্দ্রকে এই কারণেই তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। শৈলেশচন্দ্রেরই কাজ ছিল লেখা সংগ্রহ করা, রবীন্দ্রনাথ কেবল সম্পাদক-লেখক। ৩ এপ্রিল ১৯০১ অর্থাৎ ১৩০৭-এর চৈত্র মাসের শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন —

শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের সম্পাদক কাকে ঠিক করলে এখনো খবর পাইনি।[৩]

এর মোটামুটি দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে গেল বৈশাখের বঙ্গদর্শন। সুতরাং, লেখা সংগ্রহ যে আগে থেকে চলছিল, আর তার মূল হোতা যে ছিলেন শৈলেশচন্দ্র তা সহজেই অনুমেয়। ফলত রবীন্দ্রনাথ সরাসরি মনোযোগ দিতে পারলেন পত্রিকা সম্পাদনা ও নিজের লেখায়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখার সংরূপগত বিন্যাসের দিকে একটু চোখ বোলানো দরকার। —

| বর্ষ | রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা | কবিতা ও গান | গল্প ও উপন্যাস | নাটক | গদ্য ও প্রবন্ধ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩০৮ | ৫০ | ৪ | ১০ | ১ | ৩৫ |
| ১৩০৯ | ৫৯ | ৩৫ | ৯ | ০ | ১৫ |
| ১৩১০ | ৩৭ | ১৫ | ১১ | ০ | ১১ |
| ১৩১১ | ২৯ | ৫ | ১২ | ০ | ১২ |
| ১৩১২ | ২৮ | ১৭ | ৩ | ০ | ৮ |
| মোট | ২০৩ | ৭৬ | ৪৫ | ১ | ৮১ |

লেখক হিসাবে বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্ররচনার সংরূপবৈচিত্র্যের বান ডেকে গেল, পাশাপাশি রচনাসমূহের বিষয়বৈচিত্র্যেরও। দু'টি উপন্যাস 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' এবং দু'টি গল্প 'দর্পহরণ' ও 'মাল্যদান'; প্রথম বছরেই নাটক 'বশীকরণ'; চতুর্থ বছরে গান 'বড়োদারাজ গায়কবাড়' আর কবিতা-প্রবন্ধ তো আছেই। ভাষা, সাহিত্য, রঙ্গমঞ্চ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম সহ বঙ্গবিভাগ বা ইউনিভার্সিটি বিল-এর মতো বিভিন্ন সমসায়িক বিষয় প্রবন্ধ আকারে জায়গা করে নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখায় বঙ্গদর্শনের পাতায় এই পাঁচ বছরে। ১৩০৮ ও ১৩১১-য় বঙ্গদর্শনে কবিতার পরিমাণ কম হলেও বাকি বছরগুলিতে মোট রবীন্দ্ররচনার প্রায় অর্ধাংশ কখনো বা তারও বেশি কবিতা। ১৩০৯ অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন এই ৩টি সংখ্যায় যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১০টি রবীন্দ্ররচনার মধ্যে ৯, ১০ ও ৯টিই কবিতা আর



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

শ্রাবণ ১৩১০ সংখ্যায় প্রকাশিত ৮টি রবীন্দ্ররচনার সবক'টিই কবিতা। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা এই পাঁচ বছরের বঙ্গদর্শনে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পাঁচ বছরের (বৈশাখ ১৩০৮ — চৈত্র ১৩১২) 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সূচি —

**১৩০৮**

বৈশাখ — সূচনা [গদ্য]; প্রার্থনা [কবিতা]; ব্যাধি ও প্রতিকার [প্রবন্ধ]; চোখের বালি [উপন্যাস]; রচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের বচন [আলোচনা]; ভারতী — বৈশাখ, নব্যভারত — চৈত্র, সাহিত্য — ফাল্গুন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা — ফাল্গুন, প্রদীপ — চৈত্র, সাহিত্য-সংহিতা — চৈত্র, প্রবাসী — বৈশাখ [মাসিক সাহিত্য সমালোচনা]। জ্যৈষ্ঠ — প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ, নকলের নাকাল [প্রবন্ধ]; চোখের বালি; কবিচরিত, কবির বিজ্ঞান [কবিতা]। আষাঢ় — সমাজভেদ, আচার্য জগদীশের জয়বার্তা, কবিজীবনী [প্রবন্ধ]; জগদীশ চন্দ্র বসু [কবিতা]; হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা, 'নকলের নাকাল' সম্বন্ধে, 'ভাষাতত্ত্ব' সম্বন্ধে [আলোচনা]; ভারতী — জ্যৈষ্ঠ, সাহিত্য — চৈত্র, প্রদীপ — বৈশাখ, প্রবাসী — জ্যৈষ্ঠ [মাসিক সাহিত্য সমালোচনা]; প্রাকৃত ও সংস্কৃত [গদ্য]। শ্রাবণ — জড় কি সজীব?, মেঘদূত, হিন্দুত্ব, নেশন কি ? রেনার মত [প্রবন্ধ]; চোখের বালি; সাহিত্য — বৈশাখ, প্রদীপ — জ্যৈষ্ঠ [মাসিক সাহিত্য সমালোচনা]। ভাদ্র — চোখের বালি; কেকাধ্বনি [প্রবন্ধ]। আশ্বিন — বিরোধমূলক আদর্শ [প্রবন্ধ]; চোখের বালি। কার্তিক — চোখের বালি। অগ্রহায়ণ — বশীকরণ [নাটক]। পৌষ — চোখের বালি; কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, বাংলা ব্যাকরণ [প্রবন্ধ]। মাঘ — চোখের বালি। ফাল্গুন — চোখের বালি; প্রাচীন ভারতের একঃ [প্রবন্ধ]। চৈত্র — বারোয়ারী-মঙ্গল [প্রবন্ধ]; চোখের বালি।

**১৩০৯**

বৈশাখ — চোখের বালি; নববর্ষ [প্রবন্ধ]। জ্যৈষ্ঠ — নববর্ষের গান [কবিতা]; চোখের বালি। আষাঢ় — চোখের বালি; ব্রাহ্মণ, চীনেম্যানের চিঠি [প্রবন্ধ]। শ্রাবণ — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [প্রবন্ধ]; চোখের বালি। ভাদ্র — চোখের বালি; মরণ [কবিতাগুচ্ছ]। আশ্বিন — বাজে কথা, শকুন্তলা [প্রবন্ধ]; শুক্ল-সন্ধ্যা [কবিতা]; চোখের বালি। কার্তিক — মা ভৈঃ, অত্যুক্তি [প্রবন্ধ]; মন্দ্র [সমালোচনা প্রবন্ধ]; রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি [আলোচনা]; চোখের বালি। অগ্রহায়ণ — মুক্তপাখীর প্রতি, দুর্ভাগা, প্রতীক্ষা, পথিক, শেষ কথা, প্রার্থনা, আহ্বান, পরিচয়, মিলন [কবিতা]; পরনিন্দা [প্রবন্ধ]। পৌষ — স্বদেশ, নারী, বিশ্ব-দোল [কবিতা]; রঙ্গমঞ্চ [প্রবন্ধ]। মাঘ — পনেরো-আনা, ধর্মের সরল আদর্শ [প্রবন্ধ]; লক্ষ্মী-সরস্বতী, কথা, নব পরিণয়, পূর্ণতা, সার্থকতা, সঞ্চয়, রচনা, সন্ধান, অশোক, জীবনলক্ষ্মী [কবিতা]। ফাল্গুন — জাগরণ, বসন্ত, উৎসব, প্রেম, পূজা, সন্ধ্যাদীপ,

গোধূলি, সম্ভোগ, দ্বৈতরহস্য [কবিতা]; দর্পহরণ [গল্প]। চৈত্র — বসন্তযাপন [প্রবন্ধ]; ঝরণাতলা [কবিতা]; মাল্যদান [গল্প]।

**১৩১০**

বৈশাখ — ভোরের পাখি [কবিতা]; রাজকুটুম্ব [প্রবন্ধ]; নৌকাডুবি [উপন্যাস]। জ্যৈষ্ঠ — নৌকাডুবি; সন্ধ্যা, যাত্রিণী [কবিতা]। আষাঢ় — গ্রাম, মেঘোদয় [কবিতা]; নৌকাডুবি। শ্রাবণ — নৌকাডুবি; সাগরমন্থন, হিমালয়, ক্ষান্তি, শিলালিপি, হরগৌরী, তপোমূর্তি, সঞ্চিতবাণী [কবিতা]। ভাদ্র — নৌকাডুবি; চিঠি, শিশু [কবিতা]; ঘুষাঘুষি, ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত [প্রবন্ধ]। আশ্বিন — নৌকাডুবি; সাহিত্য সমালোচনা [প্রবন্ধ]। কার্তিক — নৌকাডুবি; সাহিত্যের সামগ্রী [প্রবন্ধ]। অগ্রহায়ণ — নৌকাডুবি; সাহিত্যের তাৎপর্য [প্রবন্ধ]। পৌষ — নৌকাডুবি; মন্দিরের কথা [প্রবন্ধ]। মাঘ — নৌকাডুবি; দিন ও রাত্রি [প্রবন্ধ]। ফাল্গুন — ধর্মপ্রচার, মনুষ্যত্ব [প্রবন্ধ]; নৌকাডুবি। চৈত্র — নৌকাডুবি; পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় [প্রবন্ধ]।

**১৩১১**

বৈশাখ — নৌকাডুবি। জ্যৈষ্ঠ — নৌকাডুবি; সাময়িক প্রসঙ্গ — বঙ্গবিভাগ [প্রবন্ধ]। আষাঢ় — নৌকাডুবি; প্রার্থনা, সাময়িক প্রসঙ্গ — য়ুনিভার্সিটি বিল [প্রবন্ধ]; স্বীকার [কবিতা]। শ্রাবণ — গুরুদক্ষিণা [সমালোচনা প্রবন্ধ]; নৌকাডুবি; পাগল, সাময়িক প্রসঙ্গ — দেশের কথা [প্রবন্ধ]; নমস্কার, আমি সে জানি, বংশীধ্বনি [কবিতা]। ভাদ্র — স্বদেশী সমাজ [প্রবন্ধ]; নৌকাডুবি। আশ্বিন — 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট, শিবাজি-উৎসব [প্রবন্ধ]; নৌকাডুবি। কার্তিক — নৌকাডুবি। অগ্রহায়ণ — নৌকাডুবি; বড়োদারাজ গায়কবাড় [গান]। পৌষ — নৌকাডুবি। মাঘ — উৎসবের দিন [প্রবন্ধ]; নৌকাডুবি। ফাল্গুন — নৌকাডুবি; প্রার্থনা [প্রবন্ধ]। চৈত্র — নৌকাডুবি; সফলতার সদুপায় [প্রবন্ধ]।

**১৩১২**

বৈশাখ — নৌকাডুবি; ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ [প্রবন্ধ]। জ্যৈষ্ঠ — নৌকাডুবি; ধম্মপদং [প্রবন্ধ]। আষাঢ় — নৌকাডুবি; শেষ খেয়া [কবিতা]। শ্রাবণ — দেশীয় রাজ্য [প্রবন্ধ]। ভাদ্র — ঘাটের পথ [কবিতা]; ব্রতধারণ [প্রবন্ধ]। আশ্বিন — সোনার বাংলা, আগমন, দেশের মাটি [কবিতা]; অবস্থা ও ব্যবস্থা [প্রবন্ধ]। কার্তিক — হবেই হবে, দ্বিধা, অভয় [কবিতা]; রাখি বন্ধনের উৎসব [বিশেষ রচনা]; বিজয়া সম্মিলন [প্রবন্ধ]। অগ্রহায়ণ — শুভক্ষণ, ত্যাগ, দান [কবিতা]। পৌষ — মুক্তিপাশ, অজবিলাপ [কবিতা]। মাঘ — উৎসব [প্রবন্ধ]; দুঃখমূর্তি, বালিকা বধূ [কবিতা]। ফাল্গুন — লীলা, অনাহত [কবিতা]। চৈত্র — রবীন্দ্র-রচনাহীন।





লক্ষ্যণীয়, চৈত্র ১৩১২ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত শেষ সংখ্যায় তাঁর কোনো লেখা নেই। অন্যান্য বছরগুলির তুলনায় এই বছরে রবীন্দ্রনাথের লেখার সংখ্যাও কম। আসলে বছরটা ১৩১২ ইংরাজি ১৯০৫-০৬, স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বছর। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছেন সমকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। 'খেয়া'র কবিতাগুলিতে তারই প্রকাশ, এই বছরের প্রবন্ধগুলিতেও তাই। একদিকে রবীন্দ্রনাথের এসময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যস্ততা, অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনা। এই বছরের 'ভাণ্ডার'-এ রবীন্দ্ররচনার সংখ্যা ৫২। বোঝাই যাচ্ছে বঙ্গদর্শনে কেন তাঁর লেখার সংখ্যা কম। কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে 'ভাণ্ডার' চৈত্র ১৩১২ সংখ্যাতেও রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা নেই। রবীন্দ্রনাথ এতটাই ব্যস্ত? এই আশ্চর্য সমাপতন কি নিছকই কাকতালীয়? রবীন্দ্রনাথ কি এসময় কিছুই লেখেননি? তা পৃথক গবেষণার বিষয়।

এরপর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক পদ ছাড়ছেন। মনে রাখতে হবে, ১৩০৮-এও বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদকতা গ্রহণের ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের সেভাবে ছিল না। এসময় প্রিয়নাথ সেনকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। আর ১৩১২-তে এসে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অন্যান্য বহু কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন ক্রমশ তাতে যে তিনি 'বিশ্রামপ্রার্থী' হিসাবে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা থেকে 'নিষ্কৃতিগ্রহণ' করতে চাইবেন, তা তো নিতান্তই স্বাভাবিক। স্বসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩১৩)-য় 'নিবেদন' অংশে শৈলেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন —

গত দুইবৎসর হইতেই সম্পাদকমহাশয় অবসর লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের একান্ত অনুরোধেই লন নাই; এখন কিন্তু তাঁর একান্ত বিশ্রাম আবশ্যক, তিনি এখন বৈষয়িক সকল বন্ধন হইতেই মুক্তি পাইবার প্রয়াসী, আর তাঁহাকে সম্পাদকরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারা গেল না। নবপর্য্যায়-বঙ্গদর্শন-প্রচারের সময়ে প্রথমে রবীন্দ্রবাবুকে সম্পাদকরূপে পাইবার আশা আমাদের ছিল না, তবু প্রধানত তাঁহারই সম্পূর্ণ সহায়তা পাইবার ভরসাতেই আমরা বঙ্গদর্শন প্রকাশে সাহসী ও উৎসাহী হইয়াছিলাম। আজও আবার তাঁহারই নির্দশে ও উপদেশে বঙ্গদর্শন প্রচারে ব্রতী রহিলাম। রবীন্দ্রবাবু সম্পাদক না থাকিলেও বঙ্গদর্শনের মূল ভরসা তিনিই। তাঁহার নির্দিষ্ট পথে, প্রধানত তাঁহারই সহায়তায়, বঙ্গদর্শন পরিচালিত হইবে।[৪]

এরপর পত্রিকা পরিচালন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কতটা সহায়তা শৈলেশচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পেয়েছিল, তা আলাদা অনুসন্ধানের বিষয় হলেও লেখক হিসাবে যে তাঁর সঙ্গে বঙ্গদর্শনের সম্পর্ক অটুট ছিল তা শৈলেশচন্দ্র সম্পাদিত সংখ্যাগুলির সূচি দেখলেই বোঝা যায়।

বছর অনুযায়ী শৈলেশচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে অন্যান্য লেখকদের রচনার সংখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনা-সংখ্যার হিসাব পাশাপাশি রেখে একটু দেখার চেষ্টা করা যাক —

| | ১৩১৩ | ১৩১৪ | ১৩১৫ | ১৩১৬ | ১৩১৭ | ১৩১৮ | ১৩২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৈশাখ | সমাপ্তি [ক] | সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য [প্র] | - | - | নিশীথে [ক] | - | - |
| জ্যৈষ্ঠ | দেশনায়ক [প্র], খেয়া [ক] | প্রার্থনা [ক] | পথ ও পাথেয় [প্র] | - | - | - | - |
| আষাঢ় | শুভবিবাহ, শিক্ষাসমস্যা [প্র] | সাহিত্যসৃষ্টি [প্র] | সমস্যা [প্র] | - | আষাঢ় [ক] | সাধনতত্ত্ব বিচার [গ্রস] | - |
| শ্রাবণ | মোহিতচন্দ্র সেন [প্র] | দুর্দ্দিন [ক] | সদুপায় [প্র] | - | নিদ্রাহীন [ক] | - | - |
| ভাদ্র | আবরণ, জাতীয় বিদ্যালয় [প্র] | কামনা, নমস্কার [ক] | প্রাচ্য ও প্রতীচ্য [প্র] | বিরহ [ক] | - | - | - |
| আশ্বিন | - | দয়া [ক] | দেশহিত [প্র] | দিনান্তে [ক] | - | ধর্ম্ম, বিদ্যাসাগর [প্র] | - |
| কার্ত্তিক | - | - | - | - | - | জাগরণ [ক] | - |
| অগ্রহায়ণ | ততঃ কিম্ [প্র] | - | - | কামনা [ক] | - | - | প্রার্থনা [ক] |
| পৌষ | শান্তং শিবমদ্বৈতম্, সৌন্দর্যবোধ [প্র] | প্রার্থনা [ক] | - | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্রবাবুর অভিভাষণ [প্র], প্রার্থনা | - | - | কেন ?, আশা [ক] |





| বর্ষ | মোট রচনা | রবীন্দ্রনাথের রচনা | অন্যান্য লেখকদের রচনা |
|---|---|---|---|
| ১৩১৩ | ১২৩ | ১৬ | ১০৭ |
| ১৩১৪ | ১৪৭ | ১২ | ১৩৫ |
| ১৩১৫ | ১১৬ | ৬ | ১১০ |
| ১৩১৬ | ১১১ | ৫ | ১০৬ |
| ১৩১৭ | ১৩০ | ৫ | ১২৫ |
| ১৩১৮ | ১৪২ | ৪ | ১৩৮ |
| ১৩১৯ | ১৪১ | ০ | ১৪১ |
| ১৩২০ | ১৪৭ | ৪ | ১৪৩ |
| ১৩২১ | ১৮ | ০ | ১৮ |
| ৯৮টি সংখ্যা | ১০৭৫ | ৫২ | ১০২৩ |

সম্পাদক থাকাকালীন যত লেখা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের জন্য লিখেছেন, সম্পাদক পদ পরিত্যাগের পর কেবল লেখক হিসাবে তার সিকিভাগ লেখাও বঙ্গদর্শনে দেননি। এই পর্যায়ের ৯৮টি সংখ্যার এমন বহু সংখ্যা আছে যাতে একটিও রবীন্দ্ররচনা প্রকাশিত হয়নি। আর ১৩১৯-এর সবক'টি ও ১৩২১-এর ২টি সংখ্যা সম্পূর্ণই রবীন্দ্ররচনাহীন। কারণ ১৩১৯-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ছেন বিদেশযাত্রায়, ফিরবেন ১৩২০-র আশ্বিনে। আর তাই ১৩২০-র বঙ্গদর্শনেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখা বেরোচ্ছে অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। ১৩২১-এ তো তিনি ‘সবুজ পত্র’ নিয়েই ব্যস্ত।

এবার শৈলেশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে সংখ্যা অনুযায়ী একটু ছকে নেওয়া যাক —

লক্ষ্যণীয় এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশ পায়নি কোনো গান কিংবা নাটকও। আছে কেবল কবিতা, প্রবন্ধ এবং দু'টি বক্তৃতা। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মূলত দু'টি সুনির্দিষ্ট ধরন এই পর্বে এসে দেখা যাচ্ছে, একটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শন বা সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক এবং অপরটি সমকালীন উতপ্ত রাজনৈতিক বাতাবরণকেন্দ্রিক। তাই ১৩১৩-তে আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও বেশি — ১৬টির মধ্যে ১৪টিই প্রবন্ধ। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যত রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে সরে এসেছেন, তত কমতে থেকেছে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা। ১৩১৫-য় আন্দোলন থেকে সরে আসার পর ১৩১৬ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংখ্যা বঙ্গদর্শনে একেবারেই কম, ১৩১৭-য় তো কোনো প্রবন্ধই প্রকাশ পায়নি।

| বর্ষ | রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা | কবিতা | গদ্য / প্রবন্ধ |
|---|---|---|---|
| ১৩১৩ | ১৬ | ২ | ১৪ |
| ১৩১৪ | ১২ | ৬ | ৬ |
| ১৩১৫ | ৬ | ০ | ৬ |
| ১৩১৬ | ৫ | ৪ | ১ |
| ১৩১৭ | ৫ | ৫ | ০ |
| ১৩১৮ | ৪ | ১ | ৩ |
| ১৩২০ | ৪ | ৩ | ১ |
| মোট | ৫২ | ২১ | ৩১ |

আসলে শুধু প্রবন্ধ নয়, বঙ্গদর্শনেই রবীন্দ্রনাথের রচনা ক্রমশ কমতে থেকেছে, কবিতাও। এবার রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সরে আসতে শুরু করেছেন বঙ্গদর্শন থেকে। তাঁর বিচিত্র কর্মব্যস্ততা, পারিবারিক সমস্যা এবং স্বসম্পাদিত 'ভাণ্ডার' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সচল রাখা এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনা স্বল্পতার মুখ্য কারণ। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ এসময় ক্রমশ ঝুঁকছেন 'প্রবাসী'র দিকে। অন্যদিকে বঙ্গদর্শনও কিন্তু খুঁজে নিয়েছিল তার নতুন লেখকগোষ্ঠীকে, বৈচিত্র্য এসেছিল তার সংরূপে, বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথকেও তাঁদের আর খুব বেশি প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। বঙ্কিমের ভাষা ধার করেই বলি ১৩২১-এর আষাঢ় থেকে বঙ্গদর্শনের অপ্রকাশের মতোই 'কালস্রোতে জলবুদ্বুদ-এর মতোই মিশে গেল বঙ্গদর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক।

**তথ্যসূত্র :**

১. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, "নিবেদন", 'বঙ্গদর্শন পরম্পরা', ভবতোষ দত্ত (সম্পাদিত), বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি, জুলাই ২০০০, পৃ. ৩১৫-৩১৬
২. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), 'বঙ্কিম রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৫, পৃ. ৮৩৪-৮৩৫
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র', অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, পৃ. ১৮১
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, "নিবেদন", 'বঙ্গদর্শন পরম্পরা', ভবতোষ দত্ত (সম্পাদিত), বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, নৈহাটি, জুলাই ২০০০, পৃ. ৩২১



# জীবনপথিক প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ

**ড. চিরঞ্জীব মুখার্জী**

যে কয়েকজন প্রতিভাধর বাঙালি সাহিত্যিক স্বল্পস্থায়ী জীবনে সাহিত্যলীলা সমাপ্ত করে অকালে মৃত্যুর রহস্যময় দিগন্তে বিলীন হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বাংলা সাহিত্যের একজন ভাবমুগ্ধ প্রবন্ধকার। মাত্র ২৯ বছর বয়সেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় কিন্তু তাঁর এই স্বল্পায়ু জীবনে বাংলা সাহিত্যের মন্দিরে তা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। ছাপান্নটি গদ্য নিবন্ধ, দু'খানি কবিতা গ্রন্থ, কতকগুলি সনেট, দুটি বড় কবিতার নাতি দীর্ঘ সংগ্রহ বলেন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনার পরিধি মাত্র এই পর্যন্ত। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির নবীনতায়, ভাবের গভীরতায়, বর্ণনার মনোহারিত্বে ও প্রকাশভঙ্গীর কলানৈপুণ্যে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি বাংলাভাষায় তো বটেই, যেকোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার বিচারে অনবদ্য।

বলেন্দ্রনাথ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে আবির্ভাব ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের 'দক্ষিণপাণির প্রসন্ন আশীর্বাদ' বলেন্দ্রনাথকে সম্পদশালী করে তুলেছিল। বক্তব্যকে হৃদয় বর্ণে রঞ্জিত করে তাকে শিল্পশ্রীমন্ডিত করে তোলাই ছিল প্রাবন্ধিকের মৌলিক ধর্ম। এই ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাংলা গদ্যকে ভাবের সাহিত্যে উন্নীত করেছিলেন বলেই আত্মগত ভাবনা কামনার পক্ষ নির্ভর করে তিনি রোমান্টিকতার আকাশে ডানা মেলে দিয়েছিলেন। বলেন্দ্রনাথের রচনার বৈচিত্র্য ছিল বলেই তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনেও বৈচিত্র্য ঘটেছে। কখনো প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চিত্র- ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনায় নিবিষ্ট হয়েছেন।

বাল্যকালে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েকবছর পড়াশুনা করার পর হেয়ার স্কুলে চলে যান এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে লেখনী ধারণে সমর্থ করে তোলে। প্রথমে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রে তিনি লিখতেন, পরে 'সাধনা'র নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। বলেন্দ্রনাথের এই মননশীলতা গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ।

বলেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'একরাত্রি' এবং তারপর আরো আটটি (৮) লেখাই আত্মগতভাবে 'মগ্নকথিকা'র আকারে লেখা, যাকে একালের পরিভাষায় 'রম্যরচনা' বলা যায়। বলেন্দ্রনাথের 'একরাত্রি', এবং 'চন্দ্রপুরের হাট' রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা'র আঙ্গিক ও ভঙ্গীকে মনে করিয়ে দেয়। বলেন্দ্রনাথ বর্ণনামূলক শিল্পী আর 'ঘাটের কথা' ও

স্বভাবে বর্ণনামূলক। 'একরাত্রি' বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, আর 'ঘাটের কথা' প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১২৯১ কার্তিক সংখ্যাতে। আর প্রকারণের তারতম্য সত্ত্বেও 'ঘাটের কথা' আসলে ছোটগল্প নয়, 'কথিকা'ই।

দুটি রচনার মধ্যে বিষয় কল্পনা ও বিন্যাসে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। 'ঘাটের কথা'য় প্রকৃতিপ্রেমিক কবিমনের আত্মকথা শেষ পর্যন্ত একটি গল্পরূপের শিথিল সম্ভাবনায় বাঁধা পড়লেও বলেন্দ্রনাথের বর্ণনা প্রথম থেকেই আত্মকথনমূলক।

কেউ কেউ বলেন যে, বলেন্দ্রনাথ প্রবন্ধে যতটা শক্তিশালী কবিতায় ততটা নয়। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানত গদ্যশিল্পী বলে পরিচিত হলেও তাঁর কবিতার সংখ্যাও কম নয়। বলেন্দ্রনাথের জীবনকালে দু'খানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল—'মাধবিকা' (১৮৯৬) এবং 'শ্রাবণী' (১৮৯৭)। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি কোনো তত্ত্ব বা জীবন গভীরতার পরিচয় দিতে পারেননি, সংস্কৃত কাব্যরীতির আদর্শে কবিতার প্রসাধন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গী ছিল উপভোগ্য, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকাশরীতি অভিনব, সৌন্দর্য অভাবিতপূর্ব, 'ভারতী' এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' এ যেসব কবিরা রবীন্দ্র অনুগামী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ তাঁদের পূর্ববর্তী। রবীন্দ্রযুগের সূচনায় বলেন্দ্রনাথই ছিলেন ভোরের শুকতারা।

বলেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেছেন। বলেন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষায় অনেকটাই সংস্কৃত কলেজে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁর টান বোধদয় একটু বেশী। কিন্তু তাই বলে তাঁর বিশ্লেষণভঙ্গি ও রসজ্ঞতা সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ মানে না। সেক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশই বলেন্দ্রনাথকে দেশি-বিদেশী সাহিত্য চর্চায় শিক্ষা দিয়েছে এবং অনেক সময় পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি পথিকৃৎ নন। বিদ্যাসগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আরম্ভ করলেও বলেন্দ্রনাথ দৃষ্টিভঙ্গিতে ও স্বাধীন চিন্তায় যে বিশিষ্ট তা বলা বাহুল্য।

সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করে বলেন্দ্রনাথের আলোচনা শুরু হয় ১২৯৬ সালে 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায়। তখনও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় প্রবেশ করেননি। বলা বাহুল্য, কালিদাসের 'মেঘদূত'কে উপলক্ষ করেই সংস্কৃত সাহিত্য জগতে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল কালিদাসের প্রতি। কালিদাসকে এর আগে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ সকলেই বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর বলেন্দ্রনাথ যে কালিদাসের প্রতি কতখানি অনুরক্ত ছিলেন তা স্পষ্ঠতা পায় কালিদাসের প্রতিভা সম্পর্কিত কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে। এখানে তাঁর গরিমাদীপ্ত আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

'উত্তরচরিত', 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা', 'কাব্যে প্রকৃতি', 'মৃচ্ছকটিক', 'পশুপ্রীতি',



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

'ঋতুসংহার', 'রত্নাবলী', 'জয়দেব', 'মেঘদূত' প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ও কাব্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের উদার রসবোধ ও বিচার নৈপুণ্যের সম্যক পরিচয় মেলে, এর কারণ আগেই উল্লেখ করেছি শৈশবের শিক্ষার ফল।

'কাব্যে প্রকৃতি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রকৃতির সাথে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃতির একটি সূক্ষ্ম তফাৎ যেন এ প্রবন্ধের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রকৃতি বাইরের শক্তি, সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি মানুষের সহমর্মী সঙ্গী। তাই বলেন্দ্রনাথ বলেন—

"শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে প্রকৃতির-উপর সে কর্তত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না"[১]

যদিও রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্য' এর অন্তর্গত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে মিরান্দা ও শকুন্তলার প্রাকৃতিক পরিবেশকে তুলনা করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন-

"টেম্পেষ্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে শকুন্তলায় গাছপালা পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে"।[২]

১৯২৬ সালে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথ তখনও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় প্রবেশ করেননি। ১২৯৭ সালের ৮ জৈষ্ঠ্য রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'মেঘদূত' কবিতা রচিত হয় আরও একবছর পর তাঁর 'মেঘদূত' প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১২৯৮) প্রকাশিত হয়। আর 'কাব্যে প্রকৃতি' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' (আশ্বিন, ১৩০৯) ঠিক আট বছর আগের লেখা। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই বলেন্দ্রনাথের এরূপ রচনা রবীন্দ্রনাথের পরামর্শেরই ফল। কারণ সাহিত্য রসিক বলেন্দ্রনাথ প্রকৃতির পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে' বলেছেন— "প্রকৃতি যেখানে মানুষের সখীরূপে ফুটে না, হয় ছায়ার মত, নয় মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন— মার্চ্যান্ট অফভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয় দৃশ্যে অথবা টেম্পেষ্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয় ঘটনায়"।[৩]

রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই মন্তব্য করেছেন ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয় ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রকৃতি সম্পর্কিত এই চিন্তা লিখিতভাবে বলেন্দ্রনাথের রচনাতেই প্রথম পাওয়া গেছে।

কালিদাস ছাড়াও বলেন্দ্রনাথ কখনো কালিদাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, কালিদাস-শূদ্রক কিংবা ঠিক তেমনি বেছে নিয়েছেন দুটি কাব্যের তুলনাকে। যেমন— মেঘদূত বনাম ঋতুসংহার, তুলনার ক্ষেত্র হিসাবে কাব্যের চরিত্রও বাদ যায়নি-উদয়ণ বনাম দুষ্মন্ত বা রামচন্দ্র তাঁর আলোচনাতে স্থান পেয়েছে।

কালিদাসের অমরসৃষ্টি ‘মেঘদূত’ বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয় প্রাবন্ধিকের হাতে নবরূপ লাভ করেছে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক চেতনার স্বাতন্দ্র্য ছিল বিষয় চিন্তা এবং তার বিন্যাসে, তাই ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেখানে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন বলেন্দ্রনাথ সেখানে বিরত থেকেছেন। তাই বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের আগে ‘মেঘদূত’ রচনা করলেও তা অপরিণত রচনা। পরিণতির পথে যতই তিনি অগ্রসর হয়েছেন ততই সংহত হয়েছেন। তাই বলা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যক্তিত্বকে যে প্রভাবিত করেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপকরণে তাকে শক্ত করে তুলতেন- এটাই ছিল বলেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও তাঁর স্বাধীন চিন্তার প্রমাণ বিস্ময়ের উদ্রেক যে করে উপরের প্রবন্ধগুলিতে তা সুস্পষ্ট।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেও বলেন্দ্রনাথ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সৌন্দর্য পিয়াসী বলেন্দ্রনাথের ইতিহাসের তথ্যস্তূপের ভিতরে জাতির প্রাণস্পন্দন, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের যুগ্মবিহার। গৌরবান্বিত অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস, অতীতচারিতার মধ্যে যে সাংস্কৃতিক শক্তি তাঁর ক্ষণকালীন জীবনে চিরকালীন মন্ত্রশক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। পাঞ্জাবের সাথে বাগদাদের স্থানিক দূরত্ব বলেন্দ্রনাথের লেখায় হারিয়ে যায়। ইসলামী গম্বুজ মিনার আর হিন্দু দেবদেবীর চিত্র একাকার হয়ে যায়।

বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সন্ধানী কবিমন পরিভ্রমণ করেছে ভারতবর্ষের তীর্থপথে। কীটসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ‘A thing of beauty is a joy forever’ কে গ্রহণ করে প্রাবন্ধিক তাঁর মানসদৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন অতীতের দিকে। বলেন্দ্রনাথ অতীতের ধূসর জগত সৌন্দর্য অভিসারে যাত্রা করেছিলেন। ‘খন্ডগিরি’, ‘প্রাচীন উড়িষ্যা’, ‘কণারক’, ‘বারাণসী’ প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর প্রাচীনত্বের মোহ ফুটে উঠেছে। বলেন্দ্রনাথের উড়িষ্যার প্রতি এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যাই একমাত্র স্থান, যেখানে মুসলমান নৃপতিগনের বিধ্বংসকারী আক্রমণের পরেও দেশের অপরূপ শিল্প-কীর্তি বিনষ্ট হয়নি এবং দেব মন্দিরের পাযানে মসজিদের প্রাচীর নির্জিত হবার সুযোগ মেলেনি। তাই হিন্দু ধর্মানুরাগী শিল্পরসিক বলেন্দ্রনাথ এই  উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করে। ‘প্রাচীন উড়িষ্যা’, ‘উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র’, প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অতীতমুগ্ধ রোমান্টিকতা আর স্বদেশ প্রেমিকতার যথার্থ মিলনে গড়ে উঠেছে ‘বারাণসী’ প্রবন্ধটি। এখানেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা আছে, ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের গভীর সম্পর্ক সূচিত হয়েছে-

“... সুতরাং, যেদি দিয়াই দেখ, বারাণসীতে আসিয়া বিপুল মানব সমাজের সহিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয় এবং এই সনাতন সম্বন্ধ নিবন্ধনেই বারানসীর গৌরব ভূ-ভারতে অদ্বিতীয়”।[৪]

এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে যে প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করতে পারে অনায়াসে সেটি হল ‘কণারক’, প্রাচীন উড়িষ্যার শিল্পকীর্তির এক অবিস্মরনীয় নিদর্শন কণারকের





সূর্যমন্দির, সৌন্দর্য সন্ধানী শিল্পী বলেন্দ্রনাথ কণারকের অনিন্দ্যরূপ ঐশ্বর্য নিকেতনে প্রবেশ করেছেন এবং তন্ময়মুগ্ধ হয়ে গেছেন। ‘কণারক’ প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি সুনিপুন রেখাপাতের সাহায্যে অতীতের স্নিগ্ধ রূপ সজীব করে তুলেছেন। একই জায়গায় বসে বিলীয়মাণ পুরাতনকে তিনি বিচিত্ররূপে সজ্জিত করে তোলেন আর নির্জীব সজীবতা দান করেন। যেখানে একসময়—

“কত লোকে কতদিন অন্তরের দারুন নির্বেদ লইয়া আসিয়াছে। সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোনদিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটান না যায়, বৃদ্ধপিতামাতার অশ্রুজল বন্ধন ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে — হে দেবতা, রক্ষাকর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও,...।”[৫]

আর বহুকাল পরে,—“...কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত,”[৬]

এই প্রবন্ধটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ‘বিচিত্র’ প্রবন্ধের অন্তর্গত ‘মন্দির’ প্রবন্ধটি। দুটি প্রবন্ধই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবোজ্জ্বল দুটি বিশিষ্ট ধর্ম মন্দির অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভুবনেশ্বরের মন্দির উপলক্ষ করে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য রসসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন—

“দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। ... এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির ...।”[৭]

আবার তিনি প্রবন্ধের শেষে স্পষ্টভাবে বলেছেন-“ পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এককালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।”[৮]

কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ‘কণারক’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত ধর্মীয় তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু বিগত দিনের কণারকের যে বৈভব আজ লুপ্ত তার কথা স্মরণ করে লেখক যে মর্মাহত তার প্রমাণ মেলে।

বলেন্দ্রনাথের ‘শুভ উৎসব’ প্রবন্ধে সর্বত্রই এক স্পর্শকাতর হিন্দুর জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সুগভীর আন্তরিকতা ও রসিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে ‘শুভ উৎসব’ প্রবন্ধটিতে। তাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয়-

“শুভ উৎসব, প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের কতকগুলি গদ্য নিবন্ধ যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে ও বাংলা সাহিত্য পঠিত হইবে ততদিন এক আদর্শ ও সুন্দর জগতের জন্য আমাদের মনে Sehnsucht অর্থাৎ আকুতি আনিবে ...।”[৯] তাই সামাজিক মানুষের প্রিয় রচনা হিসাবে ‘শুভ উৎসব’ বলেন্দ্রনাথকে প্রাবন্ধিক হিসাবে উচ্চস্তরে যে নিয়ে গিয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাসের তথ্যস্তূপ থেকে জাতির প্রাণস্পন্দনকে

আবিষ্কার করার দুর্লভ অন্তঃস্পর্শী দৃষ্টি বলেন্দ্রনাথের ছিল বলেই তিনি বাংলার চারুশিল্প মুগ্ধতার নূতন দিগন্ত উৎসারিত করে দিয়েছিলেন। এখানেই প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

বলেন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের জগতেই বিচরণ করেছেন তা নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা চিন্তা একালে অনেকেই মনে রাখেন না। তিনি যে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের কবি ও কাব্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ মেলে 'বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস', 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' কৃত্তিবাস ও কালিদাস 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর', 'ভারতচন্দ্র রায়', 'কেতকা-ক্ষেমানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধ গুলিতে প্রাচীন বাংলা কাব্য সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট ধারণা পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ হয়ত বলেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের কাছে ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়াতেই গড়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথে অনুরাগ বলেন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে 'চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন 'ভারতী' পত্রিকায়। এর কয়েক বছর পরেই ১২৯৬ বঙ্গাব্দে বলেন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস' নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

'বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস' রচনাটি একটি তুলনামূলক আলোচনা। বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের কবিকৃতির মধ্যে ভাব ও ভাষাগত যে পার্থক্য আছে তাকেই প্রাবন্ধিক প্রকাশ করেছেন মাত্র। তিনি বলেছেন- "শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাষারও বিস্তর প্রভেদ;..."।[১০]

আবার, 'প্রেম' সম্পর্কে দুই কবির ধারণা যে আলাদা তাও তিনি ব্যক্ত করেছেন এই প্রবন্ধে- "বিদ্যাপতি অপেক্ষা চন্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। ..."।[১১]

আবার 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ অতীত ও বর্তমান সাহিত্যের মধ্যে একটা বন্ধন সূত্র রচনা করেছেন। আমরা সবাই জানি, অতীতের গর্ভ থেকেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ কেউই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই বলেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের সূচনাতেই এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন।

'ভারতচন্দ্র রায়' প্রবন্ধে নিছক কাহিনীর বর্ণনাসূত্রেই ভারতচন্দ্রের লেখনীর পারিপাট্য পরিহাস রসিকতা অথবা গল্প সাজাবার বিপুল ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন।

ঘরোয়া ভঙ্গিতে কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে গ্রামীণ রসিকতার আমেজ। এই প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের একাধিক ত্রুটির সমালোচনা করেও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধের শেষে ভারতচন্দ্রকেই বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধান লেখক বলেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় তিনি যুগ ও সমাজ জীবনকে মনে রেখেই তাঁর মানস বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাফল্যের মাপকাঠিতে হয়তো বা এগুলি কম প্রশংসা পেলেও এর মধ্য দিয়ে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ উন্মোচিত হয়েছে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের শৈলীর নানাদিক উঠে এসেছে। তাঁর রচনার ভাব যেমন নতুন তেমনি ভাষাও নতুন। তাঁর নতুন ভাষা অনুভূতির ভাষা। ভাষারীতির ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বাক্য সজ্জা, শব্দচয়ন কিংবা অলংকার প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাসবদ্ধ শব্দের পাশাপাশি দেশী শব্দের নিরন্তর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

'এবং' শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু করার প্রবণতা বলেন্দ্রনাথের রচনার একটি প্রধান বিষয়। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখের রচনায় 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরুর প্রবণতা দেখা দিলেও পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা বিদ্যাসাগরের রচনার মধ্যে এই প্রভাব দেখা যায় না, পরবর্তীকালে তা ফিরে এসেছিল ভূদেব ও বলেন্দ্রনাথের লেখনীতে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

"এবং উৎকলীয়েরা তাহাঁদের অধীনে জন খাটিত মাত্র"।[১২]

তিনি তাঁর প্রবন্ধের বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অনেক নতুন ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন—হেয়ার-ওয়াশ, ডিনার, টেকনিক, ক্যাটালগ ইত্যাদি। ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের সমাস করে অনেকসময় ইংরেজি শব্দকে বাংলা গদ্যে নিজস্ব সম্পদ করে তুলেছেন বলেন্দ্রনাথ। যেমন- ডিনার-আসনে, জীবন-ট্রাজেডি, স্টীম-লাঙ্গল।

তাঁর প্রবন্ধে বাংলা বাক্যে ইংরেজি শব্দ অনায়াসে অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছে। ফলে ইংরেজি শব্দ বাংলা বাক্যে আগন্তুক বলে মনে হয় না।—

"ক্রমশঃ আমাদের উৎসবগুলি 'আপসী' ছাঁচে গড়িয়া উঠতেছে"।

এখানেই বলেন্দ্রনাথের সহজাত উত্তরাধিকার।

আলোচনাকে সংহত করে আনার কালে বলা যায়, বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি প্রবন্ধের কঠিন শিল্পশৈলীতে কালজয়ী সাফল্য দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অসমাপ্ত, পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই তা অস্তমিত। তবুও বলেন্দ্রনাথকে অ-রচিত বাংলা স্টাইলিস্ট গদ্যের মহানায়ক বলতে দ্বিধা নেই। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একলব্য শিষ্য, সাহিত্য চর্চার সঙ্গী, জমিদারী পরিভ্রমণের সহযাত্রী এবং শিলাইদহ জীবনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুজ পরিকর হলেও একান্ত অনুকারী নন। তাঁর রচনার নিজস্ব শৈলীর যে পরিচয় পাওয়া তা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কখনোই বশীভূত নয়। তাঁর রচনায় বহুলতা না থাকলেও বৈচিত্র্য ছিল। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী প্রবণতা তাঁর সাহিত্যকর্মের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষণকালীন জীবনে প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন বলেন্দ্রনাথ, সঙ্গে যোগ হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আর তাতেই বিস্ফোরণ ঘটে গেছে তাঁর সৃষ্টিতে। তুলনায়—প্রতিতুলনায় হয়তো অনেক প্রাবন্ধিকের সাথে 'তর'-'তম' পার্থক্য ঘটেছে তবুও স্বল্পকালীন জীবনে অসাধারণ প্রবন্ধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ একক।

তথ্যসূত্র :

১। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কাব্যে প্রকৃতি'; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃষ্ঠা-৫১

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা' বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩১৪, পৃ-৩৯

৩। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কাব্যে প্রকৃতি' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত),বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা-৫৩

৪। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বারানসী' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস(সম্পাদিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা-৫৩০।

৫। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কণারক', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত)বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা-৫১৮।

৬। তদেব; পৃষ্ঠা- ৫২০।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিচিত্র প্রবন্ধ, 'মন্দির', বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা, ১৪০১, পৃস্থা-৯৩।

৮। তদেব; পৃষ্ঠা- ৯৬।

৯। দেবদাস জোয়ারদার (সম্পাদিত),বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫।

১০। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা)বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা- ১৮০।

১১। তদেব; পৃষ্ঠা- ১৮১।

১২। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রাচীন উড়িষ্যা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত)বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা ৫২৩।



## প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম : একটি পর্যালোচনা

কারিমুল চৌধুরী

"আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই।"[১]

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বহু-বিভক্ত সমাজে জন্মগ্রহণ করেও নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন অসম্প্রদায়িক লেখক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রকৃত মুক্তি ও মানবতার বিকাশের জন্য প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ এবং হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত মিলন। তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর রচনায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, গেয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জয়গান।

হিন্দু ও মুসলমান — এই দুই জাতির মিলনের ভাবনা যেমন তাঁর কবিতা, গান প্রভৃতি রচনায় উঠে এসেছে তেমনি তাঁর প্রবন্ধেও এই ধারণাটি আরও বেশি স্পষ্ট ও জোরালো হয়েছে। যে সমস্ত প্রবন্ধে তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও মিলনকে উপজীব্য করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'যুগবাণী' গ্রন্থের 'নবযুগ', 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', 'ছুৎমার্গ' এবং 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থের 'আমার পথ', 'মন্দির-মসজিদ', 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি।

'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (অক্টোবর ১৯২২)। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে নজরুল বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানিয়েছেন —

"এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান ! এসো বৌদ্ধ ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখো, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ওই ভ্রাতৃগণের শব। ওই গোরস্থান — ওই শ্মশানভূমিতে — শোনো শোনো তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ওই শহীদ ভাইদের মুখ মনে করো, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে করো, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না! ভুলিয়ো না! আজ আর কলহ নয়, আজ তোমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বোনে-বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।"[২]

শাশ্বত ভারতের এই যে মানবতাবাদী বাণী, তা নজরুল ইসলাম চেতনায় ধারণ করেছিলেন তাঁর অবচেতনেই। তাছাড়া শৈশব থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান — এই দুটি পৃথক ধর্ম ও জনগোষ্ঠী বহমানকাল ধরে একই জল ও

বায়ুতে পরিপুষ্ট লাভকারী, একই সাংস্কৃতিক আবহে স্থিত, মাঠে-ঘাটে-হাটে একে অপরের সহযাত্রী ও সমব্যথী। দেশের প্রকৃত উন্নতি উভয়জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল করে বলে তিনি মনে করেন।

শত শত বৎসর ধরে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করছে। তবে একই বোধ এবং উপলব্ধিতে স্নাত হয়ে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দিনাতিপাত করলেও উভয়ের অন্তরের গহীন কোণে যেন এক প্রচ্ছন্ন বাধা আছে, যে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টিতে এ সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং দুইজাতির মিলনের অন্তরায় হিসেবে 'ছোঁয়া-ছুঁয়ি'কে দায়ী করেছেন —

"আমার গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোন ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোন ধর্মসম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।"[৩]

ধর্মের আবরণ থেকে এই ছুৎমার্গের মতো জঘন্য আচরণকে দূরীভূত করার পর ধর্মের যে সুন্দর ও কল্যাণময় রূপ বেরিয়ে আসে, তা মানবতার মুক্তির অগ্রগতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু ধর্মের উপর যখন শাস্ত্রীয় আচার আচরণ তথা বাহ্যিক আবরণ চেপে বসে তখনই ধর্মের শক্তি কমে যায়, ধর্মের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্মে ধর্মে বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান এই দুইজাতির মিলনের অন্তরায়ের পেছনে এই বাহ্যিক-আচার আচরণকেও দায়ী করেছেন। এই বাহ্যিক আচরণই দুই সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছে। কারণ মানুষ তখন ধর্মের মূল সত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে ধর্মের মেকিত্ব নিয়ে, আচার সর্বস্থতাকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠে —

"ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষও বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুত্ব মুসলমানিত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ওই দুটোয় মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটাতো পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! ... টিকি দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্কে ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।"[৪]

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের সার্বিক মিলনের বিশ্বাসী কাজী নজরুল ইসলাম মিলনের পথে উভয় ধর্মের উপরিউক্ত শাস্ত্রীয় আচার-আচরণকে চিহ্নিত করে এদের প্রতিকারে তিনি তৎপর হয়েছেন। তিনি মনে করেন, এই দুই জাতির বিশ্বাস ও চৈতন্য থেকে এইসব অন্তরায়গুলো যদি দূরীভূত হয়ে যায় তবে উভয় জাতির মিলনের পথ কন্টকমুক্ত হবে।



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

নজরুলের জন্ম ও বিকাশের সময়টি ছিল ভারতবর্ষের ক্রান্তিকাল। সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী ব্রিটিশদের করতলগত ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার অভাব ছিল। পরস্পরের সন্দেহ, সংশয় ও সংঘর্ষের কারণে ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতার স্বপ্ন যেমন ক্রমে দূরবর্তী হচ্ছিল তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঠিক নির্দেশনার অভাবে এক অস্থির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এই প্রতিকূল অবস্থায় ভারতের প্রকৃত মঙ্গল কামনায় নজরুল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন দুই জাতির মিলনের জন্য অমর বাণী—

"এসো ভাই হিন্দু! এসো ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড়ো দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই!... আমাদের প্রীতিবন্ধন অক্ষয় হোক। আমাদের এই মহামিলন চিরন্তন হোক। আমরা আজ সব সংকীর্ণতা, অতীতে সকল দুঃখ-ক্লেশ ভুলিয়া ভাইকে ভাই-এর কোল বাড়াইয়া দিই। এসো ভাই আর একবার হাত ধরাধরি করিয়া এই খোলা আকাশে মুক্ত মাঠে দাঁড়াই।"[৫]

'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য' সম্পর্কে স্মৃতিচারণে প্রাধান্য পেয়েছে একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতার প্রয়াণে শোকাতুর মানুষের মিলনের চিত্র। শোকগ্রস্ত হিন্দু-মুসলমান, মাড়োয়ারী, বাঙালী, হিন্দুস্থানীরা যে তাদের ভেদাভদে ও জাতবিচার ভুলে এক হয়ে গিয়েছিল সেটাই নজরুল ইসলামকে অনুপ্রাণিত করেছিল বেশি। তাই তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ —

"মনে পড়ে, সমস্ত বড়োবাজার ছাপাইয়া হ্যারিসন রোডের সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া বোরুদ্যমান লক্ষ লক্ষ লোক-মাড়োয়ারী, বাঙালি, হিন্দু-মুসলমান, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, কন্যা — শুধু বুক চাপড়াইতেছে, 'হায় তিলকজি! আহ্ তিলকজি!' মৃত্যুর অমাভরা শত শত কৃষ্ণ পতাকা পশ্চিমা ঝঞ্ঝায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, আর তাহাই কাঁধে করিয়া অযুত লোক চলিয়াছে জাহ্নবীর জলে বিসর্জন দিতে। বাড়ির বারান্দার জানালায় থাকিয়া আমাদের মাতা ভগিনীগণ এই পুণ্যাত্মার আলেখ্যের উপর তাঁহাদের পূত অশ্রুরাশি ঢালিয়া ভাসাইয়া দিতেছিলেন। বলিলাম, ধন্য ভাই তুমি! এমনই মরণ, সুখের মরণ, সার্থক মরণ যেন আমরা সবাই মরিতে পারি।... ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবী তটে দাঁড়াইয়া, আয় ভাই, আমরা হিন্দু মুসলমান কাঁধ দিই! নইলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই! আজ বড়ো ভাইকে হারাইয়া, এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করি!"[৬]

আসলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনা নজরুলের আত্মিক বিশ্বাসের অন্যতম অঙ্গ ছিল, তাই লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে শোকাতুর জনতার মধ্যে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নজরুল ঐ সাময়িক মিলনকে চিরন্তন দেখতে চেয়েছিলেন আজীবন।

বস্তুত নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন বিশ্বমাত্রিক শিল্পী। তিনি শুধু হিন্দু-মুসলমান

মিলনেই সৃষ্টির আনন্দ পাননি, তাই তাঁর প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান মিলন ভাবনা প্রকারান্তরে পরিণত হয়েছে বিশ্বমানবতার অমোঘ মন্ত্রে — এখানেই তাঁর শিল্পীসত্তার স্বাতন্ত্র্য নিহিত।

**তথ্যসূত্র :**


১। কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা, ভারত : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। দ্বিতীয় সং, ২০০৫। 'ইব্রাহিম খা-কে লিখিত চিঠি', পৃ. ৫০৮-৫০৯।

২। কাজী, নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, ভারত : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। দ্বিতীয় সং, ২০০৫। 'যুগবাণী', 'নবযুগ', পৃ. ৪১৭।

৩। তদেব। 'যুগবাণী', 'ছুৎমার্গ', পৃ. ৪৩০।

৪। প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড। 'রুদ্রমঙ্গল'। 'হিন্দু-মুসলমান'। পৃ. ৪৪৬।

৫। প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড। 'যুগবাণী'। 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ'। পৃ. ৪২২-৪২৩।

৬। তদেব। 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৪২৫-৪২৬।




## বিশ শতকের দাদা চরিত্র ও বাঙালি কিশোরের স্বপ্নপূরণ

**ড. মৌমিতা সরকার**

উনবিংশ শতকে কিশোর-সাহিত্যের মূল ধারাটি ছিল নীতিবোধ প্রচারমূলক। কিশোরদের মনের কথা বা তাদের চাহিদাকে সে সময় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিশ শতকে আমরা দেখলাম সাহিত্যে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথার চেয়ে মনের কথার মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। কিশোরসাহিত্যও এর প্রভাব লক্ষনীয়। কিশোরদের মনগ্রাহী ভাষায় তাদের ভালোলাগার বিষয় নির্বাচন করে এসময়ে একাধিক গ্রন্থ রচিত হতে থাকলো। এর মধ্যে যুদ্ধের গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, গোয়েন্দা গল্প, হাসির গল্প, ভৌতিক গল্প, অলৌকিক গল্প, স্বাধীনতার গল্প ইত্যাদি ছিল প্রধান। কিশোরদের মনের খিদে যখন সাহিত্যের হাত ধরে মুক্তি পেতে শুরু করল তখন কিশোরদের মধ্যে পড়ার ইচ্ছে ও অভ্যেস বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল চাহিদা। এই চাহিদা পূরণের স্বার্থে কোন কোন চরিত্রকে নিয়ে লেখক আবার সমমানের অন্য কোন গল্প উপন্যাস রচনা করলেন। এভাবেই বাংলাসাহিত্যের পাতায় উঠে এলো ভোঁদড় বাহাদুর, বাটুল-দি-গ্রেট, নন্টে-ফন্টে, ফেলুদা, কাকাবাবু, মামাবাবু প্রমুখ। ধীরে ধীরে এরা নিজেদের পিতৃদত্ত পরিচয় ভুলে আপামর পাঠক-পাঠিকাদের আত্মীয় হয়ে গেলেন। এইসব সিরিজ সাহিত্যের মেলায় অন্যতম সম্মোধন হল দাদা। বিশ শতকের কিশোরসাহিত্যের সিংহভাগ জুড়ে আছে দাদাদের দাদাগিরি।

আভিধানিক অর্থে দাদা মানে মায়ের পেটের অগ্রজ। কিন্তু 'দাদা'র অর্থকে এই ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আটকে বিচার করলে হবে না। দাদা এবং দাদাগিরি শব্দ দুটিতে শ্রুতিসাম্য থাকলেও এদের এক করে ফেলা উচিত হবে না। দাদা বাঙালির খুব কাছের এবং বহুমাত্রিক শব্দ। আমরা চেনা লোককে দাদা বলি, অচেনা লোককেও দাদা বলি, শ্রদ্ধায় দাদা বলি, ভক্তিতে দাদা বলি, ভয়ে দাদা বলি, ব্যঙ্গে দাদা বলি। এই সূত্রে বাংলা সাহিত্যে নামের পাশে দাদা নিয়ে অনেক চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। 'দাদা' পুংলিঙ্গবাচক শব্দ, কিন্তু বাস্তবে হোক বা সাহিত্যের পাতায় দাদাগিরি একটি মেয়েও করে দেখাতে পারে। আবার দাদা হলেই যে দাদাগিরি করতে পারবে এমনটাও নয়। আমাদের আলোচনা অবশ্য তাদের নিয়ে যারা নামেও দাদা, কাজেও দাদা।

বিশ শতকের বাংলা কিশোর সাহিত্যে এমন দাদার সংখ্যাও কম নয়। বাংলা সাহিত্যের পাতায় নামী, বেনামী, বদনামী আরো কত দাদার আবির্ভাব হয়েছে, যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইদাদা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাদাদা, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কৈকালার দাদা, তারপর বারোয়ারি দাদা, স্যাটাদা, ভোলাদা, মধুদা আরও কতজন। কেবল আনন্দদান

দাদা চরিত্র সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, দাদা চরিত্রগুলি সৃষ্টি করতে লেখকের নিজস্ব অভিপ্রায় কাজ করেছিল এবং লেখকরা সে কাজে সর্বতোভাবে সফল হয়েছেন। আমাদের চারপাশে আজও রয়েছে দাদারা, রয়েছে দাদাগিরি; কিন্তু বর্তমানে তার স্বরূপ বদলে গেছে। বাঙালি কিশোর এখন আর রকে বসে আড্ডা দেওয়ার সময় পায়না, ঝালমুড়ি-তেলেভাজা - প্রভাতফেরী ইত্যাদি অধিকাংশই নবীন প্রজন্মের কাছে গল্পকথা। সিলেবাসের চাপকে ঘাড় থেকে নামিয়ে তাদের আজ নতুন করে এসবে সময় বিনিয়োগ করার মত সময় নেই। কাজে কাজেই টেনিদা বা ঘনাদার মতো বাকসর্বস্ব, কর্মবিমুখ দাদাগিরি ফলানোর লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর; কষ্টকর সব ফেলে ফেলুদা বা ঋজুদার সঙ্গী হওয়া। কিন্তু বাস্তবে যা হবে না কল্পনায় তাকে আপন আপন করে নিতে বাধা নেই, স্মৃতিরোমন্থনেও নেই কোন বাঁধন। তাই বাংলা সাহিত্যের কিশোর পাঠক থেকে শুরু করে পৌঢ় পাঠকের কাছে এইসব দাদারা আজও বেস্ট সেলার। বর্তমান প্রজন্ম ও সময়ের প্রেক্ষিতে এরা কেউ অতীতের ভার নয়, এরা শৈশব-কৈশোর-যৌবনের সঠিক মার্গ নির্ণয়ের সরথি। দাদাদের এই সার্থকতাই লেখকের সার্থকতা।

এদের মধ্যে কয়েকজন দাদাকে আমরা খুব ভালো করে চিনি। এরা নিজেরাই যেন দাদা ইমেজকে তৈরি করে দিয়েছেন। দাদা হোক বা দাদাগিরি - এদের ছাড়া বাংলা সাহিত্যের দাদাভাবনা অচল। কিশোর বয়সের গণ্ডি পেরিয়ে আট থেকে আশি সকলেই এদের ভক্ত। এদের ভালোলাগা, ভালোবাসা, কথাবার্তা, স্বভাবচরিত্র সব যেন আমাদের অতিচেনা, আমরা যেমন এরাও ঠিক তেমনই; আবার আমরা যা নই এরা যেন ঠিক তাই। বাস্তবে আমাদের সীমাবদ্ধতা যেখান থেকে শুরু সেখান থেকেই জন্ম এই নায়কদের। তাইতো এরা আমাদের দাদা, তাইতো এদের দাদাগিরিতে আমরা মুগ্ধ।

বিশ শতকে দাদা নানান রকম। গল্পবাগীশ দাদা, নেতাদাদা, ধান্দাবাজ দাদা, খাদ্যরসিক দাদা, প্রতিবাদী দাদা, শিকারী দাদা, রাজনৈতিক দাদা, সাংবাদিক দাদা, গোয়েন্দা দাদা, খেলোয়ার দাদা, আন্তর্জাতিক দাদা, লেখক দাদা, রোমিও দাদা, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় দাদা আরো কত কি! এসব দাদাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে আমরা তাদেরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। সব কটি ভাগের কথা আলোচনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভবও নয়। আমি কয়েকটি খুব পরিচিত দাদাদের নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রথমেই বিশ শতকের দুষ্টু দাদাদের দেখে নেওয়া যাক। সময়ানুবর্তিতা, বিদ্যানুরাগ, শাস্তিদান, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব নিয়ে শ্রীকান্তের মেজদার দাদাগিরি একটা খল চরিত্রের স্পর্শ দিয়ে যায়। নতুনদা তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। প্রেমহীন হৃদয়ের বর্ণনায়, অমানবিক ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়, অসন্তোষ প্রকাশে, তার যাবতীয়



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

হম্বিতম্বিতে তার নেতিবাচক দাদাগিরির পরিচয় পাই। তবে চরিত্রের এই নেতিবাচক দিকগুলিকে শরৎসাহিত্যে হাসির মোড়কে পরিবেশন করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এরপর আমরা বেশ কিছু নেতিবাচক দাদাদের দেখা পেয়েছি এদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রশান্ত বর্মনরায়ের হাড়কেপ্পন, বজ্জাত এবং আধপাগলা জংলিদা, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবাদা, মতি নন্দী সৃষ্ট বেশকিছু দাদারা।

বিশ শতকে আমরা সবথেকে বেশি পেয়েছি সবজান্তা বক্তিয়ার খলজী দাদাদের। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের 'নোটবই' কবিতার মেজদাটি সবজান্তা। সুকুমার সাহিত্যে একটি গল্পেও স্বল্প পরিসরে আমরা 'সবজান্তা দাদা'র দেখা পেয়েছি। কিশোরসাহিত্যে অনেক দাদারা এঁদের মতো নিজেদের প্রশংসা আদায় করেছেন আর যখনই অসমর্থ হয়েছেন তখনই কথার মারপ্যাঁচে উল্টোপাল্টা যুক্তিকে সাজিয়ে সন্দিগ্ধ শ্রোতার মুখ বন্ধ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ গল্পবলিয়ে দাদারা নিজেদের এই অনন্য প্রতিভা বলে বিশ্বব্যাপী দাদাগিরি করে বেড়িয়েছেন। গল্পবলিয়ে দাদাদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দাদারা হলেন ঘনাদা, টেনিদা, ব্রজদা। ঘনাদার গল্প বলার কায়দা এত আকর্ষণীয় এবং এত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গল্পের আনাগোনা যে আড্ডা-সাহিত্যের মেজাজটা ভেঙে দিতে গুণমুগ্ধ ভক্তদের ইচ্ছে করে না। তাই রোগা, লম্বা, হাড় বের করা, উপার্জনহীন, গৃহহীন, স্বজন-পরিবারহীন ঘনশ্যাম দাস মেসবাড়ির চিরস্থায়ী 'বড়াবাবু' হয়ে যান। ঘনাদার কাহিনিতে অতি তুচ্ছ বস্তুকে কেন্দ্র করে ভাবনা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। কিন্তু রূপদর্শীর ব্রজরাজ কারফর্মা তাঁর অভুতপূর্ব কথনশৈলীর দ্বারা বিশ্ববিখ্যাত ঘটনাগুলিকে বেছে নিয়ে প্রমাণ করেন এসবের পেছনে রয়েছে ধুতি-চাদরের স্পর্ধা ও অবদান। বিশ শতকের সাহিত্য ভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গর্ববোধ। আগাগোড়া হাস্যরসের আবরণ থাকা সত্ত্বেও এই বৈশিষ্ট্যটি ব্রজদার কাহিনিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। বিশ শতকের আর এক দাদা পটলডাঙ্গার টেনিদা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার সমস্ত বাহাদুরী তার জিভে কিন্তু নারায়ণ গাঙ্গুলির টেনিদাকে আমরা সত্যি সত্যি আপদে-বিপদে এগিয়ে আসতে দেখেছি। তার আন্তরিক সারল্য চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলিকে উপেক্ষা করে তাকে আমাদের আপনজন করে তুলেছে। টেনিদার অভিনব গালাগাল সৃষ্টির মাধ্যমে কিশোরসাহিত্যে নির্মিত হয়েছে এক আসামান্য ভাষা রেজিষ্টার। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রদীপ নারায়ণ দত্ত ওরফে পিনডিদাও অন্যের পয়সায় উদরপূর্তি করতে ভালোবাসেন, অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েন। ফাইভস্টার ক্লাবের মধ্যমণি পিনডিদা প্রয়োজনে গল্পকথক সোনার মন জুগিয়ে চলেন। বিশ শতকের অন্য কোন দাদা ভক্তদের মন জয় করার খাতিরে নিজের মতের পরিবর্তন করেন নি। এখানেই পিনডিদা চরিত্রের মৌলিকতা। তার কথার

সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও এগুলি কেবলমাত্র কৌতুক নয়, তার কাহিনিগুলির মধ্যে আমরা দলগত শক্তির জয়কে দেখতে পাই। বিশ শতকের শেষ প্রান্তে কিরণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোলদা নামে একটি বাতেলাবাজ দাদার জন্ম দিয়েছেন। তিনি হাতিমারা রাজবাড়ির অভিজাত বংশের সন্তান, অমায়িক, উদার, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। তবে তাঁর মুখ থেকে শোনা অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর বাস্তব চরিত্রের বৈসাদৃশ্যতা তাঁর গুলবাজ চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়ে যায়। পরিচয় গুপ্তের 'গল্পের রাজা লম্বুদা' একাধারে খেলোয়াড়, গোয়েন্দা, শিকারি ও দুঃসাহসী অভিযাত্রী। গর্বিত প্রতিপক্ষ, চোর-ডাকাত, বনের বাঘ, জলের কুমির এরাই কেবল লম্বুদার হাতে শায়েস্তা হন নি স্বয়ং ভূত পর্যন্ত ছেড়ে 'দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে পালিয়েছে। মাঝে মাঝে গল্পের পটভূমি মর্তের সীমা ছাড়িয়ে রূপকথার অঙ্গনেও স্থাপিত হয়েছে। একে কল্পবিজ্ঞান না বললেও এতে ফ্যান্টাসির ছোঁয়া রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের নামজাদা দাদাদের ভিড়ে দর্জিপাড়ার লম্বমান দত্তকে অনেকেই চেনে না, কিন্তু গল্প বলিয়ে দাদা হিসাবে লম্বুদাও কিশোর পাঠককে মুগ্ধ করতে সক্ষম। এছাড়াও এই দলে আছেন মৃণাল বসুচৌধুরীর ভজাদা, সৈয়দ মুস্তাফা আলীর মশাদা প্রমুখ আরো অনেকে। এই সব গুলবাজ দাদারা যখন নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি পরিবেশনে আসর জমাতেন তখন বাঙালির জীবনে কম্পিউটার, টিভি, মিডিয়া ছিল না, ছিল না পড়াশুনা বা কাজের চাপে সামাজিক জীবনে অবসর যাপনের স্বাধীনতাহীনতা। বরং ছিল প্রাণখোলা আড্ডা, আন্তরিক অতিথিপরায়ণতা ও মজলিসি বৈঠকের সুযোগ। গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে? আর তা যদি অতন্ত্য শিল্পীত মেজাজে পরিবেশিত হয়? এইসব অবিশ্বাস্য গল্প তাই আমরা এক প্রকার হাঁ করে গিলে খাই, হয়তো কখনো ধৈর্য হারিয়ে পাল্টা জেরাও করে বসি। কিন্তু সমস্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে সামলে প্রশ্নকর্তাকে ফাঁদে ফেলার ক্ষমতা এই দাদারা রাখেন। বাস্তবে আমরা যা পারিনা গুলসম্রাট দাদারা তাই-ই করে আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। অবসর বিনোদনে, রকের আড্ডায়, মজলিশি বৈঠকে চা-বিস্কুট-চপ-মুড়ি বা চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র সঙ্গে এসব কাল্পনিক বাহাদুরী কাহিনি বেশ জমে যায়।

বিশ শতকের প্রথমদিকে কল্পনায় বিশ্বজয়ী দাদাদের প্রভাব বেশি থাকলেও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে প্রতক্ষ্য দাদাগিরি করা গোয়েন্দা দাদারা। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা ও বুদ্ধদেববাবুর ঋজুদার কথা বলতে হয়। গোয়েন্দা দাদাদের বাস্তব দাদাগিরির কাছে হার মেনেছে দুধে ভিলেনরা। এদের বুদ্ধি বিবেচনা শারীরিক ক্ষমতা আর পাঁচটা মানুষের থেকে আলাদা, এদের জ্ঞান অসীম, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা অনন্য, কথা বলার কায়দা অভূতপূর্ব। এদের দাদাগিরি ছড়িয়ে আছে প্রতিদিনের জীবনচর্চায়। এইসব দাদারা নিঃসন্দেহে আমাদের





গর্ব এবং আদর্শ। কিশোর কাহিনির স্রষ্টা হিসেবে সত্যজিৎ রায় জানতেন কিশোর পাঠকের বহুমুখী চাহিদার কথা। তিনি ফেলুদার গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে রহস্য, রোমান্স, অ্যাডভেঞ্চার, ভ্রমণের আনন্দ, হেঁয়ালির মুগ্ধতা ইত্যাদি অনেকগুলো দিক উপহার দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ফেলুদার প্রভাব এতটাই বেশি ছিলো যে আমরা একে একে প্রবীর হালদারের সত্যসন্ধানী অপুদা, আশিস স্যান্যালের পটলদা প্রমুখদের পেয়েছি। এই সব দাদারা তাঁদের গোয়েন্দাগিরি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ছদ্মবেশ ধারণে পারদর্শিতা, বিশ্লেষণী শক্তি ইত্যাদির দ্বারা পাঠকদের মন জয় করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের শিকারি দাদা মানেই ঋজুদা। ঋজুদা অরণ্যপ্রেমী, স্বদেশপ্রেমী। বিশ শতকের শেষের দিকে পাঠকের চাহিদা কেবলমাত্র মানসিক উপভোগ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনা, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মূল্যবোধের উত্তরণের পথ খুঁজেছে। ঋজুদার সহকারি হিসেবে আমরা পেয়েছি কিশোরী তিতিরকে। অ্যাডভেঞ্চার দুনিয়ায় নারী-পুরুষের সহাবস্থান আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে যুগ পাল্টাচ্ছে। বিশ শতকের ঋজুদা এমন এক শিকারী যার কর্মকালেই সরকার আইন করে শিকার বন্ধ করেছে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্রীড়াজগতের কথা উচ্চারণ করলেই আমাদের মতি নন্দীর নাম মনে আসে। কিশোরবয়স্ক পাঠকদের জন্য তাঁর লেখাগুলিতে আমরা একাধিক দাদাকে খুঁজে পাই। এদের কেউ নায়ক, কেউ ভিলেন, কেউবা নায়ক তৈরির কারিগর। বাংলা সাহিত্যে ব্রজদার কথনশৈলী যেমন ব্রজবুলির শিল্পিত রূপ নির্মাণ করেছে ঠিক তেমনি তাঁর ক্রিকেট-অন্ত প্রাণ ননীদার কৌশল ক্রীড়াজগতে জন্ম দিয়েছে 'ননীট্রিক্সে'র। পরাজয় ও অপমানকে কাজে লাগিয়ে অসাধ্যসাধন করার দাদাগিরির সমার্থক শব্দ তাঁর ক্ষীরদা। মতি নন্দীর সৃজনসম্ভারে ভালোমানুষ দাদাদের থেকে মন্দ দাদাদের সংখ্যা অনেক বেশি। তবে লেখকের সৃজনীগুণে এইসব নেতিবাচক দাদারা কখনোই জয়লাভ করতে পারেন নি, কিশোর পাঠকের মুখে হাসি ফুটিয়ে জয় হয়েছে পরিশ্রম, একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাসের। ক্রীড়াজগতের আরোও কয়েকজন দাদা হলেন নির্মলেন্দু গৌতমের ঝপুদা, রতনতনু খটির ভোলাদা, সনৎকুমার মিত্রের গোপালদা, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্টেদা, শচীন দাসের সেন্টুদা, সবুজ ভট্টাচার্যের বাঞ্ছাদা, সুব্রত বন্দোপাধ্যায়ের সুখদা প্রমুখ।

কিশোর পাঠকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে দাদাদের নিয়ে অনেক ভুতের বা অলৌকিক পরিবেশে রচিত রোমাঞ্চকর গল্প লেখা হয়েছে। যেমন কালিদাস ভদ্রের 'ভূতের পাল্লায় রানাদা'। বিশ শতকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে মিথ বিশ্বাসের প্রভাব একটু একটু করে কমতে শুরু করলেও যেটুকু ছিল তাও কম কিছু না। দাদা ভাবনায়

এর একটুও ছাপ পড়বে না,তাও কি হয়? হেমচন্দ্র বাগচীর একাদশী দাদা এমনই এক মিথ বিশ্বাসে জড়িয়ে থাকা দাদা। এঁর নাম উচ্চারণেও নাকি কোন না কোন বিপদ হতে বাধ্য। একাদশী দাদার বিপরীতে আছেন মধুসূদন দাদা, যিনি সকল বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। বিশ শতকেই আমরা পেয়েছি পুলক কুমার বন্দোপাধ্যায়ের বাতিকগ্রস্থ বদনদাকে। বিশ শতকে যেসব দাদাদের নিয়ে সিরিজ সাহিত্য লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে আমরা তারাপদ রায়ের দাদার কথা উল্লেখ করতে পারি। এই আধপাগলা, বোকাবোকা স্বভাবের অত্যন্ত মজার মানুষটি নামীদামী দাদাদের ভিড়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে নিজের স্থান জমিয়ে নিতে পারেন নি বটে কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে পাঠ করলে তাঁর অদ্ভুত যুক্তি এবং কার্যকলাপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা জীবনরহস্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

কমিক্সের বইগুলোতেও আমরা যে সমস্ত দাদাদের পেয়ে থাকি তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বাটুলদা এবং নন্টে ফন্টের কেল্টুদা। বাটুল ছোটদের অত্যন্ত প্রিয় হলেও এই চরিত্রের সৃষ্টি কিন্তু ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এবং আদতেও ছোটদের কেন্দ্র করে নয়। পাশাপাশি কেল্টুদা কার্টুন দুনিয়ার অন্যতম নেতিবাচক দাদা। কেল্টুদাকে আমরা বেশিরভাগ সময় শেষকালে অপমানিত হতে দেখি, তা সত্ত্বেও তার দাদাগিরিতে ভাটা পড়ে না। কার্টুন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাদা অহিভূষণ মালিকের নোলেদার দাদাগিরি বহুমুখী।

বাংলা সাহিত্যে আট থেকে আশি সবার মন জয় করতে দাদাদের ছড়াছড়ি। বিচিত্র তাদের নেশা, বহুমুখী তাদের পেশা, বিভিন্ন তাদের মানসিকতা, এদের মধ্যে মৌলিকত্বের জোরে কেউ সর্বজন পরিচিত, কেউ বা স্বল্প পরিসরে পাঠকের কাছে সম্মানীয়, কারও মধ্যে খ্যাতির সম্ভাবনা ছিল প্রবলতর, আর বাকিরা সবাই যে একেবারে ভুলে যাওয়ার মতো তাও নয়। কোথাও সৃজন কৌশলে স্রষ্টার দাদাগিরি, কোথাও সৃষ্ট চরিত্রের দাদাগিরি। যুগ যুগ ধরে বাংলা সাহিত্যের পাতায় দাদারা নানাভাবে উপস্থিত থেকে শিশু-কিশোর পাঠকের মনোরঞ্জন ও মনবিকাশের চেষ্টা চালিয়েছে।

এই সব দাদাদের জন্ম মূলত কিশোর পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য। তাই একজন কিশোরের ভালো লাগবে এমন বিষয় কাহিনিগুলিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। সব দাদাদের এক জায়গায় রেখে তুলনা করা সম্ভব নয় কারণ এদের প্রত্যেকের বয়স কর্মক্ষেত্র ও স্বভাব আলাদা কিন্তু জনপ্রিয়তায় এরা কেউ কারো চেয়ে কম নয়। এখানেই শেষ নয়, এইসব কিশোরপাঠ্য কাহিনিগুলিতে স্রষ্টা অত্যন্ত সচেতনভাবে, সুকৌশলে বিভিন্ন মূল্যবোধ সঞ্চারিত করেছেন, নানান বিষয়ের তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা দ্বারা কাহিনিগুলি নিঃসন্দেহে বিভিন্ন দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে। দাদাদের গল্প বর্ণনা করতে গিয়ে লেখকরা টুকটাক জিভের খিদে থেকে শুরু করে ভুরিভোজের দেশি-বিদেশি খাদ্যসম্ভারের তালিকা পরিবেশন





করেছেন। জানা-অজানা কত রকমের সাহিত্য, জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব, ভাষাবিদ্যা, প্রকৃতির আজব খেলা, সঙ্গীতভাবনা, ভৌগোলিক বিস্ময়, প্রাণিজগতের না-জানা কথা, আমাদের সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এইসব গল্পগুলিতে অভিনব তথ্য উঠে এসেছে। এভাবেই উনিশ শতকের কিশোরসাহিত্যে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানদান পদ্ধতি বিশ শতকে অতন্ত্য শিল্পমণ্ডিতরূপে পরিবেশিত। পাশাপাশি কিশোরসাহিত্য বলেই হয়তো এইসব গল্পগুলিতে রাজনীতির পদক্ষেপ বা নারী পুরুষের রসায়ন লেখকরা খুব সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। একটা সময় পর শিল্পী তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এইসব চরিত্রগুলোকে সামনে রেখে স্রষ্টা যখন তার কৈশরে ফিরে যেতে চেয়েছেন ঠিক সেই সময়ে কোন একজন কিশোর হয়তো এই চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজের স্বপ্নপূরণের পথ খুঁজেছে। শিল্পীমানস ও কিশোরমানসের এই দ্বিরালাপ আমরা বিশ শতকের আগে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। সবশেষে একটা কথা বলতেই হবে, বিশ শতকের দাদা চরিত্ররা কেবলমাত্র কিশোর পাঠকের স্বপ্নপূরণ করে থেমে যাননি তারা সব বয়সের পাঠককে ফিরিয়ে দিয়েছ তাদের কৈশোরের রঙিন দিনগুলি।

**তথ্যসূত্র :**


১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সমগ্র কিশোর সাহিত্য', আনন্দ পাবলাশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬
২. বুদ্ধদেব গুহ, 'ঋজুদা সমগ্র' (প্রথম - পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলাশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭-০৮
৩. সুরজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ঘনাদা সমগ্র (প্রথম - তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলাশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭-০৮
৪. সত্যজিৎ রায়, ফেলুদা সমগ্র (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলাশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৬
৫. রূপদর্শী, ব্রজদার গুল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলাশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭
৬. তারাপদ রায়, দাদা সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮
৭. পরিচয় গুপ্ত, গল্পের রাজা লম্বুদা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮
৮. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, পিনডিদা সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫
৯. মতি নন্দি, কিশোর সাহিত্য সমগ্র, পাবলিশিং প্লাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১১
১০. শ্যামল দাস সম্পাদিত, ১০০ দাদার ১০০ গল্প, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২
১১. অহিভূষণ মালিক, নোলেদা, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১
১২. কিরণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোলদার পঞ্চবাণ, গ্রন্থভারতী, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

# ‘প্রাচীন সাহিত্য’-এ শকুন্তলা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঞ্চিতা সাঁতরা

সংস্কৃত সাহিত্যোদ্যানে সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্প হল মহাকবি কালিদাস বিরচিত ‘অভিধান শকুন্তলম’ নাটক। যার সৌরভে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিগণ আমোদিত ও আচ্ছন্ন। মহাকবি এই নাটকে তার কবি প্রতিভা ও নাট্য প্রতিভা নিঃশেষিত করে দিয়েছেন। তিনি আপন কবিত্ব মাধুর্যে সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছিলেন। ফলস্বরূপ তৎকালীন যুগের সীমা অতিক্রম করে, দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে, ভাষার বেড়াজাল ছিন্ন করে চিরন্তন খ্যাতি অর্জন করেছেন। কালিদাসের নিসর্গ চেতনা, প্রেম ভাবনা, সমাজ দর্শন, মানবতার আদর্শ, মানব জীবনে পরিপূর্ণতারবোধ সর্বোপরি আধ্যাত্মিক চেতনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবিগণের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। অর্থাৎ অভিজ্ঞান শকুন্তলমের আকর্ষণ সকল সহৃদয়গণের কাছেই প্রবল।

কালিদাসের সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত কবিগণের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। উভয়ের সাহিত্য ক্ষেত্র পৃথক। একজনের অবদান সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়, অপরজনের দান বাংলা সাহিত্যে অনুপম। রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রিয় কবি হলেন কালিদাস। বলাবাহুল্য সংস্কৃত ভাষার কাছে বাংলা ভাষা যেমন ঋণী,তেমনি মহাকবি কালিদাসের কাছে ঋণী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি কালিদাসের কাছ থেকে বিশ্বকবির ঋণ গ্রহণের যুক্তি দেখিয়ে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ’ গন্থে বলেছেন “কালিদাসের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য কিছু নাই। বাল্যকাল হইতেই যে কালিদাসের কাব্য তিনি জানিতেন। ভারতীয় সাহিত্য সভ্যতার দিগন্তরে যে সমস্ত মহাশিখর জাগ্রত, কালিদাস তাহাদের উচ্চতম। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিকে অভিবাদন জানাইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।”[১]

ব্যাস-বাল্মীকির পর ভারতীয় কবি সমাজে কালিদাসের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাঁর কাব্য প্রতিভার সমুদ্রে কবি রবীন্দ্রনাথ বার বার অবগাহন করেছেন এবং নিজেকে সিক্ত করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্ভার বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই অনুভব করা যায় যে, কালিদাসের ভূমিকা রবীন্দ্র কাব্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। কালিদাসের কাব্যের ভাষা, অলংকার, ছন্দ মাধুর্য রবীন্দ্রনাথের লেখনীর অগ্রভাগে বারংবার আঘাত হেনেছে। কালিদাসের কাব্যের ঐশ্বর্য সম্ভার সংগ্রহ করে, তা সম্পূর্ণভাবে নিজের করে নিয়ে আপন সৃষ্টি সম্ভারে আপন মনের মাধুরীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নব রূপে সজ্জিত করায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কবি শিরোমণি কালিদাসের সৃষ্টি সৌন্দর্যের আলোক-মালা হাতে ধারণ করে সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিবেশের অপরূপ লাবণ্য, সভ্যতা সংস্কৃতিকে দর্শন





করিয়েছেন; পরিচয় করিয়েছেন ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,— “কালিদাসও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাকে উদ্বোধিত এবং পরিপুষ্ট করিয়াছেন। আবার রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের কাব্যগুলির ভিতরে নিজের ভাবধারা আরোপিত করিয়া নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে যে কথা ছিল অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সম্প্রসারণের দ্বারা গভীর করিয়া তুলিয়াছেন, যে কথা ছিল না কালিদাসের কাব্যে তাহাকে কালিদাসের পরিবেষ্ঠনীর ভিতরেই নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। অথবা একথাও বলা যাইতে পারি যে, প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে কালিদাস তাহার মনের তারে যে সুর বাঁধিয়াছিলেন তাহা এত যুগের বায়ু কম্পনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের তারে নূতন নূতন ঝংকার দিয়াছে। এ সুর অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুর, কালিদাস শুধু অতীতের যবনিকার অন্তরাল হইতে নেপথ্য সঙ্গীত রচনা করিতেছেন। সেই নেপথ্য সংগীতের সহিত গভীর সঙ্গতিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুরও একটা নতুন মহিমা লাভ করিয়াছে।”[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রাচীন সাহিত্য’ ১৩১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এগ্রন্থে তিনি প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ থেকে করে কালিদাসের ‘মেঘদূতম’, ‘কুমারসম্ভবম’ ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নাটকের বিষয়বস্তুর মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন এবং বাঙালি পাঠক হৃদয়ে সংস্কৃত সাহিত্যপাঠের এক তীব্র স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন।

‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নাটকে কালিদাসের জীবনবোধ কবির হৃদয়কে কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল সেটাই আলোচ্য বিষয়। বিশেষ করে ‘শকুন্তলা’ নাটকে চিত্রিত প্রাচীন ভারতীয় সমাজ দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ‘প্রাচীন সাহিত্য’-এ শকুন্তলা বিষয়ক প্রবন্ধে প্রতিফলিত সমাজ দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কালিদাস প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে যা আমাদের নিকট তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান তার মধ্যেও যে বৃহতের অধিষ্ঠান, তার অন্তরেও যে মহত্ত্ব বিরাজমান হতে পারে তা কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ পাঠ করলেই সহৃদয়গণ অনুভব করতে পারেন। মানব জীবনকে পরিপূর্ণতার অভিমুখে নিয়ে যাওয়াই মানব ধর্ম। ঈশ্বর মানুষকে একাদশ ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, বিচারবোধের জন্য বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক চেতনাও দিয়েছেন। মানুষ যখন ব্যক্তি-চৈতন্যের সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্বচৈতন্যের পথে অগ্রসর হয় তখনই তার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং বিশ্বের সঙ্গে এক নির্মল যোগসূত্র স্থাপিত হয়। শকুন্তলা নাটকে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে ব্যক্তি চেতনার মধ্যে অবরুদ্ধ না করে কালিদাস পরিপূর্ণতা তথা আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ করেছেন। মহাকবির এই জীবন দর্শন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—“শকুন্তলার মধ্যে একটি ভাব

আছে, সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি।"[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শকুন্তলা নাটকের দুটি মিলন দৃশ্যের কথা বলেছেন একটি পূর্ব মিলন অপরটি উত্তর মিলন। শকুন্তলা নাটক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পূর্ব মিলনের বিস্তার প্রথম অঙ্ক থেকে চতুর্থ অঙ্ক এবং দ্বিতীয় মিলনের বিস্তার পঞ্চম অঙ্ক থেকে সপ্তম অঙ্ক। মহাকবি কালিদাস লিখেছেন,—

'অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিনৌ বাহূ।
"কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেসু সন্নদ্ধম।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ এই শ্লোকের বাংলা পদ্যে অনুবাদ করে বলেছেন—

"অধর কিশলয় রাঙিমা আঁকা যুগল বহু যেন কোমল শাখা।
হৃদয় লোভনীয় কুসুম হেন তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।"[৫]

এই শ্লোকের প্রতিটি শব্দে পার্থিব দেহ সৌন্দর্য এবং সম্ভোগ স্পৃহার অপরূপ বর্ণনা ধরা পড়েছে। কামনা বাসনার কর্দমাক্ত জলে অবগাহন করে দেহকে, মনকে, সর্বোপরি অন্তরাত্মাকে কালিমালিপ্ত করার মধ্যে মানব জন্মের সার্থকতা নেই। তাইতো মহাকবি চতুর্থ অঙ্কে তাঁর কাব্যের নায়ক ও নায়িকার উপর নামিয়ে আনলেন অভিশাপের অন্ধকার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দুর্বাসার অভিশাপ শকুন্তলা নাটকে কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এই অভিশাপের বীজ মহাকবি প্রথম অঙ্কেই রোপণ করেছেন। বাহ্যিক রূপজ মোহে আকৃষ্ট হয়ে দুষ্যন্ত শকুন্তলার যে প্রেম তা কেবলই দেহ নির্ভর প্রেম, প্রকৃতপক্ষে যাকে 'কাম' বলা যায়। বিশ্বকবি বলেছেন এরূপ প্রেম কালিদাসের অভিপ্রেত নয়। যৌবনোচ্ছল প্রেম বা দেহনির্ভর কামকে অভিশাপের দ্বারা জর্জরিত করে দেহাতীত প্রণয়ের রূপদান করাই মহাকবির লক্ষ্য। কারণ দেহনির্ভর প্রেম কখনোই সমাজের জন্য হিতকারক বা মঙ্গলদায়ক হতে পারে না। তাইতো নাটকের সপ্তম অঙ্কে যখন পৃথিবীর নরপতি দুষ্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধের প্রধান সহায়ক রূপে ধরা দেয় কিংবা ইন্দ্রের সিংহাসনে বসার অধিকারী হয়ে ওঠে এবং বিরহ ব্রত পালনরতা, শুদ্ধশীলা, শকুন্তলা যখন ধূসর বসন পরিধান করে ও একবেনি ধারণ করে তখন পাঠক হৃদয় সহজেই তাদের পূর্বকৃত অপরাধকে ক্ষমা করে সহজ ভাবে গ্রহণ করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন মারীচ মুনির স্বর্গত তপোবনে নায়ক নায়িকার শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে মহাকবির গভীর হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ 'প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গল সৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া'[৬]—র মধ্যেই কালিদাসের জীবনাদর্শ তথা আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয় তবে সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় সমাজের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুখ- দুঃখ,আশা-নিরাশা সমস্ত কিছুই। সেইরূপ কালিদাস শকুন্তলা নাটকে





দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্য মানবজাতির তথা শাশ্বত মানব ধর্মের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শকুন্তলা চরিত্রটিকে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন —"যে প্রেম প্রণয়ী এবং প্রণয়িনীকে আপন আপন কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্মৃত করিয়া তুলে, যে প্রণয় কেবল পরস্পরকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয়, যাহা কখনো আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব বা অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে মঙ্গলমাধুর্য বিকীর্ণ করে না, তাহা একান্তই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও সংকীর্ণ প্রেম। এরূপ প্রণয় অল্প সময়ের মধ্যে দুর্বহ হইয়া উঠে। এরূপ প্রণয় দেবরোষে ভস্মীভূত হয়, অভিশপ্ত হয় ঋষি শাপে এবং গুরুজনভর্ৎসনায় খণ্ডিত হয়।"[৭] অর্থাৎ মহাকবি বলতে চেয়েছেন প্রেম অত্যন্ত মধুর একটি বিষয়। কিন্তু যে প্রেম সমাজ সংসার, দায়িত্ব-কর্তব্য, সংস্কার ভুলিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র যৌবনমত্ততার দিকে ধাবিত হয় সেই প্রেমে কোন মাধুর্য ও পবিত্রতা থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জঙ্গলের হরিণীর মতো শকুন্তলা ছিল অসতর্ক, সে কামদেবের পঞ্চশরকে ঠিকমত চিনত না। তাই দুষ্যন্ত রূপ ব্যাধ তপোবনে প্রবেশ করে সহজেই তাকে শিকার করে দিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ সংস্কারে এইরূপ প্রেমের কোন সার্থকতা নেই। পতি চিন্তায় আনমনা শকুন্তলা যখন পূজনীয় অতিথির আগমন বার্তা শুনতে না পেয়ে থাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার উপর বর্ষিত হয় দুর্বাসার অভিশাপ। বলাবাহুল্য কর্তব্য কর্মের শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্য এবং আশ্রমধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তাকে অভিশপ্ত হতে হলো।

শকুন্তলা চরিত্রটিকে বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কালিদাস তাঁর নাটকের নায়িকাকে উদ্ভিন্নযৌবনা রূপে যেমন বর্ণনা করেছেন তেমনি অপ্রগলভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিনী, সতীধর্মের আদর্শ রূপেও প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতবর্ষের চিরন্তন নারী চরিত্রের জন্য অনুকূল করে চিত্রিত করেছেন তাকে। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যে বলা হয়েছে 'কালিদাস অপরূপ কৌশলে তাঁহার নায়িকাকে লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহনার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন।"[৮] সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদের ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে কল্যাণ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাব্যের নায়িকা শকুন্তলা।

মহাকবি নাটকের নায়ক দুষ্যন্তকেও ভারতীয় সমাজ সংস্কারের বাইরে রেখে নির্মাণ করেননি। নাটকের শুরুতেই ধনুর্বাণধারী রাজার প্রতি বৈখানাসের নিষেধ ধ্বনি শোনা যায়। মহাকবি আশ্রম মৃগের উপর শর নিক্ষেপ না করার মাধ্যমে বোঝালেন শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণয়বাণ নিক্ষেপ অনাকাঙ্ক্ষিত,নিদারুণ। বিশ্বকবির ভাষায়—

'মৃদু এ মৃগদেহে মেরোনা শর

আগুন দেবে কে হে ফুলের পর।
কোথা সে মহারাজ মৃগের প্রাণ
কোথায় যেন বাজ তোমার বাণ।।'[৯]

কিন্তু দুর্বৃত্ত ব্যাধ যেমন চঞ্চল হরিণীর চঞ্চলতা উপেক্ষা করে তাকে স্বীকার করে নিয়ে যায়, তেমনই দুষ্যন্তও রাজকর্তব্য অবহেলা করে, নিজে সামাজিক রীতি-নীতির নিয়ামক হয়েও কেবলমাত্র দৈহিক রূপের আকর্ষণে শকুন্তলাকে কামবাণে বিদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'কোন কিছু লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসে হস্তগত হইয়াছিল তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল।'[১০] তাইতো মহাকবি পরোক্ষভাবে দুষ্যন্তের উপরও দুর্বাসার অভিশাপ প্রয়োগ করলেন। কামচাঞ্চল্যের উদ্দামতার নিরসন ঘটিয়ে সংযত ও নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত করলেন। তা না হলে ভারতবর্ষের চিরন্তন সমাজ ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করা হতো। যে সমাজ কল্যাণ সাধনের জন্য কাব্য রচিত হয় সেই কল্যাণকর্মে ব্যাঘাত হত। তাই অনুতাপের অনলে দুষ্যন্তকে দগ্ধ করা হল। বিশ্বকবি বলেছেন— "এই অনুতাপের ভিতর দিয়া শকুন্তলাকে লাভ না করিলে শকুন্তলা লাভের কোন গৌরব ছিল না। হাতে পাইলেই যে পাওয়া তাহা পাওয়া নহে; লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়।"[১১] তিনি আরও বলেছেন—'বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মের ভিতরে হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না।'[১২] তাই মহাকবি দুষ্যন্ত শকুন্তলার বাহ্যিক মিলনকে দুঃখের আনলে দগ্ধ করে হৃদয়ের চিরন্তন শাশ্বত মিলনে সার্থক করে তুলেছেন। কালিদাসের এই সমাজ দর্শন বা ভাবনা বিশ্বকবির হৃদয়কে যে আলোড়িত করেছিল তা সহজেই বিশ্বাস করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাকবির রচনাভঙ্গী, বাকব্যবহার, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন পদ্ধতিতেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমালাপ বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকবি লেখনীর রাশ কখনই আলগা করে দেননি। কাব্যের দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি কালিদাস ছিলেন সদা সচেতন। দুষ্যন্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে শকুন্তলার সংবাদ না নিলেও লেখক শকুন্তলার মুখে বিলাপ ও পরিতাপের উপযোগী বাক্য ব্যবহার করলেন না। কিন্তু রসগ্রাহী পাঠকের শকুন্তলার দুঃখ বিজড়িত পরিস্থিতির কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। চতুর্থ অঙ্কে আশ্রম থেকে বিদায় নেওয়ার ঘটনাও খুব গাম্ভীর্য ও সংযমের সঙ্গে অল্প কথাতেই তুলে ধরেছেন। পঞ্চম অঙ্কের প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে দুঃখ, লজ্জা, ভয়, বিলাপ, অভিমান সবই আছে কিন্তু লেখক অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে তা উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বকবি বলেছেন এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনার সময় লেখক সমাজের কল্যাণস্তম্ভকে ভাঙতে চাননি, অকল্যাণের শিক্ষা পাঠক তথা সমাজকে দিতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দুষ্ট প্রবৃত্তির দুরন্তপনাকে অবারিত ভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন তাহাও কবি সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

লক্ষ্মী তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছে।'[১৩] কবি আরও বলেছেন 'কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই; পথে ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে, এমন দাসখত তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই।'[১৪] কাব্যের শাসনকে অব্যাহত রেখে ভারতবর্ষের চিরন্তন কল্যাণের আদর্শের কথা বিস্তৃত না হয়ে তিনি কাব্য লক্ষ্মীকে বাক্যালংকার পরিধান করিয়েছেন। সহজেই মানব সমাজকে সংকীর্ণতার পথ অতিক্রম করিয়ে অনন্তের পথে, সম্পূর্ণ তার পথে নিয়ে গেছেন।

সুতরাং বলা যায় মহাকবির জীবনবোধ বিশ্বকবির জীবনাদর্শকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা "প্রাচীন সাহিত্য"-এ শকুন্তলা বিষয়ক আলোচনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সর্বোপরি ব্যক্তি চৈতন্যের লতিকায় যে বিশ্ব চৈতন্যের পুষ্প আপন মাধুর্যে বিকশিত হতে পারে কালিদাস শকুন্তলা নাটক উপস্থাপন করেছেন। যে সুন্দর ছায়াবিজড়িত পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে মানুষ মধ্যাহ্নকালীন দাবদাহকে অতিক্রম করে শাশ্বত কল্যাণের মন্দিরে পৌঁছাতে পারে এবং যে মন্দিরে মানুষ সত্য,কল্যাণ ও সুন্দরের সন্ধান পায় সেই পথেরই সন্ধান দিয়েছেন মহাকবি শকুন্তলা নাটকে। মর্ত্যভূমির পঙ্কিল সলিলে তিনি স্বর্গের পারিজাত পুষ্পের বিকাশ ঘটিয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে কালিদাসের এই উদাত্ত ভাবনাকে যুক্তি সহকারে বিস্তারিত করেছেন এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের মানব সমাজের পরিচয় ঘটিয়েছেন।

**তথ্যসূত্র :**

১) ড: অনীল চন্দ্র বসু, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৩
২) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭
৩) হরনাথ পাল, সম্পা. রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য, গাফিকরিপ্রোডাকশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৪
৪) "অভিজ্ঞান" প্রথম অঙ্ক ১৯ নং শ্লোক
৫) হরনাথ পাল, সম্পা. রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯
৬) তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২২
৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬
৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১৮
১০) তদেব, পৃষ্ঠা-২০
১১) তদেব, পৃষ্ঠা-২৪
১২) তদেব, পৃষ্ঠা-২৩
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা-২৫
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা-২৬

# সাহিত্যের আড্ডা : আড্ডার সাহিত্য

**সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে বসে মূলত বাঙালি পাঠকের কাছে আড্ডার আভিধানিক অর্থ বুঝিয়ে বলতে যাওয়া নিতান্ত অমূলক। বাঙালি জীবনে আড্ডার মূল্য অপরিসীম। বহমান কাল ধরে এই একটা জাতি আড্ডাকে সযত্নে লালন করে চলেছে। কত অলস দুপুর, সোনালি বিকেল, মায়াভরা সন্ধ্যা, এমনকি মোহময়ী রাত বাঙালি মাতিয়ে রেখেছে আড্ডার মৌতাতে। একটু অবসর, গুটিকয় মানুষ, অফুরান ইচ্ছে, অমোঘ আকর্ষণ বৈঠকখানা থেকে বইয়ের দোকান, আটচালা থেকে চায়ের টেবিল, বটতলা-চকবাজার থেকে রেস্তোরাঁ-ক্লাবঘর, সদরদালান-চণ্ডীমণ্ডপ থেকে রুফটপ-কফিশপে দেদার আড্ডা জমিয়েছে সেকাল থেকে একালে। আড্ডা যেন বাঙালির জন্মগত অধিকার! বাঙালিকে উচ্ছন্নে যাওয়ার বেরঙিন রাস্তাটির সন্ধান দিয়েছে যে আড্ডা, সেই বেলাগাম আড্ডাই আবার সৃজনশীল বাঙালির উৎসাহ-অনুপ্রেরণার আঁতুড়ঘর।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেহারা এবং চরিত্রে আড্ডা নিজেকে অভিযোজিত করেছে বারে বারে, নিরন্তর ভূমিকা পালন করেছে যেকোন দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। আড্ডাই সেই উর্বর পটভূমি,যেখানে অজস্র অলস মস্তিষ্কে বোনা হয় সৃষ্টির বীজ। অগণিত পতিত মানবজমিনকে আবাদ করে সোনা ফলিয়েছে এই আড্ডা। এক সৃজনশীল মানুষের অকপট স্বীকারোক্তি উপরের কথাগুলিকে সমর্থন করবে,—'বলতে গেলে আড্ডার হাতেই আমি মানুষ। বই প'ড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যাবৃক্ষের উচ্চশাখা থেকে আপাতরমণীয় ফলগুলি একটু সহজেই পেড়েছিলুম -সেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্য রচনায় প্রধান নির্ভর রূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে আড্ডায় আমার সর্বনাশ হবে, এখন দেখছি আড্ডায় আমার সর্ব লাভ হলো। তাই শুধু উপাসক হয়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হয়ে তার মহিমা প্রচার করতে বসেছি।'[১] ছেলেবেলা থেকে আড্ডার প্রেমে আত্মহারা হয়েও বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য প্রতিভা শতধারায় বিকশিত হয়েছে। পুরোহিত হয়ে তাই তিনি আড্ডা নিয়েই অত্যন্ত সুখপাঠ্য আস্ত একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। মোটকথা এ আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণ তাঁর একার নয়, এ যেন আপামর বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের অন্তরের কথা।

আড্ডার সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সহবাস সত্যিই বাঙালিকে সৃষ্টিসুখে উল্লসিত করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সংস্কৃতিমনস্ক, সাহিত্যপ্রেমী কোন অভিজাত পরিবারে আড্ডা জমেছে নিয়মিত। কখনো কোনো সৃজনশীল ব্যক্তির সান্নিধ্যে একদল অনুরাগী জমিয়ে তুলেছেন দেদার আড্ডা, আবার কখনো প্রতিষ্ঠিত প্রকাশক, নামজাদা পত্রিকা সম্পাদক আড্ডায় ইন্ধন দিয়েছেন। আনকোরা জনাকয় তরুণ লেখক যখন একেবারেই নিজেদের মতো করে সাহিত্যচর্চা করার অভিপ্রায়ে একজোট হয়েছেন, বাঙালিয়ানার





উত্তরাধিকারে অনিবার্য কারণে সেখানে জমে উঠেছে আড্ডা। আড্ডা যেখানেই জমুক না কেন সাহিত্যচর্চার সঙ্গে তার সম্পর্কের রসায়নটি প্রায় সবসময়ই বেশ জমজমাট থেকেছে।

বাংলার সাহিত্য- শিল্প-সংস্কৃতিতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সুউচ্চ অবস্থান আর সুগভীর অবদানের কথা সকলেরই জানা। দ্বারকানাথ কিংবা প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথের আড্ডা দেওয়ার অভ্যাস থাকলেও সে আড্ডার সঙ্গে সাহিত্যের তেমন সুনিবিড় সম্পর্ক ছিল বলে শোনা যায় না। ঠাকুরবাড়িতে প্রথম সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করেন রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। মূলত তাঁরই উদ্যোগে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শুরু হয় 'বিদ্বজ্জনসমাগম সভা'। পরে পরে এই সভা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ড্রামাটিক ক্লাব' এবং সেই রেশ ধরে আরো পরে 'খামখেয়ালি সভা'র। সাহিত্যপ্রেমীদের আলাপ-পরিচয়ে, আমোদে- হুল্লোড়ে প্রতিটি সভাই ছিল ভীষণ জমজমাট। 'ড্রামাটিক ক্লাব' এ ড্রামার প্রাধান্য থাকলেও প্রতিটি আড্ডাতেই চলত সাহিত্যপাঠ, সংগীত পরিবেশন, নাট্যাভিনয়। আর থাকত এলাহি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। আড্ডাধারীরা একে অপরের মুগ্ধ প্রশংসা যেমন করতেন, তেমনি থাকতো স্নিগ্ধ সমালোচনা। বালক রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কবিতাটি প্রথম পড়েছিলেন 'বিদ্বজ্জনসমাগম সভা'য়,আবার তাঁর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটির অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেছিল 'ড্রামাটিক ক্লাব'। 'মানভঞ্জন', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্প তিনি পাঠ করেছিলেন 'খামখেয়ালি সভা'য়। নিজেদের বাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ- অবনীন্দ্রনাথ- বলেন্দ্রনাথ- সুধীন্দ্রনাথরা তো থাকতেনই, এইসব আড্ডার অমোঘ আকর্ষণে ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত ছুটে আসতেন প্রমথ চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রিয়নাথ সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, এমনকি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু কিংবা কখনো নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' বা মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণের বারান্দা' খুলে বসলে ঠাকুরবাড়ির সেইসব অকৃত্রিম আলাপচারিতার নাগাল পাওয়া যায়। বোঝা যায় বহু প্রতিভা বিকশিত হয়েছে জোড়াসাঁকোর এই অনাবিল আড্ডাগুলির উত্তাপে।

কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, ঠাকুর পরিবারের অনেকেই নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেকালেও পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আড্ডার আসর মাতিয়ে তুলতেন ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা। শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও সমাজসেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্বর্ণকুমারী গড়ে তুলেছিলেন 'সখি সমিতি'। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়েছিল এই 'সখি সমিতি'রই উদ্যোগে। মূলত মুক্তমনের মেয়েরাই অংশ নিতেন 'সখি সমিতি'র নানান কর্মোদ্যোগে এবং সেই সূত্রে জমে উঠত মেয়েলি মজলিশ। কিশোর রবির নতুন বৌঠানের সপ্রাণ কর্তৃত্বে জ্যোতিদাদার আমন্ত্রণে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, তারক পালিত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীরা সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা জমাতেন ঠাকুরবাড়ির তেতলার ছাদে। নারী-পুরুষের মিলিত উপস্থিতিতে সে আড্ডায় চলত গান-বাজনা আর একের পর এক কবিতা পাঠ। গুণীজন সান্নিধ্যে উৎসাহে অনুপ্রেরণায় এইসব আড্ডা

থেকেই তো সৃষ্টির অপার আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরে পরে শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ-বলেন্দ্রনাথ- অবনীন্দ্রনাথ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যমণি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির 'বিচিত্রার আড্ডা'র। আড্ডাটি আপাদমস্তক ঘরোয়া স্বভাবের হলেও বাইরের মানুষ ভিড় করতেন বেশি। গগনেন্দ্রনাথ,অবনীন্দ্রনাথরা তো থাকতেন নেতৃত্বে- ব্যবস্থাপনায়, স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিকরা আড্ডা জমাতেন বিশ্বকবিকে ঘিরে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রমথ চৌধুরী, সুকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আসতেন নিয়মিত। আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিচিত্রার আসরে রবি ঠাকুর পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতেন, পড়ে শোনাতেন 'পালাতকা'র কবিতা। প্রত্যাশা মতোই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদর্শন করতেন তাঁর ছন্দের জাদু। সাহিত্য সমালোচনায় ঋদ্ধ করতেন প্রমথ চৌধুরী। কেবল গল্প-কবিতা নয়, বিচিত্র রসিকতায় জমজমাট হয়ে উঠত 'বিচিত্রার আড্ডা'। সুধীন্দ্রনাথ পুত্র সৌমেন্দ্রনাথ তাঁর 'যাত্রী'- বইতে ধরে রেখেছেন 'বিচিত্রার আড্ডা'র এমনই সব বিচিত্র কথা।

সাহিত্যের আড্ডা কেবল জোড়াসাঁকোতে জমে উঠতো এমন নয়। আড্ডাবাজ সাহিত্যিকরা যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই বানিয়ে তুলেছেন আড্ডার উপত্যকা! বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে আড্ডা বসেছে ভাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। সে আড্ডায় উপস্থিত থেকেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো মানুষ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কেবল আড্ডা দেওয়ার মতলবে বানিয়ে তুলেছিলেন 'ডাকাতের ক্লাব'। এই ক্লাবের তরফে আগেভাগে চিঠি পাঠিয়ে যাওয়া হতো কারো বাড়িতে আড্ডা দিতে। গগনেন্দ্রনাথের নামে চিঠি পাঠিয়ে প্রথম আড্ডাটি বসেছিল ঠাকুরবাড়িতে। আড্ডা শেষে ভুরিভোজের ব্যবস্থাও ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বিনি পয়সার ভোজ' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল সেদিন।স্ত্রীর আকস্মিক প্রয়াণের পর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের দোল পূর্ণিমায় ৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে দ্বিজেন্দ্রলাল শুরু করেছিলেন 'পূর্ণিমা মিলন' নামে একটি সাহিত্য আড্ডার।'... "প্রতি পূর্ণিমায় দেশসুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া এক এক স্থানে এক একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে 'মিলন' করা যাইবে।... ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলামেশা, ভাব বিনিময়, প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে...।"[২] এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। প্রথম পূর্ণিমা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। পরে পরে পূর্ণিমা মিলনের আড্ডা বসে রসরাজ অমৃতলাল বসু, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, দেব কুমার চৌধুরী, ব্যোমকেশ মোস্তাফি, হীরেন দত্ত প্রমুখের বাড়িতে। সদালাপী মজলিশি মানুষ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই আড্ডার মধ্য দিয়ে যে অকৃত্রিম মিলনানন্দের স্বাদ গ্রহণ এবং পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তা অবশ্য অনেকটাই আড়ষ্ঠ হয়ে ওঠে। তখন গুরুগম্ভীর আলোচনা থেকে কে জানে কতটুকু সৃষ্টির প্রেরণা খুঁজে পেতেন আড্ডাধারীরা!





সে দিক থেকে দেখতে গেলে রায়বাড়ির অর্থাৎ উপেন্দ্রকিশোর- সুকুমার -সত্যজিৎ রায়ের বাড়ির আড্ডাগুলি ছিল আজীবন আনন্দ উন্মাদনায় ভরপুর। বাড়ির ছোটদের কাছে 'ভবন্দোলা', 'মন্তু পাইন'দের আজগুবি সব গল্প বলতে বলতে সুকুমার রায় তাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে বসত 'ননসেন্স ক্লাব' এর নিয়মিত বৈঠক। বাড়ির উঠোন বা ছাদে এই ক্লাবের সদস্যরা হইহই করে অভিনয় করে উপেন্দ্রকিশোরের 'কেনারাম ও বেচারাম' নাটক। সুকুমার রায়ের হাসির নাটক 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' প্রভৃতি অভিনীত হয় পরে পরে। 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' নামে একটি হাতে লেখা সচিত্র পত্রিকা 'ননসেন্স ক্লাব' থেকে বের করেন সুকুমার। নিতান্ত আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে এই ক্লাবের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলেও সুখলতা বা পুণ্যলতারা প্রমাণ করেছেন বাড়ির এই সাহিত্য আড্ডার পরিবেশ সাহিত্যিকদের কাছে কত বড় অনুপ্রেরণা! ১৯১৪সালে ১০০ নম্বর গড়পার রোডের বাড়িতে চলে আসেন সুকুমার রায়েরা। ১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে এই নতুন বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বিখ্যাত 'মনডে ক্লাব'। প্রথমে প্রতি সোমবার বসত আড্ডা। পরে অবশ্য সপ্তাহের অন্যান্য দিনে সুযোগ-সুবিধা মতো আড্ডা জমাতেন এই ক্লাবের সদস্যরা। এই আড্ডায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আড্ডাধারীরা এত সিরিয়াস ছিলেন যে, লোকে মজা করে বলতো 'মণ্ডা ক্লাব'। এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন সুকুমার রায়, কালিদাস নাগ, গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী, অজিত কুমার চক্রবর্তী, হিরণ কুমার সান্যাল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীশচন্দ্র সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুবিনয় রায় প্রমুখ।

'মনডে ক্লাব' বা 'মন্ডা ক্লাব'-এর হালচাল ছিল খানিকটা ঠাকুরবাড়ির খামখেয়ালি সভার মতো। অতুলপ্রসাদ সেন, ধীরেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, জীবনময় রায়, কালিদাস নাগ, এমনকি সুকুমার রায় পর্যন্ত এক এক দিন কোন আলোচনা নয়, গানের তোড়ে তোলপাড় করে তুলতেন আসর। 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটির সুরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখে দিয়েছিলেন প্যারোডি 'মন্ডা সম্মিলন';—

"আমাদের মন্ডা -সম্মিলন!
-আরে না -তা'না,- না-
আমাদের Monday সম্মিলন
আমাদের হল্লারই কুপন!"[৩]

সম্পূর্ণ গানে ভোজনবিলাসী আড্ডাবাজ বাঙালির নিখাদ হল্লার ছবিই ধরে রেখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তবে 'মনডে ক্লাব'এর আড্ডায় সাহিত্য-ধর্ম-পুরাতত্ত্ব- দর্শন- শিল্প-ভাষা -ইতিহাস- বিজ্ঞান সবকিছু নিয়েই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো। হিরণ কুমার সান্যাল লিখেছেন; -"শুধু আড্ডা নয়, ক্লাবে আমাদের ঠিক হয়েছিল প্রত্যেকদিন কোন-না-কোন বিষয়ে একজন সভ্য পড়বেন কিংবা কিছু বলবেন।... অজিত কুমার চক্রবর্তী মশায়ের রবীন্দ্রনাথ

সম্পর্কিত যেসব লেখা পরে বই হয়ে বেরিয়েছে -সেসব লেখা একটির পর একটি সভায় পড়েছেন।"[৪] আসলে আড্ডাধারীরা প্রত্যেকে ছিলেন এমন সব আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী যে, আড্ডার আনন্দ সমাগমেও তাঁরা পরস্পরকে যোগাতেন চিন্তার খোরাক, সৃষ্টির উৎসাহ! মনডে ক্লাবের আড্ডা চলেছিল ১৯১৫-১৯মাত্র চার বছর। আর এই সময়পর্বেই 'সন্দেশ' সম্পাদনার পাশাপাশি সুকুমার লিখে ফেলেছিলেন 'আবোল-তাবোল', 'খাই খাই'এর বেশ কিছু কবিতা, 'পাগলা দাশু'র অনেককটি গল্প, ছোট এবং বড়দের বেশ কয়েকটি নাটক- প্রবন্ধ। আবার এইসব লেখার অধিকাংশই তিনি প্রথম পড়েছিলেন মনডে ক্লাবের আড্ডায়। এই ক্লাব উঠে গেলে আর রায় বাড়িতে গড়ে ওঠেনি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আড্ডা।

অভিজাত পরিবার বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে ঘিরে যেমন জমে উঠেছে সাহিত্যের আড্ডা, তেমনি বেশকিছু পত্রিকাকে ঘিরে জড়ো হয়েছেন আড্ডাবাজ সাহিত্যিকরা। আবার দেখা গেছে আড্ডা থেকে উৎপত্তি হয়েছে বিশিষ্ট কোন পত্রিকার। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলেও 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই জমে উঠেছিল সাহিত্যিকদের আড্ডা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাটি প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির একটি ঘরোয়া আড্ডায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তেতলার ঘরের জমজমাট আড্ডা থেকে জন্ম হয়েছিল যে 'ভারতী'র, পঞ্চাশ বছরের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তাকে ঘিরে নানা জায়গায় নানা জনে আড্ডা জমিয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকা ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী ছাড়াও সফলভাবে সম্পাদনা করেছিলেন দুই বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। এই দুই বন্ধুর উদ্যোগে সুকিয়া স্ট্রিটের ২২ নম্বর বাড়িতে 'ভারতী'র কার্যালয়ে গড়ে উঠেছিল বিশাল আড্ডা। যে আড্ডায় নিয়মিত আসতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ- অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র- সুকুমার রায় আড্ডার আকর্ষণে মাঝে মধ্যে উপস্থিত হতেন 'ভারতী'র দপ্তরে। 'ভারতী'র দুই সম্পাদক মণিলাল এবং সৌরীন্দ্রমোহন এই আড্ডাধারীদের কাছ থেকে খুব সহজেই সংগ্রহ করে নিতেন পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় লেখা। সাহিত্য পাঠ, গান-গল্পে সকাল সন্ধ্যা জমজমাট থাকতো 'ভারতী'র আড্ডা। ৩৮ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কিংবা গজেন্দ্রনাথ ঘোষের বৈঠকখানাতেও মাঝেমধ্যে বসত 'ভারতী'র আড্ডা। চা-সিগারেট আর দেদার গল্প-গুজবে সেকালে 'ভারতী'র আড্ডা ছিল সাহিত্যিকদের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা। আড্ডায় পড়া মণিলালের নাটক 'মুক্তার মুক্তি' শিশির ভাদুড়ী যেমন মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি কারও পাঠ করা কবিতা পছন্দ হলেই ছাপানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল 'ভারতী'র পাতায়। আড্ডা থেকে পত্রিকাটি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছিল, পত্রিকাও আবার অনেক নতুন লেখককে এগিয়ে দিয়েছিল প্রতিষ্ঠার পথে।





'ভারতী'র আড্ডাবাজরা যেখানেই আড্ডার আঁচ পেতেন, উপস্থিত হতেন সেখানেই। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ও সুকিয়া স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকার অফিসেও নিয়মিত আড্ডা দিতে আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ। 'মৌচাক' সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার 'আমার দেশ আমার কাল' গ্রন্থে সে আড্ডার প্রসঙ্গে লিখেছেন;-'বিশেষ যে কয়টি বিষয় নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম তা হল—স্বর্গীয় ডি. এল রায়ের রবীন্দ্রনাথের ওপর বিরূপ ভাব পোষণ,...সাহিত্য ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়, স্টার থিয়েটারে ডি এল রায়ের 'আনন্দ বিদায়'-এর অভিনয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ হওয়া... এছাড়াও ভোজ শেষে চাটনির মত নারী সংক্রান্ত আলোচনাও যে হত না, তা নয়।'[৫] আড্ডাবাজ সাহিত্যিকদের রসবোধের যে অভাব ছিল না, তা বেশ বোঝা যায়। আড্ডার বন্ধুদের কাছ থেকেই সুধীরচন্দ্র সরকার সংগ্রহ করে নিতেন 'মৌচাক'-এর মধু। পরে পরে তাঁরই বইয়ের দোকান এম.সি.সরকার এন্ড সন্স-এ গড়ে উঠেছিল 'মৌচাক'-এর আড্ডা। 'ভারতী'র অনেক লেখকই বন্ধুর আমন্ত্রণে রাতারাতি লিখতে শুরু করেছিলেন শিশুদের জন্য। 'মৌচাক-এর প্রথম সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা'। হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়রাও 'মৌচাক'-এর জন্য লিখেছেন। 'মৌচাক'-এর আড্ডা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন;— 'অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিশি ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে মৌচাকের আড্ডা গমগম করত। এইখানেই বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, নন্দলাল বসু ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীর বাবুর আদর-আপ্যায়নে কত বর্ষার বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যার চায়ের মজলিশ এখানে সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে, কত ঠোঙা ঠোঙা 'অবাক জলপান' ফেরিওয়ালার ঝুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি সৎকারে সহযোগিতা করেছে; মৌচাকের ইতিহাসের সঙ্গে সেসবের ইতিহাসও জড়ানো।'[৬]

আড্ডার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে 'সবুজপত্র'-এর সঙ্গেও। প্রতি শনিবার সন্ধেবেলা প্রমথ চৌধুরীর কমলালয়ের বাড়িতে বসত 'সবুজ সভা'। সভা আলো করে উপস্থিত থাকতেন রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বরদাচরণ গুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কেউ নিয়মিত আবার কেউ অনিয়মিতভাবে। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে এ নারীবর্জিত আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন স্ত্রী ইন্দিরা দেবী। হারীতকৃষ্ণ দেবের 'সবুজ পাতার ডাক' কিংবা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' বইতে ধরা আছে 'সবুজ সভা'র ইন্টালেকচুয়াল আড্ডার ইতিকথা। কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'বসুধারা'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি লেখকগোষ্ঠী। অল্প সময়ে 'বসুধারা'র আয়ু ফুরালেও এই লেখকগোষ্ঠী জমিয়ে তুলেছিল 'রসচক্রের আড্ডা'। অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী,

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যপ্রেমী রবিবার বিকেলে আড্ডা জমাতেন কালিদাস রায়ের বাড়িতে। পরে পরে অবশ্য এই আড্ডা ভ্রাম্যমাণ হয়ে পড়ে এবং আড্ডার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'কল্লোল' আর 'কালি-কলম' তো ছিল আড্ডারই উপনিবেশ! আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম বাঁকবদলের কারিগররা নিত্যদিন অক্লান্ত আড্ডা জমাতেন ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের ছোট্ট ঘরে কিংবা বৃহস্পতিবার কলেজস্ট্রিট মার্কেটের উপর তলায় বরোদা এজেন্সির বইয়ের দোকানের সামনের প্রশস্ত বারান্দায়। 'একই মুক্ত বিহঙ্গের দুই দীপ্ত পাখা'[৭]- 'কল্লোল' আর 'কালি-কলম'-এর আড্ডার বিবরণ উপন্যাসোপম ভাষায় বুনে রেখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ'-এর পাতায় পাতায়। 'কল্লোল' সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস এবং গোকুলচন্দ্র নাগ তো থাকতেনই, নিয়মিত আসতেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র,মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। রোজ না এলেও হামেশাই এসে হাজির হতেন নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাস, মনীশ ঘটক, পরিমল গোস্বামী, মোহিতলাল মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, এমনকি বুদ্ধদেব বসুও। বোঝা যায় সৃষ্টিশীল এইসব মানুষের উপস্থিতিতে কল্লোলের আড্ডা কেমন করে হয়ে উঠতো সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ! কয়েকজন নতুন মুখ ছাড়া কল্লোলীয়রাই মূলত আড্ডা দিতে যেতেন 'কালি- কলম'-এর দপ্তরে। তবে কল্লোলের মত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছিল না কালি-কলমের আড্ডা। পত্রিকা দুটি যতদিন চলেছে, দুটি দপ্তরেই তাল মিলিয়ে চলেছে আড্ডা। আড্ডা থেকেই উঠে এসেছে অভিনব সব সাহিত্য ভাবনা। সেসব ভাবনায় ভর করেই তো গতানুগতিকতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বাংলা সাহিত্য।

অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকাকে ঘিরেই আসলে আড্ডা জমেছে। 'মানসী ও মর্মবাণী'কে ঘিরে যেমন বসেছে 'রবিবাসর', 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার 'শনিমন্ডল', তেমনি কৃত্তিবাসীদের আড্ডা 'বুধবাসর'। 'পরিচয়'- 'পূর্বাশা'ই হোক বা 'কবিতা'-'কবিপত্র' কিংবা 'সওগাত'- 'চতুরঙ্গ' প্রতিটি মননশীল পত্রিকাই আড্ডাকে আস্কারা দিয়েছে। এমনকি বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলো নিজের স্বার্থে আড্ডা জমিয়েছে নিজেদের দপ্তরে। বিমল কর কিংবা সাগরময় ঘোষদের আড্ডা তো ইতিহাস হয়ে আছে! সেসব আড্ডা থেকে উঠে এসেছেন কত নতুন লেখক, চমকপ্রদ সব নতুন লেখা! আড্ডার আনন্দের মধ্যেই আড্ডাধারী সাহিত্যিকদের কাছ থেকে সম্পাদক যেমন পত্রিকার জন্য বেছে নিতে পেরেছেন প্রয়োজনীয় লেখা, তেমনি সাহিত্যপ্রেমী তরুণটি পরিচিত হতে পেরেছেন পূর্বসূরী সাহিত্যিকের সঙ্গে, উপদেশ-অনুপ্রেরণায় পত্রিকার পাতায় সুযোগ পেয়েছেন নিজেকে প্রকাশ করার। 'মিত্র ও ঘোষ' কিংবা 'এম.সি.সরকার'-এর বইয়ের দোকানে সেকালে যেমন প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের জমজমাট আড্ডা বসেছে, একালেও তেমনি 'একুশ শতক', 'এবং মুশায়েরা' কিংবা



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

'কারিগর'-এ বসে সাহিত্যের আড্ডা। এই সব আড্ডা কি সাহিত্যকে শতধারায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় না!

রবীন্দ্রনাথ থেকে রাজশেখর বসু, সুকুমার থেকে কমলকুমার, শরৎচন্দ্র থেকে সুনীল-শক্তি কিংবা শিবরাম চক্রবর্তী থেকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরী- শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে অমর মিত্র -সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রত্যেকেই হুজুগে বাঙালির বানিয়ে তোলা নানান ঐতিহ্যবাহী আড্ডার অংশীদার। সাহিত্যপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি যেমন অনেককে পৌঁছে দিয়েছে এইসব সাহিত্য আড্ডায়, তেমনিই এই আনন্দের আখড়াগুলি থেকে অনেকে খুঁজে নিয়েছেন সৃষ্টির প্রেরণা। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে সাঙ্গুভ্যালি চায়ের দোকান, কলেজস্ট্রিট বা চৌরঙ্গীর কফি হাউস, খালাসিটোলা, বসন্ত কেবিন, আদি সুতৃপ্তি- অমৃতায়ন- কে.সি.দাশ এমনি আরও কত শত আস্তানায় আড্ডা জমিয়েছেন সাহিত্যিকরা। আবার প্রায় সব আড্ডাতেই সাহিত্যিকদের সঙ্গ দিয়েছেন সাহিত্য থেকে শত যোজন দূরে থাকা বন্ধু-বান্ধব। মোটকথা গাল-গল্প, চা-সিগারেট, চপ-মুড়ি বা লুচি-আলুরদমেই দম ফুরিয়ে যায়নি আড্ডাগুলির। এই সব সাহিত্যিক আলাপচারিতার অমূল্য ইন্ধন অনেক সময়ই আড্ডাধারীদের মধ্যে নির্মাণ করে দিয়েছে সাহিত্য রচনার উপযোগী মন। আড্ডার মতোই রমরমিয়ে চলেছে সাহিত্য সৃজন। আড্ডার সঙ্গে সাহিত্যের এই ওতপ্রোত সম্পর্কটি সেকাল থেকে একালে অমলিন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে একই রকম থাকবে এ বিশ্বাস বাঙালির উপর রাখাই যায়।

**তথ্যসূত্র :**


১) বুদ্ধদেব বসু, 'উত্তরতিরিশ', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১০৬

২) দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পত্র, সংগৃহীত- অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ডি এল রায়ের পূর্ণিমা মিলন', উৎস - সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) 'কলকাতার সাহিত্য-আড্ডা', গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৯,পৃ. ৪৭

৩) প্রসাদরঞ্জন রায়,'রায়বাড়ির আড্ডা ও সুকুমারের মনডে ক্লাব', কলকাতার সাহিত্য-আড্ডা (২০১৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৪) তদেব, পৃ. ৪০

৫) সুধীরচন্দ্র সরকার,'আমার দেশ আমার কাল', এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৫৪

৬) তদেব। পৃ. ৬৩

৭) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ. ৫১

## AMITAV GHOSH : ISSUES OF CULTURAL IDENTITY FROM POSTCOLONIAL PERSPECTIVE

**Rana Gorai**

Indian English writing is the consequence of the arrival of British people in India and it was after their departure that Indians thought of writing about India in English language. Post Independence Indian fiction refers to the period when India got freedom from British rule whereas postcolonial Indian English fiction marks the period following the fall of colonialism, i. e. termination or diminishing of foreign empires. It can be said that both fictions are virtually synonymous to each other as during both times Indian writers were able to express political and social problems as well as proved to be great social reformers through their works. It was through novels that writers shared human experience through their long and complex narratives connected with a sequence of events. Novel is a recent development compared to prose, poetry or other genres and is also the best medium of expressing the social reality with its culture, lifestyle, ways, ideals and problems. In the beginning it was a challenging task to write in colonizers' language but with the arrival of great Indian authors like Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore etc. literature was beyond such trivial limitations. In pre-independent Indian society, novels like "Untouchable" (1935) by Mulk Raj Anand, "Kanthapura" (1938) by Raja Rao and so on threw light on the political and social evils of that time. After Independence, feminist writing was developed with the arrival of women writers like Sashi Despande, Nayantara Sehgal who were concerned with women's rights, women's fight for equality in patriarchal Indian society and voiced these concerns objectively and appealingly. From 1980's writers like Salman Rushdi, Arundhati Roy and above all Amitav Ghosh, awardee of Jnanpith Award, whose ambitious novels portrayed the characteristics of pragmatic and private identity of people in Indian English. This made a remarkable mark on the world literary prospect with flourishing cultural tradition and proficient language monitoring. Thus Indian English is on the move and the present paper work





on one of the most prominent and fascinating Indian English novelists, Amitav Ghosh.

Amitav Ghosh was born in Calcutta on 11th July 1956 and grew up in India, Bangladesh, East Pakistan and Sri Lanka. He was not only a fascinating Indian English writer but also is worldly acclaimed now. He attended the Doon School in Dehradun. While he was at school, he regularly contributed fiction and poetry to "The Doon School Weekly" and founded the magazine "History Times" along with his friend Ram Guha. He graduated himself with History honours from the University of Delhi in 1976 and masters degree in sociology in 1978 and then got the Doctorate Award in Social Anthropology from the University of Oxford in 1982. He engaged himself for a little time as a Pressman for The Indian Express Daily in New Delhi. After that he become a regular visitor at the centre, at Trivandrum, Kerala (1982-83) for Social Sciences, a visiting professor of Anthropology at Virginia University (1988), at the University of Pennsylvania (1989), at American University in Cairo (1994), and Columbia University (1994-97), and Distinguished Professor of Comparative Literature at Queens College of the City University of New York (1999-2003). In the first half of his career of 2004, he also became a visiting Professor in the Department of English at the University of Harvard. He spends part of each year in Calcutta, but lives in New York with his wife, Deborah Baker, and their children Leela and Nayan. His wife Deborah Baker is also an autobiographer and essayist. Her most important work is "The Life of Laura Riding"(1993).

Amitav Ghosh has been a winner of Sahitya Academy Award in 1989 for "The Shadow Lines", the prestigious Prix Medicis Etranger Award, Arthur C. Clarke prize, and recently he was honored with Padam Shri, on 26th January, 2007. His "Sea of Poppies" was also shortlisted for the Man Booker Prize. In 2018, he was also conferred 54th Jnanpith Award which is India's highest literary honour and he was the first English language writer to receive this award. In 2019, Foreign Policy Magazine named him: Important global thinkers of the preceding decade.

Amitav Ghosh is widely regarded as one of the greatest novelists

in postcolonial Indian English literature. He widened the scope of novels by composing well-knit, compact and precise novels on a wide variety of themes. Born in the mystic land of Kolkata in 1956, the novelist came up in the Eastern part of Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Iran and India. He is interested in the past History, Social Science and Anthropology and that interest is circumstantially reflected in his narratives. It is a fact that though Ghosh started his career as a journalist for “The Indian Express Newspaper” in Delhi and novels came later in his life, he compensated for the same by producing some of his best volumes of novels in quick succession. His main themes of discussion are nationalism, multiculturalism, communal violence, restlessness, humanitarian attitude, political freedom, peaceful co-existence, scientific quest and patriotism etc. Ghosh mainly writes on contemporary themes and also brings forth a short realization of those events of the past to make their presence in the present. This technique of intermingling makes his novels a fact cum fiction based reading.

Here, a critical study is being carried out on the various thematic concerns in the novels of the epoch-making novelist Amitav Ghosh. Such kind of overview will reveal the creative capacity of the novelist as an artist and will endeavour to explore various thematic concerns in some of his following novels: like "The Circle of Reason" (1986) shows restlessness, obsession and exile, "The Shadow Lines" (1988) upholds humanitarian attitude, The Calcutta Chromosome (1996) depicts scientific quest, "The Glass Palace" (2002) presents colonial displacement and "The Hungry Tide" (2004) focuses on individualism. His novels show a continuous development both in theme and technique. Ghosh is a conscious novelist who looks 'before and after' endlessly to revise his poems in order to make them more effective and meaningful.

Amitav Ghosh presents his concern on the theme of restlessness, exile and rationalism through The Circle of Reason. Here the novelist chiefly discusses the story of an Indian protagonist Balaram. Ghosh has depicted Balaram who is suspected of being a terrorist, his obsessions, ideals and his tragic end. In this novel, Amitav Ghosh





has depicted the same theme through the other characters of this novel. The protagonist is obsessed with phrenology and carbolic acid at Talpukur. There is Balaram’s wife Toru Devi who is always preoccupied with her sewing machines, Jyoti Das with his occupation, Alu with weaving, Professor Samuel with the theories of queues and Zindi herself is obsessed with Durban tailoring. “The Circle of Reason” is not only purely based on the theme of obsession but also symbolises restlessness and shows how people spend their lives in achieving their ideals and goals in this world. Ghosh also shows, a clash of tradition and modernism and further appeals to people for a humanitarian attitude.

“The Shadow Lines” is another kind of novel by Amitav Ghosh in which he emphasises on undisturbed livelihood and altruistic notion among society and cultures. Ghosh focuses on the conventional portrayal of the lines that set the boundaries of nations as ‘illusory’ and ‘visionary’ memory and desires, the past and the present. In this novel , Ghosh depicts an Indian family and an English family who had departed from India in 1947. He makes a reunion between Mr. Justice Chandra Sekhar and Lionel Tresawsen despite their different race and religion. The novel shows that the lines only make obligations among people in the name of race, religion and regions. But fortunately the human race always strives to find freedom. The novelist never binds himself on such lines which cause hindrances, instead he freely roams in India, Pakistan and England. Thus we can see that the novel triumphs over riots and partition, violence, castes and colour. Proving the truth that the human race has the same emotions and feelings all over the world.

Amitav Ghosh’s next novel “The Calcutta Chromosome” is regarded as the first scientific novel in English. Here we find the life account and scientific quest of an Egyptian computer clerk, Antar. On one hand, he is performing on his computer machine, Ava, to find out the whereabouts of a missing scientist L. Murugan, and on other hand it deals with the discovery of a malarial parasite by Sir Ronald Ross. This novel not only deals with scientific research but also includes history, politics, psychological afflictions and even spiritual meditation.

The Glass Palace deals with the theme of colonial displacement. The novelist has shown this theme even in the upper class society through the characters King Thebaw, Queen Supayalat, the Burmese Princes and through the common people like Rajkumar, Dolly, Saya John - all of them equally became the victims of colonial displacement. In this postcolonial novel, Ghost depicts the story of Rajkumar who gradually proves himself as an influential part of the Indian Community in Burma. Rajkumar falls in love with Dolly and later marries her who lives in a distant Indian city of Ratnagiri. Amitav Ghosh has represented this theme throughout the novel among three families of Rajkumar and Dolly in Burma, of Saya John and his son Mathew in Malaysia and in India between Uma and her brother. So the theme of coloniser and colonised has been highly highlighted here.

Ghosh's next novel The Hungry Tide, no doubt, is an example of the novelist's concern for the individual in terms of past History and Geography. Here he has tried to build up a caring relationship between man and nature and at the same time has shown the devastation of nature with its interference. Subsequently, it affects both nature and human relations either internal or external. Ghosh has divided the book into two sections - one is The Ebb and the other one is The Flood and set the plot of the novel in Sundarban, the beautiful forest which is the pride of Bengal located at the Northern part of it. At the same time the novel represents the negative aspects of individualism through the conflict between government and local people over the Bengal Tiger which kills men from time to time. Ghosh repeatedly highlights how class conflict affects culture and it is to be also found through the characters of the novel who also become aware about such facts.

In order to evaluate the significance of Amitav Ghosh as a novelist, one should deeply travel beyond the footsteps to study his novels. Thus it can be concluded by saying that the epoch making novelist Amitav Ghosh's "The Circle of Reason", "The Shadow Lines", "The Calcutta Chromosome", "The Glass Palace" and "The Hungry Tide" obviously uphold the postcolonial traits like non-recognition, illiteracy, caste and cultural identity,





starvation, ethnicity, poverty, suffering and demotion. Ghosh himself is extremely affected with such themes and so it becomes the primary concern for him to weave a kind of magical realistic plot along with postcolonial background which we also find in the novels of Sashi Despande, R. K. Narayan, Mulk Raj Anand, Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri and so on. Amitav Ghosh has not only become popular throughout the country for interlocking and striking stories but also universally acknowledged.

**Informations and Sources :**


1. Amitav Ghosh, (1986), "The Circle of Reason", New Delhi, Ravi Dayal, Permanent Black. Print.
2. Amitav Ghosh, (1988), "The Shadow Lines", New Delhi, Oxford University Press, 1988. Print.
3. Amitav Ghosh, (1996), "The Calcutta Chromosome", New Delhi, Ravi Dayal, Permanent Black1996. Print.
4. Amitav Ghosh, (2000), "The Glass Palace", New York, Random House, Inc.2002. Print.
5. Amitav Ghosh, (2004), "The Hungry Tide", New Delhi, Ravi Dayal, Permanent Black, 2004. Print.

# JHUMUR : CORONA AND THE MARGINAL PEOPLE

**Sandip Tikait**

Jhumur, the folk song is funetioning as life driving force and cultural identity of the common folk of Purulia district. Jhumur is enrooted and grows in the very soil of Chota Nagpur Plateau. Jhumur stands for life. Pandemic Corona affected the entire country at large and the declaration of sudden lockdown changed the ecology of whole society. District like Purulia in West Bengal faced the same dilemma Hardship. But the positivity of human passion and emotions established human faith firmly to face the challenges through the wings of Jhumur. When people were panicked and afraid to watch the statistical report of corona infection and death toll on television, the people of Purulia became vocal to fight against all odds.

Most of the people in the district are either daily wagers or marginal farmers. A large number of daily wagers work in the different states to earn their bread. After the sudden declaration of the lockdown, marginal farmers as well as the daily wage earners fell into misery. Their livelihood was stopped and faced great financial crunches. But the people of Chota Nagpur Plateau are always brave to face challenges in life. The geographical rough terrain and the extreme climate condition always make their life tough. Now pandemic Corona put them in extreme situation. But they dared to face and the book 'Corona Bishoyok Jhumur Sankalan' is the living evidence. People of Purulia tried to overcome the Corona pandemic and proved their dynamic existence to the world.

When privileged class people were busy to exhibit sumptuous food dishes and drinks like Dalgona coffee on the social media platform as well as pass their quality time by watching movies with the family, a large number of Jobless marginal labours are stuck in their work places in the different states and cities of the country without money and food. The main focus of the paper is to analyse certain Jhumur songs from the book 'Corona Bishoyok Jhumur Sankalan' to show the grim reality of the marginal people in the district of Purulia during corona. The book has multiple arenas of human emotions like livelihood, administration, health, social, political and economical crisis. Only a very few fragments of Jhumur songs are analyse to illustrate the life of marginal people during Corona pandemic lock down. The book 'Corona Bishoyok Jhumur Sankalan' has documented the tales of marginal people who were confined within home as well as far from home during Corona pandemic. The lockdown corona scenario reflects in the Jhumur of Rakhohari Mahato:



ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VIII, Issue : XVII

করোনার ডরে
বন্দি থাক ঘরে
বিধি ভেঙ্গে গো কেহ বাইরে ঘুরো না।
( রং ) - মহামারি রূপ নিয়েছে নোভেল করোনা।[১]
[Fear of Corona
Confined in the house
By breaking the protocol do not wander outside.
(Refrain) - Novel Corona becomes Pandemic.]

Everybody is locked inside the home because of the fear of Corona virus. Anyone can be infected at any moment. As a true responsible citizen of the society it is also observed that the singer asked not to break corona protocol and roaming around as novel corona virus turns into pandemic. Another singer Gobindalal Mahato reflecting the same tale of corona where the administration is taking strict steps against those people who break the corona protocol :

(১)
চীন দেশের শুরু হল্য
গ'টা দুনিয়া ছৈড়াঞ গেলো হে
এই রোগেতে হাজার হাজার মানুষ গেল মরে হে
. . .
(৩)
উড়ছে ভাইরাসের গন্ধ, হাট বাজার সব বন্ধ হে
ভীড় দেখলেই পুলিশে তো ঢাড়ায় দমে জোরে হে
(৪)
পল্টি বিকায় সস্তা দরে, কেউ তো ছুছে নাই ডরে হে,
গোবিন্দ কয় দেখা হবেক লকডাউনের পরে হে [২]
(1)
Has begun in China
Spread in the whole World
Thousands and thousands people have died in the disease
(3)
Smell of virus is in the air, all Haat Bazar are closed
Police beat up mercilessly when see the crowd
(4)
Poultry sell in cheap rate, nobody touches out of fear,
Gobinda says let us meet after lockdown]

It is well known that corona virus was spread from China to the whole world and died thousands of people. As the virus is airborne, the open air markets as well as shops are closed. Administration is uncompromising and aggressive to those who break the protocol of corona. Police even beat those lawbreakers. Fear of corona is so terrifying that even chicken sells at very low price but no buyers are there. Still Singer expresses positive attitude towards life.

Rabindranath Mahato depicts in his Jhumur a different kind of picture of the daily wagers and marginal farmers who went to earn some money in the different pockets of the country and sudden declaration of lockdown made their life worse. In the Jhumur, life of the daily wagers documented in a journalistic approach. As Rabindranath Mahato sings:

করোনা ঘেরিল ধরা
বাইঁচে থাইকেও হলি মরা
দিবানিশি ভাবি বইসে বইসে হে...
ফিরি কিনা ফিরি ঘরে
পরবাসে ভাঁসি লরে
আইজ কি ফেরে পইড়েছি আইসে হেথা হে
(রং)-কি ঘুমে ঘুমাছে মন্ত্রী নেতা?
আইজ মনে কি নাই পড়ে হামদের কথা হে[৩]
[Corona infected the World
Living however lifeless
Thinking relentlessly day and night . . .
May I Return home or not
All at a loss in distant land
By coming here fall in such a trouble at present
(Refrain) - What sleep is sleeping minister and leader?
Today don't they mindful about us)

The life of the daily wage earner is almost ceased in every sense as Corona infected the entire country. Daily wagers are at the verge of death not because of Corona virus infection but they have no earnings to fill the belly as the entire country is under lockdown situation. From the news reports, it is known that the daily wagers wake up in the morning with empty stomach and go to sleep without food. In this utter helpless situation their worries increase day by day as their near and dear are also facing the same pitiful condition. They are in a trap in those strange lands





to earn money for their family. In a democratic society leaders are elected to look after and make progress for the people. In Corona lockdown situation, people need help from their political leaders but unfortunately, no support, no aids are extended to them. The callousness of the society reflects in the song vividly.

Rabindranath sorrowfully echoes the pain of the marginalised labours in the Jhumur :

নেতাই নেতাই বজড় দেয়
হামরা হারাই বাঁচার খেই
কেউবা ঝাড়ে কেউবা মারে ছোবল হে ...
হামরা নাকি পরিযায়ী
মরার জন্য নিজেই দায়ী
তাই তো বুকে চালায় রেলের চাকা হে ...
(রং)-কি ঘুমে ঘুমাছে মন্ত্রী নেতা?
আইজ মনে কি নাই পড়ে হামদের কথা হে[৩]
[ Leader debates with leader
We lose hope to survive
Some gives lecture some do attack . . .
Are we migrant labours
Ourselves responsible for death
So running train's wheel over our chest ...
(Refrain) - What sleep is sleeping ministers and leaders
Today don't they mindful about us]

Instead of supporting those marginalized people, clever politicians are still playing political propaganda. Some leaders are giving lectures and some of them attack each other with tons of blames and counter blames but no one has come forward to help and support those marginal labours. Gradually, as time passes by, they have been drowning in a hopeless world of misery. The most lamentable situation is that when marginalized labours who work in the different states of India are labelled as migrant labour as if they have no national identity or citizenship. Corona exposes the real state of the marginal people in society. They are blamed for their tragic fate. Various news agencies reported as there were no vehicle arrangements for the migrant labourers to reach home. They start walking with empty pocket and empty stomach towards home. Tired labours were run over by the train and found dead when they were taking rest on the railway track.

The same pathos also expresses by Rakhohari Mahato in his Jhumur :

হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান
তামিলনাড়ু, রাজস্থান
বোম্বাই, গুজরাটে তারা দিনমজুর খাটা
(রং) - ট্রাকে প'ড়েছে চাপা ত কেও ট্রেনে প'ড়ছে কাটা
সুখীর ভারত, দুখীর ভারত সাধের ভারত মাতা।[৫]
[Howrah, Hooghly, Bardhaman
Tamilnadu, Rajasthan
Bombai Gujraat they work as daily wager
(Refrain) - Run over by truck and cut by the train
Rich India, poor India adore to mother India]

He sings that the daily wage earners of Purulia work in the various districts of West Bengal like Howrah, Hooghly and Bardhaman as well as in the different states of India - Tamilnadu, Rajasthan and Maharastra. Irrespective of rich or poor, citizens are proud to be Indian who love the mother land. Though, Corona shows that equality and **brotherhood**–are the rhetorical words only. Poor people have no place in society. During lockdown poor marginal labourers cannot afford any vehicle. So, they depend on their feet and start walking **homewards.** And some of their homewards journey end under the truck or train.

Rabindranath Mahato further presents the pitiable state of the marginal labourers' family. They miss their family and worry about them :

'যারা আমার আপনজন
পরিবার আর কুটুমজন
আসার আশায় থাকে পথ চেয়ে হে ...
দুধের ছানা নিয়ে কলে
স্ত্রী ভাঁসে চোখের জলে
খনে খনে বাড়ে বুকের ব্যথা হে ...
(রং) - কি ঘুমে ঘুমাছে মন্ত্রী নেতা?
আইজ মনে কি নাই পড়ে হামদের কথা হে ন'[৬]
(My near and dear
Family and relatives
Gazing at the path with hope of returning home . . .
Having baby in the lap
Wife is in floods of tears
Frequently feels surging pain in heart ...
(Refrain) - What sleep is sleeping minister and leader





Today don't they mindful about us)

Family is the prime source of strength as well as great impulsive force for the marginal folk. They work and live for their family. The family, friends, and relatives - all near and dear are waiting indoubtful heart for their home coming with great hope. The dependents are waiting for their only resort. Thoughts of troubles and worries make the wife of marginal worker sad. Wife is longing with tears for beloved husband's return along with her baby. In a very small span, the singer captures the picture of emotional family bonding of the marginal people.

Pandemic corona challenged the human existence and exposed the status of class classification in society. No country, no state or agencies had come forward to support those marginal people. The socio-economic condition divided the society into two hemispheres. Marginal People's labour and energy are being used to build the nation but truly they have no place in the society, state or country. In their own country marginal people were labelled as migrant labour as if they belonged to some foreign country. The basic facilities like food and shelter, the minimum human requirement had not been even provided in the crisis. They come on the roads with the hope of returning home and it is phenomenal that the people who migrated during the lockdown were greater in number than the Independence scenario. It is not only the story of Purulia district but it's an iconic representation through Jhumur where the marginalised people of the many districts like Purulia suffered likewise. In the Jhumur song, the folk singers recorded the reality of the marginal. This genre is instrumental to illustrate the dismal plight of the people. Singers of Purulia want to tell the entire world the other dimension of life through Jhumur.

Like the journalists, the folk Singers are very particular and skillfully narrate the day to day accounts of life. Corona can choke the society for a while but never been able to choke the marginal people at any time or any place.

**Notes & References :**

1. Animesh Das (Ed.): 'Corona Bishoyok Jhumur Sankalan', Manbhum Lokgaan Shilpi Gosthi, Purulia, 2021, p 9.
2. Ibid, p 11
3. Ibid, p 13.
4. Ibid, p 14.
5. Ibid, p 10.
6. Ibid, p 13.